গল্প-গ্রন্থাবলী

তৃতীয় খণ্ড

গল্প-গ্রন্থাবলী

তৃতীয় খণ্ড

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রজ্ঞাভারতী

প্রকাশক
সুশান্ত দে
প্রজ্ঞাভারতী
১, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

প্রজ্ঞাভারতী প্রকাশিত
প্রথম মুদ্রণ : ১৩৫৯

প্রচ্ছদ
কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

সূচীপত্র

মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বহুকাল তাহাতে তৈলস্পর্শ ঘটে নাই, কৃষ্ণবর্ণ কৃশ দেহ, কোটরগত চক্ষু, অত্যন্ত ছিন্ন মলিনবেশী এক প্রৌঢ় ব্যক্তি সিরাজগঞ্জ বাজারে রামলোচন সরকারের চাউলের আড়তে আসিয়া বলিল, "বাবু মশায়, আজ সারাদিন আমি কিছু খেতে পাইনি।"

রামলোচন তহবিল মিলাইবার জন্য সম্মুখে রাশিকৃত টাকা পয়সা, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতি লইয়া গণিয়া গণিয়া থাকে থাকে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। ভিখারীর প্রতি চোখের কোণে একবার দৃষ্টিমাত্র করিয়া, একটা পয়সা তাহার দিকে ঠক্ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। পয়সাটি কুড়াইয়া লোকটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া করুণস্বরে বলিল, "একটা পয়সায় কি হবে বাবু? সারাদিন কিছু খাইনি।"

এইবার রামলোচন ভাল করিয়া লোকটার মুখের পানে চাহিলেন। চেহারা দেখিয়া তাঁহার মনে বোধ হয় একটু দয়ার সঞ্চার হইল; বলিলেন, "ভাত খাবে?"

লোকটা বলিল, "আজ্ঞে, তাই যদি দুটি আজ্ঞে হয়।"

"আচ্ছা বোস তা হ'লে। সন্ধ্যেটা দেখিয়েই দোকান বন্ধ করবো। বাসায় নিয়ে গিয়ে তোমায় ভাত খাওয়াব: ঐ যে পয়সাটা দিলাম, ময়রার দোকানে গিয়ে কিছু মিষ্টি কিনে ততক্ষণ জল খাওগে।"—বলিয়া তিনি তহবিল মিলাইতে মন দিলেন।

রামলোচন সরকার জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার নিবাস এ স্থানে নহে, তবে এই জিলাতেই বটে। বাজারে এই চাউলের আড়তটি তাঁহার পৈতৃক আমলের; বাজার হইতে কিছু দূরে নদীর সন্নিকটে দ্বিতল বাসবাটীখানিও তাঁহার পিতা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রামলোচন ও তাঁহার কনিষ্ঠ পদ্মলোচন উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া কারবার চালাইতেন। পিতার জীবিতকালেই উভয়ের বিবাহ হইয়াছিল, বড়বধূর নাম তারাসুন্দরী, ছোটর নাম রাধারাণী। বাড়ীতে বিধবা মাতা ছিলেন, তাঁহার সেবা ও ঘর গৃহস্থালী কর্ম্মের জন্য উভয় বধূ এককালে এখানকার বাসাবাটীতে আসিয়া থাকিতে পারিতেন না— পালাক্রমে ছয় মাস করিয়া এক জন বাটীতে থাকিতেন, এক জন বাসাবাটীতে আসিয়া স্বাধীন গৃহিণীপনার সুখাস্বাদন করিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর এই বন্দোবস্তই চলিয়া আসিতেছিল; এক দিন হঠাৎ কলেরা রোগে পদ্মলোচনের মৃত্যু হইল। ইহার পর বিধবা জননীও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, মাস ছয়েক পরেই তাঁহার পুত্রশোক, চিতার আগুনে নির্ব্বাপিত হইল। সেই অবধি তারাসুন্দরীই সিরাজগঞ্জের বাসাবাটীতে কায়েম হইলেন, রাধারাণী তাঁহার শ্বশুরের ভিটা আগলাইয়া পড়িয়া রহিলেন। বড়বধূও অবশ্য মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন; কিন্তু অধিকদিন থাকিতে পারেন না, বাসাবাটীতে কর্ত্তাকে, অতিথি-অভ্যাগতকে ভাত জল দেয় কে? সম্প্রতি দিন পনেরো হইল, ছোট-বধূ বাসাবাটীতে আসিয়া রহিয়াছেন, কারণ তারাসুন্দরী এখন সন্তানসম্ভাবিতা—দিনও ঘনাইয়া আসিয়াছে।

॥ দুই ॥

তহবিল মিলানো শেষ করিয়া, টাকাগুলি বাসায় লইয়া যাইবার জন্য খেরুয়ার থলিতে ভরিয়া রাখিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামলোচন থেলো হুঁকা হাতে করিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্বকথিত সেই ভিখারী আসিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। রামলোচন বলিলেন, "কি হে, জলটল কিছু খেলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এক পয়সার বাতাসা কিনে জল খেলাম।"

"বেশ। তোমার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীহারাধন দত্ত। কায়স্থ।"

"কায়স্থ? বেশ বেশ। আচ্ছা, বস ঐখানটায়।"—বলিয়া, যে চৌকিখানির একপ্রান্তে তাঁহার "গদী", চক্ষুর ইঙ্গিতে রামলোচন তাহারই অপর প্রান্ত দেখাইয়া দিলেন। হারাধন বসিল।

হুঁকায় কয়েক টান দিয়া রামলোচন বলিল, "কায়স্থ? বটে! তা, তোমার এমন অবস্থা হ'ল কি ক'রে?"

হারাধন নীরবে আপন ললাটে হস্তার্পণ করিল।

রামলোচন বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ত বটেই, সে ত বটেই। অদৃষ্টই হচ্চে মূলাধার। বাড়ী কোথা তোমার?"

"কোথাও নেই। বাড়ী ঘর থাকলে কি আর পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াই বাবু?"

"তবু—তোমার বাপ-পিতামহ কোথায় থাকতেন, কোথায় তুমি জন্মেছিলে, কোথায় ছেলেবেলা কাটিয়েছ, সে সব ত বলতে পার?"

হারাধন মাথাটি নাড়িয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে মশাই অনেক কথা! বলতে গেলে মহাভারত।"

রামলোচন ভাবিলেন, পূর্ব্বে বোধ হয়, ইহার অবস্থা ভাল ছিল, গ্রহবৈগুণ্যবশে এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে, সে সকল কথা বলিতে বোধ হয় লজ্জা ও দুঃখ অনুভব করিতেছে। ভাবিলেন, সকলই অদৃষ্টের খেলা, কখন কার কি অবস্থা দাঁড়ায়, কিছুই ত বলা যায় না। এ বিষয়ে উহাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। করুণাপূর্ণ নয়নে লোক-টির পানে চাহিয়া বলিলেন, "তামাক খাবে?"

"আজ্ঞে দিন"—বলিয়া হারাধন হাত বাড়াইল। রামলোচন কলিকাটি খুলিয়া তাহার হাতে দিলেন; হুঁকা দিলেন না, কারণ যদিও এ ব্যক্তি নিজেকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে—সত্যই কায়স্থ কি না, তাই বা কে জানে! লোকে কথায় বলে, "জাত হারালে কায়েত।"

হারাধন কলিকাটি লইয়া, তাহা অঙ্গুলিপুটে ধারণ করিয়া, হস্তদ্বারা কৃত্রিম হুঁকা রচনা করিয়া খুব জোরে জোরে তিন চারিটা দম লাগাইল। তাহার দাপট দেখিয়া রাম-লোচন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে নাকি?"

"বড় তামাক"—অর্থাৎ গাঁজা। হারাধন বলিল, "মাঝে মাঝে তাও চলে বইকি!"—বলিয়া কলিকাটি সে রামলোচনকে প্রত্যর্পণ করিল। রামলোচন তখন সেটি নিজের হুঁকায় বসাইয়া, দুই এক টান দিয়াই বুঝিতে পারিলেন, উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। রামলোচন ডাকিলেন—"বেজা! পিদিপটে জ্বাল রে।" বালক ভৃত্য ব্রজনাথ গদীর উপর একটি পিতলের রেকাবী বসাইয়া, প্রদীপসহ পিল-সুজটি তাহার উপর রাখিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। রামলোচন তখন "হরিবোল হরি—দুর্গা দুর্গা, জয় মা অন্নপূর্ণা" প্রভৃতি দেবদেবীর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। বেজা তার পর প্রদীপটি হাতে করিয়া, দোকানের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া, "সন্ধ্যা দেখাইয়া" আসিল। দোকানের গোমস্তা এবং ওজনদার উভয়ে মিলিয়া, সকল দ্বার ও জানালাগুলি সাবধানে বন্ধ করিয়া, মোটা মোটা হুড়কা তুলিয়া দিল। চাউলের বস্তা প্রভৃতিও যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, নিজ নিজ পিরিহান ও চাদর প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রামলোচন পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া, গোমস্তার হাতে দিয়া, টাকার থলি হাতে লইয়া আড়তের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ম্মচারিগণ বাহির দ্বারটি বন্ধ করিয়া তাহার নানা স্থানে বড় বড় তালা লাগাইয়া, চাবির গুচ্ছ প্রভুকে প্রত্যর্পণ করিল। "এস হে হারাধন"—বলিয়া রামলোচন অতিথি ও ভৃত্যসহ বাসা অভিমুখে চলিলেন; কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

॥ তিন ॥

হারাধনকে বাসায় লইয়া গিয়া বাহিরের ঘরের বারান্দায় তাহাকে বসাইয়া রামলোচন বলিলেন, "রান্নার ত এখনও দেরী আছে; তুমি এখানে ব'স ততক্ষণ, আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসি।"—বলিয়াই তিনি আগন্তুকের বস্ত্র প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি কাপড় ছাড়বে? একখানা ধুতিটুতি পাঠিয়ে দেবো?"

হারাধন বলিল, "হলে ত ভালই হয়।"

"আচ্ছা ব'স।" বলিয়া রামলোচন অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিজ শয়নঘরের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন ভিতরে তাঁহার স্ত্রী কোলের ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইতেছেন—ছোটবউ সেখানে বসিয়া ছিলেন, ভাসুরের পদশব্দ পাইয়া অপর দ্বার দিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। রামলোচন প্রবেশ করিয়া, টাকার থলি এবং আড়তের চাবির গুচ্ছ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "ওগো দেখ, একজন ভিকিরী সারাদিন কিছু খায় নি, তাকে সঙ্গে ক'রে এনেছি, তাকে দুটি ভাত দিতে হবে। আর কিছু জলখাবার—দুই এক টুকরো শসা কি পেঁপে, আর কিছু মিষ্টি যদি থাকে—বেজাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, বাইরের ঘরের বারান্দায় সে ব'সে আছে। আর দেখ, আমার একখানা ছেঁড়াখোঁড়া ধুতি যদি খুঁজে বের ক'রে দিতে পার ত ভাল হয়, সে কাপড় ছাড়বে।"

প্রস্তাবগুলি শুনিয়া তারাসুন্দরী সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। বলি-লেন, "ভিকিরী না কুটুম? এত খাতির যে?"

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, "বড় কুটুম—তোমার ভাই! ওগো ভিকিরী হ'লেও সে ছোটলোক নয়—কায়স্থ সন্তান। আমিও যা, সেও তাই, তবে অবস্থার গতিকে সে এখন ভিকিরী, আমি চেলের মহাজন।"

"ওঃ—আচ্ছা, তা দিচ্চি"—বলিয়া তারাসুন্দরী খোকাকে দুধ খাওয়ান শেষ করিতে মন দিলেন। রামলোচনও মুখ-হাত ধুইবার আয়োজন করিলেন।

জলযোগাদি শেষ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিলেন, হারা-ধনের আর সে চেহারা নাই। স্নানান্তে ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া, এখন তাহাকে ভদ্র-লোকের মত দেখাইতেছে। রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, চান করেছ যে দেখছি!"

হারাধন বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, নদীতে গিয়ে চান ক'রে এলাম।"

"খেলে-টেলে কিছু?"

"খেলাম বইকি। বড় গিন্নী খানিকটা ফুটি আর গুড় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে প্রাণটা শীতল হ'ল।"

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, "বড়গিন্নী কি মেজোগিন্নী, তা তুমি জানলে কি ক'রে? তুমি এরই মধ্যে আমার সাংসারিক খবর সব পেয়ে গেছ দেখছি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার বেজা চাকরকে জিজ্ঞেস ক'রে সব কথাই জেনে নিলাম।"

রামলোচন সেখানে বসিয়া হারাধনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর, প্রতিদিনই তিনি এই বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া আহারের পূর্ব্বে দুই এক ছিলিম "বড় তামাক" সেবন করিয়া ক্ষুধায় শাণ দিয়া লন—কেহ সাথী জুটিলে তাহার সঙ্গে বসিয়া—নচেৎ একাকী। বড় তামাকের প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই হারাধনের সহিত তাঁহার

হইয়া গিয়াছিল—এবার তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। নেশাটি ক্রমে জমিয়া উঠিতে লাগিল। তখন রামলোচন অত্যন্ত উদার হইয়া পড়িলেন। হারাধনের কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহার মনটি তৎপ্রতি অত্যন্ত স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, প্রস্তাব করিলেন, হারাধন যত-দিন ইচ্ছা এখানে অতিথিস্বরূপ অবস্থান করিতে পারে।

রাত্রি নয়টার সময় বেজা আসিয়া সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত। হারাধনকে লইয়া রাম-লোচন অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শয়নঘরের বারান্দাতেই আহারের স্থান হইয়াছিল। হারাধন বসিয়া মুক্ত দ্বারপথে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এই ঘরেই আপনার শয়ন হয় বুঝি?"

রামলোচন বলিলেন, "হ্যাঁ, এই ঘরখানিতে আমি শুই। এই পাশাপাশি ঘর দুখানি আমার দু'ভাইয়ের ছিল আর কি। ভাই ত আমার দাগা দিয়ে চ'লেই গেলেন!"—বলিয়া, গাঁজার প্রভাবে তাঁহার পুরাতন ভ্রাতৃশোক নূতন হইয়া উঠিল। ভাত খাইতে খাইতে, কোঁচার খুঁটে তিনি চক্ষু মুছিলেন।

"হ্যাঁ—সবই ত আমি শুনেছি।"—বলিয়া হারাধন ঊর্দ্ধমুখে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ছোট বধূ রাধারাণীই ভাত বাড়িয়া দিয়া গিয়াছিল। এই সময় সে ভাসুরের দুধের বাটি লইয়া আসিয়াছিল—ভাসুর ও আগন্তুকের এই কথোপকথন শুনিয়া, ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া আগন্তুকের পানে চাহিল। হারাধনের দৃষ্টিও ঠিক এই সময় অবগুণ্ঠনবতীর পানে ফিরিল। উভয়ে চোখোচোখি হইবামাত্র রাধারাণীর দৃষ্টি রোষ ও বিরক্তি জ্ঞাপন করিল। হারাধন তখনই মাথাটি নিচু করিয়া, সন্তপ্তস্বরে বলিল, "হরি হে, তোমারই ইচ্ছা!"

॥ চার ॥

রামলোচনের সুনজরে পড়িয়া গিয়া, হারাধন পরম আরামে তথায় অধিষ্ঠান করিল। প্রাতে উঠিয়াই বাবুর সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে যায়; স্নানান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাবুর সহিত আড়তে গিয়া বসে। রামলোচন দেখিলেন, হিসাব-পত্র লিখিতে সে সুদক্ষ; গত বৎসরের সালতামামি হিসাব এখনও করা হয় নাই—সেই হিসাব প্রস্তুত করিবার ভার তিনি হারাধনের প্রতি অর্পণ করিয়া, নিজে হুঁকা হাতে করিয়া মনের সুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দশ বার দিন কাটিলে, রামলোচনের স্ত্রী তারাসুন্দরী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছিল; সূতিকাগৃহ হইতেই নানা রোগে ভুগিয়া তাহারা জননীর কোল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। তাই রামলোচন এবার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। স্থানীয় হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবু ও পাসকরা ধাত্রী প্রতিদিন আসিয়া সকল বিষয় তদারক করিয়া, উপদেশ ও ঔষধের ব্যবস্থা প্রদান করিতে-ছেন। এই গোলমালে রামলোচন আর নিয়মিতভাবে দোকানে যাইতে পারেন না। মাঝে মাঝে দুই একঘণ্টা গিয়া গদীতে বসেন; তার পর হারাধনের প্রতি দোকানের ভার দিয়া চলিয়া আসেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিয়া ক্রয়বিক্রয়ের হিসাব পরীক্ষা করেন, তহবিল বুঝিয়া লন; গোপনে কর্ম্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও দেখিয়াছেন, হারাধনের হিসাবে কোথাও একটি পয়সার গরমিল পান নাই।

হারাধনের প্রতি বাবুর এই নির্ভর ও বিশ্বাস দেখিয়া, কর্ম্মচারীরা কিন্তু মনে মনে চটিতে লাগিল। চাল নাই চুলা নাই কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, তাহার প্রতি এতটা বিশ্বাস-স্থাপন করা যে বাবুর পক্ষে নিতান্তই মূঢ়তা হইতেছে, ইহাই তাহারা অন্তরালে

বলাবলি করিতে লাগিল। দোকানের গোমস্তা নরহরি সাহা এক দিন তাহার মনের এই সন্দেহের কথা বাবুকে বলিয়াছিল, কিন্তু বাবু তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। নরহরি ইহাতে ক্ষুন্ন হইয়া, সরকার ও ওজনদারের নিকট বলিয়াছিল, "ভালোর তরেই বলেছিলাম, কিন্তু বাবু শুনলেন না। শুনবেন কেন, কাঙালের কথা বাসি না হ'লে ত মিষ্টি লাগে না!"

অশৌচান্তে তারাসুন্দরী আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইয়া, নাইয়া ধুইয়া ঘরে উঠিলেন। এক দিন তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, তোমার গেলবছরের সালতামামি হিসেবটা হয়ে গেছে কি?"

"কেন?"

"ছোটবউ বলছিল, দিদি, বটঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কোরো, এ ক'বছরে কত টাকা মুনাফা হয়েছে আমার ভাগের অর্দ্ধেক টাকাটা যদি বটঠাকুর দেন ত তীর্থধর্ম্ম ক'রে আসি।"

শুনিয়া রামলোচন গুম্ হইয়া রহিলেন।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাবছ কি?"

রামলোচন বলিলেন, "আমি ভাবছি কি শুনবে? পদ্মলোচন, ত আজ পাঁচ বৎসর হ'ল গিয়েছে। কই, এত কাল ত ছোট বউমা এ কথা কোনও দিন উত্থাপন করেন নি। আজ হঠাৎ এ কথা কেন!"

বড়বউ বলিলেন, "কেউ বোধ হয় সলাপরামর্শ দিয়েছে, যে আড়তের অর্দ্ধেক মালিক ত তুই, তোর ভাসুরই বা সব একলা খায় কেন?"

"কে ওঁকে এ বুদ্ধি দিলে সন্ধান নিতে পার?"

"দেখব চেষ্টা ক'রে। আপাততঃ ওকে কি বলি, তা আমায় ব'লে দাও।"

"বোলো যে, হিসেবপত্র এখন তৈরী হয়নি--আর হিসেবের জন্যে আটকাচ্চেই বা কি? দু' একশো টাকা যদি ওঁর দরকার হয় ত চেয়ে নেন যেন।"

ছোটবউ কিন্তু দুই এক শত টাকার কথা কানে তুলিলেন না। বলিলেন, "না দিদি, দু' একশো টাকায় আমার কিছু হবে না। পাঁচ বছরে লাভে লোকসানে মিলিয়ে কিছু না হ'লে থাকে, তবু অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকাও লাভ হয়েছে—আমায় এখন আড়াই হাজার টাকা বটঠাকুর দিন, পরে হিসেবপত্র হ'লে, আমার পাওনার বাকী টাকা দিলেই চলবে।"

সংসারে এই লইয়া বড়ই একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে উভয় যা'য়ে বেশ সম্প্রীতি ছিল, তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিত, এখন উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। ইতিমধ্যে রামলোচন একজন বিশ্বস্ত লোকের কাছে খবর পাইলেন, হারাধন এক দিন স্থানীয় কোনও প্রসিদ্ধ উকীলের বাড়ীতে গিয়া বসিয়া ছিল।

॥ পাঁচ ॥

সে দিন সন্ধ্যায় বাসায় আসিয়া রামলোচন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বউমার সম্বন্ধে তোমার কোনও সন্দেহ হয় কি?"

তারাসুন্দরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"উকীল বাড়ী যায় কেন হারাধন?"

তারাসুন্দরী, স্বামীর প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি কথা! ছি ছি—এমন কি কখনও হ'তে পারে?"

রামলোচন বলিলেন, "হারাধনের কি এমন তালুক-মুলুক জোৎজমা আছে, যার জন্যে ওকে উকীল-বাড়ী যেতে হয়? আরও দেখ, এত দিন না তত দিন, হারাধন আসার পর থেকেই ছোট বউমা এই গণ্ডগোল সুরু করেছে। আর একটা কথা। আমার যেমন প্রীতি-

ছেন, গেল বছরের সালতামামী হিসেবটা আমি ঐ হেরোকেই তৈরী করবার ভার দিয়েছিলাম।"

"গেল বছর লাভ কি হয়েছে?"

"প্রায় হাজার টাকা। সেই ধরেই ছোট বউমা বোধ হয় হিসেব করেছেন, পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার টাকা। দেখ, আমি নিশ্চয় বলছি, হেরোর সঙ্গে ছোট বউমার কোনও যোগাযোগ আছে। বাড়ী থেকে হতভাগাকে তাড়িয়ে দিই, কি বল?"

"তা দাও! কিন্তু, আমার ত ও কথা বিশ্বাসই হয় না। ছি ছি, এ কি কখনও হতে পারে? চব্বিশ ঘণ্টা ত দুজনে একসঙ্গে রয়েছি, তার কথায় বার্ত্তায় চালচলনে কই, কোন দিন মনে ত কিছু সন্দেহ হয় না।"

এ কথা শুনিয়া রামলোচন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি যা-ই বল না কেন বড়বউ, ভিতরে কোনও গোলযোগ আছেই আছে। ছোটবউই বা লাভের অংশ দাবী করে কেন, আর হেরোই বা উকীল বাড়ী যায় কেন? ভারী ত আমাদের মাসীমার কুটুম, পরমুণ্ডে দুবেলা খাচ্চেন দাচ্চেন—দিই ওকে দূর ক'রে, কি বল?"

তারাসুন্দরী নীরবে কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "এখন হঠাৎ কিছু না ক'রে দিনকতক চোখ-কাণ খুলে থাকা যাক এস। যদি সে রকম কোনও বেচাল দেখতে পাই, তখন দুটোকেই ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলেই হবে।"

রামলোচন পত্নীর এ যুক্তিই উপস্থিত ক্ষেত্রে সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

॥ ছয় ॥

ছোটবউ ও হারাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে যে কোনও প্রকার সন্দেহের উদয় হইয়াছে, তাহা কর্ত্তা বা গিন্নী নিজ নিজ কথায় বা ব্যবহারে কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এক দিন বেলা দশটার সময়, রান্নাঘরের বারান্দায় বড়বউ ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন, ছোটবউ কুটনা কুটিতেছেন, এমন সময় "কি গো বড় গিন্নি, কেমন আছ গো?"—বলিয়া একজন বয়স্কা বিধবা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই স্ত্রীলোক দেশে ইঁহাদের বাড়ীর কাছেই বাস করে, ইঁহাদেরই প্রজা। তারাসুন্দরী বলিলেন, "দুলেবউ যে!—ভাল আছিস ত দুলেবউ?"

"হ্যাঁ, মা, তোমাদের ছিচরণ আশীর্ব্বাদে ভালই আছি।"—বলিয়া নিম্নে দাঁড়াইয়া বারান্দার প্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া সে উভয় বধূকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এই খোকাটি এবার বুঝি হয়েছে? তোমার খোকা হয়েছে, তা আমি দেশে থাকতেই শুনেছিলাম। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেঁচে থাকুক!"

বড়বউ বলিলেন, "ব'স্ দুলেবউ, ব'স্। এখানে কোথায় এসেছিলি? কবে এলি?"

"এই পরশু দিন এসেছি মা। আমার জামাই এখন এইখানেই চাকরী করে কিনা, সে এখন আদালতের পেয়াদা হয়েছে। তোমাদের আশীর্ব্বাদে বেশ দু'পয়সা ওজগারও করছে। আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছে, এইখানেই বাসা ভাড়া নিয়ে আছে। মেয়েকে অনেক দিন দেখিনি তাও বটে, তোমার খোকাটি হয়েছে শুনেছিলাম তাও বটে, তাই মনে করলাম যাই একবার দেখা-শুনো করে আসি।"

"তা বেশ করেছিস। তোর মেয়ে জামাই ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ মা, তারা ভাল আছে।"

দুলেবউ বসিয়া বসিয়া গ্রামের নানা সংবাদ বলিতে লাগিল। ঘণ্টাখানেক পরে বলিল, "আচ্ছা তা হলে এখন উঠি মা, বেলা হয়ে গেল। সকালেই দেশে যাব মনে করছি।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "উঠবি কেন দুলেবউ? এতদিন পরে এলি, এইখানেই দুটি খেয়ে যা। নাওয়া হয়েছে?"

"না মা, নাওয়া এখনও হয়নি। তা বেশ, দুটি পেসাদ দিও, খেয়েই যাব। তোমাদের খেয়েই ত মানুষ মা; আজ বলে নয় সাত পুরুষ। তা একটু তেল দাও, নদীতে যাই।"

দুলেবউ নদী হইতে স্নান করিয়া যখন ফিরিল, তখন প্রতিদিনের প্রথামত রামলোচন হারাধনকে লইয়া ভোজনে বসিয়াছেন। দুলেবউ গোয়ালঘরের ছায়ায় নারিকেলগাছের আড়ালে বসিয়া হারাধনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পুরুষদের আহার শেষ হইলে, দুলেবউকে ভাত দিয়া, বড়বউ ও ছোটবউ খাইতে বসিলেন। আহারান্তে ছোটবউ নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন। দুলেবউ পুকুরঘাটে গিয়া আঁচাইয়া আসিয়া নিজ আহারস্থান পরিষ্কার করিল। হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া, আল্‌গোছে গিন্নীর হাত হইতে একটি পাণ লইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "গিন্নিমা একটা কথা আছে, কিছু যদি মনে না কর ত বলি।"

তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা দুলেবউ?"

"ঐ যে মিন্সেটা বাবুর সঙ্গে ব'সে খেলে, ও কে? তোমাদের কেউ হয়?"

"না, আমাদের কেউ না, দোকানের মুহুরী।"

"কত দিন এসেছে?"

"এই মাসখানেক হবে। কেন দুলেবউ, এ কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?"

দুলেবউ এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "ও লোক ভাল নয় মা, ওকে তাড়িয়ে দাও। ছোট গিন্নী এখানে আসবার মাসখানেক আগে, ও মিনসে আমাদের গাঁয়ে গিয়েছিল। ও কে, কি বিত্তান্ত কেউ জানে না। যদি মিথ্যে বলি ত আমার জিভ্যে যেন খ'সে যায় মা—সন্ধ্যের পর তোমাদের বাড়ীর বাগানের ধারে, পুকুরঘাটের পথে—এই রকম সব জায়গায়, দু'তিন দিন ছোটবউয়ের সঙ্গে ফুসুর ফুসুর ক'রে কথা কইতে ওকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি কেন, আরও কত লোক দেখেছে। এ নিয়ে গাঁয়ে একটু কাণাকাণিও সুরু হয়েছিল। তার পর মিন্‌সে কোথায় চলে গেল, আর দেখতে পাইনি। আবার এখানে এসেও জুটেছে দেখছি। কার মনে কি আছে তা নারায়ণই জানেন, কিন্তু এসব কি ভাল মা? তোমরা ভদ্দরনোক, গাঁয়ের মাথা, ছি ছি, এ কি কাণ্ড!"—বলিয়া দুলেবউ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তারাসুন্দরী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, তবে ত স্বামী যাহা সন্দেহ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক, আমার বিশ্বাসই ত ভুল!

॥ সাত ॥

অপরাহ্ণকালে ছোটবউ বলিলেন, "দিদি, এখন তুমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছ, বট্‌ঠাকুর আমার টাকাগুলির ব্যবস্থা করে দিলেই আমি দেশে চলে যেতে পারি। আড়াই হাজার টাকা যদি এখন নাও হয়ে ওঠে, আপাততঃ দু'হাজার পেলেও আমার চলবে—পরে তখন হিসেবপত্র দেখে যা হয় তা দেবেন। আজকে বট্‌ঠাকুরকে তুমি বোলো মনে করে দিদি।"

বড়বউ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা তা বলবো।" মনে মনে বলিলেন, "তোমায় হাতেনাতে একবার ধরি দাঁড়াও, ধ'রে আচ্ছা করে ঝাঁটাপেটা করি, তার পর বোধ হয়, তুমি দেশে না গিয়ে কাশী কি বৃন্দাবন যেতেই চাইবে।"

রাত্রে আহারাদির পর নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া তারাসুন্দরী স্বামীকে বলিলেন, "ওগো,

তুমি যা সন্দেহ করেছিলে, তাই ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল।"—বলিয়া দুলেবউ কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদটি তিনি স্বামীর গোচর করিলেন। টাকার জন্য আজ আবার ছোটবউয়ের তাগাদার কথাও বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, "টাকাটা ফেলেই দাও। দিয়ে পাপ বিদেয় কর। নইলে এখানে বাসায় আমাদের চোখের সামনে কি কাণ্ড হতে কি কাণ্ড হবে, ভাবতেও আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।"

রামলোচন নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। কোনও মতামত ব্যক্ত না করিয়া অবশেষে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু নিদ্রা তাঁহার চক্ষুতে আসিল না। ঘণ্টাখানেক এ পাশ ও পাশ করিয়া তিনি উঠিলেন। নগ্নপদে বাহিরে গেলেন। উঠানে নামিয়া দ্বার খুলিয়া আস্তে আস্তে বৈঠকখানা ঘরের বারান্দার নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন। এ কয়দিন গভীর রাত্রে প্রায়ই তিনি এইরূপ "রোঁদে" বাহির হইতেছেন, দেখিতে আসেন, হারাধন নিজ স্থানে শয়ন করিয়া আছে কি না। অন্যান্য দিন বৈঠকখানা ঘর ভিতর হইতে বন্ধ দেখিতে পান: আজ দেখিলেন বাহিরে শিকল চড়ানো।

দেখিয়া, তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিল। বৈঠকখানার পাশ দিয়া, তিনি বাগানে প্রবেশ করিয়া নিজ শয়নকক্ষের পশ্চাতে গিয়া পোঁছিতেই দেখিতে পাইলেন, ছোটবউয়ের ঘরের পশ্চাতের জানালার কাছে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ভিতরের মানুষের সংগে চুপি চুপি কি কথা-বার্ত্তা কহিতেছে।

সাবধানে আর একটু অগ্রসর হইতেই দেখিয়া চিনিলেন, ও ব্যক্তি হারাধনই বটে। রাগে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। তিনি যেন পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বাঘের মত লম্ফ দিয়া গিয়া সজোরে লোকটার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "পাজি, নচ্ছার হারামজাদ! এই তোর কাজ? আয় শালা, তোকে আজ খুন করে এইখানেই পুঁতি।" —বলিয়া হারাধনকে পাড়িয়া ফেলিলেন। উভয়ে মহা ঝটাপটি আরম্ভ হইল।

ব্যাপার দেখিয়া ছোটবউ নক্ষত্রবেগে নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তারাসুন্দরীর শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বলিতে লাগিল—"দিদি দিদি, ওঠ। সর্ব্বনাশ হ'ল, বটঠাকুর খুন করছেন।"

"কি কি"—বলিয়া তারাসুন্দরী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ছোটবউ বলিল, "দিদি বারণ কর, বারণ কর। ও অন্য কেউ নয়—ও আমার দাদা—আমার সহোদর ভাই। আমি টাকা চাইনে দিদি—তোমার পায়ে পড়ি, আমার দাদাকে বাঁচাও।"

তারাসুন্দরী খোলা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার প্রায় নীচে বাগানে একটা প্রবল মারামারির শব্দ এবং স্বামীর কণ্ঠস্বরে "খুন করব তোকে" এই কথা কয়টি শুনিলেন। ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অ্যাঁ-অ্যাঁ করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

বড় বধূর অবস্থা দেখিয়া ছোটবউ নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদা, দাদা, পরিচয় দাও।"—কিন্তু এই সময় হারাধন উঠিয়া চোঁচাঁ দৌড় দিল, এবং রামলোচন তাহার পশ্চান্ধাবন করিলেন; সুতরাং ছোটবউয়ের কথাগুলি উভয়ের মধ্যে কাহারও কর্ণগোচর হইল না।

॥ আট ॥

হারাধনকে ধরিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে রামলোচন যখন ক্ষতবিক্ষতপদে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন, উভয় বধূই একত্র মেঝের উপর বসিয়া আছেন, তিনি প্রবেশমাত্র ছোটবউ উঠিয়া অপর দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

রামলোচন বলিয়া উঠিলেন, "হেরো শালাকে ত ধরতে পারলাম না, পালিয়ে গেল; এখন ডাক ঐ হারামজাদীকে। নাক কাণ কেটে ঝাঁটা মেরে ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও।"

বড়বউ বলিলেন, "চুপ চুপ। অমন কথা মুখে এনো না।"

রামলোচন স্ত্রীর কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? ও কথা বলছ কেন?"

বড়বউ বলিলেন, "ওগো মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। ঐ হারাধন আর কেউ নয়, ছোটবউয়ের দাদা।"

রামলোচন বলিয়া উঠিলেন, "সে কি?"

"ওর এক দাদা ছিল, সে পাবনার বাজারে এক রাত্রে একটা খারাপ স্ত্রীলোককে খুন ক'রে ফেরার হয়েছিল শোন নি? ওই সেই দাদা। হারাধন ত নয়, ওর আসল নাম হীরালাল।"

রামলোচন বলিলেন "বল কি? ও ছোটবউয়ের ভাই? তা সে হ'ল ফেরারী আসামী, এখানে কি করতে এসেছিল শুনি?"

"বোনের কাছ থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে।"

রামলোচন মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া, খাটের পায়ায় ঠেস্ দিয়া বলিলেন, "জল দাও।"

তারাসুন্দরী উঠিয়া এক গেলাস জল আনিয়া দিলেন। সমস্ত জলটুকু ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া ফেলিয়া গেলাস নামাইয়া রাখিয়া রামলোচন বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু —কথাটা কি সত্যি? না, নষ্ট স্ত্রীলোকের উপস্থিত বুদ্ধি?"

ইঁহারা জানিতেন না, ছোটবউ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। সে তখনই দুম দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া, নিজ কক্ষে গিয়া বাক্স খুলিয়া তাহা হইতে কতকগুলা কাগজ বাহির করিয়া লইল। বড়বউয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কোলের উপর কাগজগুলা ফেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বটঠাকুরকে এগুলি পড়ে দেখতে বল দিদি।"

লণ্ঠনের আলো বাড়াইয়া দিয়া রামলোচন কাগজগুলি পড়িতে লাগিলেন। এগুলি, এই বাসাতে থাকাকালীন "হারাধন" লিখিয়াছে। ভগিনীর নিকট টাকার তাগাদা, ভাসুরের নিকট পাঁচ বৎসরের মুনাফার অংশ হিসাবে অন্ততঃ ২৫০০ টাকা দাবী করার জন্য উপদেশ; উকীলের পরামর্শের কথা; অবশেষে একখানি পত্রে, অন্ততঃ পক্ষে আপাততঃ ২০০০ টাকার জন্য পীড়াপীড়ি। স্পষ্টই বুঝা গেল, "হারাধন" এই পত্রগুলি রাত্রে পশ্চাতের জানালা দিয়াই হউক, অথবা অপর কোনও সুযোগেই হউক, তাহার ভগিনীর হাতে দিয়াছিল।

পত্রগুলি পড়িয়া রামলোচন বলিয়া উঠিলেন—"জয় ভগবান! জাত কুল রক্ষে করলে বাবা!"—বলিয়া পত্রগুলির মর্ম্ম স্ত্রীকে জানাইলেন।

অতঃপর রামলোচন বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে ব্যবসায়ে তাহার লাভের অংশস্বরূপ ৩০ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

পোষ্ট মাষ্টার

খড়ে ছাওয়া গ্রাম্য পোষ্ট আফিসের ভিতরে, নড়বড়ে টেবিলের সামনে, হাত ভাঙ্গা চেয়ারের উপর, বেগুনে রঙের আলোয়ান গায়ে ঐ যে যুবকটি বসিয়া কাজ করিতেছে, ওই এখানকার পোষ্ট মাষ্টার বা ডাকবাবু বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিতেই, বাহিরে ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনা গেল; 'রাণার' ডাক লইয়া আসিয়াছে। 'রাণার' প্রবেশ করিয়া ডাকের ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল; বাবুকে প্রণাম করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। ডাকবাবু ব্যাগের শিলমোহর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। রাণার তখন 'তামুক' খাইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

আফিস গৃহ এখন জনশূন্য। পিয়নেরা রান্না খাওয়া সারিয়া লইতেছে—খানিক পরেই আসিয়া জুটিবে, এবং নিজ নিজ বীটের চিঠি, মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি প্রভৃতি বুঝিয়া লইবে। ব্যাগটি কাটিয়া বিমল উহা টেবিলেব উপর উবুড় করিয়া ধরিল। চিঠি-পত্র পার্শেল প্রভৃতির সঙ্গে, একটা প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের পাঁচ ছয়টা বিভিন্ন প্যাকেটও বাহির হইল। একটা প্যাকেট লইয়া বিমল তাহার দেরাজের মধ্যে রাখিল। (ইহা সে বাসায় লইয়া যাইবে এবং আহারাদির পর শয়ন করিয়া, খুলিয়া গল্প ও প্রেমের কবিতা-গুলির রসাস্বাদন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে।) তার পর চিঠির গাদা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে ৪।৫ খানি বাছিয়া লইয়া, দের'জের মধ্যে লুকাইল। এগুলি সমস্তই খামের চিঠি এবং পুরুষের হস্তাক্ষরে, স্ত্রীলোকের নামে ঠিকানা লেখা। এগুলিও সে বাসায় লইয়া গিয়া, জল দিয়া খুলিয়া পাঠ করিবে—শুধু প্রেমের গল্প কবিতা নয়, প্রেমের চিঠি পড়িতেও বিমল অত্যন্ত ভালবাসে। এটা সে একটা নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়াই মনে করে; কারণ, চিঠিগুলি সে নষ্ট করে না, আবার জুড়িয়া, পরদিন ছাপ মোহর লাগাইয়া, বিলির জন্য পিয়নদের দিয়া থাকে। ছয় মাসের অধিক কাল বিমল এখানে আসিয়াছে—প্রত্যহই এইরূপ চিঠি অপহরণ করে;—এটা তাহার একটা নেশার মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সাড়ে দশটা বাজিল; পিয়নেরা একে একে আসিয়া টেবিলের উভয় পার্শ্বে বসিয়া গেল। বিমল তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামের পত্রাদি বন্টন করিয়া দিতে লাগিল; এই অবসরে আমরা এই মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।

॥ দুই ॥

বিমলের নিবাস যশোর জেলার কোনও এক গণ্ডগ্রামে। তথায় একটি হাইস্কুল আছে —সেই স্কুলের উপরের ক্লাসগুলির প্রত্যেকটিতে দুই তিন বৎসর করিয়া কাটাইয়া বিমল যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার গোঁফদাড়ি বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং বয়স হইয়াছে ২২ বৎসর। গ্রামের লোকে সে সময় বলিয়াছিল "বিমল যে দিন পাস হবে, সেদিন পূবের সূয্যি পশ্চিম দিকে উঠবে।" এইরূপ মন্তব্যের যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। গ্রামের যত বকাটে ছোকরাই ছিল বিমলের বন্ধু; সখের থিয়েটার দলের সেই ছিল প্রধান পাণ্ডা, এবং গঞ্জিকা সেবন ত অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল, ইদানীং থিয়েটারের রিহার্সালে যে বোতলও গোপনে আমদানী হইত, তাহারও বিশ্বাস-জনক প্রমাণ আছে।

কিন্তু যে ঘটনা অভাবনীয়, তাহাই ঘটিয়া গেল; গেজেট বাহির হইলে দেখা গেল, বিমল তৃতীয় বিভাগে পাস হইয়াছে,—অথচ সূর্য্যদেব গ্রামের লোকের ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও খাতিরই করিলেন না।

বিমল ছোকরাটি দেখিতে বেশ সুপুরুষ, কিন্তু তাহার মন্দস্বভাব জন্য আজিও বিবাহ হয় নাই। সংসারে তাহার মা ও জেঠাইমা (উভয়েই বিধবা), একটি ছোট ভাই, একটি বিধবা ভগিনী এবং দুইটি জেঠতুতো ভাই বর্ত্তমান। বড়টি স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে সামান্য বেতনে সুমারনবীশের কর্ম্ম করে—ছোট ভাই দুটি স্কুলে পড়ে। বিমলেরও এখন অর্থোপার্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল—সামান্য যাহা জোৎজমা আছে তাহাতে সংসার চলে না। তাহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে, ২৪ পরগণার পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল: তাঁহারই সুপারিশে সে ডাক-বিভাগে কর্ম্ম পায়। আলিপুরের হেড আপিসে বৎসরখানেক শিক্ষানবিশী ও এক্‌টিনি করিয়া, আজ ছয় মাস হইল সে এই মহেশপুর ডাকঘরের সাব-পোষ্ট মাষ্টার হইয়া আসিয়াছে।

হেড আপিসে থাকিতে পাঁচজন উপরওয়ালার অধীনস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমলের মোটেই ভাল লাগিত না। এখানে আসিয়া সে স্বাধীন হইয়াছে। সরকারী বাসাটি ভাল, পিয়নেরা আজ্ঞাকারী, খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ, এমন কি পল্লীগ্রাম হইলেও এখানে "বিলাতী" পাওয়া যায়—তবে সোডা পাওয়া যায় না, জল মিশাইয়া খাইতে হয়, এই যা একটু অসুবিধা। সুতরাং মোটের উপর বিমল এখানে ভালই আছে বলিতে হইবে।

॥ তিন ॥

পিয়নগণ স্ব স্ব ব্যাগ ভরিয়া পত্রাদি লইয়া রওয়ানা হইয়া গেলে, বিমল অপহৃত মাসিকপত্রখানি ও চিঠিগুলি হাতে করিয়া আপিস ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাতে তালাবন্ধ করিল। বাসায় প্রবেশ করিয়া উঠান হইতে বলিল, "বামুন মা, রান্নার কত দূর ?"

একজন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ বিধবা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "রান্না আমার শেষ হয়েছে, তুমি চান ক'রে এস বাবা।" ইঁহার বাড়ী এই পাড়াতেই, বড় গরীব, মাত্র চারিটি টাকা বেতনে বিমলকে দুই বেলা রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যান।

বিমল নিজ ঘরে গিয়া, চিঠিগুলি ও মাসিকপত্রখানি বালিসের নীচে গুঁজিয়া, কোট প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া, একটা শিশি হইতে কিঞ্চিৎ তেল ঢালিয়া মাথায় দিয়া, সাবান গামছা ও বস্ত্র লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়খানি শুকাইতে দিয়া জামা পরিয়া, আর্সি চিরুণী ও বুরুষ লইয়া পরিপাটি রূপে নিজ কেশসংস্কার করিল। তারপর রান্নাঘরের বারান্দায় বিছানো আসনখানির উপর বসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

বিমলকে খাওয়াইয়া 'বামুন মা' যখন চলিয়া গেলেন তখন বেলা প্রায় ১২টা। বিমল পাণ চিবাইতে চিবাইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া, শয়নঘরে প্রবেশ করিল। এক গেলাস জল ও একখানি ছুরী লইয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) ছোট টেবিলখানির উপর রাখিয়া, বিছানায় বসিয়া, বালিসের তলা হইতে মাসিকপত্র ও চিঠিগুলি বাহির করিল। জলে আঙ্গুল ভিজাইয়া, প্রত্যেক চিঠির মুখে বেশ করিয়া বুলাইয়া সেগুলি সারবন্দি টেবিলের উপর রাখিয়া মাসিকপত্রখানির মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোনও চিঠির মুখের জল শুষ্ক হইয়াছে কি না। মাঝে মাঝে সেগুলির মুখ আবার ভিজাইয়া দিতে লাগিল। যখন বুঝিল এইবার সময় হইয়াছে, তখন মাসিকপত্রখানি রাখিয়া ছুরীর ফলা চিঠির মুখে ঢুকাইয়া উল্টাদিকের চাপ দিয়া একে একে চিঠিগুলি খুলিয়া ফেলিল।

প্রথম চিঠিখানি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সহিত একখানি দশ টাকার নোট। বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আজ বউনি হল মন্দ নয়!" নোটখানি বালিশের

তলায় গ‍ুঁজিয়া রাখিয়া চিঠির ভাঁজ খ‍ুলিল। প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন। বিমল সাগ্রহে চিঠিখানি পড়িতে লাগিল। কলিকাতা প্রবাসী বিরহী স্বামী স্বীয় বিরহ যন্ত্রণার অনেক বর্ণনা করিয়াছে; লিখিয়াছে বড়দিনের ছ‍ুটিতে বাড়ী আসিয়া তাঁহার হ‍ৃদয়েশ্বরীকে হ‍ৃদয়ে ধরিয়া সকল জ‍্বালা নিব্বাণ করিতে পারিবে—সে জন্য দিন-গণনা করিতেছে। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়া, খোকার দ‍ুধ খরচের জন্য ১০টি টাকা পাঠাইতেছে। এ ব্যক্তির আরও কয়েকখানি পত্র ইতিপ‍ূর্ব্বে বিমল পাঠ করিয়াছিল—সে জানিত, লোকটি কলিকাতায় চাকরির জন্য উমেদারী করিতেছিল।

এ পত্রখানি রাখিয়া, বিমল দ্বিতীয় পত্রখানি খ‍ুলিল। "প‍ূজনীয়া পিসিমা!" সম্বোধন দেখিয়া—"ধ‍ুত্তোর" বলিয়া সক্রোধে চিঠিখানি বিছানার উপর ফেলিয়া, তৃতীয় পত্রখানি উন্মোচন করিল।

এই লোকের চিঠিও মাঝে মাঝে বিমল পড়িয়াছে—তাহা হইতে ইহাদের প‍ূর্ব্বকথা কিছ‍ু কিছ‍ু সে অবগত ছিল। মেয়েটির নাম চার‍ুশীলা—সে বিধবা বোধ হয় বালবিধবা। এই মহেশপ‍ুর গ্রামের দক্ষিণে রস‍ুলপ‍ুরে তাহার বসতি—খ‍ুব সম্ভব ঐ স্থানে তাহার শ্বশ‍ুরালয়। তাহার পিত্রালয় কলিকাতায়;—কলিকাতা নিবাসী এই পত্রলেখকের সহিত তাহার প্রণয় সংঘটিত হয়। পত্রলেখককে পত্রশেষে কখনও নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না—সে সহি করে—"তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী", "তোমার ভালবাসা", —"তোমার সে"—এইর‍ূপ সব মাথাম‍ুণ্ড। বিগত ৩।৪ মাস হইতে ইহাদের এইর‍ূপ প্রেমপত্র চলিতেছে—তবে, মেয়েটির লেখা চিঠি বিমল কখনও দেখিবার স‍ুযোগ পায় নাই, —নাম না জানাতে, রওয়ানা চিঠিগ‍ুলির মধ্য হইতে সেখানি বাছিয়া বাহির করা শক্ত বলিয়াও বটে; এবং সময় পাওয়া যায় না বলিয়াও বটে,—কারণ ভিন্নগ্রামের ডাক বাক্স হইতে পিয়নেরা চিঠি ঝাড়িয়া আনিবার সময় ডাকঘরে অনেক লোকজন থাকে, ছাপ-মোহর দিয়া ব্যাগ ভর্ত্তি করিবার ধ‍ুম পড়িয়া যায়।

বিমল সাগ্রহে পত্রখানি পাঠ করিল। তাহাতে এইর‍ূপ লেখা ছিল—

কলিকাতা
২২শে অগ্রহায়ণ

আমার হ‍ৃদয়েশ্বরী,

গতকল্য তোমায় একখানি পত্র লিখিয়াছি—তাহা তুমি পাইয়া থাকিবে। তাহাতে লিখিয়াছিলাম, আমি আগামী শনিবার দিন গিয়া তোমায় লইয়া আসিব। কিন্তু শনিবারে যাওয়ার স‍ুবিধা করিতে পারিলাম না। পরদিন অর্থাৎ রবিবার দিন আমি নিশ্চয় যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তুমি প‍ূর্ব্ব পরামর্শ মত, রাত্রি ঠিক ১২টার সময় তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমে সেই শিবমন্দিরের সম্ম‍ুখে আসিয়া দাঁড়াইবে—আমি মন্দিরের পার্শ্বস্থ সেই বটব‍ৃক্ষের ছায়ায় ল‍ুকাইয়া থাকিব; এবং তুমি আসামাত্র তোমাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিব। যান বাহনাদির কির‍ূপ বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিব তাহা এখন বলিতে পারি না—হয়ত হাঁটিয়াই উভয়ে ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আইন অন‍ুসারে আমাদের বিবাহের সমস্ত আয়োজন আমি করিয়া রাখিয়াছি—প‍ুরোহিতও ঠিক হইয়াছে—সোমবার দিন আমি যথাশাস্ত্র তোমার পাণিগ্রহণ করিব। এ সম্বন্ধে আমি উকীল ব্যারিষ্টারগণের পরামর্শও লইয়াছি। তাঁহারা বলেন, যদি তোমার শ্বশ‍ুরকুলের কেহ, এই লইয়া আমার উপর মামলা মোকদ্দমা করিতে উদ্যত হয়, তবে তোমার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক হইয়াছে এবং স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসিয়াছিলে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই কেহ আর আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। সেইজন্য আমি জন্মম‍ৃত্যু রেজেষ্টারি আপিস হইতে তোমার জন্মদিনের সার্টিফিকেটের

সকল পর্য্যন্ত আদায় করিয়া আনিয়াছি। সুতরাং সকল দিকেই আটঘাট বাঁধা রহিল। রবিবার সন্ধ্যার ট্রেণে আমি রওয়ানা হইয়া ষ্টেশনে নামিয়া, রাত্রি দশটার মধ্যেই তোমাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিব। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, গৃহের বাহির হইও—আশা করি তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের মিলনের পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইবে।

অধিক আর কি লিখিব। আমার শূন্য গৃহে আসিয়া তুমি লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হও—আমার শূন্য হৃদয়ে বসিয়া আমায় চিরসুখী কর। ইতি

তোমার (মন) চোর।

এই পত্রখানি পড়িয়া বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল—কি চমৎকার! এ যে রীতিমত একটা নভেলী ব্যাপার! বাঃ—বাঃ—ক্যা মজাদার! ক্যা তোফা। বাহবা চারুশীলা—ব্রাভো! জিতা রহো বাবা—থ্রি চিয়ার্স ফর্ চারুশীলা। বেশ বেশ—বরের কাছে তুমি যাবে—মাইকেল ত বিধানই দিয়ে গেছে—"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে" —ব্রজাংগনা কাব্য দেখহ! গড ব্লেস্ দি হ্যাপি পেয়ার—তোমাদের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করবে না বাবা? নুচি খেয়ে আসতাম!

অতঃপর বিমল বাকী পত্র দুইখানি পড়িয়া দেখিল; এ দুইখানিই মামুলি স্বামীর মামুলি প্রেমের চিঠি—তাহাতে প্রেমের চেয়ে ঘরকন্নার কথাই বেশী—কোনও বিশেষত্ব নাই। বিমল এই ছয় মাসের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ সহস্রাধিক প্রেমপত্র পড়িয়াছে, সে জানে বৈধ প্রেমের চিঠি অপেক্ষা, অবৈধ প্রেমের চিঠিতেই 'মজা' বেশী থাকে; পত্রগুলি আবার জুড়িয়া রাখিয়া বিমল মাসিকপত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমে উহা তাহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল; সে তখন পাশ ফিরিয়া, পাশের বালিসে পা দিয়া আরামে ঘুমাইতে লাগিল।

॥ চার ॥

অপরাহ্নকালে বিভিন্ন গ্রাম হইতে পিয়নেরা ফিরিয়া আসিলে বিমল তাহাদের নিকট হইতে মনি অর্ডার রেজেষ্টারি প্রভৃতির রসিদ বুঝিয়া লইয়া, খাতাপত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। কার্য্যশেষ হইলে, ভৃত্যকে বলিল, "ওরে, যা দেখি, হরেন সার দোকান থেকে এক বোতল বিহাইব নিয়ে আয়। চাদরের ভেতর বেশ করে নুকিয়ে আনবি—বুঝেছিস? আর, করিমদ্দিকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাস।"—বলিয়া বিমল, সরকারী তহবিল হইতে ভৃত্যের হস্তে ছয়টি টাকা দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে পিয়ন করিমদ্দি সেখ আসিয়া বলিল, "হুজুর ডেকেছেন?"

বিমল বলিল, "হ্যাঁ। আজ একটা ফাউলের কারি বানিয়ে দিতে পারবে হে শেখের পো?"

করিম বলিল, "কেন পারবো না হুজুর?"

"আচ্ছা—এই টাকা নাও। বেশ মোটা তাজা দেখে একটা মুরগী কিনে এনো। বেশ করে' লঙ্কাবাটা দিও—আমরা বাঙ্গাল মানুষ, ঝালটা কিছু বেশী খাই।"—বলিয়া বিমল ক্যাশ হইতে তাহাকেও একটি টাকা দিল।

কাজকর্ম্ম শেষ হইলে, ক্যাশ হইতে আর তিনটি টাকা লইয়া, দ্বিপ্রহরে লব্ধ সেই দশ টাকার নোটখানি ক্যাশে রাখিয়া ক্যাশ পূরণ করিল। ক্যাশ মিলাইয়া তাহা লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, আপিস ঘরে চাবি দিয়া বিমল বাসায় গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বামুন মাকে দেখিয়া বলিল, "মা, আজ শরীরটে কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে,

আজ রাত্রে ভাতটা আর খাব না, খানকতক পরোটা ভেজে রেখে যেও। তরকারী ফরকারী বেশী কিছু দরকার নেই খানকতক আলুভাজা হলেই চলবে।"—বলিয়া সে মুখহাত ধুইতে চলিয়া গেল। (মাঝে মাঝে—বিশেষ. বেতন পাইবার পর দুই চারি দিন বিমলের এরূপ গা ম্যাজ ম্যাজ করিয়া থাকে—এবং রাত্রে ভাতের পরিবর্ত্তে লুচি বা পরোটা ফরমাস করে।) মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া বিমল এক পেয়ালা চা পান করিয়া, পাণ মুখে দিয়া ঘোষেদের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে গেল—প্রত্যহই এইরূপ যায়।

রাত্রি ৮টা বাজিতেই বামুন মা পরোটা ও আলুভাজা বিমলের শয়নঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিমল বাসায় আসিয়া রামচরণ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "করিমদ্দি এসেছিল?"

রামচরণ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ রেখে গেছে।"—বিমল দেখিল একটি এনামেলের বড় বাটীতে তাহার আকাঙ্ক্ষিত ফাউল কারি ঢাকা রহিয়াছে।

বিমল তখন ভৃত্যকে রাত্রের মত বিদায় দিয়া, সদর দরজা বন্ধ করিয়া, শয়নঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেওয়ালে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল—তাহার আলো বাড়াইয়া দিয়া যথাস্থান হইতে বোতল গ্লাস এবং 'কাক ইস্কুরু' বাহির করিয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) টেবিলের উপর রাখিল: জুতা মোজা ত্যাগ করিয়া, বিছানার ধারে বসিয়া বোতলটি খুলিয়া ফেলিল।

এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালাটি পাড়িয়া তাহাতে ছড়ি দিতে লাগিল। একটা গৎ বাজাইয়া আর এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালা যথাস্থানে রাখিয়া ভাবিল, সেই মজার চিঠিখানা আর একবার পড়িতে হইবে। দেওয়াল আলমারি খুলিয়া, চিঠিগুলি বাহির করিয়া, চারুশীলার খানি বাছিয়া লইয়া বলিল—"এঃ জুড়ে ফেলেছি যে দেখছি। কুছ পরোয়া নেই—ফের খুলবো!"—বলিয়া টলিতে টলিতে বিছানায় আসিয়া বসিল। চিঠিখানিকে সমনে ধরিয়া বলিল, "কি চাঁদ, জল খাবে? না ব্র্যাণ্ডি?"—বলিয়া গেলাসে খানিক ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া, আঙুলে একটু লইয়া চিঠির মুখ ভিজাইয়া বলিল. "যা বেটা, তোর চিঠিজন্ম সার্থক হয়ে গেল।" পরে ব্র্যাণ্ডিটুকু পান করিতে করিতে, চিঠিখানি খুলিতে চেষ্টা করিতেই উহার মুখ ছিঁড়িয়া গেল। চিঠিখানি ঊর্দ্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঁড়ে গেলি? কাল বিলি হবি কি করে রে শালা?"—বলিয়া খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া, খামখানা ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া বলিল "জাহন্নামে যাও!" চিঠি খুলিয়া পড়িল —"আমার হৃদয়েশ্বরী!" চিঠি রাখিয়া নিজ বক্ষে হাত দিয়া, চক্ষু মুদিয়া অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল—"হৃদয়েশ্বরী!—হৃদয় জ্বলে গেল.—পুড়ে গেল,—খাক্ হয়ে গেল! আর একটু খাই"—বলিয়া চক্ষু খুলিয়া, গেলাসের বাকীটুকু পান করিয়া, পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জিহ্বা তখন তাহার জড়াইয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, নেশা হইলে. সে আর 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না—'স' স্থানে 'ছ' বলিত। একটি একটি কথায় জোর দিয়া পড়িতে লাগিল—

"কিন্তু—ছনিবারে,—যাওয়ার ছুবিধা করিতে—পারিলাম না। পরদিন—পরদিন—অর্থাৎ রবিবারে—আমি নিচ্চয় যাইব তাহাতে কোন ছন্দেহ নাই। তুমি—পুর্ব্ব পরামর্ছ মত—রাত্রি ঠিক ১২টার ছময়—তোমাদের বাড়ীর পাচ্চিমে ছেই ছিবমন্দিরের ছম্মুখে আছিয়া দাঁড়াইবে।"

চিঠি রাখিয়া, আর কিঞ্চিৎ পান করিয়া, গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল। অর্দ্ধমুদিত নেত্রে, মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল—"এ চিঠি ত তুমি পাবে না মণি! খামখানাই যে ছিঁড়ে ফেলেছি। আগেকার চিঠি মত—তুমি ছনিবারে রাত বারটায় এছে ছিবমন্দিরের কাছে দাঁড়াবে ত? তার আছাপথ চেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—অবছেছে ক্লান্ত হয়ে

বছে পড়বে—বছে বছে ক্রমে ছুয়ে পড়বে। কিন্তু ছে ত হায় আছবে না। অল্‌রাইট—আমি যাব আমি গিয়ে তোমায় বলবো—

উঠ উঠ হে ছুন্দরী,
তব পদছু পচ্ছ যোগ্য নহে এ ধরণী!
তুমি কেন ধুলায় পতিত?

তুমি চল—আমার ছঙ্গে চল। চল ছখি, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হবে। হৃদয়ের ছরী—না ছুরি? হৃদয়ের ছুরি হোয়ো না দোহাই বাবা ছাতদোহাই তোমার!”—বলিয়া চক্ষু খুলিয়া, আপন রসিকতায় মুগ্ধ হইয় বিমল একটু হাসিল। গ্লাসের বাকীটুকু পান করিয়া ফেলিয়া, আবার চিঠিখানি লইয়া পড়িতে বসিল। পড়িল—

“আমার ছুন্য গৃহে আছিয়া, তুমি লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হও। আমার ছুন্য হৃদয়ে বাছিয়া আমায় চিরছুখী কর। ভগবানের নাম ছরণ করিয়া গৃহের বাহির হইও—আছা করি তাঁহার আছীর্ব্বাদে আমাদের মিলনের পথ হইতে ছকল বাধাবিঘ্ন অপছারিত হইবে।”

চিঠি রাখিয়া বিমল বলিতে লাগিল—“উত্তম কথা!—কিন্তু দাদা, তোমারই হৃদয় কি ছুন্য? আমারও যে তাই ভাই। আমার ছব ছুন্য ছব ছুন্য। আমার হৃদয় ছুন্য—প্রেম নেই; গৃহ ছুন্য—ইছ্‌তিরী নেই—বাক্‌ছো ছুন্য, টাকা নেই! আমার ছব ছুন্য—মহাব্যোম—ব্যোম ভোলানাথ—ছনিবার রাত বারটায় আমি যাব—তোমার মন্দিরের কাছে বটগাছেব নীচে আমি লুকিয়ে থাকবো—চারুছীলাকে নিয়ে এছে, আমার ছুন্য গৃহ ছুন্য হৃদয় পূর্ণ করবো। তুমি হচ্ছ বিঘ্ন বিনাছনের বাপ—তাকে ছাবধান করে দিও—যদি কোনও বাধা বিঘ্ন ঘটে—তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্তুরকে এর জন্যে রেছ্‌পানছিবিল হতে হবে—এই ছাপ্‌ কথা আমি বলে রাখলাম।”—বলিযা বিমল বীররসের সহিত বিছানায় এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, চক্ষু খুলিল। আর খানিকটা সুরা ঢালিয়া, জল মিশাইয়া পান করিয়া হাত নাড়িয়া বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিল, “লেডিজ এন্ড জেনেলমেন, তোমরা ভাবছো—মাতালছ্য নানা-ভঙ্গি—এখন এ বেটা মদের খেয়ালে এই ছব বলছে—কাল এছব কিছুই মনে থাকবে না। তা নয় তা নয়—হাম যায়েঙ্গা।—অলবৎ যায়েঙ্গা।—ঢেকে যায়েঙ্গা—আমায় চিনতে পারবে না। তার পর এই বাছায় এনে তাকে বন্দিনী। আদরে যত্নে মিছ্‌টি কথায় তিরিলোককে বছীভূত করতে কতক্ষণ?—আর আমার এ চেহারাটাও কি কোনও কাজে লাগবে না?—এখন একটু ছোয়া যাক্‌।”—বলিয়া মাতাল বিছানায় দেহ লুটাইয়া দিয়া, নিদ্রাঘোরে অচেতন হইয় পড়িল। কোথায বহিল তার পরোটা—আর কোথায় রহিল তার সাধের ফাউলকারি!

॥ পাঁচ ॥

খামের উপর শ্রীমতী চারুশীলা দাসী ঠিকানা লেখা থাকিলেও, এবং রসুলপুর গ্রামে যথার্থই একজন চারুশীলা দাসী থাকিলেও, পত্রখানি তাহার জন্য উদ্দিষ্ট নহে। তাহার নামেই পত্র আসে বটে, কিন্তু পত্র না খুলিয়াই, চারুশীলা সেখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া পাশের বাড়ীতে তাহার প্রিয়সখী বনলতাকে দিয়া আসে। ইহাই গোপন বন্দোবস্ত। সব কথা তবে খুলিয়াই বলি।

বনলতা, বনে জন্মগ্রহণ করে নাই—খাস কলিকাতা সহরে তাহার মাতুলালয়ে জন্মিয়াছিল। বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া বনলতা মামার বাড়ীতেই মানুষ হইতে থাকে। মামা বড়লোক ছিলেন, নিজের মেয়েদের সঙ্গে বনলতাকেও ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বজাতীয় একটি যুবক কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িত—তাহার সহিত বনলতার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু মাস কয়েক পরেই সেই হতভাগ্য যুবক কালকবলিত হয়। বনলতার মামা, অভাগিনী ভাগিনেয়ীকে আরও লেখাপড়া শিখাইতে

লাগিলেন। গত বৎসর উইল করিয়া তাহাকে বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া, ইহধাম হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

যে লোকটি "তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী" "তোমার মনচোর" ইত্যাদি বলিয়া চিঠি সহি করে, তাহার নাম নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ইঁহাদেরই জ্ঞাতি। সে লোকটি সুশিক্ষিত এবং উদার-মতাবলম্বী। ব্রহ্মদেশে সেগুন কাঠের তাহার বিস্তৃত কারবার আছে—কলিকাতায় তাহার ব্র্যাঞ্চ আছে। বনলতার মামার শ্রাদ্ধ উপলক্ষেই বর্ম্মা হইতে নরেন কলিকাতায় আসে এবং বিধবা বনলতার সহিত পরিচিত হয়। তাহাদের বাড়ী ভিন্ন হইলেও, প্রত্যহই এ বাড়ীতে সে আসিতে লাগিল এবং এসব ক্ষেত্রে যাহা হয়—প্রথমে আঁখি মজিল, তারপর মন মজিল। ব্যাপার অবগত হওয়া বনলতার মামাতো ভাইয়েরা, নরেনের সহিত তাহার বিধবা-বিবাহ দিতেও কৃতসংকল্প হইলেন।

এই খবর কাকমুখে রসুলপুর গ্রামেও আসিয়া পেঁাছিল। উইলের সংবাদও পূর্ব্বে পেঁাছিয়াছিল। বনলতার শ্বশুর কলিকাতায় গিয়া, বনলতার মামাতো ভাইদের উপর উকিলের চিঠি দিয়া, মহা হাংগামা করিয়া, বিধবা পুত্রবধূকে "উদ্ধার" করিয়া আনেন।

রসুলপুরে আসিয়া বনলতা প্রথমে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। মাসখানেক পরে পাশের বাড়ীর সমবয়সী চারুশীলার সহিত তাহার সখিত্ব জন্মে। চারু তার স্বামীর অভিমতে, বনলতার সহিত তাহার হস্তাকাঙ্ক্ষীর পত্রবিনিময়ে এইভাবে সহায়তা করিতে সম্মত হয়।

অপহৃত পত্রখানিতে লেখা ছিল, "গতকল্য তোমায় পত্র লিখিয়াছি যে, শনিবার রাত্রে গিয়া তোমায় লইয়া আসিব।" সে পত্রখানি যথাসময়ে চারুর হস্তগত হয়, এবং যথানিয়মে বনলতাকে সেখানি সে দিয়াও আসে। অন্যান্য পত্র, বনলতা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত। কিন্তু এ পত্রখানিতে সময় তারিখ ইত্যাদি লেখা ছিল বলিয়া, বাক্সে লুকাইয়া রাখে। বনলতার শ্বাশুড়ী তাহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। তাহার অনুপ-স্থিতিতে মাঝে মাঝে তিনি তাহার বাক্স পেটরা গোপনে খানাতল্লাসীও করিয়াছেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত "দোষজনক" কিছুই পান নাই। এই পত্রখানি পেঁাছিবার পর দিন, দ্বিপ্রহরে বনলতা চারুশীলাদের বাড়ী গিয়াছিল—সেই সুযোগে তাহার শ্বাশুড়ী অন্য চাবি দিয়া তাহার বাক্স খুলিয়া, পত্রখানি পাঠ করেন এবং স্বামীকে দেখান। স্বামী বলেন, "আচ্ছা, আসুক না পাজি, তাকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া যাবে।"

শনিবার দিন বনলতার শ্বশুর তাঁহার দুইজন বন্ধুকে রাত্রে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। শ্বাশুড়ী, নানা অছিলায়, রান্নাবান্নায় বিলম্ব করিলেন। অতিথিদ্বয়ের আহার যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন ১১টা।

অন্য দিন রাত্রি ১০টা না বাজিতেই বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়ে। আজ বনলতা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিন্তু বাড়ীর সকলে জাগিয়া; শ্বাশুড়ী-ননদেরা তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন। ওদিকে বৈঠকখানা হইতে ১২টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বনলতার শ্বশুর, তাঁহার বন্ধুদ্বয় সহ, লাঠি ও দাড়ি সংগে লইয়া, শিব-মন্দিরের পশ্চাতে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই, ওভারকোট গায়ে, মাথায় মুখে কম্ফাটার জড়ানো, বিমল ধীরে ধীরে আসিয়া বৃাবৃক্ষের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াইল। ক্ষণপরেই তিনজন লোক আসিয়া তাহার মাথায়, পার্শ্বে, বুকে, পদদ্বয়ে লাঠি, কিল, চড়, ঘুসি ও লাথি মারিতে মারিতে তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল। প্রহারের চোটে তৎপূর্ব্বেই বিমল সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল।

লোক তিনজন তখন, অচেতন বিমলের হস্তপদ উত্তমরূপে রজ্জুবদ্ধ করিল। এক ব্যক্তি কহিল, "বেটা বেঁচে আছে ত? না মরেছে?"

অপর ব্যক্তি তাহার নাকের কাছে হাত দিয়া বলিল, "না—নিঃশ্বাস বেশ পড়ছে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "এখন, একে কি করা যায় বল দেখি? এইখানেই কি পড়ে থাকবে?"

"না না—আমাদের বাড়ীর কাছে কেন? শেষকালে কি কোনও পুলিস হাঙ্গামায় পড়বো?"

"তবে চল বেটাকে নিয়ে খানিক দূরে কোথাও ফেলে রেখে আসা যাক।"

"দেশলাইটে জ্বাল ত, লোকটা কে, দেখি।"

এক ব্যক্তি দেশলাই জ্বালিল। তিনজনেই তখন বলিয়া উঠিল, "এ কি! এ যে মহেশপুরের পোষ্ট মাষ্টার!"

দেশলাই পুড়িয়া গেল। আবার যেমন অন্ধকার তেমনই অন্ধকার।

তখন তিনজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। "এ বেটাই বা এখানে এল কেন? যে বেটার আসবার কথা সেই বা এল না কেন?"

"সে যা হোক তা হোক—এখন চল একে মহেশপুরে পোষ্ট আপিসের বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে আসা যাক।"

তিনজনে তখন বিমলেব অচেতন দেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল। পল্লীগ্রামের পথ—রাত্রি দ্বিপ্রহর—রাস্তায় আলো নাই—জনমানবের সঞ্চার নাই।

॥ ছয় ॥

শীতে, খোলা বারান্দায় পড়িয়া থাকিয়া, ঘণ্টা দুই পরেই বিমলের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে সেই আবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া, নানারূপ উপায় ফন্দি চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্রমে ভোর হইল। একজন পিয়নকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া, বিমল ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে ডাকিল।

পিয়ন আসিয়া বলিল, "বাবু, ব্যাপার কি?"

বিমল চিঁচিঁ করিয়া বলিল, "ডাকাতি রে, ডাকাতি! আগে আমার প্রাণটা বাঁচা।"

সে ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া অন্যান্য পিয়নকে ডাকিয়া আনিল। সকলে মিলিয়া বিমলের বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিল।

বিমল বলিল, "আমার বুকপকেট থেকে চাবি নে। ডাকঘর খোল্, খুলে, মেঝের উপব আমায় শুইয়ে দিয়ে থানায় খবর দিগে যা।"

পিযনেবা তাহাই করিল। বিমল কাৎরাইতে কাৎরাইত বলিল, "সব পিয়ন যা। দারোগা প্রথমে তোদেরই জবানবন্দি নেবে কিনা!"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলবো হুজুর?"

"যা জানিস—যা দেখেছিস—সবই বলবি।"

পিয়নগণ যখন চলিয়া গেল তখন বেশ ফর্সা হইয়াছে। বিমল টলিতে টলিতে উঠিয়া, সরকারী লোহার সিন্দুক খুলিল। তাহার মধ্যে নোটে টাকায় ৫৪২, ছিল—সেগুলি সমস্ত বাহিব করিয়া রুমালে বাঁধিয়া, বাসায় গিয়া নিজ ট্রাঙ্কে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়া, ডাকঘরের মেঝেতে পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিল।

॥ সাত ॥

দুইদিন পরে, কলিকাতার কাগজে কাগজে ছাপা হইল—

ভীষণ ডাকাতী

পোষ্ট আফিস লুট!

বিগত শনিবার রাত্রে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামের পোষ্ট আফিসে একটি ভয়ানক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাত্রি ১১টার সময় ডাকঘরে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছিলেন, পিয়নেরা তৎপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে আর কেহ ছিল না। ৫।৬ জন যুবক হঠাৎ ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রিভলবার বাহির করিয়া বলে—"খবর্দ্দার চীৎকার করিও না, গুলি করিব। লোহার সিন্দুকের চাবি দাও।" ইহাতে পোষ্ট মাষ্টার বলেন, "তা কখনই দিব না—প্রাণ দিব তবু সরকারের টাকা দিব না।" একজন যুবক তৎক্ষণাৎ পিস্তলের বাঁট দিয়া বিমলবাবুর মস্তকে সজোরে প্রহার করে। অপর যুবকগণ তাঁহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া, তাঁহার বুকে বসিয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া মুখ বাঁধিযা ফেলে। তারপর হস্তপদাদি রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া চাবি খুঁজিতে থাকে। চাবি পাইয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া পূর্ব্বদিনের ক্যাশ ৫৪২, লইয়া. সিন্দুক বন্ধ করণান্তর পোষ্ট মাষ্টারকে বাহিরের বারান্দায় আনিয়া শোয়াইয়া দেয়। অফিস ঘরে তালাবন্ধ করিয়া, চাবির গোছা পোষ্ট মাষ্টারের পকেটেই ভরিয়া দিয়া তাহারা পলায়ন করে। প্রকাশ, ডাকাতগণের মুখে কালো মুখস, গায়ে কালো কোট, পায়ে বুটজুতা ছিল, এবং তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতেছিল। এই ডাকাতি সম্পর্কে গতকল্য কলিকাতার কয়েকটি ছাত্রাবাসে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে এবং পুলিস, তিনজন যুবককে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতেরা কেহই ধরা পড়ে নাই। বিমল আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া সরকারের টাকা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই বিশ্বাসে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

রবিবার রাত্রে নবেন যথাস্থানে আসিয়া, বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। বনলতা পত্রে এখানকার সমস্ত ঘটনা জানাইয়াছিল। মাসখানেক পরে, একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে, বনলতা পলায়ন করিয়া পদব্রজে রেলের ষ্টেশনে গিয়া নরেনের সঙ্গে মিলিত হয় এবং উভয়ে কলিকাতায় চলিয়া যায়। তার শ্বশুর কলিকাতায় গিয়া থানায় এবং উকিল বাড়ীতে অনেক ছুটাছুটি করিযাছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। নরেনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

যুবকের প্রেম

বিবাহের পর তিনটি বৎসরও ঘুরিল না—মহেন্দ্র বিপত্নীক হইল।

মাত্র দুই বৎসর নয় মাস পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটির নাম ছিল চঞ্চলা। হিন্দুর মেয়ের চঞ্চলা নাম রাখা ভাল হয় নাই, কারণ. বধূ হইয়া তাহাকে পতিকুলে ধ্রুব-তারার মত স্থির থাকিতে হইবে। ছেলেবেলায় সে বড় দুষ্ট ছিল বলিয়াই মা-বাপ তাহার চঞ্চলা নাম রাখিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা কি জানিতেন, তাহার জীবন-কুসুমটি ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতেই, চপলা চঞ্চলার মতই সে আকাশের গায়ে লুকাইবে?

মহেন্দ্র তাহাদের জিলায় অবস্থিত মিশনরী কলেজ হইতে দুইবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। পড়াশুনায় মন তাহার কোন কালেই ছিল না। তাহার মন ছিল খেলায়—তাস পাশা খেলায় নয়—ক্রিকেট, ফুটবল, কুস্তী, জিম্‌ন্যাষ্টিক ইত্যাদিতে। কলেজের ফুটবল টীমের সেই ছিল কাপ্তেন, জিম্‌ন্যাষ্টিকের আখড়ায় সেই

ছিল মাস্টার। দেহে তাহার বিলক্ষণ বলও জন্মিয়াছিল।

পাস করিতে না পারিলেও, আর একটা জিনিস সে বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল—ইংরাজী ভাষা এবং আদবকায়দা। মিশনরী সাহেবগণের সহিত সর্ব্বদা মিশিবার ইহা ফল। খেলায় তাহার নিপুণতা ও দেহবলের জন্য সাহেবেরা তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন।

মহেন্দ্র বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র—পিতার মৃত্যুর পর সে-ই বাড়ীর কর্ত্তা হইয়াছিল। সংসারটি নিতান্ত ছোট ছিল না, সামান্য কিছু জমীজিমাৎ ছিল, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিত। সকলেই আশা করিয়াছিল, মহেন্দ্র মানুষ হইয়া উপার্জ্জন করিতে শিখিলে সংসারেব কষ্ট ঘুচিবে। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াও মহেন্দ্র মানুষ হইবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না। তখন পাড়ার প্রবীণাগণ তাহার মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন—"ছেলের বিয়ে দাও; তা হ'লেই সংসারের দিকে টান হবে, টাকা রোজগারের চেষ্টা করবে।'—তাই, একুশ বৎসর বযসে মা তাহার বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিয়াছিলেন,—চঞ্চলার বয়স তখন এগারো। বৎসরখানেক হইল, চঞ্চলা "ঘরবসত" করিতে আসিয়াছিল। প্রবীণাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া মহেন্দ্র ঘরেই বসিয়া রহিল, উপার্জ্জনের কোনও চেষ্টা দেখিল না। শেষের এক বৎসব সে ত বউ লইয়াই মাতিয়া ছিল। সেই বউ, কাল বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মহেন্দ্রকে ফাঁকি দিযা চলিয়া গেলে, সেই শোকে মহেন্দ্র কিছুদিন যেন পাগলের মত হইযা গিযাছিল। সারা সকালবেলাটা মাথাটি নীচু করিয়া, উঠানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারী করিয়া বেড়ায়, সাত ডাকেও কেহ তাহার উত্তর পায় না। শ্রান্ত হইলে, তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। "রান্না হয়ে গেছে, স্নান ক'রে এস"—বলিলে সে কথা কাণেই তোলে না। অবশেষে বিস্তর তাগিদে স্নান কবিযা আসিয়া খাইতে বসে, কিন্তু পাতে অর্দ্ধেক ভাত তরকারী ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যায়। বিকালে জিমন্যাষ্টিক বা ফুটবলের আড্ডা হইতে কেহ ডাকিতে আসিলে, তাহাকে ফিরাইয়া দেয়—যায় না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া বহুক্ষণ ঘুমায় না—এপাশ ওপাশ করে, মাঝে মাঝে কাঁদে। ইহা দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা গোপনে বলাবলি করে—"আহা বড্ড দুজনে ভাব হয়েছিল কিনা।"—আর, আঁচলে আপন আপন চক্ষু মুছে।

পাড়ার প্রবীণারা মহেন্দ্রের মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, "শীগ্‌গির একটি ভাল মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দাও—তা হ'লেই মন আবার ভাল হবে।" মা বলিতে লাগিলেন, "না দিদি, এখন আমি ওকে ও কথা বলতে পারব না। বড্ড শোকটা পেয়েছে—আর কিছু-দিন যাক—একটু সামলে উঠুক আগে।"

॥ দুই ॥

ছয় মাস কাটিয়াছে। এখন মহেন্দ্র অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছে। আহারে আবার রুচি জন্মিয়াছে। কেহ হাসির কথা বলিলে, এখন সে পূর্ব্বের মতই হাসিয়া উঠে। পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামের সঙ্গে ফুটবলের ম্যাচ খেলিতে যায়। পূর্ব্বের মত সবই করে, কিন্তু কিছু-তেই জীবনের সে স্বাদটুকু আর পায় না।

অবসর বুঝিয়া এক দিন মা তাহার নিকট পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মহেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল—"না মা, ও কায আর করছিনে।"

মা বলিলেন, "পাগল ছেলে! এখন তোর বয়স কি? তোর বয়সের কত ছেলের প্রথম বিয়েই হয় না যে! তোর দ্বিগুণ বয়সের কত লোক, পরিবার মরবার পর দু'মাস যেতে না যেতেই আবার বিয়ে করেছে—তুই করবিনে কেন? ঐ ওপাড়ার চাটুয্যেদের মেঝকর্ত্তা—"

মহেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "যার যা প্রবৃত্তি হয়, সে তা করুক মা, আমার দ্বারা কিন্তু ও কাযটি হবে না।"

সে দিন এই পর্য্যন্ত। তাহার পর কোনও দিন মা, কোনও দিন মাসী, কোনও দিন পিসী, কোনও দিন খুড়ি-জ্যেঠী-ঠানদিদিরা এ বিষয়ে মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে মহেন্দ্র উত্যক্ত হইয়া স্থানত্যাগ করাই স্থির করিল। একদিন মাকে বলিল, "মা, আমি ভেবে দেখলাম, এ রকম ভাবে ঘরে ব'সে থাকাটা ঠিক নয়। একটা কায-কর্ম্মের উপায় না হ'লে সংসারই বা চলবে কি ক'রে? তাই মনে করছি, তুমি যদি মত কর তবে কলকাতায় গিয়ে একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখি।"

এতদিনে ছেলের সুবুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাই ত করা উচিত বাবা! লেখাপড়া শিখেছ, একটা চেষ্টা করলে অবশ্যই একটা ভাল কায-কর্ম্ম জোটাতে পারবে। তা কলকাতায় যাও—এস গিয়ে—তাতে আমার কোনও অমত নেই।"—মনে ভাবিলেন, কায-কর্ম্ম করিতে করিতেই ছেলের মন ভাল হইবে,—আবার বিবাহ করিতে রাজী হইবে,—সংসারটা বজায় থাকিবে।

সেই গ্রামের একজন কায়স্থ কলিকাতায় লোহার ব্যবসায় করিয়া থাকেন। বড় কারবার। তিনি বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া মহেন্দ্র গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। তিনি শুনিযা রাজী হইলেন; বলিলেন, "বেশ ত! আমার সঙ্গেই তুমি চল বাবাজী। আমার গদীতে থাকবে—খাবে দাবে—আর কায-কর্ম্মের চেষ্টা ক'রে বেড়াবে। আমার আড়তেও অনেক লোক প্রতিপালিত হচ্ছে—কিন্তু তুমি ভাল লেখাপড়া শিখেছ, সে রকম সামান্য চাকরী ত তোমার উপযুক্ত হবে না, ভবিষ্যতেও তেমন কোনও উন্নতি নেই। কোনও একটা ভাল আপিস-টাপিসে ঢোকবার চেষ্টাই দেখতে হবে তোমায়। কারবারসূত্রে দু'চার জন বড়লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় আছে, আমিও তোমার জন্যে চেষ্টা দেখবো।"

যথাদিনে মহেন্দ্র আম্রশাখাযুক্ত ঘট প্রণাম করিয়া, জননী প্রভৃতির পদধূলি লইল। মা, তাহার কপালে দধির ফোঁটা দিয়া, "চিরজীবী হও—রাজ-রাজেশ্বর হও"—বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটি ব্যাগে নিজ সামান্য বস্ত্রাদি, মৃতা পত্নীলিখিত খানকতক পুরাতন চিঠি এবং মাতৃদত্ত দশটি মাত্র টাকা লইয়া, মহেন্দ্র কলিকাতা যাত্রা করিল।

॥ তিন ॥

মহেন্দ্র মফঃস্বলে প্রতিপালিত হইলেও, সে নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে নহে—কলিকাতা তাহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না, পিতার জীবনকালে তাঁহার সহিত কযেকবার সে কলিকাতায় আসিয়া এক মাস দেড় মাস করিয়া থাকিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় পেঁছিবার দুই দিন পরে সেই কায়স্থ বাবুটি মহেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন এবং কয়েক জন বড়লোকের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "চেষ্টা করা যাবে। মাঝে মাঝে এসে খবর নিও।"

মহেন্দ্র দুই চারি দিন অন্তর তাঁহাদের বৈঠকখানায় গিয়া ধর্ণা দিতে লাগিল; সব দিন যে কর্ত্তা মহাশয়ের দেখা পাইত, তাহা নহে; দেখা পাইলেও, বিশেষ কোনও আশার বাক্য শুনিতে পাইত না। "বি-এটা পাস করা থাকলে চট্ ক'রে একটা কিছু হয়ে যেতে পারতো।—যা হোক, চেষ্টায় আছি, দু'চার জন লোককে বলেও রেখেছি, দেখি কি হয়।"—এইরূপ কথা শুনিয়াই ফিরিতে হইত।

আফিস অঞ্চলেও মহেন্দ্র ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিল। সারাদিন ধূলায় রৌদ্রে ঘুরিয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া গদীতে ফিরিয়া আসিত। আহার করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিতে যাইত; মৃতা পত্নীর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িত। নির্জ্জন পাইলে ব্যাগ হইতে উজ্জ্বলার পত্রগুলি বাহির করিয়া পাঠ করিত; পড়া শেষ করিয়া, সজল নয়নে সেগুলি

আবার নেকড়ায় বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিত।

কলিকাতায় এইভাবে একমাস কাটিয়া গেল, কিন্তু কাষ-কর্ম্মের কোনও কিনারা হইল না। এই সময় পূর্ব্বোক্ত বড়লোকগণের মধ্যে একজন প্রাতে দুই ঘণ্টা তাঁহার পুত্রকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য পড়াইবার জন্য মাসিক দশ টাকা বেতনে তাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র তাহা গ্রহণ করিল—তবু পকেট খরচটা ত চলিবে!

যখন দুই মাস কাটিয়া গেল, তখন মহেন্দ্র প্রায় হতাশ হইয়া পড়িল। এরূপ ভাবে বসিয়া বসিয়া সরকার মহাশয়ের অন্নধ্বংস করিতে তাহার মনে লজ্জাও হইতে লাগিল। ভাবিল, আর একটা মাস দেখিব—কিছু যদি না জুটে, তবে দেশে ফিরিয়া গিয়া, চাষবাস কিছু বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইবে।

কিন্তু সেটা তাহাকে করিতে হইল না—ভাগ্যদেবী তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং প্রসন্ন বদনে হাসিয়া, তাহার আশার সংসার করিবার জন্য এক অভাবনীয় ঘটনার সৃষ্টি করিলেন।

॥ চার ॥

সে দিন শনিবার ছিল, আফিসগুলি বেলা দুইটার সময় সব বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্র আর কি করে, গদীতে ফিরিয়া গিযা জন্তুটির মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না—ভাবিল, তার চেযে যাই, গড়ের মাঠে গিয়া গাছের ছায়ায় একটু শুইয়া থাকি। তাই সে করিল। রাস্তা হইতে অল্পদূরে একটা খালি বেঞ্চি দেখিয়া তথায় গেল এবং গায়ের উড়ানীখানি খুলিয়া, গুটাইয়া সেটিকে উপাধান স্বরূপ করিয়া, বেঞ্চির উপর শয়ন করিল। ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল, আরামে মহেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঘণ্টা দুই এই ভাবে নিদ্রা যাইবার পর, সে জাগিয়া উঠিল। শরীরে আবার বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিল। রৌদ্র তখন পড়িয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিবার অভিপ্রায়ে, উঠিয়া ধীরে ধীরে রাস্তার উপর আসিল। পথে তখন অনেক বায়ুসেবনকারী বহির্গত হইয়াছে।

কিয়দ্দূর পথ আসিয়া, মহেন্দ্র দূরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। দেখিল কেল্লার দিক হইতে একখানা বগীগাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই গাড়ীকে থামাইবার জন্য বাস্তার লোক হো-হা করিযা পথরোধ করিযা দাঁড়াইতেছে—কিন্তু ঘোড়া নিকটে আসিবামাত্র তাহারা সরিয়া দাঁড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী মোড় ঘুরিয়া, মহেন্দ্র যে রাস্তায় ছিল, সেই রাস্তা লইবাব চেষ্টায় কোণের লাইটপোস্টে ধাক্কা খাইল। পশ্চাতে যে সহিস দাঁড়াইযা ছিল, সে ছিট্কাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল; গাড়ী বিদ্যুদ্বেগে মহেন্দ্রের দিকে আসিতে লাগিল।

ক্ষণকাল মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইল, একজন অল্পবয়স্কা শ্বেতকায়া মহিলা মধ্যস্থলে বসিয়া, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি শিশু—একটি বালক, একটি বালিকা। তিনি নিজেই গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন, অশ্বের ছিন্ন বল্গা তখনও তাঁহার হাতেই রহিয়াছে।

মহেন্দ্র যেখানে ছিল, সে স্থানের কাছাকাছি চাব পাঁচজন ইংরাজ ভদ্রলোক বেড়াইতেছিলেন। খিদিরপুর ডকের বহুসংখ্যক কুলি সেই সময় উত্তর দিক হইতে সেই স্থানে আসিয়া পেঁাছিযাছিল, সাহেবেরা লম্ফ দিয়া সেই সব কুলির মধ্যে পড়িয়া, ছড়ি-উঁচাইয়া ধমক দিয়া, তাহাদিগকে আনিয়া, পথের প্রস্থভাগ জুড়িয়া তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিলেন, এবং নিজেরা বিপদের স্থান—মধ্যভাগ জুড়িয়া রহিলেন। তাঁহারা চীৎকার করিতে করিতে ছড়ি আস্ফালন করিতে লাগিলেন, কুলিরাও হল্লা করিতে লাগিল। মহেন্দ্র স্বেচ্ছায় এই কুলিদের সঙ্গেই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

অশ্ব কাছাকাছি আসিয়া, পথ এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ দেখিয়া সহসা ফিরিয়া ময়দানের

দিকে মুখ করিল, এবং নিমেষ মধ্যে খানা পার হইয়া, ময়দানে প্রবেশ করিয়া ছুটিতে লাগিল। মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজ গলা হইতে চাদরখানা নামাইয়া, তাহার উভয় প্রান্ত একত্রে গাঁইট দিয়া গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিয়দ্দূরে প্রাণপণে ছুটিয়া অশ্বের নাগাল পাইয়া, সেই চাদরের ফাঁস তাহার গলায় লাগাইয়া বিপুল বলে তাহা টানিতে টানিতে আড় হইয়া ছুটিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর পশ্চাতে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরাও ছুটিয়া আসিতেছিলেন। মহেন্দ্রের এই সাহস ও কৌশল দেখিয়া, "ব্রাভো ইয়ংম্যান—হোল্ড অন্" (সাবাস যুবক, ধরিয়া থাক) বলিয়া তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন। অশ্বের গতিবেগ প্রতি মুহূর্ত্তে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে সাহেবেরা আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেই চাদর দুই তিনজনে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে লাগিলেন। আর কিয়দ্দূর গিয়াই অশ্ব পরাজয় স্বীকার করিল—সে দাঁড়াইল।

দুইজন সাহেব তখন মেমসাহেব ও শিশুদ্বয়কে বগী হইতে নামাইলেন। মেমসাহেবের মুখ শাকের বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। দাঁড়াইতে পারিলেন না। সেইখানে ভিজা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। কথা কহিবার শক্তি নাই যে কাহাকেও ধন্যবাদ দিবেন। শিশু দুইটি তাঁহাকে জড়াইযা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেমসাহেবের মূর্চ্ছার উপক্রম দেখা গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এক সাহেবের পকেটে ব্যাণ্ডি ভরা ফ্লাস্ক ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া, মেমসাহেবের মুখে ধরিলেন। মেমসাহেব ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিলেন।

সাহেবেরা কেহ মহেন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিলেন কেহ তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, সকলেই তাহাকে অজস্র প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

মেমসাহেব একটু চাঙ্গা হইলে, তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি কেল্লায় থাকেন, মেজর গ্রীণের পত্নী। শিশু দুইটি তাঁহার নিজস্ব নহে—কর্ণেল হ্যামিল্টনের সন্তান—তিনি তাহাদিগকে লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সহিসটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী-ঘোড়া তাহার জিম্মায় রাখিয়া, সাহেবেরা বিবি গ্রীণ ও শিশুদ্বয়কে রাস্তার উপর লইয়া আসিয়া একটা ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া দিলেন। বিবি, সাহেবদিগকে ও মহেন্দ্রকে মধুর ভাষায় ধন্যবাদ দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবু, তুমি আমায় কেল্লায় পৌঁছাইয়া দিবে চল।"

মহেন্দ্র কোচবাক্সে উঠিতে যাইতেছিল, বিবি বলিলেন, "না না—তুমি ভিতরে আসিয়া বস।" মহেন্দ্র তাহাই করিল, গাড়ী কেল্লা অভিমুখে ছুটিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া, বিবি গ্রীণ মহেন্দ্রকে ড্রয়িংরুমে বসাইয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে ডাকিয়া আনি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে এক স্থূলকায় বর্ষীয়ান্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বিবি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "জন্, এই বাবু আমার জীবনদাতা।" মহেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি আমার স্বামী, মেজর গ্রীণ।"

ইঁহারা প্রবেশ করিতেই মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মেজর সাহেবকে সেলাম করিল। সাহেব মহেন্দ্রের করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে অনেক ধন্যবাদ জানাইলেন। এক সোফার উপর নিজ পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মহেন্দ্র উত্তর দিতে লাগিল। সাহেব বলিলেন, "বাঃ, তুমি ত বেশ ইংরাজী বল, বাবু! তুমি একজন সুশিক্ষিত লোক।"

বেহারার মুখে সংবাদ পাইয়া, কর্ণেল হ্যামিল্টনও এই সময় আসিয়া পড়িলেন, এবং

মহেন্দ্রের প্রতি সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। প্রায় দশ মিনিটকাল উভয় সাহেবে বসিয়া, মহেন্দ্রের সহিত নানা কথোপকথন করিলেন, তাহার পর উভয় সাহেব উঠিয়া গিয়া পরামর্শ করিলেন। পরে কর্ণেল সাহেব মহেন্দ্রকে আসিয়া বলিলেন, "বাবু, তুমি আজ আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমাদের আজীবন স্মরণ থাকিবে। তোমার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস অত্যন্ত প্রশংসার্হ। আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে যদি আমরা সামান্য কিছু উপহার দিই, তাহাতে তুমি বিরক্ত হইবে কি?"—বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

মহেন্দ্র নোটখানির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া, সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কোনও উপহার বা পুরস্কারের আশায় ত এ কার্য্য করি নাই। প্রত্যেক ভদ্রলোকের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিয়াছি মাত্র। টাকা না লইবার অপরাধ আপনারা গ্রহণ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সাহেব দুইজন আবার কি বলাবলি করিলেন। তাহার পর মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়াছ বলিলে; কোনও স্থানে কোন আশা পাইয়াছ কি?"

"না সাহেব, এ পর্য্যন্ত পাই নাই।"

'আমাদের আফিসে একটি চাকরি খালি আছে। বেতন একশ টাকা, সেটি পাইলে তুমি খুসী হও?"

"হ্যাঁ সাহেব—সেটি পাইলে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান মনে করিব।"

"বেশ! কাল তুমি একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিও এবং বেলা একটার সময় আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিও।"

'নিশ্চয় আসিব। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

"কিছুই না—কিছুই না, তবে ঐ কথা ঠিক রহিল। আমরা এখন ক্লাবে চলিলাম। (স্ত্রীর প্রতি) এলিস, বাবুকে একটু চা খাওয়াইবে না?"

বিবি গ্রীণ বলিলেন, "চা আনিতে হুকুম দিয়াছি। তোমরা চা খাইয়া যাইবে না?"

মেজর সাহেব বলিলেন, "না প্রিয়তমে, আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আমরা ক্লাবে গিয়াই যাহা হয় পান করিব।"—বলিয়া তিনি কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

'যাহা হয়' কথাটির অর্থ বুঝিয়া, বিবি গ্রীণ আপন মনে একটু হাসিলেন। চায়ের অপেক্ষায় মহেন্দ্রকে নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন দরখাস্ত লইয়া কেল্লার আফিসে গিয়া মেজর সাহেবের সঙ্গে মহেন্দ্র সাক্ষাৎ করিল। মেজর সাহেব যথাস্থানে লইয়া গিয়া, সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত মঞ্জুর করাইয়া, নিয়োগ-পত্র সহি করাইয়া দিলেন। আগামী কল্য হইতেই তাহাকে কার্য্য করিতে হইবে।

বাসায় ফিরিবার পথে, একটা পোষ্ট আফিসে দাঁড়াইয়া, মহেন্দ্র পোষ্টকার্ডে জননীকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

মহেন্দ্রের আশ্রয়দাতা আড়তদার সেই কায়স্থবাবুটি এ সংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মহেন্দ্র সঙ্কুচিত ভাবে তাঁহাকে বলিল, "গোটাকতক টাকা পেলে আফিস যাবার জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় তৈরী করাতাম। মাইনে পেয়ে শোধ করতাম।"

কায়স্থবাবুটি তৎক্ষণাৎ তাহার আবশ্যকমত টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পরদিন আফিস হইতে ফিরিবার পথে, ধর্ম্মতলার একটা ভাল দর্জ্জির দোকানে মহেন্দ্র দুইটা ইংরাজী সুট ফরমাস দিয়া আসিল।

যেদিন চাকরী হইল, সেদিন রাত্রে বাসায় শয়ন করিয়া, স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিল বুকে করিয়া মহেন্দ্র অনেক অশ্রুবর্ষণ করিল।

প্রথম মাসের বেতন পাইয়া মহেন্দ্র সেই ছেলেপড়ানো চাকরীটি ছাড়িয়া দিল, কায়স্থ বাবুর ঋণ পরিশোধ করিল; একটা মেসের বাসা স্থির করিয়া সেখানে উঠিয়া গেল, আরও কিছু কাপড়-চোপড় ফরমাস দিল এবং মাকে দশটি টাকা মণিঅর্ডার করিল।

মহেন্দ্রের চালচলন, ইংরাজী কথা-ভাষাজ্ঞান ও কর্ম্মপটুতায় সাহেবেরা তাহার উপর বেশ সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন মেজর সাহেব বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া চা-পানার্থে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। বিবি গ্রীণ সে দিনও তাহাকে সমাদরে ও মিষ্টবাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন।

চা-পানান্তে মেজর সাহেব বারান্দায় চেয়ার বাহির করাইয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বসিলেন, বিবি গ্রীণ বেড়াইতে যাইবার সাজসজ্জা করিবার জন্য ভিতরে গেলেন। মেজর সাহেব বলিলেন, "মোহেন্, আফিস হইতে বাড়ী গিয়া তুমি কি কর?"

আফিসে এখন সাহেবেরা মহেন্দ্রের নামটি সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে "মোহেন্" বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। মহেন্দ্র উত্তর দিল, "চা-পান করিয়া বাসাতেই থাকি, কিছু পড়ি-টড়ি, কোনও দিন থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপে যাই।"

"বেড়াইতে যাও না?"

"এখান হইতে বাসায় ফিরিতেই আমার বেড়ানো হইয়া যায়।"

"দেখ, আমি উর্দ্দু পাশ করিয়াছি; কিন্তু বাঙ্গলা এখনও পাশ করি নাই। বাঙ্গলা পাশ করাও আমার আবশ্যক। আমার একজন শিক্ষক প্রয়োজন, তাহাকে আমি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া মাহিনা দিব—অধিক দিতে পারিব না। তুমি আমায় পড়াইবে? আফিসের পর এক ঘণ্টা—এই ধর পাঁচটা হইতে ছয়টা।"

মহেন্দ্র বলিল, "বেতনের জন্য কিছুমাত্র আসে যায় না। আপনার অনুগ্রহেই আমি চাকরীটি পাইয়াছি, অতি আহ্লাদের সহিত আমি আপনাকে বাঙ্গলা শিখাইতে প্রস্তুত আছি।"

সাহেব বলিলেন, "বেশ কথা। কত দিনে আমি বাঙ্গলা শিখিতে পারিব, বল দেখি?"

"আপনি কি পরিমাণ শিখিতে চান, তাহা না জানিলে বলা শক্ত।"

"পরীক্ষা পাস করার মত—বেশী শিখিয়া কি করিব? আমি অন্যান্য মিলিটারী অফিসারগণের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গলা পাস করিতে ছয় মাস যথেষ্ট। কাল হইতেই আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক, কি বল?"

"বেশ ত! কাল আমি আফিসের পরেই আসিব। একখানি বর্ণপরিচয় বহি আপনার জন্য কিনিয়া আনিব কি?"

"আনিও।" বলিয়া পাৎলুনের পকেট হইতে সাহেব একটি টাকা বাহির করিয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে ধরিলেন।

মহেন্দ্র বলিল, "টাকা রাখুন। ঐ বহির দাম পাঁচ পয়সা মাত্র, আমি কিনিয়া আনিব এখন।"

সাহেব টাকাটি পকেটে ফেলিয়া, একটি দুয়ানি বাহির করিয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন।

এই সময়ে মেমসাহেব বাহির হইয়া আসিলেন; সহিস টমটমখানি আনিয়া হাজির করিল। মহেন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সাহেব সস্ত্রীক টমটমে গিয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্রও ইঁহাদের সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছিল। ঘোড়ার প্রতি চাহিয়া বলিল, "এটা ত আপনার সে ঘোড়া নয়।"

সাহেব বলিলেন, "না। সেটাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। এটা নূতন কিনিয়াছি, এ বেশ ঠাণ্ডা।"—বলিয়া হস্তসঙ্কেতে বিদায় জ্ঞাপন করিয়া তিনি টমটম হাঁকাইয়া দিলেন।

পরদিন আফিসের পর মহেন্দ্র সোজা মেজর সাহেবের কুঠীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বারান্দায় বিবি গ্রীণ দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে বাঙ্গলা পড়াইতে আসিয়াছেন বুঝি? কিন্তু আপনার ছাত্র ত পলাতক!"

"তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

"ভয় নাই। একটু পরেই আসিবেন। তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছেন, ততক্ষণ আপনাকে চা দিতে। ভিতরে আসুন; চা আমাদের প্রস্তুত।"—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

চা ঢালিয়া, রুটী-মাখনের প্লেটটা মহেন্দ্রের দিকে সরাইয়া দিয়া, টেবিলের উপরে রক্ষিত বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ বইখানি তিনি কৌতূহলবশতঃ তুলিয়া লইলেন। সেখানি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করিতে হয়?"

অ-আর পাতা দেখাইয়া মহেন্দ্র বলিল, "এইখান থেকে। এইগুলি স্বরবর্ণ—ভাওয়েল্‌স্‌,—আর, এই পাতায় এইগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ—কনসোনেণ্টস্‌।"

চা-পান করিতে করিতে মেমসাহেব অক্ষরগুলির দিকে চাহিতে লাগিলেন। "এগুলির চেহারা ত ভারি অদ্ভুত! দেখিলে বাস্তবিক হাসি পায়। কোন্‌টির কি নাম?"

মহেন্দ্র বলিল, "এইটি অ।"

"এক মুহূর্ত্ত থামুন।"—বলিয়া মেমসাহেব তাঁহার পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি সোণার পেন্সিল বাহির করিয়া অক্ষরতলে লিখিলেন—"Awe."

"এটি?"

"আ।"

মেমসাহেব তাহার তলায় লিখিলেন—"Ah!"—এইরূপে স্বরবর্ণের প্রত্যেক অক্ষরের নিম্নে সেগুলির উচ্চারণ লিখিয়া লইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মেজর গ্রীণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেমসাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ব্যাড্‌ বয়। মুন্সীজী কতক্ষণ আসিয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহা হউক তুমি যে সময় নষ্ট করিলে, তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। তোমার কার্য্য অনেকটা আমি অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছি।"—বলিয়া তিনি অক্ষরগুলি দেখাইয়া উচ্চারণও পড়িতে লাগিলেন।

মেজর সাহেবের চা-পান শেষ হইতে প্রায় ছয়টা বাজিল। পকেট হইতে ঘড়ী খুলিয়া দেখিয়া স্ত্রীর প্রতি বলিলেন, "আজ আর আমার পড়িবার সময় কই? অক্ষরগুলির উচ্চারণ তুমি ত লিখিয়াই রাখিয়াছ, কাল সকালে ওগুলা আমি অভ্যাস করিব এখন। চল, এবার হাওয়া খাইতে যাওয়া যাক। মোহেন্‌, কাল আসিয়া তুমি দেখিবে, ঐ সমস্ত অক্ষর আমার চেনা হইয়া গিয়াছে, আমি নূতন পাঠ লইব।"—বলিয়া সহাস্যে মহেন্দ্রকে বিদায় দিয়া তিনি "সস্ত্রীক শকটারোহণে" হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন।

পরদিন মহেন্দ্র সাহেবের কুঠিতে গিয়া দেখিল, সাহেব আছেন। তিনি মহেন্দ্রকে বসাইয়া বলিলেন, "ওহে দেখ, তোমাদের বাঙ্গলা অক্ষরগুলো ড্যাম ডিফিকল্ট। উচ্চারণ অতি বদ্‌। আজ আমি সেগুলা অভ্যাস করিবার বেশী সময় পাই নাই, কাল করিব; করিয়া নূতন পাঠ লইব। আজ তুমি এক পেয়ালা চা খাইয়া যাও।"

চা-পানের পর মেমসাহেব প্রথমভাগখানি আনিয়া স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলার উচ্চারণ টুকিয়া লও না, জন্‌। স্বরবর্ণগুলো চেনা শেষ করিয়া যদি সময় পাও ব্যঞ্জনবর্ণগুলোও কতকটা চিনিয়া রাখিতে পারিবে।"

সাহেব বলিলেন, "বেশ বুদ্ধি করিয়াছ। ওগুলো তুমিই লিখিয়া রাখ, প্রিয়তমে।"

মেমসাহেব একটি একটি করিয়া সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু "ত" লইয়া বড় বিপদ হইল। তিনি "ত" কোনমতেই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না—"ট" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া সাহেব হাসিয়াই আকুল।

॥ ছয় ॥

লেখাপড়া এই ভাবেই চলিতে লাগিল। সাহেব গৃহে উপস্থিত থাকিলে, দুই দিন ভাঁড়াইয়া এক দিন পড়েন। যেদিন মহেন্দ্র আসিবার পূর্ব্বেই প্রস্থান করেন, সে দিন স্ত্রীকে বলিয়া যান, নূতন পড়াটা তুমিই শিখিয়া লইও, কাল সকালে তোমার কাছেই আমি জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।"

মেমসাহেব এ দিকে দ্রুতগতি শিখিয়া ফেলিতেছেন। এক মাস হইয়া গেল, সাহেবের 'সাধু পুজা'ই ভাল করিয়া আয়ত্ত হইল না। কিন্তু মেমসাহেবের প্রথম ভাগ প্রায় শেষ—রাখালের গল্প হইতেছে। তাই কি পুরা সময়টা তিনি পড়েন? দুজনে বসিয়া কত গল্প হয়—কত হাসি তামাসা—কত রঙ্গ-ব্যঙ্গ।

একদিন স্বামীর অনুপস্থিতিকালে মেমসাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের দেশে, শিক্ষকেরা ছাত্র বা ছাত্রীর গুরুজনস্বরূপ গণ্য—নয় কি?"

"হ্যাঁ।"

"গুরুজনের সামনে তাঁদের নাম করিতে নাই, তুমি বলিয়াছ। কিন্তু আমি যে তোমার নাম করিয়া ডাকি—মিষ্টার মোহেন্ বলি, এটা ত উচিত হইতেছে না।"

মহেন্দ্র বলিল, "তাতে আর দোষ কি? তুমি ত আর বাঙ্গালীর মেয়ে নও।"

"আর, তুমি আমায় মিসেস গ্রীণ বল, সেটাও ভাল শোনায় না। আমার ইচ্ছা, আমি তোমায় গুরুজী বলিয়া ডাকিব—আর তুমি আমায় এল্সি বলিয়া ডাকিবে। সে কি ভাল হইবে না?"

"তুমি আমায় গুরুজী বলিয়া ডাকিলে কোনও ক্ষতি হইবে না—কিন্তু আমি তোমায় এল্সি বলিয়া ডাকিলে তোমার স্বামী কি সেটা পছন্দ করিবেন?"—বলিয়া মহেন্দ্র একটু হাসিল।

মেমসাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,—তা বটে, তিনি হয়ত মনে করিবেন, তোমাতে আমাতে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। রাগ করিতে পারেন বটে। তবে কাজ নাই—যেমন চলিতেছে, তেমনি চলুক। বুড়াকে চটাইয়া লাভ কি?"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

এইরূপ রঙ বেরঙের কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। রঙ্গ ক্রমে চড়িতে লাগিল। তবে সাহেব উপস্থিত থাকিলে বাজে কথা একটিও হইত না।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে সাহেবের প্রথম ভাগ এখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু মেম-সাহেব বোধোদয় ধরিয়াছেন।

এমন সময় সরকারী কার্য্যে মেজর সাহেবকে করাচী যাইবার আদেশ হইল। দুই সপ্তাহকাল সেখানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে।

সে দিন পড়াইয়া বিদায় গ্রহণ করিবার সময় মহেন্দ্র বলিল, "তা হলে, আপনি ফিরিয়া আসিলে আবার আমি আসিব।"

মেমসাহেব বলিলেন, "আমি বুঝে পড়িব না? দুই সপ্তাহ না পড়িলে আমি সব ভুলিয়া যাইব যে!"

সাহেব বলিলেন, "তুমি যেমন আসিতেছ, তেমনি আসিও মোহেন্। মেমসাহেবকে পড়াইও।"

মহেন্দ্র সম্মত হইয়া বাসায় চলিয়া গেল।

॥ সাত ॥

মেজর সাহেবের অনুপস্থিতিসত্ত্বেও মহেন্দ্র তাঁহার মেমকে প্রতিদিন পাঁচটা বাজিলেই পড়াইতে যায়। পড়ানো শেষ হইতে প্রথম দুই দিন ছয়টা স্থানে সাতটা বাজিয়াছিল, তৃতীয় দিন একেবারে আটটা বাজিয়া গেল। ঘড়ীর পানে চাহিয়া বিবি গ্রীণ বলিলেন, "উঃ—আটটা! অনেক দেরী হইয়া গেছে ত! মোহেন্, তুমি, কেন আমার সঙ্গেই আজ ডিনার খাইয়া যাও না।"

মহেন্দ্র বলিল, "বেশ ত—ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।"

"আচ্ছা, তুমি তবে ততক্ষণ হাত-মুখ ধুইয়া লও, নীচেই গোসলখানা আছে। আমিও উপরে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া আসি। সাড়ে আটটায় আমরা ডিনারে বসিব।" —বলিয়া তিনি বেয়ারাকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "সাহেবকা ওয়াস্তে গোসলখানা ঠিক করো।" বেয়ারা চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া মহেন্দ্রকে সে নিম্নতলে একটি কামরায় লইয়া গেল। এটি শয়নকক্ষ, কিন্তু অব্যবহৃত বলিয়া মনে হইল। সেই কক্ষের সংলগ্ন গোসলখানায়, একখানি নূতন সাবান, ধোয়া তোয়ালে ও জল রহিয়াছে। মহেন্দ্র শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, সিগারেট মুখে করিয়া ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, এল্‌সি তৎপূর্ব্বেই আসিয়া বসিয়া আছে। তাহার অঙ্গে কালো সিল্কের সান্ধ্য পরিচ্ছদ, পাউডার-চর্চ্চিত অর্দ্ধনগ্ন শুভ্র বক্ষের উপর একটি মুক্তাহার দুলিতেছে। এল্‌সি বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে।

মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া বলিল, "কি পড়া হইতেছে?"

"এ একখানি নভেল, নূতন বাহির হইয়াছে। তুমি বোধ হয় এখনও এখানি পড় নাই?"—বলিয়া মহেন্দ্রর হস্তে এল্‌সি পুস্তকখানি দিল।

মহেন্দ্র বহিখানির সদর পৃষ্ঠা দেখিয়া বলিল, "না, এখানি পড়ি নাই। তবে এই লেখকের অন্য কয়েকখানি উপন্যাস আমি পড়িয়াছি।"

এল্‌সি বলিল, "এখানি খাসা বই। আমার পড়া হইলে তোমায় দিব এখন—পড়িয়া দেখিও, বেশ মজা আছে। আচ্ছা মোহেন্, তোমাদের বাঙ্গলা ভাষায় নভেল আছে?"

"হ্যাঁ,—আছে বইকি, অনেক আছে।"

"সে সব নভেল কি রকম? তুমি ত ইংরাজি নভেল অনেক পড়িয়াছ, বাঙ্গলা নভেলও কি সেই ধরণের?"

"অনেকটা সেই ধরণের বইকি।"

"তাতে লভ মেকিং (প্রেমলীলা) আছে?"

"তা আছে বইকি! প্রেমলীলা ছাড়া কি আর নভেল হয়?"

"সে ত নিশ্চয়। বাঙ্গলা নভেলে নায়িকারা সব কি রকম হয়?"

"যা হওয়া উচিত—খুব সুন্দরী হয়। তবে বয়সটা তাদের কিছু কম হয়। ইংরাজী নভেলে যেমন নায়িকারা হয় ১৮।১৯, বাঙ্গলা নভেলে তেমনই ১৩।১৪ বছরের হয়।"

এল্‌সি হাসিয়া বলিল, "আমার বয়সও কিন্তু ১৯ বৎসর। আমি স্বচ্ছন্দে ইংরাজী উপন্যাসের নায়িকা হইতে পারি—কি বল? কিন্তু বাঙ্গলা উপন্যাসের ত পারি না।

আচ্ছা, এ দেশের ঐ সব ছোট ছোট মেয়েরা প্রেম করিতে জানে?"

"আমাদের গরম দেশ কিনা। অল্পবয়সেই আমরা ও বিষয়ে বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠি।"

"কার সঙ্গে ঐ সব মেয়েরা প্রেম করে?"

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও বাংলা উপন্যাসে "আর্টের" যুগ—পরকীয়া প্রেমের যুগ—তেমন "নিভীক"ভাবে আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং মহেন্দ্র বলিল, "তারা প্রেম করে স্বামীর সঙ্গে—অথবা যার সঙ্গে শেষে বিবাহ হইবে, তার সঙ্গে।"

শুনিয়া এল্‌সি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে ত নিতান্ত সেকেলে ফ্যাশান! স্বামী বা হবু স্বামীর সঙ্গে প্রেমে আবার কোনও মজা আছে নাকি?"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল "আমাদের সাহিত্য এখনও তত মজাদার হইয়া উঠে নাই।"

এই সময় বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, "খানা টেবিল পর।"

উভয়ে উঠিয়া খানা-কামরায় গেল। টেবিলটি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। দুইটি ফুল-দানিস্থ পুষ্পগুচ্ছের মাঝে বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতে লাগিল।

দুই কোর্স শেষ হইবার পর, পরিবেষণকারী "বয়" রক্তবর্ণ তরল পদার্থপূর্ণ ডিক্যাণ্টার আনিয়া মেমসাহেবের 'ওয়াইন' গ্লাস পূর্ণ করিয়া দিল। এল্‌সি মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে একটু ক্লারেট দিবে কি? না হুইস্কি? আমার স্বামী কিন্তু হুইস্কিই পছন্দ করেন।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আমি ও সব কখনও পান করি নাই। আমি মিশনরীদের সহবাসে মানুষ, তাঁরা সুরাপান করাকে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন।"

এল্‌সি হাসিয়া বলিল, "মিশনরীরা ঐ রকম অদ্ভুত জীবই বটে। তা, তুমি কখনও পোর্টও খাও নাই? পোর্ট ত অনেকে ডাক্তারের উপদেশে পান করে।"

মহেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, পোর্ট আমি পান করিয়াছি বটে।"

এল্‌সি হুকুম করিল "বয়, সাহেবকো পোর্ট সরাপ।"

বেয়ারা সাইডবোর্ড হইতে পোর্টের বোতল ও পোর্টগ্লাস লইয়া আসিল। মহেন্দ্রের পার্শ্বস্থ ক্লারেট গ্লাসটি সরাইয়া, সেখানে পোর্টগ্লাস রাখিয়া উহা পূর্ণ করিয়া দিল।

তখন "উপন্যাসে প্রেমতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। উভয়ের গ্লাস খালি হইবামাত্র বয় তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেছে। তৃতীয় গ্লাসের মাঝামাঝি পৌঁছিয়া মহেন্দ্রের দেহ মনে একটা অপূর্ব্ব পুলকসঞ্চার হইল। তাহার কথাবার্ত্তা আরও সরস হইয়া উঠিল—কথায় কথায় উভয়ের হাসির ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের বিশেষ কোনও রংদার কথা শুনিয়া "Naughty boy!" (দুষ্ট বালক) বলিয়া, হাসিতে হাসিতে এল্‌সি তাহার বাহুতে বা পিঠে থাবড়া মারিতে লাগিল। গোলাপী চোখে, এল্‌সির পানে চাহিয়া মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, এ যেন মূর্ত্তিমতী কবিতা—এমন সুন্দরী সুরসিকা রমণীরত্ন জগতে দুর্লভ।

আহার শেষ হইলে উভয়ে ড্রইং রুমে গিয়া বসিল।

সেদিন মহেন্দ্র যখন বাসায় ফিরিল, রাত্রি তখন প্রায় একটা।

॥ আট ॥

পরদিন রবিবার ছিল। বেলা সাতটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া মহেন্দ্র শয্যায় পড়িয়া গত রাত্রির ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে লাগিল।

সব কথা স্মরণ করিয়া নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—"ছি ছি!—এ আমি কি করিলাম! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-

ছিলাম, আজীবন আমার মৃতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া সেই ভালবাসায় তন্ময় হইয়া থাকিব, তাহাকে ধ্যান করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিব, একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইব—সে প্রতিজ্ঞা আমার কোথায় রহিল? ছি ছি—আমি কি নীচ! কি দুর্ব্বল! কি অপদার্থ! আমি ত মনুষ্য নামের অযোগ্য। আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

সারাদিন মহেন্দ্র বিষণ্ণ বদনে বাসায় বসিয়া কাটাইল। যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে—এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই সে চিন্তা করিতেছিল। একবার বাক্স খুলিয়া স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিলটি বাহির করিল। মনে হইল, চিঠিগুলি যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"অপবিত্র পশু! ঐ কলঙ্কিত হস্তে আমাদের স্পর্শ করিবার অধিকার আর তোমার নাই!" মহেন্দ্রের হস্তে সেই চিঠির বাণ্ডিল যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত অনুভূত হইল। সে উহা বাক্সে ফেলিয়া, বাক্স বন্ধ করিল।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়াও সে অনেকক্ষণ এই বিষয়ে চিন্তা করিল। অবশেষে স্থির করিল, জোর করিয়া, শাসন করিয়া, অবাধ্য মন-মাতঙ্গকে ও পথ হইতে ফিরাইতে হইবে। প্রলোভনের পথে আর পদার্পণ করা উচিত নয়। মেজর সাহেব যতদিন না ফেরেন, ততদিন আর তাঁহার বাড়ীতে সে যাইবে না—তিনি ফিরিলেও আর যাইবে না—তাঁহাকে বাংগলা পড়ানো পরিত্যাগ করাই সে স্থিরসংকল্প করিল। নেশার ঝোঁকে একবার বিপথে পা দিয়াছে বলিয়া আজীবন যে সেই পথেই চলিতে হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই—আবার চেষ্টা করিয়া, সংযম-সাধনা করিয়া দৃঢ়চিত্তে সুপথেই নিজেকে চালনা করিতে হইবে।

পরদিন সোমবারে মহেন্দ্র তাহার আফিসে গেল। পূর্ব্ব হইতে সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, আজ পাঁচটা বাজিলেই সটান্ সে বাসার পথ ধরিবে—সাহেবের কুঠীর ধারে কাছেও যাইবে না। কিন্তু তিনটার পর এ বিষয়ে তাহার মনে একটু দ্বিধা প্রবেশ করিল। এরূপভাবে না বলিয়া কহিয়া পলায়ন করা কি নিতান্ত অভদ্রতা হইবে না? তার চেয়ে, যথাসময়ে গিয়া মেমসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, কোনও একটা ওজর দেখাইয়া বিদায় লওয়াই ভাল। ভদ্রতাও রক্ষা হইবে—সকল দিক বজায়ও থাকিবে;, কারণ, মহেন্দ্রের সঙ্কল্প এখন স্থির—এল্‌সির মোহজালে আর কিছুতেই সে নিজেকে জড়াইতে দিবে না।

ক্রমে, "ভদ্রতা রক্ষার" জন্য মহেন্দ্রের মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ঘন ঘন ঘড়ির পানে চাহিতে লাগিল, কতক্ষণে পাঁচটা বাজে! অবশেষে পাঁচটা বাজিল। মহেন্দ্র কলম ফেলিয়া, কাগজপত্র গুছাইয়া দেরাজ বন্ধ করিয়া, হ্যাট্ ও ছড়ি হস্তে আফিস হইতে বাহির হইযা পড়িল।

মেজর সাহেবের কুঠীর নিকট গিয়া দেখিল এল্‌সি বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া আছে। ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মহেন্দ্র হ্যাট্ তুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। বারান্দায় উঠিতেই, এল্‌সি অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্মিতমুখে বলিল, "ওয়েল্ মোহেন্, নটি বয়!—কাল তুমি আস নাই কেন বল ত? আমি তোমার উপর ভা—রি রাগ করিয়াছি!"

মহেন্দ্র বলিল, "কাল যে রবিবার ছিল।"

"হ'লই বা রবিবার! তুমি ত জান, আমার স্বামী এখানে নাই, আমি একলাটি রহিয়াছি। নাই বা পড়িলাম—দুজনে বসিয়া গল্পে-সল্পে আমোদে সন্ধ্যাটা ত কাটানো যাইত! কাল বিকালে তোমার কোথাও কোন কাজ ছিল বুঝি?"

"না, কাজ এমন বিশেষ কিছুই না।"

"আচ্ছা এখন চা খাইবে চল। আজ আর পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না। চা খাইয়া, চল, দুজনে ময়দানে একটু বেড়াইয়া আসা যাউক।"

॥ নয় ॥

মহেন্দ্রের 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞা'. 'স্থির-সঙ্কল্প', 'সংযম-সাধনা', কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার আর খোঁজ নাই। দিনের পর দিন, পরস্পরের নেশায় দুজনে মসগুল হইয়া রহিল।

সেদিন বিকালে মহেন্দ্র মেমসাহেবকে 'পড়াইতে" গিয়া দেখিল, সে ম্লানমুখে বসিয়া আছে, টেবিলের উপর একখানা হলুদে খাম। এল্‌সি বলিল, "মোহেন্, টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কাল প্রাতে আমার স্বামী আসিয়া পেঁীছিবেন।"—বলিয়া টেলিগ্রামখানি মহেন্দ্রের দিকে ঠেলিয়া দিল। মহেন্দ্র সেখানি পড়িয়া, বিষন্নবদনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। ৮

এল্‌সি বলিল, "দেখ মোহেন্, এখন হইতে আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে চলিতে হইবে। শুধু আমার স্বামী ফিরিয়া আসিতেছেন বলিয়া নয়—তোমায় আমায় লইয়া আমাদের সমাজেও একটু কাণাঘুসা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে. একজন নেটিভের সঙ্গে অত মেশামিশি কি জন্য?"

মহেন্দ্র বলিল, "তবে কি এখন হইতে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, এল্‌সি? তাহা হইলে কেমন করিয়া আমি বাঁচিব, প্রিয়তমে?'

"তাহা হইলে কি আমিই বাঁচিব? না প্রিয়তমে, সে হইতেই পারে না। তুমি পূর্ব্বে যেমন আমার স্বামীকে রোজ পড়াইতে আসিতে. পড়াইয়া চলিয়া যাইতে, সেইরূপ করিবে। তবু চোখের দেখা ত হইবে! যাহাতে মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টা করিয়া নির্জ্জনে তোমাতে আমাতে মনের কথা আদান প্রদানের সুযোগ পাই, তাহার একটা ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তুমি মুখ হাত ধুইয়া লও। চা খাইয়া, চল, ময়দানে গিয়া একটু বেড়ানো যাক।"

সন্ধ্যার পর কেল্লা হইতে বাহির হইয়া ময়দানের এক জনহীন স্থানে বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চ দেখিতে পাইয়া. সেইখানে দুইজনে বসিয়া, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল।

অবশেষে স্থির হইল. পার্ক লেনে অথবা ঐ অঞ্চলের কোনও উপযুক্ত বাড়ীতে, বেনামীতে একখানি ঘর ভাড়া লইতে হইবে। সুযোগমত সঙ্কেত অনুসারে সেইখানেই মাঝে মাঝে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ এবং "মনের কথার আদান প্রদান" চলিবে। এল্‌সি বলিল, "তাহারা বোধ হয় ২।৪ মাসের ভাড়া অগ্রিম চাহিয়া বসিবে। কিছু আসবাবও আমাদের আবশ্যক হইবে। আমি সেজন্য তোমায় এক হাজার টাকা দিব। আজ রাত্রেই টাকাটা দিয়া রাখিব—নইলে আমার স্বামী আসিলে অসুবিধা হইতে পারে। এখন ওঠা যাক্ চল, আমাদের ডিনারের সময় হইয়া আসিল।"

মেজর গ্রীণ পরদিন প্রাতে আসিয়া পেঁীছিলেন। বিকালে যথানিয়মে মহেন্দ্র তাঁহাকে পড়াইতে গেল। মেজর সাহেব পড়িলেন না—মহেন্দ্রকে চা খাওয়াইয়া, হাসি-খুসী গল্প-গুজবে সময় কাটাইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া. সস্ত্রীক টমটমে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। পরদিনও এইরূপ হইল।

এ দুই দিন এখান হইতে বিদায় হইয়া. মহেন্দ্র পার্ক লেন অঞ্চলে "উপযুক্ত বাড়ী'তে খালি ঘর খুজিয়া বেড়াইল। কিন্তু তখন রাত্রি—কোথাও কোনও সুবিধা করিতে পারিল না। সুতরাং সে স্থির করিল, রবিবারে এই পাড়ায় আসিয়া এ কার্য্যটি সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে।

তৃতীয় দিন, আফিসে মেজর সাহেব মহেন্দ্রকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, "মোহেন্, আমার এখন অনেক কাজ পড়িয়াছে। এখন আমি আর বাঙ্গলা পড়িবার সময় পাইব না। আর তোমার কষ্ট করিয়া আমার কুঠিতে আসার প্রয়োজন নাই।"—বলিয়া তিনি

মহেন্দ্রের প্রাপ্য টাকা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র দেখিল, মেজর সাহেবের মুখ-খানা গম্ভীর—বিরক্তির ছায়াও তাহাতে সুস্পষ্ট।

মহেন্দ্র আফিসে নিজ স্থানে গিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, না পড়িবার কারণ সাহেব যাহা বলিলেন, তাহাই কি সত্য? না, কাহারও নিকট কোন "কাণাঘুষা" শুনিয়া তাঁহার মনে একটা সন্দেহ প্রবেশ করিয়াছে? যাহা বলিলেন, তাহা আফিসে না বলিয়া, নিজ গৃহেও ত বলিতে পারিতেন! তাঁহার কুঠীতে আর আমি যাই, ইহা কি তাঁহার ইচ্ছা নয়? বাস্তবিক, এ দিকে একটু বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছিল বইকি; সেটা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে।"

ইহার দুই দিন পরে মেজর সাহেব আফিসের বারান্দায় আসিয়া হঠাৎ দেখিলেন কিছু-দূরে তাঁহার গৃহভৃত্য একখানি চিঠি হাতে করিয়া মহেন্দ্রের আফিসের দিকে যাইতেছে। সাহেব বেয়ারাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি চিঠিখানি বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া, প্রভুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তাহাকে নিজের খাসকামরায় আনিয়া বলিলেন, "কিস্কা চিঠ্ঠি—ডেখ্লাও।"

প্রভুর সক্রোধ মূর্ত্তি দেখিয়া বেয়ারা কম্পিত হস্তে চিঠিখানি বাহির করিয়া দিল। "টুম্ আভি বাহার বারাণ্ডামে ঠাহরো"—বলিয়া সাহেব চোখে চশমা আঁটিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর হস্তাক্ষরে মহেন্দ্রের নাম লেখা। খামের মুখে জল দিয়া ভিজাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা সন্তর্পণে খুলিয়া চিঠি পাঠ কবিলেন। সেই কয়েক লাইন ইংরাজীর অনুবাদে এই—

"প্রিয়তম,

আজ তিন দিন তোমায় চোখের দেখাটিও দেখিতে পাই নাই। সে জন্য কি কষ্টে যে আছি, তাহা বলিতে পারি না। আজ রাত্রি নয়টার পর এলিয়ট ট্যাঙ্কের পশ্চিমে, আমাদের সেই নির্জ্জন বৃক্ষতলে বেঞ্চখানিতে তুমি বসিয়া থাকিও। সৌভাগ্যবশতঃ একটা সুযোগ ঘটিয়াছে—ঐ সময় সেখানে গিয়া আমি তোমার সহিত ঘণ্টা দুই যাপন করিতে পাবিব। এস—এস—এস—তোমায় না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব।

তোমারই—

এল্‌সি।"

মেজর সাহেব কাগজে টুকিয়া লইলেন—এলিয়ট—ট্যাঙ্ক—পশ্চিমে—বেঞ্চে। তাহার পর, খামখানি আঠা দিয়া আঁটিয়া ডাকিলেন—"বেয়ারা!" বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব বলিলেন, "যাও, চিঠ্ঠি মোহেন্‌বাবুকে দেও। হাম ইস্ চিঠ্ঠিকো দেখা,' মেমসাহেব ইয়ে মোহেন্‌বাবু কোইকো মৎ বোলো খবরদার। বোলনেসে—বোলনেসে—"

মেজর সাহেব তাঁহার টেবিলের দেরাজ টানিয়া একটা রিভলভার বাহির করিয়া বেয়ারার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বোলনেসে. হাম তুমকো শুট করেগা—জান মারেগা—সমঝা?"

বেয়ারা কম্পিতপদে এক হাত পিছাইয়া গিয়া, করযোড়ে কাতরস্বরে কহিল, "নেহি খোদাবন্দ্—হাম কুছ নেহি বোলেগা। কোইকো নেহি বোলেগা। মেরা জান পিয়ারা হায়।"

মেজর সাহেব রিভালভারটি দেরাজে বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—ইয়াদ্ রাখ্‌খো, যাও।"

॥ দশ ॥

বিকালে মেজর সাহেব স্ত্রীকে বলিলেন, "এল্‌সি, আজ আমি বাড়ীতেই খাইব। বাবুর্চ্চিকে বলিয়া দাও।"

এ কথা শুনিয়া মেমসাহেবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মনের ভাব যথাসাধ্য

গোপন করিয়া সে বলিল, "তবে যে তুমি বলিয়াছিলে, আজ তোমাদের ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে একটা ভোজ আছে—ন'টার সময় তোমায় সেখানে যাইতে হইবে—বাড়ীতে খাইবে না!"

"হ্যাঁ, তা বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু—সেখানে যাইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। আজ এম্পায়ারে একটা খুব ভাল ফিল্‌ম্‌ আছে—চল ডিনারের পর দুজনে দেখিয়া আসা যাউক।"

এল্‌সি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া, অগত্যা স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

ডিনার শেষে রাত্রি নয়টার সময় টমটম জোতাইয়া, মেজর সাহেব স্ত্রীকে লইয়া বাহির হইলেন। বায়স্কোপে পৌঁছিয়া টমটম বিদায় করিয়া দিলেন—ট্যাক্‌সিতে ফিরিবেন।

সাড়ে নয়টায় বায়স্কোপ আরম্ভ হইল। দশটার পূর্ব্বেই মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি একটু থাক প্রিয়তমে; আমি দশ মিনিট মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি। বড় পিপাসা পাইয়াছে, বারে গিয়া একটা পেগ পান করিয়া আসি।"

এল্‌সি কোন কথা বলিল না—স্বামীর সঙ্গ তাহার বিষয়ৎ বোধ হইতেছিল। মেজর সাহেব চলিয়া গেলে সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল আজ আর মোহেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোনই উপায় নাই—সে বেচারী সঙ্কেতস্থানে বসিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিবে।

সাহেব রাস্তা পার হইয়া দ্রুতপদে ময়দানের ভিতর দিয়া চলিলেন। দশ মিনিট পরে উদ্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া, পথ হইতেই দেখিতে পাইলেন, বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চের উপর ফেল্ট হ্যাট্‌ মাথায় দিয়া কে একজন একাকী বসিয়া আছে।

পথ হইতে নামিয়া, ঘাসের উপর দিয়া সন্তর্পণে তিনি সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি ডাকিলেন—"মোহেন্‌!"

মহেন্দ্র চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কে, মেজর গ্রীণ ?"

"হ্যাঁ। আমি মেজর গ্রীণ। তুমি এ সময়ে এখানে বসিয়া কি করিতেছ, মোহেন্‌ ?"

"বায়ু সেবন করিতেছি।"

সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "রাস্কেল! ব্ল্যাগার্ড! বায়ু সেবন করিতেছ ? না, আমার স্ত্রীর প্রতীক্ষা করিতেছ ? বিশ্বাসঘাতক! ড্যাম নিগার শূয়ারকা বাচ্চা! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার—এক জন য়ুরোপীয় মহিলা—আমার স্ত্রীর সহিত প্রেম কর ? আমি এই দণ্ডে তোমায় কুকুরের মত হত্যা করিব। তোমার ঈশ্বরকে স্মরণ কর!"—বলিয়া সাহেব সাঁ করিয়া ভিতরের বুক পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিলেন। উহার উজ্জ্বল নলটি অদূরস্থ গ্যাসের আলোকে চক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল।

কিন্তু রিভলভার ছুড়িবার অবসর সাহেব পাইলেন না। মহেন্দ্র পালোয়ানগণের নিকট শেখা একটা "ল্যাং" মারিয়া, সেই মুহূর্ত্তে সাহেবকে ধরাশায়ী করিয়া, তীরবেগে ঘোড়-দৌড়ের মাঠের দিকে ছুটিল।

মেজর সাহেব তাঁহার স্থূল দেহখানি যথাসাধ্য শীঘ্র উঠাইয়া, আবার দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, পলায়মান মহেন্দ্রের দিকে রিভলভার লক্ষ্য করিলেন—আওয়াজ হইল গুড়ুম্‌। সৈনিক পুরুষের শিক্ষিত হস্ত—মহেন্দ্রের মাথার ফেল্ট হ্যাট্‌ উড়িয়া গেল।

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িল না দেখিয়া, সাহেব তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। স্থূলদেহ লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত দৌড়িতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাঁহার রিভলভার গর্জ্জন করিল, "গুড়ুম—গুড়ুম!"

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িলও না, তাহাকে সাহেব আর দেখিতেও পাইলেন না। অগত্যা তখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রিভলভার পকেটে পুরিয়া, পোষাকের ধূলাকাদা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আবার বায়স্কোপ অভিমুখে চলিলেন। তথায় পৌঁছিয়া, বার-এ দাঁড়াইয়া অল্প একটু সোডা সংযোগে একটা ডবল-পেগ ব্র্যাণ্ডি লইয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। একটা সিগারেট ধরাইয়া অর্দ্ধেকটা খাইয়া, সেটা ফেলিয়া দিয়া ভিতরে

গিয়া স্ত্রীর নিকট বসিলেন। এল্‌সি বলিল, "দশ মিনিট মধ্যে আসিব বলিয়া গেলে —প্রায় এক ঘণ্টা কাটিল, ছিলে কোথায় ?"

মেজর সাহেব সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "এক বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।"

॥ এগার ॥

মহেন্দ্র সেই নির্জ্জন ময়দানের ভিতর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে যখন দেখিল, বন্দুকের শব্দ বন্ধ হইয়াছে, তখন দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। এতক্ষণে সে 'গ্লাস রাইড' রাস্তা পার হইয়া, প্রায় ধোবীতালাওয়ের নিকট পৌঁছিয়াছিল। অন্ধকারে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী সাহেবের আর কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। তখন সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। ক্রমে লোয়ার সার্কুলার রোডে আসিয়া পড়িয়া, একখানা চল্‌তি ঠিকাগাড়ী খালি পাইয়া, তাহা ভাড়া করিল। "জানানী-সোয়ারী"র মত সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ করিয়া, রাত্রি এগারটার সময় নিজ বাসায় আসিয়া পৌঁছিল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া, ভোরে উঠিয়া, মহেন্দ্র ধুতি গামছা আর তাহার মৃতা পত্নীর চিঠির বাণ্ডিলটি লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেল। জলে নামিয়া প্রথমে বাণ্ডিলটি গঙ্গাগর্ভে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। আফিসের সাহেবের নামে কর্ম্মত্যাগপত্র লিখিয়া উহা ডাকে দিয়া, নিজ জিনিষপত্র বাঁধিতে লাগিল। আহারান্তে, বাসায় পাওনাগণ্ডা মিটাইয়া দিয়া, জিনিষপত্রসহ ষ্টেশনে গিযা ট্রেণে উঠিল এবং সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ী পৌঁছিয়া জননীকে প্রণাম করিল।

মা বলিলেন, "কি বাবা, ছুটি নিয়ে এলি ?"

"না মা,—চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম। পরের এন্তাজারি আর পোষাল না।"

অমন চাকরীটা ছাড়িয়া আসাতে মা বড় দুঃখ করিতে লাগিলেন।

মেমসাহেবেব সেই হাজার টাকায়, চাষের জমি কিছু বাড়াইয়া হাল-গরু কিনিয়া মহেন্দ্র চাষবাস আরম্ভ করিয়া দিল এবং পরের মাসেই নিকটস্থ গ্রামের একটি সুন্দরী "ডাগব" মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিল।

বৎসর দুই পরে মহেন্দ্র তাহাদের গ্রামের লাইব্রেরীতে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে মেজর গ্রীণের নাম ছাপা দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া খবরটা পড়িল। ইহা বিলাতী সংবাদ-পত্র হইতে উদ্ধৃত। ভারতীয় সেনাবিভাগের মেজর গ্রীণ এক বৎসরের ফার্লো লইয়া, লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন; তিনি লণ্ডনের আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়া, বিবি এল্‌সি গ্রীণের সহিত তাঁহার বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়াছেন এবং কো-রেস্পণ্ডেন্ট, লয়েড্‌স্‌ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী টার্ণার নামক কোনও যুবকের বিরুদ্ধে হাজার পাউণ্ড খেসারতের ডিক্রী পাইয়াছেন।

পুলিনবাবুর পুত্রলাভ

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

পুলিনবাবুর বয়স যখন ১৫ বৎসর মাত্র, সেই সময়েই একটি ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। এখন তাঁহার বয়স ৩০ এবং পত্নী সুশীলাসুন্দরীর

বয়স ২৫ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি এই দম্পতি একটি সন্তানের মুখ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে দুইজনই মনক্ষুণ্ণ—বোধ হয় সুশীলাই বেশী।

পুলিনবাবু পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদ্র জমিদার। তবে, পাড়াগাঁয়ে বাস করিলেও তিনি নিজে পাড়াগেঁয়ে নহেন—কারণ, প্রথমতঃ গ্রামটি কলিকাতা হইতে অধিক দূর নহে—রেলে ৫।৬ ঘণ্টার পথ মাত্র; দ্বিতীয়তঃ বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া তিনি কিছুদিন লেখা-পড়া করিয়া, সভ্য ভব্য হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী সুশীলা নির্জ্জলা পাড়াগেঁয়ে।

আত্মীয় পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী যখন দেখিল যে সুশীলার ২০ বৎসর বয়স হইয়া গেল, তথাপি সন্তান হইল না, তখন সকলেই তাহাকে "বাঁজা" বলিয়া স্থির করিল। অনেকেই বলিতে লাগিল, পুলিনের আবার বিবাহ করা উচিৎ, নচেৎ বংশলোপ অনিবার্য্য। পুরুষেরা বলিল, পুলিন যদি স্ত্রীর ভয়ে বিবাহে বিরত থাকিয়া, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা নষ্ট করে, তবে তার তুল্য নরাধম আর জগতে নাই। স্ত্রীলোকেরা—যাঁহারা প্রবীণা হইয়াছেন—বলিতে লাগিলেন, স্বার্থের জন্য স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে না দেওয়া, সুশীলার অত্যন্ত গর্হিত কাজ হইতেছে এবং এরূপ কার্য্য শুধু বর্ত্তমান যুগেই সম্ভব—তাঁহাদের আমলে এরূপ ঘটিতে কখনও শোনা যায় নাই। তাঁহারা মাঝে মাঝে এই লইয়া সুশীলাকে মৃদু গঞ্জনা দিতেও ত্রুটি করেন না।

এইরূপে উত্যক্ত হইয়া, সুশীলা কিছু দিন হইতে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে; কিন্তু পুলিন সে কথা কাণেই তুলেন না।

সংসারে এখন সুশীলাই গৃহিণী। একটি বিধবা ননদ ও একটি বিধবা যা' আছে—তাহারা সুশীলার বয়ঃকনিষ্ঠ।

আজ গ্রামে একটা নিমন্ত্রণে গিয়া, সুশীলা কয়েকজন গিন্নিবান্নী রমণীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য শুনিয়া আসিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে রাজি করিবে, নচেৎ—

নচেৎ, গঙ্গায় ডুবিবে, অথবা বিষ খাইবে, অথবা পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে, তাহা সে এখনও স্থির করিতে পাবে নাই। রাত্রে আহারাদির পর শয্যায় প্রবেশ করিয়া, স্বামীর নিকট সুশীলা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

পুলিন বলিল, "দূর পাগলী!"

সুশীলা বলিল, "এটা আমার পাগলামি হল কিসে? বিয়ে করলে যদি একটি ছেলেব মুখ দেখতে পাও, বাপ-পিতামো যদি জলপিণ্ডি পান, সেটা কি তোমার করা উচিত নয়?"

পুলিন বলিল, "দেখ সুশী, বিয়ে আমি একটা কেন দশটা করতে পারি। কিন্তু জান ত, যেমন স্ত্রীলোক বাঁজা আছে, তেমনি পুরুষ বাঁজাও আছে। আমি যদি সেই রকম পুরুষ হই—তাহলে সে স্ত্রীরও সন্তান হবে না। চিরদিনের জন্যে মিছে কেবল তোমায় সতীনের যন্ত্রণা দিয়ে যাব সেটা কি ভাল?"

সুশীলা গম্ভীর ভাবে বলিল, "কে বললে তোমার ছেলে হবে না? তা ছাড়া, আমায় সতীনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তারই বা মানে কি? তুমি কি নতুন বউ এনে আমাকে আর খেতে দেবে না, না পরতে দেবে না, না আমায় বিষনয়নে দেখবে? সে রকম লোক তুমি নও, তা আমি বিলক্ষণ জানি।"

পুলিন পাশ ফিরিয়া, পাশের বালিস আঁকড়িয়া ধরিয়া বলিল, "রাত ১২টা বাজে, এখন একটু ঘুমতে দেবে? না, খালি গজর গজর করবে?"

সুশীলা চুপ করিয়া গেল।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

দুই দিন পরে বেলা ৯টার সময়, পুলিন তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া দুই একজন প্রতিবেশীর সহিত আরামে ধূমপান ও গল্পগুজবে মগ্ন আছে—এমন সময় অন্তঃপুর হইতে তাহার তলব আসিল। হুঁকাটি একজনের হাতে দিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, নিম্নতলের ঢাকা বারান্দার উপর একখানি কুশাসন বিছাইয়া, গ্রামের দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি লইয়া বসিয়া আছেন—সুশীলা, কক্ষমধ্যে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া।

পুলিন বারান্দায় উঠিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই যে! প্রণাম হই। কতক্ষণ আসা হয়েছে?"—বলিয়া, তাঁহার পানে চাহিয়া, অন্যের অলক্ষিতে একটু হাসিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর হস্তসঙ্কেতে আশীর্ব্বাদ করিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "বেশীক্ষণ নয়—এই ঘণ্টাখানেক হল এসেছি বাবা। মা লক্ষ্মী কালই আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা কাল আর সময় পাইনি, আজ এসেছি।"

পুলিন ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তলব কেন গিন্নী? দৈবজ্ঞ ঠাকুরকেই বা আনিয়েছ কেন? নিজের একটা সতীন-টতীন ঠিক করেছ নাকি? ঠিকুজী কুষ্ঠী মেলাবে?"

সুশীলা বলিল, "হ্যাঁ, মেলাব। তুমি এখন হাত পা ধুয়ে একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে ঐ তসরের কাপড়খানা পর দেখি!"

পুলিন বলিল, "সুবোধ ও সুশীল স্বামী সর্ব্বদা স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া বেড়ায় এবং কখনও তাহার কথার অবাধ্য হয় না। সে যা পায় তাই খায়—গালিগালাজ, সম্মার্জ্জনী কিছুতেই আপত্তি করে না।—তা, আমি তসরের কাপড় পরে কি করবো?"

সুশীলা বলিল, "দৈবজ্ঞ ঠাকুর তোমার হাত দেখবেন।"

পুলিন বলিল, "হাত দেখবেন? কি সর্ব্বনাশ! কই, আমি ত নিজের কোনও অসুখ বিসুখ বুঝতে পারছিনে! ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে! দোহাই তোমার—আমার ভাতটি যেন বন্ধ কোর না!"

সুশীলা বলিল, "যাও—যাও, বুড়ো বয়সে আর ঢং দেখে বাঁচিনে! সে হাত দেখা নয়। হাত দেখে, উনি অদৃষ্টের ফলাফল বলে' দেবেন।"

পুলিন শুনিয়া হাসিল। বলিল, "তুমি ত জান সুশী ও সবে আমার বিশ্বাস ফিশ্বাস নেই। মিছে কেন আমায় কর্ম্মভোগ করাবে?"

সুশীলা বলিল, "তোমার বিশ্বাস নেই, আমার আছে। আমি যা বলি তা কর।"

স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে অবশেষে পুলিনকে বাধ্য হইয়া তসর পরিয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সম্মুখে গিয়া বসিতে হইল।

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "দাও দেখি বাবা! ডান হাতখানি দাও।"

পুলিন হাত বাড়াইয়া দিল। সেখানি লইয়া ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "যদিও বউমা, তোমার পুত্রভাগ্যটা জানবার জন্যেই বিশেষ ব্যস্ত হয়েছেন, তথাপি পরমায়ুটাই আগে পরীক্ষা করতে হয়। কেননা শাস্ত্র বলেছেন—পূর্ব্বমায়ুঃ পরীক্ষেত পশ্চাল্লক্ষণমেব চ। বাঃ—এই যে বুড়ো আঙ্গুলে ধনুরেখা রয়েছে। শাস্ত্র বলেছেন,

ধনুর্যস্য ভবেৎ পাণৌ, পঙ্কজং বাথ তোরণম্।
তস্যৈশ্বর্য্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ অশীত্যায়ুর্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

বাবা, এতে ক'রে তোমার রাজোচিত ঐশ্বর্য্য, আর আশী বছর পরমায়ু সূচিত হচ্চে। আচ্ছা, এইবার তবে পুত্রভাগ্যটা দেখি।"—বলিয়া তিনি পুলিনের পাণিপার্শ্ব অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন।—তারপর, হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া, সুশীলার পানে চাহিয়া বলিলেন, "একটি পুত্রসন্তান তোমার স্বামীর অদৃষ্টে ত রয়েছে দেখছি মা!"

সুশীলা ঘোমটার ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহ ক'টি?"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর আরও কিছুক্ষণ হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বিবাহ ত একটিই দেখছি। আচ্ছা, এস ত মা, তোমার হাতখানি আর একবার দেখি!"

সুশীলা আসিয়া, নিজ বাম হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর সেখানি লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "নাঃ—আমার ভুল হয়নি। তুমিই তোমার স্বামীর সন্তানের জননী হবে, মা! এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।"

অতঃপর দৈবজ্ঞ ঠাকুর দক্ষিণান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পুলিন, তসর ছাড়িয়া নিজ সাবেক বস্ত্র পরিধান করিতেছিল, সুশীলা তাহার কাছে গিয়া বলিল, "বলি হ্যাঁগা —দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে কত টাকা ঘুষ খাইয়েছ?"

পুলিন বলিল, "ঘুষ! ঘুষ আমি কি জন্যে খাওয়াব?"

"নইলে, আমার ২৫ বছর বয়স হল, এখনও আমি সন্তানের জননী হব বলে গেল কেন?"

পুলিন বলিল, "বাঃ—সে আমি কি জানি? আমি ত তোমায় সাফ বলেছি আমি ও সব বুজরুকি বিশ্বাস করিনে। তুমি নিজেই বল যে তোমার বিশ্বাস হয়;—এখন তুমি জান আর তোমার দৈবজ্ঞ ঠাকুরই জানে—আমি কি জানি?"—বলিয়া পুলিন বাহির হইয়া গেল।

সুশীলা বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। তারপর ডাকিল, "গেনির মা!"

ঝি, গেনির মা আসিয়া বলিল, "কেন গিন্নীমা?"

"তুই কাল দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে ডাকতে গিয়েছিলি, কর্ত্তা কি তা জানতে পেরেছেন?"

গেনির মা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কত্তা জানতে পেরেছেন?—তা, কেমন করে বলবো মা? ওঃ—হাঁ—মনে হয়েছে। ঠিক ত! কাল যখন আমি দৈবজ্ঞ ঠাকুরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠেছি, সামনেই দেখি কত্তা মোশাই—লাঠি হাতে করে কোথা থেকে বেড়িয়ে আসছেন। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গেনির মা, এখানে কি করতে এসেছিলি? আমি মাথাটি নীচু করে বল্লাম, আজ্ঞে মাঠাকরুণ দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই বলতে এসেছিলাম।"

সুশীলা রুষ্টস্বরে বলিল, "কই আমাকে ত এসে সে কথা তুই বলিসনি!"

গেনির মা বলিল, "ভুলে গেছনু মা—ভুলে গেছনু। আর মা, এখন কি আর সব কথা মনে থাকে ছাই! দশ গণ্ডাই হবে কি বিশ গণ্ডাই হবে বয়স হল, এখন তোমাদের রেখে যেতে পারলেই বাঁচি মা!"

অতঃপর সুশীলা, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের দশম বর্ষীয় পৌত্র উমাপদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সমস্ত কথাই সে প্রকাশ করিল। গতকল্য বিকালে জমিদার-বাবু তাহাদের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং বৈঠকখানায় বসিয়া তাহার পিতামহের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, উপরন্তু উঠিবার সময় দশটি টাকা প্রণামী দিয়া আসিয়াছেন।

শুনিয়া সুশীলা মনে মনে বলিল, "হুঁ—সুশীলা বামনী আবার জানে না কি! কেবল মরবে কবে তাই জানে না। আমার সঙ্গে এই চালবাজি। আচ্ছা আসুক মিন্সে বাড়ীর ভিতর!"

স্ত্রীর পীড়াপীড়ি ও জেরায় পড়িয়া, অবশেষে "মিন্সে"কে স্বীকার করিতেই হইল যে ঘুষ দিয়া মিথ্যা সাক্ষী সৃষ্টি করা রূপ দুষ্কার্য্য সে করিয়াছে এবং নাক কাণ মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, এরূপ কার্য্য আর কখনও তাহার দ্বারা হইবে না।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

আষাঢ় মাস। আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। সুশীলা তখন শয়নকক্ষের জানালার কাছে বসিয়া আকাশের গায়ে নীরদ ও সৌদামিনীর খেলা দেখিতেছিল। তার মনটা বড় ভাল নাই—কারণ তার স্বামী "৩।৪ দিনে ফিরিব" বলিয়া একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, আজ সপ্তাহ অতীত হইল, আজিও তিনি ফিরিলেন না, বা কোন সংবাদও পাঠাইলেন না।

এই সময় গেনির মা আসিয়া প্রবেশ করিল। সে ধীরে ধীরে প্রভুপত্নীর নিকট অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, "মা, একটা বিষম খপর শুনে এলাম এখনি!"

সুশীলা তাহার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর গেনির মা?"

"কত্তা নাকি শুনলাম, কলকাতায় গিয়ে একটা বিয়ে করেছেন?"

"বিয়ে করেছেন? ধুৎ—কে বললে তোকে? স্বপ্ন দেখছিস নাকি?"

"না সপ্‌নি কেন দেখব মা! ঘোষেদের ঝি পেসন্ন বল্লে।"

"কি বললে?"

"ঘোষজা মশাই ত মাসখানেক বাড়ী ছিল না কিনা,—হাইকোর্টে তেনার শালার কি মোকদ্দমা চলছিল, তাই সে সেখানে গিয়েছিল। কাল বিকেলে ফিরে এসেছে। এসে ঘোষগিন্নীর সঙ্গে বলাবলি করছিল, তাই পেসন্ন বাইরে থেকে শুনেছে।"

সুশীলা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি পেসন্ন বললে গেনির মা?"

গেনির মা বলিল, "আর কি কি বললে?—মনে করে দেখি দাঁড়াও! দশ গণ্ডা বছর বয়স হল! কোনও কথা কি মনে রাখতে পারি ছাই। হ্যাঁ হ্যাঁ—আর বললে যে, বউ নাকি বেশ ডাগর সাগর, যেমনি উপ্ তেমনি নেকাপড়া জানে।"

শুনিয়া সুশীলার মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। তার চোখ দিয়া প্রায় জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এতদিন যে জন্য আমি অনুনয় বিনয় করিতেছি—সেই কার্য্য করিলই শেষে—তবে ওরূপ ভাবে, আমাকে লুকাইয়া করিবার কি দরকার ছিল? কলিকাতা যাইবার সময় সকল কথা খুলিয়া বলিলেই ত হইত। এরকম ভাবে আমাকে অপমান করিল কেন?

আহারাদি শেষ হইলে সুশীলা ঘোষগৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এই গ্রামের আর একজন ক্ষুদ্র জমিদার। পুলিন ইহাকে দাদা সম্বোধন করিয়া থাকে।

খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া বাগানে বাগানে সেই বাড়ীতে যাওয়া যায়। সুশীলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘোষগৃহিণী আহারান্তে পাণ খাইতে খাইতে তাঁহার ময়না পাখীকে পড়াইতেছেন। সুশীলাকে দেখিয়া তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরম সমাদরে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ সাধারণ ভাবের কথাবার্ত্তার পর সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "শুনলাম বট্‌ঠাকুর কলকাতা থেকে ফিরেছেন। আমাদের ওঁরা আজ এক সপ্তাহ হল কলকাতায় গেছে; ৩।৪ দিনে ফেরবার কথা, তা আজও ফিরলো না, আমি ত তাই ভেবে মরছি দিদি!"

ঘোষগৃহিণী বলিলেন, "না কিছু ভাবনা নেই, ঠাকুরপো ভালই আছেন, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে!"

"দেখা হয়েছিল?—যা হোক ভাল আছে শুনে তবু নিশ্চিন্ত হলাম। ওর সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল দিদি, তা কিছু বললেন বট্‌ঠাকুর?"

"হ্যাঁ—বললে, পরশু বুঝি। কোথায় নেমন্তন্ন ছিল, সেইখানে দুজনে দেখা হয়।"

"নেমন্তন্ন ছিল? কিসের নেমন্তন্ন ভাই?"

ঘোষগৃহিণী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কে জানে বিয়ের না কিসের!"

"কবে আসবে তা কিছু শুনলে?"

"হ্যাঁ—বললেন তাঁর আসতে এখনও হপ্তাখানেক দেরী আছে।"

সুশীলা মনে মনে হিসাব করিল—"পরশু বিয়ে হয়ে গেছে—কাল গেছে কালরাত্রির —আজ ফুলশয্যে—শ্বশুরবাড়ীতে অষ্টমঙ্গলা সেরে বাড়ী ফিরতে এখনও হপ্তাখানেক দেরী ত আছেই বটে।"

ঘোষগৃহিণী বলিলেন, "কেন, তোমরা কি তাঁর কোনও চিঠিপত্র পাওনি?"

"না দিদি, গিয়ে অবধি একখানি চিঠিও লেখেনি।"—বলিয়াই সুশীলা আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না—ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ঘোষগৃহিণী বলিল, "ওকি—ওকি ভাই কাঁদছ কেন? এই ঠিক দুপুর বেলায়, স্বামীর কথা কইতে কি কাঁদতে আছে? তাতে তাঁর অমঙ্গল হবে যে!"—বলিয়া তিনি স্নেহের হস্তে সুশীলার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।

সুশীলা নিজ অঞ্চলেও মুখ চক্ষু মুছিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দিদি, একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—তুমি সত্যি বলবে? যদি মিথ্যে বলবে ত আমার মাথা খাবে। তোমার মা কালীর দিব্বি, মা মনসার দিব্বি, বাবা তারকনাথের দিব্বি, বাবা বিশ্বনাথের দিব্বি—সে নাকি আবার বিয়ে করেছে?"

এই সকল ভীষণ দিব্যগুলি শুনিয়া ঘোষগৃহিণীর মুখখানি অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি মুখখানি নত করিয়া বলিলেন, "তোমায় কে বললে এরই মধ্যে?"

"সে যেই বলুক। কথাটা সতি ত?"

"উনি ত বললেন ভাই। কারু কাছে প্রকাশ করতে আমায় মানা করেছিলেন, আমি ত কাউকে বলিনি, তবে তুমি শুনলে কি করে তুমিই জান, আর ভগবান জানেন। আর কেউ দেখে এসে বলেছে বোধ হয়। এ সব কথা কি আর চাপা থাকে? বলে ধর্ম্মের ঢাক আপনি বেজে উঠে।"

"তাই বেজেছে দিদি। আমি যখন জানতেই পেরেছি তখন আর আমার কাছে লুকিয়ে কি হবে? যা যা তুমি শুনেছ সব আমায় বল।"

ঘোষগৃহিণী যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই—বিবাহ করিবার কোনও ইচ্ছাই পুলিন-বাবুর ছিল না কেবল ঘটনাচক্রেই ইহা হইয়া গিয়াছে। গিয়াছিলেন একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে—পুলিনবাবুও ঘোষ মহাশয়ও। কন্যার পিতা তাদৃশ ধনবান নহেন কিন্তু কন্যাটি খুব সুন্দরী আর লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছে, বয়সও একটু হইয়াছে—১৫।১৬ বছরের কম হইবে না। ঘড়ি আংটি প্রভৃতি দান-সামগ্রী একটু খেলো হইয়াছিল বলিয়া বরের বাপ আরও ২০০্ অতিরিক্ত দাবী করিয়া বসেন। এই লইয়া বরপক্ষ কন্যাপক্ষে বিবাদ ও গালাগালি হওয়াতে, বরপক্ষ বর উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করেন। মেয়ের জাত যায় দেখিয়া, সভাস্থ সকলের অনুরোধে পুলিনবাবু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই সেই মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন।

এই বিবরণ শেষ করিয়া ঘোষগৃহিণী বলিলেন, "তা ভাই, তুমি কিছু দুঃখ কোর না; জন্ম মৃত্যু বিবাহ—এগুলো ভবিতব্য কিনা, এতে মানুষের হাত নেই। তোমায় ত ভগবান ছেলে-পিলে দিলেন না। দেখ, এইবার যদি তোমার শ্বশুরের বংশটা রক্ষা হয়,—এতে দুঃখ করা তোমার উচিত নয়।"

সুশীলা বলিল, "না না, তার জন্যে আমি দুঃখ করবো কেন? আমি নিজেই ত তাকে কতদিন থেকে বলছি ওগো বিয়ে কর, বিয়ে কর—তবু সে করলে না। ঘটনাচক্রে এবার হয়ে গেল।"

বাড়ী ফিরিয়া সুশীলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে, তাই কি ঠিক? অত বড় কলকাতা সহরে, সে ছাড়া কি আর কোনও পাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না?"

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

বাড়ী ছাড়িবার ঠিক তেরো দিন পরে, পুলিন ফিরিয়া আসিল। তাহার অঙ্গে একটি নূতন সিল্কের পাঞ্জাবী, পরিধানে জাড়িপাড় ধুতি, স্কন্ধে জাড়িপাড় উড়ানি, পায়ে নূতন একযোড়া পাম্প শু এবং হাতের কব্জীতে নূতন সোণার ঘড়ি। এতদ্ভিন্ন, তাহার হাতে একটি নূতন চামড়ার ব্যাগও ছিল। সুশীলা তাহার স্বামীর এরূপ সৌখীন বেশভূষা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। অনুমান করিল, এগুলি হয়ত নূতন শ্বশুরবাড়ী হইতে প্রাপ্ত—অথবা, উক্ত মধুপুরীতে গমন উপলক্ষে ক্রীত। হাতের ব্যাগ মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া পুলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

সুশীলা শুষ্কস্বরে বলিল, "ভাল আছি। এত দেরী তোমার?"

"কাজের ঝঞ্ঝাটে"—বলিয়া পুলিন বস্ত্রপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

সুশীলা ভারি গলায় বলিল, "তা, দেরী করলে বেশ করলে, একখানা চিঠি লিখেও ত খবরটা দিতে হয়। আমি যে এদিকে ভেবে মরি!"

চটিজুতা পায়ে দিয়া, শয্যাপ্রান্তে বসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে পুলিন বলিল, "ওঃ—তুমি বুঝি ভাবছিলে? তা, অতটা আমার খেয়াল হয়নি।"

সুশীলা মনে মনে বলিল, "নূতন রসে মজে' ছিলে—পুরানোর কথা আর খেয়াল হবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল, "গিয়েছিলে ত বন্ধুর ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। তায়, এত কি ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলে, শুনি?"

পুলিন আমতা আমতা করিয়া বলিল, "ঝঞ্ঝাট—অর্থাৎ—খবর পেলাম কি জান? শুনলাম, হিমালয়ের জঙ্গলে একটা মস্ত বড় সাধু আছেন—৩০০ বছর বয়স—তিনি, ছেলে হবার জন্যে যে কবচ দেন তা একেবারে অব্যর্থ। তাই, সেই কবচ আনবার জন্যে সেই জঙ্গলে গিয়েছিলাম। উঃ—সে বিরাট জঙ্গলে যেতে তিন দিন, আসতে তিন দিন। তাই তো তোমায় চিঠি লিখতে পারিনি—সেখানে ত খাম পোষ্টকার্ড পাওয়া যায় না!"

সুশীলার মন, ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। একে ত এই প্রবঞ্চনা—তার উপর এত মিথ্যা কথার সৃষ্টি! ছি ছি! সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "সেই জঙ্গলে বোধ হয় ভাল ভাল কাপড় চাদর, পম্প শু, হাতঘড়ি-টড়ি খুব সস্তা? সেখানেই এ সব কেনা হল নাকি?"

পুলিন বলিল, "নাঃ—এ সব কলকাতাতেই কিনেছিলাম। তা তোমার জন্যেও কিছু কিনে আনবো ভেবেছিলাম, কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেল!"

সুশীলা মনে মনে বলিল, 'এখন ত ফুরবেই!' প্রকাশ্যে বলিল, "সে ভালই হয়েছে। বেলা হল, এখন স্নান করে ফেল।"

"হ্যাঁ—স্নান করে' দুটি খেয়ে শুয়ে পড়ি। গাড়ীতে রাত্রে ত ঘুম হয়নি।"

সুশীলা মনে মনে বলিল, "শুধু কাল রাত্রি কেন? ষোলবছুরী অপ্সরী পেয়েছ—তার আগেরও ক' রাত সে কি আর তোমায় ঘুমুতে দিয়েছে?"

পুলিন উঠিয়া স্নানাহার করিল, তার পর শয্যায় লম্বমান হইয়া, অবিলম্বেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল।

সুশীলা সেদিন আহারে বসিল বটে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র—কিছুই খাইল না। বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা এ সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "শরীরটে ভাল নেই। বোধ হয় জ্বর হবে।"

আহারান্তে সুশীলা নিজ শয়নকক্ষে গেল না, পাশের ঘরে গিয়া একখানা মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিল। কিন্তু ঘুমাইতেও পারিল না। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন হুহু করিতেছিল—সর্ব্বশরীরে যেন জ্বালা ধরিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক এইরূপ শয্যা-কণ্টকের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিবার পর, সে উঠিল। বাড়ীর অন্যান্য সকলে নিদ্রিত।

সুশীলা নিজ শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। পালঙ্কোপরি স্বামী নিদ্রিত—তাহার মুখে মাঝে মাঝে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে—বোধ হয় সে কোনও স্বপ্ন দেখিতেছে। সুশীলা স্থির করিল, নিশ্চয়ই সেই ষোলবছুরী পরীকেই স্বপ্ন দেখিতেছে। ইচ্ছা হইল, স্বামীর সেই হাসিমুখে এক কিল মারিয়া তার মুখের দাঁত ও সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দেয়!

শয্যার নিকটেই টেবিলের উপর, নূতন চামড়ার ব্যাগটি ছিল; সুশীলা তাহা লইয়া, পার্শ্বের কক্ষে গিয়া, খুলিয়া ফেলিল; অন্যান্য জিনিষের সহিত তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল, কয়েকখানি ছাপা রঙীন কাগজ ও একখানি ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফখানি একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতিমূর্ত্তি, বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইবে। সুন্দর একখানি বারাণসী শাড়ী পরা, সর্ব্বাঙ্গে ভাল ভাল অলঙ্কার। সুশীলা নিশ্চয় করিল, ইহাই বিবাহ সজ্জায় সজ্জিতা তাহার নব পত্নীর ছবি। সে প্রায় এক মিনিট ধরিয়া, ছবিখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া, তাহার রূপের খুঁৎ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার মুখের হাসি ও দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়া রাগে সুশীলার গা জ্বলিয়া উঠিল—গৃহস্থ ঘরের মেয়ের অত ঢং কেন? সে শুনিয়াছিল, আজকাল কলিকাতা সহরের মেয়েরা যখন থিয়েটার বায়স্কোপ বা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে যাইবার জন্য সাজগোজ করিয়া বাহির হয়, তখন তাহারা কুলবধূ অথবা বাইজী তাহা চেনা দুষ্কর। সুশীলা অস্ফুট স্বরে বলিল—মুখে আগুন! মুখে আগুন!

লাল সবুজ হলদে কাগজগুলি খুলিয়া দেখিল, সেগুলি বিবাহের 'প্রীতি উপহার' 'স্নেহাশীষ' প্রভৃতি। উপরে ছাপা আছে "শ্রীমান ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর শুভ পরিণয়"—কিন্তু ইন্দুভূষণ লাল কালী দিয়া কাটিয়া তাহার উপর হাতের লেখায় "পুলিনবিহারী"।

জিনিষগুলি সমস্ত ব্যাগের মধ্যে পুনঃস্থাপন করিয়া, সুশীলা চোরের মত সন্তর্পণে গিয়া উহা পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া আসিল। তার পর ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া, খালি মেঝের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া, ফুঁপাইযা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

রাত্রে আহারের পর, পুলিন শয্যাপ্রান্তে বসিয়া গুড়গুড়িতে তামাক সেবন করিতে-ছিল, সুশীলা আসিয়া সেই শয্যার অপর প্রান্তে বসিয়া বলিল, "তুমি এমন জোচ্চোর হলে কবে থেকে?"

পুলিন বলিল, "কেন, কি জুচ্চুরি করলাম?"

"কলকাতায় গিয়ে তুমি বিয়ে করে আসনি?"

পুলিন বলিল, "বিয়ে? বিয়ে কি? কখন আবার বিয়ে করলাম? স্বপ্ন দেখছ নাকি?"

সুশীলা বলিল, "তাই বোধ হয়। তা, বিভাবতীকে বেশ পছন্দ হয়েছে ত?"

পুলিন দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "বিভাবতী কে?"

"ন্যাকামি রাখ না! তুমি ভেবেছ ডুবে ডুবে জল খাবে শিবের বাবাও টের পাবে না!—কিন্তু ধর্ম্মের ঢাক যে আপনি বেজে ওঠে! আমি সব জানি—সব শুনেছি" বলিয়া সুশীলা, গ্রেনির মা ও ঘোষগৃহিণীর নিকট যাহা শুনিয়াছিল সমস্তই বলিল।

শুনিয়া পুলিন মাথাটি নীচু করিয়া অপরাধীর মত বসিয়া রহিল। অবশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই জন্যেই বলে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! তোমারই অনুরোধে এ কাজ করা—আর তুমিই আমায় দুষছো?"

সুশীলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "আমার অনুরোধেই যদি করা, ত আমার কাছে এত লুকোচুরি কি জন্যে?"

"সেটাও তোমার ভাল ভেবেই করছিলাম, সুশীলা। ভেবেছিলাম এখন তোমায় কিছু বলবো না—সে বউ সেইখানেই থাকবে; তার পর, একটি ছেলে হলে, তখন সব তোমায় ভেঙে বলবো। হাজার হোক তুমি স্ত্রীলোক বই ত নও—সতীন হয়েছে শুনলে পাছে এখন তুমি দুঃখ পাও—সেই ভেবেই গোপন করেছিলাম আর কি!"—বলিয়া পুলিন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আবার তামাক টানিতে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে, পত্নীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে তখনও কাঠের পুতুলের মত সেই এক ভাবেই বসিয়া আছে। বলিল, "রাত হল, শোও, এখনও বসে কেন?"

সুশীলা কহিল, "তুমি শোও। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।"

পুলিন বলিল, "দিনের বেলা খুব ঘুমিয়েছি—এখনও আমার ঘুম পায়নি। তামাকটা খেয়ে নিয়ে, তার পর একখানা চিঠি শেষ করে শোব এখন, তুমি ততক্ষণ শোও না!"

সুশীলা বলিল, "ওঃ—চিঠি লিখতে হবে? তা, আমি এ ঘরে উপস্থিত থাকলে, তোমার অসুবিধে হবে না? বেশ প্রাণ খুলে প্রাণের কথা লিখতে পারবে কি? সে দরকার নেই, আমি ও ঘরে গিয়ে শুচ্চি—তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে তোমার প্রেমপত্র লেখ।" বলিয়া সুশীলা নামিয়া, সজোর পদক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সশব্দে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

স্বামী স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা আর বড় নাই। মুখ দেখাদেখিও এক রকম বন্ধ বলিলেই হয়। এই ভাবে এক সপ্তাহ কাটিল। সুশীলাদের শয়নকক্ষ ছিল ত্রিতলে, অন্যান্য সকলে দ্বিতলে বা নীচের ঘরে শয়ন করিত, সুতরাং এই দম্পতীর এরূপ মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদের সংবাদ কেহ জানিতে পারিল না।

প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে আহারেব পর, পুলিন ঘণ্টা দুই আড়াই দিবানিদ্রা উপভোগ করিত। সুশীলা মাঝে মাঝে এটা ওটা লইবার বা রাখিবার জন্য, সে ঘরে প্রবেশ করিত, এবং কাজ সারিয়াই চলিয়া যাইত।

আজ দ্বিপ্রহরে এইরূপে স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, দ্বার হইতে সে দেখিল, স্বামী নিদ্রিত—কিন্তু তাহার বুকের উপর কি একটা জিনিষ রহিয়াছে। আস্তে আস্তে শয্যার নিকট গিয়া দেখিল, উহা একখানা কালো মোটা পেষ্টবোর্ড—তাহাতে ইংরাজিতে কি সব ছাপা রহিয়াছে।

সুশীলা অতি সন্তর্পণে সেখানি স্বামীর বুক হইতে উঠাইয়া লইয়া দেখিল, তাহার অপর দিকটায়—সেই সুন্দরী "ষোলবছুরী"র ফটোগ্রাফ!

আবার সন্তর্পণে ফটোগ্রাফখানি স্বামীর বুকে রাখিয়া দিয়া সুশীলা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অপরাহ্নে পুলিন নিদ্রাভঙ্গের পর হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া বিছানায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। সুশীলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, স্বামীর শয্যার নিকট দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "আমি বাপের বাড়ী যাব।"

পুলিন দেখিল, সুশীলার মুখ চোখ স্ফীত—সে বোধ হয় অনেক কাঁদিয়াছে। বলিল, "হঠাৎ এ মতলব?"

"আমি আর এখানে থাকবো না।"

"কেন? কি হল আবার?"

"আমি কারু সুখের কণ্টক হয়ে থাকতে চাইনে!"

"কেন, কার আবার সুখের কণ্টক হলে তুমি?"

"তোমার! আর কার? আমি রয়েছি বলেই ত তোমার বিভাবতীকে এখানে আনতে পারছ না!"

"আমার বিভাবতী আবার কে?—ওঃ বুঝেছি।—তা, আমি তাকে এখানে আনবার জন্যে ছটফট করছি তুমি কিসে বুঝলে?"

"দুধের সাধ কি আর ঘোলে মেটে? ফটোগেরাপ বুকে করে শুয়ে থাকার চেয়ে, তাকে এখানে নিয়েই এস,—এসে সুখে রাজ্যি ভোগ কর। আমি তোমার আপদ বালাই, আমি দূর হয়ে যাই।"—বলিয়া সুশীলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"ওকি সুশী ছি ছি—কাঁদ কেন?" বলিয়া পুলিন খপ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিল। সুশীলা সজোরে আপন হাত ছাড়াইয়া লইয়া, পশ্চাতে হটিয়া, গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আমায় ছুঁও না বলছি খপর্দ্দার।"

"কেন? তাতে দোষ কি?"

"যে স্বামী অন্য স্ত্রীলোককে ছুঁয়েছে, তাকে আমি ছুঁতে চাইনে! তাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।"

পুলিন বলিল, "ওঃ—এই ব্যাপার! স্পর্শদোষ? তবে যে আগে তুমি বিয়ে করবার জন্যে আমায় অত পীড়াপীড়ি করতে? এখন বিয়ে যদি করলাম, তায় আমার এত অপরাধ হল?"

সুশীলা বলিল, "বিয়ে করতেই বলেছিলাম; তার ফটোগেরাপ বুকে করে ঘুমুতে তোমায় বলিনি ত! সে সব কথা ছেড়ে দাও—যার যা অদৃষ্টে ছিল তাই হয়েছে। এখন আমার আর এখানে একদণ্ড থাকতে ইচ্ছে নেই—আমি বাপের বাড়ী যাব। তুমি যদি আমায় রেখে আসতে না পার, বল আমি অন্য উপায় দেখবো।"

পুলিন কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া কি চিন্তা করিল। শেষে বলিল, "তা বেশ, আমিই রেখে আসবো এখন। বল কবে যেতে চাও।"

"কালই।"

"বেশ, উত্তম কথা। কালই তোমায় নিয়ে যাব। তোমার কিছু ভয় নেই—গাড়ীতে দু'জনে একটু তফাতে তফাতে বসলেই হবে,—স্পর্শদোষটা ঘটবে না।"

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন পুলিন, সুশীলাকে লইয়া যাত্রা করিল। সুশীলার পিত্রালয়ে যাইতে হইলে হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া শিয়ালদহে গিয়া আবার অন্য গাড়ীতে চড়িতে হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন পুলিন সুশীলাকে লইয়া গিয়াছে, অথবা পিত্রালয় হইতে আনিয়াছে তখন এই সুযোগে পথে কলিকাতায় ২।১ দিন যাপন করিয়া, তাহাকে থিয়েটর সার্কাস প্রভৃতি দেখাইত।

বেলা দশটার সময় হাওড়ায় নামিয়া, পূর্ব্ব প্রথামত, পুলিন সুশীলাকে লইয়া, "আর্য্য আশ্রম" নামক বাঙ্গালী হোটেলে গিয়া উঠিল। পর্দ্দানশিনা স্ত্রীলোকগণের জন্যও সেখানে উত্তম বন্দোবস্ত আছে।

আহারাদির পর উভয়ে বিশ্রামার্থ পৃথক পৃথক শয্যায় শয়ন করিল। পুলিন বলিল, "সুশী, শেষকালে তোমার মনে কি এই ছিল?"

সুশীলা বিরক্তিভরে বলিল, "কি আবার?"

"তুমি আমায় এমন ভাবে ত্যাগ করবে জানলে কি আমি আবার বিয়ে করি? এমন বিয়ে করে লাভ?"

"বিয়ে করে ত সুখী হয়েছ তুমি!—সেই লাভ।"

পুলিন আর কিছু না বলিয়া, পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

নিদ্রাভঙ্গে উভয়ে নিজ নিজ শয্যায় উঠিয়া বসিলে, সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের গাড়ী ক'টায়?"

"রাত ন'টায়।"

"তুমি একবার সেখানে যাবে না?"

"কোথায়?"

"তোমার বিভাবতীর কাছে!"

পুলিন খুসী হইয়া বলিল, "তুমি সুদ্ধ যাও যদি, ত যাই। চল না, দেখে আসবে তাকে। তোমায় সে দিদি বলতে অজ্ঞান। কলকাতা থেকে যেদিন আমি ফিরে যাই, সেদিন সে কত যে কাঁদলে। বললে, 'আমায় এখানেই ফেলে রাখলে, দিদিকে ত আমি দেখতে পাব না, তাঁর একদিন সেবাও করতে পাব না!'—তার কথাবার্ত্তায় বুঝতে পেরে-ছিলাম, তোমায় সে খুব ভক্তি করে। চল না সে তোমায় দেখলে কত খুসী হবে।"

সুশীলা বলিল, "আমার গলায় একগাছা দড়ি আর একটা কলসী কি জোটে না ভেবেছ তুমি—যে তার সঙ্গে যাব আমি দেখা করতে?"

পুলিন ক্ষুণ্নস্বরে বলিল, "তবে থাক্।"

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। শেষে সুশীলা বলিল, "তুমি যাও না, গিয়ে দেখা করে এস। এখন ত মোটে ৪টে—আমাদের গাড়ীর এখনও ৫ ঘণ্টা দেরী।"

পুলিন বলিল, 'এখন থাক্—সে তোমায় পৌঁছে দিয়ে ফেরবার পথেই হবে এখন।" —বলিয়া তামাক সাজিতে বসিল। পূর্ব্বে ভৃত্যাদি না থাকিলে সুশীলা নিজে তাহাকে তামাক সাজিয়া দিত, এখন আর দেয় না।

তামাক সাজিয়া, কিয়ৎক্ষণ ধূমপানের পর পুলিন বলিল, "সুশীলা, তোমায় আমায় এখন থেকে বোধ হয় চির-বিচ্ছেদ?"

সুশীলা কঠোর স্বরে বলিল, "একরকম তাই বইকি!"

"আমার শেষ অনুরোধ একটি রাখবে?"

"কি?"

"চল তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে ফটোগ্রাফ তোলাই। আগে যখনি কলকাতায় এসেছি, তখনই ওকথা তুমি আমায় বলেছ—কিন্তু একবারও হয়ে ওঠেনি।—একখানা ফটোগ্রাফ থাকলে তবু, চিহ্ন ত একটা থাকবে!"

সুশীলা নীরব রহিল। তাহার মৌন সম্মতি জানিয়া পুলিন বলিল "তবে তোমার বেনারসীখানা বের করে পর—আর খানকতক গহনা-টহনাও পরে নাও।"

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া সুশী বলিল, "সে সব কিছু আমি পারবো না।"

পুলিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমার উপর ত এখন আর আমার কোনও জোর নেই। আচ্ছা, তবে গাড়ী ডাকতে পাঠাই?"

গাড়ী আনাইয়া সুশীলাকে লইয়া পুলিন হাতীবাগানে এক ফটোগ্রাফের দোকানে গিয়া উঠিল।

ফটোগ্রাফওয়ালা খাতির করিয়া উভয়কে একটি কামরায় লইয়া গিয়া বসাইল। তাহার সহকারী পার্শ্বের ষ্টুডিও মধ্যে ক্যামেরা ঠিক করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই উভয়ের ফটোগ্রাফ তোলা হইয়া গেল।

বিশ্রামকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে আবার উপবেশন করিল। ফটোগ্রাফওয়ালা বলিল, "লেমনেড, বরফ, কি চা—কিছু আনিয়ে দেবো?"

পুলিন বলিল, "না।—দেখুন, এই যে সেবার আপনার দোকান থেকে আমি এই ফটোখানা কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম—এ নিয়ে ত মহাতর্ক উপস্থিত হয়েছে, মশাই!"—

বলিয়া পুলিন, পকেট হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। সুশীলা ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চোখে দেখিল—ইহা সেই বিভাবতীর ফটোগ্রাফ।

ফটোগ্রাফওয়ালা বলিল, "কেন, তর্ক কিসের?"

পুলিন বলিল, "আপনি ত বলেছিলেন যে এখানি ষ্টার থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেস হেনাবালার?"

"হেনারই ত। কেন কি হয়েছে?"

"আমার এক বন্ধু বলেন, এখানি মিনার্ভার সুধামুখীর ছবি।"

ফটোওয়ালা বলিল, "না না—সুধার এ চেহারা? এ হেনার ফটোগ্রাফ—যে হেনা এখন ষ্টারে বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী সাজছে। নগেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ের পর কুন্দনন্দিনীর সাজেই এখানি তোলা।"

পুলিন বলিল, "ষ্টারে বিষবৃক্ষ হচ্ছে নাকি? দেখতে গেলে হয়। কখন আরম্ভ?"

"আজ রবিবার—বেলা পাঁচটায় আরম্ভ।"

গাড়ী নীচে অপেক্ষা করিতেছিল। আরোহিদ্বয়কে লইয়া দুই মিনিটের মধ্যেই উহা ষ্টার থিয়েটারে গিয়া উপস্থিত হইল।

পুলিন নামিয়া সুশীলাকে টিকিট কিনিয়া দিয়া, তার হাতে ফটোখানি দিয়া বলিল, "চেহারা মিলিয়ে দেখো—যে কুন্দনন্দিনী সাজবে, তাব সঙ্গে মেলে কি না।" বলিয়া সুশীলাকে ঝির জিম্মা করিয়া দিয়া সে অন্তর্হিত হইল।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় থিয়েটার ভাঙ্গিল। গাড়ীতে স্বামী স্ত্রীতে বেশী কিছু কথাবার্তা হইল না।

বাসায় ফিরিয়া উভয়ে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিল। তারপর, পুলিন তামাক সাজিতে বসিল। সুশীলা বলিল, "হ্যাঁগা—এ ফটোখানা ত সেই যে কুন্দনন্দিনী সেজেছিল তারই বটে। তুমি ওখানা কিনেছিলে কেন?"

পুলিন গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমায় জব্দ করবার জন্যে।"

"কি জব্দ?"

"যাতে তুমি মনে কর আমি ফের বিয়ে করেছি—আর ঐ আমার নতুন স্ত্রী।"

"কেন তুমি বিয়ে করনি?"

"বালাই ষাঠ!—আমি কেন বিয়ে করবো? আমার শত্রু যে সে দুই বিয়ে করুক।"

"তবে কেন নিজে মুখে তুমি স্বীকাব করেছিলে যে বিয়ে করেছ?"

"তোমায় জ্বালাবার জন্যে।"

সুশীলা বলিল, "উঃ—কি ধাপ্পাবাজ তুমি!—আচ্ছা সে যেন হল। তুমি ঐ হেনা না ফেনার ছবি বুকে করে বাড়ীতে কাল দুপুরবেলা ঘুমুচ্ছিলে কেন?"

"ঘুমুইনি—জেগেই ছিলাম। তুমি আসছ, পায়ের শব্দ পেয়েই ওখানা বুকে করে চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করে' পড়েছিলাম।"

"আমায় জ্বালাতনের জন্যই ত? ভণ্ড মিন্সে! আচ্ছা, সে যেন বুঝলাম। তোমার ব্যাগের মধ্যে সেই সব প্রীতি উপহারে যে বিভাবতীর নাম ছাপা ছিল সে তবে কে?"

"ঐ যে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে কলকাতায় এসেছিলাম, সেই।"

"কার সঙ্গে তার বিয়ে হল?"

"নাম মনে নেই।"

"যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল, তারই সঙ্গে হল কি?"

"তারই সঙ্গে।"

"তবে কেন ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুর বলেছিলেন যে সে বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল, তারা বর তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল?"

"তাকে ঐ কথাই বলতে আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম যে এমন ভাবে বউদির কাছে গল্পটা করবে, আরও ২।১ জন মানুষ শুনতে পায়।"

সুশীলা বলিল, "এত দুষ্টামিও তোমার পেটে!—জোচ্চর মিন্সে! আচ্ছা—বিয়ের পদ্যে তবে সে বরের ছাপা নাম কেটে তোমার নাম হাতের লেখায় বসানো ছিল কেন?"

পুলিন বলিল, "ওটা, ঐ মজাটুকু করবার জন্যে।"

"তবে সেটা জাল, বল!"

"একরকম তাই বইকি!"

পুলিন তামাক সাজিয়া আনিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। বলিল, "আমি তা হলে ১ নম্বর ধাপ্পাবাজ, ২ নম্বর ভণ্ড, ৩ নম্বর জোচ্চর, ৪ নম্বর জালিয়াৎ—আর কিছু আছে?"

সুশীলা বলিল, "তোমার মত নিষ্ঠুর কি আর ভূভারতে আছে? এই ৮।১০ দিন, কি কষ্টটাই তুমি আমায় ভোগ করালে বল দেখি! পুরুষ মানুষ, তুমি কি জানবে স্বামীর ভালবাসা হারালে স্ত্রীলোকের কি বুকফাটা কষ্ট!"—বলিয়া সুশীলা চোখে আঁচল দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পুলিন হুঁকা ফেলিয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "ছি ছি সুশী—কেঁদ না, চুপ কর!"

এ বার সুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইল না, স্পর্শদোষ সহ্য করিল।

একটু পরেই, হোটেলের ঠাকুর দুই থালায় লুচী তরকারী প্রভৃতি দিয়া গেল। সুশীলা সে সমস্ত গুছাইয়া স্বামীকে খাইতে বসাইল।

পুলিন খাইতে লাগিল। সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তবে তোমার সেবার কলকাতায় অতদিন দেরী হল কেন?"

"ঐ যে বললাম, কবচ আনতে গিয়েছিলাম। তবে হিমালয়ের জঙ্গলে নয়, বাঙ্গালা দেশেরই একটা পল্লীগ্রামে।"

"এ কথাটা সত্যি?"

"কেন কবচ ত তুমি নিজে চক্ষে দেখেছ—তুমি পরলে না ত আমি কি করব? কাল চল কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে' মাকে দর্শন করে' দুজনে কবচ দুটি ধারণ করি।"

তাহাই হইল। এ যাত্রায় সুশীলার পিত্রালয়ে যাওয়া ঘটিল না। অসম্ভবও সম্ভব হয়। বৎসর না ঘুরিতেই, কবচ ধারণের সুফল ফলিল;—এই দম্পতি পুত্রলাভ করিল।

রাণী অম্বালিকা

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

অম্বরপতি মানসিংহের অন্তঃপুরে বিভিন্ন মহিষীগণের আবাসার্থ ভিন্ন ভিন্ন মহাল সকল নির্ম্মিত ছিল। এইরূপ একটি মহালের একটি সুসজ্জিত কক্ষে, সায়ংকালে, গবাক্ষ সমীপে উপবেশন করিয়া, রাণী অম্বালিকা দেবী অন্তঃপুরের সিংহদ্বার অভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখখানি কিছু বিষণ্ণ, মাঝে মাঝে অন্যমনে কি যেন ভাবিতেছেন, তাঁহার মনোমধ্যে দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কক্ষমধ্যে সুগন্ধি তৈলপূর্ণ দীপাবলী উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিতেছে এবং সেই আলোক রাণীর দোদুল্যমান হীরক-খচিত কর্ণভূষণে পতিত হইয়া, শতগুণ উজ্জ্বলতর হইয়া, কক্ষগাত্রে প্রতিফলিত হইতেছে। অম্বালিকা দেবীর বয়স ত্রিংশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে—কিন্তু এখনও তিনি পরমা সুন্দরী। বস্তুতঃ তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যের

মোহে আকৃষ্ট হইয়াই, পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন; অম্বালিকার পিতা বিজয়সিংহ যে তাঁহারই অধীনস্থ একজন ক্ষুদ্র সামন্ত প্রজা, ধনে মানে কুলমর্য্যাদায় যে তাঁহার বহু নিম্নে, সে কথা গণনার মধ্যে আনেন নাই।

কাবুল বিদ্রোহ দমন করিয়া, প্রায় একপক্ষকাল মহারাজ মানসিংহ গৃহে ফিরিয়াছেন, কিন্তু আজিও রাণী অম্বালিকা তাঁহার দর্শন পান নাই। অদ্য রজনীতে মহারাজ এই মহালেই বিশ্রাম করিবেন, এইরূপ সংবাদ আছে। কিন্তু আপাততঃ রাণী অম্বালিকার উৎকণ্ঠার কারণ, স্বামীর উপেক্ষা বা আগমন-বিলম্ব নহে। মহারাজের কাবুল অবস্থিতি সময়ে, রাণীর পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসে, তাঁহার জনক বিজয়সিংহ অত্যন্ত পীড়িত, তাঁহার জীবন সংশয়; মৃত্যুকালে প্রিয় দুহিতাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়াছেন। রাণীদের পিত্রালয়ে গমন তখনকার দিনে রাজাবরোধের একান্তই নিয়ম-বিরুদ্ধ ছিল। বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে মহারাজের হুকুম লইয়া রাণী ক্বচিৎ কখনও পিতৃগৃহে যাইতেন। মহারাজ অনুপস্থিত, অম্বালিকা তাই পট্টমহাদেবীর (বড় বা পাট-রাণীর) পদতলে কাঁদিয়া পড়িলেন। তিনি হুকুম দিলেন; অম্বালিকা পিতৃগৃহে গমন করিলেন। সেখানে মাসাধিককাল থাকিয়া, পিতৃসেবায় তাঁহাকে সুস্থ ও নিরাময় করিয়া, অল্পদিন হইল ফিরিয়াছেন। মহারাজের কাবুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছেন। এখন বিষম চিন্তা, এই পিত্রালয়-গমন সংবাদ শুনিয়া মহারাজ কি বলিবেন!

একজন সুবেশা পরিচারিকা আসিয়া প্রবেশ করিল। দেবীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সে ডাকিল, "রাণীজী!"

রাণী চমকিয়া, মুখ ফিরাইয়া পরিচারিকার পানে চাহিলেন।

পরিচারিকা, রাণীর দুশ্চিন্তার কারণ অবগত ছিল। কহিল, "মহারাজ কি এক প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে আসিবেন? এখন হইতে এমন করিয়া বসিয়া থাকিযা নিজেকে ক্লান্ত করিতেছেন কেন?"

রাণী বলিলেন, "অত রাত্রি হইবে কি?"

"তা আর হইবে না? যখন আসেন, এক প্রহর দেড় প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে কবে আর আসিয়া থাকেন?"

"কেন মিনা, একদিন ত ছিল যখন তিনি সন্ধ্যা না লাগিতেই আসিতেন!"—বলিয়া রাণী একটু বিষাদের হাসি হাসিলেন।

পরিচারিকার নাম মৃণালিনী—সংক্ষেপে মিনা। এই দাসী, রাণী অম্বালিকার পিত্রালয় বিজয়গড় গ্রামেরই একজন দরিদ্র বিধবা; রাণীর বিবাহের পর তাঁহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছে।

মিনা বলিল, "সে সব দিনের কথা ছাড়িয়া দিউন রাণীজী!"

রাণী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে ত অনেকদিনই দিয়াছি! তবু সে সব দিনের কথা স্মরণেও সুখ! প্রথম যখন আমায় বিবাহ করিয়া আনেন, তখন তোর মনে আছে মিনা? তখন চারি—পাঁচ—ছয় রাত্রি পর্য্যন্ত, অবিচ্ছেদে, আমার পূজা গ্রহণ করিতেন। আর এখন? মাসে একদিন দর্শন পাই কিনা সন্দেহ!"

দাসী বলিল, "তখন আপনিই ছিলেন সবচেয়ে নূতন রাণী। তার পর, এই ১৫ বছরে মহারাজের আরও কতগুলি মহিষী হইয়াছে বলুন দেখি?"

রাণী বলিলেন, "গড়ে বছরে তিনটি।"

"তবে কেন ব্যস্ত হন রাণীমা?"

রাণী অবনত নয়নে উত্তর করিলেন, "আমি কি আর বুঝি না? সবই বুঝি! এই বৃহৎ রাজপুরীতে, তিনি ভিন্ন আমার আর কে আছে বল্? আমার যদি একটি সন্তান

থাকিত, তবে তাহাকে লইয়া আমি ভুলিয়া থাকিতে পারিতাম। কিন্তু বিধাতা সে সুখ আমার অদৃষ্টে লিখিলেন না!—তুই যা, রন্ধনশালায় ব্রাহ্মণেরা আমার আজ্ঞামত মহারাজের ভোজনের সকল ব্যবস্থা করিতেছে কি না দেখিয়া আয়।"

পরিচারিকা চলিয়া গেলে অম্বালিকা দেবী, উঠিয়া কক্ষমধ্যে কিয়ংকাল পাদচারণ করিলেন; তাহার পর ভিত্তিগাত্র বিলম্বিত, রৌপ্যখচিত একখানি বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া, নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে লাগিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে দুই একগাছি করিয়া রূপার তারও দেখা দিয়াছে!—কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া, একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া, পুনরায় আসিয়া গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। ক্রমে প্রহরের ঘণ্টা বাজিল। দ্বিতীয় যামে, সংবাদ আসিল. মহারাজ দুঃখের সহিত জানাইতেছেন, আজ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইবে; অতরাত্রে আসিয়া তিনি রাণী অম্বালিকা দেবীর বিশ্রাম-ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন না।

অম্বালিকা দেবীর নয়নযুগল সজল হইয়া আসিল। পরিচারিকাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল আসিবেন, অথবা কবে আসিবেন, তাহা কি মহারাজ কিছু বলিয়াছেন?"

মিনা উত্তর করিল, "সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজভৃত্য বলিল. সে সম্বন্ধে প্রভুর কোনও আদেশ নাই।"

রাণী শুধু বলিলেন, "বেশ।"

প্রদোষে রাণী যে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, একে একে সে সমস্তই মোচন করিলেন। দাসী তাঁহাকে শয়নের বেশ পরিধান করাইয়া দিয়া বলিল, "এখন ভোজন করিবেন কি?"

রাণী বলিলেন, "করিব, পরে। তুই একটা কাজ করিতে পারিস?"

"কি, বলুন।"

"অন্যান্য রাণীদের মহালে গিয়া জানিয়া আয় দেখি, মহারাজ আজ রাত্রে কোথায় বিশ্রাম করিবেন।"

দাসী চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রাণী হৈমবতীর মহালে, মহারাজের আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু মহারাজ এখনও আসিয়া পৌছেন নাই; অধিক রাত্রে তাঁহার আসিবার কথা আছে।"

রাণী হৈমবতী মহারাজ মানসিংহের নূতনতমা মহিষী। তিনি হুণ্ডিরাজ ভীম-সিংহের দুহিতা।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

এই ঘটনার ৫।৬ দিন পরে, মহারাজ মানসিংহ, রাণী অম্বালিকার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাণী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। মহরাজ রাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন. "এ কি, এত রোগা হইয়া গিয়াছ কেন? বিজয়গড়ে এ বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়াছি; যাইবার সময় এখান হইতে কিছু ঘৃতাদি খাদ্য লইয়া গেলেই হইত!"

রাণী বুঝিলেন, মহারাজের এ বাক্য. স্নেহজনিত নহে,—পরন্তু, তাঁহার পিতার দারিদ্র্যের প্রতি শ্লেষকটাক্ষ। মহারাজ কিরূপ গর্ব্বিত ও মদোদ্ধত. তাহা রাণীর জানিতে বাকী ছিল না। তিনি অবনত বদনে নিরুত্তর রহিলেন।

মহারাজ কিন্তু এ ব্যাপার এখানেই থামিতে দিলেন না। অম্বালিকা তাঁহার বিনা হুকুমে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি ত বিষম বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, তদুপরি,

একটা রাজকীয় ব্যাপারের জন্য তাঁহার মনটা আজ অপ্রসন্ন ছিল।

কথায় কথায় কথা বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে রাণী বলিলেন, "আপনি উপস্থিত ছিলেন না—তাই আপনার হুকুম লইতে পারি নাই। রমণীর পিত্রালয় গমন এতই কি অপরাধের ?"

মহারাজ বলিলেন, "প্রজা সাধারণের রমণীগণের পক্ষে অপরাধ নহে বটে; রাজ-পরিবারে উহা নিয়মবিরুদ্ধ। তুমি ত রামায়ণ পড়িয়াছ; সীতাদেবী বিবাহের পর সেই যে অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন; আর কি কোনও দিন তিনি মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন? মহাভারত পড়িয়াছ, দ্রৌপদী দেবী, বিবাহের পর কোনও দিন আবার পাঞ্চালনগরে পিতৃ-দর্শনে যাইতেছেন, এ বর্ণনা কোথায় আছে? তবু ত তাঁহাদের পিতা রাজ্যেশ্বর। আর, তোমার পিতা? যদি আমার অনুমতি লইয়া যাইতে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল; তুমি স্বৈরিণীর ন্যায় চলিয়া গিয়াছিলে!"

রাণী বলিলেন, "কেন, মহারাজ, আমাকে এরূপ কটুবাক্য সকল বলিতেছেন? আপনার অনুমতি লইবার উপায় ছিল না; তাই আমি পট্টমহাদেবীর অনুমতি লইয়া গমন করিয়াছিলাম।"

মহারাজ বলিলেন, "মহাদেবীর অনুমতি লইয়া গিয়াছিলে; কিন্তু এ বিষয়ে অনুমতি দিবার তিনি কে?"

অম্বালিকা বলিলেন, "ওটা আমারই ভুল হইয়াছে, মহারাজ! বিগত-যৌবনা মহাদেবীর অনুমতি না লইয়া, নূতন রাণী হৈমবতীর নিকট অনুমতি লইয়া গেলেই বোধ হয় মহা-রাজের ক্রোধাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতাম।"

মহারাজ মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "ঈর্ষাটি ত দেখিতেছি, ষোল আনাই আছে! তোমার পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়াই যদি হইয়াছিল, তবে পাল্কী পাঠাইয়া সেই ভিক্ষুক-টাকে এখানে আনাইয়া লইলেই পারিতে। এখানে রাজবৈদ্যগণ সেটার চিকিৎসা করিত, ঔষধপথ্যাদির ব্যয়টাও তার বাঁচিয়া যাইত।"

এই কথা শুনিবামাত্র, রাণী ক্রোধে জ্ঞানহারা হইলেন। সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "সকলেরই ত রূপবতী পিসি ও ভগিনী থাকে না মহারাজ, থাকিলে, আপনার ন্যায়, আমার পিতাও হয়ত তাহাদের মুসলমানকে দিয়া, সম্পত্তিশালী ও গণ্যমন্য হইতে পারিতেন।"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই রাণী মহাশঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, হায় হায়, কি করিলাম!—রাণা প্রতাপসিংহ একবার ইঁহাকে ঐ বিষয়ে উপহাস করিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ নিজেকে কিরূপ অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা রাণী জানিতেন।

বাস্তবিক, অম্বালিকার আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রমাণিত হইল। কথাগুলি শুনিবামাত্র মানসিংহের চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "পাপীয়সী! তুই আমায় অপমান করিলি? এত সাহস তোর? যা, আমার অন্তঃপুর হইতে তুই দূর হইয়া যা। আর ইহজীবনে আমি তোর মুখদর্শন করিব না। তোকে, সাতদিন মাত্র সময় দিলাম। এই সাতদিনের ভিতর, তুই তোর পিতাকে আনাইয়া, তাহার সহিত চলিয়া যাইবি—ইহাই তোর প্রতি আমার শেষ ও অপরিবর্ত্তনীয় দণ্ডাদেশ!"—বলিয়া, মহারাজ, কম্পিতপদে রাণী অম্বালিকার মহাল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

রাণী অম্বালিকা, অনাহারে, অনিদ্রায় সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন। পরদিন তিনি বহু মিনতি করিয়া, ক্ষমা চাহিয়া, মহারাজের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। পরি-

চারিকা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, মহারাজ পত্র পাঠান্তে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন ও কহিয়াছেন, রাণীকে বলিস, মহারাজ মানসিংহের মুখ হইতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় কথা বাহির হয় না।

সে রাত্রিও অম্বালিকা কাঁদিয়া কাটাইলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, তাঁহার দ্বারে একখানি পর্দ্দাঘেরা তাঞ্জাম আসিয়া লাগিল। মিনা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রাণী হৈমবতী দর্শনপ্রার্থিনী।

"তাঁহাকে লইয়া আইস।"—বলিয়া অম্বালিকা সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, এ দর্শনের উদ্দেশ্য কি? সমবেদনা-জ্ঞাপন?—না, রঙ্গ দেখিতে আসা? কিন্তু হৈমবতী ত সে প্রকৃতির মেয়ে নহে। তাহার মুখে সদাই হাসি—মনে কিছুমাত্র খলতা কপটতা নাই—ইহা ত সকলেই বলে; অম্বালিকাও বৎসরাধিক কাল তাহাকে দেখিতেছেন, তাঁহারও বিশ্বাস সেইরূপ।

হৈমবতী প্রবেশ করিয়া, অম্বালিকাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ মাত্র—দেহ-নদী প্লাবিয়া নবযৌবনের জোয়ার ছুটিতেছে।

হৈমবতী কহিলেন, "দিদি, আমি মহারাজের নিকট সকল কথাই শুনিয়াছি। তুমি মহারাজকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা বলাটা বড়ই দোষের হইয়াছে বইকি। অত্যন্ত রাগের বশে ওকথা তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহাও আমি বুঝিতে পারি-তেছি। কিন্তু না বলিলেই ভাল হইত, একথা তুমিও বোধ হয় এখন বুঝিতেছ।"

অম্বালিকা বলিলেন, "এখন কেন, যে দণ্ডে আমার এ পোড়া মুখ হইতে ও কথা বাহির হইয়াছিল, সেই দণ্ডেই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তখন আর উপায় কি?"

হৈমবতী অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি যে এ সকল কথা সরল অন্তঃকরণেই বলিতেছেন, সে সম্বন্ধে অম্বালিকার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। চিঠি ও মহারাজের মৌখিক উত্তরের কথাও নূতন রাণী অবগত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আর একখানা চিঠি লিখিয়া দেখিলে হয় না?"

"আর কি লিখিব, বহিন?"

"তুমি মহারাজকে কি লিখিয়াছিলে তাহা আমি জানি না। এস না, দুইজনে পরামর্শ করিয়া একখানা চিঠি লেখা যাক।"

অম্বালিকা বলিলেন, "যা ভাল বোঝ তাই কর ভাই।"

অম্বালিকা কাগজ কলম লইলেন। পরামর্শের বড় একটা প্রয়োজন হইল না. হৈমবতী বলিয়া যাইতে লাগিলেন; অম্বালিকা লিখিতে লাগিলেন। বিদুষী বলিয়া হৈমবতীর খ্যাতি ছিল। পত্র সমাপ্ত হইলে, হৈমবতী বলিলেন, "আজই এখানি মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দাও। আজ রাত্রে, আমার কুঞ্জেই তাঁর স্থিতি। আমিও কথাটা পাড়িব—দেখি যদি তাঁর মন ভিজাইতে পারি।"

"যা হয় করিস ভাই।"—বলিয়া অম্বালিকা, সপত্নীকে বিদায়-চুম্বন করিলেন।

হৈমবতী বলিলেন, "কাল আবার এই সময় আমি আসিব; মহারাজ কি উত্তর দেন, তাহাও দেখিয়া যাইব।"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন দ্বিপ্রহরে, রাণী হৈমবতী আবার আসিয়া দর্শন দিলেন। আজ তাঁহার মুখখানি বেশ হাসি হাসি। তাঁহার মুখ দেখিয়া অম্বালিকার মনে ভরসা হইল, বোধ হয় কোনও সুসংবাদ আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি ভাই?"

হৈমবতী তাঁহার বস্ত্রমধ্য হইতে, পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "আজ আমিই তোমার

বরের পত্রবাহিকা।"—বলিয়া পত্রখানি, অম্বালিকার হস্তে প্রদান করিলেন।

অম্বালিকা তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাহাতে এই কয়েক পংক্তি মাত্র লেখা ছিল :—

"আমার আদেশ অপরিবর্ত্তনীয়। তুমি এতদিন এখানে যেরূপ সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে জীবন-যাপন করিয়াছ, তদভাবে পিতৃগৃহে তোমার বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তুমি গমন কালে তোমাকে আমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব স্থির করিয়াছি। তদ্ভিন্ন, এখানে তোমার যাহা যাহা প্রিয়বস্তু আছে, তাহাও তুমি পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে পার।"

পত্র পড়িয়া, অম্বালিকার মনে এইমাত্র যে আশার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পত্রখানি সপত্নীর হস্তে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানি পড়িয়াছ?"

হৈমবতী বলিলেন, "পড়িয়াছি। আমারই ঘরে বসিয়া ত এ পত্র তিনি লিখিয়াছেন। আমি দিদি, তোমার হইয়া তাঁহাকে অনেক স্তুতিমিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন গলাইতে পারিলাম না। তোমার চিঠির কথা তিনি উল্লেখ করিলেন; জেব হইতে সেখানি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন, চিঠিখানি যে আমারই মুশাবিদায় লেখা তাহা ত তিনি জানেন না! আমি ভালমানুষ সাজিয়া, মনোযোগের ভাণ করিয়া সমস্ত পত্রখানি পড়িলাম। শেষে বলিলাম, দিদির বাবা ত শুনিয়াছি গরীব গৃহস্থ; এখানে এত বৎসর মহারাজ তাঁহাকে যে প্রকার সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে পালন করিয়াছেন, সহসা সে সকল হইতে বঞ্চিত হইলে, তিনি বাঁচিবেন কি? গরীব গৃহস্থ ঘরের অশন বসন কি এ বয়সে তাঁহার সহ্য হইবে?—তাহাতে মহারাজ উত্তর করিলেন, আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি করিয়া দিব। বলিযা কাগজ কলম চাহিলেন। পত্র লেখা হইলে আমি বলিলাম, ওখানি আমাকেই দিন, কল্য আমি দিদির সহিত শেষ দেখা করিতে যাইব, পত্রখানি তাঁহাকে দিয়া আসিব। তাই ওখানি আমার হাতেই দিলেন।"

অম্বালিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অত দান খয়রাতের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাকেই যদি হারাইলাম, তবে লক্ষ মোহর লইয়াই বা কি করিব, আসবাব-পত্র সেখানে লইয়া গিয়াই বা কি করিব? তারপর, আমার সম্বন্ধে আর কোনও কথা হইয়াছিল?"

"হইয়াছিল বইকি। আমি বলিলাম, দিদি আপনাকে কত ভালবাসেন, তাহা আপনি জানেন না। তিনি শ্লেষ করিয়া বলিলেন, স্বামীকে মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়া অপমান করা ত ভালবাসারই একটা প্রধান লক্ষণ বটে!—আমি বলিলাম, মানুষের কি ভুল হয় না? একদিন একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই কি আজীবন তাঁহাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে? তিনি বলিলেন, তুমি জানিয়া রাখ নূতন রাণী, মহারাজ মানসিংহের এক কথা।—অন্যান্য কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাইবার পূর্ব্বে দিদিকে আপনি কি একটিবার শেষ দেখা দিবেন না?—তিনি বলিলেন, আমি নিজে হইতে যাইতে চাহি না, তবে সে যদি বিশেষ আকিঞ্চন করে, তবে একবার শেষ দেখা কেন না করিব? —দিদি, আমি বলি কি, তুমি এখনি একখানি চিঠি তাঁহাকে লিখিয়া তোমার সেই প্রার্থনা জানাও!"

অম্বালিকা সজল নয়নে বলিলেন, "আর দেখা করিয়া কি হইবে বহিন?"

হৈমবতী বলিলেন, "না না দিদি, একবার তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা করিতেই হইবে।"

"তোমার কি ইচ্ছা, আবার আমি তাঁর কাছে কাঁদাকাটি করিব, পায়ে ধরিব—দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইব? না ভাই, সে আর কাজ নাই। আবু হোসেনের রাজ্যভোগ ত আমার ফুরাইয়াই গিয়াছে, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, আর কেন বৃথা চেষ্টা?"

হৈমবতী আব্দারের স্বরে বলিলেন, "না দিদি ও চিঠি তোমার লিখিতেই হইবে।

লিখিলেই, শেষ দিন মহারাজ এখানে আসিবেন। কাঁদাকাটি, পায়ে ধরা করিতে তোমায় বলি না। আমার অন্য একটা অভিসন্ধি আছে।"

"কি অভিসন্ধি?"

"তাহা এখন বলিব না। আগে ও চিঠির জবাব আসুক; কাল আসিয়া বলিব। একটা ভারি মজার মৎলব আমি স্থির করিয়াছি। কাল মহারাজ তোমায় ঐ পত্র লিখিবার পরেই সেই মৎলব আমার মাথায় আসিয়াছে।"—বলিয়া হৈমবতী হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন আবার দ্বিপ্রহরে তিনি আসিলেন। এবারেও তাঁহার হাসি হাসি মুখ। অম্বালিকা বলিলেন, "চিঠির জবাব আসিয়াছে।"

হৈমবতী বলিলেন, "জানি। দিদি, একটি নিভৃত কক্ষে চল, একটু পরামর্শ আছে।"

অম্বালিকা তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

দুই দণ্ড পরে উভয়ে যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন হৈমবতীর মুখখানি তেমনই হাসি হাসি; অম্বালিকার মুখখানি যেন আর তত বিষণ্ন নহে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

যথাদিনে মহারাজ মানসিংহ, গম্ভীর মুখে, রাত্রি এক প্রহরের পর আসিয়া দর্শন দিলেন। খাজাঞ্চিখানা হইতে লোক আসিয়া তৎপূর্ব্বেই রাণী অম্বালিকাকে লক্ষ মোহর ওজন করিয়া দিয়া গিয়াছিল।

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আজ রাত্রি এখানে আপনি যাপন করিবেন, এ অবস্থায় এ দুরাশা কি মনে স্থান দিতে পারি?"

মহারাজ বলিলেন, "না, আমার কাজ আছে, শীঘ্রই যাইতে হইবে।"

রাণী কিয়ৎক্ষণ নতমুখে বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "অন্ততঃ, আহার করিয়া যান।"

মহারাজ পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সময় হইবে না।"

রাণী বলিলেন, "তা বটে! এত সৌভাগ্য আমার এ পোড়া অদৃষ্টে সহিবে কেন? আমার ঘরে আপনি কি কিছুই আর খাইবেন না?"—বলিতে বলিতে, রাণী অম্বালিকার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া আসিল।

মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, একপাত্র সরবৎ না হয় দাও, পান করি।"

রাণী উঠিয়া স্বয়ং সরবৎ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। মহারাজ সরবৎ পান করিয়া, তাম্বুল গ্রহণ করিলেন।

পাণ খাইতে খাইতে মহারাজ বলিলেন, "আজ সারাদিন বড় পরিশ্রম গিয়াছে, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। শীঘ্রই উঠিব।"—বলিতে বলিতেই তাঁহার নেত্রযুগল মুদ্রিত হইয়া আসিল।

"মহারাজ, শয়ন করুন।" বলিয়া রাণী অম্বালিকা সযত্নে তাঁহাকে শোয়াইয়া দিয়া, মস্তকতলে উপাধান সংযোগ করিলেন। অচিরেই মহারাজের নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল।

রাণী হৈমবতী, পার্শ্বের কক্ষ হইতে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিলেন। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নিদ্রিত মহারাজের প্রতি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন জব্দ, মিন্সে!"

অম্বালিকা উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, "কোনও অনিষ্ট হইবে না ত ভাই?"

হৈমবতী বলিলেন, "আমার বাপের বাড়ীর রাজবৈদ্য, তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। তাঁহার ঔষধে অনিষ্ট হইবে? সারারাত অতি গভীর নিদ্রা! এদিকে সব ঠিক আছে ত? এইবার পাল্কী বেহারাদের ডাকিয়া পাঠাও।"

"তা, পাঠাইতেছি। নিজের ভাল করিতে গিয়া, পাছে তোমার কোনও অনিষ্ট করিয়া বসি, বোন, সেই আমার বিষম ভাবনা হইতেছে। মহারাজ কল্য প্রাতে জাগিলে সব কথাই ত খুলিয়া তাঁহাকে বলিতে হইবে! তোমার পরামর্শেই যে আমি এ কার্য্য করিয়াছি, তাহা তাঁহাকে জানাইতে তোমার নিষেধ নাই বলিয়াছ; কিন্তু শুনিয়া, তিনি যদি তোমার উপর রাগ করেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "ঈস্, আমার উপর রাগ করিবেন, এত মুরেদ তাঁর? বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা আমি, এক কিলে ওঁর নাক ভেঙ্গে দিতে পারি, সে ভয় নাই?" বলিয়া তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন।

অম্বালিকা বলিলেন, "শেষরক্ষা হইলেই বাঁচি, ভাই।"

হৈমবতী বলিলেন, "সে ঠিক হইবে, কোনও চিন্তা নাই দিদি। মহারাজ জাগিলে, তাঁহাকে যাহা যাহা বলিতে হইবে, যেমন যেমন করিতে হইবে, আমি যেমন তোমায় শিখাইয়া দিয়াছি, সে সব ভুলিয়া যাইবে না ত?"

"না ভাই, ভুলিব কেন?"

দুইখানি সুসজ্জিত পাল্কী আসিয়া দ্বারে লাগিল। রাত্রি দেড় প্রহরের পর, মহারাজকে ধরাধরি করিয়া একখানি পাল্কীতে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। অপর পাল্কীতে রাণী অম্বালিকা আরোহণ করিলেন। বত্রিশ জন বেহারায়, সে পাল্কী দুইখানিকে হাওয়ার মত উড়াইয়া লইয়া চলিল। অগ্রে ও পশ্চাতে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য ও মশালবাহকগণ ছুটিল। এ সকল লোকই রাণী হৈমবতীর পিতৃরাজ্য হুণ্ডিপুর হইতে আনীত।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে পাল্কী দুইখানি বিজয়গড় গ্রামে প্রবেশ করিল। রাণীর পিতা, বৃদ্ধ বিজয়সিংহ, সুসজ্জিত বেশে, রাজজামাতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। জামাতাকে নিদ্রিত দেখিয়া, এবং কন্যা, নিদ্রাভঙ্গ করিতে নিষেধ করায়, তাঁহাকে লইয়া গিয়া, পালঙ্কে শয়ন করাইয়া দিলেন।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

বেলা চারি দণ্ডের সময়, মানসিংহের চেতনা-লক্ষণ দেখা দিল। অম্বালিকা তখন তাঁহার পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতেছিলেন।

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, অনেকক্ষণ সূর্যোদয় হইয়াছে। গাত্রোত্থান করিবেন না? স্নানাদি ও সন্ধ্যাবন্দনার সময় যে উত্তীর্ণ হইয়া যায়!"

মহারাজ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া, শয়নকক্ষের চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন। অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? আমি কোথায়?"

অম্বালিকা বলিলেন, "মহারাজ, এ আপনার শ্বশুরভবন।"

মহারাজ উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "শ্বশুরভবন! কোন্ স্থান?"

"বিজয়গড়।"

"বিজয়গড়? এখানে আমি কি করিয়া আসিলাম?"

"আপনার এই দাসী আপনাকে লইয়া আসিয়াছে।"

মহারাজ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ রাণী?—হাঁ—হাঁ—আমার এখন স্মরণ হইতেছে, আমি নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর ছিলাম, রাজধানীতে তোমার আলয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমি কি নিদ্রিত অবস্থায় আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছ? কি ভয়ানক কথা! জান রাণী, রাজদ্রোহ—কঠিন অপরাধ!"

"অপরাধ করি নাই মহারাজ, রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তিনী হইয়াই এ কার্য্য আমি করিয়াছি। আমি রাজাজ্ঞা পালন করিয়াছি মাত্র।"

"কে আজ্ঞা দিল? কোন্ সে রাজা? দিল্লীশ্বর?"

"না মহারাজ, দিল্লীশ্বর এ আদেশ আমাকে কেন দিবেন? আমার হৃদয়েশ্বর যিনি, তাঁহারই আদেশে এ কার্য্য আমি করিয়াছি।"

"কে, আমি?"

"আপনি ছাড়া আমার হৃদয়েশ্বর কে, মহারাজ?"

"তুমি কী বলিতেছ, মহিষী? আমি তোমায় আজ্ঞা দিয়াছি যে, তুমি আমায় বিজয়গড়ে লইয়া যাও? কবে আমি তোমায় এরূপ আজ্ঞা দিলাম?"

"আমার নিকট মহারাজের স্বহস্তলিখিত পরওয়ানা আছে। এই দেখুন।"—বলিয়া রাণী, মহারাজের শেষ পত্রখানি তাঁহার সমক্ষে মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই দেখুন মহারাজ, আপনি লিখিয়াছেন, এখানে যাহা যাহা তোমার প্রিয়বস্তু আছে, তাহাও তুমি পিতৃগৃহে লইয়া যাইতে পার। তা—হিন্দু-রমণীর নিকট স্বামী অপেক্ষা অধিক প্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর কি আছে মহারাজ? আপনিই আমার জীবনের প্রিয়তম বস্তু, তাই আপনাকেই আমি এখানে লইয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া মহারাজের বদনমণ্ডল হাস্যরেখায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি হাস্যাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপর, মহিষীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন।

রাণীকে আদর করা শেষ হইলে, মহারাজ জেরা আরম্ভ করিলেন। রাণী হৈমবতীর এ বিষয়ে কোনও নিষেধ ছিল না। অম্বালিকা সকল কথাই খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, "ছুঁড়িটা ত আচ্ছা দুষ্ট!"

শ্বশুরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, সেই দিন ও রাত্রি জামাতৃ-আদরে বিজয়গড়ে যাপন করিয়া, মহারাজ স-মহিষী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাণী হৈমবতীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, এই ব্যাপার লইয়া মহারাজ তাঁহার সঙ্গেও অনেক হাস্য-পরিহাস করিলেন; রাগ করিলেন না—তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার করিলেন না; সুতরাং সে যাত্রা প্রৌঢ়-বয়স্ক মহারাজের সমুন্নত ঘ্রাণেন্দ্রিয় অভগ্নই রহিয়া গেল।

সতী

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

চৌরঙ্গি অঞ্চলে, বিলাত-ফেরতগণের এক ক্লাবের বারান্দায় বসিয়া, চারি বন্ধুতে কথোপকথন হইতেছিল। সকলেই প্রায় সমবয়স্ক, তবে কেহই চল্লিশের নীচে নহেন। সকলেই খ্যাতি, মান ও বিত্ত সঞ্চয় করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আজ এই ক্লাবে, একটা উৎসব ছিল। সে সকল কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে;—মেম্বরগণ এইখানেই ডিনার ভোজন সমাধা করিয়াছেন; অনেকে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; ইঁহারাও, এই গ্লাসটা শেষ হইলেই উঠিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প। এমন সময়, ছাত্র-জীবনে, বিলাতে কে কিরূপ প্রেম-চর্চ্চা করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। দুইজন নিজ নিজ "বহুদর্শিতা" বিবৃত করিবার পর, এই দলের যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, দত্ত সাহেব বলিলেন, "আমাদের সময় ধীরেনকে নিয়ে একটা ভারি কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। তোমরা কেউ তখনো বিলেত যাওনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে ধীরেনের কথা কি শোননি? ধীরেন ঘোষাল।"

শ্রোতৃগণের মধ্যে একজন বলিলেন, "সেই বহু লক্ষপাতি প্রতাপ ঘোষালের ছেলে ধীরেন ঘোষাল ?"

দত্ত সাহেব বলিলেন, "সেই।"

"হ্যাঁ—বিলেতে পে'ছে আমি তার কথা শুনেছিলাম। আহা! বেচারি বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিল! তারই কোনও প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারের কথা তুমি বলছ নাকি? শুনে-ছিলাম, সে ত অত্যন্ত ভালমানুষ ছিল—নিতান্ত গোবেচারী।"

দত্ত সাহেব সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "ভালমানুষ গোবেচারীরা প্রেমে পড়বে না ত পড়বো কি তুমি আমি? রাজহংসের মত ক্ষীরটুকু খেয়ে নীরটুকু বর্জ্জন করাই ছিল আমাদের প্রথা। কিন্তু সেটা কি সকলে পারে ভায়া? তার কথা, সে একটা রীতিমত বা রোমাঞ্চকর ব্যাপার! ক'টা বাজলো? ১১টা। শুনবে সে কথা?"

সেন সাহেব, হুইস্কির গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়া বলিলেন, "The night is young yet. Fire away." (রজনী এখন যুবতী—বলিয়া যাও।)

(রজনী এখনও যুবতী—বলিয়া যাও।)

দত্ত সাহেব তখন যে কাহিনী বিবৃত করিলেন, আমরা নিম্নে তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

ধীরেন প্রথমে যখন বিলাতে পদার্পণ করিল, তখন সে একটি জানোয়ার বলিলেই হয়। তখনও টাই বাঁধিতে শিখে নাই—বাঁধা টাই ব্যবহার করিত। 'পেভমেন্ট'কে বলিত ফুটপাত, 'রেস্টোরাঁ'কে বলিত হোটেল, এবং 'পার্স'কে বলিত মনিব্যাগ। যাহারা হুইস্কি ব্র্যান্ডি পান করে, তাহাদিগকে সে ভয়ানক দুশ্চরিত্র ও নিতান্ত নরাধম জ্ঞান করিত। বিলাতে আমি ছাড়া তাহার পূর্ব্বপরিচিত কোনও বন্ধু ছিল না—সুতরাং সে আসিয়া আমার বাসাতেই উঠিল—আমিই ষ্টেশনে গিয়া তাহাকে নামাইয়া আনিয়াছিলাম।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি পড়বে?"

"প্রথমতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং। তারপর, ডিগ্রী নিয়ে, জাহাজ-নির্ম্মাণ শিখতে বাবা বলে দিয়েছেন। বাবার মৎলব আছে, ভবিষ্যতে একটা কোম্পানি গঠন করে, জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা খুলবেন।"

"তা হলে ত অন্ততঃ বছর পাঁচেকের ধাক্কা বল। তা, বাবা মাসে মাসে কত পাউন্ড করে তোমায় পাঠাবেন?"

"পাঠাবেন কি? সমস্ত টাকাই আমার সঙ্গে তিনি দিয়েছেন, অর্থাৎ ড্রাফ্‌ট দিয়ে-ছেন। ড্রাফ্‌ট ভাঙিয়ে নিয়ে, কোনও ব্যাঙ্কে জমা রাখতে বলেছেন—প্রয়োজন মত মাসে মাসে বের করে নিতে হবে।"

"কত পাউন্ড?"

"চার হাজার।"

আমি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "চার হাজার পাউন্ড? ষাট হাজার টাকা? Lucky dog!" (ভাগ্যবান কুকুর!)

ধীরেন বলিল, "বাবা বলেছেন, বিদেশ বিভুঁই—হঠাৎ কোনও বিপদ আপদ হয়, ব্যারাম পীড়া হয়,—কিছু বেশী টাকা সঙ্গে থাকা ভাল! যা অবশিষ্ট থাকবে, ফেরবার সময় দেশে নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন।"

আমি বলিলাম, "আদর্শ পিতা! কিন্তু, পুত্ররত্ন যদি তার এই কাঁচা বয়সে, বদখেয়ালিতে টাকাগুলি উড়িয়ে দেয়?"

ধীরেন সগর্ব্বে বলিল, "সে বিশ্বাস আমার উপর বাবার আছে। জন্মকাল থেকে এই ২৫ বৎসর তিনি আমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, এ তিনি বেশ জানেন, অন্যায় ভাবে টাকা ওড়াবার ছেলে আমি নই!"

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

৮।১০ দিন লণ্ডনে থাকিবার পর, ধীরেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইল। আমাকে বলিল, "তুমি আমার সংগে চল ভাই—সব ঠিক ঠিকানা করে দিয়ে আসবে।" তৎপূর্ব্বেই তাহার সেই চার হাজার পাউণ্ডের ড্রাফ্‌ট ভাঙাইয়া ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা হইয়াছিল। আমি ধীরেনকে সংগে লইয়া গ্লাসগো গিয়া, তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। একটা উচ্চশ্রেণীর বোর্ডিং হাউসে তাহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিলাম।

গ্লাসগো হইতে প্রায়ই সে আমায় চিঠিপত্র লিখিত। মাস ছয় পরে, ধীরেনের নিমন্ত্রণে, আমি একদিন গ্লাসগো যাত্রা করিলাম। দেখিলাম, এই ছয় মাসে, সে অনেকটা মানুষের মত হইয়াছে। এখন আর ইংরেজী উচ্চারণে ভুল করে না, রোস্ট ফাউলে মাস্টার্ড মাখিয়া খাইতে উদ্যত হয় না। এবং ডিনারের পর দুই এক গ্লাস হুইস্কি সেবন করিতেও অভ্যস্ত হইয়াছে। যে বোর্ডিংয়ে তাহাকে আমি রাখিয়া আসিয়াছিলাম তাহা সে ছাড়িয়াছে—এখন রুম্‌স্‌ লইয়া বাস করে। বন্দোবস্ত একটু উচ্চ ধরণের, মূল্যও তদনুযায়ী দিতে হয়।

প্রথম কয়েকদিন সে আমার নিকট কিছুই ভাংগে নাই। আমার লণ্ডনে ফিরিবার পূর্ব্বদিন, সান্ধ্যভোজনের পর, তার বসিবার ঘরে আগুনের কাছে বসিয়া আমরা যখন হুইস্কি খাইতেছিলাম—তখন সে আমায় বলিল—"দত্ত—আমার জীবনে একটা নূতন ঘটনা ঘটেছে!"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ঘটনা হে?"

সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি প্রেমে পড়েছি!"

আমি বলিলাম, "বহুৎ আচ্ছা! মরদকা বাচ্ছা, এই ত চাই। তা, ছুঁড়িটা সুন্দরী ত?"

ধীরেন চটিয়া বলিল, "ছুঁড়ি নয়। সে ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে। এবং তোমাদের মত—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সবাই পাষণ্ড, আর তুমি খুব সাধু তা আমি জানি! তা তুমি কি করতে চাও শুনি?"

ধীরেন গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি তাঁকে বিবাহ করতে চাই।"

শুনিয়া আমি একটি শিস্‌ দিয়া, এক মিনিট কাল নীরবে বসিয়া রহিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "তাঁকে"—ইস্‌! প্রেমে জরজর! সখী আমায় ধর ধর! শেষে শ্লেষভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁকে প্রোপোজ (বিবাহ প্রস্তাব) করেছ নাকি?"

ধীরেন বলিল, "না, তা এখনও আমি করিনি।"

ধীরেনের প্রণয়িণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তার নাম বার্থা ম্যাকজন। তাহার বয়স ২২ বৎসর। বিধবা মা আছেন। একটি ভাই একটি বোন আছে। ভাইটি হাই-স্ট্রীটে মুদির দোকান করে, এটি তার পৈতৃক দোকান। বার্থা কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিল; গ্লাসগো সহরেই একটি ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের গভর্ণেস স্বরূপ সেই বাটীতে থাকে।

বলিলাম, "ভায়া, এমন কার্য্যটি কোর না কোর না। ওরা হল রাজার জাত, আমরা হলাম কালা আদমি—ওদের প্রজা। তুমি যদি মেম বিয়ে করে এ দেশেই বসবাস করতে পার, তা হলে সে একরকম চলে যেতে পারে। কিন্তু যদি তাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাও, তা হলে তোমার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। তোমার মা বাপ আত্মীয়স্বজন সকলেই তোমার ঐ মেমকে বিষনয়নে দেখবেন। আর তোমার মেম দেখবেন, সে দেশের ইংরেজ সমাজ, কালা আদমি বিবাহ করার জন্যে তাঁকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখছে। তোমরা হবে ধোবিকা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাটকা। এখনও প্রোপোজ করনি, সেই মঙ্গল; সময় থাকতে সাবধান হও। এর বেশী আর আমি তোমায় কিছু বলতে চাইনে।"

ধীরেন রূক্ষস্বরে বলিল, "পাদ্রী সাহেব, তোমার এ অযাচিত উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু সকলকেই তুমি নিজেদের মত মনে কোর না।"

আমিও একথা শুনিয়া একটু চটিলাম বইকি। বলিলাম, "দেখ, তুমি এই ছ'মাস মাত্র বিলেতে এসেছ, আমি আজ তিন বৎসর আছি! তুমি এখনও ওদের চেনোনি, আমি ওদের হাড়হদ্দ বুঝে নিয়েছি। তুমি কি ভাব বার্থা তোমার প্রেমে জরজর হয়েছেন?"

"অন্ততঃ আমি হয়েছি। তিনিও যে আমায় ভালবাসেন, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমি প্রোপোজ করলে বোধ হয় তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন না।"

আমিও ব্যঙ্গভরে বলিলাম, "নিশ্চয়ই করবেন না। তুমি যে একজন বহু লক্ষপতির সন্তান, তা শ্রীমতী জানতে পেরেছেন যে! তুমি যে নির্ব্বোধের সর্দ্দার, পড়েছ একজন এডভেঞ্চারেসের হাতে, আর মনে করছ তিনি বুঝি একজন সীতা বা দময়ন্তীই হবেন। আমার কথা না শুনলে শেষে তোমায় নাকের জলে হতে হবে তা তোমায় বলে দিচ্ছি ভায়া!"

ধীরেন গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, আমার সঙ্গে আর কোনও কথা কহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরস্পরকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া আমরা নিজ নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম।

পরদিন প্রাতরাশের পর সাড়ে নয়টার ট্রেণে আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

তিন মাস পরে ধীরেনের পত্রে জানিলাম, সেই গর্দ্দভ, কুমারী বার্থাকে প্রোপোজ করিয়াছে—বসন্তের মধ্যভাগে মে মাসে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার অভিপ্রায়। পত্রখানি পড়িয়া রাগে সেখানা মুচড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। আপন মনে বলিতে লাগিলাম—একটা মাস এগিয়ে ১লা এপ্রিল বিবাহ হলেই ভাল হত—"সকল মূঢ়ের দিন"টাই তোদের বিবাহের পক্ষে সুপ্রশস্ত।

শীত ফুরাইল, বসন্তকাল আসিল। কই, ধীরেনের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র ত এখনও আসিল না! আমার উপর সে যা চটিয়াছে, বোধ হয় আমায় নিমন্ত্রণই করিবে না।

নিমন্ত্রণপত্র আসিল না—কিন্তু একদিন এক টেলিগ্রাম আসিল। সর্ব্বনেশে টেলিগ্রাম। বার্থা টেলিগ্রাম করিয়াছে—"ধীরেন সাংঘাতিক পীড়িত। সে তোমায় দেখিতে চায়—শীঘ্র এস।"

সেইদিনই সন্ধ্যার পর গ্লাডস্টোন ব্যাগে খানকতক কাপড় চোপড় পুরিয়া আমি স্কচ এক্সপ্রেসে গ্লাসগো যাত্রা করিলাম।

পরদিন বেলা দশটার সময় গ্লাসগোতে নামিয়া, ক্যাব লইয়া, সোজা বার্থার ঠিকানায় গিয়া পৌঁছিলাম। দরজায় কড়া নাড়িতে একটা লালমুখী মোটা মাগী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, "তুমি কি মিস্টার ড্যাট? আমার কন্যা বার্থা কি তোমায় টেলিগ্রাম করিয়াছিল?"

ও হরি! এই বুঝি বিবি ম্যাকজন? আমি ভাবিয়াছিলাম এ বাড়ীর দাসী। টুপী তুলিয়া বলিলাম, "হাঁ, মিস বার্থার টেলিগ্রাম পাইয়াই আমি আসিয়াছি। তিনি কোথায়?"

বিবি ম্যাকর্জন বলিলেন, "ভিতরে আসুন বলিতেছি।"—আমাকে ড্রয়িংরুমে লইয়া গিয়া বসাইয়া বলিলেন, "বার্থা হাসপাতালে। মিস্টার ঘোষাল সেখানে বসন্তরোগে শয্যাশায়ী—বার্থাই তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে।—আমি মেয়েটাকে কত নিষেধ করিয়াছিলাম, মিনতি করিয়াছিলাম, রাগ করিয়াছিলাম,—বলিয়াছিলাম, মিস্টার ঘোষাল লক্ষপতির সন্তান, তাঁহার ত টাকার অভাব নাই—উচ্চ বেতনে ভাল ভাল নার্স নিযুক্ত করিয়া দাও—না হয় আমিও কিছু সাহায্য করিব—ও সব ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ—"

দেখিলাম বক্তৃতা দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা; বাধা দিয়া বলিলাম "ঘোষাল এখন কেমন আছেন, আপনি জানেন কি?"

বিবি ম্যাকজন বলিলেন, "কাল বিকালেও আমি সংবাদ লইতে গিয়াছিলাম। হাউস সার্জ্জন বলিলেন, অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি আরও বলিলেন, 'তোমার মেয়ে প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর সেবা করিতেছে'—তার ধৈর্য্য তার সাহিষ্ণুতা তার বুদ্ধির ?কস্তর প্রশংসা করিলেন; আশঙ্কাও প্রকাশ করিলেন, যথেষ্ট সাবধানতা লওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি রোগের বীজ বার্থার শরীরে সংক্রামিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। মিষ্টার ড্যাট—আপনি আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে; এখন চলুন দুজনেই যাই—দুইজন বা তিনজন ভাল ভাল বহুদর্শী নার্স নিযুক্ত করিয়া বার্থাকে বুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত করি—নহিলে,—নহিলে,—বার্থাকে যদি ঐ রোগে আক্রমণ করে—তবে আমার কি হইবে!" —বলিয়া বৃদ্ধা চোখে রুমাল দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, যাই চলুন; আমার ব্যাগটা দয়া করিয়া এখন আপনার গৃহে রাখুন, ফিরিয়া, একটা বাসা ঠিক করিয়া উহা লইয়া যাইব।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ব্যাগ দিন, দয়া করিয়া দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি কাপড় বদলাইয়া আসিতেছি। আপনার জন্য এক পেয়ালা চা ও কিছু প্রাতরাশ পাঠাইয়া দিব কি?"

আমি বলিলাম, "না, ধন্যবাদ। প্রাতরাশ আমি ট্রেণেই শেষ করিয়াছি।"

বৃদ্ধা ব্যাগ লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, পূর্ব্বে যাহা মনে করিয়াছিলাম, ধীরেন বহু লক্ষপতির সন্তান শুনিয়াই বার্থা তাহাকে জালে ফেলিয়াছে—সে ধারণা দেখিতেছি ভুল। আসল ভালবাসা না থাকিলে নিজের জীবন কেহ সংকটাপন্ন করিতে পারে না এ কথা সুনিশ্চিত।

দশ মিনিট পরে, বৃদ্ধা নামিয়া আসিলেন। রাস্তায় বাহির হইয়া ক্যাব লইয়া আমরা হাসপাতালে গিয়া পৌঁছিলাম।

হাউস সার্জ্জন সাহেবের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন, "ঘোষালের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই যাইতেছে। জীবনের আশা খুবই কম।"

বার্থার মা বলিলেন, "আমার মেয়ের কি হইবে, ডাক্তার? তার রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? ঈশ্বরের দোহাই, ডাক্তার, আমার মেয়েকে রোগীর নিকট হইতে তাড়াইয়া দাও। নহিলে সেও বাঁচিবে না।"

ডাক্তার বলিলেন, "তিনি সাবালিকা। স্বেচ্ছায় না গেলে আমরা ত জোর করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে পারি না।"

"তাকে খুব ভয় দেখাও। বল, এইবেলা তুমি সরিয়া পড়, নহিলে তুমি সুদ্ধ মরিবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে ভয়ও দেখাইয়াছি। কোনও ফল হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, উনি আমার স্বামী এবং উনি হিন্দু। উনি যদি মরেন, আমি নিজেকে হিন্দু বিধবা বলিয়া মনে করিব—এবং সতী হইব।"

বিবি ম্যাকজন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কি? সতী হইব কি?"

ডাক্তার সাহেব শিক্ষিত ব্যক্তি, ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া, আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই না মিঃ ড্যাট?"

আমি বলিলাম, তাই বটে।'

শুনিয়া বিবি ম্যাকজন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"Oh, how foolish! How horrible!" (উঃ—কি মূঢ়তা! কি ভয়ঙ্কর!) হায় হায়, কি হবে ডাক্তার? রোগী যদি মরে, বার্থা যদি তার সঙ্গে জীবন্ত পুড়িয়া মরিতে চায়, তবে কি সর্ব্বনাশ হইবে! আমার যে একগুঁয়ে মেয়ে, সব পারে ও! উহা নিবারণের কি কোনও উপায় নাই ডাক্তার?"

ডাক্তার বলিলেন, "যথেষ্টই আছে। আমাদের আইনে উহা চলিবে না। আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে পুলিশ গিয়া বাধা দিবে!"

"Thank God!"—(ঈশ্বরকে ধন্যবাদ)—বলিয়া বৃদ্ধা একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আমাদের সেখানে রাখিয়া, ডাক্তার রোগীকে দেখিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া রোগী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করিবেন চলুন—কিন্তু আধঘণ্টা মাত্রই।"

বসন্ত রোগীর সান্নিধ্যে কাহাকেও লইয়া যাইতে হইলে যে সকল প্রক্রিয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা করিয়া, ডাক্তার আমায় ধীরেনের কক্ষে লইয়া গেলেন। তার সারাদেহ কম্বলে ঢাকা—কেবল মুখখানি বাহির হইয়া আছে। সে মুখ আমি চিনিতে পারিলাম না—বসন্ত গুটিকায় তাহা আচ্ছন্ন। দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু রোগীর সাক্ষাতে অশ্রুপাত করা অন্যায় বিবেচনায় বহু কষ্টে আমি উহা সম্বরণ করিলাম।

ডাক্তার সাহেব বার্থাকে বলিলেন, "মিস ম্যাকজন, তুমি চল, স্নানাদি করিয়া, তোমার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। তিনি তোমায় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

বার্থা, ধীরেনের শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিল, "তুমি ততক্ষণ তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা কও, প্রিয়তম, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

ক্ষীণস্বরে ধীরেন কি বলিল আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না। বার্থা ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে চলিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছ, ধীরেন?"

ধীরেন ক্ষীণস্বরে বলিল, "আর, কেমন আছি ভাই! আমার দিন ত ফুরিয়ে এসেছে! বড়জোর আর একদিন কি দু'দিন বোধ হয়!"

আমি বলিলাম, "ননসেন্স! ও কি কথা? তুমি ভাল হবে। ২।১ দিনের মধ্যেই বোধ হয় একটু সুরাহা হবে।"—মুখে বলিলাম বটে কিন্তু বুকে জোর পাইলাম না।

ধীরেন বলিল, "সে সম্ভাবনা কম। কিন্তু আমি গেলে আমার বাপ মার কি হবে? তাঁদের না হয় অন্য পুত্রকন্যা আছে—কিন্তু বার্থার কি হবে?"

বলিলাম, "শুনলাম, উনি যেমন তোমার সেবা করছেন, তেমন সেবা মা কিম্বা স্ত্রী ছাড়া বোধ হয় আর কেউ পারে না।"

ধীরেন বলিল, "বেশী—বেশী। কোথায় মনে করেছিলাম আর মাসখানেক পরে ওকে বিবাহ করে সুখী হব—তা না হয়ে, হল কিনা চিরবিদায়ের ব্যবস্থা!"

আমি মাথা নত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। শেষে বলিলাম, "ভাই, ছমাস পূর্ব্বে তুমি যখন প্রথম ওর কথা আমায় বলেছিলে, তখন ওঁর সম্বন্ধে আমি নিষ্ঠুর ও অপমানকর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলাম, এখন দেখছি তা ভুল—মহা ভুল। সে জন্যে তুমি আমায় মাফ কর ভাই।"

ধীরেন বলিল, "এ দেশে যেমন পাঁচটা আমরা দেখি, সেই অনুসারেই তুমি বলেছিলে, তোমার দোষ কি? তুমি ত জানতে না। আর, ওর যে এত গুণ, তা আমিই কি তখন সব জানতাম? ওকে বিয়ে করে নিয়ে গেলে আমার মা বাপ আত্মীয়স্বজন বিরক্ত হবেন শুনে ও কি বলেছিল জান? ও বলেছিল, আমি ত সেখানে গিয়ে মেমের মত থাকব না। তোমার বোনদের ছবিতে যেমন দেখেছি আমি সেই রকম শাড়ী পরবো, সিন্দুর পরবো, হাতে খাব, খালি পায়ে বেড়াব—তা হলেও কি আমি তাঁদের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারবো না?—সবই হল। শাড়ী শাঁখা সিন্দুর সবই পরা হল!" বলিতে বলিতে ধীরেনের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেবের নিকট বার্থা যে সতী হইবার কথা বলিয়াছিল, সে কথা ধীরেন ত

শোনে নাই, ভাবিলাম এখন উহাকে বলি। তার পর আবার মনে হইল, সে কথা বলিয়া উহার যাতনা বাড়াইয়া আর ফল কি?

একটু শান্ত হইয়া ধীরেন বলিল, "ভাই দুটি কাজের জন্যে তোমায় ডেকেছি। প্রথম, আমার মৃত্যু হলে, এরা যেন আমায় কবর না দেয়। লণ্ডনে ক্রিমেটোরিয়ম্ আছে, আমার কফিন সেইখানে নিয়ে দাহ কোর। দ্বিতীয় কথা, ব্যাঙ্কে আমার এখনও পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর জমা আছে। বাসায় আমার ওয়ার্ডরোবের দেরাজে আমার চেকবই আছে। দু'তিনখানা চেক আমার সই করাও আছে। অন্ত্যেষ্টি খরচ দুই একশো পাউণ্ড যা লাগে তা বাদে, সমস্ত টাকার চেক লিখে বার্থাকে দিও। এই দু'টি কাজের জন্যেই বিশেষ করে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আর, দেশে ফিরে গিয়ে, আমার মা বাপকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিও। আর কি বলবো?"—আবার তার চোখ দিয়ে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার সাহেব এই সময় আসিয়া বলিলেন, "মিস্টার ড্যাট, আধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করেন ত আবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারেন।"

ধীরেনের দিকে চাহিযা বলিলাম, "এখন তা হলে আসি ভাই।"—বলিয়া উঠিলাম।

করিডরে যাইতে যাইতে দেখিলাম, স্নান সারিয়া, তপস্বিনী গৌরীর মত, বার্থা রোগীকক্ষ অভিমুখে যাইতেছেন। আমি টুপি তুলিলাম,—কেবলমাত্র এটিকেট রক্ষার জন্য নহে,—তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার বুক ভরিয়া গিয়াছিল।—নীরবে আমি তাঁহাকে সম্মান জ্ঞাপন করিলাম।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

আর তিনটি দিন মাত্র ধীরেন জীবিত ছিল। তাহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেই, সেই কাল ব্যাধি, বার্থার শরীরেও আত্মপ্রকাশ করিল।

আমি তৎপূর্ব্বেই ধীরেনের চেকবই হইতে দুইখানি চেক কাটিয়া রাখিয়াছিলাম। একখানি অন্ত্যেষ্টি-ব্যয় জন্য, অপরখানি বার্থার নামে। ধীরেনের মৃত্যুর পরদিন বার্থার চেকখানি আমি ডাক্তার সাহেবের হাতে দিয়া যথাকর্ত্তব্য তাঁহাকেই করিতে বলিয়াছিলাম।

পরদিন বার্থার সঙ্গে গিয়া আমি দেখা করিলাম।

বার্থা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কবে লণ্ডনে ফিরিবেন?"

বলিলাম, "তোমাকে আরোগ্যের পথে দেখিয়া, তারপর আমি যাইব।"

বার্থা একটু মৃদু হাসিল। বলিল, 'ধীরেনের কফিন ভাল জায়গায় আছে ত?"

"আছে।"

"দেখুন, আমি মরিলে, আমাকেও যেন কবর দেয় না। আমিও দাহ হইব। এবং —বুঝিলেন?"

আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি। ঈশ্বর করুন, তাহা যেন আমায় না করিতে হয়। আপনি ভাল হইয়া উঠুন।"

বার্থা বলিল, "ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি, দেখা যাউক। দেখুন, ধীরেনের সেই চেকের কথা। যদি আমি বাঁচি, ও চেক আমি লইব, যদি না বাঁচি, তবে ঐ টাকা এই হাসপাতালে, ধীরেনের স্মৃতিরক্ষার্থে দিয়া যাইব। ডাক্তার সাহেবকে আমি সে কথা বলিয়াছি।"

প্রতিদিন আমি গিয়া বার্থার সংবাদ লইতাম। সপ্তম দিনে বার্থার আত্মা তার প্রিয়তমের আত্মার অনুসরণে অনন্তের পথে ছুটিল।

পরদিন রাত্রের ট্রেণে, একযোড়া কফিন বুক্ করিয়া, একই ভ্যানে পাশাপাশি রাখাইয়া

লণ্ডনে লইয়া গেলাম। ক্রিমেটোরিয়মের অধ্যক্ষকে যাত্রার পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। অপরাহ্ন কালে লণ্ডনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে তাহাদের শববাহী গাড়ী আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সেই গাড়ীতে উভয় কফিন লইয়া, দাহগৃহের একটি লৌহময় চেম্বারের মধ্যে দুটিকে পাশাপাশি স্থাপন করাইয়া, ফুল কিনিতে গেলাম। ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। শ'খানেক টাকার ফুল ও মালা কিনিয়া আনিয়াছিলাম, কফিন দুইটির উপর সেগুলি সাজাইয়া দিলাম। তার পর, চেম্বারের লৌহদ্বার রুদ্ধ হইল। অধ্যক্ষ, বিদ্যুৎগৃহে প্রবেশ করিয়া, সুইচ টিপিয়া দিলেন।

"এইবার তোদের ফুলশয্যা হোক"—বলিয়া, চোখে রুমাল দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

দত্ত সাহেবের কাহিনী শেষ হইল, তখন রাত্রি প্রায় ১টা। "বাই জোভ!—এত রাত হয়েছে?"—বলিয়া শ্রোতৃগণ উঠিলেন। নীচে নামিয়া, নিজ নিজ মোটরে আরোহণে ক্লাব পরিত্যাগ করিলেন।

রেলে কলিসন

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

বঙ্গবাসী কলেজে বি-এ পড়িতেছিলাম, এমন সময় বঙ্গভঙ্গের ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া সভা-সমিতিতে ছুটাছুটি, ফেডারেসন হলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ, এবং স্বদেশী বস্ত্রের মোট কাঁধে করিয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিতে লাগিলাম। দুই একটা সভায় বক্তৃতা করিবার পর, সুবক্তা বলিয়া কিছু খ্যাতি অর্জ্জন করা গেল। মনে আছে বীডন উদ্যানে এক সভা অন্তে স্বয়ং সুরেন বাঁড়ুয্যে আমার পিঠ থাবড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "জিতা রও বাবা!" এই সময় কলিকাতা ইউনিভারসিটির নাম হইয়া গেল—"গোলামখানা"। কে একজন, একখানা কাগজে বড় বড় অক্ষরে "গোলামখানা" লিখিয়া সেনেট হাউসের দেওয়ালে আঁটিয়া দিয়াছিল। সুতরাং অনেকের সঙ্গে আমিও কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের ষাঁড় হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পড়াশুনার দিকে ঝোঁক কোনও দিনই আমার ছিল না, পিতা মাতাও জীবিত নাই যে তাড়না করিবেন। পড়িতাম শুধু ফ্যাসনের অনুরোধে—আর পাঁচজনে যাহা করে তাহা করাই উচিত বলিয়া, —সে বালাই দূর হইল; হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কালক্রমে উত্তেজনার ভাবটা কতক কমিয়া গেলে, স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবসায় করিব বলিয়া ঠিক করিলাম। ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁকটা আমার বাল্যকাল হইতেই। যখন স্কুলে পড়িতাম, মনে আছে, নয় আনা দিয়া একশিশি লজেঞ্জুষ কিনিয়া, পয়সায় তিনটা করিয়া ছেলেদের নিকট বিক্রয় করিয়া বারো আনা করিতাম। জলছবি আনাইয়া, ঐরূপে খুচরা বিক্রয় করিয়া, টাকায় আট আনা লাভ করিতাম। অভাবের জন্য যে এরূপ করিতাম তাহা নহে; আমার পিতার কিছু ধন সম্পত্তি ছিল। ছেলেরা আমায় বলিত, "আর জন্মে তুই মাড়োয়ারী ছিলি।" তাই বোধ হয় ছিলাম; ব্যবসার প্রসঙ্গ শুনিতে, ব্যবসায়িগণের সঙ্গে মেলামেশা করিতে মনে যে আনন্দ হইত, কোনও জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বা দেশপ্রসিদ্ধ কবির সহিত আলাপেও তাহা হইত না।

দেশে আমার পৈতৃক নগদ টাকা কিছু ছিল—বেশী নয়, হাজার পাঁচেক হইবে। ব্যবসায়ে সব টাকাটা একেবারে ফেলিব না স্থির করিয়া, দুই হাজার টাকার ধুতি শাড়ী

প্রভৃতির জন্য আহমেদাবাদের এক বিখ্যাত মিলে অর্ডার পাঠাইলাম। বড়বাজার স্ট্রীটে একখানা দোকান ঘর ভাড়া লইয়া, মাল রাখিবার জন্য র‍্যাক নির্ম্মাণ করিতে মিস্ত্রী লাগাইয়া দিলাম। সাইন বোর্ড আঁকাইতে দিলাম, তাহাতে লেখা থাকিবে "বন্দে মাতরম্ বস্ত্র ভাণ্ডার—সোল প্রোপ্রাইটর এ, বি, কাঞ্জিলাল।" বলিতে ভুলিয়াছি, আমার নাম শ্রীঅটল-বিহারী কাঞ্জিলাল।

র‍্যাক-আদি নির্ম্মিত হইল; সাইন বোর্ড প্রস্তুত, এবং একদিন আহমেদাবাদ হইতে পত্র আসিল, মিলের মালিক পাঁচ গাঁইট মাল পাঠাইয়া "বিল্‌টী" (মালের রসিদ) খানা ভিঁপি করিয়াছেন, টাকা দিয়া ভি-পি লইয়া আমি যেন মাল খালাস করিয়া লই। তৎসঙ্গে একটি 'চালান' (জিনিষের ফর্দ্দও) আসিয়াছে। পরদিন পোষ্ট আপিস হইতেও ইন্টি-মেসন পাইলাম। মহোল্লাসে সেইদিনই গিয়া দুই হাজার বাহাত্তর টাকা দিয়া ভি-পি ছাড়াইয়া লইলাম।

রসিদ আসিয়াছে ডাকগাড়ীতে, মাল রওনা হইয়াছে মালগাড়ীতে সুতরাং পোঁছিতে দেরী হইবে; তাই এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া, হাওড়ার মালগুদামে গিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কত লোকের কত গাঁইট আসিয়া স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে—কিন্তু আমার মাল ত কই আসে নাই! একজন বাবু বলিলেন, "আহমেদাবাদ কি এখানে মশাই! আরও হপ্তাখানেক পরে এসে খবর নেবেন।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

সপ্তাহ পরে আবার গিয়া সংবাদ লইলাম—না, মাল আজিও আসে নাই। দুইদিন, তিনদিন অন্তর মালগুদামে যাইতে লাগিলাম, মালের কোনও পাত্তাই নাই। এইরূপে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল।

একদিন মালগুদামে দাঁড়াইয়া, একজন পরিচিত লোককে আমার দুর্দ্দশার কথা বলিতেছিলাম। নিকটেই একজন মাড়োয়ারী বালক দাঁড়াইয়া ছিল,—বছর বারো বয়স হইবে—সে ছোঁড়া শুনিয়া, হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি রাগত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁসিতা হ্যায় কাহে জী?" ছোকরা পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিল, "হাসছি বাবু, আপনার আক্কেল দেখে! মাল এসে পোঁছল কি না, তার ঠিক নেই, এক ঝুড়ি টাকা দিয়া বিল্‌টী ছাড়িয়ে নিলেন! বিল্‌টীর ভি-পি এলে আমরা প্রথমে মালগুদামে এসে খবর নিই যে মাল এসেছে কি না। মাল স্বচক্ষে দেখে, তবে আমরা পোষ্ট আপিসে যাই। বিল্‌টী তিন হপ্তা ডাকঘরে জমা থাকে।"

ছোকরার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। ঠিক কথাই ত! কিন্তু কই, এ কথা ত এতদিন কেহই আমায় বলে নাই। এই বারো বছরের ছোঁড়া এ কথা জানে, —অথচ সে কালিদাস পড়ে নাই, ভবভূতি পড়ে নাই,—সেক্সপিয়রের মিলটনের নামও তাহার উৰ্দ্ধতন চতুৰ্দ্দশ পুরুষ কেহ শ্রবণ করে নাই।

মাল আসিল না। রেল কোম্পানীর নিকট দরখাস্ত করিয়াছি, তাঁহারা ছাপা ফরম ফিল-আপ করিয়া উত্তর দিয়াছেন, "অনুসন্ধান করিতেছি।" সে তাঁরা করুন; আমি ত মাল পাইবার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা করিয়া রেল কোম্পানির নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে হইবে—কিন্তু সে পরের কথা। আপাততঃ, বস্ত্র খরিদ জন্য স্বয়ং আহমেদাবাদ যাত্রা করিলাম। বিভিন্ন মিলে গিয়া স্বয়ং দেখিয়া মাল অর্ডার দিব। বিভিন্ন মিলে—কারণ সব খরিদ্দারের পছন্দ একরকম নহে। এ জ্ঞানটুকুও সম্প্রতিই অর্জ্জন করিয়াছি। ফিরিয়া আসিয়া, হাওড়ায় আমার মাল পোঁছিয়াছে স্বচক্ষে দেখিয়া, তার পর পোষ্ট আপিস হইতে বিল্‌টীর ভি-পি ছাড়াইব।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বোম্বাই মেলে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। ইণ্টার ক্লাশের টিকিট ছিল। ইটার্সি ষ্টেশন ছাড়াইয়া রাত্রি হইল। ব্যাগে লুচী, আলুভাজা ও মোহনভোগ ছিল, তাহাই খাইয়া, বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমার কামরায় তখন দুইজন মাত্র আরোহী ছিল। আমি জাগিয়া থাকিতেই তাহারা নামিয়া গেল। তার পর আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম জানি না, একটা কর্ণবধিরকারী বিরাট ভীষণ শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি বেঞ্চির উপর হইতে ছিটকাইয়া মহাবেগে কোথায় যেন পতিত হইলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি সমস্তই অন্ধকার। একটা মড়মড় কড়কড় শব্দ এবং সেই সঙ্গে অনেক লোকের করুণ আর্ত্তনাদ কাণে আসিতে লাগিল। নিজে তখনও আমি দুলিতেছি—আমার ডান দিকের উরতে এবং মাথার পশ্চাতে ভীষণ যন্ত্রণা। বুঝিলাম, ট্রেণে কলিসন হইয়াছে।

দোলানি ও মড়মড় কড়কড় শব্দ শীঘ্রই থামিয়া গেল। উরতে হাত দিয়া দেখিলাম একটা কাঠের টুকরা সেখানে বিঁধিয়া রহিয়াছে। সেটা খুলিয়া ফেলিতেই, যন্ত্রণা একটু কমিল বটে, কিন্তু দর দর ধারায় রক্তপাত হইতে লাগিল তাহা স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম, এ কলিসনে আমি মরি নাই, মরিলে ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িত না; ভাঙা গাড়ীর স্তূপের ভিতর জীবন্ত সমাধি লাভ করিয়াছি।

বাহির হই কি করিয়া? কই, কোনও দিকে ত একটু আলোকের কণাও দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু শ্বাসকষ্টও ত অনুভব করিতেছি না—বায়ু প্রবেশের পথ কোথাও নিশ্চয়ই আছে। এবং সেই পথেই, নরনারীর সমবেত কণ্ঠোত্থিত আর্ত্তনাদও শ্রবণপথে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

বাহির হইবার কোনও উপায় কি নাই?

এই অন্ধ তমোগহ্বরে, অনাহারে মৃত্যুই কি আমার অদৃষ্টলিখন? তার চেয়ে, মস্তক চূর্ণ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পরলোক পাড়ি দিতে পারিলেই ত ভাল হইত! সেই অন্ধকারে চারিদিক হাতড়াইতে লাগিলাম। একটা কোমল দ্রব্য স্পর্শ করিলাম—মনুষ্যদেহ। স্পর্শে আরও জানিলাম, তরুণী নারীদেহ। তাহাকে ঠেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মরে গেছ নাকি?"

কোনও উত্তর নাই। ও তবে মরিয়াছে। জীবিত ও মৃত—একত্র সমাধিস্থ। আরও চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিলাম, আর কাহাকেও পাইলাম না। আরব্য উপন্যাসে পড়িয়াছিলাম, সিন্ধবাদ সে কোন দেশে গিয়াছিল, সেখানে স্বামী মরিলে জীবন্ত স্ত্রীকে এবং স্ত্রী মরিলে জীবন্ত স্বামীকে একত্র সমাধিস্থ করা হয়—আমি কি সেই দেশে রহিয়াছি এবং এই তরুণীই কি আমার মৃতা পত্নী? বিশেষ চেষ্টায় স্মরণশক্তি প্রয়োগ করিয়া জ্ঞান হইল—না, তাহা নয়, আমি অবিবাহিত বাঙ্গালী যুবক, এবং মাল খরিদ করিবার জন্য এই ট্রেণে আহমেদাবাদ যাইতেছিলাম।

নিজ উরতের ক্ষত স্থানে হাত দিয়া যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় একটা গোঙানি শব্দ শুনিতে পাইলাম। জয় জগদীশ্বর!—ও তবে মরে নাই—বাঁচিয়াই আছে! মৃত্যু-নদীর তটপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, একটি জীবিত প্রাণীর সঙ্গলাভে যেন কৃতার্থ হইয়া গেলাম। হাত বাড়াইয়া মেয়েটির গা ঠেলিয়া বলিলাম, "তুমি বেঁচে আছ?"

সে ক্রন্দনের স্বরে বলিল—"আগে মাঈ গে মাঈ!"

বুঝিলাম বাঙালীর মেয়ে নয়, হিন্দী কথা কয় যে!

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বহুত চোট্ লাগা?"

সে কেবল কাৎরাইতে লাগিল।

ক্ষণপরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "বহুৎ জখম হুয়া ?"

সে বলিল, "বড়া দুখাতা হায় মাঈ যে মাঈ !"

বলিলাম, "কাঁদনেসে ক্যা হোগা ? গাড়ী জড় গিয়া। হামলোগ সব চাপা পড় গিয়া। তুমারা নাম ক্যা ?"

সে বলিল, "সরস্বতী"—বাঙ্গলা ধরণে নয়, সংস্কৃত ধরণে শব্দটা উচ্চারণ করিল।

ক্রমে ক্রমে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, তাহার পিঠে শিরদাঁড়ায় আঘাত লাগিয়া বড় যন্ত্রণা হইতেছে, রক্তপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই ট্রেণে অন্য কামরায় তাহার পিতাও আছেন, সে দেড়া মাসুলের মেয়েকামরায় ছিল। হাওড়ায় ট্রেণে উঠিবার সময়, আমাদের কামরার পাশে ইন্টার ক্লাসের মেয়েকামরা দেখিয়াছিলাম; বুঝিলাম মাঝের পার্টিসন ভাঙ্গিয়া, বিধাতা তাহাকে আমার কামরায় আনিয়া ফেলিয়াছেন।

সরস্বতী বলিল, "এ বাঙ্গালী বাবু, হামলোক জিয়েগা ?"

বলিলাম, "দেখো, রামজীকা ক্যা মর্জ্জি !"

বালিকা তখনও কাতরাইতেছে দেখিয়া বলিলাম, "এ জী ! তুমারা পিঠমে একটু হাত বুলায় দেগা ?"

সে বলিল, "হাঁ বাবুজী !"

বলিলাম, "আচ্ছা, তবে থোড়া কাছমে সরে আও।"

সে তেমনি কাতরাইতে লাগিল। বোধ হয় অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা তাহার বিলুপ্ত। আমি কষ্টে সৃষ্টে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখিলাম, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া পড়িয়া আছে, পিঠের মাঝখানটা বিষম ফুলিয়াছে। তাহার "আঙিয়া"র সে স্থানটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আমি অতি মৃদুভাবে সেখানে হাত বুলাইতে লাগিলাম। বোধ হয় বালিকার আরাম হইতেছিল, তাহার কাতরাণী একটু কমিল।

কথাবার্ত্তাগুলার বাঙ্গলা অনুবাদই দেওয়া যাউক।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বাবু, আমরা বাঁচবো ?"

বলিলাম, "নারায়ণ জানেন।"

"আমার বাবার কি হ'ল ?"

"তাও নারায়ণই জানেন।"

মেয়েটি "বাবু হো !"—বলিতে বলিতে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, "এ জী, কেঁদো না, কপালে যা আছে তা কে খণ্ডাবে বল !"

ক্রমে সে একটু শান্ত হইল। আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। তাহারা গুজরাটী ব্রাহ্মণ। সে এখনও কুমারী। পিতা আছেন, মা নাই। পিতার নাম নগীনদাসজী—তিনি আহমেদাবাদে কাপড়ের ব্যবসায় করেন। তিনি কারবার সম্পর্কিত কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; সরস্বতী কখনও কলিকাতা দেখে নাই—আব্দার লইয়াছিল, তাই মাতৃহারা কন্যাটিকেও তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এখন দেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। সরস্বতীর বয়স ১৫ বৎসর মাত্র।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ জী, তোমার কোন্‌খানে লেগেছে ?"

আমি বলিলাম, "মাথার পিছনটায়, আর উরুতে।"

সে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কষ্ট হচ্চে কি ?"

আমি বলিলাম, "হচ্চে বইকি একটু। উরুতে যত যন্ত্রণা হোক বা না হোক মাথা বড়ই ঝন্‌ঝন্ করছে।"

সে বলিল, "মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবো ?"

"দেবে ? আচ্ছা দাও"—বলিয়া তাহার নিকট আমি একটু সরিয়া গেলাম।

সে, হাত বুলাইতে লাগিল। আমি বলিলাম, "দেখ সরস্বতী! রামজীর কি আশ্চর্য্য লীলা দেখ! কলিসন হ'ল, গাড়ী চুরমার হয়ে গেল, চারিদিকে ভাঙ্গা লোহা লক্কড় স্তূপাকার—মাঝখানে একটা ঘর হয়ে গেল, তার ভিতর শুধু তুমি আর আমি। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি?"

সে বলিল, "খুব আশ্চর্য্য বাবুজী! বড় পিপাসা, একটু জল।"

জল আর কোথায় পাওয়া যাইবে? হঠাৎ মনে হইল, আমার কোটের পকেটে ডিবা ভরা পাণ ছিল। হাত দিয়া দেখি, সে ডিবা আছে। বলিলাম, "জল এখানে কোথায় পাব? পাণ আছে খাবে?"

"দাও!"

ডিবাটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "খুলে নিয়ে খাও।"

সে পাণের ডিবা লইল। খুলিয়া, পাণ খাইয়া বলিল, "তুমি খাবে?"

আমি বলিলাম, "আমার দু'হাতেই তো রক্ত মাখা। তুমি যদি খাইয়ে দিতে পার ত খাই।"

সে, নিঃসঙ্কোচে স্বহস্তে আমায় পাণ খাওয়াইয়া দিল!

মানুষের মনের গতি বিচিত্র। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী হইয়াও, তাহার এই নারী-হস্তেব মমতা-মাখা সেবায় আমার মনে মধুর ভাবের সঞ্চার হইল। বলিলাম, "এ জী! যদি আমরা বাঁচি, তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

সে বলিল, "কেন?"

আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস, রামজীর তাই ইচ্ছা। নয় ত দেখ, আমাদের দু'জনকে এভাবে এক কামরার মধ্যে পুরবেন কেন?"

বালিকা কহিল, "তা ঠিক। কিন্তু বাবু, আমার বাবুজী কি বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন?"

"তিনি যদি আপত্তি না করেন, তবে বিয়ে করবে?"—বলিয়া আমি তাহার হাতখানি ধরিলাম।"

সে বলিল, "আচ্ছা।"

আমি তার হাতখানি ধরিয়া চুম্বন করিলাম। বলিলাম, "বাবুজী কেন মত করবেন না? আমিও ব্রাহ্মণ সন্তান। তুমি আমি দু'জনে তাঁর পা ধরে কাঁদবো; তবু কি তাঁর দয়া হবে না?"

সবস্বতী বলিল, "আচ্ছা। কিন্তু, তুমি ত আমাকে দেখনি আমি সুন্দরী কি কুৎসিৎ।"

বলিলাম, "তুমিও ত আমায় দেখনি। রামজী আমাদের দু'জনকেই দেখেছেন, দেখে-শুনেই এভাবে আমাদের একত্র করে দিয়েছেন।"

সরস্বতী বলিল, "তা ঠিক।"

ইহার অল্পক্ষণ পরেই সরস্বতী ঘুমাইয়া পড়িল—ডাকিয়া আর তার সাড়া পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, সরস্বতী আমায় ঠেলা দিতেছে—"এ জী। ওঠ ওঠ!"

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, নানা ছিদ্রপথে দিবালোক প্রবেশ করিতেছে। বাহিরেও অনেক লোকের গোলমাল।

সেই অল্পালোকে, সরস্বতীর মুখপানে আমি চাহিলাম। চক্ষু বুঝিয়া গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু রামজী আমায় ঠকান নাই। বলিলাম, "বোধ হয়, সরস্বতী, আমরা উদ্ধার পাব। বাইরে অনেক লোকের গলার স্বর শুনছি—ওরা আরোহিদের বাঁচাতে এসেছে।"

সপ্রতীক্ষ হৃদয়ে আমরা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিলাম। তার পর আমাদের

অতি নিকটে, কাঠ ভাঙ্গার দুড়দাড় শব্দ পাইলাম। ক্রমে ক্রমে আলোক প্রবেশের পথ বর্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে, একস্থান সম্পূর্ণভাবে ফাঁক হইয়া গেল। কয়েকটা কাঠের টুকরা ঝরঝর করিয়া আমাদের গায়ে আসিয়া পড়িল। একজন লোক মুখ বাড়াইয়া আমাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "জিতা হায় ?"

আমরা বাহির হইলাম। সরস্বতী দাঁড়াইতে পারে না—আমার কাঁধে ভর দিয়া সে অতি কষ্টে চলিতে লাগিল।

একজন সাহেব আসিয়া আমার নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিল। সরস্বতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম, "ইনি আমার পত্নী।" সাহেব, খাতায় মিস্টার ও মিসেস এ· বি· কাঞ্জিলাল লিখিয়া বলিল, "তোমরা হাঁটিতে পারিবে। হাঁটিয়া পরের স্টেশনে চলিয়া যাও। সেখানে, বিনা পয়সায় পাস মিলিবে, যেখানে ইচ্ছা যাইও।"—বলিয়া সাহেব চলিয়া গেল।

আমরা দুইজনে সরস্বতীর পিতার জন্য বহু অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম তৎপূর্বেই দুইখানা রিলীফ ট্রেণ ভরিয়া বহু মৃত ও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নাগপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সরস্বতী বলিল, পরের স্টেশন অবধি হাঁটিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। নিকটে একখানা গ্রাম দেখা যাইতেছিল। আমরা বিশ্রামের আশায়, কষ্টেসৃষ্টে সেই গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম।

এক সম্পন্ন কৃষকের গৃহে আশ্রয় মিলিল। কৃষক-প্রদত্ত গরম দুধ উভয়ে খানিকটা করিয়া পান করিয়া, তাহার বাহিরের ঘরে চাটাইয়ের উপর শুইয়া দুইজনে ঘুমাইতে লাগিলাম। এখানেও সরস্বতীকে আমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম।

॥ উপসংহার ॥

কৃষকের গৃহে তিনদিন অবস্থিতি করিয়া, একটু সুস্থ হইয়া, কৃষক ও কৃষক-পত্নীকে যথাযোগ্য উপহারাদি দিয়া, আমরা নাগপুর যাত্রা করিলাম। তথাকার হাসপাতালে সরস্বতীর পিতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তাঁহার একটা হাত একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ডাক্তার তাহা আমূল কাটিয়া দিয়াছে, জ্বরঘোরে তিনি অচেতন।

আমরা উভয়ে তাঁহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিলাম। ৫।৬ দিন পরে তাঁহার কতকটা জ্ঞান হইল। সপ্তাহ পরে, তিনি সংলগ্নভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন। বলিলেন, "বেটী ! তোকে যে এ জীবনে আর দেখিতে পাইব সে আশা আমার ছিল না!"

আর কয়েকদিন পরে তিনি উঠিয়া বসিতে পারিলেন।

ক্রমে ক্রমে, আমাদের সকল কথাই তাঁহাকে আমরা বলিলাম। কি অবস্থায়, উভয়ের নিকট উভয়ে সত্যবদ্ধ হইয়াছি তাহা শুনিয়া তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, "মেয়েকে যে আমি জীবিত ফিরিয়া পাইলাম ইহাই আমার ঢের। তোমাদের মিলন, রামজীব ইচ্ছা, বলিয়াই তিনি তোমাদের ওরূপ সঙ্কটের অবস্থা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—আমারও তাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তোমাদের মিলনে আমি বাধা দিব না।"

নগীনদাসজী আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। আর্য্যসমাজ মতে আমাদের বিবাহ হইল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে, বড়বাজারে ঘর ভাড়া লইয়া আমি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান খুলিলাম। মালপত্র তিনিই আনাইয়া দিলেন। আমার দোকান বেশ চলতি হইল দেখিয়া তিনি আহমেদাবাদ যাত্রা করিলেন।

স্বদেশীর কৃপায়, আমার দোকান দিন দিন বেশ গুলজার হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্বশুর মহাশয় বৎসরে একবার করিয়া কলিকাতায় আসিয়া মাসখানেক কাটাইয়া যান। নিজ ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করেন, আমাকে যথোপযুক্ত উপদেশাদি দেন, এবং অবসর সময়টা, তাঁহার দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণকে লইয়া নানাবিধ আনন্দ উদ্যোগে কাটাইয়া দেন।

দাম্পত্য প্রণয়

এক

পল্লীগ্রামে পাশার আড্ডা বসিয়াছে। যাঁহারা খেলিতেছেন, তাঁহারা একমনেই খেলিতেছেন। অপর যাঁহারা জমায়েৎ হইতেছেন, তাঁহারা গুড়ুক ফুঁকিতেছেন ও নানাবিধ গল্প করিতেছেন। এমন সময় প্রৌঢ়বয়স্ক সীতানাথ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সভায় আসন গ্রহণ করিয়া বেণী বসুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুনেছ বোসজা? এবার তারকেশ্বরে যে ভারি ধুম।"

"চড়ক মেলায় নাকি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। মোহান্ত এবার কাশী থেকে বাই, কলকাতা থেকে খ্যামটা নাচ আনাচ্চে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা ত আছেই—আবার কলকাতায় নাকি এক রকম ছিয়াচার উঠেছে, তাও এক দল আসবে। পশ্চিম থেকে ভুরে খাঁ চাঁদ খাঁ এসেছে, তারা ভোজবাজি দেখাবে—সে নাকি একেবারে আশ্চর্য্য কাণ্ড।"

বসুজা বলিলেন, "বটে! এবার তা হ'লে ত ভারি ধুম দেখতে পাই! যাচ্চ নাকি?"

"যাচ্চি ছেড়ে—হুঁ—হুঁ—গিয়েছিই ধ'রে নাও। বলা বাগ্দীর গাড়ীখানা নগদ আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে বায়না ক'রে রেখেছি। সংক্রান্তির দিন ভোরে উঠে রওনা।"—বলিয়া সীতানাথ সকলের পানে চাহিয়া গর্ব্বভরে হাস্য করিলেন।

তারকেশ্বরে সংক্রান্তি-মেলায় এবার এই অভূতপূর্ব্ব আয়োজনের সংবাদ পাইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তারকেশ্বর যাইবার পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইল। কেবল নরহরি বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া, নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। নরহরির বয়স ৩২।৩৩ বৎসর—সে এ গ্রামের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ—অর্থেরও অভাব নাই।

রাধাচরণ বলিল, "বিশ্বাস ভায়া, তুমি যে কিছু বলছ না? তুমি কি যাবে না নাকি?"

নরহরি বিষন্নভাবে বলিল, "দেখি!"

দত্ত মহাশয় গ্রাম সম্পর্কে নরহরির ঠাকুরদাদা। তিনি ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "তুমি দেখবে কি, আমি আগেই দেখে রেখেছি। তোমার যাওয়া হবে না। নাতবৌকে ফেলে কি আর তুমি যেতে পারবে?"

নরহরি বলিল, "সেই ত! বাড়ীতে আর দ্বিতীয় মনিষ্যি নেই—একলা কার কাছে থাকে বলুন!"

এ কথা শুনিয়া অনেকেই নরহরির পানে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। বসুজা মহাশয় থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঢের ঢের স্ত্রৈণ পুরুষ দেখেছি ভায়া, কিন্তু তোমার মত আর একটি দেখিনি। এতই যদি বিরহের ভয়, তবে না হয় যোড়েই চল। দুদিকই বজায় থাকবে।"

একজন বলিল, "দোহাই বোসজা! ও পরামর্শটি দেবেন না ওকে। ও যদি সত্যিই পরিবারটিকে গলায় বেঁধে তারকেশ্বর যায়, তাহলে আমাদের কি দশা হবে ভাবুন দেখি একবার! আমাদের 'তিনি'রাও, ধিনি ধিনি ক'রে নেচে উঠবেন; বলবেন, আমরাও যাব। না ভাই নরহরি, ও কার্য্যটি কোর না, কোর না। 'দুহু দোঁহা মুখ চেয়ে'—প্রেম-চর্চ্চা তোমরা ঘরে বসেই কর।"

অতঃপর নরহরিকে অব্যাহতি দিয়া, অপর সকলে যাইবার পরামর্শে বসিয়া গেল। তামাক ছিলিমটা শেষ করিয়া নরহরি উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

দুই

উপরে যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা আজিকালিকার কথা নহে—প্রায় ৫০।৫৫ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। তখন সবেমাত্র কাশী অবধি রেল খুলিয়াছে। সবেমাত্র সহরের লোকেরা ইংরাজী পড়িতে সুরু করিয়াছে। দূরে পল্লীগ্রামে, অধিকাংশ লোকই তখন নিরক্ষর, কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার প্রচলন ছিল। তাও, পনেরো আনা তিন পাই লোকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ২।৪ বছরে যতটুকু বিদ্যালাভ সম্ভব, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত—অধিক আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ছিল না। এক পাই আন্দাজ লোকই পাঠশালা পার হইয়া সংস্কৃত শিখিতে চেষ্টা করিত। সকলেরই কিছু কিছু জোৎ-জমি ছিল, তাহাতেই তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইত। অবসর-কালে কোনও বৈঠকখানায় জমায়েৎ হইয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহারা তাস-পাশা খেলিত বা গুড়ুক ফুঁকিত—এবং নানারূপ খোস-গল্পে সময় কাটাইত। ইংরাজী না পড়ায়, ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনীকে তাহারা যথোচিত সম্মান করিয়া চলিত এবং কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রবণ করিলে, এখনকার লোকের মত অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া "হাম্বাগ" বলিয়া উড়াইয়া দিত না—বিশ্বাস করিয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত।

এই গ্রামখানির নাম মাণিকপুর, তারকেশ্বর এখান হইতে হাঁটা পথে সাত ক্রোশ মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপহসিত নরহরি বিশ্বাসের সংসারে স্ত্রী কুসুমকুমারী ভিন্ন তাহার আর কেহই নাই। কুসুমের বয়স প্রায় ২৩ হইতে চলিল, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। আর যে হইবে, তাহারই বা আশা কই? গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই বলিত. কুসুমকুমারী বন্ধ্যা এবং নরহরির পুনরায় বিবাহ করা উচিত, নহিলে পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের লোপ অনিবার্য্য।

এই দুঃখটুকু ভিন্ন এই দম্পতীর জীবনে আর কোনও দুঃখের ছায়ামাত্রও ছিল না। স্বাস্থ্য উভয়ের অটুট—ম্যালেরিয়ার নামও সেদিনে কেহ কখনও কর্ণগোচর করে নাই। মদন ও রতির তুল্য রূপবান্ ও রূপবতী না হইলেও, উভয়েই আকার অবয়বে সুশ্রী ও প্রিয়দর্শন ছিল। নরহরি ধনশালী ব্যক্তি না হইলেও, তখনকার হিসাবে সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়াই বিবেচিত হইত। তাহার জোৎ-জমা ছিল, বাগান ছিল, পুকুর ছিল; সে সকলের উপস্বত্বে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। আর একটি অমূল্য সম্পদের তাহারা অধিকারী ছিল—অবিচ্ছিন্ন ও গভীর দাম্পত্য প্রণয়। বস্তুতঃ, তাহাদের দাম্পত্য প্রণয় গ্রামের মধ্যে প্রবাদ বচনের মতই প্রচারিত ছিল। স্বামীরা বলিত, "স্ত্রী যদি হতে হয়, তবে ঐ বিশ্বেসদের কুসুমের মতই হওয়া উচিত।" স্ত্রীরা বলিত, "স্বামী যদি হ'তে হয়, তবে ঐ নরহরি ঠাকুরপোর মতই যেন হয়। আজ প্রায় ১৫।১৬ বচ্ছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে—এখনো পর্য্যন্ত দুটিতে যেন জোটের পায়রা।"

কিন্তু এ সকল মন্তব্য তাহারা প্রায় নিজ নিজ দাম্পত্য কলহের সময়েই প্রকাশ করিত। সুস্থমনে পুরুষরা বলিত, বুড়া হইতে চলিল, এ বয়সেও সেই বিশ বছরের ছোঁড়ার মত,

'পলকে প্রলয়' গণিয়া স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া বেড়ানো, নরহরির নির্লজ্জ ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নহে। স্ত্রীলোকেরা বলিত, "বুড়ী মাগী,—সময়ে একটা মেয়ে জন্মালে আজ নাতির দিদিমা হ'ত, এ বয়সে চৌদ্দ বছুরী ছুঁড়ীর মত 'প্রাণনাথ' বলে স্বামীর গায়ে ঢলে ঢলে পড়া!—গলায় দাঁড়, গলায় দাঁড়!"—ইত্যাদি। এ সকল মন্তব্য যে এই দম্পতীর কাণে আসিয়া পৌঁছিত না, এমন নহে,—শুনিয়া তাহারা হাসিত মাত্র—এবং পরস্পরকে অধিক আদরে-সোহাগে ডুবাইয়া রাখিত।

তিন

মহা ধুমধামের সহিত তারকেশ্বরে চড়ক-মেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চড়ক ত মাত্র এক দিন, কিন্তু মেলাটি সপ্তাহকাল থাকিবে। মাণিকপুরের অধিকাংশ পুরুষই—কেহ গো-শকটে, কেহ পদব্রজে—তারকেশ্বরে আসিয়াছে এবং বলা বাহুল্য, পথি নারী বিবর্জ্জিতা নীতির অনুসরণ করিয়া কেহই নিজ স্ত্রী কন্যা ভগিনীকে সঙ্গে লয় নাই। ২/৩ দিন পরে গ্রামবাসী কেহ কেহ মেলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং উৎসবের বর্ণনায়, যাহারা যায় নাই বা যাইতে পায় নাই, তাহাদিগকে ব্যস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

৩রা বৈশাখ অপরাহ্ণকালে পাড়ার ৩।৪ জন বর্ষীয়সী বিধবা স্ত্রীলোক কুসুমকুমারীর কাছে আসিয়া ধরিয়া বসিল—"এত ধুমধাম, আমরা কিছুই কি তার দেখতে পাব না? সংসারে কি কেবল খেটে মরতেই এসেছি? তোমার স্বামীকে বল, আমাদের সকলকে তারকেশ্বরে নিয়ে চলুন।"

খুড়ীমা, জ্যেঠাইমা—যাহার সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ অনুসারে সম্বোধন করিয়া কুসুম বলিল, "কিন্তু শুনলাম, সেখানে যে রকম ভীড় হয়েছে, বাসা পাওয়াই যে শক্ত হবে। পুরুষমানুষেরা গাছতলাতেও পড়ে থাকতে পারে! কিন্তু আমরা মেয়েছেলে ত তা পারবো না!"

এক বৃদ্ধা কহিলেন, "সে জন্যে কোনও ভাবনা নেই। আমার ভাইঝির বিয়ে হয়েছে, তারকেশ্বরের খুব কাছেই। এমন কি, সে গ্রামের বাইরে বেরুলেই মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাওয়া যায়। সেইখানে গিয়ে আমরা থাকবো এখন। আমি যখন বাবাকে দর্শন করতে যাই, সেইখানেই গিয়েই ত থাকি। জামাইটি বড় ভাল, অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল, আমাদের গুরুর আদরে রাখবে, তুমি দেখো।"

অবশেষে কুসুম স্বীকৃত হইল। বলিল, "আচ্ছা, ওঁর কাছে কথাটা পেড়ে দেখি, উনি কি বলেন।"

পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "ওলো নাতবৌ, তুই যদি বায়না নিস্ ত নাতির সাধ্যি নেই যে, সে কথা ঠেলে।"

বাস্তবিক, বৃদ্ধার ভবিষ্যদ্‌বাণীই সফল হইল। নরহরি সম্মত হইল। পরদিন প্রাতে একখানি গো-শকটে সস্ত্রীক নরহরি এবং অপর একখানিতে ঠান্‌দি, খুড়ীমা ও জ্যেঠাইমা তারকেশ্বর যাত্রা করিলেন।

চার

মাণিকপুর গ্রাম হইতে আগত বেণী বসু, সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি একত্র বাসা করিয়াছেন। যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক প্রভৃতি দেখিয়া খুব আনন্দেই তাঁহারা সময় কাটাইতেছিলেন। বিশেষতঃ বেণী বসু থিয়েটার দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছেন। এই দলটি কলিকাতার কোনও একটি "অবৈতনিক" সম্প্রদায়। পুরুষমানুষই গোঁফ-দাড়ি

কামাইয়া স্ত্রীলোক সাজে। এক দিন শকুন্তলা, এক দিন নবনাটক এবং একদিন নীল-দর্পণ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই আর এক দিন নীলদর্পণ অভিনীত হইবে। থিয়েটারের দল যেখানে বাসা করিয়াছে, বেণী বসু তথায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই দলের কয়েক জন লোকের সহিত বেশ আলাপও জমাইয়া তুলিয়াছেন। সীতানাথ ঠাকুর্দার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিয়াছেন, গ্রামে ফিরিয়া তথায় একটি থিয়েটারের দল খুলিতে হইবে। এই অবৈতনিক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অভিনেতা শিবনাথ সান্যাল এ বিষয়ে ইঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শিবুর বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর, কথাবার্ত্তায় খুব চৌকস ; কিন্তু একটু ইংরাজী বুকনি মিশানো তার অভ্যাস। অভিনয় কার্য্যে সে ওস্তাদ।

পাকাপাকি পরামর্শ করিবার জন্য বেণী বসু আজ শিবনাথকে নিজেদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বাহির হইয়া তিনি থিয়েটারী বাসায় গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পর শিবনাথকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসায় আসিতেছিলেন। পথে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ। বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হে, তুমিও যে এসেছ দেখছি!"

নরহরি বলিল, "না এসে আর কি করি বল বেণীদা! গিন্নী যে ছাড়লেন না!"

"গিন্নীকেও এনেছ নাকি?"

"এনেছি বইকি। তা ছাড়া মিত্তির বাড়ীর ঠানদিদি, মুখুয্যেদের খুড়ীমা, জেঠাইমাও এসেছেন। তাঁরা সব আরতি দেখতে গেছেন, আমি তাঁদের আনতে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, তা বেশ বেশ! এলেই যদি, দু'দিন আগে আসতে হয়; নীলদর্পণ দেখতে পেতে। আচ্ছা তাতে ক্ষতি নেই, কা'ল রাত্রে আবার নীলদর্পণ হবে। দেখতে যেও নিশ্চয়! সে যে কি চমৎকার—দেখলে আর জীবনে ভুলতে পারবে না। চল হে শিবু রাত হয়ে যাচ্ছে।"

পথে শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে ফেলো?"

বেণী বসু নরহরির পরিচয় দিলেন; তাহার অসাধারণ পত্নীভক্তির বিষয়ও সালঙ্কারে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া শিবু হাসিতে লাগিল।

বাসায় পেঁছিয়া বেণী বসু দেখিলেন, সীতানাথ হুঁকা হাতে বসিয়া পাকা রুই মাছের পোলাও রন্ধন তদারক করিতেছেন। বলিলেন, "শিবুকে ধরে নিয়ে এলাম ঠাকুর্দা! আর একটা খবর শুনেছেন? নরহরি এসেছে। এইমাত্র পথে আসতে আসতে তার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

সীতানাথ বলিলেন, "কে? আমাদের গ্রামের নরহরি? সত্যি নাকি? বউকে ফেলে? দেখি দেখি, সূয্যি আজ কোন দিকে অস্ত যাচ্ছেন।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সীতানাথ বারান্দা হইতে গলা বাড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন।

বেণী বসু বলিলেন, "বউকে ফেলে আসবে, তাও কি সম্ভব, ঠাকুর্দা? সঙ্গেই এনেছে।"

সীতানাথ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "বউটাকে এই ভিড়ে, গলায় বেঁধে নিয়ে এসেছে নাকি? কেলেঙ্কারী!"

বেণী বসু ইতিমধ্যে মাদুর বিছাইয়া, শিবনাথকে লইয়া তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সীতানাথ দুই জনকে দুই ভাঁড় সিদ্ধি দিয়া নিজে এক পাত্র লইয়া পান করিতে করিতে বলিলেন, "কেলেঙ্কারী আর কাকে বলে! এক পাড়ায় বাস, আমাদের গিন্নীরাও ত সবাই শুনেছেন, দেখেছেন ; বাড়ী ফিরে গেলে আমাদের দশাটা কি হবে বল দেখি দাদা!"

বেণী বসু কহিলেন, "জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারবে! ইচ্ছে করে, আচ্ছা ক'রে মেয়েটাকে জব্দ ক'রে দিই।"

"তা, দাও না—একটু শিক্ষা হোক। কিন্তু কি উপায়ে জব্দ করবে, সেইটে বল দেখি ?"

বেণী বসু সিম্বির খালি ভাঁড়টি নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "কত রকম উপায় হ'তে পারে। এই ধরুন, গ্রামে কারু নামে এখান থেকে যদি একটা উড়ো চিঠি লেখা যায় যে নরহরির স্ত্রীকে সুন্দরী দেখে, মোহান্ত মহারাজ—'

ঠাকুর্দা বাধা দিয়া কহিলেন, "না না—সতীলক্ষ্মী—তা কি করতে আছে ? ছি ছি তা কোরো না! হাজার হোক গৃহস্থের বউ! এমন কোনও উপায় বের কর, যাতে দু'জনের খুব চুলোচুলি বেধে যায়। দিনকতক একটু মজা দেখে নিয়ে, তার পর সব ভেঙে দিলেই হবে এখন, কি বল শিবু ভায়া ?"

শিবু বলিল, "হ্যাঁ, সেই রকমই ভাল। ওঁর ওয়াইফ কি খুব সুন্দরী নাকি ?"

বেণী বসু বলিলেন, "এমন কিছু ডানাকাটা পরী যে তা নয়, তবে রংটা ফর্সা আছে, মুখ-চোখও ভাল।"

"নাম কি ?"

"কুসুমকুমারী।"

"এজুকেটেড ? চিঠি লিখতে পারে ?"

বেণী বসু বলিলেন, "তোমার যেমন কথা! ঐ কি কলকাতার মেয়ে যে লেখাপড়া জানবে ? কেন, জানলে কি করতে ? তার নামে কোনও জাল প্রেমপত্র-টত্র—"

শিবু বলিল. "না, এমনিই জিজ্ঞাসা করলাম।"

এই সময় আর দুইজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আসিয়া জুটিলেন। এ প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সীতানাথ উঠিয়া পাকের স্থানে গিয়া. পোলাও রন্ধনের তদ্বিরে ব্যাপৃত হইলেন।

পাঁচ

পরদিন সন্ধ্যায় আবার নীলদর্পণের অভিনয় হইল। স্ত্রী ও ঠান্‌দিদি প্রভৃতিকে লইয়া নরহরি থিয়েটার দেখিয়া আসিল।

তাহার পরদিন থিয়েটারের দল কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। যাত্রার দল, বাই, খেমটা প্রভৃতি এখনও আসর গরম রাখিয়াছে, এমন সময় মেলায় আর একটা নূতন "আকর্ষণ" উপস্থিত হইল। একজন নাকি অসাধারণ সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি লোকের হাত দেখিয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ ত তুচ্ছ কথা, পূর্ব্বজন্মের ঘটনা পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারেন। তবে, তাঁহার দক্ষিণাটা কিছু বেশী—নগদ ষোল আনা। তিনি নাকি কেদার বদরীর পথে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ হইতে এখনও ৫।৬ হাজার টাকা লাগিবে, তাই বাবাজী এই উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন মাত্র—নচেৎ তাঁহার আহার দৈনিক আড়াই সের দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ ফলমূল মাত্র।

বেণী বসু এক দিন গিয়া হাত দেখাইয়া আসিলেন। পরিচিত অপরিচিত যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, বলিতে লাগিলেন, "বাবাজীর ক্ষমতা একেবারে অদ্ভুত! অত্যাশ্চর্য্য! আমার জীবনের পূর্ব্বকথা যা যা বললেন, শুনে ত মশাই আমি 'থ' হয়ে গেছি।" আবার কেহ কেহ এমনও বলিতেছে. "বেটা বুজরুক্! আন্দাজি ঢিল মারে এক একটা লেগেও যায়। টাকা উপায়ের একটা ফন্দি করেছে।"—কিন্তু তথাপি হাত গণাইবার লোকের অভাব হইতেছে না। বাবাজী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, বেলা ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক এবং অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পুরুষগণের হাত দেখিবেন। একটি কাগজে নাম-ধাম ও জন্মনক্ষত্র লিখিয়া, সেই কাগজে একটি টাকা মুড়িয়া, চেলার দ্বারা ভিতরে বাবাজীকে পাঠাইয়া দিতে হয়; যথাসময়ে ডাক পড়ে।

সে দিন সন্ধ্যার পর রন্ধন করিতে করিতে খুড়ীমা নরহরির স্ত্রী কুসুমকে বলিলেন, "আচ্ছা বউমা, তুমি একবার গিয়ে হাত দেখাও না কেন! তোমার ছেলেপিলে হ'চ্ছ না কেন, কি ব্রত-প্রীত মানত-টানত করলে হতে পারে, সেটা জেনে এলে হয়।"

জেঠাইমা ও ঠান্‌দিও ঐ প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। কুসুম গিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল; নরহরি আপত্তি করিল না।

পরদিন প্রাতে কুসুমকে লইয়া ইঁহারা বাবাজীর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। নিয়ম অনুসারে নাম ও জন্মনক্ষত্র লেখা কাগজে একটি টাকা মুড়িয়া চেলা বাবাজীর দ্বারা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া বাহিরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একে একে উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের ডাক হইতে লাগিল। ক্রমে শেষে যিনি গিয়াছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, চেলা ডাকিল, "কুসুমকুমারী দাসী কার নাম? শীগ্‌গির এস।"

কুসুম উঠিল। ভিতরে যাইতে তাহার পা কাঁপিল। প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘ জটাজুট-ধারী, ভস্মাচ্ছাদিতদেহ বাবাজীকে দেখিয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

বাবাজী বলিলেন, "জিতা রও বেটী! তুমি কি জানতে চাও বল।"

কুসুম সভয় কণ্ঠে বলিল, "আজ ১৫ বচ্ছর হ'ল আমার বিয়ে হয়েছে—আজ পর্য্যন্ত একটি সন্তানের মুখ দেখতে পেলাম না, তাই আমরা স্ত্রী-পুরুষ বড়ই মনের দুঃখে আছি বাবা! কি পাপে এ রকম হ'ল, কি করলে সে পাপ খণ্ডাতে পারে, সেইটে যদি বাবা দয়া করে আমায় বলে দেন।"

বাবাজী বলিলেন, "হুঃ! তোমার একটি সন্তান দরকার? তার জন্যে চিন্তা কি? কি সন্তান চাও? পুত্তুর সন্তান, না কন্যে সন্তান?"

কুসুম সলজ্জভাবে মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল, "একটি পুত্তুর সন্তান হ'লে আমার শ্বশুর-বংশের জলপিণ্ড বজায় থাকত, বাবা!"

বাবাজী বলিলেন, "হুঁ—পুত্তুর সন্তান চাই? এ আব বিচিত্র কথা কি? এস, সরে এস, বাঁ-হাতখানি তোমার দেখি।"

কুসুম সভয়ে অগ্রসর হইয়া, নিজ বাম হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল। বাবাজী হাতখানি ধরিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত তাহা নিরীক্ষণ করিয়া, হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "না, তোমার পুত্তুর সন্তান হবে না,—কোন সন্তানই হবে না।"

কুসুম কাতরভাবে বলিল, "কেন বাবা? কি পাপের জন্যে—"

বাবাজী বাধা দিয়া বলিলেন, "বিশেষ কোনও পাপের জন্যে নয় মা—কোনও একটা গূঢ় কারণের জন্যেই তোমার সন্তানভাগ্য নষ্ট হয়ে গেছে।"

কুসুম হাতযোড় করিয়া বলিল, "কেন বাবা কি গূঢ় কারণ?"

বাবাজী বলিলেন, "সে গূঢ় কারণটি পূর্ব্বজন্মঘটিত। শুনতে চাও?"

কুসুমের কৌতূহল অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "হ্যাঁ বাবা, দয়া ক'রে বলুন—জানবার জন্যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।"

বাবাজী বলিলেন, "কিন্তু সে যে অতি গুহ্য কথা, মা। অন্য কিছু ত নয়—পূর্ব্ব-জন্মের কথা,—নরলোকে তা প্রকাশ করাই নিষেধ। তবে আমি তোমায় বলতে পারি, যদি তুমি আমার পা ছুঁয়ে দিব্বি কবতে পার যে, সে কথা এ জীবনে কাউকে, এমন কি, তোমার স্বামীকেও বলবে না। যদি এ নিষেধ অমান্য কর, তবে একমাস মধ্যেই তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে। বেশ করে ভেবেচিন্তে দেখ।"

কুসুম কোনও ভাবনা-চিন্তা না করিয়াই বলিল, "না বাবা, আমি কারুখকে বলবো না। আপনার পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি—" বলিয়া সভয় কম্পিতহস্তে বাবাজীর পদস্পর্শ করিল।

বাবাজী তখন মুখখানি বিষম গম্ভীর করিয়া, অনুচ্চ স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"পূর্ব্বজন্মেও তুমি কায়স্থ কুলেই জন্মেছিলে—তুমি একজন অবস্থাপন্ন লোকের স্ত্রী ছিলে। মুর্শিদাবাদ সহরে, তোমার স্বামীর মস্ত একটা নুনের গোলা ছিল, প্রায় লাখো টাকার কারবার। নৌকো নৌকো বোঝাই নুন আসতো,—২০।২৫ জন দুলে, বাগ্দী—এই রকম সব ছোট জাত—তোমাদের মাইনে করা চাকর ছিল, তারা সব, নুনের বস্তা নৌকো থেকে নামিয়ে, পিঠে ক'রে বয়ে বয়ে, গোলায় নিয়ে গিয়ে তুলতো। আবার নুন কোথাও চালান দিতে হ'লে, গোলা থেকে বের ক'রে পিঠে ক'রে নিয়ে গিয়ে নৌকোতে বোঝাই দিত। এই ছিল তাদের কাজ। এ জন্মে যে লোক তোমার স্বামী হয়েছে, সেও ছিল তোমাদের একজন মাইনে করা মুটিয়া,—জেতে বাগ্দী ছিল।"

কুসুম বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ! বাগ্দী!" ঘৃণায় তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

'হ্যাঁ—বাগ্দী ছিল। নামটি যদি জানতে চাও, তাও ব'লে দিতে পারি। কেষ্টা বাগ্দী। গতজন্মে তুমি বড়ই বাগী ছিলে মা, কিন্তু বড়ই বুদ্ধিমতী ছিলে। স্বামীর মৃত্যুর পর কারবারটি তুমি নিজেই চালাতে লাগলে। ঐ কেষ্টা বাগ্দী ছিল বিষম চোর। তোমার নুনের গোলা থেকে গঙ্গার ঘাট প্রায় পোয়াটেক পথ। কেষ্টা মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই পথে দুই এক বস্তা নুন আধা-কড়িতে কাউকে বেচে ফেলতো। একদিন ধরা পড়ে যায়। তোমার কাছে খবর হ'ল। সেই শুনে তুমি রেগে কাঁই! সরকারকে হুকুম দিলে, 'হারামজাদা বেটাকে দশ জুতো মেরে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও।'—কেষ্টা অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, সরকারের পায়ে ধ'রে কেঁদে বললে, 'দোহাই সরকার মোশাই, এবার আমায় মাফ করতে আজ্ঞে হয়—আর কক্ষনো এমন কাজ করবো না।'—সরকার বললে, 'কর্ত্রীঠাকরুণ নিজে হুকুম দিয়েছেন, আমি মাফ করবার কেবে বেটা?'—হুকুম তামিল হ'ল। কেষ্টার পিঠে দশ ঘা জুতো মেরে তাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কেষ্টা দুঃখে, অভিমানে সেই দিন গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবে স্থির করলে। গঙ্গার ধারে গিয়ে. 'হে মা গঙ্গে, হে মা পতিতপাবনি! এই অধম সন্তানকে তোমার কোলে ঠাঁই দাও মা!—তোমার অভাগা সন্তানেব এইমাত্র ভিক্ষা, মা, আর জন্মে আমি ঐ হারামজাদী কর্ত্রীঠাকরুণকে যেন উঠতে-বসতে জুতোপেটা করতে পারি।' এই বলতে বলতে কেষ্টা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল।"

কুসুম বলিল, "সে আমায় জুতো মারতেই চেয়েছিল। তবে আমার স্বামী হয়ে জন্মালো কেন?"

বাবাজী বলিলেন, "এইটে আর বুঝতে পারলে না, মা? নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোককে কি জুতো মারা চলে? শাস্ত্রের নিষেধ যে!"

কথাগুলি শুনিয়া কুসুমের তখনই বিশ্বাস হইল না। সে বলিল, "কিন্তু বাবা, কই, সে ত আমার সঙ্গে কোন দিন কোন দুর্ব্ব্যবহার করেনি! বরঞ্চ—"

গণৎকার বলিল, "দাঁড়াও মা, এখনই কি তাই সে করবে?—এখনও যে তুমি, কি বলে হুঁ হুঁ—ছেলেমানুষ কিনা! আর বছর কতক যাক, তোমার চুল ২।১ গাছি পাকুক, তখন দেখো, তোমার সঙ্গে ও কি রকম ব্যবহার করে। অত কথায় কাজ কি, তোমায় একটা পরীক্ষা আমি বলে দিচ্ছি, তা হ'লেই তুমি বুঝতে পারবে আর জন্মে ও বাগ্দী ছিল কি না!"

কুসুম আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরীক্ষা বাবা?"

বাবা বলিলেন, "ও যখন ঘুমুবে, তুমি ওর পিঠ চেটে দেখো।—আর জন্মে পিঠে নুন ব'য়ে ব'য়ে পিঠ এমন নোন্‌তা হয়ে গেছে যে, এখন ২।৩ জন্ম লাগবে ওর সেই নুন কাটতে!—আচ্ছা. এখন ঘরে যাও মা, অনেক লোক এখনও অপেক্ষা করছে।"

কুসুম তখন গণৎকার ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, ম্লানমুখে সজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করিল।

বাসায় পৌঁছিলে, সুযোগমত নরহরি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাত দেখে বাবাজী কি বললেন?"

কুসুম সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ছেলে হবে না বললেন!"—বলিয়া ম্লানমুখে চলিয়া গেল।

ছয়

নরহরি সেইদিনই আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া, অপরাহ্নকালে আবার তারকেশ্বর দর্শনে চলিল। তথায় গ্রামস্থ বন্ধুগণের আড্ডায় পৌঁছিয়া দেখিল, সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছে। মেলাস্থানে গিয়া দুই একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আর সকলে কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "তারা হাত গোণাতে গেছে।" গণৎকার ঠাকুরের অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় অনেক প্রশংসাবাদ করিল। বলিল, "আমরাও যাচ্ছি—যাবে তুমি?"

নরহরি ভাবিল, কুসুম ত হাত দেখাইয়া গিয়াছে, গণৎকার ঠাকুর তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, সন্তান হইবার কোনও আশা নাই। যাই না, আমিও হাত দেখাই, আমাকেই বা কি বলেন শুনা যাক। আমিই যে কুসুমের স্বামী তাহা ত আর ঠাকুর জানেন না! তাঁহার যথার্থ গণনাশক্তি আছে অথবা বুজরুকি মাত্র, তাহা পরীক্ষা করিবার এই সুযোগ। বলিল, "বেশ চল, আমিও হাত দেখাব।"

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নাম-ধাম ও জন্মনক্ষত্র লিখিত কাগজে একটি টাকা জড়াইয়া চেলার দ্বারা ভিতরে পাঠাইয়া নরহরি অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার ডাক হইল।

নরহরি ভিতরে গিয়া প্রণাম করিতেই বাবাজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কি তোমার মনস্কামনা, বল বাবা!"

নরহরি বলিল, "মনস্কামনা এমন বিশেষ কিছু নয়। আমার হাতটা একবার দেখুন; আমার আয়ুস্থান, ধনস্থান, পুত্রস্থান—এইগুলো সব কেমন, সেইটে জানবার অভিলাষ।"

"আচ্ছা, স'রে এস—দাও, হাত দাও, দেখি।"

নরহরি, বাবাজীর নিকট বসিয়া নিজ দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিয়া, বাবাজীর পরিচ্ছদটি দেখিতে লাগিল। এত টাকা রোজগার করিতেছেন, কিন্তু—ওঃ—কি বৈরাগ্য! আলখাল্লাটি ছেঁড়া এবং তালি দেওয়া, তাও রং মিলে নাই। অথচ ইচ্ছা করিলে ইনি রোজ একটা নূতন রেশমী আলখাল্লা কিনিয়া পরিতে পারেন।

বাবাজী কিয়ৎক্ষণ নরহরির হস্ত নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "তোমার আয়ুস্থান ত তেমন সুবিধে নয়, বাবা! ৫২ বছর মাত্র তোমার পরমায়ু, ঐ সময় তোমার অপঘাতমৃত্যু। বিষপ্রয়োগে তোমার মৃত্যু—তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।"

শুনিয়া নরহরি শিহরিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল, "বলেন কি ঠাকুর!"

ঠাকুর বলিলেন, "আমি কি বলছি? বলছে তোমার অদৃষ্টলিপি। ধনস্থান—বড় মন্দও নয়; ৪০ বৎসর বয়স হলে হঠাৎ এমন একটা উপায়ে তোমার বিপুল ধনাগম হবে, যা তুমি কখনও স্বপ্নেও ভাবনি; তার পর যশস্থান, সেটাও ঐ ৪০ বছর বয়সের পরে। যশ জিনিষটে ধনেরই অনুগামী কিনা! তার পর পুত্রস্থান—কই, না, এখানে ত কিছুই নেই, একেবারে শূন্য যে! তোমার কি কোনও ছেলেপিলে হয়েছে?"

নরহরি হতাশভাবে বলিল, "না।"

বাবাজী বিষণ্ণভাবে মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন, "একদম শূন্য!"

"কেন বাবা, পুত্রস্থান আমার শূন্য হ'ল কেন? এটা খণ্ডাবার কি কোন উপায় নেই? কোনও রকম ব্রত-ট্রত কি যাগ-যজ্ঞ করলে দোষটি খণ্ডাতে পারে না?"

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কয় স্ত্রী?"

"একটি মাত্র।"

বাবাজী ঠোঁট গুটাইয়া বলিলেন, "হুঁ! সে আমি তোমার হাত দেখেই বুঝতে পেরেছি। এ স্ত্রীর গর্ভে তোমার সন্তান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে যদি অন্য বিবাহ কর, তা হ'লে সন্তান আপনিই হবে, তার জন্যে যাগ-যজ্ঞ কিছুই করতে হবে না। কিন্তু এ স্ত্রী হ'তে হবে না। শুধু তাই নয় বাবা, এ স্ত্রীকে তুমি বেশী 'নাই' দিও না।"

"কেন বাবা? 'নাই' দিলেই বা কি অশুভ হবে, না দিলেই বা তার শুভফল কি?"

বাবাজী বলিলেন, "নাই দিলে মাথায় উঠবে। আসল কথা শুনতে চাও? সে কিন্তু গতজন্মের কথা।"

"বেশ ত, বলুন না।"

"'বেশ ত বলুন না' বললেই হলো না, বাবা! পূর্ব্বজন্মের কথা—এ সকল গুহ্যাতিগুহ্য বিষয়। যাকে তাকে অমনি বললেই হ'ল? তুমি যদি আমার পা ছুঁয়ে দিব্য করতে পার যে, আজ আমি তোমায় যা শোনাব, তুমি নরলোকে কারু কাছে তা প্রকাশ করবে না, তবেই তোমায় বলতে পারি। কথাটি যদি তুমি প্রকাশ ক'রে ফেল, তবে তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে।"

নরহরি কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল। তাহার পর বাবাজীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিল।

বাবাজী তখন বলিতে লাগিলেন, "আর জন্মে তুমি মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে চাকরী করতে। অবস্থা তোমার বেশ ভালই ছিল। বুড়ো বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হ'লে তুমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলে। এ স্ত্রী ভারী সুন্দরী ছিল। যেমন হয়ে থাকে, তুমি তার অত্যন্ত বশীভূত হয়ে পড়েছিলে; যাকে ঘোর স্ত্রৈণ বলে, তাই আর কি! তোমার একটি কুকুর ছিল—ঠিক কুকুর নয়—কুক্কুরী—তোমার আগেকার স্ত্রী সেই কুকুরটিকে বড়ই ভালবাসতেন। তোমার এই দ্বিতীয় পক্ষটি, সেই জন্যে, কুকুরটিকে মোটেই দেখতে পারতো না। তাকে মারতো, ভাল করে খেতে দিত না। এক দিন সে কুকুরটিকে এক লাথি মেরেছিল, কুকুরটি রাগ না সামলাতে পেরে ঘ্যাঁক্ করে তার পায়ে কামড়ে দেয়। এই আর যায় কোথা! বৌটি ত কেঁদেই অনর্থ! তুমি বাড়ী এসে, তাই দেখে, রাগের বশে কুকুরের মাথায় এক লাঠি মেরেছিলে, তাতেই তার মৃত্যু হয়। মরবার সময় সে মনে মনে বলেছিল, কার দোষ, বাবু তার কিছুই অনুসন্ধান করলেন না, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কথা শুনে আমার প্রাণবধ করলেন!—এই ভাবতে ভাবতে সে প্রাণত্যাগ করলে। তার পরেই তার আত্মা, কাশীতে বাবা বটুকভৈরবের দরবারে উপস্থিত। বটুকভৈরবই হলেন কুকুরদের দেবতা কিনা। কুকুরটি হাতযোড় ক'রে বাবাকে বললে 'হে বাবা বটুকভৈরব, এই বর আমাকে দাও, আর জন্মে যেন ওকে এর প্রতিফল দিতে পারি। আমায় যেমন ও বধ করেছে আর জন্মে আমিও যেন ওকে মেরে ফেলতে পারি।' বাবা বললেন, 'পাগলা কুকুর না হ'লে ত তার কামড়ে মানুষ মরে না। তা ছাড়া তোর পাপ শেষ হয়েছে, তুই এবার মানুষ হয়ে জন্মাবি। তার চেয়ে বরঞ্চ তুই ওর স্ত্রী হয়ে জন্মাস, বিষ খাইয়ে ওকে মেরে ফেলিস।' সেই জন্যেই সেই কুকুর—বা কুক্কুরী—তোমার স্ত্রী হয়ে জন্মেছে—তোমায় বিষ খাইয়ে মারবে তবে ছাড়বে!"

নরহরি বলিল, "কি বলেন আপনি! আমার স্ত্রী আর জন্মে কুকুর ছিল? আমিই তাকে মেরে ফেলেছিলাম? এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করি?"

বাবাজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। প্রকৃত ঘটনা যা, তাই আমি তোমায় বললাম। তুমি পীড়াপীড়ি করলে ব'লেই বললাম, নইলে কারু পূর্ব্বজন্মের কথা সহসা আমি প্রকাশ করি না।"

নরহরি সবিনয়ে বলিল, "বাবা, আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিনি। ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্যজনক, তাই আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ ও কথাটা বেরিয়ে পড়েছিল; আপনি কিছু মনে করবেন না, বাবা! কেবল একটা বিষয়ে খট্‌কা ঠেকেছে। আমাকে বিষ প্রয়োগেই যদি ও মারবে তা হ'লে স্ত্রী হয়ে জন্মাবার কি দরকার ছিল? অন্য যে কেউ ত—"

বাবাজী বলিলেন, "এ ত সে কুকুর বলেনি, বলেছেন বাবা বটুকভৈরব, দেবতার লীলা কি সহজে বোধগম্য হয়? বোধ হয়, এর মীমাংসা এই—ও সব কাজে স্ত্রীর যেমন সুযোগ হবে, তেমন আর কার?"

নরহরি বলিল, "হ্যাঁ, তা বটে!"

বাবাজী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে প্রমাণ যদি পাও তা হ'লে বিশ্বাস হবে ত?"

নরহরি বলিল, "আপনার দয়া।"

বাবাজী তাহাকে এক টুকরা কাগজ দিয়া বলিলেন, "তোমার স্ত্রীর নামটি এতে লেখ।"

বাবাজী লিখিত কাগজখানি ফেরত লইয়া কুসুমকুমারী নামের ২য়, ৩য় ও ৫ম অক্ষর কাটিয়া, সেটি নরহরির হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

নরহরি পড়িল—'কুকুরী।" তাহার গা শিহরিয়া উঠিল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন, "আরও প্রমাণ আছে। রোজ রাত্রে তুমি ঘুমুলে, কুকুরের যা স্বধর্ম্ম—তোমার স্ত্রী তোমার পিঠ চাটে। কোনও দিন জানতে পারনি কি?"

"আজ্ঞে না। আমার ঘুমটা খুব গভীর হয়।"

"আচ্ছা, একদিন ঘুমের ভাণ ক'রে পিছু ফিরে শুয়ে থেক। তা হলেই দেখতে পাবে।"

নরহরি বিদায় গ্রহণ করিল। মেলার কোনও তামাসা দেখা আর তাহার ভাল লাগিল না। তারকেশ্বরে থাকিতেই আর ভাল লাগিল না।

পরদিন ঠান্‌দি, খুড়ীমা ও জেঠাইমার বিস্তর প্রতিবাদ সত্ত্বেও সকলকে লইয়া নরহরি বাড়ী ফিরিল।

সেইদিন সন্ধ্যার পর সীতানাথ দত্তের তারকেশ্বরের বাসায় শিবনাথ তাস খেলিতে আসিল। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল হে, শিবু?"

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, "পরামর্শ যেমন যেমন হয়েছিল, ঠিক সেই রকমই বলেছি। কিন্তু দাদা, যাই বল, ছুঁড়িটাকে যখন বললাম তোমার হাজ্‌বাণ্ড আর জন্মে বাগ্‌দী ছিল, তখন তার মুখখানি এমন সরোফুল হয়ে গেল যে দেখে আমার ভারী দুঃখ হতে লাগলো। ভাবলাম, দূরে হোক্ গে, কথাটা পাল্টে নিই :—অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছিলাম।"

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর মিন্‌ষেটা?"

মিন্‌ষেটার প্রাণে বড় ফিয়ার হয়েছে। স্ত্রী বিষ খাওয়াবে, সোজা কথা?"

বেণী বসু বলিলেন, "কিন্তু বুদ্ধিটে খুব বের করেছিলে ভায়া। হাঃ হাঃ—একজন ছিল কুকুরী, একজন নুন বওয়া মুটে! বাস্তবিক তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।"

শিবু বলিল, "আমরা হলাম ক্যালকাটাস্ সন্—আমাদের হাড়ে ভেল্কী খেলে!"

সকলে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সীতানাথ বলিলেন, "সাজগোজটিও তোমার চমৎকার হচ্ছে। আচ্ছা ঐ দিনে কত টাকা রোজগার হ'ল?"

শিবু বলিল, "ও দিকে ডেলি ২৫।৩০।৪০ টাকা পর্য্যন্ত হচ্ছিল। এখন ক্রমেই

কিন্তু কমছে। মেলা ত প্রায় ফিনিশ হয়ে এল কি না। লোক আর তেমন কই?"

তাহার পর তাসখেলা আরম্ভ হইল।

সাত

সেদিন নরহরির বাড়ী পেঁাছিতে সন্ধ্যা হইল। সমস্ত দিন আহার হয় নাই—কুসুম তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া আসিয়া আলুভাতে ভাত চড়াইয়া দিল।

আহারের সময় নরহরির মনে হইতে লাগিল, সে যেন কুকুরের ছোঁয়া ভাত খাইতেছে। খাইয়া তৃপ্তি হইল না; পুরা খাইতেও পারিল না; অর্দ্ধেক পাতে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

আচমন করিয়া পাণ মুখে দিয়া নরহরি বিছানায় শয়ন করিল। কুসুম আসিয়া তামাক সাজিয়া দিল। বিছানায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নরহরি বলিল, "যাও আর দেরি কোর না—খেয়ে এসে শুয়ে পড়, সারাদিন গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে শরীর একেবারে এলিয়ে গেছে—আমি ত ঘুমে চোখে দেখতে পাচ্ছিনে।"

কুসুম রান্নাঘরে চলিয়া গেল। স্বামীর থালার নিকট দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, "কি করবো? পাতে আর খাব কি? কায়েতের মেয়ে হয়ে শেষে বাগ্দীর এঁটোটা খাব?"—আবার ভাবিল, "আর জন্মেই বাগ্দী ছিল, এ জন্মে ত কায়েত। আর হাজার হোক স্বামী ত বটে! খাই না হয়!"

হেঁসেল হইতে আর কিঞ্চিৎ ভাত-তরকারী আনিয়া পাতে ঢালিয়া লইয়া কুসুম খাইতে বসিল। কিন্তু বাগ্দীর উচ্ছিষ্ট খাইতেছি মনে করিয়া তাহার গা-টা কেমন "ঘিন্ ঘিন্" করিতে লাগিল।

কোন মতে আহার শেষ করিয়া কুসুম উঠিল। কাজ কর্ম্ম সারিয়া শয়নঘরে গিয়া দেখিল স্বামী বিছানার অপর প্রান্তে পাশবালিশ আঁকড়াইয়া পিছু ফিরিয়া নিদ্রিত। তাঁহার নিঃশ্বাস বেশ গভীরভাবে পড়িতেছে।

কুসুম পাণ খাওয়া শেষ করিয়া, বাহিরে গিয়া কুলকুচা করিয়া, মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার করিয়া লইল। তাহার পর দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ নিবাইয়া, ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া শয়ন করিল। স্বামীর গায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, ঘুমুলে?"

কোনও উত্তর নাই। কুসুম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমুলে নাকি?"

উত্তর নাই। কুসুম তখন স্বামীকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন বুঝিয়া, জিহ্বা দ্বারা ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠদেশ লেহন করিতে লাগিল। হাঁ, নোন্‌তা ত বটেই! পিঠে নুনের বস্তা না বহিলে কি কারও পিঠ এত লবণাক্ত হইতে পারে? বাবাজীর কথায় কুসুমের মনে একটু যাহা সন্দেহ ছিল, এতক্ষণে তাহা দূরীভূত হইল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এবং তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাহার পর খাট হইতে নামিল। প্রদীপ জ্বালিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। নরহরি মাথা তুলিয়া একবার দ্বারের দিকে চাহিল, স্ত্রীর শাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগমাত্র দেখিতে পাইল। ভাবিল, "এত রাত্রে আবার চললেন কোথায়? হাড়-টাড় চিবুতে নাকি?"—বারান্দায় জলের শব্দ শুনিল, কুসুম কুলকুচা করিতেছে। নরহরি আবার উপাধানে মস্তক দিয়া নিদ্রার ভাণ করিল।

কুসুম ঘরে আসিয়া পাণ খাইয়া শয্যার প্রান্তদেশে সঙ্কুচিতভাবে শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নরহরি তখন উঠিয়া বাহিরে গিয়া জল-হাতে পিঠের চাটা অংশটুকু বেশ করিয়া ধুইয়া আসিয়া শয়ন করিল।

স্বামী স্ত্রীর সে অখণ্ড স্নেহপ্রেম কোথায় উড়িয়া গেল! ইহাদের মধ্যে কোনও দিন যাহা হয় নাই তাহাই হইতে লাগিল, মাঝে মাঝে কলহ-কিচিকিচিও হইতে লাগিল। ক্রমে কুসুম শুনিল তাহার সন্তান হয় না বলিয়া স্বামী নাকি আবার বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছেন। বলা বাহুল্য, এ সংবাদে কুসুমের মেজাজ আরও খারাপ হইয়া গেল।

প্রস্তাবিত সখের থিয়েটারের দল খুলিয়াছে। সীতানাথ হইয়াছেন অধ্যক্ষ। শিবনাথ কলিকাতায় গিয়াই একখানি শকুন্তলা নাটক পাঠাইয়া দিয়াছিল। নীলদর্পণ শক্ত, তাই শকুন্তলারই অভিনয় প্রথমে হইবে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বেণী বসুর বৈঠকখানায় সকলে সমবেত হইয়া মহলা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। নরহরি এক দিন এই আড্ডায় আসিয়া বলিল, "আমিও সাজবো, আমাকেও একটা কিছু পার্ট দাও।"

সীতানাথ বলিলেন, "আমাদের কিন্তু রিহার্শাল ভাঙ্গতে কোনও দিন রাত ১০টা, কোনও দিন রাত ১১টাও বেজে যায়। অত রাত অবধি পারবে তুমি থাকতে?"—বলিয়া ব্যঙ্গভরে চোখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

নরহরি বলিল, "তা খুব পারবো।" বাস্তবিক কিছুক্ষণ গোলমালে থাকিয়া নিজের দুঃখ বিস্মৃত হওয়াই নরহরির উদ্দেশ্য। নরহরিকে রাজমন্ত্রীর পার্ট দেওয়া হইল। বিশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে সে অভিনয় শিক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরেই কলিকাতা হইতে শিবনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে নিজে কণ্বমুনি সাজিবে এবং অভিনয়কাল অবধি এইখানে থাকিবে। সে কলিকাতায় বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে টাকা পাঠাইলেই ড্রেস, সীন প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিবে। খুব উৎসাহের সহিত মহলা চলিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে পোষাক প্রভৃতি আসিল। আগামী কল্য রথযাত্রার দিন প্রথম অভিনয় হইবে। অদ্য ড্রেস রিহার্শাল। কিন্তু নরহরি সহসা অনুপস্থিত।

নরহরিকে ডাকিতে তাহার বাড়ী লোক ছুটিল। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তার বড় বিপদ, তার স্ত্রী ঝগড়াঝাঁটি করিয়া বাপের বাড়ী যাইতেছে। কল্য ভোরে সে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পৌঁছাইতে যাইবে, সেই আয়োজনে ব্যস্ত আছে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ইহা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ড্রেস রিহার্শালে না হয় সে নাই নামিল। কিন্তু কল্য রাত্রে অভিনয়, নরহরির শ্বশুরালয় ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভোরবেলা রওয়ানা হইয়া সেইদিনই আবার কি সে ফিরিয়া আসিয়া প্লে করিতে পারিবে? অসম্ভব। সুতরাং তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য স্বয়ং তিনি নরহরির গৃহে যাইতে চাহিলেন। বলিলেন, "যাই, ব'লে ক'য়ে দুটো দিন যদি দেরী করাতে পারি।"

শিবু বলিল, "তার চেয়ে চলুন, আমিও যাই—গিয়ে ব্যাপারটা ভেঙ্গেই দিয়ে আসি। দু'তিন মাস হয়ে গেল—আর কেন? ফর নথিং আর ত্যাঁদিকে ব্রেবোল দেওয়া কেন?"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "তবে তাই কর—রহস্যটা ভেঙ্গেই দাও। তা হ'লে একলাই তুমি যাও। আমাদের সেখানে থাকাটা ঠিক হবে না।"

শিবু বলিল, "না, না—আপনি অন্ততঃ চলুন সঙ্গে ঠাকুর্দা।"

সীতানাথ বলিলেন, "আচ্ছা চল।"

এক হস্তে গেলাস-বাতিযুক্ত একটি দেশী লণ্ঠন, অপর হস্তে বাঁশের লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে শিবনাথ ও সীতানাথ রওয়ানা হইয়া গেলেন।

নরহরির বাসায় পৌঁছিয়া ঠাকুর্দা তাহার নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নরহরি আসিয়া, দরজা খুলিয়া, ইঁহাদিগকে বৈঠকখানায় বসাইল।

ঠাকুর্দা বলিলেন, "হ্যাঁ হে ভায়া, তোমাদের হয়েছে কি বল দেখি?"

নরহরি মুখ গোঁজ করিয়া বলিল, "হবে আবার কি? ঝগড়া হয়েছে।"

"ঝগড়া হয়েছে? আমরা ত জানি, আমাদের ঘরেই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে থাকে। তোমরা হ'লে এ গ্রামের আদর্শ দম্পতি, তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি কি রকম? এ যে বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

নরহরি বলিল, "হ্যাঃ—আদর্শ দম্পতি ত কেমন! আমাদের বাতাস যেন আর কোনও দম্পতির গায়ে না লাগে!"

"বটে? এমন ব্যাপার? কবে থেকে এ রকমটা তোমাদের হয়েছে?"

"মাস দুই হবে। সেই তারকেশ্বরের চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা দেখে ফিরে আসা অবধি।"

"কি নিয়ে তোমাদের গণ্ডগোল বল দেখি?"

"এমন বিশেষ কিছু নয়। কা'ল রাত্রে রিহার্শাল্ থেকে ফিরে এসে দেখি—ও নিজের আহারাদি সেরে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার ভাতের থালা মেঝের উপর রাখা। একটা ঝুড়ি চাপা দেওয়া ছিল,—ঘরে কুকুর ঢুকে ঝুড়ি ঠেলে সব খেয়ে গেছে—ভাতগুলো ছিটিয়ে লণ্ডভণ্ড ক'রে রেখেছে। দেখে ভারি রাগ হ'ল, বিশেষ ক্ষিধের সময়। রাগ সামলাতে পারলাম না, চুল ধরে টেনে উঠিয়ে বসিয়ে পিঠে এক কিল মেরে কেবল বলে-ছিলাম—'দ্যাখ্ দেখি হারামজাদী! কি হয়েছে! তোর ভাইকে দিয়ে এ সব যে খাইয়ে দিলি, এই রাত্তিরে আমি কি খাই?'—এ নিয়ে মহা গণ্ডগোল বেধে গেল।"

সীতানাথ বুঝাইতে লাগিলেন, "স্বামী-স্ত্রীতে বিবাদ কোন সংসারে আর নেই? তাই বলে' স্ত্রীকে বাপের বাড়ী চলে যেতে দেওয়া—এই বা কেমন কথা? দিন দুই সবুর কর না। থিয়েটারটা হয়ে যাক, তার পরই না হয়—"

নরহরি বলিল, "গিন্নীর রাগ যা হয়েছে—সে রাগ ভাঙ্গানো শিবের অসাধ্য!"

সীতানাথ বলিলেন, "বল কি ভায়া? শিব ত এখানে উপস্থিতই রয়েছেন—যদি বল ত ইনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখেন।"

সীতানাথ ও শিবনাথকে নরহরি অন্তঃপুরে লইয়া গেল। শিবনাথ গিয়াই কপট ভক্তি-ভরে একটি প্রণাম করিয়া বলিল, "বউঠাক্‌রুণ, কাল ভোরে ত আপনার কোন মতেই যাওয়া হ'তে পারে না। অসম্ভব! আমরা সকলে এত ট্রবোল্ নিয়ে থিয়েটার করছি, আপনি না দেখেই চ'লে যাবেন? তা হ'লে আমাদের মনে যে বড়ই আপশোষ হবে, বউঠাক্‌রুণ!"

কুসুম ঘোমটা দিয়া অবনত মুখে বসিয়া রহিল, কোনও কথা কহিল না।

শিবনাথ বলিল, "আপনি অর্ডার দেন, নরুদাদাকে রিহার্শালে নিয়ে যাই। কাল তেখন থিয়েটার দেখে, পরশু হয়, তার পর দিন হয়, বাপের বাড়ী যাবেন এখন।"

কুসুম তাহার সেই ঘোমটায় আবৃত মস্তক প্রবলভাবে চালনা করিয়া নিজ অসম্মতি জানাইল।

শিবনাথ বলিতে লাগিল, "দেখুন বউঠাক্‌রুণ, নরুদাদার কাছে সব হিস্ট্রিই শুনলাম। উনি অবশ্য আপনার সঙ্গে যা করেছেন, খুবই অন্যায় কায করেছেন। কিন্তু সেটা কি আপনার মাইণ্ড করা উচিত? আপনি ত জানেন, উনি আর জন্মে ছিলেন বাগ্‌দী, পুণ্য-বলে এবার কায়স্থের ঘরে জন্মেছেন। এখনও সেই বাগ্‌দী স্বভাবতই ত আছে—এক জন্ম কায়েত হ'লেই বাগ্‌দী কি আর জেণ্টেল্‌ম্যান হয়?"

শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইল এবং ঘোমটা কমাইয়া, বক্তার মুখের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এক নজর চাহিয়া দেখিল।

নরহরি চটিয়া উঠিয়া বলিল, "কি বলছ তুমি শিবু! আর জন্মে আমি বাগ্‌দী ছিলাম?"

শিবনাথ বলিল, "ছিলে না? আবার ভণ্ডামী! বাগ্‌দী ছিলে; নুনের গোডাউনে মুটেগিরি করতে, সে কথা কি বউঠাক্‌রুণ জানেন না ভেবেছ? তোমার পিঠের নুন আজও ক্যাটেনি—বউঠাক্‌রুণ তা চেটে দেখেছেন। হয় কি না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।"

কুসুম বলিল, "ঠাকুরপো, আপনি এ সব কথা কি ক'রে জানলেন?"

নরহরি বলিয়া উঠিল, "কি বলছ তোমরা সব? আমি আর জন্মে বাগদী ছিলাম, নুনের বস্তা পিঠে বইতাম, এই সব কথা আমার স্ত্রীকে কেউ বলেছে নাকি?"

কুসুম বলিল, "ঠাকুরপো! তুমিই কি তারকেশ্বরে সেই গণৎকার সন্ন্যাসী সেজেছিলে?"

নরহরি বলিল, "সে সন্ন্যাসী কি তোমার চেনা লোক?"

শিবু বলিল, "খুব চেনা! ওল্ড ফ্রেন্ড! তার কাছেই ত আমার গাঁজা খেতে শেখা! বউঠাক্রুণকে তিনি কি বলেছিলেন, তোমায় কি বলেছিলেন, সবই তাঁর নিজ মুখে আমি শুনেছি। এখানে আসবার আগের দিন, কল্কাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা। বাগবাজারের এক আড্ডায় ব'সে বাবাজী গুলী টানাছলেন। আমাকে দেখে ডাকলেন। আমি এখানে আসবো শুনে তিনি বললেন, ওহে, সেই গ্রামে নরহরিকে আর তার স্ত্রীকে কতকগুলো তামাসার কথা ব'লে এসেছিলাম—কিন্তু তার পরে ভেবে দেখলাম, কাষটা অন্যায় হয়েছে। ফর নথিং বেচারীদের একটা মনোমালিন্য হবে। তুমি সেখানে যাচ্ছ, নরহরি আর তার স্ত্রীকে বোলো, সে সব বিলকুল মিছে কথা, শুধু রঙ্গ করবার জন্যে বলা, আর তাদের এই টাকা দুটি ফিরে দিও।"—বলিয়া শিবু ট্যাঁক হইতে কাগজের পুঁটলি দুইটি বাহির করিয়া নরহরির হাতে দিল।

নবহরি খুলিয়া দেখিল, একটিতে তার স্বহস্তে লিখিত নিজ নামধাম ও জন্মনক্ষত্র; অপরটিতে কোনও অপরিচিত বালক-হস্তাক্ষরে কুসুমের নামাদি লেখা।

নরহরি বলিল, "তবে তুমিই সেই গণৎকার!"

শিবু বলিল, "ক্ষেপেছ তুমি?"—বলিয়া এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যে, তাহার মৌখিক কথাটা প্রতিবাদ স্বরূপ গণ্য হওয়া কঠিন।

সব গোলমালই মুহূর্ত্তমধ্যে মিটিয়া গেল। ড্রেস রিহার্শালের সময় নরহরি দেখিল, তারকেশ্বরে গণৎকার ঠাকুরের অঙ্গে যে পোষাকটি দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই পোষাক পরিয়াই শিবু কম্বমুনি সাজিয়াছে—সেই স্থানে সেই বেরঙা তালিটি এ পোষাকেও বিদ্যমান। রিহার্শাল অন্তে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে সে এই কথা বলিল, এবং দুই জনে খুব হাসিতে লাগিল। নিজ নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত হইল। কিন্তু সব গোলমালই সুন্দর ভাবে মিটিযা গেল।

বিলাতী রোহিণী

এক

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ফারম্ ঘোষ এণ্ড চাটার্জ্জি কোম্পানির অংশীদার ও কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, চা-পান কার্য্য সমাধা করিয়া, বেলা ৮টার সময় বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ, জ্বলন্ত কলিকাযুক্ত রূপার গুড়গুড়ি হস্তে খানসামাও নামিয়া আসিল। পূর্ব্বে হইতেই কয়েকজন ভদ্রলোক সাক্ষাতের অভিলাষে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, বাবু প্রবেশ করিতেই তাঁহারা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া, বাবু একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া, আরামে গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে, ভদ্রলোকগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

মিনিট পনেরো কাল এইরূপ চলিলে, ডাকপিয়ন আসিয়া সেলাম করিয়া, বাবুর হস্তে কয়েকখানি পত্র দিল। সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সত্যবাবু বলিলেন, "বিলাতী ডাক যে! এবার খুব সকালেই এসেছে ত!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া পিয়ন সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বাবু তখন সেগুলি হইতে বাছিয়া, একখানি খুলিয়া, পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানি তাঁহার একমাত্র পুত্র, বিলাত-প্রবাসী শ্রীমান সুধাংশুভূষণ লিখিয়াছে।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে সত্যবাবুর মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্রোধ ও বিরক্তিতে ললাটদেশ সঙ্কুচিত ও নাসিকাগ্র স্ফীত হইতে লাগিল। পত্র পাঠ শেষ হইলে, সেখানি তিনি টেবিলের উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অন্যদিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন ভদ্রলোক সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনও মন্দ খবর নয় ত?"

সত্যবাবু সেকথার কোনও উত্তর না দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "বসুন, আমি একটু ভিতর থেকে আসি"—বলিয়া চিঠিখানি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। একজন নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" অপর একজন উত্তর করিলেন, "সুধার চিঠি এসেছে।"

বাবু উপরে গিয়া, গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুধার চিঠি এসেছে।"

স্বামীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছে? ভাল আছে ত?"

"এই দেখ"—বলিয়া সত্যবাবু পত্রখানি স্ত্রীর হস্তে দিলেন।

গৃহিণী পড়িতে লাগিলেন—

১৪৮নং কুইন্স্ রোড
লণ্ডন (W)
১২ই আগষ্ট

শ্রীচরণেষু,

গত রবিবার আপনার পত্র এবং টাকার ড্রাফ্ট্ পাইয়াছি। আপনারা সকলে কুশলে আছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

বাবা, গত কয়েক সপ্তাহ হইতে লিখি লিখি করিয়া একটি কথা আপনাকে লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সে কথা আর আপনাদের নিকট গোপন রাখা আমার উচিত হইবে না, তাই আজ লিখিতেছি।

বিগত গ্রীষ্মের বন্ধের সময়, আমি যখন ব্রাইটনে বায়ু-পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলাম, সেই সময় সমুদ্রস্নানকালে একটি যুবতীর জীবন বিপন্ন হয়। আমিও স্নান করিতেছিলাম, আমি অনেক কষ্টে সেই যুবতীর জীবনরক্ষা করি। সেই সূত্রে তাহার সহিত আমার পরিচয় হয়। আমি জানিতে পারি যে তাহার নাম নোরা ডাড্লি, সে লণ্ডন ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করে, আমারই ন্যায় গ্রীষ্মের বন্ধে সমুদ্রতীরে বায়ু-পরিবর্ত্তনে আসিয়া কোনও বোর্ডিংএ বাস করিতেছে। তাহার বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, শিশুকাল হইতেই বাপ মা নাই, নটিংহামশায়ারে তাহার এক পিতৃব্য থাকেন, এতদিন তিনিই উহাকে লালনপালন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল নয় বলিয়া, বৎসর খানেক হইতে নোরা লণ্ডনে আসিয়া চাকরি করিতেছে। ক্রমে তাহার সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। প্রতিদিন সাক্ষাৎ হইত। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াও সেইরূপ।

আমি প্রতিদিন বিকালে তাহার আপিসের ছুটির পূর্ব্বে, বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকি। সে আসিলে, দুইজনে একত্র বেড়াইতে যাই; কোন কোন দিন কোনও সাধারণ ভোজনাগারে সান্ধ্যভোজনও একত্র সমাধা করি।

বাবা, আপনি ত জ্ঞানী ব্যক্তি। আপনি ত জানেন এই প্রকার ঘনিষ্ঠতার পরিণতি

কিরূপ দাঁড়ানো সম্ভব ও স্বাভাবিক। যাহা সম্ভব ও স্বাভাবিক, তাহাই হইয়াছে। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে না পাইলে, আমার জীবনটাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নোরার অবস্থাও তদ্রূপ। একদিন বিকালে কার্য্যবশতঃ আমি যথারীতি তাহার আপিসের নিকট গিয়া দাঁড়াইতে পারি নাই। সে অনেকক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া, আমার বাসায় আমাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল ; বাসায় আমার কোনও সংবাদ না পাইয়া, বাসার সামনে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা কাল পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছিল ; অবশেষে নিজ বাসায় ফিরিয়া গিয়া, বিছানায় শুইয়া পড়ে, সে রাত্রে সে কিছুই খায় নাই! পরদিন সন্ধ্যার পর হাইড্ পার্কে এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া আকুল হইল!

বাবা, এই সব কথা লিখিলাম বলিয়া আমাকে আপনি নির্লজ্জ ও বাচাল মনে করিবেন না। এসব কথা আমার লিখিবার উদ্দেশ্য, অপনাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। যদিও আপনি একবার বিলাতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন ছিলেন না। ইংরাজললনা হইয়াও নোরা যারপর নাই কোমলহৃদয়া ও প্রেমময়ী। আপনাদের—শুধু আপনাদেরই বা বলি কেন, অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় নরনারীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, মেমেরা একান্ত পাষাণহৃদয়া হয়, এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম-তাহাদের আদৌ অজ্ঞাত। নোরাকে আমি বিবাহ করিলে আদর্শ হিন্দুপত্নীর মতই যে সে আমাকে ভক্তি ও সেবা করিবে, সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্কই যে সে অনুসরণ করিবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আপনাদের প্রতিও সে যে যথেষ্ট ভক্তিমতী হইবে তাহাও আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। আপনা-দিগকে দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল। কথায়-বার্ত্তায় আপনাকে "পাপা" এবং মাকে "মাম্মা" বলিয়াই সে উল্লেখ করিয়া থাকে।

বাবা, অবস্থা সমস্তই খুলিয়া লিখিলাম। আমি জানি আপনি উদার মহৎ, কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা বা কুসংস্কার আপনার নাই। তাই সাহস করিয়া সকল কথা আপনাকে লিখিয়া, এ বিবাহে আপনার ও মাতৃদেবীর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ আমি ভিক্ষা করিতেছি। পাঠ শেষ হইতে আমার এখনও দুই বৎসর বাকী আছে। ততদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নহে বলিয়া, আগামী ডিসেম্বর মাসে আমরা বিবাহ করা স্থির করিয়াছি। সে সময় আমার হাজার দুই টাকা আবশ্যক হইবে। বিবাহের পর আমার এলাউন্স বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে, কারণ তখন আর আপনার পুত্রবধূকে চাকরি করিতে দেওয়া শোভন হইবে না। আমরা যতদূর সম্ভব মিতব্যয়িতার সহিত গৃহস্থালী নির্ব্বাহ করিব। নোরা খুব শক্ত মেয়ে, একটি পয়সা তাহার হাতে অপব্যয় হইবার যো নাই।

এই পত্র অদ্য হইতে তিন সপ্তাহ মধ্যে আপনার হস্তগত হইবে। ডাকে ইহার উত্তর আসিতে আরও তিন সপ্তাহ লাগিবে। অতদিন অপেক্ষা করিতে হইলে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। তাই মিনতি করিতেছি, মাতৃদেবীর সম্মতি লইয়া, মাত্র দুইটি কথায় আমায় একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দিবেন। বিলাতে টেলিগ্রাম পাঠাইবার মাশুল অত্যন্ত অধিক, সুতরাং বিস্তারিত ভাবে সকল কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। আপনি যদি শুধু দুটি কথা "Bless you" (আশীর্ব্বাদ করি) টেলিগ্রাম করিয়া দেন, তবে আমি আপনার ও জননীদেবীর সম্মতি ও আশীর্ব্বাদ পাইলাম বলিয়া বুঝিব, এবং নিশ্চিন্ত হইব। আপনি আমার শতকোটী প্রণাম জানিবেন ও মাতৃদেবীকে জানাইবেন। আপাততঃ বিদায়।

আপনাদের চির স্নেহের

সুধা

গৃহিণী এই পত্রখানি যখন পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিয়দংশ পড়িবার পর, তাঁহার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, তিনি নিকটস্থ একখানা

চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। পত্রপাঠ শেষ করিয়া স্বামীর দিকে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হবে ?"

সত্যবাবু বলিলেন, "এ বিয়ে যেমন করে হোক বন্ধ করতেই হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা তো বটেই! কিন্তু কি উপায়ে বন্ধ করবে ? কে'দে কেটে, ভয় দেখিয়ে, তুমি আমি দুজনে যদি তাকে বারণ করে চিঠি লিখি তা হ'লে সে কি শুনবে না ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "মাগীকে নিয়ে হারামজাদা যে রকম মস্‌গুল্‌ হয়ে আছে, মানা করলেই যে শুনবে এমন ত বোধ হয় না।"

"তবে ?"

"সেই কথাই ত ভাবছি। একটা কোন উপায় করতেই হবে। মেম বিয়ে করে নিয়ে এলে, এদেশে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না যে! না দেশী সমাজে, না বিলাতী সমাজে, কোন সমাজেই সে যে মুখ দেখাতে পাবে না। পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা পর্য্যন্ত লোপ হবে। দেখ দেখি নচ্ছার বেটার আক্কেলখানা! উনি জানেন আমি উদার মহৎ, আমার ভিতরে কোন রকম কুসংস্কার নেই! আরে, মুর্গীই না হয় খাই, তাই বলে কি হিঁদুয়ানি ছেড়ে দিয়েছি, আর তোকে মেম বিয়ে করতে অনুমতি দেবো ? কি রত্নই পেটে ধরে-ছিলে গিন্নী!"

গিন্নী বলিলেন, "তুমি না হয় নিজেই একবার যাবে ? গিয়ে ছেলেকে ধরে' নিয়ে আসবে ?"

সত্যভূষণবাবু পূর্ব্বে যে বিলাত গিয়াছিলেন, তাহা সুধাংশুর পত্রেই প্রকাশ। কারবার সংসৃষ্ট ব্যাপারে তিন মাসের জন্য একবার তাঁহাকে বিলাতে যাইতে হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বার যাইতে কোনও আটক নাই।

সত্যবাবু বলিলেন, "মেরে ধরে তাকে নিয়ে আসবো ? সে কি আর কচি খোকাটি আছে যে গালে একটা চড় কষিয়ে কাণ ধরে' হিড়্‌হিড় করে টেনে আনবো ? রাস্কেল শুয়ার কোথাকার! সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্কই সে অনুসরণ করবে! খুঁজে খুঁজে কি সীতা সাবিত্রীই বের করেছে বেটা অকাল কুষ্মাণ্ড—বাঃ! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। সে দেশে চাকরি করা মেয়েরা যে কেমন সীতা সাবিত্রী সে আর জানতে বাকী নেই!"

বিলাত প্রবাসকালে স্বামীর ব্রহ্মচর্য্য-পালন সম্বন্ধে গৃহিণী মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া থাকেন। অন্য সময় হইলে শেষের এই কথাটি লইয়া আজ তিনি স্বামীকে একটু পরিহাস না করিয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু ইহা পরিহাসের সময় নয়। তিনি ভীতভাবে বলিলেন, "সে কি গো ? ছুঁড়ি কি তা হলে—গৃহস্থের মেয়ে নয় ?"

কর্ত্তা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কক্‌খনো নয়। ও খুড়ো ফুড়ো সব ঝুট বাত। দেশে তার খুড়োখুড়ি থাকলে, ছুটির সময় সে সেইখানে গিয়ে কাটাতো—কাপ্তেন খুঁজতে ব্রাইটনে যেত না। তোমার ছেলেটিকে যেমন পেয়েছে গাধারাম! শুনেছে মস্ত বড়-লোকের একমাত্র ছেলে, গেঁথে ফেলেছে। বেটা, খাচ্ছিস খা, আবার ছাঁদা বেঁধে আনার দরকার কি বাপু ? বামুনের ছেলে কিনা, ছাঁদা বাঁধা ভুলতে পারেনি! করুক না বিয়ে, করে' একবার মজাটি দেখুক। একটি পয়সা দেবো না, ত্যজ্যপুত্র করবো। বিয়ের সময় খরচের জন্যে দু' হাজার টাকা চাই! আব্দার দেখনা একবার! হতভাগা পাজি ছুঁচো হনুমান।"

আপিসের বেলা হইয়া যায়। স্নানাহার করিয়া সত্যবাবু আপিসে গেলেন। আহার—পাতের কাছে বসাই সার হইল। গৃহিণী ত সারাদিন শয্যা লইয়া রহিলেন।

॥ দুই ॥

আপিসে গিয়া, সত্যবাবু পুত্রের চিঠিখানি আর একবার পাঠ করিলেন। ছেলে লিখিয়াছে, দুইটিমাত্র কথা তার করিয়া দিবেন— "Bless you"। সত্যবাবু, একখানি বিলাতী টেলিগ্রামের ফর্‌ম্‌ লইয়া, রাগের মাথায় তৎপরিবর্ত্তে লিখিলেন, "Damn you" (উচ্ছন্ন যাও)। ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, চাপরাশি আসিয়া দাঁড়াইল। টেলিগ্রামখানা তাহার হাতে দিবার জন্য উঠাইলেন; আবার নামাইয়া রাখিলেন। ভাবিলেন, এরূপ টেলিগ্রাম পাইয়া, ক্রোধে ও নৈরাশ্যে ছেলে যদি বিবাহই করিয়া বসে! তা ছাড়া, টেলিগ্রামখানা এই দীর্ঘযাত্রাপথে যে সকল কর্ম্মচারী ও কর্ম্মচারিণীর হাতে পড়িবে, তাহারাই বা ভাবিবে কি! একজনকে মাত্র গালি দিবার জন্য, ৫০।৬০ টাকা যে ব্যয় করিয়াছে, তাহাকে লোকে উন্মাদ ভিন্ন আর কি মনে করিবে? তাই তিনি সেখানা ছিঁড়িয়া, অন্য একখানা টেলিগ্রাম লিখিলেন, তাহাতে শুধু একটি মাত্র শব্দ রহিল—"Wait" (সবুর)।

সন্ধ্যার পর সত্যবাবুর মোটর, বালিগঞ্জে এক বাঙ্গালী ব্যারিস্টার মিস্টার সেনের গৃহের ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। ইনি সত্যবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। সেন সাহেব তখন রাত্রিবসন পরিধান করিয়া লাইব্রেরী গৃহে একখানা আরাম কেদারায় পড়িয়া, চশমা চোখে দিয়া বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার মুখে পাইপ, পার্শ্বস্থ টেবিলে হুইস্কির গ্লাস। বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, "হঠাৎ যে! খবর কি হে?"

সত্যবাবু পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া সেন সাহেবের হাতে দিলেন। সেন তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "এ যে জবর খবর! তা, টেলিগ্রাম করে দিয়েছ ত?"

কি টেলিগ্রাম করিতে যাইতেছিলেন, সেখানা ছিঁড়িয়া কি টেলিগ্রাম করিয়াছেন, দুই রকমই সত্যবাবু বলিলেন। শেষে বলিলেন, "উপায় কি করা যায় বল দেখি? আমি ত নিজে যাওয়া একরকম স্থিরই করেছি। সেখানে গিয়ে কি রকম কার্য্যপ্রণালীটা অবলম্বন করি বল দেখি?"

"নিজে যাচ্ছ? তাহ'লে আর ভাবনাটা কি? কিছু টাকা খরচ করলেই হল।"

"কি করবো? ছুঁড়িকে কিছু টাকা দিয়ে, তাকে ভাগিয়ে দেবো?"

সেন সাহেব হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়া বলিলেন, "উঁহু! সে সুবিধে হবে না। ছুঁড়ি কি রাজি হবে? সে হয়ত ভাববে, বিয়ে হলে এই বুড়োর ষোল আনা সম্পত্তিই ত আমার; এখন দু' কি পাঁচ হাজার নিয়ে কি হবে? কিংবা, সে টাকাও নিতে পারে, বিয়ে করবার মৎলবও পরিত্যাগ না করতে পারে। তার চেয়ে বরঞ্চ এক কাজ কর না, সত্য!"

সত্যবাবু সাগ্রহে বলিলেন, "কি?"

"দাঁড়াও"—বলিয়া তিনি গ্লাস তুলিয়া সেটা খালি করিয়া বলিলেন, "তোমাকেও একটা পেগ দিক?"

সত্যবাবু সম্মতি জানাইলে, বয়কে ডাকিয়া দুইটা পেগ দিতে আদেশ করিলেন। পাইপ টানিতে টানিতে বলিলেন. "কৃষ্ণকান্তের উইল পড়েছ ত? গোবিন্দলালের ঘাড় থেকে ভূত ছাড়াবার জন্যে ভ্রমরের বাপ মাধবীনাথ যে ফন্দি করেছিলেন, তুমিও তাই কর না কেন?"

সত্যবাবু বলিলেন, "নিশাকর পাই কোথা?"

"নিশাকর হবার মত একটি লোক আমার হাতে আছে।"

"কে?"

"নবীন দত্ত। হরি দত্তের ছেলে নবীন দত্ত। বছর ৩।৪ হতভাগাটা বিলাতে ছিল; শুধু স্ফূর্ত্তি করেই বেড়িয়েছে—পাস-টাস কিছু করতে পারেনি। বিলাতে যে কত লীলা

সে করে' এসেছে তার সংখ্যা নেই। একবার না দ্ব'বার তার জেল পর্য্যন্ত হয়েছিল। বাপ মারা যাবার পর টাকার অভাবে দেশে ফিরে এসেছে—এখন বেকার অবস্থায় চাকরির চেষ্টায় ঘ্বরছে। সে যে রকম বদমাইস, কিছ্ব থোক্ টাকা পেলে স্বচ্ছন্দে রাজি হবে এখন। কায হাঁসিল করে আসবে।"

সত্যবাব্ব বলিলেন, "টাকা খরচ করতে আমি রাজি আছি।"

"তাকে তার মেহনতানা দিতে হবে। তারপর, সরঞ্জামি খরচ। সে একটা রাজা-টাজা নবাব-টবাব সেজে, ছ্বড়িকে হাত করে নেবে কিনা! স্বতরাং তাকে একট্ব লম্বা হাতেই টাকা খরচ করতে হবে।"

সত্যবাব্ব বলিলেন, "ব্বঝেছি। টাকার জন্যে আট্‌কাবে না। সে লোক কোথায়, তাকে একবার ডাকাও।"

সেন বলিলেন, "সে কি এখন আসবে? সে এখন ক্লাবে বসে পেগ টানছে। কাল সন্ধ্যে-বেলা বরঞ্চ তাকে এখানে আনিয়ে রাখবো, তুমি সন্ধ্যের পর এস। তার বায়না স্বরূপ একটা চেকও সঙ্গে এন।"

"বেশ, তাই আনবো।"

দ্বই চারিটি অন্যান্য কথার পরে সত্যবাব্ব উঠিলেন।

পরদিন সত্যবাব্ব যথাসময়ে বন্ধ্বগৃহে উপস্থিত হইয়া, দত্ত সাহেবের দেখা পাইলেন। দত্ত রাজি। ইংরাজিতে বলিল, "এ আর একটা শক্ত কথা কি? সে ঠিক হয়ে যাবে এখন। আমাকে কিন্তু নবাব সাজতে হবে। নবাবোচিত সকল সরঞ্জামই চাই। অন্য সব জিনিষ সেখানেই পাওয়া যাবে. কেবল একটা জমকালো রকমের রূপোর গ্বড়গ্বড়ি, লক্ষ্মৌয়ের খানিকটে স্বগন্ধি তামাক, আর কিছ্ব টিকে এখান থেকে সঙ্গে নিতে হবে। আর, একটা ফেজ ক্যাপ।"

তিনজনে বসিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। ইত্যবসরে দত্ত আধ বোতলের উপর উদরস্থ করিয়া ফেলিল। সত্যবাব্বর নিকট টাকা লইয়া সে যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, তাহার পা একট্বখানি টলিলও না।

॥ তিন ॥

দত্তসাহেবকে সঙ্গে লইয়া, পি-এন্ড-ও কোম্পানির মল্‌ডেভিয়া নামক মেল ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া, যথাসময়ে সত্যবাব্ব লন্ডনে আসিয়া পেণছিলেন। ঐ মেলেই, সত্যবাব্ব লিখিত একখানি পত্র স্বধাংশ্বর নামে আসিয়া পেণছিল, তাহাতে "হাঁ, না" কিছ্বই নাই. আছে শ্বধ্ব তাহার প্রণয়িনী সম্বন্ধে গ্বটিকতক ফাঁকা প্রশ্ন,—কেমন বংশ. খ্বড়া কিরূপ লোক ইত্যাদি। সময় লইবার ফিকির—আর কিছ্ব নয়।

ট্রেণ হইতে নামিয়া উভয়ে একটা হোটেলে গিয়া উঠিলেন। পরদিন প্রাতে, দত্ত বাসা খ্বজিতে বাহির হইল এবং একট্ব দ্বরে অঞ্চলে বাসা ঠিক করিয়া, সত্যবাব্বকে সেখানে লইয়া গেল। সত্যবাব্ব যে লন্ডনে আসিয়াছেন, এখন স্বধাংশ্বকে তাহা জানিতে দেওয়া অভিপ্রেত নহে।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, দত্ত বাহির হইয়া, লন্ডন ব্যাঙ্কে গিয়া উপস্থিত হইল। কত প্বরুষ, কত স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী, ভিতরে বসিয়া কায করিতেছে—গরাদের ভিতর দিয়া তাহাদের সকলকেই দেখা যায়। ১৯।২০ বৎসর বয়সের মেয়ে অনেকগ্বলিই রহিয়াছে, কোন্‌টি নোরা, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। দত্ত তখন ব্যাঙ্কের একজন ছোক্‌রাকে ডাকিয়া, তাহার হস্তে একটি শিলিং গ্বঁজিয়া দিয়া বলিল, "ওহে ছোক্‌রা, একট্ব এদিকে এস ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

অর্থলাভে খ্বসী হইয়া, দন্ত বাহির করিয়া, বালক দত্তসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে একটা

নিভৃত স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। দত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যাঙ্কে মিস্ ডাড্‌লি নামে যে একটি যুবতী চাকরি করে, তা'কে তুমি চেন?"

বালক বলিল, "নোরা ডাড্‌লি ত? খুব চিনি। ডাকিয়া দিব?"

"হাঁ—দাও ত।"

বালক ছুটিয়া চলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, যে সকল যুবতী বসিয়া টাইপ-রাইটিং-এর কার্য্য করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের কাণে কাণে কি বলিল। বলিতেই, সেই যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বাহিরের ভিড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দত্ত ভিড়ের আড়ালে লুকাইয়া সেই যুবতীকে দেখিতে লাগিল। যুবতী, বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া তখন দত্ত সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বাস্তবিক, নোরার সঙ্গে দেখা করা তাহার উদ্দেশ্য নহে; দেখা হইলে, সে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, কেন মহাশয়? তখন কি উত্তর দিবে? উদ্দেশ্য—তাহাকে চেনা, এবং ব্যাঙ্কে সে কি কার্য্য করে তাহা জানা। উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে।

দত্ত, সেখান হইতে সোজা ফ্লীট ষ্ট্রীটে গেল। সেখানে অনেক সংবাদপত্রের আফিস। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে, উপর্য্যুপরি তিন দিন প্রভাতে প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি দিল:—

WANTED

অবসর সময়ে টাইপ-রাইটিং কার্য্যের জন্য একটি যুবতীর প্রয়োজন। সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা, দুই ঘণ্টা কার্য্য করিতে হইবে। বেতন সপ্তাহে ৪ গিনি। বয়স ও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ সহ আবেদন করুন।

বক্স নং......C/o ম্যানেজার.....

বিজ্ঞাপন দিয়া, পাঁচটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে দত্ত আবার ব্যাঙ্কের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একজন ভারতবর্ষীয় যুবক, একস্থানে দাঁড়াইয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছে। পাঁচটার পরেই ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণসহ নোরাও বাহির হইয়া আসিল। যুবক তাহাকে দেখিবামাত্র টুপী উত্তোলন করিল; উভয়ের করমর্দ্দন হইল; অল্পদূরে দাঁড়াইয়া দত্ত শুনিল, নোরা বলিতেছে, "সিউডা, আজ বেলা ৩টার সময় তুমি কি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলে?" সুধা বলিল, "কই না!" নোরা বলিল "আজ বেলা ৩টার সময় ব্যাঙ্কের একজন ছোক্‌রা আসিয়া বলিল, কোনও কৃষ্ণবর্ণ ভদ্রলোক তোমায় ডাকিতেছেন। ভাবিলাম, নিশ্চয় তুমিই কোনও দরকারে আসিয়াছ। বাহিরে আসিয়া তোমায় কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। ছোকরাটাও চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, 'কই তাঁকে ত দেখিতেছি না।'"

সুধা বলিল, "আর কেহ বোধ হয় আর কাহাকেও খুঁজিতেছিল।"

"তাই হইবে"—বলিয়া দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল এবং শীঘ্রই ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া গেল। দত্ত মনে মনে হাসিয়া, অম্‌নিবাসে উঠিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিল।

দুইদিন পরে, চারিখানি সংবাদপত্রের আফিস হইতে চার বোঝা আবেদন পত্র আসিয়া পৌঁছিল। দত্ত সেগুলি গণিয়া দেখিল, দুই হাজারেরও উপর। সত্যবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এত?" দত্ত বলিল, "হবে না? সারাদিন আফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে সপ্তাহে দেড় গিনি দু'গিনির বেশী পায় না; এটা, অবসর সময়ে ঘণ্টা দুই কায করেই চার গিনি! তা ছাড়া, নিয়োগকর্ত্তা ধনী ও অবিবাহিত হলে, অনেক সময় টাইপ্-রাইটিং ছুঁড়ির সঙ্গে বিয়েও হয়ে যায়।—সেও একটা ফিউচর্ প্রস্পেক্ট্ (ভবিষ্যৎ আশা) আছে ত!"

উভয়ে তখন পত্রগুলি ভাগাভাগি করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আবেদনকারিণীর নামটি মাত্র দেখিয়াই, সেখানা ছিঁড়িয়া ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপ অর্দ্ধ-

ঘণ্টাকাল বৃথা পরিশ্রমের পর, দত্ত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এই দেখ।—লণ্ডন ব্যাঙ্কের নোরা ডাড্‌লি।—বয়স ১৯ বৎসর। মার দিয়া কেল্লা!"

সত্যবাবু পত্রখানি লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। বলিলেন, "সেই হারামজাদিই বটে। বেটী মূর্খ—দেখ না এইটুকু চিঠির মধ্যে কতগুলো বানান ভুল!"

দত্ত বলিল, "মূর্খ না ত কি! সে যাক্। তোমার ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করেই অবশ্য এ দরখাস্ত করেছে। সন্ধ্যাবেলাটাই ওদের লীলা খেলার সময় কিনা : তোমার ছেলে যে মত দিলে বড় ?"

সত্যবাবু বলিলেন, "বোধ হয় ভেবেছে, বাবার চিঠিতে তেমন উৎসাহ ত কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত ফেরবার আগে ভিন্ন বিবাহই হবে না। সন্ধ্যের পর দু'ঘণ্টা বইত নয়! ৬টা থেকে ৮টা ইতিমধ্যে ফাঁকতালে যা রোজগার হয়ে যায়।"

দত্ত বলিল, "তাই বোধ হয় ওদের পরামর্শ।"

॥ চার ॥

সত্যবাবুকে পূর্ব্ব বাসায় রাখিয়া, দত্ত সাহেব কেনসিংটন গার্ডেন্সে আসিয়া উচ্চ ভাড়ায় নূতন বাসা স্থির করিল। ঘরগুলি পূর্ব্ব হইতেই বহুমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জিত ছিল, নবাবোচিত কতকগুলি জিনিষও সংগৃহীত হইয়াছে। আহারাদির বন্দোবস্তও ধনী-জনোচিত। এখানে আসিয়া দত্ত নিজের নাম বলিয়াছে—"নবাব অব্ পান্নাগড়।" একজন খানসামা (valet) নিযুক্ত করিয়াছে; এবং মাসিক ভাড়ায় একখানা দামী রোল্‌স্ রয়েস্ মোটর গাড়ীও নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর এই জাল নবাবটি, নকল পান্নার গোটাকতক আংটি আঙুলে পরিয়া, রূপার গুড়গুড়িতে, সোণার ঝালরযুক্ত সরপোষে ঢাকা কলিকায়, সুগন্ধি অম্বুরী তামাকু সেবন করিতেছিল। পার্শ্বস্থ টেবিলে হুইস্কির গ্লাস। মাঝে মাঝে তাহাও পান করি-তেছে। ঘড়িতে ঠংঠং করিয়া ছয়টা বাজিল। দাসী আসিয়া বলিল, "মিস্ ডাড্‌লি।"

"নিয়ে এস।"—বলিয়া দত্ত গম্ভীরভাবে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিল।

অর্দ্ধমিনিট পরে, নোরা আসিয়া প্রবেশ করিল। দত্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন ও করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে বসাইল। সে কতদিন লণ্ডনে আছে কোথায় তাহার বাসা. আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে, বিনীত ও মধুরভাবে এই রকম কতকগুলি প্রশ্ন তাহাকে করিতে লাগিল। তারপর নিজ পরিচয় এইরূপ দিল—

"আমার পিতা, লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বাল্যকালেই আমাকে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি ইংলণ্ডেই ছিলাম। পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দেশে চলিয়া যাই। আমিই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। গদি পাইয়া আমি রাজ্যশাসন করিতে লাগি-লাম। রাজ্যটি ছোট। আয় তেমন বেশী নয়—বার্ষিক মাত্র চৌদ্দ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ তোমাদের লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি। একদিন আমি মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছি, একটা গ্রামের মাতব্বর প্রজা আসিয়া এক টুকরা সবুজ পাথর আমার হাতে দিল। বলিল, নিজ ক্ষেত চষিতে চষিতে মাটির ভিতর সে উহা পাইয়াছে। পাথরখানা দেখিয়া আমার মনে বড় সন্দেহ হইল। যাচাই জন্য উহা বোম্বাইয়ের কোন বিখ্যাত মণিকারের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা বলিল, উহা উচ্চ অঙ্গের পান্না—তোমরা যাহাকে এমারেল্ড্ বল। ঐটুকু পাথরের মূল্য তাহারা ছয় হাজার টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। ছয় হাজার—অর্থাৎ এদেশের টাকায় প্রায় চারিশত পাউণ্ড। তারপর সেইস্থানে ও নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি আমি খনন করাইতে আরম্ভ করিলাম। আরও তিন টুক্‌রা পান্না পাইলাম। আমার রাজ্যে যে পান্নার খনি আছে তাহা কেহ জানিত না। এখন বুঝিলাম, এই জন্যই পুরাকাল হইতে ইহার নাম হইয়াছে পান্নাগড়। যাহা হউক. সে সমস্ত জমি প্রজার নিকট হইতে

ছাড়াইয়া লইয়া, স্থানটির চতুর্দ্দিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছি, একশো গজ অন্তর এক এক জন সশস্ত্র প্রহরী খাড়া আছে। যদি কোনও ধনী ব্যক্তি বা কোম্পানী ঐ পাহাড় জমি লীজ লয়, সেই চেষ্টা করিতে এখন আমি ইংলণ্ডে আসিয়াছি। দুই একজন ধনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। অগ্রিম বার্ষিক ত্রিশ হাজার পাউণ্ড হিসাবে ভাড়া চাহি ; কিন্তু এখনও দশ বারো হাজারের অধিক কেহ উঠিতে চাহিতেছে না। সেই সূত্রে অনেক চিঠি-পত্র লেখার আমার প্রয়োজন হইবে। তাই টাইপ্‌রাইটিং জন্য আমার একজন লোক প্রয়োজন। তা, তুমি যদি এ কর্ম্মটি গ্রহণ কর তবে ভালই হয়।"

নোরা বলিল, "গ্রহণ করিব বইকি। সেই জন্যই ত আসিয়াছি। কবে হইতে আমার কার্য্য করিতে হইবে, বলুন।"

"আজ হইতেই তোমাকে আমি নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু আজ আমি বড় ক্লান্ত আছি। কাল তুমি আসিলে, কতকগুলা চিঠি টাইপ করিতে দিব। তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছে। সারাদিন ব্যাঙ্কে খাটিয়াছ, আহা ছেলেমানুষ তুমি, ফুলের মত অমন যে তোমার মুখ-খানি, তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে। কিছু খাইবে?"

নোরা বলিল, "না, ধন্যবাদ, আমি বাড়ী গিয়া খাইব।"

"কিছু পান কর তবে। একটু শ্যাম্পেন, দুখানা বিস্কুট। দেখ, আমাদের ভারত-বর্ষের নিয়ম এই, বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিলে, তাহাকে কিছু না খাওয়াইয়া আমরা ছাড়ি না।"

নোরা রাজি হইল। দুই গ্লাস শ্যাম্পেন ও খান চারি বিস্কুট খাইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ তবে আমি যাইতে পারি?"

দত্তও দাঁড়াইয়া বলিল, "এখনই যাবে? আচ্ছা, এই লও, তোমার এক সপ্তাহের বেতন অগ্রিম লইয়া যাও।"—বলিয়া দত্ত চারিটি সভারিন ও চারিটি শিলিং পকেট হইতে বাহির করিয়া নোরার হস্তে দিল। নোরা ধন্যবাদ দিয়া সেগুলি গ্রহণ করিল।

দত্ত বলিল, "যাও যাও, আর দেরী করিও না। তোমার কতই না ক্ষুধা পাইয়াছে—আহা ছেলেমানুষ! এখানে ত কিছু খাইলে না, কাল আবার ঠিক সময় আসিও। বোধ হয় আমাদের বনিবনাও ভালই হইবে। তুমি কিন্তু বেশটি!—খাসাটি!"—বলিয়া, এ বিদ্যায় বৃহস্পতি দত্ত সাহেব, নোরার গালটি টিপিয়া দিল। নোরা রাগিল না ; মুচ্‌কি হাসিযা, মাথাটি হেলাইয়া "গুড্‌ নাইট্‌" বলিয়া প্রস্থান করিল।

আটটা কুড়ি মিনিটে, হাইড্‌ পার্কের কোনও নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে সুধাংশুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে স্থির ছিল। তখনও এক ঘণ্টার বেশী বাকি। এদিক ওদিক বেড়াইয়া সময়টা কাটাইয়া, যথাসময়ে নোরা সেই সঙ্কেত স্থানে গিয়া তাহার প্রণয়ী "সিউডা"র সহিত সাক্ষাৎ করিল। নবাব সাহেব ঘটিত সকল কথাই সে সুধাকে বলিল। কেবল তাহার শেষের মন্তব্যটি এবং গাল টিপিয়া দিবার কথাটি গোপন করিয়া গেল।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিল, 'নবাব সাহেবের বয়স কত?"

নোরা তাচ্ছিল্যভাবে বলিল, "বয়স ঢের হইয়াছে।" (দত্ত সাহেবের বয়স ৩২ বৎসর মাত্র)

"দেখিতে কেমন?"

"কদাকার।" (দত্ত সাহেব একজন সুপুরুষ বলিয়া গণ্য)

"কথাবার্ত্তা কিরূপ?"

"কাঠখোট্টার মতন। আবার 'হুক্কায়' ধূমপান করে! মাগো, কি দুর্গন্ধ! কেমন করিয়া যে তাহার চাকরি করিব জানি না।"

সুধাংশু এ সমস্ত শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। বলিল, "কি করিবে বল ; কিছুদিন ত কাজ কর। বাবার চিঠি ত তোমায় পড়িয়া শুনাইয়াছি। তাঁর ভাবভঙ্গি-কিছুই বুঝিতে

পারিতেছি না। হয়ত বা বলিয়া বসিবেন, 'না, এখন বিবাহ করিয়া কায নাই; পাঠ শেষ হইলে, বিবাহ করিয়া দেশে চলিয়া আসিও।' তোমার এই চাকরিটি যদি স্থায়ী হয়, তবে চাই কি, বাবাকে না জানাইয়াও কিছুদিন পরে আমরা বিবাহ করিতে পারি। তোমার উপার্জ্জনে এবং আমার এলাউন্সের টাকায় আমাদের সংসার একরকম চলিয়া যাইতে পারিবে। এই সকল ভাবিয়াই, তোমার এ চাকরি গ্রহণে আমি সম্মতি দিয়াছি; নচেৎ বাবার নিকট হইতে আশাপূর্ণ পত্র আসিলে, কখনই সম্মতি দিতাম না।"

॥ পাঁচ ॥

দুই সপ্তাহ পরে একদিন দত্ত আসিয়া সত্যবাবুকে বলিল, "ভাই, পাঁচশো টাকা দাও।"

"কেন?"

"ছুঁড়ির জন্যে একটা ইভনিং ড্রেস (পোষাক) কিনতে হবে।"

"সেদিন ত দুশো টাকার ইয়ারিং কিনে দিলে, আবার এখনি?"

দত্ত বলিল, "এইবার যে এই নাট্যরঙ্গে শেষ অঙ্কের যবনিকা উঠছে। হপ্তাখানেক মধ্যেই নির্ব্বিবাদে ছেলেকে নিয়ে তুমি জাহাজে চড়বে।"

"কি রকম? এত শীঘ্র হবে মনে কর?"

"হবে। শোননা বলি। কাল আমার বাসায়, দুজনে শ্যাম্পেন ডিনার খেয়ে, সোফায় হেলান দিয়ে বসে গল্প করছি আর ব্রাণ্ডি টানছি, কথায় কথায় ছুঁড়ি বললে—'নোবি'—নবাবকে সংক্ষিপ্ত করে' নিয়ে, সে আমার নাম রেখেছে 'নোবি' কিনা!—বললে 'নোবি! আমার ইচ্ছা করে, তোমাতে আমাতে দুজনে একদিন কোনও থিয়েটারে যাই!'—বললাম, 'বেশ ত! চলনা, যেদিন বলবে। অ্যাপলো থিয়েটারে 'থ্রী লিট্‌ল মেড্‌স' হচ্চে—ভারি মজার ব্যাপার, কালই চল,—বল ত এখনই টেলিফোনে বক্স রিজার্ভ করে রাখি!'—ছুঁড়ি বললে 'কাল কি করে যাওয়া হতে পারে?—কি পরে' আমি যাব? তোমার সঙ্গে রোল্‌স্‌ রয়েস্‌ কার থেকে থিয়েটারে নামবো কি এই ঝিয়ের পোষাক পরে'?" আমি বললাম, 'ওঃ—সেইজন্যে? তা চলনা কালই তিন দিনের কড়ারে বণ্ড্‌ ষ্ট্রীটে তোমার পোষাক ফরমাস দেওয়া যাক। শনিবার দিন সেই পোষাকে তুমি আমার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে পারবে।'—তাই ভাই কাল পোষাকটি ফরমাস দিতে হবে, টাকা দাও।"

সত্যবাবু বলিলেন, "তা দিচ্ছি, কিন্তু একহপ্তা পরে, ছেলে নিয়ে বাড়ী যাব তুমি ঠিক বলছ?"

দত্ত বলিল, "শোন তবে, আমার প্ল্যান বলি। এবার তোমায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে। ছেলের সঙ্গে গিয়ে কাল দেখা কর, যেন আজই এসে পৌঁছেচ। শনিবারে আমি যে থিয়েটারে যাব, তুমিও ছেলেকে নিয়ে সেই রাত্রে ঐ থিয়েটারে যেও। দিনের বেলা ছেলেকে বোলো, চলনা থিয়েটার দেখে আসা যাক! বলে', একখানা খবরের কাগজ তুলে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দেখে, অ্যাপলো থিয়েটারের নাম করে দেবে।'

সত্যবাবু বলিলেন, "ওঃ বুঝেছি তোমার মৎলব। যাতে সুধা তোমাদের দুজনকে একত্র দেখতে পায়।"

"ঠিক তাই। আমরা দুজনেই বেশ গোলাপী চোখে বক্সে বসে' থাকবো আর, এদেশে যাকে lovey dovey বলে, সেই রকম জোটের পায়রা দুটির মত আচরণ করবো।"

সত্যবাবু বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু ছেলে বেটা যদি তাই দেখে ক্ষেপে ওঠে—একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে?"

দত্ত বলিল, "যদি ছুটে গিয়ে, ছুঁড়ির গলায় হাত দিয়ে গর্জ্জন করে' ওঠে—'রোহিণী! —আমি তোমার যম!'—এই ভয় করছ তুমি?"

"হ্যাঁ, ঐ রকম।"

দত্ত. সত্যবাবুর বাহুতে করাঘাত করিয়া বলিল, "কোনও চিন্তা নেই দাদা। এ প্রসাদপুরের মাঠ নয়—এখানে গোবিন্দলালের অভিনয় করবার চেষ্টা করলেই, লণ্ডন-পুলিস অমনি মজাটি দেখিয়ে দেবে বাছাধনকে!"

প্রচুর পরিমাণে হুইস্কি টানিয়া, চেক লইয়া দত্ত প্রস্থান করিল।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় হাইড্ পার্কে নোরার সঙ্গে দেখা হইলে সুধা বলিল, "নোরা, মস্ত খবর। গতকল্য বাবা হঠাৎ লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন; আজ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বলিলেন, 'সে মেয়েটিকে একবার নিজের চক্ষে না দেখিয়া কি করিয়া তোমাদের বিবাহ অনুমোদন করি বল? তাই চলিয়া আসিলাম।'—কাল কখন তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করিবে বল দেখি?"

নোরা বলিল, "তাই ত প্রিয়তম,—বড় মুস্কিল হইল যে! নটিংহাম হইতে চিঠি আসিয়াছে, আমার খুড়ো অত্যন্ত পীড়িত। তাই কাল শনিবার আপিসের পর ২টার গাড়ীতে আমি নটিংহাম যাইব স্থির করিয়াছি। খুড়াকে দুই দিন একটু সেবাশুশ্রূষা করিয়া আসি, উইলে আমায় কিছু দিয়াও যাইতে পারেন।"

"কবে ফিরিবে?"

"সোমবার প্রাতে আসিয়া আবার আপিস করিব। শনি রবি এই দুইটি দিন কেবল তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ।"

"আচ্ছা, যদি না গেলেই নয়, তবে যাইও। সোমবারে এইখানে আবার দেখা হইবে ত?"

"হ্যাঁ, তা হইবে বইকি। 'পাপা'র সঙ্গে দেখা করা সম্বন্ধে, সোমবারেই তোমাতে আমাতে পরামর্শ হইবে।"

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিল। পার্কের বাহির হইয়া, যে পাড়ায় নোরা থাকে, সেই দিকের অম্‌নিবাসে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া সুধা অন্য গাড়ীতে আরোহণ করিল। নোরা কিন্তু কিয়দ্দুর মাত্র গিয়া, সে গাড়ী হইতে নামিয়া, ট্যাক্সি লইয়া সোজা নবাব সাহেবের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার পর, নবাব সাহেবের পোষাক কামরায় গিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, সান্ধ্যবেশ ও নবার্জ্জিত নকল হীরা মুক্তার অলঙ্কারগুলি পরিয়া, নবাবসাহেবের সহিত ভোজনে বসিল। ইদানীং প্রায় প্রতিরাত্রেই সে, 'বড় ক্ষুধা পাইয়াছে' 'বড় ঘুম পাইতেছে' ইত্যাদি অছিলায় হাইড্ পার্কে সুধার নিকট তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করিয়া. নিজ বাসায় ফিরিবার নাম করিয়া এইখানে আসিয়া রাজভোগে পানাহার করে, এবং কথায় বার্ত্তায় অধিক রাত্রি হইয়া গেলে, সব দিন বাসায় ফিরিয়া যাওয়াও ঘটে না।

শনিবার দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সত্যবাবু পুত্রের নিকট থিয়েটারে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সুধা ভাবিতেছিল, নোরা সহরে নাই, কেমন করিয়া আজ সন্ধ্যা কাটিবে! পিতার এ প্রস্তাবে সে যেন বাঁচিয়া গেল।

যথাকালে সত্যবাবু, পুত্রসহ অ্যাপলো থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন। অর্দ্ধগিনি মূল্যের এক একখানি টিকিট ও ছয় পেনি মূল্যের একখানি প্রোগ্রাম কিনিয়া স্টলে গিয়া তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলেন। ১৫।২০ মিনিট পরে, অভিনয় আরম্ভ জন্য আলোক নির্ব্বাপিত হইল। প্রায় সেই সময়েই, দ্বিতলের চার-গিনি বক্সখানিতে, কাহারা প্রবেশ করিল. সুধাংশু ভাল দেখিতে পাইল না।

প্রথম অঙ্ক শেষ হইলে, সুধাংশু সেই বক্সের পানে চাহিয়া দেখিল, মহার্ঘ্য বসনভূষণে সজ্জিতা কোনও সুন্দরী, একজন ভারতীয় যুবাপুরুষের পার্শ্বে বসিয়া হাস্যপরিহাস করিতেছে। এই যুবককে সে পান্নাগড়ের নবাব বলিয়া চিনিতে পারিল, পূর্ব্বে ২।১ বার দূর হইতে ইহাকে দেখিয়াছিল। প্রথমটা সুধাংশুর চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল, নোরাকে

সে চিনিতে পারে নাই। তারপর সে বুঝিতে পারিল, ঐ তরুণী ত আর কেহ নয়, তাহারই সাধের প্রণয়িনী নোরা!

দেখিয়া, সুধার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বলিল, "বাবা, বড় গরম, আমি বাইরে থেকে আসি।"—বলিয়া থিয়েটারের বার্-এ গিয়া, এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি লইয়া, চোঁচোঁ করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

ফিরিয়া আসিয়া সে আবার পিতার পার্শ্বে বসিল, কিন্তু অভিনয়ের এক অক্ষরও আর তাহার কাণে গেল না। আলো জ্বলিলেই, সেই বক্সের পানে আবার চাহিয়া রহিল। দুইজনে হাসি গল্পের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সোহাগে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে—রীতিমত "লাভ ডাভি" অবস্থা! সত্যবাবুও মাঝে মাঝে আড়চোখে সেই বক্সের পানে চাহিতেছিলেন। সুধাংশু কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। সত্যবাবু বলিলেন, "তোমার কি শরীর ভাল নেই, অসুখ করছে? বাড়ী যাবে?"

সুধাংশু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

রাত্রি ক্রমে ১১টা বাজিল, অভিনয় শেষ হইল। অন্যান্য দর্শকগণের সঙ্গে ইহারাও পিতাপুত্রে বাহির হইল। ভেষ্টিবুলে আসিয়া সুধা বলিল, "বাবা, এইখানে একটু দাঁড়ান, আমি শীগ্‌গির আসছি।"—বলিয়া সে রাস্তার ধারে নামিল।

ঐ অদূরে পেভ্‌মেণ্টের উপর, কারের অপেক্ষায় নবাব সাহেবের বাহু অবলম্বনে নোরা দাঁড়াইয়া। সুধা হন হন করিয়া তথায় গিয়া, উত্তেজিত ও শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "নোরা, নটিংহাম যে লণ্ডনের এত কাছে তাহা জানিতাম না। কখন ফিরিলে? খুড়াটি কেমন আছে বল দেখি!'

নোরা মহা বিপদে পড়িল। পান্নাগড়ের রাণী হইবার আশাও সে মনে পোষণ করে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না বলিয়া, সুধাংশুকে সে হাতছাড়া করে নাই। এখন একুল ওকুল দুই কুল যাইবার দাখিল। সুতরাং সে নবাব-কুল বজায় রাখিবার আশায়, মস্তক উত্তোলন করিয়া উদ্ধত স্বরে বলিল, "Sir! I don't know you." (মহাশয় আমি আপনাকে চিনি না।)

সুধা ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "বটে! কবে থেকে, প্রেয়সী?"

নবাব সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "How dare you insult the future Ranee of Pannagarh!'—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ণমূলে ধাঁ করিয়া এক ঘুষি!

ঘুষি খাইয়া সুধা ঠিকরাইয়া কয়েক পা হটিয়া গেল। আহত স্থানে হাত দিয়া, পুলিস পুলিস বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

পথচারী দুই চারিজন লোক, গোড়া হইতে এই ব্যাপার দেখিতেছিল। প্রকাশ্যভাবে একজন মহিলার এই অপমানে তাহারা আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বলিল, "Serve you right, young man!" গোলমাল শুনিয়া, একজন পুলিস কনষ্টেবলও ছুটিয়া আসিল। লোকের নিকট ব্যাপার অবগত হইয়া সুধার স্কন্ধে তাহার সেই স্থূল হস্ত অর্পণ করিয়া বলিল, "Off with you drunken nigger. Think twice, before you insult an English lady again."—(হট্ যাও মাতাল কালা আদমি! ভবিষ্যতে একজন ইংরাজ রমণীকে অপমান করিবার আগে, বেশ করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিও।)—বলিয়া সুধাংশুকে এক ধাক্কা দিল।

সত্যবাবু নিকটেই ছিলেন। পুত্রকে লইয়া তাড়াতাড়ি ক্যাবে তুলিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

পথে যাইতে যাইতে, নোরার বিশ্বাসঘাতকতার কথা পিতাকে বলিতে বলিতে, সুধা ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। একে কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী সন্তান, তার উপর মদের নেশা!

সত্যবাবু পুত্রকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

ওদিকে য়োলস্ রয়েস্ কারে বসিয়া "নবাব" নেকু সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে, প্রিয়তমে?"

নোরা বলিল, "কে জানে কে! একদিন আমাদের ব্যাঙ্কে একখানা চেক ভাঙ্গাইতে গিয়াছিল, সেই সময় আমি উহাকে একটু সাহায্য করি। সেই অবধি ও আমার পিছু লইয়াছে, নানাভাবে আমায় জ্বালাতন করে।"

"তাই নাকি? বদমাস্! এবার বোধ হয় উহার শিক্ষা হইবে।"

"হওয়া ত উচিত।"—বলিয়া নোরা নীরব হইল।

পরদিন রবিবার। সত্যবাবু পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, তুমি মনে বড়ই আঘাত পেয়েছ। আমি বলি কি আমার সঙ্গে দেশে চল। সেখানে কিছুদিন থাকলে, তোমার মনটা আবার সুস্থ হবে।"

সুধাংশু সহজেই সম্মত হইল। সোমবার প্রাতে পিতাপুত্রে টমাস কুকের বাড়ী গিয়া জানিলেন, অদ্য রাত্রে লণ্ডন হইতে ট্রেণে চড়িলে, মার্সেল্‌স্ বন্দরে ভারতগামী একখানি ফরাসী জাহাজ ধরা যাইবে। সত্যবাবু দুইখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া আনিলেন।

অবসর মত সত্যবাবু দত্তসাহেবের সহিতও দেখা করিলেন। তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন; টাকাকড়িও বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে বলিলেন, "আহা, ছেলেটাকে অমন করে' ঘুষি মারাটা তোমার ভাল হয়নি কিন্তু।"

দত্ত বলিল, "দাদা, যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল নইলে চলবে কেন? ঐ মুষ্টিযোগটুকু না হলে কি আর বাবাজী অমন লক্ষ্মীটির মত তোমার সঙ্গে বাড়ী যেতে রাজী হতেন? ভাল পরামর্শই হয়েছে—আজ রাত্রেই সরে পড়। দেশে গিয়েই, একটি সুন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বাবাজীর বিয়ে দিয়ে ফেলো। আর তাকে বিলেত মুখোও হ'তে দিও না।"

সত্যবাবু বলিলেন, "আবার নেড়া বেলতলায় যায়! এখন, তুমি কি করবে বল? কবে দেশে ফিরবে?"

"হপ্তাখানেক পরেই। আসছে মেলে, আমিও আমার হবু রাণীটিকে কদলীপ্রদর্শন ক'রে—চম্পট পরিপাটি দেবো আর কি!"

"হ্যাঁ, বেশী দেরী করো না।"—বলিয়া সত্যবাবু উপকারী বন্ধুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রজাপতির পরিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ উকীলের চিঠি

সন্ধ্যার পর আদালত হইতে গৃহে ফিরিয়া প্রৌঢ়বয়স্ক উকীল শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতলে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, একখানা হাত-ভাঙ্গা ইজি-চেয়ারের উপর লম্বমান হইয়া, একেবারে যেন এলাইয়া পড়িলেন। চাপকানটা খুলিয়া রাখার সামর্থ্যও তাঁহার দেহে যেন আজ আর নাই।

গৃহিণী রান্নাঘর হইতেই স্বামীর পদশব্দ শুনিয়াছিলেন; তিনি তখন ময়দা

মাখিতেছেন, বড় মেয়ে কমলা তাঁহার কাছে বসিয়া কুটনা কুটিতেছে। ময়দা মাখা শেষ হইতে প্রায় ৫ মিনিট লাগিল; গৃহিণী তখন হাত ধুইয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া, কমলাকে রুটী ক'খানা বেলিয়া রাখিতে বলিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা, এখনও পোষাক ছাড়নি?"

শ্যামাচরণবাবু নীরবে মাথাটি নাড়িলেন।

গৃহিণী শঙ্কাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন. "হ্যাঁগা, অমন ক'রে রয়েছ কেন? শরীর ভাল আছে ত?"—সঙ্গে সঙ্গে স্বামীব ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিলেন,—না, গা গরম হয় নাই।

শ্যামবাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "শবীর ভালই আছে।"

'তবে তুমি অমন ক'রে রয়েছ কেন, বল না! আজ কি বেশী মেহনত হয়েছে? আদালতে বেশী কাজ ছিল?"

শেষের কথাটিতে শ্যামাচরণের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল—সেটা দুঃখের হাসি। আজ বিশ বৎসর ত প্র্যাকটিস হইল, মক্কেলের কাজের ভীড়ে মারা যাইবার অবস্থা ত এ পর্য্যন্ত কোনও দিন হয় নাই। তিনি প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না; ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাপকানটি খুলিয়া স্ত্রীর হাতে দিলেন। হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে যাইতেছিলেন, গৃহিণী বলিলেন, "তুমি ব'স ব'স, আমি খুলে দিচ্ছি।"

স্ত্রীর সাহায্যে বস্ত্র পরিবর্ত্তন সমাধা করিয়া শ্যামবাবু বলিলেন, "খবর খারাপ; হংসরাজ সুন্দরমলরা উকীলের চিঠি দিয়েছে, এক মাসের মধ্যে তাদের টাকা শোধ না করলে নালিশ কববে।"—বলিয়া শ্যামবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

গৃহিণী বলিলেন. "বটে! তা. সে কথা এখন আর ভেবে কি করবে বল! এক মাস ত সময় আছে, সে তখন যা হবার তাই হবে। তুমি যাও, হাতে মুখে জল দাও, আমি তোমার চা ঠিক করিগে।"

"যাই"—বলিয়া শ্যামাচরণ গামছাখানি কাঁধে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

শ্যামাচরণবাবুর বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। নিবাস হালিসহর গ্রামে। প্রত্যহ নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া চুঁচুড়ার আদালতে ওকালতী করিতে গিয়া থাকেন। তাঁহার একটি পুত্র, দুইটি কন্যা। পুত্র সুরেন্দ্রনাথের বয়স ২২ বৎসর। হুগলী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া দুই বৎসর যাবৎ সে কলিকাতায় আইন অধ্যয়ন করিতেছে। বড় মেয়ে কমলা সন্তানসম্ভাবিতা, মাসখানেক হইল পিতৃগৃহে আসিয়াছে। ছোট সরলা নিজ শ্বশুরালয়েই রহিয়াছে।

কন্যা দুইটির বিবাহ দিয়া শ্যামাচরণবাবু ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। হুগলির হংসরাজ সুন্দরমল মাড়োয়ারী ফারমের নিকট হ্যাণ্ডনোটে তিন হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। আসলের ত কথাই নাই, সুদটাও যে সব মাসে ফেলিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। তাহাদের প্রাপ্য এখন চার হাজাব টাকার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। উপার্জ্জন যাহা করেন, তাহাতে পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনেব ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া. কলিকাতাস্থ পুত্রের পড়াব খরচ যোগাইয়া, মহাজনের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এক মাসের মধ্যে চার হাজার টাকা কোথা হইতে আসিবে?

রাত্রিতে আহারাদির পর কর্ত্তা-গিন্নীর কথোপকথন হইতেছিল। কর্ত্তা বলিলেন, "লোকে আমায় বলে. তোমার টাকার ভাবনা কি? তোমার বি-এ পাশ করা ছেলে. তাব বিয়ে দিয়ে এখনই ত অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা ঘরে তুলতে পার!"

গৃহিণী বলিলেন, "তা ত বলবেই লোকে। আজকালকার বাজারে বি-এ পাশ ছেলের দাম ত পাঁচ হাজার টাকা ন্যূনসংখ্যা! কিন্তু ছেলেকে যে রাজী করতে পারিনে. সেই ত হয়েছে বিপদ কিনা!"

কর্ত্তা বলিলেন, "ছেলে যদি রাজি হয় ত এখনও হ'তে পারে। কোন্নগরের মুখুয্যে-দের সেই মেয়েটির এখনও বিয়ে হয়নি। এ শনিবারে সুরোকে ডেকে পাঠাব? আর একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখা যাক এস। অলঙ্কার, দানসামগ্রী এ সব ছাড়া নগদ পাঁচ হাজার দিতে তখনই ত তারা রাজী ছিল—বোধ হয় টেনে টুনে সাড়ে পাঁচ কি ছয়ও করা যেতে পারে। বাপের এই বিপদ শুনলেও কি তার মন গলবে না?"

গিন্নী বলিলেন, "এদিকে ত মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি খুবই দেখায়। কিন্তু কথা বললে শোনে না, ঐ ত দোষ।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভক্তি-টক্তি নয়—ও সব শুধু বচন—বচন! আজকালকার ছেলেদের ত ঐ রকমই হয়েছে কিনা! মুখের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য; কিন্তু কাজের বেলায় ফক্কিকার!"

স্বামীর মুখে পুত্র সম্বন্ধে এই মন্তব্য শুনিয়া গৃহিণীর মনে একটু আঘাত লাগিল। তিনি বলিলেন, "কিন্তু যে কথা সে বলে তাও ত কিছু অন্যায্য কথা নয়! সেবার বললে, দেখ মা, এই বরপণের অত্যাচারে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থ জর্জ্জর হয়ে রয়েছে; যে মেয়ের বাপ গরীব, তা'র ত কষ্টের অবধি নেই। দেশের এই অমঙ্গল দূর করবার জন্যে আমরা কলেজের ছাত্ররা মিলে সমিতি করেছি, কত বক্তৃতা ক'রে বেড়াচ্ছি, খবরের কাগজে কত প্রবন্ধ লিখছি, কত ছেলেদের খোসামোদ ক'রে ধরে এনে প্রতিজ্ঞা-পত্রে সই করিয়ে নিচ্ছি,—আমাকেই সকলে সেই সভার সম্পাদক করেছে; এখন আমিই যদি পণ নিয়ে বিবাহ করি, তা হলে লোকসমাজে আর মুখ দেখাব কেমন করে?—আমাদের বিষম দুরবস্থা, তাই যা বল; কিন্তু ছেলের কথা ত অসঙ্গত নয়!"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে ত সবই বুঝি। কিন্তু বাপের এই অপমান, এই দুঃখের চেয়ে সমাজে তার মুখ দেখাতে না পারার দুঃখ অপমানই কি এত বড় হ'ল?"

গৃহিণী এ কথার কোনও সদুত্তর দিতে পারিলেন না। যাহা হউক, স্থির হইল, এ শনিবারে বাড়ী আসিতে অনুরোধ করিয়া কল্যই সুরেনকে পত্র লেখা হইবে।

সুরেন পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রতি শনিবার না হউক, এক শনিবার অন্তর বাড়ী আসিতই। ইদানিং 'বিবাহপণ নিবারণী সমিতি"র সম্পাদক হইয়া তাহার অত্যন্ত সময়াভাব ঘটিয়াছে। খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ চলিতেছে। তাই এখন সে মাসে একবার করিয়া বাড়ী আসে মাত্র। ইংরাজী মাসের প্রথম শনিবারে বাড়ী আসে, পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎও করা হয়, মাসিক খরচের টাকাটাও লইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ যুবকের কর্ত্তব্যজ্ঞান

শনিবার সন্ধ্যার ট্রেণে সুরেন আসিয়া পৌঁছিল। সে দিন আর মা তাহাকে কিছুই বলিলেন না। পরদিন প্রাতে তিনি আহ্নিক করিতে বসিয়া, পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সুরেন মার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসুনয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

গৃহিণী তাঁহার আসনের নিম্ন হইতে উকীলের চিঠিখানি বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

সুরেন সেখানি পাঠ করিয়া মার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তাই ত! এখন উপায়?"

মা বলিলেন, "তুমি, বাবা, উপযুক্ত ছেলে,—উপায় তুমিই কর।"

সুরেন নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে কহিল, "আমি কি উপায় করবো, মা?"

মা বলিলেন, "কোন্নগরের মুখুয্যেদের সেই মেয়েটিকে বিয়ে কর। এখনি নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে।"

সুরেন বলিল, "কিন্তু মা, আমি ত বলেছি—"

পুত্রকে বাধা দিয়া জননী বলিলেন, "তুমি যা বলেছ, তা আমি শুনেছি। তুমি বলেছ, বিবাহপণ-নিবারণী সভার তুমি একজন মস্ত পাণ্ডা, তুমি পণ নিয়ে বিবাহ করলে সমাজে আর তুমি মুখ দেখাতে পারবে না। সে সবই আমি বুঝি। কিন্তু এদিকে যিনি তোমার জন্মদাতা, মহাগুরু—যিনি এত কষ্ট করে আপনি না খেয়ে তোমায় খাইয়ে, তোমায় এত বড়টা করে তুলেছেন, নিজের গায়ের রক্ত জল ক'রে তোমায় মানুষ করছেন, তিনি যে দেনার দায়ে জেলে যান! উনি জেলে গেলে সমাজে কি তোমার মানসম্ভ্রম বাড়বে, বাবা?"

সুরেন কিয়ৎক্ষণ নতমস্তকে বসিয়া কি চিন্তা করিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "আর কি কোনও উপায় নেই, মা?"

মা বলিলেন, "আর কোনও উপায় নেই। কমলার বিয়ের পর আমার যে ক'খানা গহনা বাকী ছিল, সরলার বিয়ের সময় সে সবই গেছে, তা ত তুমি জান। হাতে এই যে দুগাছি রুলি দেখছ, এই সার। কোথাও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে যেতে হ'লে আমার যেন মাথা কাটা যায়—একজন উকীলের পরিবার, তা'র এই দুরবস্থা! কিন্তু সে কথা যাক। সম্বলের মধ্যে এই বাড়ীখানি। তা পাড়াগাঁয়ে এ পুরানো বাড়ী, এ বেচলে হাজার টাকা পাওয়া যায় ত ঢের। আর এই থালা, ঘটি-বাটি—লেপ কাঁথা বিছানা—এ সব বিক্রী করলেই বা আর কত হ'বে?" বলিতে বলিতে গৃহিণীর নেত্রযুগল সজল হইল, কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল।

সুরেন বলিল, "তা বলছিনে। আর কোথাও যদি ধার পাওয়া যায়—"

"কে আর ধার দেবে, বাবা? কি বিষয়-সম্পত্তি আছে যে, তাই দেখে ধার দেবে? —বিশেষ, মহাজন যে হবে, সে এটা জানতেই পারবে যে, আর এক মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়ে, ৪।৫ বছরের মধ্যে তা'র একটি পয়সাও শোধ করতে পারেনি; নালিশের ভয় দেখাচ্ছে ব'লে, তাদের দেবার জন্যেই এই টাকা ধার করা হচ্ছে।"

সুরেন নীরবে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা বলিলেন, "সুপুত্রের যা কর্ত্তব্য, তাই তুমি কর, বাবা। পিতাকে সত্য থেকে মুক্ত করবার জন্যে রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন, তুমি তোমার পিতাকে জেল থেকে মুক্ত করবার জন্যে বিয়ে করবে, এটা কি একটা বড় কথা হ'ল? মেয়েটি আমি দেখেছি; খাসা, ঘর আলোকরা মেয়ে। সদ্বংশ, সকল রকমেই উপযুক্ত কুটুম্ব। লোকে যেমনটি চায়, এও তেমনটি। আর অমত কোরো না বাবা, রাজি হও, এই বোশেখ মাস পড়তেই শুভ কার্য্যটি হয়ে যাক।"

একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া, "আচ্ছা মা, ভেবে চিন্তে দেখি" বলিয়া সুরেন উঠিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে, শ্যামাচরণবাবু অন্তঃপুরে আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বললে খোকা?"

পুত্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, গৃহিণী সে সমস্তই বিবৃত করিলেন। শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "বোধ হয় মন গলেছে; রাজি হ'বে! কি বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "মা সুবচনী, মা মঙ্গলচণ্ডী তাই করুন। আমি তোমাদের পুজো দেবো মা, ছেলেকে আমার সুমতি দাও।"

সন্ধ্যাবেলায় কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা কিছু বলেছে?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "না, এখনও কিছু বলেনি। কা'ল কলকাতায় ফেরবার আগে ব'লে যা'বে বোধ হয়।"

সোমবার প্রাতে গৃহিণী পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া, তাহার অনুসন্ধানে গিয়া, শয্যার উপর একখানি পত্র পাইলেন। কম্পিত হস্তে সেখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন—

মা,

আমি তোমার অধম সন্তান, তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। সারা দিন, সারা রাত্রি, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি; যে আদর্শকে আমি জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি তাহা হইতে কোনও মতেই বিচ্যুত হইতে পারিব না, প্রাণ গেলেও নহে। আমাকে তোমরা, পার ত ক্ষমা করিও। ভোরের ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। ইতি

প্রণত—শ্রীসুরেন।

পত্র পড়িয়া গৃহিণীর মাথা ঘুরিতে লাগিল। স্বামীকে গিয়া তিনি সে পত্র দেখাই-লেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, 'যাকগে—যা করলো ত'বয়েই গেল। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হ'বে। কিন্তু এবার টাকা নিতে এলে তা'কে ব'লে দিও, আর আমি তার খরচ যোগাতে পারবো না। খাইয়ে পরিয়ে তাকে এত বড়টা করলাম লেখাপড়া শেখালাম, এখন নিজের পথ সে নিজেই দেখুক।"

গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পর মাসে প্রথম শনিবারে সুরেন টাকা লইতে আসিল না, সুতরাং ও কথা তাহাকে বলাও হইল না। কলিকাতা হইতে পিতাকে সে চিঠি লিখিল—

বাবা,

আমি আপনার অকৃতজ্ঞ সন্তান, আপনার আদেশ আমি পালন করিতে না পারিয়া, কিরূপ মনোদুঃখে কাল কাটাইতেছি, তাহা আমার অন্তর্যামীই জানেন। অপর কথা, আপনার এরূপ অর্থসংকটের সময় আমার পড়ার খরচের জন্য আপনাকে বিব্রত করা আর আমার উচিত নহে। এ কয়দিন চেষ্টা করিয়া মার্চেন্ট আফিসে আমি একটি ৪০্ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি যোগাড় করিয়া লইয়াছি, তাহাতেই আমার খরচ চলিবে। আপনার ও জননীদেবীর পাদপদ্মে আমার শত শত প্রণাম। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কর্ত্তব্যপথে চিরদিন স্থির থাকিতে পারি। আমি আপনাদের ক্ষমার অযোগ্য, তা জানি,

তথাপি ক্ষমাপ্রার্থী

শ্রীসুরেন।

ইহার কয়েকদিন পরে শ্যামাচরণ আসিয়া স্ত্রীকে জানাইলেন, হংসরাজ সুন্দরমলের যিনি উকীল, তিনি তাঁহার মক্কেলগণকে বলিয়া কহিয়া স্তুতিমিনতি করিয়া, ঋণ পরি-শোধের সময়টা এক মাসের স্থানে ছয় মাস করিয়া লইয়াছেন।

গৃহিণী বলিলেন, "তা ত হ'ল! কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই বা চার হাজার টাকা আসবে কোথা থেকে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন "দেখি ভগবান কি করেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "কলিতে ভগবানের বিচারই যদি থাকবে, তা হ'লে আর ভাবনা কি?"

"দেখা যাক"—বলিয়া শ্যামাচরণবাবু চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ বন্ধু-সংবাদ

ভগবান বিচার করুন না করুন, প্রজাপতি কিন্তু একটা ভারি মজা করিলেন।

হালিসহর নিবাসী উমাচরণ চৌধুরী মহাশয় রাজপুতানার কোনও দেশীয় করদরাজ্যে উচ্চ বেতনে চীফ জাষ্টিস বা প্রধান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কয়েকদিন হইল,

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা অমলার বিবাহের জন্য ছুটি লইয়া তিনি সপরিবারে স্বগ্রামে আসিয়াছেন।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে উমাচরণ ওকালতী করিবার অভিপ্রায়ে রাজপুতানায় গমন করেন; মাঝে একবার মাত্র দেশে আসিয়াছিলেন, সেও ১০।১২ বৎসরের কথা।

এই উমাচরণ ছিলেন শ্যামাচরণের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। নামসাম্যের জন্য বাল্যকালেই ইঁহারা "বন্ধু" পাতাইয়াছিলেন। এখন উভয়েরই চুল পাকিলেও, পরস্পর সেই "বন্ধু" সম্ভাষণই চলিয়া থাকে।

উমাচরণ ক্রমে শ্যামাচরণের সাংসারিক ব্যাপারের সমস্ত কথাই শুনিলেন। শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন; বন্ধুর সঙ্গে গোপনে কি একটা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সুরেনকে পূর্ব্বে তিনি ১০।১১ বৎসরের বালকটি মাত্র দেখিয়াছিলেন। একদিন কলিকাতায় যাইয়া, নিজে অপ্রকাশ থাকিয়া সুরেনকে দেখিয়া আসিলেন। তাহার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে গোপনে একটু অনুসন্ধানও করিলেন। বুঝিলেন, সে যুবকের চরিত্র অনিন্দনীয়।

ফিরিয়া আসিয়া উমাচরণ বলিলেন, "বন্ধু, তোমার ছেলেটিকে দেখে এলাম। আমার ত বেশ পছন্দই হয়েছে। আমার অমলাকে তা হ'লে তুমি নাও—সে তোমার ছেলের অনুপযুক্ত হবে না।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "তা হলে, সেই পরামর্শই রইল ত? ছেলের যা কোট, বিয়ের সময় শুধু শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে, একটি হত্তুকী দিয়ে তুমি কন্যাদান করবে; তা'র পরদিন চুপি চুপি এসে আমি টাকাটা নিয়ে যা'ব। দেনাটাও ফেলে দেবো, বউমার জন্যে গয়না-গাঁটিও গড়াতে দেবো।"

উমাচরণ কিছুক্ষণ ভাবিলেন; তাহার পর বলিলেন, "সে যেন হ'ল, কিন্তু তোমার যে দেনাশোধ হয়ে গেল, তুমি যে পুত্রবধূর অলঙ্কার গড়াচ্ছ, এ সব কা'র টাকাতে, সে কথা জানতে কি খোকার বাকী থাকবে? তখন যদি সে বেঁকে বসে? যদি বলে আমায় ঠকিয়ে বিবাহ দেওয়া হয়েছে, ও স্ত্রীকে আমি গ্রহণ করবো না?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "না না—তা কি আর সে করতে পারে? একবার বিয়ে হয়ে গেলে, তা'র পর বিবাহিতা স্ত্রীকে কি সে ত্যাগ করতে পারে? লেখাপড়া শিখেছে, একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান ত আছে।"

উমাচরণ বলিলেন, "কি জানি ভাই, আজকালকার ছেলেদের কর্ত্তব্যজ্ঞান যে ভীষণ! কোন্‌টা যে তাদের কর্ত্তব্য আর কোন্‌টা যে নয়, তা আমরা, সেকেলে মানুষ, বুঝিও না ছাই! কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাপকে যে জেলে পাঠাতে প্রস্তুত, সে স্ত্রীকে ত্যাগ করবে, তা আর আশ্চর্য্য কি?"

এই সময় ডাকওয়ালা একখানা চিঠি দিয়া গেল। সুরেনের চিঠি। সুরেন লিখিয়াছে, আগামী ১২ই এপ্রিল তাহাদের ল' কলেজ গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইবে। যে ফারমে সে চাকরী করে, তাঁহারা দার্জ্জিলিঙে তাঁহাদের একটি ব্রাঞ্চ খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। সেই কারণে ছোটসাহেবের সঙ্গে তাহাকেও দার্জ্জিলিঙে গিয়া মাসখানেক থাকিতে হইবে। মাসখানেক সে এখন বাড়ী আসিতে পারিবে না, ইত্যাদি—পত্রখানি পড়িয়া, শ্যামাচরণ সেখানি বন্ধুর হাতে দিলেন।

পত্র পড়িয়া, উমাচরণ বলিলেন, "ভালই হ'ল!"

শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাল হ'ল?"

"দাঁড়াও, একটু ভেবে চিন্তে দেখি, তার পর তোমায় বলবো এখন।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ কয়েকখানি পত্রাংশ

(১)

দার্জ্জিলিং
১০ই বৈশাখ

বন্ধুবরেষু,

আমরা গতকল্য নিরাপদে দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়াছি। উপস্থিত স্যানিটোরিয়মে আসিয়া উঠিয়াছি, ২।১ দিনের মধ্যেই একটি বাড়ী লইব। সুরেন বাবাজীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় এখনও পাই নাই। যেমন যেমন হয়, পরে তোমায় জানাইব। বউ-ঠাকুরাণীকে আমার নমস্কার এবং কমলা মা'কে স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবে। ইতি

তোমার বন্ধু উমাচরণ

(২)

দার্জ্জিলিং
১৩ই বৈশাখ

বন্ধু,

গতকল্য বিকালে মালে বেড়াইতে বেড়াইতে সুরেন বাবাজীকে দেখিতে পাইলাম। পরিচয় লইয়া, বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলাম, "অ্যাঁ, তুমি হালিসহরের শ্যামাচরণের ছেলে? আমারও বাড়ী যে হালিসহর, আর তোমার বাবা যে আমার বাল্যবন্ধু!"—তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আনিলাম। যাহা গোপন করা আবশ্যক এবং যাহা প্রকাশ করা চলিবে, সে সম্বন্ধে গিন্নীকে সব শিখাইয়া রাখিয়াছিলাম। রাত্রিতে তিনি তাহাকে আহারের জন্য জিদ করিলে সুরেন সম্মত হইল। অমলার সঙ্গেও তাহার আলাপ করাইয়া দিয়াছি। অমলা কাল গান শুনাইয়াছে—গান শুনিয়া সুরেন খুব খুসী হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা গেল। আগামী কল্য বিকালে তাহাকে চা-পানের নিমন্ত্রণ করিয়াছি এবং বলিয়াছি, চা-পানের পর সকলে একত্রে বেড়াইতে যাওয়া যাইবে।

(৩)

দার্জ্জিলিং
১লা জ্যৈষ্ঠ

বন্ধু,

সুরেন প্রায় প্রতিদিনই বিকালে এখানে আসিয়া চা খায়, এবং সান্ধ্যভোজনও মাঝে মাঝে এখানে সম্পন্ন করে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে তোমায় জানাইয়াছি। সুরেন যতক্ষণ না আইসে, অমলা বেটী ততক্ষণ পথপানে চাহিয়া থাকে; অথচ এমন ভাবটা দেখায়, যেন তাহার মনে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। তোমার ছেলেটিও, ভাই, বড় কম যান না। অমলা যতক্ষণ ঘরে না থাকে, ততক্ষণ সে যেন ছট্‌ফট্‌ করে। মধ্যে একদিন আমাদের শরীরটা ভাল নয় বলিয়া, সুরেনের জিম্মাতে অমলাকে বেড়াইতে পাঠাইয়াছিলাম। দু'জনে একলা বেড়াইতে যাইবে শুনিয়া, মনের আনন্দ গোপনের জন্য দু'জনেরই সেই "অমানুষিক" চেষ্টার দৃশ্যটা, যদি ভাই দেখিতে! উহারা মনে করে, আমরা বুড়াবুড়ী কিছুই বোধ হয় বুঝিতে পারি না, সন্দেহও করি না। দু'জনে বাহির হইয়া গেলে, বুড়াবুড়ী আমরা ত হাসিয়াই আকুল। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। কয়েক দিন হইল, আমরা বার্চ্চ হিলে বেড়াইতে গিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়া নিজেরা বাড়ী ফিরিয়া আসি। ঘণ্টাখানেক পরে উহারা ফিরিল। তখন নিজেদের মুখ হইতে হাসি-তামাসার ভাবটা মুছিয়া ফেলিয়া, দুশ্চিন্তার ভাবটা আনয়ন করা আমাদের পক্ষেও বিশেষ আয়াস সাধ্য হইয়াছিল।

(৪)

দার্জিলিং
১২ই জ্যৈষ্ঠ

ভাই বন্ধু,

গত কল্য সুরেন আমার নিকটে আসিয়া অমলার হস্ত প্রার্থনা করিয়াছে। আমি বলিলাম, "বেশ ত, তা হ'লে তোমার বাপকে আমি চিঠি লিখি!" সে বলিল, "বাবাকে চিঠি লিখলে তিনি এখনই আপনার কাছে অনেক টাকা চেয়ে বসবেন।" আমি বলিলাম, "তাতে আমি পিছপাও নই। বিনা টাকায় আজকালকার বাজারে কা'র আর মেয়ের বিয়ে হয় বল?" সে বলিল, "বাবা যদি টাকা নেন, তা'হলে কিন্তু আমি বিবাহ করতে পারবো না। আপনি অমলাকে শুধু শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে, একটি হর্তুকি পণ দিয়ে যদি দান করেন, তবেই আমি বিবাহ করতে পারি।" শুনিয়া আমি কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিলাম, "কি! এত বড় কথা তুমি বল আমায়? শুধু শাঁখা-শাড়ী পরিয়ে হর্তুকি দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করবো? কেন আমায় কি তুমি একটা যে-সে লোক পেয়েছ? তোমার চোখে আমি একটা পথের ভিখারী বুঝি, না?"

ধমক খাইয়া ছেলেটা মুষড়াইয়া গেল; আমতা আমতা করিয়া বলিল, "না না, সে ভাবে আমি বলিনি, আপনি রাগ করছেন কেন?"—তারপর সে তা'র পণনিবারিণী সভার কথা, আরও কত কি সব মাথামুণ্ড বলিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "ওঃ, কলকাতার সেই পণ-নিবারিণী সভা? প্রোফেসর অমূল্য বোস যা'র সভাপতি?" খোকা বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" আমি বলিলাম, "সেই লোকই ত সম্প্রতি বিবাহ ক'রে শ্বশুরের টাকায় বিলাত গেছে। খবরের কাগজওয়ালারা তাই নিয়ে তাকে কি রকম গালাগালিটা দিয়েছে দেখ না!"—বলিয়া সেইদিন প্রাতে প্রাপ্ত একখানা সংবাদপত্র তাহাকে দেখাইলাম। পড়িয়া সুরেন ভারী দমিয়া গেল। বলিল, "তা হলেই বুঝুন না? আমি সেই সভার সম্পাদক। আমিও যদি ঐ কার্য্য করি, আমাকেও ত এমনি ক'রে গালাগালি খেতে হ'বে!" এই কথা শুনিয়া যেন আমি একটু ঠাণ্ডা হইয়াছি, এইরূপ অভিনয় করিয়া বলিলাম, "কিন্তু বাপু, তুমি হাজার রাজি থাকলেও তোমার বাপের অমতে তোমাকে আমি জামাই কি করে করি বল? তোমার বাবাকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি ত! তিনি ভারী একরোখা মানুষ। শেষ-কালে বলে বসবেন, ও বউ আমি গ্রহণ করবো না। তার চেয়ে, বাপু, তোমার বাবাকে চিঠি পত্র লিখে সব ঠিকঠাক করি, তিনি অনুমতি দিলেই শুভ কার্য্যটি হতে পারবে।" খোকা বলিল, "সে আশা বৃথা। তিনি বড় অর্থসঙ্কটে পড়ে আছেন। বিনা টাকায় কখনই তিনি সম্মতি দেবেন না।" আমি বলিলাম, "তা হলে বাপু, এ কাজের মধ্যে আমি নেই। বাপ-মাকে লুকিয়ে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে, সে হতেই পারে না, অসম্ভব। আমার মেয়ের অন্যত্র সম্বন্ধ করতে হবে। তুমি বাপু, এ বাড়ীতে আর এস না। অমলা ত এখন নিতান্ত ছোট্টটি নেই—তোমাদের দেখা-শুনা হলে মিছামিছি মন খারাপ হবে বই ত নয়।" এই কথা শুনিয়া আমাকে একটি প্রণাম করিয়া সুরেন প্রস্থান করিল।

রাত্রিতে গিন্নির কাছে শুনিলাম, মেয়েটা কোথায় দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি মেয়ের খোঁজে যাইয়া দেখেন, সে বিছানায় উবুড় হইয়া পড়িয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। তা'র মা'র কাছে সে আর কোনও কথা গোপন করিতে পারে নাই; অন্যত্র তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিলে সে আফিম খাইবে। গিন্নি চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "মেয়েটার কষ্ট দেখে মনে হ'তে লাগলো, সব কথা তা'কে খুলেই বলি। কিন্তু তোমার নিষেধ। সেই জন্যে তার কাছে কিছু ভাঙ্গতে পারলাম না।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "কালকের দিনটে চুপ ক'রে থাক। পরশু চিঠি লিখে সুরেনকে ডেকে

পাঠিও। অমলাকে তুমি বলে রেখ, সুরেন আজ আসবে, বাপ-মা'র অনুমতি নেওয়া সম্বন্ধে তাকে রাজি করা, অমলারই ভার। এ বিষয়ে সুরেন রাজি হ'লে, আর কোনও গোল নেই, এই মাসেই বিয়ে হ'তে পারে। সুরেন এলে পরে, অমলার কাছে তাকে রেখে তুমি চ'লে এস। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যা'বে এখন।"

পরামর্শমতই কার্য্য হইয়াছিল। যাইবার সময় সুরেন আমায় বলিয়া গিয়াছে, আজই সে তোমাকে চিঠি লিখিবে।

আচ্ছা, ভাই, দিনে দিনে হইল কি বল ত? আমরাও ত এক দিন বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু কই, তাহার মধ্যে এমন সব মজার ব্যাপারের বাষ্পমাত্রও ত ছিল না। সেকালে জন্মিয়া আমরা কি ভুলই করিয়াছি, হায় হায়! বড়ই ঠকিয়া গিয়াছি। ধুত্তোর সে কাল!

(৫)

দার্জ্জিলিং
১২ই জ্যৈষ্ঠ

পরম-পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী দেবী
শ্রীচরণকমলেষু।

মা!

দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়া, পৌঁছান সংবাদটি মাত্র তোমায় দিয়াছিলাম। তা'র পর নানা কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত তোমাদের পত্র লিখিতে পারি নাই, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

এখানে পৌঁছিবার অল্পদিন পরেই বাবার বাল্যবন্ধু হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ চৌধুরী মহাশয়েব সহিত আমার আলাপ হয়। ইঁহার নাম আমি তোমাদের নিকট শুনিয়াছিলাম কিন্তু পূর্ব্বে ইঁহাদিগকে দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। এবার ছুটীতে প্রথম হালিসহরে গেলে তোমাদের সঙ্গে তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল শুনিলাম। তাঁহার কন্যা অমলাকে অবশ্যই তোমরা দেখিয়াছ; তাহার সহিত তিনি আমার বিবাহ দিতে চাহেন, টাকাকড়িও যথেষ্ট দিতে প্রস্তুত আছেন, এরূপ আভাস পাইয়াছি।

পণ লইয়া বিবাহ কবার আমি কিরূপ বিরোধী, তাহা ত তোমরা ভালরূপই জান। আমি পণনিবারিণী সভার সেক্রেটারী হইয়া ঐ কার্য্য করিলে দেশের চক্ষুতে আমি যে অত্যন্ত হেয় হইয়া পড়িব, তাহাতেও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজে আমাকে নানারূপ শ্লেষ, বিদ্রূপ ও গালাগালি করিবে। কিন্তু টাকা না পাইলে বাবা জেলে যান! সেটা ঘটিতে দেওয়া আমার পক্ষে ঘোর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হয়, তাহাতেও সন্দেহ পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিয়াছি, আমার পরমগুরু পিতৃদেবের মঙ্গলার্থে আমার আদর্শ, আমার প্রতিজ্ঞা, আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই বলি দিয়া, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব।

অতএব, মা, বাবাকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাইয়া, তাঁহাকে বলিও যে, আমি আর তাঁহার অবাধ্য সন্তান নহি। তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই আমি নতমস্তকে পালন করিতে প্রস্তুত আছি। তবে, অন্য কোথাও নহে—এই চৌধুরী মহাশয়ের সহিতই কথাবার্ত্তা হয়, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

আমার এখানকার কার্য্য এক সপ্তাহ পরে শেষ হইবে। কলেজ খুলিতে এখনও বিলম্ব আছে। সাহেবকে বলিয়াছি, তিনি আমায় তিন সপ্তাহের ছুটী দিবেন. ঐ তিন সপ্তাহ বাড়ী গিয়া তোমাদের চরণসেবায় অতিবাহিত করিব, স্থির করিয়াছি।

সেবক
শ্রীসুরেন।

পুঃ—চৌধুরী মহাশয়কে পত্রখানি শীঘ্রই লেখা প্রয়োজন। কারণ শ্রাবণের মাঝামাঝি তাঁহার ছুটী ফুরাইবে, তিনি আবার রাজপুতানায় চলিয়া যাইবেন।"

॥ উপসংহার ॥

মহাসমারোহে, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

পরবৎসর সুরেন ওকালাতী পাশ করিয়া, সস্ত্রীক রাজপুতানায় চলিয়া গেল। সে-খানেই শ্বশুরের আদালতে সে এখন ওকালতী করে। তাহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মিয়াছে। উমাচুরণবাবুরও পেন্সন লইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। পেন্সন লইবার কালে জামাতাকে তিনি একটি ছোটখাট জজীয়তী পদে বাহাল করিয়া আসিতে পারিবেন, মহারাজ বাহাদুর এরূপ আভাসও দিয়াছেন।

চিরায়ুষ্মতী

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

বরকন্যার মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ' জিনিসটার অস্তিত্ব সেকালে আমাদের দেশে আদৌ ছিল না, বঙ্কিমবাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" বাহির হওয়ার পর হইতেই বাঙ্গালী তরুণ তরুণী সমাজে উহার সুত্রপাত হইয়াছে—ইহা মনে করা অত্যন্ত ভুল। কারণ যে সময়ের ইতি-বৃত্ত নিম্নে আমরা প্রকাশ করিতেছি, তাহা সিপাহী বিদ্রোহের ৩।৪ বৎসর পরের এবং দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মালীপুর গ্রামখানিতে বহু সদ্ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার কয়েকঘর আছেন, যাঁহারা নিজেদের 'স্বভাব কুলীন' বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন।

মালীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরবিলাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি স্বভাব কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বিঘা কয়েক মাত্র ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল,—তা ছাড়া বিঘা দুই জমার জমিও রাখিতেন। তখনকার দিনের মোটা ভাত কাপড়ের পক্ষেও ইহা যথেষ্ট ছিল না। স্বচ্ছন্দে ও সুশৃঙ্খলে তাঁহার সংসার চলিত না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স এ সময় চল্লিশ পার হইয়াছিল। নিজ পিতার জীবিত-কালে, তাঁহার আদেশে কুলীনের কুলরক্ষার জন্য একে একে তাঁহাকে তিন 'সংসার' করিতে হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর ইচ্ছা করিলে তিনি 'সংসার'-সংখ্যা আরও বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এই তিন সংসারের মধ্যে মধ্যমা রাইমণি অকালে পরলোক গমন করেন ; কনিষ্ঠা ক্ষীরোদাসুন্দরী ধনীকন্যা, তিনি পিতৃ-গৃহের ক্ষীর সর ছাড়িয়া গরীব স্বামীর মোটা ভাত পছন্দ করিতেন না বলিয়া, জ্যেষ্ঠা সারদাসুন্দরীই আসিয়া শ্বশুরালয়ে জাঁকিয়া বসেন এবং কালক্রমে তিনিই গৃহিণীর পদবীলাভ করিয়াছেন।

সারদাসুন্দরীর গর্ভে হরবিলাসের তিনটি সন্তান জন্মিয়াছিল ; তাহার মধ্যে বড়টি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। দ্বিতীয়টি কন্যা—নাম রাখিয়াছিলেন প্রভাবতী, তাহার বয়স এখন বারো। কনিষ্ঠ পুত্রটি এ সময়ে তিন বৎসরের শিশু মাত্র।

প্রভার আজিও বিবাহ হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে কুলীনগৃহে বড় বড় মেয়েরাও অবিবাহিত

থাকিত ; কারণ স্বভাব বা অন্ততঃ 'স্বকৃতভঙ্গ' কুলীনের পুত্র ভিন্ন, অন্য পাত্রে কন্যা-দান তাঁহারা অত্যন্ত অপমানজনক মনে করিতেন।

এই সময়ে সহসা হরবিলাসের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল। সংবাদ আসিল, আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনায়, তাঁহার হুগলি জেলার রাজগ্রাম নিবাসী মাতুল ও মাতুলের একমাত্র পুত্র গঙ্গায় নৌকাডুবিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন হরবিলাস ব্যতীত আর কোনও ওয়ারিশান নাই। ইহা শুনিয়া হরবিলাস অগোণে মাতুলালয় যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখি-লেন, বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতুলানী ভিন্ন আর কেহ নাই। বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা একজন সম্পন্ন গৃহস্থের উপযোগী। এই সম্পত্তি লাভে নিত্য অভাব অনটনের হাত হইতে চিরজীবনের জন্য নিস্কৃতি পাওয়া যাইবে। দেশে ফিরিয়া আসিয়া, নিজ বাস্তুভিটা ও জমিজমা যাহা ছিল বিক্রয় করিয়া, দেনাশোধ করিয়া গ্রামের বাস উঠাইয়া, মাঘ মাসে হর-বিলাস মাতুলালয়ে গিয়া স্থায়িভাবে বাস আরম্ভ করিলেন।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

রাজগ্রামে আসিয়া হরবিলাস বিষয় সম্পত্তি দখল ও তাহার তত্ত্বাবধানে মন দিলেন। সারদাসুন্দরী তাঁহার নূতন সংসার গোছাইয়া লইতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনীদের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল, কিন্তু একটা বিষয়ে সারদাসুন্দরী বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাঙ্গাল দেশের ভাষা শুনিয়া প্রতিবেশিনীরা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে, কেহ কেহ বা প্রকাশ্যভাবে একটু আধটু ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করে—ইহাতে সারদাসুন্দরী মনে মনে চটিয়া যান। কেবল পাড়ার হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী এই পর্য্যায়ভুক্ত নহেন; ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় সারদাসুন্দরী বেশ আনন্দ পান। ফলে, অল্পকাল মধ্যেই উভয় পরিবারে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইল। হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সকল বিষয়ে হরবিলাসের পরামর্শদাতা ও উপকারী বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন। মাঝে মাঝে পরস্পরের মধ্যে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণও চলিতে লাগিল। 'হরিচরণকে হরবিলাস দাদা বলিয়া ডাকেন।

হরিচরণের দুইটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নীলমাধব—তাহার বয়স তখন ১৭।১৮ বৎসর। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া, ইংরাজি পড়িবার জন্য সে শ্রীরামপুর মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে, প্রত্যহ দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে যায়। কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়মাধব দশে পড়িয়াছে।

হরবিলাসের গৃহে একটি বড় ঘরের দুই দিকে দুইখানি তক্তপোষ পাতা। এক-খানিতে হরবিলাস এবং অপরখানিতে গৃহিণী পুত্রকন্যাদের লইয়া শয়ন করেন। হর-বিলাস এ গ্রামে আসিবার মাস দুই তিন পরে, একদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া প্রভাবতী শুনিল, তাহার পিতামাতা নিম্নস্বরে এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন:—

মাতা। হ্যাঁগা, প্রভার বিয়ের কথা ভাবছো না? মেয়ে যে বলতে নেই দেখতে দেখতে ডাগর হয়ে উঠলো।

পিতা। ভাববার সময় পাচ্ছি কই? বিষয় আশয়গুলো ভাল ক'রে দেখে শুনে নিতেই ত এ ক'মাস কাটলো। এইবার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখতে হবে বইকি।

মাতা। দেখ, আমার মনে একটা কথা উদয় হয়েছে, তুমি শুনলে কি বলবে জানিনে।

পিতা। কি কথা?

মাতা। আচ্ছা, চাটুয্যেদের ঐ নীলমাধব ছেলেটির সঙ্গে দিলে হয় না?

পিতা। কি সর্ব্বনাশ! ও ছেলে যে তিন পুরুষে!

মাতা। তা হলেই বা তিন পুরুষে; ওকে মেয়ে দিলে কুলমর্য্যাদায় তুমি একটু নেমে যাবে, এই না? ছেলেটি কিন্তু আমার ভারি পছন্দ হয়েছে তুমি যাই বল!

পিতা। নিজে স্বভাব কুলীন হয়ে শেষে তিন পুরুষে পাত্রকে মেয়ে দেবো?

মাতা। স্বভাব কুলীনের ছেলে এ সব দেশে ত বড় পাওয়া যায় না! তা হলে দেশ থেকে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এলে না কেন? দেখ পাঁচটা নয় সাতটা নয়, ঐ একটি মেয়ে। যে পাত্রে দিলে মেয়ে সুখে থাকবে, সেই পাত্রে দেওয়াই ভাল নয় কি? স্বভাব কুলীন পাত্র এনে বিয়ে দেবে, তার হয়ত আর পাঁচটা বিয়ে হয়ে আছে—আরও দশটা করবে,—স্বামীর ঘর কন্না যে কি বস্তু, তা মেয়ে জীবনে কখনও জানতে পারবে না! তার চেয়ে এই ভাল নয়? নীলু ছেলেটি দেখতে শুনতেও যেমন, স্বভাব চরিত্রও তেমনি—তার উপর ইংরেজী লেখাপড়া শিখছে, চাকরী করবে। আমি ত বলি বট্‌ঠাকুরের কাছে তুমি একবার কথাটা পেড়ে দেখ।

পিতা। নীলুই যে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবার পর আর পাঁচটা বিয়ে করবে না তা তুমি কি করে জানলে? ভঙ্গ হলেও, ও তিন পুরুষে বইত নয়!

মাতা। কি বল তুমি তার ঠিক নেই! ও যে ইংরেজী পড়ছে গো! যারা ইংরেজী পড়ে, তারা সাহেবের চাকরী করে,—তারা কি আর বিয়ের ব্যবসা করতে যায়?

পিতা। হ্যাঁ, আমিও ঐ রকম শুনেছি বটে, যারা ইংরেজী পড়ে তারা একটার বেশী বিয়ে করতে চায় না। আচ্ছা, তা কথাটা ভেবে চিন্তে দেখি। পিতৃকুলের মর্য্যাদাটা!—খোয়াব? এই একটা আপশোষ, নইলে আর কি।

মাতা। আপশোষই বা কিসের? যে দেশে যেমন চল্। আমাদের দেশে হলে, অবিশ্যি, এটা একটা নিন্দের কথা হত। কিন্তু এদেশে, এরা ত কই ততটা মনে করে না।

পিতা। তা ঠিক। ইংরেজ হল দেশের রাজা, কলকাতা হল তাদের রাজধানী। কলকাতার হাওয়া লেগে এদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে বইকি! নইলে ধর, আমাদের দেশে বামুন কায়েতের ঘরের বিধবারা কি পাণ খায়, না মাথায় চুল রাখে? এদেশে দেখ বিধবারা দিব্যি চুল রাখছে, খাসা পাণ খেয়ে ঠোঁটটি লাল করে বেড়াচ্ছে, তাতে ত কোনও নিন্দে নেই! যস্মিন দেশে যদাচারঃ—কথাটা তুমি নেহাৎ অন্যায় বলনি বটে। আচ্ছা তা হলে চাটুয্যে মশায়ের কাছে কাল কথাটা না হয় পেড়েই দেখি!

মাতা। তবে তোমায় খুলেই বলি। গিন্নীর কাছে ও কথা আমি বলেছিলাম। তিনি বট্‌ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমায় বলেছেন, "তা যদি হয় তা হলে ত খুবই ভাল। কিন্তু মুখুয্যে মশায় হলেন বাঙ্গাল দেশের একটা জাঁদরেল কুলীন, উনি কি আমার ছেলেকে মেয়ে দেবেন?" দিদি আমায় বললেন, "তুমি ভাই তোমার কর্ত্তাকে বলে কয়ে যদি রাজি করাতে পাব, তা হলে আমাদের কোনও আপত্তি হবে না।"

হরবিলাস বলিলেন, "তা হলে ভিতরে ভিতরে কাজটা তুমি অনেকখানি এগিয়ে রেখেছ বল? এতক্ষণ তবে আমার সঙ্গে নখ্‌রা করছিলে কেন?"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "ঐ ছেলেটাকেই জামাই করতে যদি তোমার এতই সাধ হয়ে থাকে, তবে তাই কর। মেয়ে আমার সুখে থাকলেই হল। না হয় তিন পুরুষ নেমেই গেলাম, তার আর কি করা যাবে! অনেক রাত্রি হল, এখন ঘুমোও।"

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

প্রভাবতী তার পিতামাতার কথোপকথন, অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে সমস্তটাই শুনিল। শুনিয়া সে মনে মনে বলিল, "কি মুস্কিল! ওদের নীলু হবে আমার বর? তার সামনে কত হেসেছি, কথা কয়েছি, বাচালতা করেছি, এখন আমি হব তার বউ? সে

বাড়ী ঢুকলে, ঘোমটা দিয়ে আমায় পালাতে হবে? কি কেলেঙ্কারী মা, কি কেলেঙ্কারী! প্রথম যখন আমরা এলাম, ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল, তখন মা আমায় বলেছিলেন, নীলুকে তুই দাদা বলবি। আমি বলেছিলাম, "কেন গা, পরের ছেলেকে আমি দাদা বলতে যাব কেন?" সে আমি পারবো না।" ভাগ্যিস দাদা বলিনি! ওমা. যাব কোথা? কি ঘেন্না মা, কি ঘেন্না! তা, এ'রা ত একরকম সব ঠিকঠাক ক'রেই ফেলেছেন দেখছি। আমাকে নীলুর পছন্দ হবে ত? সে যদি তার মা-বাপকে বলে, ও মেয়ে আমার পছন্দ নয়—ওকে আমি বিয়ে করতে চাইনে! তখন কি হবে? এক ছেলে সোমত্ত ছেলের কথা কি মা-বাপ ঠেলতে পারবেন? কিন্তু, পছন্দ বোধ হয় হবে তার আমাকে। হ্যাঁগা, আমি ত আর কালো কুচ্ছিৎ নই। ওর গায়ের রঙের চেয়ে আমার রঙ ত অনেক ফর্সা। তবে আমি লেখাপড়া জানিনে, মুখ্যু, এই যা বল। এদেশের মত, আমাদের দেশে মেয়েছেলের লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ ত এখনও হয়নি! হলে, এতদিন আমি বা কোন্ দু'চারখানা বই না পড়ে ফেলতাম। তার যদি সেই ইচ্ছেই হয়, বিয়ের পর আমায় শেখালেই পাববে—কে মানা করছে বাপু?"

'বরের' কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রভা ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া, স্বপ্ন দেখিল, বর যেন ঘোমটা খুলিবার জন্য তাহাকে কত সাধ্য-সাধনা করিতেছে—আর সে যেন বলিতেছে —"ও কি নীলু, ছি! কি ছেলেমানুষী করছ তুমি? কনে কউকে, বরের সাক্ষাতে কি ঘোমটা খুলতে আছে? দাঁড়াও আগে বড় হই, তারপর তুমি যা বলবে আমি তাই শুনবো!"

ঘুম ভাঙ্গিলে, এই স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া প্রভার বড়ই হাসি পাইল। ভাবিল, "স্বপ্নে বরকে বলেছি 'ছি নীলু!' বরকে কি মানুষ নাম করে ডাকে? আমি যেন কী!"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যথাসময়ে হরবিলাস কথা পাড়িলেন। তিনি আহ্লাদের সহিত সম্মতও হইয়াছেন, তবে এখন অকাল চলিতেছে, সেই বৈশাখের পূর্বে আর বিবাহের দিন নাই।

নীলুর সহিত প্রভার বিবাহ হইবে, একথা পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। প্রভা আর নীলুর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে না; এমন কি তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। হঠাৎ উভয়ে চোখোচোখী হইয়া গেলে, নীলু একটু মুচ্‌কে হাসে, প্রভা ব্যস্তভাবে সেখান হইতে পালাইয়া যায়।

বিবাহের এখনও ৭।৮ মাস বিলম্ব থাকিলেও, উভয় পরিবারে এখন হইতেই বেয়াই বেয়ান সম্বোধন প্রচলিত হইয়াছে। পূজার সময় প্রভার মা তাঁর হবু জামাইকে ধুতি চাদর ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়া তত্ত্ব করিলেন। পরদিন, ও-বাড়ী হইতে প্রভার জন্যও তত্ত্ব আসিল।

ক্রমে বিজয়ার দিন আসিল। সারাদিন প্রভার মনে এই কথাটাই তোলাপড়া করিতে লাগিল—"সন্ধ্যার পর যখন ও-বাড়ীতে প্রণাম করতে যাব, আর সকলকে ত প্রণাম করব, তাকেও প্রণাম করব কি না? যদি তাকে প্রণাম করি, তবে কি সেটা আমার বেহায়াপনা হবে? যদি না করি, সেটাই বা কেমন দেখায়?" এক একবার মনে হইতে লাগিল, যাই মাকে কথাটা না হয় জিজ্ঞাসা করিয়াই দেখি, তিনি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিবেন সেইরূপই করা যাইবে। কিন্তু লজ্জায় বাধিল; মাকে প্রভা এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর মার সঙ্গে প্রভা ও-বাড়ীতে প্রণাম করিতে গেল। নীলু বাড়ী নাই, উভয়-সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তথায় বিজয়াকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল— "আজকের দিনে তাঁকে একটি প্রণাম করা হল না!" বাড়ী ফিরিয়াও মাঝে মাঝে কথাটা

মনে পড়াতে তাহার বুকের ভিতরটা খচখচ করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সারদাসুন্দরী পাড়ার অপর কয়েকজন 'গিন্নীবান্নির' সহিত ও-পাড়ার পুরোহিত ঠাকুরের বাড়ী বিজয়া করিতে গেলেন। পরিষ্কার চাঁদনি রাত্রি। প্রভার পিতাও কাঁধে চাদর ফেলিয়া ছড়িহস্তে বাহির হইলেন। বাড়ীতে রহিল কেবল প্রভা, আর তার মামী ঠাকুরাণী।

প্রভা মামীর ঘরে বসিয়া বসিয়া তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছিল, কি একটা প্রয়োজনে নিজেদের শয়ন-ঘরে আসিল। তাহা সারিয়া, মামীমার ঘরে যাইবার জন্য যেই দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়াছে, অমনি জ্যোৎস্নালোকে দেখিল—সম্মুখে তার বর! দেখিয়াই সে ব্যস্তভাবে মাথায় ঘোমটা দিতে হাত উঠাইল, কিন্তু দুষ্ট নীলু খপ্ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আর ঘোমটা দেয় না! এখানে কে আছে? আগে আমার সঙ্গে কত হাসতে, গল্প করতে, সে সব ত বন্ধই করেছ। এখানী এমনই ডুমুরের ফুল হয়ে দাঁড়িয়েছ যে, মুখখানি দিনান্তে একবার দেখতেও পাইনে। আজ বছরকার দিনেও একটিবার দেখবো না?"

প্রভা লজ্জায় রাঙা হইয়া চুপি চুপি বলিল, "হাত ছাড় না, ও কি?"

নীলুও নিম্ন স্বরেই বলিল, "ছাড়বই বা কেন? যার যা জিনিষ, সে কি তা ছাড়ে?" বলিয়া প্রভার অপর হস্তটিও ধারণ করিয়া প্রভাকে নিজের দিকে টানিল।

প্রভা যেন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িল, তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল। অশিষ্ট বালক, তাহাকে নিজ বক্ষে জড়াইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিল!

প্রভার তখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে গলায় আঁচল দিয়া, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, নীলমাধবকে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইল।

নীলু তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বেঁচে থাক, সুখে থাক। তোমার মা বাপকে প্রণাম করতে এসেছিলাম, কিন্তু তাঁরা ত বাড়ী নেই, ফিরে এলে তাঁদের বোলো যে, আমি এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে তবু বিজয়টা হল। কিন্তু দেখ প্রভা মা দুর্গা যদি দয়া করেন, আসছে বছর তোমায় আমায় বিজয়া কিন্তু এ রকম উঠানে দাঁড়িয়ে আর নয়! কি বল?" মৃদু হাসিয়া আদরে প্রভার চিবুক স্পর্শ করিল।

তারপর বলিল, "পোড়া বোশেখ মাস যে কবে আসবে তা জানিনে! একটা কথা বলে যাই—মাঝে মাঝে দেখা দিতে কৃপণতা কোর না। যেদিন তোমার মুখখানি একটি-বারও না দেখি, সে দিনটা যেন অন্ধকার বলে মনে হয়। আচ্ছা এখন তবে আসি!" বলিয়া নীলু চলিয়া গেল।

মামীমা তাঁহার অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্যটি আগাগোড়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কথোপকথন শুনিতে পান নাই। আপন মনে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ওমা! এ যে দেখচি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! এখনও ত বাপু বিয়ে হয়নি—এরই মধ্যে এত! আর ছুঁড়িটাও ত বেহায়া কম নয়। কালে কালে এ সব হল কি? দুর্গা দুর্গা।"

সারদাসুন্দরী বাড়ী ফিরিলে, মামীমা গোপনে তাঁহার নিকট এ ব্যাপারটি বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া, সারদাসুন্দরী হাসিলেন। রাত্রে ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—"ঐ স্বামী নিয়ে তুমি চিরসুখী হও মা!"

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

এবার শীতটা খুব প্রবল ভাবেই পড়িয়াছে। অগ্রহায়ণের হিম লাগিয়া অনেকের সর্দ্দি কাসি হইতে লাগিল, এবং কেহ কেহ জ্বরেও পড়িতে লাগিল; কিন্তু সে ম্যালেরিয়া নহে, বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার নামও তখন কেহ শোনে নাই।

একদিন সংবাদ আসিল, নীলুর জ্বর হইয়াছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি কাসি খুব প্রবল। প্রথমে নীলুর পিতা মাতা এটাকে বিশেষ কিছু একটা বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু তিন দিন জ্বর ছাড়িল না দেখিয়া ভীত হইয়া চতুর্থ দিনে কবিরাজ ডাকিলেন।

প্রবীণ কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একটা সাংঘাতিক সংবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন, "জ্বর আর দিন দুই তিনে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি; কিন্তু ছেলেটির দেহে যক্ষ্মাকাসের সূচনা হয়েছে।"

কি সর্ব্বনাশ! শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে, গৃহিণীকেও তিনি এ বিষয় অবগত করাইলেন। প্রভার পিতামাতাও শুনিলেন।

সকলেই মহা চিন্তিতভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

জ্বর তখনকার মত বন্ধ হইল বটে; কিন্তু কাসটুকু থাকিয়া গেল। মাঝে মাঝে বাড়ে, মাঝে মাঝে কমে। যখন বাড়ে তখন আবার জ্বর হয়; কমিলে জ্বর ছাড়িয়া যায়। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িল।

একদিন রোগের চিকিৎসান্তে কবিরাজ মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কর্ত্তা মহাশয়কে বলিলেন, "চাটুয্যে, তুমি হরবিলাসের মেয়েটির সঙ্গে নীলু বাবাজীর বিয়ে দেওয়া স্থির করেছিলে নয়?"

"হ্যাঁ, আসছে বৈশাখ মাসে ত বিয়ে হবার কথা আছে।"

"অমন কাজটি কোরো না। নীলুর এ রোগ, নির্দ্দোষ হয়ে কোনও দিন সেরে যাবে, এ আশা নেই। তবে খুব সাবধানে থাকলে, কিছুদিন ছেলে বাঁচতে পারে। ওর বিবাহ দেওয়াব সঙ্কল্প মন থেকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও। আমার কথার মর্ম্মটা তুমি বুঝতে পেরেছ?"

কর্ত্তা দুঃখিত ভাবে বলিলেন "হ্যাঁ তা বুঝেছি।"

ক্রমে হরবিলাসও একথা শুনিলেন। নীলুর আশা ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তা গিন্নীতে পরামর্শ করিয়া, মেয়ের জন্য অন্য পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। চৈত্র মাসে বকুল-গ্রামে একটি পাত্র স্থির হইল। কথাবার্ত্তাও ঠিক হইয়া গেল বৈশাখের মাঝামাঝি বিবাহ হইবে।

বৈশাখের আরম্ভেই নীলু আবার জ্বরে পড়িল। কবিরাজ মহাশয়ের যথাসাধ্য চিকিৎসাতেও এবার রোগের কোনও উপশম দেখা গেল না। কবিরাজ মহাশয় গোপনে চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন, "এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার।" রোগ, বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে।

১০ই বৈশাখ, কবিরাজ মহাশয়ের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে হরবিলাস তাঁহার রোগীর অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "শিবের অসাধ্য। আর বড় জোর এক সপ্তাহ মেয়াদ।"

১৭ই বৈশাখ প্রভার বিবাহেব দিনস্থির হইয়াছিল। হরবিলাস আসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিলেন—বিবাহের দিন মাসখানেক পিছাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ সেই সময় যদি ও-বাড়ীতে কিছু হয়,—এ-বাড়ীতে শানাই বাজাইয়া বিবাহের উৎসব বড়ই খারাপ দেখাইবে।

প্রভা, একথা শুনিয়া, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মাকে গিয়া বলিল, "মা, আমার বিয়ের দিন পিছিয়ে দেবার দরকার নেই। ঐ তারিখেই আমার বিয়ে দাও। আর, বকুলগ্রামে নয়—ঐ পাত্রের সঙ্গেই।"

মা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিয়া উঠিলেন, "সে কি কথা পাগলী? সে যে মরতে বসেছে!"

প্রভা বলিল, "তা হোক!"

"তা হোক কি না? বিয়ের পর তেরাত্তির পোয়াতে না পোয়াতেই যে বিধবা হবি!"

প্রভা বলিল, "তাই যদি আমার কপালে থাকে মা, তবে হব। অন্য কারুকে বিয়ে করার চেয়ে, আমি তার বিধবা হয়ে থাকবো সেও আমার ভাল।"

"সে কি? এমন সৃষ্টিছাড়া কথা ত কখনও শুনিও নি বাছা!"

প্রভা বলিল, "বিধবা হওয়াই যদি আমার অদৃষ্টে থাকে মা, তবে যেখানেই তোমরা আমায় বিয়ে দাও না কেন, অদৃষ্ট কি খণ্ডাবে?"

মা বলিলেন, "তা নয় বটে। তবে কেউ দশ বছর কেউ বিশ বছর সধবা থেকে, ছেলেপিলের মা হয়ে সংসার-ধর্ম্ম ক'রে বিধবা হয়, তুই যে সদ্য সদ্যই হবি।"

"হই হব মা। তুমি যদি ওর সংগে আমার বিয়ে না দাও তা হলে এ প্রাণ আমি রাখবো না।"

মা বলিলেন, "কার কপালে কি আছে তা কেউ বলতে পারে না। ও ছেলে যদি বাঁচেও, তা হলে বিয়ে দিতে কবিরাজ মানা করেছে, শুনিসনি?"

প্রভা বলিল, "জানি, সবই আমি শুনেছি, বুঝেছিও—তিনি ত বলেন নি যে বিয়ের মন্ত্র পড়লেই তার মৃত্যু হবে।"

মা বলিলেন, "তা নয় বটে। তা হলে, জীবনে তোর ছেলেপুলে আর হবে না।"

প্রভা বলিল, "তা, না হোক।"

মা কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, 'আচ্ছা কর্ত্তা কি বলেন দেখি।"

প্রভা বলিল, "বলাবলি নয় মা। আমি আজ থেকে উপবাস সুরু করলাম। একদিন—দুদিন—তিনদিন—উপবাসেও মানুষ মরে না। বেশী দিন হলে মরে। মা, তুমি সতী-লক্ষ্মী—তোমার পা ছুঁয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা করলাম, ওর সংগে বিয়ে হবার দিন ভোর-বেলা আইবুড় ভাত খাব—তার আগে আমি জল-গ্রহণ করবো না।"—বলিয়া প্রভা হাঁটু গাড়িয়া জননীর পদযুগল স্পর্শ করিল।

সারদাসুন্দরী, স্বামীকে গিয়া সকল কথা বলিলেন।

হরবিলাস মেয়েকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, নীলু ভাল হয়ে উঠুক। ওরই সংগে বিয়ে দিয়ে দেবো—তুই এখন জল খা।"

প্রভা পিতার পা ধরিয়া বলিল, "আমার প্রতিজ্ঞা ভংগ করাবেন না বাবা!"

হরবিলাস অবশেষে হতাশ হইয়া চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন। শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহা বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "এ যে প্রায় সত্যযুগের কথার মত শোনাচ্ছে হে! কে এরা? আর জন্মের স্বামী স্ত্রী নাকি?"

হরবিলাস বলিলেন, "ঈশ্বর জানেন!"

বৈশাখ মাস ভরাই প্রায় বিবাহের দিন ছিল, পরদিন বেশ প্রশস্তই ছিল। সমারোহে নয়,—চোখের জলের মধ্যে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর, শ্বাশুড়ী সজল-নেত্রে মস্তকে ধান দূর্ব্বা সহযোগে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় শুধু এইমাত্র বলিলেন, 'সাবিত্রী যেমন যমের মুখ থেকে তাঁর স্বামীকে কেড়ে নিয়ে এসেছিলেন, তুমিও যেন তাই করতে পার মা।"

পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিবাহের পর হইতে নীলমাধব একটু একটু করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। মাসখানেক মধ্যেই সে বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সকলেরই ইহাতে অবিমিশ্র আনন্দ, কেবল কবিরাজ মহাশয়ের আনন্দের সংগে বিস্ময়

মিশ্রিত ছিল। তিনি কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নহে, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। একদিন তিনি হরবিলাসের বাটীতে আসিয়া বলিলেন, "ওহে, তোমার মেয়ের কুষ্ঠী আছে?"

হরবিলাস বলিলেন, "আমাদের ও অঞ্চলে মেয়েছেলের কুষ্ঠী আর কে তৈরি করায়!"

"ঠিকুজী আছে?"

"হ্যাঁ, তা আছে। কেন বলুন দেখি?"

"ঠিকুজী হলেও চলবে। সেখানি আমায় এনে দাও, ভায়া। আমি তোমার মেয়ের সম্বন্ধে কিছু গণনা করতে চাই।"

হরবিলাস ঠিকুজীখানি আনিয়া কবিরাজ মহাশয়ের হস্তে দিলেন।

সপ্তাহপরে, ঠিকুজীখানি লইয়া আসিয়া কবিরাজ বলিলেন, "তোমার কন্যার বৈধব্য-যোগ নেই। সে আমরণ সধবা। আমার ওষুধের গুণে নয়, তোমার মেয়ের এয়োতের জোরেই নীলু বেঁচে উঠেছে।"

কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা কিন্তু সমানই চলিতে লাগিল। ছয় মাস পরে তিনি বলিলেন, "এখন আর কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু এখনও দু'এক বৎসর স্বামী স্ত্রীকে আলাদা থাকতে হবে।"

নীলু আবার স্কুলে যায়। পরবৎসর সে থার্ড ক্লাসে উঠিল। তাহার পিতার মামা-শ্বশুর রেল বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার সাহায্যে সে একটি ষ্টেশনের কার্য্য পাইয়া বিদেশে চলিয়া গেল। আর এক বৎসর পরে স্ত্রীকে সে নিজ কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হইল।

প্রভা চিরায়ুষ্মতীই রহিল। ৪৭ বৎসর বয়সে, স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, পুত্র-কন্যাগণকে পাশে বসাইয়া সে সতীলোকে যাত্রা করিয়াছিল।

বিলাসিনী

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

"সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, লোটা কম্বল লইয়া, সন্ন্যাসী হইয়া হিমালয়েই আশ্রয় গ্রহণ করিব? না, ভোজালীর আঘাতে বা পিস্তলের মুখে দুশ্চারিণী কুলকলঙ্কিনীর সমুচিত শাস্তি-বিধান করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠ আলিঙ্গনে হৃদয়ের অসহ্য জ্বালা চিরতরে জুড়াইব?"—ইহাই হইয়াছে এখন ব্রজমাধববাবুর প্রবল চিন্তা।

হায় সেদিন, আর এদিন! সেই, একুশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, প্রথম শ্রেণীর অনার্স লইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, পিতৃ-অনুরোধে সবান্ধবে "কনে দেখিতে" যাওয়া! মনে বড়ই আশঙ্কা ছিল, কনেটি পাছে নিতান্ত নাবালিকা হয়, দেখিতে "গৃহস্থ ঘরের পাঁচ-পাচি"র মত হয়, প্রশ্নের উত্তরে পাছে বলে "আমি দুতিয়ে ভাগ পড়ি।" ধনী ভাবী-শ্বশুরের সেই সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে সুখাসনে বসিয়া, অধীর প্রতীক্ষা—পরে কক্ষ-মধ্যে সেই সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত, চতুর্দ্দশ বসন্তের সেই একগাছি মালার মত কন্যার সহসা আবির্ভাব, চারি চক্ষুর সেই প্রথম মিলন—কি অশুভক্ষণেরই সে মিলন! তারপর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হেম-নবীন-রবির কবিতা-আবৃত্তি! শ্রবণ-নয়ন সেদিন কি পীযূষ ধারাতেই অভিষিঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল। তারপর সেই পরিণয়োৎসব—দুই দিন পরে, মধ্যরাত্রে, সুবাসিত কুসুমসমাকীর্ণ সুমনোহর শয্যামধ্যে সেই প্রথম

মিলন! তখন ব্রজমাধববাবুর মনে হইয়াছিল, জীবনের বাকি সারাটা পথই বুঝি এই মত কুসুমাস্তৃতই রহিবে—এই সৌরভময়ী লাবণ্য সরসীতে সন্তরণ করিয়াই জীবনটা বুঝি কাটিবে! সেদিন কে জানিত যে, এমন দিনের মুখও আবার দেখিতে হইবে!

আশা ত অনেকই ছিল, কোন্‌টাই বা পুরিয়াছে? ব্রজমাধববাবুর পিতা, বয়সে প্রবীণ হইলেও, নিতান্ত সেকেলে লোক ছিলেন না। বৈবাহিক নিজ ব্যয়ে জামাতাকে বিলাতে পাঠাইয়া, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে তাহার পাঠ সমাপন করাইয়া, ব্যারিষ্টার করিয়া আনিবেন, হাইকোর্টে প্রথম কয়েক বৎসর অর্থানুকূল্যে তাহার ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দিবেন, এই আশাতেই এখানে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর ছয় মাস কাটিতে না কাটিতেই, সহসা হার্টফেল হইয়া তাঁহার মৃত্যু—তার পর প্রকাশ হইল, নিজ পুত্রগণের তরুণ স্কন্ধে তিনি চাপাইয়া গিয়াছেন—লক্ষাধিক টাকার ঋণ! ব্রজমাধব-বাবুর আশা ভরসা সমস্তই ফর্সা হইয়া গেল। কোথায় তিনি হইবেন চৌরিঙ্গি বা অন্ততঃ বালিগঞ্জ-বিলাসী ব্যারিষ্টার, নিজস্ব মোটরগাড়ীতে বসিয়া হাইকোর্টে আসিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে বার-লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিবেন, না, তিনি হইয়াছেন মাসিক দেড়শত মুদ্রা বেতনে বেসরকারী কলেজের বিনয়নম্র অধ্যাপক! ট্রাম আরোহণে কলেজে যান—ফিরেন পদব্রজে। শ্যামবাজারে একটি গলির ভিতর তাঁহার বাসা; ঝি পাছে পয়সা চুরি করে বলিয়া, প্রতিদিন প্রাতে স্বহস্তে বাজার করিয়া থাকেন। পুত্র কন্যা জন্মে নাই তাই রক্ষা! নহিলে কলিকাতা সহরে এই অল্প বেতনে, গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন হইত।

আজ রবিবার, কলেজ নাই। স্ত্রীও গৃহে নাই—ভবানীপুরে, তাহার পিত্রালয়ে। নিম্ন-তলে নির্জ্জন বৈঠকখানায় বসিয়া ব্রজমাধববাবু অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। "খুন? না, সন্ন্যাস অবলম্বন? কি করি? এ অবস্থায় কি করা উচিত? কি করা কর্ত্তব্য?" এটা তিনি স্থির করিয়াছেন, ঝোঁকের মাথায় কিছু করিয়া বসিবেন না—যাহা করিতে হয়, বেশ ধীরভাবে, ঠাণ্ডা মাথায়, ভাবিয়া চিন্তিয়া—তার পর।

সহসা ব্রজমাধববাবু ডাকিলেন, "ঝি।"

ঝি কলতলায় বাসন মাজিতেছিল; উত্তর দিল, "কেন বাবু?"

"একবার এদিকে এস ত।"—বলিয়া ব্রজবাবু এক টুকরা কাগজে কি লিখিতে লাগিলেন।

ঝি বাসনমাজা ফেলিয়া রাখিয়া, তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া বস্ত্রাঞ্চলে হাত মুছিতে মুছিতে বৈঠকখানায় আসিয়া প্রবেশ করিল। ব্রজবাবু তাহার হাতে কাগজখানি দিয়া বলিলেন, "ঐ যে ১৮ নম্বরে উকীল বিপিনবাবু থাকেন, তাঁর কাছে চিঠিখানা নিয়ে যাও ত! একখানা বই দেবেন, নিয়ে এস।"

ঝি চিঠি লইয়া প্রস্থান করিল। পাঁচ সাত মিনিট পরেই, চামড়ায় বাঁধা একখানা মোটা বহি আনিয়া প্রভুর টেবিলের উপর রাখিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেল।

বহিখানি, "ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন।" ব্রজবাবু সেখানি খুলিয়া, তাহার সুদীর্ঘ সূচীপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে, যে পৃষ্ঠায় নরহত্যা অপরাধের বর্ণনা আছে, সেই পৃষ্ঠা খুলিয়া অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। জটিল বিষয়, অনেক-ক্ষণ ধরিয়া পাঠ করিলেন। আইনজ্ঞ নহেন, তাঁহার ধারণা ছিল, অসতী স্ত্রীকে হত্যা করিলে ফাঁসি হয় না—জেল হয়, বড় জোর দ্বীপান্তর হয়। অনেকক্ষণ পাঠ করিয়া বুঝিলেন, তাহা ঠিক নহে। 'হাতে-নাতে' ধরিয়া তন্দণ্ডে খুন করিলে ফাঁসি হয় না বটে, অন্যথায় হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজির রহিয়াছে, মোহন নামক এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাহাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে, রাত্রে শয্যায় নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিল। অনেক রাত্রি হইলে, স্ত্রী ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিল, দ্বারের

অর্গল সন্তর্পণে মোচন করিয়া, ধীরে ধীরে বাহির হইল। মোহনও উঠিল। ঘরে একখানা কুড়াল ছিল, তাহা হাতে লইয়া, একটু দূরে থাকিয়া, প্রায়ান্ধকার পথে অভিসারিকার অনুসরণ করিল। স্ত্রী, নির্জ্জন রাজপথ বাহিয়া, কিছু দূরে গেল। ফকির উদ্দিন নামক একব্যক্তি, এক স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল; স্ত্রীলোকটা সেখানে দাঁড়াইয়া, তার সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা কহিতে লাগিল। মোহন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া, দুই তিন লম্ফে সেখানে উপস্থিত হইয়া, মোসম্মাতের মস্তকে সজোরে কুঠারাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনীর জীবলীলা সাঙ্গ। মোহনের ফাঁসি হইয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল আইন পাঠ করিয়া, ব্রজবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বহিখানি বন্ধ করিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া সেখানি যথাস্থানে ফেরৎ পাঠাইলেন।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ব্যাপারটা এই। ব্রজমাধববাবুর স্ত্রী উষারাণী, আবাল্য ধনী পিতার গৃহে প্রতিপালিত হওয়াতে, একটু অতিরিক্ত রকম সৌখীন হইয়া পড়িয়াছিল। বসন-ভূষণ, প্রসাধন দ্রব্য খুব উচ্চমূল্যের না হইলে তার মনেই ধরিত না। তা ছাড়া, সাধারণ হিন্দু কুলবধূর ন্যায় 'জুজুবুড়ী' হইয়া গৃহকোণে আবদ্ধ থাকা, অথবা বাহির হইলে দেড়হাত ঘোমটা দিয়া সসঙ্কোচ পদবিক্ষেপ তাহার মোটেই পছন্দ হইত না। থিয়েটার, বায়স্কোপ এগ্‌জিবিশন প্রভৃতি দেখিতে সে বড়ই ভালবাসিত—এবং তাহার ইচ্ছা হইত, বিলাতফেরতেরা যেমন সস্ত্রীক প্রকাশ্যভাবে ঐ সকল স্থানে গিয়া থাকেন, সেও স্বামীর সহিত সেইভাবে অবাধে সঞ্চরণ করে। কিন্তু ব্রজমাধববাবুর সেটা আদৌ পছন্দসই ছিল না। তিনি বলিতেন, "আমি ত বিলাতফেরৎ নই যে তোমাকে মেম সাজিয়ে সঙ্গে নিয়ে বেড়াব!" --এই কারণে উষা অসন্তোষে কালযাপন করিত। এবং ঐ সকল স্থানে যাইতে হইলে, স্বামীর সঙ্গে না গিয়া, নিজ দলভুক্ত সখীগণের সাহচর্য্যে যাওয়াই পছন্দ করিত।

মধ্যে তিন মাসের জন্য ব্রজমাধববাবুর একটি মোটা রকম টিউসনি জুটিয়াছিল। বি-এ পরীক্ষার্থী এক ধনীসন্তানকে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পড়াইতে হইত। অভাবের তাড়নায়, অতি আগ্রহের সহিতই এ কাজটি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিতে রাত্রি সাড়ে দশটা হইয়া যাইত। একদিন বাড়ী ফিরিলে উষা তাঁহাকে বলিল, "ওগো, তোমায় না বলে' একটা কাজ করে' ফেলেছি। তুমি শুনলে রাগ করবে না, বল।'

ব্রজবাবু বলিলেন, "কি কাজ করেছ আগে বল শুনি, তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।"

"আগে বল যে রাগ করবে না।"—আবদারের স্বরে এই কথা বলিয়া, উষা স্বামীর হস্তধারণ করিল।

"কোনও দামী জিনিষ কিনে ফেলেছ বুঝি?"

এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে। ফলে, মাসের শেষ দিকে, সংসার খরচের টাকা ফুরাইয়া যাওয়ায়, টাকা ধার করিয়া আনিয়া উষাকে দিতে হইয়াছে।

উষা বলিল, "না, তা নয়!"

"তবে? কোথাও গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। বায়স্কোপে।"

"কার সঙ্গে? প্রতিমা এসেছিলেন?"

এই প্রতিমাসুন্দরী, উষার একজন বাল্যসখী। তার স্বামী বিলাতফেরৎ না হইলেও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি—সাহেবী চালচলনে দীক্ষিত,—স্ত্রীটিও তাঁর মনের মত। পূর্ব্বে দুই

চারিবার প্রতিমা আসিয়া এ ভাবে ঊষাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, তাই প্রতিমার কথাই ব্রজবাবুর মনে পড়িল।

স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে ঊষা বলিল, "না, প্রতিমা আসেনি, আমি একলাই গিয়েছিলাম।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "একলা? যদি কোনও বিপদ-আপদ হত? যদি কোন অসভ্য লোক, তোমায় কোনও অপমানসূচক কথা বলত?"

ঊষা হাসিয়া বলিল, "আমরা ত আর ঘোমটা দিয়ে কলাবউটি সেজে বেরুইনে যে বদমাইস লোকে 'মেয়ে-ছেলে' দেখে দুটো ঠাট্টা করে নেবে। আমরা তখন মেম-সাহেব —ভয়ের বস্তু!"

ব্রজবাবু বলিলেন, "তা যাই হোক, আর এমন একলা যেও না।"

ঊষা বলিল, "আচ্ছা, তা যাব না। এবার মাফ করলে ত?"

"হ্যাঁ, তা করলাম।"

এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা ব্রজবাবু ছাত্রকে পড়াইতে গিয়া দেখিলেন, তাহার দেহ অসুস্থ। তাহার নিকট বসিয়া কিয়ৎক্ষণ গল্পস্বল্প করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। পথে একটু কাজ ছিল, উহা সারিয়া যখন বাসায় ফিরিলেন, রাত্রি তখন নয়টা। তিনিও দ্বারের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছেন, অমনি একখানি কুঠীয়ালী মোটরগাড়ী আসিয়া তথায় দাঁড়াইল।

ব্রজবাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন, ইংরাজ বেশধারী এক বাঙ্গালী যুবক মোটর হইতে নামিয়া, এক সুবেশা যুবতীকে অবতরণে সাহায্য করিতেছে। সে যুবতী আর কেহই নহে, তাঁহার পত্নী ঊষারাণী। এরূপভাবে একজন পরপুরুষের সহিত স্ত্রীকে মোটরে দেখিয়া ব্রজবাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল।

ব্রজবাবু স্তম্ভিতের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া, ইহাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল।

ঊষা নামিয়া, স্বামীকে দেখিবামাত্র তাঁহার পানে চাহিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই কহিল, 'এই যে, ভালই হল, তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে মিষ্টার লাহিড়ী বড়ই ব্যস্ত হয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, তিনি ত এখন বাড়ী নেই, আপনি অন্যদিন কোনও সময় বরং আসবেন। তা তুমি এসে পড়েছ ভালই হয়েছে। ইনি আমাদের বেলাদিদির ভাই—মিষ্টার লাহিড়ী। (লাহিড়ী সাহেবের পানে ফিরিয়া) ইনিই আমার স্বামী, প্রোফেসর চ্যাটার্জ্জি।"

লাহিড়ী সাহেব তৎক্ষণাৎ ব্রজবাবুর সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন "হাউ-ডু-ডু স্যঃ।"।—মুখ হইতে ভক্ করিয়া একটা মদের গন্ধ বাহির হইয়া ব্রজমাধববাবুর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে নিগৃহীত করিল।

মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, "আসুন, মিষ্টার লাহিড়ী, ভিতরে আসুন।"

লাহিড়ী সাহেব অতি ভদ্র ভাষায় ক্ষমা চাহিয়া, ব্রজবাবুর সহিত পুনশ্চ করমর্দ্দন করিয়া, ঊষার প্রতি 'টুপি উত্তোলন" পূর্ব্বক, মোটরে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

স্ত্রীসহ ব্রজবাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঊষা বলিল, "হ্যাঁগা, আজ যে এত শীগগির ফিরলে?"

মনে মনে ব্রজবাবু বলিলেন, "অসুবিধে হল বুঝি?"—প্রকাশ্যে শীঘ্র ফিরিবার যথার্থ কারণ যা তাই বলিলেন।

স্বামীকে অত্যধিক গম্ভীর দেখিয়া ঊষা বলিল, "তোমায় না বলে ওদের সঙ্গে বায়স্কোপে গিয়েছিলাম তাই তুমি রাগ করেছ? তুমি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই, বেলাদিদি এসে উপস্থিত। আমিও কিছুতেই যাব না, তিনিও কিছুতেই ছাড়বেন না।

শেষে আমি বললাম, দেখ, একলা দুকলো মেয়েমানুষ, বিনা অভিভাবকে এ রকম হুটর হুটর করে, এখানে ওখানে যাওয়া আমাদের উনি পছন্দ করেন না। বেলাদিদি বললেন, এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তা হলে কোনও বাধা নেই। আমার মেজদাদা, ক'দিন হল লাহোর থেকে এসেছেন, তিনি বায়স্কোপের ভেস্টিবুলে আমার অপেক্ষায় থাকবেন, তুমি চল। তাই শুনে আমি গেলাম। বায়স্কোপের পর, বাড়ীতে বেলাদিদিকে নামিয়ে দিয়ে মিস্টার লাহিড়ী আমায় পোঁছে দিতে এসেছিলেন!"

ব্রজবাবু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি লাহোরে থাকেন বুঝি? সপরিবারে?"

"না উনি এখনও অবিবাহিত।"

"কি করেন সেখানে?"

"ব্যারিস্টারি করেন। খুব রোজগার।"

"ওঃ"—বলিয়া ব্রজবাবু মৌনাবলম্বন করিলেন।

স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া ঊষাও একটু চটিয়া গেল। এমন কি অপরাধ করিয়াছে সে, যার জন্য এত? স্বামীর প্রতি অভিমানে দিন দুই ঊষা ভাল করিয়া কথা কহিল না।

কয়েকদিন পরে, একদিন ঊষা একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য সাজগোজ করিতেছিল; ব্রজবাবুও যাইবেন, তিনিও বস্ত্র পরিবর্তন করিতে আসিলেন। ঊষা একটা সুগন্ধির নূতন শিশি খুলিয়া, নিজ বসনে ইচ্ছামত মাখিয়া স্বামীর রুমালে একটু মাখাইয়া দিয়া বলিল, "কেমন সুগন্ধি বল দেখি!"

ব্রজবাবু ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন. "বাঃ—সুন্দর।" পরে শিশিটি হাতে লইয়া দেখিলেন, গন্ধটির নাম নার্কিস। বলিলেন, "এটা খুব দামী বোধ হয়? কত দিয়ে কিনলে?"

ঊষা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বড়গুলোর দাম বেশী—এগুলো ছোট, এগুলোর দাম কম।"

"তবু কত?"

ঊষা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল "সাড়ে তিন টাকা।"

ঘটনাচক্রের অদ্ভুত গতি। ইহার দুই দিন পরে, ছাত্রকে পড়াইতে গিয়া ব্রজবাবু তাহার টেবিলের উপর একশিশি নার্কিস দেখিতে পাইলেন। এ শিশিটি ঊষার শিশির প্রায় দ্বিগুণ। শিশিটি হাতে তুলিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, "নার্কিস—এর গন্ধটি বড় চমৎকার।"

ছাত্র বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। দামও তেমনি।"

"কত দাম এর?"

"ছত্রিশ টাকা।"

ব্রজবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন. "অ্যাঁঃ—বল কি? ছত্রিশ টাকায় এইটুকু এক শিশি এসেন্স?"

ছাত্র বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ! যুদ্ধের সময় দাম আরও বেড়ে গিয়েছিল, এখন তবু একটু কমেছে।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "আমি ছোট শিশি দেখেছি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—ছোট শিশিও আছে, সে একটার দাম চব্বিশ টাকা।"

ব্রজবাবু আর কিছু বলিলেন না। নিজ কার্য্য সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেলেন। নার্কিস বা তাহার মূল্য সম্বন্ধে স্ত্রীর সহিত কোন কথাই কহিলেন না।

মাসের তখন মাঝামাঝি। ব্রজবাবু ভাবিতে লাগিলেন, দেড়শত টাকা মাহিনার গরীব অধ্যাপকের স্ত্রী, চব্বিশ টাকা দিয়া এক শিশি এসেন্স কেনে—এই বা কি রকম কথা! ভাবিলেন, মাসের শেষ সপ্তাহে ঊষা নিশ্চয়ই বলিবে সংসার খরচের টাকা ফুরাইয়াছে; আবার কোথাও টাকা ধার করিতে ছুটিতে হইবে।

কিন্তু মাসকাবার হইয়া গেল, উষা টাকা চাহিল না।

উষা মুখ ভার করিয়া থাকে, স্বামীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহে না। মাঝে মাঝে থিয়েটারে যায়, বায়স্কোপে যায়, সব সময় স্বামীকে জিজ্ঞাসাও করে না। কখনও বলে প্রতিমাদির সঙ্গে গিয়াছিলাম, কখনও অন্যান্য সখীর নাম করে। কৈফিয়ৎ দেয়, "তুমি রাত দশটা অবধি বাইরে থাকবে; ঘরে একলাটি আমার কি করে কাটে বল দেখি?" শুনিয়া ব্রজবাবু ভালমন্দ কিছুই বলেন না। তিনিও মুখ ভার করিয়া থাকেন।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মাসখানেক এইভাবে কাটিল। মাতার পীড়া-সংবাদ শুনিয়া উষা কয়েক দিন পিত্রালয়ে গিয়া থাকিতে চাহিল, ব্রজবাবু আপত্তি করিলেন না। উষা ভবানীপুরে যাইবার কয়েক দিন পরে, একদিন প্রাতে ব্রজবাবু অপরিচিত হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা একখানা চিঠি পাইলেন। খুলিয়া, পত্রপ্রেরকের স্বাক্ষর অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, সেখানে কেবলমাত্র লেখা আছে—"আপনার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।" বেনামী চিঠিখানাতে এইরূপ লেখা ছিল:—

মহাশয়

শুনিয়াছিলাম, ১২ বৎসর মাষ্টারী করিলে, লোকে বুদ্ধি হারাইয়া গর্দ্দভে পরিণত হয়। আপনার মাষ্টারী ত তাহার অর্দ্ধেকও হয় নাই—তথাপি আপনার এ দুরবস্থা কেন?

চোখে কি কিছুই দেখিতে পান না? আপনার রসবতী বিলাসিনী পত্নী এত যে লীলাখেলা করিতেছেন, কিছুই কি বুঝিতে পারেন না?

তিনি থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপ দেখিয়া বাড়ী ফিরিলে, আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত, "কি অভিনয় দেখিলে বল দেখি?"—তিনি যাহা উত্তর করিবেন, তাহা আপনার যাচাই করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সে চুলোয় যাক। তাঁহার হাতে যদি চব্বিশ টাকা মূল্যের ছোট এক শিশি নার্কিস দেখেন, অথবা তাঁহার পরিধানে যদি ষাট টাকা জোড়ার একখানা বেলেডাঙ্গার শাড়ী দেখেন, অথবা তাঁহার গলায় যদি খোদ হ্যামিল্টনের বাড়ীর সাতশত টাকা মূল্যের একছড়া নেকলেস দেখেন, তবে কি আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে, এগুলি আমি ত তোমায় কিনিয়া দিই নাই, তুমি কোথায় পাইলে?

অধিক আর কিছু লিখিতে চাহি না। চোখ কাণ খুলিয়া রাখিবেন এবং ভুলিবেন না যে, বুড়া চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছে, ওরূপ স্ত্রীর সহিত একত্র বাস, স-সর্প গৃহে বাস করার তুল্য, এবং আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ যদি দার (স্ত্রী) পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহাও কর্ত্তব্য। ইতি—

আপনার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু

পত্রখানা পড়িয়া ব্রজবাবুর দেহের রক্ত যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। মাথা বিষম ঘুরিতে লাগিল। উষার নিকট ছোট নার্কিসের শিশি তিনি দেখিয়াছেন বটে। সে উহা নিজে কেনে নাই তাও নিশ্চিত। কিনিলে, মূল্য চব্বিশ টাকার স্থানে সাড়ে তিন টাকা বলিত না; আন্দাজি বলিয়াছে। কিন্তু কই সে বেলেডাঙ্গার শাড়ী এবং হ্যামিল্টনের বাড়ীর নেকলেস ত ব্রজবাবু দেখেন নাই! আছে নিশ্চয়ই আছে। যে ব্যক্তি নার্কিসের কথা ঠিক লিখিয়াছে, শাড়ী ও নেকলেস সম্বন্ধেও তাহার উক্তি ঠিক

হওয়াই সম্ভব। উহার নিকট এত টাকা নাই যে, সে নিজে ওসব কিনিতে পারে। সুতরাং, বেনামী পত্রোক্ত তাহার সেই লীলা-সঙ্গীরই ওগুলি উপহার। কে সে ব্যক্তি? সেই হতভাগ্য লাহিড়ীই কি? পত্রে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে, সে যে থিয়েটারে বায়স্কোপে গিয়াছিলাম বলে, তাহা মিথ্যা কথা,—অন্য কোথাও গিয়া তাহার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হয়।

ব্রজবাবু মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "স-সর্প গৃহে বাস" উল্লেখ করিয়া পত্রপ্রেরক আমাকে সাবধান করিয়াছে। আমার প্রাণহানি করাও কি পাপীয়সীর উদ্দেশ্য নাকি? আশ্চর্য্য নহে। কারণ লাহিড়ী অবিবাহিত, আমি মরিলেই উহাদের "বিধবা বিবাহ" হইতে পারিবে।

এরূপ ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত? উহাকে খুন করিয়া পাপের উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া, নিজে ফাঁসি যাইব? না, সন্ন্যাসী হইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করিব?

এই সময়েই ব্রজবাবু পীনাল কোড আনাইয়া, খুনের ধারা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

এই প্রকার নানা চিন্তায় ব্রজবাবুর দিন কাটিতে লাগিল।

এই সময়ে কলেজ মহলে সংবাদ রটিল, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একজন অধ্যাপক আবশ্যক একজন উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া, ব্রজবাবুর মনে হইল, এই কার্য্যটি যদি যোগাড় করিতে পারা যায়, তবে সমস্ত সমস্যারই মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে। স্ত্রীকে খুনও করিতে হয় না, নিজেকে সন্ন্যাসীও হইতে হয় না। স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া, বিলাতে গিয়া, আর না ফিরিয়া আসিলেই হইল।

অনেক সহি সুপারিশ যোগাড করিয়া, ব্রজবাবু গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "এ কাযের উমেদার বড় নেই। দেশ ছেড়ে, স্ত্রী পুত্র পরিজন ছেড়ে, কেউই চিরদিন বিলাতে গিয়ে থাকতে চায় না। প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন মাত্র অধ্যাপক এই কর্ম্মের প্রার্থী হ'য়ে আমার কাছে এসেছিলেন, তাঁকে কথা দিয়েছি যে তাঁকেই পাঠাব। তাঁর নিজের খুবই ইচ্ছে, কিন্তু শুনলাম, এ খবর শুনেই তাঁর স্ত্রীর ফিট হতে আরম্ভ হয়েছে। তাঁর আত্মীয় স্বজন খুবই বাধা দিচ্ছেন। তাঁর যদি না যাওয়া হয় তবে আপনাকেই পাঠাতে প্রস্তুত আছি।"

ব্রজবাবু মনে মনে বলিলেন, "আমার স্ত্রীর ফিট হবে না।" প্রকাশ্যে, কর্ত্তা মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

পরদিনই কর্ত্তা মহাশয় ব্রজবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রজবাবু তৎসমীপে উপস্থিত হইলে বলিলেন, "সে ভদ্রলোকের যাওয়া হ'ল না। আপনি রাজী ত?"

ব্রজবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কবে যেতে হবে?"

"যত শীঘ্র পারেন। পরশু বিলাতী মেল কলকাতা থেকে রওয়ানা হবে। এত শীঘ্র বোধ হয় আপনি পেরে উঠবেন না। তার পরের মেলে, অর্থাৎ আজ থেকে ন' দিন পরে যাত্রা করতে পারবেন ত?"

ব্রজবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। নিশ্চয় পারবো।"

কোথায় গেলে ব্রজবাবু নিয়োগপত্র ও পাথেয় প্রভৃতির জন্য অর্থ পাইবেন ইহা বুঝাইয়া দিয়া, কর্ত্তা মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার হাতে দিলেন।

ব্রজবাবু, সাহেব বাড়ীতে গিয়া সুট প্রভৃতির ফরমাস দিলেন। তারপর স্ত্রীকে

আনিতে ভবানীপুরে লোক পাঠাইলেন। তাকে সকল কথা জানাইয়া, তাহার একটা বন্দোবস্ত করিয়া জন্মশোধ বিদায় লইতে হইবে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

পরদিন উষা স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিল। বেলা তখন ১২টা। স্বামীকে গৃহে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তুমি কলেজে যাওনি?"

ব্রজবাবু বলিলেন, "না। আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে।"

উষা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "শেষ হয়েছে কি রকম?"

ব্রজবাবু তখন বিলাতে তাঁহার চাকরি গ্রহণের কথা বলিলেন।

উষা বলিল, "সে কি! ভিতরে ভিতরে এই সব তুমি ঠিক করে' ফেলেছ? আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না?"

ব্রজবাবুর মুখমণ্ডলে ক্ষণকালের জন্য একটা ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। তারপর তিনি বলিলেন, "এটা ত হচ্চে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ কিনা! এ যুগে ত স্বামী স্ত্রী আর পরস্পরের অধীন নয়!"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ স্ত্রী, নিজের ইচ্ছা অনুসারে যা খুসী তাই করতে পারে, স্বামীর তাতে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার নেই; আর স্বামীও, নিজের ইচ্ছা মত কাজ করতে পারে, স্ত্রীর মতামত নেওয়াব প্রয়োজন হয় না।"

উষা কয়েক মুহূর্ত্ত নির্নিমেষ নয়নে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। পরে, শ্লেষের স্বরে বলিল, "এতটা উদার হয়ে উঠলে, বিলেত যাবার নামেই?"

ব্রজবাবু সেইরূপ স্বরে উত্তর করিলেন, "যাদের বিলেত যাবার নাম গন্ধও হয়নি, তারাও ত কত লোকে এই রকম উদাব মত পোষণ করে!"

উষা বলিল, "কথাটা কি আমাকে লক্ষ্য করে বলা হল?"

ব্রজবাবু বলিলেন, "যা বোঝ তুমি!"

এ কথা শুনিয়া উষার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া, জানালার কাছে গিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রজবাবু মনে মনে বলিলেন, "ষ্টেজে যেও—প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হতে পারবে তুমি।" কিন্তু এত কালের মমতা, ধীরে ধীরে স্ত্রীর দিকে অগ্রসরও হইলেন। মুখ হইতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "তা, এত কান্না কিসের?—এস এস, ধীরভাবে কথাটা আলোচনা করা যাক।"

উষা কিন্তু সহজে আসিল না। অনেক সাধ্যসাধনা করিতে হইল।

অবশেষে দুইজনের "ধীরভাবে" কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

ব্রজবাবু বলিলেন, "আর এক হপ্তা মাত্র ত আমি দেশে আছি। আমি চলে' গেলে, তুমি তোমার মার কাছে গিয়ে থাকবে ত?"

উষা প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "তবে? কোথায় থাকতে চাও তুমি?"

"কোথাও থাকতে চাইনে।"

"বুঝলাম না।"

"হয় আমিও তোমার সঙ্গে যাব, নয় তোমাকেও যেতে দেবো না। রেখে দাও তোমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের থিওরি। ও থিওরির মাথায় মারি আমি—যা দিয়ে ঘরঝাঁট দিই তাই।"

ব্রজবাবু একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। মৌখিক স্বামী-বিচ্ছেদবেদনা দেখাইয়া,

স্বৈরিণীর স্বাধীনতা লাভের আনন্দকে ঢাকিয়া রাখার অভিনয় বলিয়া ত ইহা বোধ হইতেছে না! তাই তিনি বলিলেন, "হয় আমার সঙ্গে তুমিও বিলাতে যাবে, নয় আমাকেও যেতে দেবে না এই তোমার ইচ্ছা? কথাটা কি সত্য, উষা?"

উষা বলিল, "আমাকে মিথ্যাবাদিনী মনে করার, তোমার কি কোনও কারণ ঘটেছে?"

ব্রজবাবু বলিয়া ফেলিলেন, "ঘটেছে। ভেবে দেখ, এই দু'তিন মাসের মধ্যে তুমি কি আমাকে অনেকগুলো মিথ্যা কথা বলনি?"

একথা শুনিয়া উষা একটু দমিয়া গেল। সে নতমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, সম্প্রতি স্বামীর নিকট কি মিথ্যা সে বলিয়াছে।

ব্রজবাবু বলিলেন, "বল বল, চুপ করে' রইলে কেন?"

উষা ভীত ভাবে বলিল, "হ্যাঁ, দুই একটা বলেছি বোধ হয়।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "বলেছ। আচ্ছা, এখন আমি তোমায় যা যা জিজ্ঞাসা করবো, সমস্ত কথার সত্যি উত্তর দেবে কি?"

উষা বলিল, "দেবো। তুমি জিজ্ঞাসা কর আমায়।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "সে দিন তুমি আমায় একটা গন্ধ দেখিয়েছিলে তার নাম নার্কিস। সেটার দাম কি সত্যি সাড়ে তিন টাকা?"

উষা অবনত মুখে বলিল, "না, তার দাম ২৪৲ টাকা।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "আচ্ছা বেশ। এবার সত্যি কথা বলেছ। আচ্ছা, তোমার এমন কোনও কাপড় গহনা আছে কি, যা আমি তোমায় দিইনি, এমন কি দেখিনি পর্যন্ত?"

উষা বলিল, "হ্যাঁ, আছে।"

"দেখাবে সে সব আমায়?"

"আচ্ছা দেখাচ্ছি।"—বলিয়া উষা উঠিয়া, তাহার কাপড়ের আলমারি খুলিয়া, একখানি সুন্দর সাচ্চা জড়িপাড় শাড়ী বাহির করিয়া আনিয়া স্বামীর সম্মুখস্থ টেবিলের উপব রাখিয়া বলিল, "আমার এই শাড়ীখানি তোমায় এখনও দেখাইনি।"

ব্রজবাবু সেখানি স্পর্শও করিলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাকার শাড়ী এ?"

"বেলেডাঙ্গার।"

"দাম কত?"

"এখানির দাম ত্রিশ টাকা।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "হুঁ। আর কিছু আছে? গহনা টহনা?"

"আছে। তাও দেখাচ্ছি।"—বলিয়া উষা তাহার গহনার বাক্স হইতে হরতন আকারের একটা মখমলের কেস বাহির করিয়া আনিয়া, উহা খুলিয়া, স্বামীর সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। সূর্য্যালোকে জড়োয়া নেকলেস ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। ব্রজবাবু স্পর্শ করিলেন না, তবে লক্ষ্য করিলেন, ডালার ভিতর-অংশে সোণার অক্ষরে হ্যামিল্টন কোম্পানির নাম লেখা রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর দাম কত?"

উষা অসঙ্কোচে বলিল, '৭০০ টাকা।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "হুঁ—আর কিছু নেই বোধ হয়?"

উষা বলিল, "না, আর আমার এমন কিছু নেই, যা তোমার কাছে লুকোনো।"

উভয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব। তার পর উষা বলিল, "তুমি আমায় যা কথা জিজ্ঞেস করলে, আমি সব সত্য উত্তর দিলাম। এখন তুমি আমার একটি কথার সত্য উত্তর দাও।"

"আমার এ কাপড় গহনা এসেন্স সম্বন্ধে, এ রকম ভাবে তুমি আমায় জেরা করলে কেন?"

ব্রজবাবু নিজ পকেট হইতে সেই বেনামী চিঠিখানা বাহির করিয়া, ঊষার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই চিঠিখানি পড়ে' দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে। আর, কেন যে তোমায় ছেড়ে আমি বিলেতে যাচ্চি, তাও বুঝতে পারবে।"

ঊষা এক নিঃশ্বাসে পত্র পাঠ করিয়া, সেখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার কাঁদিতে বসিল। ব্রজবাবু হতভম্ব হইয়া এই দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, মুখ তুলিয়া, ঊষা ক্রন্দনের স্বরে কহিল, "ঠিক হয়েছে, আমার উপযুক্ত শাস্তি আমি পেলাম। স্বামীর কাছে মিথ্যা কথা বলা, স্বামীকে লুকিয়ে কাজ করার শাস্তি যে এত বড়, তা কিন্তু আগে আমি বুঝতে পারিনি। সে যা হয় হোক। এখনই —শীগ্‌গির একখানা ট্যাক্সি আনাও। তুমি আমার সঙ্গে চল ভবানীপুর। এই গহনা, কাপড়, আর গন্ধ, মাকে দেখিয়ে তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, এসব আমি কোথায় পেয়েছি। আর তোমার মোটা বেতের ছড়িগাছটা হাতে নাও।

ব্রজবাবু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "কেন ?"

"যে এই বেনামী মিথ্যা চিঠি তোমায় লিখেছে, সেই লোকটাকে আমি তোমায় দেখিয়ে দেবো। তুমি তাকে মারবে—খুব মারবে—যেন ছ'মাস সে বিছানা ছেড়ে উঠতে না পারে। তার জন্যে যদি তোমায় জেলে যেতে হয়, তাও যেও। তুমি জেল থেকে ফিরে আসবার আশায় আমি প্রাণ ধরে' থাকবো, তোমার সংসার বজায় রেখে দেবো।"

ব্রজবাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কাকে ? কাকে মারবো ?"

"সেই সত্যকে।"

"কোন্ সত্য ?"

সে আমার বাপের বাড়ীর কাছে থাকে। ছেলেবেলা থেকে সে আমায় জ্বালাতন করছে—যখন আমার বিয়ে হয়নি—তখন থেকে। ইদানীংও, আমি মার কাছে গেলে, আমার সঙ্গে গোপনে কথা কইতে চেষ্টা করে। মাকে আমি সব কথাই বলে দিয়েছিলাম। আগে সে আমাদের বাড়ীতে ঘরের ছেলের মত আসতো যেত মা সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিছুতেই না পেরে সে আমার এই সর্ব্বনাশের আয়োজন করেছে। উঃ কি পাজি, কি শয়তান! চল তুমি, তার পাপের প্রতিফল তাকে দেবে চল। মার খেয়ে সে পড়ে' গেলে, আমি এই হাইহিল জুতোসুদ্ধ গুণে তিনটি লাথি তার মুখে মারবো। ওগো চল, চল।"—বলিয়া ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখের অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে, তাহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

ব্রজবাবু অনেক কষ্টে তাহাকে ঠাণ্ডা করিলেন। দুই একটা প্রশ্ন করিয়া যাহা জানিতে পারিলেন তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—

বিবাহের পূর্ব্বে সত্যর অভদ্রতা সম্বন্ধে সকল কথা ঊষা কেবল মাকে বলিয়াছিল, আর কাহাকেও বলে নাই। তাহা শুনিয়া মা বিরক্ত হইয়া সত্যকে নির্জ্জনে তিরস্কার এবং বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তারপর ঊষার বিবাহ হইল, সত্যও বিবাহ করিল। দুই তিন বৎসর সত্য আর ঊষাদের বাড়ী আসে নাই। তাহার স্ত্রী আসিত, বাড়ীতে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করিত, তাস খেলিত—ইদানীং আবার ঊষা থাকিলে, স্ত্রীকে ডাকিবার ছলে, সত্য যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। মাস কয়েক পূর্ব্বে ঊষা যখন দিন পনেরো গিয়া পিত্রালয়ে ছিল, তখন আবার সত্য পূর্ব্ববৎ আচরণ আরম্ভ করে। ঊষা মাকে উহা জ্ঞাপন করায়, মা আবার তাহাকে বাড়ী আসা বন্ধ করেন। এবার ঊষা পিত্রালয়ে গেলে, একদিন মা'র সঙ্গে তাহার অনেক কথা হয়। একাকিনী অথবা কোনও সখীর সঙ্গে থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতিতে যাওয়ার কথা, ইহাতে ব্রজবাবুর অসন্তুষ্টি, একদিন প্রতিমাদের সঙ্গে বায়স্কোপ দেখা, ফিরিবার সময়

প্রতিমার ভাই তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে আসার কথা, নামিবার সময় স্বামীর সামনে পড়িয়া যাইবার কথা, এবং পরে কিছুদিন ধরিয়া এ বিষয় লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে মান অভিমানের কথা, সমস্তই উষা মাকে বলিয়াছিল, মা শুনিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন; এ সমস্ত সময়টা সত্যর স্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিল;—সেই নিশ্চয় গিয়া স্বামীর নিকট সে সব কথা গল্প করিয়াছে। তারপর ঐ শাড়ী, ঐ নেকলেস, ঐ গন্ধ ছয়মাস পূর্ব্বে মার নিকট থাকাকালীন ক্রীত হয়। পিতার মৃত্যুর পর, মা তাহাকে গোপনে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিলেন, সেই টাকা হইতেই, ভাইদের সাহায্যে উষা ঐ গন্ধ, ঐ শাড়ী এবং ঐ নেকলেস ক্রয় করে। সত্যের স্ত্রী ঐ সমস্ত জিনিষই দেখিয়াছে, দামের কথাও শুনিয়াছে এবং আপাততঃ উষা স্বামীর বকুনির ভয়ে, ওসব তাঁহাকে দেখাইবে না, ইহাও সে জানিয়া গিয়াছিল। সব কথা নিশ্চয় সে সত্যর নিকট গল্প করিয়াছিল। সত্য, এই সুযোগ পাইয়া ঐ কুৎসিত পত্র লিখিয়া নিজ হীন প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সকল কথা শুনিয়া ব্রজবাবু, আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

উষা বলিল, "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি—এই শাড়ী, নেকলেস, গন্ধ আর ঐ শত্রুর চিঠি নিয়ে এখনি তুমি মা'র কাছে যাও। তাঁকে এ সব দেখিয়ে, তিনি কি বলেন তা শুনে এস। আমি না হয় বাড়ীতেই থাকি।"

ব্রজবাবু বলিলেন, "না, তার দরকার হবে না। তোমার কথাতেই আমার বিশ্বাস হয়েছে।"

উষা অনেক পীড়াপীড়ি করিল। কিন্তু ব্রজবাবু কিছুতেই এই সরেজমিন তদন্তে যাইতে রাজী হইলেন না।

তারপর বিলাত যাওয়া না যাওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, দুজনে যাওয়াই ভাল। তবে চিরজীবনের জন্য নহে। বছর পাঁচেক সেখানে থাকিয়া, আবার দেশে ফিরিলেই চলিবে। তখন, আর একটা প্রোফেসারি জুটাইয়া লইতে কতক্ষণ ?

যাত্রার পূর্ব্বদিন দুজনে ভবানীপুরে বিদায় সম্ভাষণ করিতে গমন করিল। উষা সেই শাড়ী এবং সেই হার পরিয়াই স্বামীর সহিত ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিল।

ঢাকার বাঙ্গাল

এক

ঢাকা কলেজ হইতে পরেশনাথ প্রথমে এম-এ ও পরে বি-এল পাস করিয়া, পঞ্জিকা মতে এক অতি শুভদিনে, ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য ঢাকার বার লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিয়াছিল।

পরেশের পৈতৃক-ভবন ঢাকা সহর হইতে কিছু দূরে কোনও গ্রামে; নৌকায় যাইতে ৫।৬ ঘণ্টা মাত্র লাগে। উকীল হইয়াও পরেশ প্রথমে নিজ স্বতন্ত্র বাসা করে নাই; কারণ তাহার হাতে এ পরিমাণ মজুদ টাকা ছিল না যে, ওকালতীর অনশন-কাল কাটাইয়া ওঠে। তাই সে মেসের বাসাতে থাকিয়াই, শেয়ারের ছকড় গাড়ী আরোহণে আদালতে "বাহির" হইতে লাগিল।

পরেশনাথের বয়স এ সময় ২৫ বৎসর মাত্র—গৌরবর্ণ যুবা, দিব্য সুঠাম চেহারা;

পড়াশুনাও বেশ ভাল রকমই করিয়াছে—এবং এখনও করিয়া থাকে,—কিন্তু হইলে কি হইবে, সে, যাহাকে বলে, একটু 'মুখচোরা'। সকল প্রসঙ্গে সকলের সঙ্গে ফর্‌ ফর্‌ করিয়া কথা বলা তাহার মোটেই আসে না। ইহাও একটা কারণ বটে;—দ্বিতীয় কারণ, এখানে তাহার কোনও সহায় ছিল না—তাই পরেশ পশার জমাইতে পারিল না। পশার চুলোয় যাউক, মাসে মাসে মাসিক বাসা-খরচটা উপার্জ্জন করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সামান্য যাহা পুঁজি ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। তার পর বিধবা জননীর সামান্য সঞ্চয়ে হাত পড়িল। তার পর স্ত্রীর অলঙ্কারেও হাত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। এইভাবে, বছর দুই কাটিয়া গিয়াছে।

বছরখানেক বার লাইব্রেরীতে ধরণা দিবার পর হইতেই, ওকালতী ব্যবসার প্রতি পরেশের ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছিল; ইহাও সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার প্রকৃতির মানুষের, এ ব্যবসায়ে কোনও দিনই কোনও সুবিধা হইবে না। তাই সে একটা চাকরির সন্ধান করিতেছিল। বিজ্ঞাপন দেখিয়া নানা স্থানে দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও ফল দর্শে নাই।

পরেশের ওকালতী জীবন দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পর, একদিন সংবাদপত্রে সে এক বিজ্ঞাপন দেখিল, কলিকাতাস্থ কোনও সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তির পুত্রগণকে পড়াইবার জন্য একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সচ্চরিত্র গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন, মাসিক বেতন ৫০৲ মাত্র কিন্তু বাসা-খরচ লাগিবে না।

প্রথম দর্শনে, এ বিজ্ঞাপন পরেশনাথের নিকট তেমন লোভনীয় মনে হইল না। এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া শেষে ছি ছি, ৫০৲ টাকা বেতনের গৃহশিক্ষক? তাও কোনও করদ রাজা মহারাজার গৃহেও নয়,—একজন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোকের গৃহে!—কিন্তু পরদিন সাত পাঁচ ভাবিয়া, সে একখানা দরখাস্ত ঝাড়িয়াই দিল। ভাবিল—"হবে না সে ত জানাই আছে। কত দরখাস্ত ত করা গেল, হ'ল কি কোনওটা? যাক্‌, দেখাই যাক্‌ না, দুটো পয়সা বইত নয়।" (ইহা ডাকমাশুল বৃদ্ধির পূর্ব্বের ঘটনা)

এ দরখাস্তের কিন্তু জবাব আসিল। "হইল" ঠিক বলা যায় না, "হইলেও হইতে পারে"।—ভবানীপুরের ঠিকানা দিয়া রায় বাহাদুর খেতাবধারী এক ভদ্রলোক চিঠি লিখিয়াছেন,—"আপনার সহিত সাক্ষাতে কথাবার্ত্তা কহিতে ইচ্ছা করি। আপনি আসিয়া আমার সহিত আগামী শুক্রবার বেলা দশটার মধ্যে দেখা করুন। যদি আপনি মনোনীত না হন, তবে আপনার যাতায়াতের ইণ্টার ক্লাসের ভাড়া আমি দিব।"

এ পত্র পড়িয়া পরেশ চটিয়া গেল। সে আপন মনে বলিতে লাগিল, "হ্যাঃ—ভারি ত চাকরি তাও আবার জাঁকড়ে! রায় বাহাদুর হৃদয়নাথ চাটার্জ্জি! কে হে তুমি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি? তোমার নামও ত কখনও শুনিনি জীবনে। ভেবেছিলাম হয়ত বা রবীন্দ্র ঠাকুর, কি জগদীশ বোস কি প্রদ্যোৎকুমার, কি দীঘাপাতিয়া—এই রকম কেউ একজন নামজাদা লোকের বিজ্ঞাপন। তা নয়, হৃদয়নাথ চাটার্জ্জি! ঘোড়ার ডিম যাবে।"

পরদিন ডাকে পরেশ তার স্ত্রীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইল। সে লিখিয়াছে, জমিদারের গোমস্তা খাজনার জন্য বড়ই বিরক্ত করিতেছে: খোকার গোয়ালাব দুধের দামও তিন মাসের বাকী, সে বলিয়াছে অন্তত এক মাসের টাকা শোধ না করিলে সে দুধ বন্ধ করিবে—অতএব গোটা কুড়ি টাকা না হইলেই চলে না ইত্যাদি।

এই পত্র পড়িয়া পরেশের মনটা খারাপ হইয়া গেল। ভাবিল, দূর হোক্‌ ছাই—এ রকম ক'রে আর কতদিন চলবে?—অত মান অপমানের হিসেব করতে গেলে চলে না—যাই, মহা সম্ভ্রান্ত ও মহাপদস্থ সেই অজ্ঞাতনামা রায় বাহাদুরের তাঁবেদারীই করিগে। দূর গেলে পঞ্চাশটে টাকা পাব ত? বাসা-খরচ লাগবে না, নিজের কাপড় জুতো—সে

আর কতই? বাড়ীতে মাসে মাসে যদি কুড়িটে টাকাও মনিঅর্ডার ক'রে পাঠাই তাহলেই তারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। যাই দেখি, মহামতি চাটুয্যে মশাই আমায় 'মনোনীত' করেন কি না।"

কিন্তু টাকা কোথায়? বাড়ীতে ২০, এবং কলিকাতার পাথেয় স্বরূপ অন্ততঃ ২০,—এই ৪০, টাকা এখনই প্রয়োজন। শ্বশুরদত্ত একছড়া সোণার চেন তাহার ছিল; ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীর অলঙ্কার সে বিক্রয় করিয়াছে কিন্তু এটিকে বিক্রয় করে নাই—কারণ পেটে অন্ন থাকুক আর নাই থাকুক তদুপরি সোণার চেন ঝুলাইয়া আদালতে না গেলে উকীলের মর্য্যাদা থাকিবে কেন? সেই চেনছড়াটি বিক্রয় করিয়া, বাড়ীতে ২০, পাঠাইয়া দিয়া বাকী অর্থ সঙ্গে লইয়া পরেশ কলিকাতা যাত্রা করিল।

দুই

শিয়ালদহে নামিয়া, "পান্থ-নিবাস" নামক হোটেলে নিজের বাক্স ও বিছানা রাখিয়া, চা খাইয়া পরেশ ভবানীপুর যাত্রা করিল। নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়া দেখিল, বাড়ীটি বড়মানুষী ধরণের বটে। ফটকে কাঠের চেয়ারের উপর ভোজপুরী দ্বারবান গর্ব্বিত-ভাবে বসিয়া আছে—বেটা যেন লাট!

ইহা দেখিয়া পরেশ সেখানে দাঁড়াইল না। অল্পদূরে রাস্তার মোড়ে একটা পাণের দোকান ছিল, সেখানে গিয়া এক পয়সার মিঠা খিলি কিনিল। দেড় পয়সা দিয়া একটা কাঁচি সিগারেট কিনিয়া, তাহা ধরাইয়া পাণওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ যে বড় বাড়ী, ফটকে দরোয়ান বসে' আছে, ও বাড়ী কার হে?"

পাণওয়ালা বলিল, "জানেন না বাবু? উনি রায় বাহাদুর রিদয়বাবু। ঐ যে চিড়িয়াখানার কাছে ছোটলাট সাহেবের কুঠী আছে না? উনি সেই কুঠীর মেনেজার, মস্ত লোক!"

"ওঃ"—বলিয়া পরেশনাথ ধীর পদে সেই বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিয়া আসিল। দ্বারবান হস্তে, রায় বাহাদুরের চিঠিখানি পাঠাইয়া দিল।

ক্ষণকাল পরেই তাহার ডাক পড়িল। পাজামা সুট পরিয়া রায় বাহাদুর ড্রয়িং রুমে বসিয়া, গুড়গুড়িতে তামাকু সেবন করিতে করিতে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। চোখে সোণার চশমা। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের উপরে উঠিয়াছে—দেহখানি স্থূল, বর্ণটি খুব উজ্জ্বল শ্যাম—প্রায় গৌরবর্ণ বলিলেই হয়।

পরেশনাথ প্রবেশ করিতেই তিনি তাহার সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বলিলেন, "বসুন।"

পরেশ বসিলে, রায় বাহাদুর তাহার প্রতি নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

রায় বাহাদুর পরেশের আবেদনপত্রখানি বাহির করিয়া, তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এম-এ, বি-এল পাশ করেছেন; ঢাকাতে প্র্যাকটিস করেন লিখেছেন; বিশেষ সুবিধে হয়নি তা অবশ্য বুঝতেই পারছি; কিন্তু তা হলেও, ৫০, টাকা মাইনেতে কি আপনার চলবে? এতে কি আপনি সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন?"

পরেশ সবিনয়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, তা পারবো, কেন না আমার অভাব কম।"

"ওঃ—সে ভাল।"—বলিয়া রায় বাহাদুর গুড়গুড়ির নলটায় দুই চারি টান দিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ২৪ ঘণ্টার লোক চাই—এখানে আপনার থাকতে কোনও অসুবিধে হবে না ত?"

পরেশ বলিল, "আজ্ঞে, অসুবিধে হবে কেন?"

"আমি যদি আপনাকে মনোনীতই করি, কবে আপনি জয়েন করতে পারেন?"

"যবে বলেন। একবার আমায় ঢাকায় যেতে হবে, সেখানকার বাসা তুলে দিয়ে, দেশে গিয়ে মার সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে আসতে পারি।"

"দেশে আপনার মা আছেন বুঝি? আচ্ছা বেশ। যতগুলি দরখাস্ত এসেছিল, তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে আমি যাদের ডেকেছিলাম, তাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই দেখা করা হয়ে গেছে। আপনি আজ এলেন। আর দু'জন মাত্র বাকী—তাঁদের কাল ডেকেছি। তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই, পরশু আমি স্থির করবো কাকে এ পদ দেবো। আপনি কি করবেন? এ দুদিন কি কলকাতাতেই অপেক্ষা করবেন?"

পরেশ বলিল, "আপনি যা বলেন।"

"আমি তবে আপনাকে স্পষ্টই বলি। পূর্ব্বে যতগুলি লোক এসেছিলেন, তাঁদের সকলের চেয়ে, আপনাকেই আমি বেশী যোগ্য মনে করি। কাল যে দু'জনের আসবার কথা আছে, তাঁদের অবশ্য এখনও দেখিনি।"

এই সময় একটি ১২।১৩ বৎসরের সুন্দরী মেয়ে, অঙ্গে তার ইংরাজী ফ্রক, রুখু এলোচুল ফিতায় বাঁধা, লাফাইতে লাফাইতে সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং আগন্তুকের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, রায় বাহাদুরের গলাটি জড়াইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "ড্যাডি-মণি, আজ ত 'ফান্‌-ফ্রাইডে', আজ কি আমরা বায়স্কোপে যাব?"

পরেশ মনে মনে বলিল, 'আ মোলো যা! ধেড়েকেষ্ট মেয়েটার রকম দেখ! আবার ড্যাডি-মণি! ইঙ্গবঙ্গ এই জন্যেই বলে বোধ হয়।"

রায় বাহাদুর কন্যার পৃষ্ঠে আদরের মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "যাবি ত পাগলী!"

মেয়ে মহা আনন্দে নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করিল। রায় বাহাদুর বলিলেন, "দুদিন আপনি থেকেই যান না। আপনাব বাসার ঠিকানাটা দিয়ে যান, পরশু রবিবার সকালেই, যাহোক একটা কিছু খবর আপনাকে পাঠাব। যদি অন্য লোককেই এপয়েন্ট করি, আপনার রাহা খরচের টাকা পাঠিয়ে দেবো—নয়ত, আপনাকেই ডেকে পাঠাব।"

পরেশ বলিল, "আজ্ঞে কোনও বাসা ত এখনও ঠিক করিনি। যদি বলেন ত পরশু—"

"আচ্ছা, তা হলে পরশু সকালে একবার এই সময় এসে খবরটা নেবেন।"—বলিয়া রায় বাহাদুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া, পরেশের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন।

পরেশ ভয়ে ভয়ে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রায় বাহাদুর তখন টেলিগ্রামের ফর্ম্ম লইয়া তাঁহার পরিচিত ঢাকার কোন প্রবীণ উকীলকে এই মর্ম্মে একটি জবাবী তার করিলেন!

'জুনিয়র উকীল পরেশ ব্যানার্জি কি চরিত্রের লোক? আমার সন্তানদের গৃহ-শিক্ষক হইবার সে উপযুক্ত কি না?"

তার লেখা হইলে রায় বাহাদুর ঘণ্টা বাজাইলেন। আর্দ্দালি আসিল। তখনই সে তার রওনা হইয়া গেল।

অপরাহ্ণ কালে তারের জবাব আসিল—"ঐ যুবক অতি সচ্চরিত্র। সর্ব্বাংশে উপযোগী।"

এই উত্তর যখন আসিল, রায় বাহাদুর তখন তাঁহার কর্ম্মস্থানে ছোট লাটসাহেবের কুঠী বেলভেডিয়ারে। পাণওয়ালা বর্ণিত "মেনেজার" তিনি নহেন, তিনি বেলভেডিয়ারের এঞ্জিনিয়র। বহুকাল সরকারী পূর্ত্ত বিভাগে কর্ম্ম করিয়া, এই কয়বৎসর তিনি বেল-ভেডিয়ারের এঞ্জিনিয়র হইয়াছেন। লোকে বলে, ইনি ছোট লাটসাহেবের অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র। লাটসাহেবের পত্নীর ত, চাটার্জ্জি না হইলে এক মুহূর্ত্ত চলে না। নেকলেস মেরামত করাইতে হইলে চাটার্জ্জিকেই হ্যামিল্টনের বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। চাটার্জ্জি বলরুম সাজাইয়া না দিলে তাঁর নৃত্যোৎসব সম্পন্ন হয় না।

রবিবার প্রভাতে রায় বাহাদুর-ভবনে আসিয়া পরেশ শুনিল, তাহাকেই মনোনীত করা হইয়াছে। সাত দিন পরে আসিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, এই কড়ারে, সেইদিনই সে ঢাকা রওনা হইল।

তিন

যথাসময়ে পরেশ আসিয়া নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ছাত্র দুইটি তার বেশ বাধ্য; বড়টির নাম সুবোধ, ছোটটির নাম সুশীল। পড়াশুনাতেও মন আছে। সুবোধ স্কুলে যায়। সুশীল এখনও স্কুলে ভর্ত্তি হয় নাই, বাড়ীতেই পড়ে; রায় বাহাদুরও পরেশের কর্ম্মকুশলতায় তার উপর খুসী।

ছাত্রগণকে পড়াইবার অবসর কালে, রায় বাহাদুরের লাইব্রেরী হইতে বহি লইয়া পরেশ তাহার অধ্যয়নতৃষা মিটাইতে থাকে। মাঝে মাঝে রায় বাহাদুরের সহিত নানা প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা হয়;—রায় বাহাদুর তাহার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

আহারাদির ব্যবস্থা ভাল, ইঁহাদের ব্যবহার ভাল, অর্থচিন্তা নাই,—পরেশ বেশ আরামেই দিন কাটাইতে লাগিল। এইরূপে ৩।৪ মাস কাটিবার পর, হঠাৎ রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র সুশীলের দুই একটা কথায় তাহার মনটা বড় আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

সুশীল একদিন অপরাহ্ণে (তার দাদা তখনও স্কুল হইতে ফিরে নাই) হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা স্যার, ডেপুটি কাকে বলে?"

পরেশ বলিল, "ডেপুটি? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বোধ হয়। তাঁরা মফঃস্বলে হাকিমী করেন।"

"হাকিমী কি, স্যার?"

"এই—তাঁরা অপরাধীদের বিচার করেন, লোককে জেলে দ্যান।"

বালক বলিল, "ওঃ—আচ্ছা স্যার, আপনার ডেপুটি হতে ইচ্ছে করে?"

পরেশ বলিল, "পেলে ত বেঁচে যাই।"

"কেন? ডেপুটিদের অনেক মাইনে বুঝি?"

"হ্যাঁ,—মাইনে বেশী। মান সম্ভ্রমও খুব।"

বালক বলিল, "আচ্ছা, স্যার, আপনার কি বিয়ে হয়েছে?"

বালকের মুখে এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে পরেশ কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "কেন বল দেখি?"

সুশীল বলিল, "ডেপুটি হতে আপনার খুব ইচ্ছে বলছেন; কিন্তু যাদের বিয়ে হয়েছে, তারা ত আর ডেপুটি হতে পারে না। তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

এই কথা শুনিবাই, পরেশ বুঝিতে পারিল, বালকের এই উক্তির অন্তরালে একটা কিছু রহস্য লুক্কায়িত আছে। সে সাবধান হইল; এবং বালকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, "যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা ডেপুটি হতে পারে না তোমায় কে বললে?"

বালক বলিল, "আমায় কেউ বলেনি। কাল রাত্রে আমরা যখন ঘুমুচ্ছিলাম, বাবা মা শুয়ে যে সব কথা বলাবলি করছিলেন, তাই থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি যে যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের আর ডেপুটি হবার যোটি নেই।"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "ঘুমুচ্ছিলে ত বাবা মার কথা শুনলে কি করে?"

বালক বলিল, "সবটা কি ঘুমুচ্ছিলাম? একটু একটু ঘুমুচ্ছিলাম, একটু একটু জেগেও ছিলাম।"

পরেশ নির্লিপ্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিলেন তাঁরা?"

'মা বলছিলেন, পরেশ ছেলেটি ত দেখতে শুনতে বেশ, স্বভাবটিও ভাল, ওর বিয়ে হয়ে গেছে কিনা খোঁজ নাও না। যদি না হয়ে থাকে, লাটসাহেব ত তোমার হাতধরা, তুমি কি আর ওকে একটা ডেপুটি করে দিতে পার না? বাবা বললেন, তা পারবো না কেন, বোধ হয় পারি। আচ্ছা কাল পরেশকে জিজ্ঞাসা করবো।"

পরেশ বলিল, "আর কি বলছিলেন তাঁরা?"

বালক বলিল, "আরও বাবা কি কি বললেন আমি ভুলে গেছি, স্যার।"

শুনিয়া পরেশ হাসিতে লাগিল। এই সময় আয়া দুধ খাইবার জন্য সুশীলকে ডাকিতে আসিল, সুশীল ভিতরে চলিয়া গেল।

পরেশ আপন-মনে কথাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল। প্রথম নম্বর, বাড়ীতে একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা বর্ত্তমান। দ্বিতীয়তঃ পরেশ তাহাদের স্বজাতি ও স্বঘর, এবং সে যে বিবাহিত, একথা কোনও দিন প্রকাশ করে নাই,—কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই বলিয়াই প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তৃতীয়তঃ রায় বাহাদুরের জামাতার জন্য একজন পদস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন, পঞ্চাশ টাকা বেতনের গৃহশিক্ষক হইলে চলিবে কেন? যতই সে ভাবিয়া দেখে, ততই তাহার মনের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে, তাহাকে জামাই করিবার অভিপ্রায়েই রায়বাহাদুর-দম্পতী গত রাত্রে ঐ প্রকার কথোপকথন করিয়াছিলেন।

সেই দিনই রাত্রি-ভোজনের পর, রায় বাহাদুর খোলা বারান্দায় ঈজি চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে, পরেশকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পরেশ আসিলে বলিলেন, "বস হে। একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্।"

পরেশ বসিল। প্রথমে দুই একটা অবান্তর কথার পর রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর চিঠিপত্র পাও? সবাই ভাল আছেন ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন বলেছিলে?"

'আজ্ঞে আমার বিধবা মা আছেন, একটি ছোট বোন আছে, বিধবা জ্যেঠাইমা আছেন, তাঁর একটি ছেলে আছে বছর বারো তেরো।"

'আজও বিবাহ করনি নাকি?"

পরেশের বুকটি দুর দুর করিয়া উঠিল। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট স্বরে মিথ্যা বলিল, "আজ্ঞে না।"

"কেন? তার কারণ?"

"আজ্ঞে, নিজে ভাল রকম উপার্জ্জন করতে পারার পূর্ব্বে বিবাহ করাটা উচিত মনে করি না, সেই জন্যেই করিনি। অন্য কোনও কারণ নেই।"

কথাটা শুনিয়া রায় বাহাদুর খুসী হইলেন। সেদিন এ প্রসঙ্গে আর অধিক কথা চালাইলেন না।

দিন পাঁচ ছয় আর কোন কথা এ সম্বন্ধে উঠিল না। ইহাতে পরেশ একটু হতাশ হইয়াই পড়িল। কিন্তু সপ্তম দিনে রাত্রি দশটার সময় রায় বাহাদুর তাহাকে তলব করিলেন।

আজ স্পষ্ট কথা। রায় বাহাদুর বলিলেন, "দেখ পরেশ, আজ আমি তোমার কাছে একটি প্রস্তাব করবো। বিষয়টি একটু, কি বলে গিয়ে, ডেলিকেট। ইচ্ছা হয়, আজই তুমি উত্তর দিও। কিম্বা, যদি ভেবে চিন্তে দেখতে চাও, আজই তোমার উত্তর আমার আবশ্যক নেই; ভেবে চিন্তে দেখে, দুদিন পরেই তুমি আমায় বোলো।"

পরেশ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া, রায় বাহাদুরের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

রায় বাহাদুর ঈজি চেয়ারে একটু উচ্চ হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "আমার মেয়ে

সুনীতিকে তুমি ত দেখেছ। ডায়োসিজনে পড়ছে, এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে, তাও বোধ হয় শুনেছ। ওর বিবাহ দেবার জন্যে, গিন্নী কিন্তু বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। যেখানে যেখানে পাত্র দেখা হল, কোথাও তেমন পছন্দ হল না।—তোমাকে গিন্নী কি সুনজরে দেখেছেন জানিনে, ওঁর ভারি ইচ্ছে হয়েছে, তোমার হাতেই সুনীতিকে সমর্পণ করেন।"—বলিয়া রায় বাহাদুর নীরব হইলেন। পরেশও লজ্জিতভাবে মাথাটি হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

প্রায় একমিনিট পরে, রায় বাহাদুর আবার বলিতে লাগিলেন, "সুনীতিকে তোমার পছন্দ কি না জানি না। আর, তোমার মা বেঁচে রয়েছেন, তাঁরও মতামত নেওয়া অবশ্য দরকার। আরও একটা কথা বলে' রাখি। যদি অন্য বাধা না থাকে, তবে তুমি সেদিন যে বাধার কথা উল্লেখ করেছিলে যে উপার্জ্জনক্ষম না হলে তুমি বিবাহ করবে না, সে বিষয়ের একটা ব্যবস্থা আমি করতে পারবো। তুমি বোধ হয় জান যে লাটসাহেব আমায় বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তাঁকে ধ'রে, তোমার একটা কিনারা আমি ক'রে দিতে পারবো বোধ হয়।"

পরেশ প্রায় জড়িত স্বরে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আপনি যা বললেন, এ ত আমার আশার অতীত, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তবে, মাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। তাঁর মত না নিয়ে—"

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন, "সে ত নিশ্চয়—আমি ত তা আগেই বলেছি। তুমি তাঁকে চিঠিতে সব কথা লেখ। কিম্বা, না হয় বাড়ীই যাও, মুখে তাঁকে সব কথা বল। আর, তিনি যদি মেয়ে দেখতে চান, তাঁকে সঙ্গে করেও এখানে আনতে পার।"

পরেশ বলিল, 'আজ্ঞে, সেই বোধ হয় ভাল হবে।"

বেশ, তবে তাই যাও। কথাটা পাকা হয়ে গেলেই, তোমাকে আমি লাটসাহেবের কাছে নিয়ে যেতে চাই।"

পরেশ আর কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বলিল, 'আজ্ঞে হেঁহেঁ—আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ।"

পরদিনই সন্ধ্যার ট্রেণে পরেশ ঢাকা যাত্রা করিল। এখানে চাকরি করিতে করিতে, আর দুইবার সে বাড়ী গিয়াছিল—শিয়ালদহে গিয়াছিল, ভাড়াটিয়া অশ্বযানে। এবার রায় বাহাদুরের নিজের মোটর গাড়ী তাহাকে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিয়া আসিল! গত দুইবার বাড়ী যাইতে নিজ পকেট হইতে তাহাকে কষ্টসঞ্চিত অর্থ বাহির করিতে হইয়াছিল। এবার উল্টা কিছু লভ্য হইল,—রায় বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতের ভাড়া দিয়াছিলেন, পরেশ কিন্তু শিয়ালদহে গিয়া ইণ্টার ক্লাসের টিকিটই খরিদ করিল!

চার

পাঁচদিন পরে পরেশ বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, তার মা জেঠাইমা উভয়েই এ বিবাহে মত দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "আমরা এখন বউমাকে দেখবো না। অদিনে অক্ষণে কি দেখতে আছে? বিয়ের পর যখন বউ বরণ ক'রে ঘরে তুলবো সেই সময় মুখ দেখবো।"

এখন হইতে গৃহিণী, আহারাদি ও অন্যান্য বিষয়ে পরেশকে আরও বেশী যত্ন করিতে লাগিলেন।

লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত হইবার উপযুক্ত পোষাক, রায় বাহাদুর নিজ ব্যয়েই পরেশকে তৈয়ারী করাইয়া দিলেন। এবং একদিন অবসর মত, লাটসাহেবের নিকট তাহাকে

লইয়া গিয়া, নিজ হবু-জামাই বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। লাটসাহেব সহাস্য বদনে পরেশের সহিত করমর্দ্দন করিয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। বিদায় গ্রহণকালে, পরেশের সাক্ষাতেই তিনি রায় বাহাদুরকে বলিলেন, "বেশ উজ্জ্বলবুদ্ধি যুবক! দেখি আমি উহার জন্য কি করিতে পারি।"

মাসখানেকের মধ্যেই, বার্ষিক ডেপুটি মনোনয়নের সময় উপস্থিত হইল। গেজেট হইবার পূর্ব্বেই পরেশ জানিতে পারিল, শিক্ষানবীশ ডেপুটিদের তালিকায় তাহার নাম উঠিয়াছে এবং আলিপুর আদালতে তাহাকে কর্ম্মশিক্ষা করিতে হইবে।

কিছুদিন পরেই, ধড়াচূড়া বাঁধিয়া পরেশ আদালতে যাইতে আরম্ভ করিল। রায় বাহাদুর-গৃহেই এখনও সে বাস করে—এবং পূর্ব্ব মতই তাঁহার পুত্রগণের শিক্ষকতা করিয়া থাকে। সুনীতি আর তাহার সামনে বড় আসে না ; যদিও এখনও সে ফ্রক ছাড়িয়া শাড়ী ধরে নাই এবং ডায়োসিজনের গাড়ীতে নিয়মিত ভাবে স্কুলে যায়, তথাপি বরকে 'লজ্জা' করিবার বংশানুক্রমিক প্রথা সে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এপ্রিল মাসে সুনীতির ম্যাট্রিক পরীক্ষা হইবে—মে মাসে পরেশের ডেপুটি পদে পাকা হইবার কথা—তাই জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি বিবাহ হইবে এইরূপই প্রায় স্থির আছে।

সুনীতির পরীক্ষা হইয়া গেল। লিখিয়াছে ভাল, পাস সে নিশ্চয়ই হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে কিন্তু হঠাৎ এক অঘটন ঘটিল। বেলভেডিয়ারে রায় বাহাদুরের নিকট টেলিফোনে সংবাদ গেল, এজলাসে বসিয়া কাজ করিতে করিতে হঠাৎ পরেশের ফিট হইয়াছিল, চেয়ারসুদ্ধ হুড়মুড় করিয়া সে পড়িয়া যায়, ভবানীপুরের ডাক্তার যতীন ঘোষ সেদিন ঘটনাক্রমে কোনও মোকর্দ্দমায় সাক্ষী স্বরূপ আদালতে উপস্থিত ছিলেন, খাস কামরায় লইয়া গিয়া তিনিই রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতেছেন।

শুনিয়া, রায় বাহাদুরের মাথায় ত বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ মোটর ছুটাইয়া, আদালতে গেলেন। পরেশ তখন কতকটা সুস্থ হইয়া চেয়ারে বসিয়াছেন। ডাক্তারবাবু তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবু, রায় বাহদুরকে চোখ টিপিয়া বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়। বড় গরমটা পড়েছে কিনা, তাই ফিট হয়েছিল।"

"এখন বিশেষ কোনও আশঙ্কা আছে কি?"

"না, উপস্থিত কোনও আশঙ্কা নেই।"

রায় বাহাদুর পরেশকে এবং ডাক্তারকে নিজ মোটরে তুলিয়া লইয়া বাড়ী আসিলেন। পরেশকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া, ডাক্তারকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, ব্যাপার কি বল দেখি?"

ডাক্তারবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার গুরুতর। এ, যে সে মূর্চ্ছা নয়,—মৃগী রোগ।"

"অ্যাঁ? বল কি!"—বলিয়া রায় বাহাদুর সেখানেই হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন। জড়িত স্বরে বলিলেন, "তবে ত, যে কোনও সময়ে, হঠাৎ—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে।"

ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, দিন দুই সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিয়া, ভিজিটের টাকাগুলি লইয়া ডাক্তারবাবু প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে পরেশকে দেখিতে আসিয়া রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আর কি কখনও এ রকম ফিট তোমার হয়েছিল, না এই প্রথম?"

পরেশ ক্ষীণস্বরে বলিল, "আজ্ঞে আর দু'বার হয়েছিল। শেষবার, এখানে দিনকতক আসবার আগেই। বার লাইব্রেরীতে ব'সে অন্য জুনিয়র উকীলদের সঙ্গে তাস খেল-

ছিলাম, হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি।"

"প্রথম বার?"

"সেবার আমি বি-এ পাস করে দেশে গেছি, একটা বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে বসে-ছিলাম,—খেতে খেতেই ফিট হয়।"

রায় বাহাদুর মুখখানি গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

গৃহিণী স্বামীর মুখে পরেশ সম্বন্ধে ডাক্তারের মন্তব্য গতকল্যই শুনিয়াছিলেন; এখন তার আর দুইবার মূর্চ্ছা হওয়ার ইতিহাস শুনিয়া বলিলেন, "ওগো তুমি অন্য পাত্র দেখ; ও ছেলেকে কিছুতেই আমি মেয়ে দেবো না।"

পরেশ সুস্থ হইয়া আবার আদালতে বাহির হইতে লাগিল।

রায় বাহাদুর একদিন অবস্থা বুঝিয়া, মিষ্ট কথায় স্নেহপূর্ণ ভাষায় তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। পরেশ দুঃখিতভাবে বলিল, "আজ্ঞে, আমি নিজেই আপনাকে জানাব ভেবেছিলাম। যতীনবাবু ডাক্তারও আমাকে বলেছেন, এ অবস্থায় বিবাহ করা কিছুতেই আমার উচিত নয়।"

এই কথোপকথনের অল্পদিন পরেই পরেশের বদলির সংবাদ গেজেটে প্রকাশিত হইল। ভিতরে ভিতরে রায় বাহাদুরই কল টিপিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

রায় বাহাদুর অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ছেলেটি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছিল; শাঁসালো শ্বশুর দেখিয়া বিলাত যাইতে চাহিল; এবং মাস দুই পরেই শ্বশুরের টাকায় বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে চলিয়া গেল।

ডেপুটি পদে পাকা হইয়া পরেশ টাঙ্গাইল মহকুমায় সেকেণ্ড অফিসর স্বরূপ বদলি হইল। প্রথম প্রথম রায় বাহাদুর পরেশের সংবাদ লইতেন। ক্রমে সেটা কমিয়া গেল, শেষে বন্ধই হইয়া গেল।

পাঁচ

বৎসরখানেক পরে পরেশের সাবডিভিজন্যাল অফিসার প্রবোধবাবু ছুটি লইয়া কলি-কাতায় আসিলেন। একদিন রায় বাহাদুরের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। টাঙ্গাইলে ছিলেন শুনিয়া রায় বাহাদুর তাঁহাকে পরেশের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রবোধবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, পরেশ সেখানে বেশ আছে। কাজকর্ম্ম করছে। এই কিছুদিন হল সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়ার পেয়েছে।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবাহ করেছে?"

"হাঁ। করেছে বইকি।"

"ছেলেপিলে কিছু হয়েছে নাকি?"

"হাঁ, তার একটি ছেলে, একটি মেয়ে।"

বিবাহই বা করিল কবে? আর বছর না ঘুরিতেই একটি ছেলে একটি মেয়ে! সবিস্ময়ে রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত বড় ছেলে মেয়ে?"

"ছেলেটি বড়। বছর ছয়েকের হবে। মেয়েটি বছরখানেকের।"

রায় বাহাদুর শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু মনের বিস্ময় মনে গোপন করিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ!"

অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরেশের এখন স্বাস্থ্য কেমন?"

প্রবোধবাবু বলিলেন, "স্বাস্থ্য ভালই!"

"সেখানে কোনদিন তার ফিট টিট হয়েছিল?"

"না, ফিট হবে কেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "এখানে যখন ছিল, তখন একদিন এজলাসে বসে তার ফিট হয়েছিল।"

প্রবোধবাবু বলিলেন, "না, সেখানে কোনও দিন ত ফিট-টিট হতে দেখিনি তার।"

রায় বাহাদুর একটু গোপন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, যতীন ডাক্তার যিনি আলিপুরে পরেশের ফিটের দিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তিনি পরেশের স্বগ্রাম-বাসী ও সতীর্থ; এবং পরেশ এখানে থাকাকালীন সে প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে গিয়া আড্ডা দিত।

রাত্রে রায় বাহাদুর পরেশঘটিত নূতন খবরগুলি সমস্তই তাঁহার গৃহিণীর নিকট প্রকাশ করিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে, ও ফিট-টিট সবই মিথ্যে—নিজের কাজটি বাগিয়ে নিয়ে কেবল বিয়েটা বন্ধ করবার জন্যেই ঐ কৌশল করেছিল!"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আমরা গর্ব্ব করে থাকি আমরা কলকাতার লোক ভারি চালাক!—কিন্তু ঢাকার বাঙ্গালটা এসে আমাদের কি ঠকানটাই ঠকিয়ে গেল বল দেখি!"

সুশীলা না পিপুলা?

এক

ভাগলপুরে আমার পিতা ওকালতী করিতেন, সেই স্থানেই আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ।

আমাদের বাড়ী হইতে অল্প ব্যবধানেই পিতার বন্ধু আর একজন উকীলের বাড়ী ছিল। তাঁহার নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকালে আমি তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায় প্রতিদিনই খেলা করিতে যাইতাম। চন্দ্রনাথবাবুকে আমি কাকামশাই ও তাঁহার পত্নীকে কাকীমা বলিতাম। কাকীমার তখনও কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি আমাকে খুবই যত্ন করিতেন;—কোলে বসাইয়া আমাকে মিঠাই খাওয়াইতেন, মুখ ধোযাইয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিয়া, আমায় পাউডার মাখাইতেন। চলিয়া আসিবার সময় মুখে চুমো খাইয়া বলিতেন, "আবার কাল এস, বাবা।" মা আমায় মারিলে কাকীমা'র কাছে গিয়াই আমি নালিশ করিতাম। তাঁহার উপর আমার আব্দার ও মান-অভিমানের সীমা ছিল না।

কিন্তু কাকীমার গৃহে আমার এই অত্যধিক আদর অধিক দিন রহিল না। আমার বয়স যখন সাত বৎসর তখন তিনি স্বয়ং জননী হইলেন,—একটি আধটি নয়—একসঙ্গে দুই দুইটি কন্যা তিনি প্রসব করিয়া বসিলেন। ইহাকেই বলে "রামজী যব্ দেতা তব্ ছাপ্পর ফোড়্কে দেতা।" আমি তখন সাত বৎসরের বালক হইলেও, ঘটনাটি বেশ স্মরণ আছে। তাহার অল্পদিন পূর্ব্বেই আমি ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম।

যাহা হউক কাকীমার কন্যা দুইটি দিন দিন "শুক্লপক্ষের শশিকলা"র মতই বাড়ীতে লাগিল। আমিও ক্লাসের পর ক্লাস উঠিতে লাগিলাম। আমি আর বড় একটা কাকীমার বাড়ী যাই না। একটু বড় হইলে, তার মেয়ে দুটি আমাদের বাড়ী খেলা করিতে আসিতে লাগিল। একটির নাম সুশীলা, অপরটির নাম পিপুলা বা প্রফুল্লনলিনী। একে ত যমজ ভগিনী, কোনটি কে চেনাই শক্ত—তার উপর আবার তাদের মা দুষ্টামী করিয়া দুইটিকে একই রকমে সাজাইতেন। দুইটির চুল ঠিক একই রকমে বাঁধিয়া, একই রঙের

ডিজাইনের ফ্রক দুইটিকে পরাইতেন, জুতা মোজা পরিলে তাহাও ঠিক একই রকমের হইত। আমাদের বাড়ীতে দুইটি প্রায় একসঙ্গেই আসিত। কখনও একটি একলা আসিলে বাড়ীর সকলেই জিজ্ঞাসা করিত—"সুশীলা না পিপ্‌লা?" যে আসিত, সে নিজের নামটি বলিত।

আমাদের বাড়ীর পশ্চাতে একটি ফুল-ফলের বাগান ছিল, আমি কখনও সুশীলাকে, কখনও পিপ্‌লাকে, কখনও উভয়কে সেই বাগানে লইয়া যাইতাম। সকল ফলের মধ্যে পেয়ারাটাই ছিল তাহাদের অত্যন্ত লোভের বস্তু। পেয়ারা পাড়িয়া দিতাম, উভয়ে খাইত। কখনও স্বহস্তে পেয়ারা পাড়িবার আব্দার লইত—পাকা পেয়ারা খুঁজিয়া তাহার নিম্নভাগে দাঁড়াইয়া একে একে উভয়কে আমি কাঁধে তুলিয়া বসাইতাম, তাহারা আনন্দ কলরবে পেয়ারা পাড়িত।

তখন আমার পৈতা হইয়া গিয়াছে—বয়স বারো বৎসর। সুশীলা পিপ্‌লা পাঁচ। একদিন আমার সাক্ষাতেই কাকীমা মাকে বলিলেন, "সুশীলা কি পিপ্‌লা, একটিকে ভাই তোমায় নিতে হবে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত, ছিলে খুড়ী, হবে—শ্বাশুড়ী।" বারো বৎসর বয়সের সকল ছেলে এই কথোপকথনের অর্থ বুঝিতে পারিত কি না, জানি না; কিন্তু আমি জলের মতই বুঝিয়াছিলাম; বাল্যকালে আমি বোধ হয় একটু অকালপক্কই ছিলাম। পরদিন স্কুলে গিয়া, ক্লাসের বুজম্ ফ্রেন্ড হরিগোপালকে জলখাবার ঘরের নিকট একাকী পাইয়া চুপি চুপি বলিলাম, "ওরে, আমার যে বিয়ে।"

হরিগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কবে রে?"

বলিলাম, "তা জানিনে, ভাই। বোধ হয়, বড় হলে পাস-টাস করলে।"

হরিগোপাল তাচ্ছিল্যভাবে বলিল, "ধুৎ, সে ত ঢের দেরী। কোথায় সম্বন্ধ শুনি? কার সঙ্গে?"

"চন্দ্রবাবুর মেয়ের সঙ্গে।"

"সেই সুশীলা পিপ্‌লা?'

"হ্যাঁ।"

"কোন্‌টার সঙ্গে?"

"তা এখনও জানিনে, ভাই। দুটোর মধ্যে একটার সঙ্গে।"

"তা, তোর কোন্‌টাকে পছন্দ শুনি।"

"তা কি জানি ভাই, দুটোই ত এক রকম।"

হরিগোপাল আমার চেয়ে দুই তিন বছরের বড়। সে তখন সিগারেট খাইতে ও নভেল পড়িতে শিখিয়াছে। এসব বিষয়ে আমার চেয়ে সে ঢের বেশী বিজ্ঞ। হরিগোপাল গম্ভীরভাবে বলিল, "তোর মা-বাপ যদি তোকে জিজ্ঞাসা করেন, তুই সুশীলাকে বিয়ে করবি, না পিপ্‌লাকে বিয়ে করবি, তুই কি উত্তর দিবি, শুনি?"

"তাই ত, ভাই, কি উত্তর দেবো ব'লে দাও।"

হরিগোপাল গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "এর মধ্যে আসল কথা কি হচ্ছে, জানিস?"

"কি?"

"আসল কথা হচ্ছে লভ্—ভালবাসা। অনেক নভেলে আমি পড়েছি, ভালবাসা ভিন্ন বিয়ে হলে সে বিয়েতে সুখ হয় না। এখন তোকে খোঁজ নিতে হবে, কে তোকে বেশী ভালবাসে—সুশীলা না পিপ্‌লা। যে তোকে বেশী ভালবাসে, তাকেই বিয়ে করবি—এ ত সোজা কথা।"

"আচ্ছা" বলিয়া আমি ক্লাসে চলিয়া গেলুম।

পরদিন রবিবার ছিল, সুশীলা-পিপ্‌লা আসিলে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা

করিলাম, "আচ্ছা, তোরা দুজনের মধ্যে কে আমায় বেশী ভালবাসিস, বল্ দেখি? যে আমায় বেশী ভালবাসে, তাকেই আমি বিয়ে করবো।"

পিপুলো বলিল, "আমি তোমায় বেশী ভালবাসি. আমায় তুমি বিয়ে কর সুরোদাদা।"

সুশীলা বলিল, না সুরোদাদা ওকে তুমি বিয়ে কোরো না—আমি তোমায় বেশী ভালবাসি, আমায় বিয়ে কর।"

পিপুলো বলিল, "হ্যাঁ তোকে বিয়ে করবে বইকি। তুই সেদিন সুরোদাদাকে কি ভয়ানক কামড়ে দিয়েছিলি, মনে নেই? সুরোদাদার পায়ে এখনও দাঁতের দাগ রয়েছে।"

সুশীলা মিনতিমাখা অনুতাপের স্বরে বলিল. "আর আমি তোমায় কামড়াবো না সুরোদাদা, আমাকেই বিয়ে কর তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

সুশীলা-বিষয়ে পিপুলো-কথিত অপবাদের ইতিহাসটুকু এই;—মাস দুই পূর্ব্বে পেয়ারা পাড়িবার জন্য সুশীলাকে আমি কাঁধে তুলিয়াছিলাম; নামাইবার সময় আমারই অসাবধানতা বশতঃ সে পড়িয়া যায়। এই পতনে রাগিয়া সে আমারই পায়ের গোছে এমন কামড়াইয়া দিয়াছিল যে. তাহার সেই ধারালো ৩।৪টা দাঁত আমার পায়ের মাংসে প্রবেশ করিয়া রক্ত বহাইয়া দিয়াছিল। ঘা পর্য্যন্ত হইয়াছিল. সে ক্ষত শুকাইতে মাসখানেক লাগে।

বিবাহ জন্য দুই বোনে রীতিমত ঝগড়া বাধিয়া গেল। অবশেষে সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তখন সান্ত্বনার ছলে তাহাদিগকে বলিলাম, "আচ্ছা আচ্ছা, তোরা ঝগড়া-ঝাঁটি করিসনে, আমি দু'জনকেই বিয়ে করবো।"

দুই

ষোল বৎসর বয়সে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এফ-এ পড়িতে গেলাম। (তখনও ভাগলপুরে কলেজ খোলে নাই।) কালক্রমে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন কলেজে ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম।

ছুটিতে বাড়ী আসিয়া দেখিতাম, সুশীলা-পিপুলার সেই একই ভাব—অর্থাৎ কোন্‌টি কে, চিনিবার উপায় নাই। ১০।১১ বৎসরের হইলে তাহারা আর ফ্রক পরিত না—শাড়ী পরিত; কিন্তু তখনও তাহাদের মা. দুইটিকে একই পাড়ের শাড়ী ও জামা পরাইতেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে তাহারা পড়ে। স্কুলের গাড়ী আসিলে হিন্দুস্থানী দাই নামিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করে—"মনে আছে ভাই?"—ভিতর হইতে বালিকারা উত্তর দেয় "সীতারাম"—এবং বহি-সেলেট লইয়া বাহির হইয়া আসে—ইহাই ছিল সেই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রচলিত সঙ্কেত।

এ কয় বৎসর প্রথম প্রথম সুশীলা-পিপুলো আমার সহিত পূর্ব্বের মত মিশিত বটে, কিন্তু যতই তাহারা বড় হইতে লাগিল. ততই মেলামেশা কমিয়া আসিতে লাগিল। প্রথম প্রথম আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময় তাহাদের জন্য কিছু কিছু খেলনা; ছবির বই প্রভৃতি উপহার আনিতাম। শেষ দুই বৎসর আর কিছু আনি নাই। এখন তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে বড় একটা বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না, কদাচিৎ আমাদের বাড়ী আসিলে তাহারা মা'র কাছে গিয়া বসিত; কদাচিৎ আমি তাহাদের বাড়ী গেলে কাকীমার সঙ্গে বসিয়া খানিক গল্প করিয়া চলিয়া আসিতাম।

পূজার ছুটি ফুরাইতে আর দুই দিন মাত্র বিলম্ব আছে। দ্বিপ্রহরে আহারের পর আমি একখানা উপন্যাস পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলাম; অপরাহ্নে ঘুম ভাঙ্গিলে মা আসিয়া আমার কক্ষে বসিলেন। দুই চারি কথার পরেই আসল কথাটি পাড়িলেন —"বাবা, ছেলেবেলা থেকে তোর ও বাড়ীর কাকীমার ইচ্ছে, সুশীলা পিপুলো একটির

সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, এ কথা তুই জানিস ত?—অনেক সময়েই ঘরে এ কথা আমরা বলাবলি করেছি।"

আমি বলিলাম, "জানি বইকি, মা।"

"এ বিষয়ে তোর কোনও অমত নেই ত?"

"আমার মতামতের জন্যে আর কি যাচ্ছে আসছে মা?—তুমি, বাবা যা বলবে, আমি তাই করতেই প্রস্তুত আছি।"

মা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "সে ত জানি, তুই আমার লক্ষ্মী ছেলে। আচ্ছা বেশ, তবে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ওদের বাপ একটির পাত্র স্থির করেছেন। একটি তাকে, একটি তোকে দিতে চান। সুশীলা পিপুলো দুজনের মধ্যে কাকে তোর পছন্দ বল্ দেখি?"

কাহাকে আমার পছন্দ, তাহা আমি মনে মনে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলাম। তবু, মা কি বলেন শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—"যমজ বোন ওরা, দেখতে ত দুজনাই সমান—তোমার কাকে পছন্দ, তাই বল।"

মা বলিলেন, "শুধু যে দেখতে দুজনেই সমান, তাই নয়। দু'জনেরই মেজাজ, মতিগতিও সমান। আমি ত বাবা জন্মাবধি ওদেব দেখছি—দোষে গুণে দুজনাই ঠিক একই রকমের। তবে, যেন মনে হয়, ওরই মধ্যে পিপুলা একটু অভিমানী। দুজনেই অভিমানী, তবে পিপুলো যেন একটু বেশী।"

আমি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, যদি ওদেরই কাহাকেও বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি সুশীলাকেই বিবাহ করিব। ছেলেবেলায় সে-ই আমার কামড়াইয়া দিয়াছিল—তাহারই দাঁতের চিহ্ন এখনও আমার পায়ের গোছে বর্ত্তমান; সুতরাং এক হিসাবে সে নিজস্ব বলিয়া আমায় চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পর, এই কামড়ানো অপরাধের জন্য পাছে তাহাকে বিবাহ করিতে না চাই, এই জন্য ৫ বৎসরের সুশীলার সেই ব্যাকুলতা, সেই কান্না, এত দিনেও আমি ভুলিতে পারি নাই—তাহার সেই কচি করুণ মুখচ্ছবি আমাব অন্তরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আর একটা কথা, তাহারও. নামের আদ্যক্ষর "সু", আমারও নামের তাই, সেই জন্য আমি মনে করিতাম, বিধাতা বুঝি সুশীলাকেই আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। তাই মাকে বলিলাম, "ও অভিমানী-টভমানী দরকার কি, মা, তার চেয়ে সুশীলাই ভাল।"

মা বলিলেন, "বেশ—তাই হবে।"

সুশীলাকে আমি মনোনীত করায় পিপুলা হইল খালি। পাত্রপক্ষ যথাদিনে পিপুলাকে আসিয়া দেখিয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল। কাকীমা উভয় কন্যার বিবাহ এক দিনেই দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাই হইল। পিপুলাকে যিনি বিবাহ করিলেন, তিনি আমার চেয়ে বছর দুই বয়সে বড়—নাম সরোজনাথ। পাটনায় তাঁহার পিতা জজ আদালতের সেরেস্তাদার—এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর তিনিও পিতার আপিসে চাকরী পাইয়াছেন।

সুশীলার জেঠা দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি আমায় সুশীলা দান করিলেন; কাকা মহাশয় সরোজকে পিপুলো দান করিলেন। কন্যাদানের আসন ও ছাদনাতলা দুইটি হইয়াছিল বটে—পুরোহিতও দুই জন; কিন্তু বাসর ঘর হইল একটিমাত্র। এক বাসরে দুই বর পাইয়া, নিমন্ত্রিতা তরুণীগণ সে দিন আমোদের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন।

আমার অভিপ্রায় ছিল, ফুলশয্যার রাত্রিতে নববধূ আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবা-মাত্র আমি আমোদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিব—"সুশীলা না পিপুলো?"—কিন্তু আনাড়ী আমি জানিতাম না,—সে সময় বধূর সঙ্গে কয়েক জন নিমন্ত্রিতা পুরমহিলাও আসিয়া থাকেন। সুতরাং প্রশ্নটা মুলতুবী রাখিতে হইয়াছিল। শয়নগৃহ নির্জ্জন হইলে, আমি

নববধূরে উভয় স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি গো, তুমি সুশীলা না পিপুলা ?"

যে বর বাল্যকালে কাঁধে চড়াইয়া পেয়ারা খাওয়াইয়াছে এবং যাহাকে কামড়াইয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত করা হইয়াছে—নববধূ হইলেও তাহাকে লজ্জা করা একটু কঠিন বইকি! —সে লজ্জা সুশীলা করিল না—দুষ্টামীর উত্তরে দুষ্টামী করিয়া বলিল, "কাকে পেলে খুসী হও ?"

আমিই বা দুষ্টামী ছাড়িব কেন? বলিলাম, "পিপুলাকে।"

সুশীলা বলিল, "তাকে কাগে নিয়ে গেছে। এখন অর হায় হায় করলে কি হবে বল ?"

সরোজের রঙটা কিছু কাল, তাই সুশীলার এই বক্রোক্তি। পরে শুনিয়াছিলাম, দুই জমাইয়ের দেহবর্ণের পার্থক্য বিষয়ে মেয়ে-মহলে একটু আলোচনাও হইয়াছিল। সকলে বলিয়াছিল—"যেমন দুটি বোন—নিক্তির ওজনে রূপে গুণে সমান—জামাই দুটিও সেই রকম হ'লে বেশ হ'ত!"

তিন

পরবৎসর, আমি আইন পাস করিয়া ভাগলপুরেই ওকালতি সুরু করিলাম।

সুশীলা বেশীর ভাগ আমাদের বাড়ীতেই থাকিত। মাঝে মাঝে "ও-বাড়ী" যাইত। উভয় ভগিনী একত্র হইলে কাকীমা—অধুনা শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী—মেয়ে দুইটিকে পূর্ব্বের ন্যায় আর সমান সাজে সাজাইতেন না। আমি 'আটপৌরে' জামাই—পাছে অজ্ঞাতে কোন গোলমাল করিয়া ফেলি, ইহাই বোধ করি, তাঁহার আশঙ্কা ছিল।

শ্বাশুড়ীর এই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন কিন্তু অধিক দিন রহিল না। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত একদিন সংবাদ আসিল সরোজ পাটনায় হঠাৎ কলেরা রোগে মারা গিয়াছে।

পিপুলা বিধবা-বেশ ধারণ করিয়া শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। যমজ দুই ভগিনীর বেশে এই হৃদয়বিদারক পার্থক্য দর্শনে আত্মীয়বন্ধু সকলেরই চক্ষুতে জল বহিল।

বৎসরখানেক মধ্যে পিতৃদেব বুঝিয়াছিলেন ওকালতি ব্যবসাটি আমার ঠিক উপযোগী নহে; তাই তাঁহার উপদেশে মুন্সেফীর জন্য আমি আবেদন করিয়াছিলাম।

পিপুলার বৈধব্যের পর বৎসরখানেক মধ্যে পাটনা সহরে ভীষণ প্লেগ রোগ দেখা দিল এবং সেই ব্যাধিতে আমার জনক ও জননী এক সপ্তাহের ব্যবধানে, উভয়ে স্বর্গারোহণ করিলেন। এই সর্ব্বনাশে আমি মাসখানেকের উপর জড়পুত্তলিকাবৎ হইয়া রহিলাম। তাহার পর আমার মুন্সেফীতে নিয়োগবার্ত্তা গেজেট হইল। আমি ত প্রথমে উহা প্রত্যাখ্যান করিতেই প্রস্তুত হইয়াছিলাম; কিন্তু শ্বশুর মহাশয় আমায় অনেক করিয়া বুঝাইলেন। ফলে, ঐ পদ আমি গ্রহণ করিলাম। আসবাবপত্র কতক বিক্রয় করিয়া, কতক একটা কামরায় তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া, বাড়ীটা ভাড়া দিয়া, সুশীলাকে লইয়া আমি কর্ম্মস্থান মোতিহারিতে গমন করিলাম।

এই নূতন স্থানে সুশীলার সেবা-যত্নে, পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনে আমার চিত্ত ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। কাজকর্ম্মে আমার সুখ্যাতিও হইল। ছুটিতে ভাগলপুরে যাইতাম, শ্বশুরালয়েই অবস্থিত করিতাম।

সেবার পূজার ছুটিতে গিয়া দেখিলাম, শ্বশুর মহাশয়ের শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ওয়ালটেয়ারে বাড়ীভাড়া লইয়াছেন—মহাপঞ্চমীর দিন যাত্রা করিবেন।

তাহার ইচ্ছা ছিল, পূজার ছুটিটা মাত্র সেখানে যাপন করেন; কিন্তু শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর বিশেষ জেদাজেদিতে বড়দিনের ছুটিটা পর্য্যন্ত সেখানে কাটাইতে সম্মত হইয়াছেন। আমাকেও সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করিলেন, আমিও সহজেই সম্মত হইলাম।

ওয়ালটেয়ারে যে স্থানে আমাদের বাড়ীটি লওয়া হইয়াছিল, তাহা একেবারে ফাঁকা —সহর হইতে মাইলখানেক দূরে হইবে। সেখানে সপ্তাহখানেক থাকিবার পরেই শ্বশুর মহাশয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। প্রাতে ও বৈকালে আমরা বেড়াইতে বাহির হইতাম। এখানে আসিয়াই শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী পিপুলাকে থান ছাড়াইয়া আবার পাড়ওয়ালা কাপড় পরাইলেন, হাতে দুগাছি পাতলা সোণার চুড়ি পরাইয়া দিলেন। এ বিদেশে আর কে আছে যে, দেখিয়া নিন্দা করিবে? ইহাতে মায়ের প্রাণে যদি একটু শান্তিলাভ হয়, এই মনে করিয়া শ্বশুর মহাশয়ও এ কার্য্য অনুমোদন করিলেন।

পূজার এক মাস ছুটি দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া আসিল। মোতিহারিতে ফিরিবার জন্য আমি তল্পিতল্পা বাঁধিতে লাগিলাম। সুশীলা আসিয়া আমায় বলিল, "দেখ, বাবা মার ইচ্ছে, এ দুটো মাস আমি এইখানেই থাকি। তোমাকে তাঁরা ভরসা ক'রে বলতে পারছেন না।"

আমি বলিলাম, "তোমার কি ইচ্ছে, তাই বল।"

সুশীলা বলিল, "আর কিছু নয়,—সেখানে একলা তোমার কষ্ট হবে—নইলে দুটো মাস না হয় আমি থেকেই যেতাম।"

বুঝিলাম সুশীলার মনোগত অভিলাষ, দুই মাস এখানেই পিতামাতার নিকট অবস্থান করে। হাসিয়া বলিলাম "না, আমার তেমন বিশেষ কোনও কষ্ট হবে না। তুমি দু'মাস এখান থেকে, ওঁদের সঙ্গেই ফিরো। আমি একটা রবিবারে ভাগলপুরে এসে তোমায় নিয়ে যাব এখন।"

সুশীলা বলিল, "তবে বাবা-মাকে বলিগে আমায় রেখে যেতে তোমার মত আছে।"

বলিলাম, "তা বলগে।"

চার

যথাসময়ে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলাম।

মোতিহারি জিলায় অনেকগুলি অরণ্য আছে। অরণ্যের সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হইল। আমার প্রেয়সী-হীন গৃহ আর গৃহ বলিয়া মনে হইল না, অরণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

অতি কষ্টে দুই মাস গৃহারণ্যে কাটাইলাম। ৬।৭ দিন অন্তর সুশীলার একখানি পত্র পাইতাম—তাহাতে অরণ্যবাসের ক্লেশ কতকটা লাঘব হইত। কবে বড়দিন আসিবে —কবে আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইব—কবে "মধু গেহ, গেহ বলি মানব"—এই চিন্তাতেই দিনযাপন করিতাম।

পৌষের প্রারম্ভে হঠাৎ শ্বশুর মহাশয়ের একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলাম—"বাবাজী, বড়ই দুঃখের বিষয়, গত শুক্রবার সন্ধ্যার পর তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ হার্টফেল হইয়া পিপুলা মারা গিয়াছে। এই শোকে আমরা পাগলের মত হইয়াছি। কিছুদিন আমরা কাশীধামে গিয়া বাস করিব স্থির করিয়াছি। আগামী রবিবার সন্ধ্যা ৮টার সময় এক্সপ্রেস গাড়ীতে আমরা মোকামা পাস করিব, তুমি যদি কিছু দিনের ছুটি লইয়া আমাদের সঙ্গ লইতে পার, তবেই বড়ই ভাল হয় বাবা! এ শোকের সময় তোমায় কাছে পাইলে আমাদের অনেক সান্ত্বনা। বিশেষ চেষ্টা করিও। এবিষয়ে অধিক আর কি লিখিব।"

পত্রখানা পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনের মধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বাল্যকালে, যমজ ভগিনীর দুইজনের মধ্যে একজনের জ্বর হইলে, অপরটিরও গা গরম হইত। উহারা বড় হইলে সেরূপ আর দেখা যায় নাই বটে,—কিন্তু—ইহা যে মৃত্যু! যদি আমার সুশীলার কিছু হয়, তবে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?

বড়দিনের ছুটি হইতে তখনও ১৫ দিন বিলম্ব আছে। কাছারী গিয়া, জজ সাহেবকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, সোমবার হইতে বড়দিনের বন্ধের দিন পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করাইয়া লইলাম। শ্বশুর মহাশয়কে সেই মর্ম্মে তারও করিয়া দিলাম।

যথাদিনে আমি মোকামা ষ্টেশনে শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সেকেণ্ড ক্লাসের একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া যাইতেছিলেন, আমিও সেই কামরায় উঠিলাম। শ্বাশুড়ী আমাকে দেখিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুশীলাও ঘোমটার ভিতর ফোঁপাইতেছে—বুঝিতে পারিলাম। বড় ইচ্ছা হইল, তাহার হাতটি ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনার কথা বলি; তাহার চোখ মুছাইয়া দিই; কিন্তু শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সমক্ষে তাহা করিবার উপায় নাই। শ্বশুর মহাশয় চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিপুলার পীড়া ও চিকিৎসার কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

দানাপুর ষ্টেশনে ট্রেণ পেঁছিলে, লুচি প্রভৃতি খাবার কেনা হইল। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন , "সুশীলা, দেখ ত মা, ঐ ব্যাগের মধ্যে পাণের কৌটায় সাজা পাণ আর আছে কি না? না থাকে ত কিনতে হবে।"—সুশীলা উঠিয়া, ব্যাগ হইতে পাণের কৌটা বাহির করিয়া, তাহা খুলিয়া পিতাকে দেখাইল—কৌটাটি শূন্য। পাণের খিলিও কেনা হইল।

শ্বাশুড়ী, দুইটি শালপাতায়, আমাদের দুইজনকে খাবার দিয়া বলিলেন, "সুশীলা, সোরাই থেকে ওঁদের দু' গ্লাস জল গড়িয়ে দাও ত মা।"

সুশীলা উঠিয়া জল গড়াইয়া দিল। আমরা আহার শেষ করিলাম। হাত ধুইয়া, পাণ খাইয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। শ্বশুর শাশুড়ী দুজনেই মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। সুশীলা এখন আর কাঁদিতেছে না। একবার যদি চোখো-চোখি হয়, এই আশায় আমি সুশীলার পানে মাঝে মাঝে চাহিতে লাগিলাম,—কিন্তু সে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। তখন হঠাৎ মনে পড়িল, আমি রহিয়াছি বলিয়া সুশীলা বা শ্বাশুড়ী কেহই খাইতে পারিতেছেন না। আরা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমি শ্বশুর মহাশয়কে বলিলাম, "আমি তবে এখন ও কামরাটায় গিয়ে শুইগে।"—আমার বিছানার বাণ্ডিলটি বগলে করিয়া, আমি নামিয়া গেলাম।

পাঁচ

পরদিন কাশীধামে পেঁছিয়া আমরা এক "যাত্রাওয়ালা"র বাড়ীতে উঠিলাম। দুই-খানি ঘর ভাড়া লওয়া হইল। এখানে ২।১ দিন থাকিয়া, একটি বাড়ী খুঁজিয়া লইবার পরামর্শ ছিল।

বাসায় জিনিষপত্র রাখিয়া ধুলাপায়ে গঙ্গাস্নান এবং বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে বাহির হওয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া পাকাদি সমাপন হইতে অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইল। আহারান্তে বিশ্রাম। শ্বশুর মহাশয় ও আমি একটি কক্ষে শয়ন করিলাম, সুশীলাকে লইয়া শ্বাশুড়ী অপর কক্ষে রহিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে সন্ধ্যার সময় উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, আমরা তিনজনে বিশ্বনাথের আরতি দর্শনে বাহির হইলাম। ফিরিয়া আর পাকাদির উদ্যোগ হইল না, বাজার হইতে লুচি, আলুর দম, রাবড়ী প্রভৃতি আনাইয়া তাহার দ্বারা জলযোগ সম্পন্ন হইল।

আহারান্তে ধূমসেবন করিতে করিতে শ্বশুর মহাশয় আমার সহিত গল্প করিতে

লাগিলেন। আমি মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখিতেছি এতক্ষণ বোধ হয় সুশীলা ও শ্বাশুড়ীর খাওয়া হইল। এইবার বোধ হয়, শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া ও ঘরে যাইবেন এবং সুশীলাকে এ ঘরে পাঠাইয়া দিবেন। সুশীলার সঙ্গে দেখা করিবার—তাহার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য আমি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক রাত এক দিন এত কাছাকাছি দুজনে রহিয়াছি—অথচ দেখা-সাক্ষাৎ নাই। একবার মাত্র—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নানের সময় আমি সুশীলার মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম। দু'জনে চোখো-চোখি হইয়াছিল —কান্নায় ফোলা সে চোখ দুটি, আমার চক্ষুর সহিত মিলিত হইবামাত্র সুশীলা মুখখানি নামাইয়া লইয়াছিল। সুশীলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আদর করিবার জন্য আমার প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল।

রাত্রি প্রায় যখন ১০টা, শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাদের কক্ষে আসিলেন। পাণ আনিয়াছিলেন, তাহা রাখিয়া বলিলেন, "তোমরা তা হ'লে শোও এখন দোর বন্ধ ক'রে।"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরাও শোওগে, রাত হ'ল।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "বাড়ীর কি হ'ল?"

শ্বশুর উত্তর দিলেন, "যাত্রাওয়ালা বললে, তার সন্ধানে দু'তিনখানি বাড়ী খালি আছে। কাল সকালে সেগুলো দেখাবে। তার পর যেটা পছন্দ হয়।"

"আচ্ছা"—বলিয়া শ্বাশুড়ী প্রস্থান করিলেন। শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া দ্বারে খিল লাগাইয়া দিলেন।

আমি পিছু ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। মনে মনে বড়ই চটিয়া গিয়াছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই শ্বশুর মহাশয়ের নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল। আমার কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি নিদ্রা হইল না। অবশেষে এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম,—ধুত্তোর কাশীর কাঁথায় আগুন! এখানে কি সবই উল্‌টো? বিশ্বনাথের মন্দির আলাদা, অন্নপূর্ণার মন্দির আলাদা—আমারই বা দুঃখ করলে চলবে কেন?—অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, যাত্রাওয়ালার সঙ্গে আমরা বাড়ী দেখিতে গেলাম। নদীয়া ছত্রে একটি বাড়ী আমাদের বেশ পছন্দ হইল। তখনই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘরটি আমার শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। যাত্রাওয়ালা একজন চাকর ও একজন ঝি ঠিক করিয়া দিবার ভার লইল।

সেখান হইতে ফিরিয়া, গঙ্গাস্নানান্তে দেবদর্শনাদি সারিয়া, যাত্রাওয়ালার বাসায় আসিয়া আহারাদি করিলাম। বিশ্রামান্তে বিকালে নূতন বাসায় উঠিয়া যাওয়া গেল। বহুকাল বিচ্ছেদের পর আজ আমার সুশীলাকে পাইব জানিয়া মনে মনে বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম করিলাম।—আমার এই প্রণামটি লইয়া, বাবা বিশ্বনাথ বোধ হয় হাসিয়াছিলেন।

আরতি দেখিয়া আসিয়া, নৈশ ভোজন সমাপনান্তে যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম, রাত্রি তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। অধীর আবেগে আমি সুশীলার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর ধীরপদক্ষেপে সুশীলা আসিয়া প্রবেশ করিল। ধীরে দ্বারটি ভেজাইয়া দিল। জন্মদরিদ্র ব্যক্তি সহসা মহারত্ন লাভ করিলে যেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, আমারও অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়া পড়িল,—আমার মুখ দিয়া হঠাৎ সেই পুরাতন রসিকতা বাহির হইয়া পড়িল—"সুশীলা না পিপুলো?"—কথাগুলি উচ্চারণমাত্র সকল কথা আমার মনে পড়িল—আমি মরমে মরিয়া গেলাম। ছি ছি আমি কি একটা মানুষ, না পশু?

মেঝের উপর আমার বিছানা পাতা ছিল। সুশীলা সজল নয়নে ধীরে ধীরে বিছানার দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু বিছানায় আসিল না; কিছু দূরে, মেঝের উপর বসিয়া

রহিল। আমি বলিলাম, "আমার মাফ কর সুশীলা, আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। পিপুলো আজ নেই—আজ ওরকম রসিকতা করা আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে!"—বলিয়া তাহাকে টানিয়া বিছানায় লইবার জন্য বাহু বাড়াইলাম।

সুশীলা হঠাৎ দূরে সরিয়া বলিল, "আমায় ছুঁয়ো না।"

তাহার এই ভাব দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, আমি তোমায় ছোঁব না কেন সুশীলা?"

উত্তর—"আমার পানে বেশ ক'রে চেয়ে দেখ দেখি—আমি কি তোমার সুশীলা?"

তাহার মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভয়ে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল। বলিলাম, "নিশ্চয়ই তুমি আমার সুশীলা।"

উত্তর পাইলাম—"না, আমি তোমার সুশীলা নই। তোমার সুশীলাকে ওয়ালটেয়ারে চিতার আগুনে পুড়িয়ে এসেছি। আমি হতভাগিনী পিপুলো।"—বলিয়া সে চোখে অঞ্চল দিল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কক্ষচ্যুত হইয়া যেন আমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। আমি নারায়ণ স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদিলাম। আমার দেহ কাঁপিতে লাগিল। আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না—শয্যায় এলাইয়া পড়িলাম।

প্রায় পাঁচ মিনিটকাল এইরূপ বিহ্বল হইয়া ছিলাম। তাহার পর আবার চক্ষু খুলিলাম। একদৃষ্টে সুশীলা বা পিপুলো যেই হোক—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।—সুশীলাই ত—কে বলিল পিপুলো? অন্যে দুইজনের পার্থক্য বুঝিতে না পারুক—যাহার সঙ্গে আমি ছয় বৎসর ঘর করিয়াছি—তাহার সম্বন্ধে আমারও কি ভ্রম হওয়া সম্ভব? বলিলাম, "তোমার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সুশীলা?"

"পরিহাস নয়। সত্যিই সুশীলাকে যমে নিয়ে গেছে।"

"তবে যে বাবা আমাকে লিখেছিলেন, পিপুলো মারা গেছে।"

"বাবার তখন মাথার ঠিক ছিল না, তাই ওরকম লিখেছিলেন।"

"কি বল তুমি?"

"যা সত্য ঘটনা, তাই আমি তোমায় বলছি। সুশীলাকে পুড়িয়ে এসে, পরদিন বাবা মাকে বললেন—এখানে আমাদের কেউ চেনে না—সুশীলা মরেনি, হতভাগিনী পিপুলোই মরেছে। এ বয়সে পিপুলোর বৈধব্যবেশ আমি চোখে দেখতে পারছিলাম না—দিন-রাত আমার বুকে চিতার আগুন জ্বলছিল। আজ থেকে ও আর পিপুলো নয়, ও সুশীলা—ও গিয়ে ওর স্বামীর ঘর করুক।"

আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, না জাগিয়া আছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বলিলাম, "মা শুনে কি বললেন?"

"মা বললেন, ছি ছি, তাও কি হয়? পিপুলো সুশীলা সেজে গিয়ে স্বামীর ঘর করবে কি? জামাই কি এ জাল ধরতে পারবে না? বাইরের লোক না পারুক, তুমি আমি যেমন ঠিক চিনি কোন্‌টি পিপুলো, জামাইও নিশ্চয় সেই রকম চিনবে যে, এ সুশীলা নয়। তখন কি উপায় হবে? আর যদি ধর, জামাই চিনতে না-ও পারে, —হিঁদুর মেয়ের পরলোক ব'লেও ত একটা জিনিষ আছে? জালিয়াতী ক'রে, ইহলোকে দু'দিন না হয় পিপুলো সুখভোগ ক'রে নিলে। তারপর—পরলোকে কি উপায় হবে?"—বলিয়া পিপুলো চুপ করিল।

আমি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলাম, "তারপর?"

"তারপর বাবা বললেন, 'আমি তোমাদের ও সব পরলোক-ফরলোক মানিনে।' মা বললেন, 'তা না মানতে পার, কিন্তু মানুষে মানুষে সত্য ব্যবহার আর জালজুয়াচুরির

মধ্যে কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম—তা ত মান?' বাবা বললেন, 'তা মানি বটে।' শেষকালে বাবাতে মায়েতে পরামর্শ হ'ল স্ত্রীবিয়োগ হ'লে অনেকেই ত ছোট শালীকে বিয়ে করে। এই কাশীতে অনেক তান্ত্রিক সাধক, অনেক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের মধ্যে এক রকম বিবাহ প্রচলিত আছে তার নাম শৈব বিবাহ। তোমার মত ক'রে, এখানে তোমাতে আমাতে শৈব বিবাহ দেওয়ার জন্যেই বাবার কাশী আসা। তোমার এ বিষয়ে মত কি, তাই জানবার জন্যে বাবা মা আমায় আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না—চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। কে এ? কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছি? সুশীলা এ নয়, কে বলিল? সুশীলা আর পিপুলা—কোন্‌টি কে? তফাৎই বা কি? এ ত ঠিক আমার সেই সুশীলার মতই কথাবার্ত্তা কহিতেছে। "আমি পিপুলা"—এ কথা না বলিলে, আমি ত ইহাকে সুশীলা বলিয়াই গ্রহণ করিতাম।

চোখ খুলিলাম। পিপুলা সেই ভাবেই বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি বড় বিষন্ন। আমি তাহাকে গ্রহণ করিব, না প্রত্যাখ্যান করিব—এই সংশয়েই কি?

বলিলাম, "আচ্ছা, তোমার মত কি বল?"

পিপুলা বলিল, "আমি জানিনে।"—বলিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই সেই উঠিয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তাহ পরে, অতি গোপনে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে আমাদের উভয়ের শৈব বিবাহ হইল। পুরোহিত হইলেন, নদীয়াছত্র নিবাসী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রথম মিলন-রাত্রিতে পিপুলা বলিল, "মনে আছে তোমার? ছেলেবেলায় আমরা দু' বোনেই তোমায় বিয়ে করবার জন্যে কে'দেছিলাম—তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?"

আমি বলিলাম, "মনে আছে। বলেছিলাম, কাঁদিসনে—আমি তোদের দুজনকেই বিয়ে করবো।"

পিপুলা বলিল, "তাই করলে, তবে ছাড়লে!"

পিপুলার নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল। যাহাকে বিবাহ করিলাম—জনসমাজে সে-ই সুশীলা বলিয়া পরিচিত হইল।

আমাদের একটি কন্যা জন্মিয়াছে। তাহার বিবাহের সময় কি হইবে, এই সমস্যা মাঝে মাঝে মনে উদয় হয়।

ঠকাইয়া কাহাকেও মেয়ে দিব না। যাহাকে পাত্র নির্ব্বাচন করিব, আসল কথা সমস্তই তাহাকে খুলিয়া বলিব। সুতরাং একটি উচ্চশিক্ষিত উদারমতাবলম্বী সুপাত্রের প্রয়োজন। তবে এখনও তাহার দেরী আছে। কন্যাটি আমার দেড় বৎসরের মাত্র।

ভুল

সন্ধ্যাকালে, একজন সপ্তবিংশতি বর্ষীয় যুবক এবং দ্বাবিংশতি বর্ষীয়া একটি যুবতী, ইডেন গার্ডেনের একটি জনবিরল এবং প্রায়ান্ধকার অংশে, জলের ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিল। উভয়েই বাঙ্গালী, তবে যুবকের অঙ্গে ইংরাজি পরিচ্ছদ এবং যুবতীর পরিধানে শাড়ী ব্লাউজ, কিন্তু পদদ্বয় জুতা মোজায় আবৃত। ইহারা উভয়েই রোমান

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান। যুবকের নাম সরোজ রায় এবং যুবতীর নাম লিলি বা লীলাবতী সান্যাল।

সরোজ বলিল, "কতদিন আর তুমি আমায় আশায় আশায় রাখবে লীলা? আমি যে তোমায় কত ভালবাসি, তা কি আজও তুমি বুঝতে পারনি?—আমার ভালবাসায়, আজও কি তোমার সন্দেহ আছে?"

লীলা অন্ধকার জলের পানে চাহিয়া, মৃদুস্বরে বলিল, "না, সন্দেহ নেই সরোজ—কিন্তু—"

সরোজ মিনতির স্বরে বলিল, "কিন্তু—কি, বল? কেন তুমি আমায় নিতে রাজি হচ্ছ না?"

লীলা বিষন্ন স্বরে বলিল, "তুমি জান সরোজ, আমি তোমায় ভালবাসি!"

"তবে—তবে কেন আপত্তি লীলা? তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি, তবে আর আমাদের মিলনে বাধা কি? আমার আয় কম বলে? বিবাহ করলে, সে আয়ে, আমরা ভদ্রভাবে, স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপন করতে পারবো না, এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তবে আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি। তোমায় ত বলেছি, আপিসের বড়সাহেব আমায় পাকা কথা দিয়েছেন, হেডক্লার্কবাবু পেন্সন নিলেই সেই পদে তিনি আমায় পাকা ক'রে দেবেন। আর বড় জোর বছরখানেক,—পেন্সন তাঁকে নিতেই হবে—আর এক্সটেন্সন তিনি পাবেন না। তখন আমার ২৫০, টাকা মাইনে হবে সে টাকায় কি এই কলকাতা সহরে আমরা ভদ্রভাবে গৃহস্থালী পেতে বসতে পারবো না?"

লীলা বলিল, "তা কেন পারবো না—তবে—"

"তবে, কি বল? ঈশ্বর যদি আমাদের সন্তানাদি দেন, তবে ঐ আয়েও সুশৃঙ্খলে আমাদের চলবে না এই তোমার আপত্তি? অবশ্য, ছেলেমেয়েদের দামী দামী পোষাক পরিয়ে, ঘরের মোটরকারে চড়িয়ে তাদের দামী স্কুলে পাঠানো চলবে না বটে। কিন্তু সন্তানের শিক্ষার জন্যে এটা নইলে কি চলে না? আমার বাবাও গরীব ছিলেন, তাঁর বড় বাড়ী, মোটরগাড়ী এ সব কিছুই ছিল না, অথচ আমাদের দুই ভাই, তিন বোনকে তিনি সুশিক্ষিতই করতে পেরেছিলেন—তিনটির মধ্যে একটি মেয়ের ভাল বরে বিবাহও দিয়ে গেছেন। গৃহস্থালী ভাবে জীবন যাপন করা, গৃহস্থালী ভাবে ছেলেমেয়ে মানুষ করা এতে এমন কি কষ্ট বা অপমান, লীলা?"

লীলা বলিল, "তুমি ত জান সরোজ—আমিও গরীবের মেয়ে—গৃহস্থালী ভাবেই মানুষ হয়েছি;—আমার বিবাহিত জীবনে ও আমার ছেলেমেয়ের জন্যে বড় বাড়ী, মোটরগাড়ী—এ সব কিছুরই আবশ্যক আছে ব'লে আমি মনে করি না। তুমি অনেক দিন থেকেই আমায় পীড়াপীড়ি করছ—আমি রাজি হইনি—তোমায় যথেষ্ট ভালবাসি না, বা তোমায় আমার যোগ্যপাত্র বলে মনে করি না ব'লে নয়। ঈশ্বর জানেন, আমি তোমায় কত ভালবাসি। জগৎ জানেন, বরং আমিই তোমার যোগ্য পাত্রী নই; বেশী লেখাপড়া শিখতে পারিনি—ক্যাম্বেলের প্লাস করা লেডি ডাক্তার মাত্র—রূপ নেই—কালো আমি; তুমি আমাকে বিবাহ করবার জন্যে আগ্রহ করছ—এ ত আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমি যে কেন রাজি হতে পারছিনে, তা আজ তোমায় বলি। তুমি জান, আমার মা নেই; ভাই বোন কেউ নেই;—আমার বাবা অথর্ব্ব হয়েছেন, একান্ত অসহায়—আমি বিয়ে ক'রে স্বামীর ঘরে গেলে, আমার বাবাকে কে দেখবে শুনবে—কে তাঁর সেবা করবে? সেই কারণেই আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হতে পারিনে সরোজ—অন্য কোনও কারণ নেই।" —বলিয়া লীলা চুপ করিল।

সরোজও প্রায় এক মিনিট কাল নীরব রহিল। তারপর সে সন্তর্পণে লীলার একখানি হস্ত নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া বলিল, "এই মাত্র তোমার আপত্তি, লীলা? তা

তুমি এতদিন কেন আমায় বলনি—তা হলে ত এর মীমাংসা অনেক দিন আগেই হয়ে যেতে পারত। তোমাকে বিবাহ ক'রে আমি একদিন সুখী হব—আমাদের ভবিষ্যৎ ঘরকন্নার একটি ছবি, এমন দিন নেই যে আমি কল্পনায় চিত্রিত করিনি; কিন্তু সে চিত্র থেকে তোমার বাবাকে আমি-ত কোনও দিনই বাদ দিয়ে দেখিনি। তোমার বাবার কাছ থেকে তোমায় আমি ছিনিয়ে নিয়ে সংসার পাতবো—এমন হৃদয়হীন আমি ত নই লীলা! —তাঁকে আমাদের সংসারে নিয়ে এসে, আমাদেব মাথার মণি করে রাখবো। তুমি একা তাঁর সেবা যত্ন করে থাক—আমরা দু'জনে মিলে কববো।—তা হলে, আর ত কোনও বাধা নেই লীলা ?"

লীলা বলিল, "কিন্তু তুমি ত জান সরোজ, তিনি বড়ই স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ। তিনি যে জামাইয়ের সংসারে ভাব বোঝা হয়ে বাস করতে রাজি হবেন, এমন ত মনে করা যায় না!"

"আমি কি হাতে পায়ে ধ'রেও তাঁকে রাজি করতে পারবো না ?"

"আশা কম। তুমি তাঁকে ব'লে দেখতে পাব। একটা কথা বলি, তুমি মনে কিছু দুঃখ কোর না সরোজ—তুমি যদি মাসে মাসে তাঁকে সম্পূর্ণ খরচ তাঁর কাছে নিতে স্বীকৃত হও, তা'হলে তুমি আমি দুজনে মিলে তাঁব হাতে পায়ে ধরে হয়ত তাঁকে রাজি করতেও পারি।"

সরোজ বলিল, 'ঐ সর্ত্তে ভিন্ন তিনি যদি রাজি না-ই হন, তা হলে অগত্যা তাই হবে। দেখ, সকল বাধাই ত ঘুচে গেল, এবার তুমি বল লীলা, তুমি আমায় গ্রহণ করবে। আমাকে আর সংশয়ের মধ্যে ফেলে রেখ না—আমাকে সুখী কর।"

লীলা বলিল, "আমাকে পেলে যদি তুমি সুখী হও—তা হলে তা হলে—আমাকে নাও তুমি।"

ষোল-আনা লওয়া. গির্জ্জায ভিন্ন অপর কোথাও ত সম্ভব নয়। তাই, আপাততঃ সরোজ বায়না লইল—লীলাকে বুকে জড়াইয়া, তাহাকে চুম্বন করিল। আজ ছয় মাসের অধিককাল, উভয়ে উভয়ের মন জানিয়াছে—উভয়ের এরূপ নিভৃত ও দীর্ঘকাল সাক্ষাতের সুযোগও বহুবার হইয়াছে—কিন্তু সরোজ বাক্যে ভিন্ন, লীলার সহিত প্রণয়িজনোচিত ব্যবহার কোনও দিন করে নাই—তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি, তাহার ভদ্রতা জ্ঞান, লেশমাত্র অসংযম হইতে এতদিন তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

তারপর এবিষয়ে দু'জনে আলোচনা হইল। লীলার পিতা যখন ইহাদের অর্থের উপর কিছু মাত্রও ভাগ বসাইতে সম্মত নহেন—সবোজ যাহা বেতন পায়, এবং লীলা চিকিৎসা ব্যবসায়ে যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতে, ব্যয়বাহুল্য না করিয়া, সস্তা অঞ্চলে একখানি ছোটখাট বাড়ী লইয়া সাধারণ ভদ্রগৃহস্থের মত থাকিলে এখনই এ দুটি প্রাণী, সম্মিলিত জীবন যাপন করিতে পারে। য়ুরোপীয় সমাজে, বিবাহের দিনটি স্থির করিবার ভার একমাত্র "কনে"র উপর;—তদনুসারে সুখমিলনের সেই দিনটি যত শীঘ্র সম্ভব নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সরোজ লীলাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। লীলা বলিল, "আচ্ছা তাই হবে গো হবে! বাবার কাছে আগে সব কথা বলি। কাল সকালে তুমি আমাদের বাড়ী আসছ ত, সেই সময় শুনতে পাবে।"

সরোজ বলিল, "আচ্ছা লীলা আমি এক কাজ করি। এখনি তোমাদের বাড়ী যাই চল না। আমি বরং নীচে লুকিয়ে বসে থাকবো এখন; বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করে এক মিনিটের জন্যে তুমি এসে আমায় ব'লে যাবে।"

লীলা বলিল, "না না সে কি হয় ? কাল সকালে এসে তুমি শুনবে। তোমার যে আর দেরী সইচে না দেখছি!"

"মানুষের সহন শক্তির একটা সীমা ত আছে ? আর কত সওয়া যায় বল!"—বলিয়া

সরোজ প্রিয়তমার ওষ্ঠে একটি এবং উভয় গণ্ডে দুইটি চুম্বন করিল।

"লোভী বালক!"—বলিয়া লীলা সরোজের বাহুতে মৃদুচপেটাঘাত করিয়া বলিল, "আটটা বাজে বোধ হয়। এখন ওঠা যাক চল। আমি বাড়ী গিয়ে তবে বাবার খাবার ঠিক করবো।"

দুজনে তখন উঠিয়া, গেটের দিকে চলিল। বাহির হইয়া, উভয়ে কালীঘাটগামী ট্রামে উঠিল। এলগিন রোডের মোড়ে নামিয়া, লীলাকে তাহার গৃহদ্বার অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া, সরোজ নিজের বাসায় গেল। উভয়েরই বাসা কাছাকাছি।

সরোজের এই বাসায় আরও ২।৩ জন খৃষ্টীয় যুবক বাস করেন—মেসেরই মত। সরোজ নিজ বাসায় গিয়া ভৃত্যের নিকট শুনিল তাহার জন্য একখানি টেলিগ্রাম অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মা ও ভাইয়েরা আসানসোলে থাকেন, ভাবিল, হয়ত তাঁহাদেরই কাহারও কোনও অসুখ বিসুখ হইয়াছে। তাড়াতাড়ি নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া, টেবিলের উপর হইতে, হলুদবর্ণ খামখানি ছিঁড়িয়া টেলিগ্রামটি পড়িল। একবার—দুইবার—তিনবার পড়িল। উহা বোম্বাই হইতে আসিতেছে—জার্ম্মাণ লটারির এজেণ্ট তার করিয়াছেন—

"আপনার ক্রীত টিকিটখানি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং প্রাইজ লাভ করিয়াছে আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

"পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড! সাড়ে—সাত—লক্ষ—টাকা! সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।"—বিড় বিড় করিয়া এই কথা দুই তিন বার উচ্চারণ করিবার পরই, সরোজ সংজ্ঞা হারাইয়া সেইখানেই ভূমিশায়ী হইল।

"ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া"—বলিয়া ভৃত্য চীৎকার করিয়া উঠিল। পাশের ঘরের মিষ্টার ঘোষাল ছুটিয়া আসিলেন। ভূপতিত সরোজের হাত হইতে টেলিগ্রামখানি লইয়া পাঠ করিয়া মুহূর্ত্ত মাত্রে সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বাড়ীর সামনেই রাস্তার অপর পারে বরফের দোকান ছিল, ভৃত্যকে বরফ আনিতে ছুটাইয়া, অন্য একজনকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই সরোজের জামা প্রভৃতি খুলিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া, তাহার মাথায় বরফ প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিল। ভোরবেলায় ডাক্তার বলিলেন, "আর কোনও ভয় নাই।"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। মিষ্টার ঘোষাল ফী কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার উত্তর দিলেন, "থাক্—উনি ভাল হয়ে উঠুন, ওঁর কাছেই ফী নেবো এখন। আমি বাড়ী গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়েই আবার আসছি।" বলা বাহুল্য রোগের কারণ স্বরূপ টেলিগ্রামখানি ডাক্তারবাবু স্বচক্ষে পাঠ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লীলার পিতা শ্রীযুক্ত হরিনাথ সান্যাল মহাশয়ের বয়স ৬০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক সময় তিনি একজন বলশালী পুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। নাটোর টীমে ক্রিকেট খেলিয়া খুব নামও করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি—এখন তিনি বাতে পঙ্গু, চোখেও আর ভাল দেখিতে পান না। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিতেন। এমন কিছু বড় চাকরি নয়—ফিনান্স দপ্তরে কেরাণীগিরি করিতেন,—শেষ পর্য্যন্ত ১৫০৲ টাকা বেতন হইয়াছিল,—এখন পঁচাত্তরটি টাকা মাসে পেন্সন পান। তাঁর সহধর্ম্মিণী ১০ বৎসর পূর্ব্বেই গত হইয়াছেন। একমাত্র লীলা ছাড়া, আর কোনও সন্তান তাঁহার জীবিত নাই। সুতরাং এই কন্যাই সংসারে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ও একমাত্র বন্ধন।

কলেজে পাঠদশাতেই হরিনাথ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়—নিজ নামটিরও পরিবর্ত্তন করিয়া মিষ্টার হ্যারি স্যাণ্ডেল হইয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিয়া ও ফী দিয়া, এই নাম-পরিবর্ত্তন পাকা করিয়া লইয়াছিলেন। সরকারী কাগজপত্রে এখনও তাঁহার নাম হ্যারি স্যাণ্ডেল—ঐ নাম সহি করিয়া মাসে মাসে পেন্সনের টাকা আনিয়া থাকেন, কিন্তু চিঠিপত্র লিখিতে এখন তিনি শ্রীহরিনাথ সান্যাল স্বাক্ষর করেন। বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৫ সালে দেশে যখন স্বদেশী ভাবের বন্যা বহিল, তখন হইতেই তাঁহার এই মতি পরিবর্ত্তন। ধর্ম্ম, মানুষের অন্তরের জিনিষ, অপর কাহারও সহিত এ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই—যার মনের যা বিশ্বাস তাই তার ধর্ম্ম—কিন্তু জাতীয়তা যে জন্মগত। খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করেন বলিয়াই তাঁহাকে যে "সাহেব" হইতে হইবে এমন কোন কথা ত নাই-ই, বরং তাহা হইতে চেষ্টা করাই স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহিতা। একদিন কৌতূহলবশতঃ স্যাণ্ডেল সাহেব কলেজ স্কোয়ারে বিপিন পালের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া রুমালে চোখের জল মুছিয়া, গোলদীঘি হইতে বাহির হইয়া সোজা তিনি ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটীর কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করেন এবং পকেটে যে কয়টি টাকা ছিল, তাহা দিয়া মিলের ধুতি ও শাড়ী ক্রয় করিয়া বাড়ী আসেন। বহুকাল যাবৎ তিনি ধুতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—বাড়ীতে পায়জামা সুটই ব্যবহার করিতেন। সেদিন, আপিসের ইংরাজি পোষাক ছাড়িয়া, নূতন ধুতি একখানি পরিধান করিলেন। ভাবের আবেশে, সেই কোরা ধুতির গন্ধটিও যেন তাঁহার আতর গোলাপের তুল্য মনে হইল। মিসেস স্যাণ্ডেল অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই—বাড়ীতে বিলাতী ও বাহিরে যাইতে হইলে দেশী শাড়ী পরিতেন। স্বামীর অনুরোধে তিনিও বিলাতীর পরিবর্ত্তে স্বদেশী মিলের শাড়ী ধরিলেন। পাঁচ বছরের মেয়ে লীলার নাম ছিল তখন লিলি—বা লিলু—তাহাকে হরিবাবু লীলাবতী করিলেন। পিতাকে সে ড্যাডি ও মাতাকে মম্মি বলিত, তাহাকে বাবা মা বলিতে শিখাইলেন। টেবিল চেয়ারের পরিবর্ত্তে কম্বলের আসন পাতিয়া ভাত খাওয়া প্রচলিত হইল। জীবনযাত্রা প্রণালীতে দেশীয় প্রথা অবলম্বনে কিছু ব্যয়লাঘবও হইল।

একে মেয়েটি কালো, তায় তাঁর নিজের তেমন অর্থ-সামর্থ্য নাই—বিবাহের জন্য ভাল ঘর বর যুটিবে কি না তাহা ঈশ্বরই জানেন—না যদি জোটে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে মেয়েটা কষ্টে না পড়ে, এই মনে করিয়া, হরিনাথবাবু তাহাকে ডাক্তারি পড়িবার জন্য ক্যাম্বেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। লীলা আজ দুই বৎসর হইল ক্যাম্বেল হইতে পাস করিয়া বাহির হইয়াছে। মেয়ের প্রাকটিসের সুবিধার জন্য হরিনাথবাবু গলিমধ্যে পূর্ব্ব বাসা ত্যাগ করিয়া এলগিন রোডে উঠিয়া আসিলেন। এই দুই বৎসরেই লীলা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বয়সও কম, ব্যবসায়েও নূতন ব্রতী, তাই লোকে এখনও তাহার চিকিৎসার প্রতি তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। তবে চিকিৎসায় যত হউক না হউক, ধাত্রীবিদ্যা ও প্রসূতি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে লীলার বেশ সুনামই হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ণিত যুবক সরোজ রায়ের সহিত ইহাদের পরিচয় এক বৎসর মাত্র। সরোজ পূর্ব্বে ইটালিতে বাস করিত—এ পাড়ায় সে উঠিয়া আসার পর আলাপ পরিচয়ের সূত্রপাত। যুবকটিকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র দেখিয়া, হরিনাথবাবু তাঁহাকে আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। মাসকয়েক মধ্যেই সরোজ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, লীলাকে বিবাহ করিবার বাসনা জানায় ও তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করে। হরিনাথ আহ্লাদের সহিত সে সম্মতি প্রদান করিয়া বলেন, "বেশ ত বাবা, লীলা যদি রাজি হয়, আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। তুমি তার মন পাবার জন্যে চেষ্টা কর।"—অসাধ্য সাধন সরোজকে করিতে হইবে না ইহা বুড়া বিলক্ষণ জানিতেন। সরোজের প্রসঙ্গ উঠিবা-

আর লীলা কেমন আগ্রহ ভরে তাহা শ্রবণ করে, কোনও দিন তার আসিবার কথা আছে কিন্তু আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিলে কিরূপ অধীর হইয়া ঘর বাহির করিতে থাকে, এবং আসিলে কিরূপ আনন্দ-বিহ্বল হইয়া উঠে, ক্ষীণ দৃষ্টি সত্ত্বেও এ সকল তাঁহার চক্ষু এড়ায় নাই।

অতঃপর, সরোজ লীলাকে লইয়া কোথাও বেড়াইতে যাইতে চাহিলে, কিংবা ইংরাজি থিয়েটার বা বায়োস্কোপের বৈকালিক অভিনয়ে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, হরিনাথবাবু প্রসন্ন মনে সম্মতি দিতে লাগিলেন। সরোজ অন্যদিন ত আসেই—প্রতি রবিবারে নিয়মিতভাবে এখানে আসে এবং ইঁহাদের সঙ্গে একত্র গির্জ্জায় যায়।

মাস দুই পরে একদিন হরিনাথবাবু কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাঁ মা, সরোজ কি তোকে কোনও কথা বলে?"

হাজার হোক বাঙ্গালীর মেয়ে, পিতার প্রশ্নের মর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিয়াও লীলা নেকা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা বাবা?"

হরিনাথ বলিলেন, "সরোজ আমার কাছে পূর্ব্বে বলেছিল, তোকে সে বিয়ে করতে চায়। তোর কাছে সে রকম প্রস্তাব সে করেছে?"

লীলা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল, "ওঃ—সে কথা ত মাঝে মাঝে বলেন। আমি রাজী হইনি, বাবা।"

"কেন মা, সরোজ ত বেশ ছেলে। কেমন ভদ্র, কেমন শিক্ষিত, কেমন সচ্চরিত্র—চাকরিতেও সুনাম করেছে, ক্রমে উন্নতিও হবে, তবে কেন তুই আপত্তি করেছিস?"

"হ্যাঁ বাবা, আমি কি তোমার এতই ভার বোঝা হয়েছি যে তুমি আমায় বিদায় করতে চাও?"

হরিনাথ আদরে কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভার বোঝা তুই কেন হবি, মা? বরং তুই মেয়ে হয়েও আমার ছেলের কাজ করছিস। যে ক'টি টাকা পেন্সন পাই তাতে ত আমাদের সব খরচ কুলোয় না,—নিজের উপার্জ্জনের টাকা তাতে যোগ করে তুই সংসার চালাচ্ছিস। তা নয়; কিন্তু মা, আমি, ত বুড়ো হয়েছি, আমি আর কদিন? আমার অভাব হলে, কে তোকে দেখবে শুনবে, কাকে আশ্রয় ক'রে তুই জীবন কাটাবি? তাই আমার সাধ, আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তোর একটা কিনারা দেখে যাই। আমি আর ক'দিন বল্?"

লীলা রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "ঐ সব অমঙ্গলের কথা তুমি খালি খালি আমায় কেন বল বাবা? তুমি কি ভাব ঐ সব শুনতে আমার বড় মিষ্টি লাগে?"

হরিনাথবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, ও কথা না হয় আর নাই বললাম। কিন্তু তুই সংসারী হবি, তোর ছেলেমেয়ে হবে—সে সব দেখতে কি আমার সাধ হয় না রে? বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে দেখিস।"

সেদিন এ প্রসঙ্গ এই পর্য্যন্তই শেষ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে হরিনাথবাবু কথাটা পাড়িতেন, লীলার কিন্তু সেই একই উত্তর—"আমি চ'লে গেলে তোমার সেবা কে করবে বাবা?"

আজ পিতাকে আহার করাইয়া, তাঁহাকে শয্যায় দিয়া, তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে লীলা সরোজের সহিত তার অদ্যকার অধিকাংশ কথোপকথন নিবেদন করিল। সমস্ত শুনিয়া বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাই যদি তোর ধনুর্ভঙ্গ পণ হয় যে, আমি তোর কাছে গিয়ে না থাকলে তুই বিবাহই করবিনে, তা হলে তাই হবে। কিন্তু আমার খরচস্বরূপ মাসে মাসে অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা জামাইকে নিতে হবে, সেটা তাকে বুঝিয়ে বলিস।"

লজ্জাত্যাগ করিয়া, বিবাহের দিন স্থির সম্বন্ধে সরোজের আগ্রহের কথাও লীলা

পিতাকে জানাইল। তিনি বলিলেন, "তা বেশ। এ মাসের ত আর দিন দশেক মোটে বাকী—আসছে মাসের মাঝামাঝিতে একটা রবিবার দেখে দিন স্থির ক'রে বলিস। তোর জন্যে কিছু গহনা গড়াতে হবে, কাপড় চোপড়ও তৈরী করাতে হবে—তাতে যেটুকু সময় দরকার, তার বেশী আর দেরী ক'রে ফল কি?"

পিতাকে ঘুম পাড়াইয়া, লীলা নিজ শয়নকক্ষে গিয়া, তখনি রবিবার ১৭ই মার্চ্চ দিনটি স্থির করিল। দশদিন আর সতেরো—সাতাশ দিন। তার পর চির-মিলনোৎসব। আনন্দের আবেগে, সরোজের ফটোখানি বাহির করিয়া লীলা বারবার চুম্বন করিল। অবশেষে সেখানি বালিসের তলায় রাখিয়া, আলো নিবাইয়া দিয়া শয়ন করিল; কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে, অন্যদিন অপেক্ষা শীঘ্রই লীলা শয্যাত্যাগ করিল। পিতা জাগিবার পূর্ব্বেই স্নানাদি সমাপন করিয়া লইল। সাড়ে সাতটার সময় সরোজ আসিবে, এখানেই ছোট হাজরী খাইবে—তার পর তিনজনে একত্র গির্জ্জায় যাইবে এইরূপই পরামর্শ ছিল।

লীলার মনটি আজ বড় প্রফুল্ল। এতদিন কর্ত্তব্যের খাতিরে সরোজকে সে তেমন আমল দিতে পারে নাই—সরোজের মনে কষ্ট দিয়াছে—আজ সে বাধা অপসৃত—আজ সরোজ আসিলে সে তাকে সুখী করিতে পারিবে। লীলার মনের ভিতর আজ কেবল গানের লহর উঠিতেছে—মাঝে মাঝে গুণ গুণ করিয়া সে গান গাহিতেছে। গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া, আজ সরোজকে এইখানে খাইবার জন্য সে অনুরোধ করিবে। আজ অনেকক্ষণ —অনেকক্ষণ, দুজনে একসঙ্গে থাকিবে। আজ কোনও বায়স্কোপে ভাল ফিল্ম আছে কিনা কে জানে! ওবেলা দুজনে দেখিতে গেলে হয়। না—বায়স্কোপে নয়—হাজার লোকের মাঝে নয়, একটিও মনের কথা কহিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে না—তার চেয়ে ইডেন গার্ডেন কিংবা গড়ের মাঠই ভাল। একটু সকালে বাহির হইয়া শিবপুরের বাগানে গেলেও হয়।

বেলা ৮টা বাজিতে আর বেশী দেরী নাই। ছোট হাজরী প্রস্তুত—সরোজ আসিলেই হয়। নীচে সদর দরজার নিকট একটু শব্দ হইলেই লীলার কাণ খাড়া হইয়া উঠে। না, ও ত সরোজের পদশব্দ নয়! লীলা অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া, রাস্তার ধারের দ্বিতল বারান্দায় বাহির হইয়া একদৃষ্টে পথপানে চাহিয়া রহিল। কত লোক আসিতেছে, কই সরোজের এখনও দেখা নাই কেন? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল—পিতার চা পান ও ছোট হাজরীর সময় উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া, লীলা বাবুর্চ্চিকে চা ভিজাইয়া টোষ্ট সেঁকিতে হুকুম দিল।

সাড়ে ৮টা বাজিলে, লীলার মনে কু গাহিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ সরোজের কোনও অসুখ করিল না ত? নহিলে যে মানুষ কাল রাত্রেই আসিবার জন্য উদ্যত— সে আজ নির্দ্ধারিত সময়ে আসিয়া পৌঁছিল না! ইচ্ছা হইতে লাগিল, সরোজের বাসায় বয়কে পাঠাইয়া সংবাদ লয়, কিন্তু বয় এখন গেলে, পিতার চা পানে আরও বিলম্ব হইয়া যাইবে। তাই সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল। পিতাকে আনিয়া ছোট হাজরী খাইতে বসাইল।

চা পান করিতে করিতে হঠাৎ হরিনাথবাবুর স্মরণ হইল—কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই সরোজ ত আজ এল না!"

লীলা ম্লান মুখে বলিল, 'আজ ত বরং অন্য রবিবারের চেয়ে সকালেই তাঁর আসবার কথা ছিল বাবা, কি জানি কি হল!"

"বোধ হয় কোনও কাজে আটকে পড়েছে"—বলিয়া হরিনাথবাবু চায়ের পাত্রটি শেষ করিলেন।

বারান্দায় ঈজি চেয়ার পাতা থাকে, ছোট হাজরীর পর হরিনাথবাবু তাহাতে বসিয়া

ধূমপান ও ষ্টেটস্‌ম্যান সংবাদপত্র পাঠ করেন। আজও যথারীতি সেই চেয়ারে গিয়া বসিলেন। বয়, গুড়গুড়িতে তামাক দিয়া গেল—কিয়ৎক্ষণ ধূমপানের পর, পকেট হইতে চশমাখানি বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া ষ্টেটস্‌ম্যানের ভাঁজ খুলিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। লীলা খানাকামরায় গৃহকার্য্য করিতেছে—এবং মাঝে বারান্দায় বাহির হইয়া এদিক ওদিক যাইতেছে।

হঠাৎ এক সময় হরিনাথবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"লীলা—শোন্—শোন্—শুনে যা!"

লীলা সেলভিটে কাপড় দিয়া একটা কাচের গ্লাস পালিস করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "কি, বাবা?"

কাগজখানা কন্যার হাতে দিয়া, একটা স্থান দেখাইয়া বলিলেন, "পড়্ এইখানটা!"

বড় বড় হেড লাইন দিয়া তাহার নিম্নে মিষ্টার সরোজনাথ রায়ের অসাধারণ সৌভাগ্যের সংবাদটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লীলার হাত কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে তার হাত হইতে কাগজখানি পড়িয়া গেল। নিকটস্থ চেয়ারখানাতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "হাঁ বাবা, তা হ'লে কি হবে?"

হরিনাথবাবু কন্যার দিকে চাহিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষীণদৃষ্টি, মেয়ের মুখ যে কত ফেকাসে হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। লীলা আবার বলিল, "কি হবে বাবা?"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দে মা—তিনি তোকে রাজরাণী ক'রে দিলেন। কি অসীম দয়া তাঁর!"

লীলা নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল—"দয়া? দয়া কি? না অভিশাপ? প্রথমেই ত দেখছি, যে লোকের সাড়ে সাতটার মধ্যে আসবার কথা, ৯টা বেজে গেল, তবু তার দেখা নেই!"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কাল সন্ধ্যেবেলা এ খবর সরোজ তোকে বলেনি?"

"না বাবা।"

"বোধ হয় গোপন রেখেছে। সে দেখতে চেয়েছিল হয়ত, সে যেমনটি আছে, তেমনি তাকে তুই গ্রহণ করিস কি না। তার এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের পর তুই তাকে গ্রহণ করলে, তার মনে হতে পারতো—আমাকে নয় আমার টাকাকেই এ গ্রহণ করছে। এখন সে ত জানছে—টাকার লোভে কাল তুই বিবাহে সম্মতি দিসনি।"

"কি জানি বাবা, কাল হয় ত তিনি নিজেই জানতেন না।"

"হ্যাঁ তাও হতে পারে বটে!"

লীলা বলিল, "কিন্তু বাবা, আমি যে সম্মতি দিয়ে ফেলেছি! কি হবে এখন?"

কন্যার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া হরিনাথ বলিলেন, "কিসের কি হবে?"

লীলা বলিল, "বাবা, সে আজ একটা রাজা—আমরা সামান্য লোক। তার সঙ্গে আর আমরা কি করে মিশবো বাবা? মিশতে পারবো কি?"

"কেন? ওঃ, বুঝেছি। আচ্ছা, ভেবে দেখি কথাটা। তুই ভয় করছিস—সে এখন বড়লোক হয়ে, আমাদের মত অবস্থার লোককে হয়ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারে। এই ত?"

লীলা বলিল, "তার যে হেড বাবুর্চ্চি হবে, তার মাইনে নিশ্চয়ই তোমার পেন্সনের চেয়ে বেশী হবে বাবা!—তুমি কি—"

"এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর, আর কি আমি জামাইয়ের বাড়ী গিয়ে বাস করতে পারব, এই কথা জিজ্ঞাসা করছিস ত?—না, সেটা আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না মা। কিন্তু সরোজ যে রকম ছেলে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে কি তার স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে?"

"প্রথম নমুনা ত এই দেখছি বাবা। তুমি কি বল, তাই শোনবার জন্যে সে কাল

রাত্রেই এসে, নীচের ঘরে দু'ঘণ্টা একলা বসে থাকতে প্রস্তুত ছিল। তাতে আমি আপত্তি করায়, আজ সকালে সাড়ে সাতটা হতে না হতেই এখানে ছুটে আসবে ব'লেছিল। সাড়ে ন'টা বাজে—এখনও পর্য্যন্ত তার দেখা নেই!—তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আর কাকে বলে, বাবা?"

হরিনাথবাবু বলিলেন, "তা না হতেও পারে। এই সংস্রবেই—হঠাৎ তার কোনও কাজ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে—তাই নিয়ে সে ব্যস্ত আছে।"

লীলা বলিল, "আচ্ছা বাবা, যেদিন আমার ডাক্তারি পাশ হওয়ার খবর জানা গেল,—আমি যদি ছুটে এসে সে খবর তোমায় না দিতাম, তুমি যদি পরদিন খবরের কাগজে তা পড়তে. তা হলে তোমার কেমন লাগতো?"

"ওঃ, সে নিজে এসে তোকে এ খবরটা দেয়নি ব'লে তুই অভিমান করছিস?—তা, সে নিজেই এখনও জানতে পেরেছে কি না তার ঠিক কি? সে হয়ত ষ্টেটস্‌ম্যান দেখেনি।"

"গুড মর্ণিং—গুড মর্ণিং—এই যে আপনারা দু'জনেই রয়েছেন!"

'কে? ঘোষাল? এস—এস—খবর কি?"

ঘোষাল বলিল, 'বসবার সময় নেই মিষ্টার সান্যাল। কাল সন্ধ্যার পর, সরোজ হঠাৎ ভারি পীড়িত হয়ে পড়েছে। আপনাবা দু'জনে একবার আসুন আমার সঙ্গে।"

হরিবাবু তীরের মত দাঁড়াইবা উঠিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ? সরোজেব অসুখ হযেছে? কি অসুখ? কি অসুখ? কেমন আছে সে?"

ঘোষাল বলিল, 'বসুন বসুন। মিস সান্যাল—আপনি দয়া করে', পাঁচ মিনিটেব মধ্যে জুতো বদলে আসুন। এই যে, ষ্টেটস্‌ম্যান বযেছে—আপনারাও খবরটা তা হ'লে পড়েছেন নিশ্চয়। কাল রাত আটটার সময সরোজ বেড়িয়ে বাসায় ফিরে এসে, বোম্বাই থেকে এই বিষয়ের টেলিগ্রাম পায়। পেয়েই তার ফিট হয়—আমরা তখনি ডাক্তার আনি, মাথায বরফ দিই—সারারাত অজ্ঞান ছিল—এখন সকালে একটু জ্ঞান হয়েছে।'

হরিবাবু বসিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ!—তারপর—তারপর ডাক্তার কি বললে? জীবনেব কোনও—"

'না, জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই এ কথা ডাক্তার আজ সকালে বলে গেলেন। ডাক্তার চলে' যাওয়ার পর, সরোজ আমায় বললে আপনাদিকে তার অসুখের খবব দিতে। তাই আমি আপনাদের নিতে এসেছি। মিস সান্যাল—দযা ক'রে—পাঁচ মিনিটেব মধ্যে।"

লীলা ছুটিয়া উপরে চলিয়া গেল।

পিতা পুত্রী উভয়ে যখন গিয়া সরোজেব বাসায পেঁাছিলেন. তখন সরোজ আবাব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তারকে ইসারায় ডাকিয়া হবিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন বুঝছেন?"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "আর কোনও ভয় নেই। ২।১ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম, আব কিছুই দরকার হবে না। কাল না হোক—পরশু নিশ্চয়ই উনি আবার তাজা হয়ে উঠবেন।"

লীলা সারাদিন সরোজের পাশে বসিয়া কাটাইল। সরোজ মাঝে মাঝে জাগে, বেশ কথাবার্ত্তা কহে, আবার ঘুমাইয়া পড়ে। জাগিলে, লীলা তাহাকে একটু একটু গবম দুধ খাওয়ায়।

এদিন এইভাবে কাটিল। পরদিন, বেশ উন্নতি দেখা গেল। আজ, নিদ্রাকাল অল্প —জাগরণ-সময় অধিক।

এক সময়, লীলা ছাড়া ঘরে আর কেহ নাই দেখিয়া সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাকে সে কথা বলেছিলে লীলা?"

"বলেছিলাম।"

"তিনি রাজি হয়েছেন?"

"হয়েছিলেন।"

লীলা যে 'হয়েছেন' না বলিয়া 'হয়েছিলেন' বলিল, রোগীর মস্তিষ্ক তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিল না। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"—বলিয়া সরোজ আবার ঘুমাইয়া পড়িল। তার প্রফুল্ল মুখখানি দেখিয়া, লীলার প্রাণের ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠিল; কারণ ইহারই মধ্যে মনে মনে স্থির সে করিয়াছে—এ বিবাহ হইতে পারে না। এখন নয়—সরোজ বেশ ভাল হইয়া উঠুক, তখন মিনতি করিয়া, নিজবাক্য ফিরাইয়া লইতে হইবে।

ডাক্তারের কথাই সত্য হইল। পরদিন সরোজ বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। তারযোগে যে সংবাদ আসিয়াছিল. জার্ম্মাণ লটারির বোম্বাই এজেন্ট পত্রযোগেও সে সংবাদ জানাইয়াছেন। তিন সপ্তাহ পরে জার্ম্মাণি হইতে চেক আসিবে, ইহাও তিনি লিখিয়াছেন।

সরোজ তাহার কর্ম্মে ইস্তফা দিতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু হরিনাথবাবুর পরামর্শে সে তাহা করে নাই—মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়া একমাসের ছুটি লইয়াছে।

এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। জার্ম্মাণীর ডাক আসিয়া পৌঁছিতে এখনও বিলম্ব আছে। জার্ম্মাণী হইতে চেকখানা আসিয়া পৌঁছিলেই মূল্য দিবার কড়ারে ইতিমধ্যে বাইশ হাজার টাকা মূল্যের একখানি রোল্‌স রয়েস মোটরকার সে কিনিয়াছে।

সে গাড়ী এখন দোকানের আস্তাবলেই আছে—বাড়ী কেনা হইলেই গাড়ীখানা আনা হইবে। প্রতিদিন প্রাতে ও বৈকালে গাড়ী আসিয়া সরোজের মেসের দ্বারে দাঁড়ায়। সরোজ তাহাতে আরোহণ করিয়া যেখানে ইচ্ছা যায়। একখানি ভাল বাড়ীর সন্ধানেও সে আছে।

বেলা ৯টার সময় নবক্রীত মোটরে চড়িয়া সান্যাল ভবনে আসিয়া সরোজ দেখিল, নিম্নে খানা-কামরায় লীলা বসিয়াছে—তাহার পিতা ছোট হাজরী সারিয়া উপরে চলিয়া গিয়াছেন। সরোজ বলিল, "লোয়ার সার্কুলার রোডে একখানি ভাল বাড়ীর খবর পেয়েছি লীলা। বর্ত্তমান মালিক ৫।৬ বছর আগে, দেড় লাখ টাকায় সেখানি কিনেছিলেন। এখন তাঁর অবস্থা খারাপ—বোধ হয় ৭০।৭৫ হাজারেই সেখানি পাওয়া যেতে পারে। চল বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তিনজনে বাড়ীটা দেখে আসি।"

লীলা বলিল, "বাবাকে নিয়ে যাও—আমি এখন যেতে পারবো না। আমার কাজ আছে।"

"কি এমন কাজ লীলা? চল, চল, লক্ষ্মীটি।"

লীলা বলিল, "আমার রোগী আছে—তাকে এখনি দেখতে যেতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ—আমি বসি। ততক্ষণ বাবার সঙ্গে একটু গল্প করি—তুমি কাজ সেরে এস। তারপর তিনজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমার গাড়ী নিয়েই তুমি যাও।"

লীলা বলিল, "হ্যাঁ—চার টাকা ভিজিটের ডাক্তারণী, রোলস্ রয়েসে চড়ে রুগী দেখতে যাবে! আমি ঠিকেগাড়ী আনতে পাঠিয়েছি।"

সরোজ, লীলার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল, "আচ্ছা, আজকাল তুমি এমন কেন হয়ে গেছ লীলা?—আমার কাছ থেকে যেন দূরে দূরে থাকতে চাও। কেন, আমি কি করেছি? তোমার কাছে আমি কি কোনও অপরাধ করেছি?"

"না, অপরাধ তুমি কেন করবে?"—বলিতে, লীলার বুক কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

বাহিরে ছক্কড় গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইল। "আচ্ছা আমি তা হলে চললাম—ফিরতে আমার দেরী হতে পারে। তুমি বাবাকে নিয়ে বাড়ী দেখে এস।"—বলিয়া, ডাক্তারি ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া, লীলা বাহির হইয়া গেল।

সরোজ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিল, "কি জানি—কিছু বুঝতে পারছিনে!"

বাস্তবিকই, সরোজের নিকট লীলার ব্যবহার আজকাল অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। নির্জ্জনে পাইয়া, তাহাকে কোনও রূপ আদর করিতে গেলেই সে সরিয়া দাঁড়ায়। মুখখানি সদাই বিষণ্ণ করিয়া থাকে। কে জানে, তার কি হইল।

বাড়ী দেখিয়া ফিরিবার সময়, হরিনাথবাবু সান্ধ্যভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া সরোজকে বিদায় দিলেন। লীলা তখনও রোগী দেখিয়া ফেরে নাই।

রাত্রিভোজন শেষ হইলে, লীলা সরোজকে বলিল, "তুমি একটু বস—আমি বাবাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।"

দ্বিতলের ভিতরের বারান্দার রেলিং ধরিয়া, সরোজ দাঁড়াইয়া রহিল। চৈত্র মাসের সুবিমল জ্যোৎস্না ধারায় গগন ভুবন প্লাবিত।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করিবার পর লীলা ফিরিয়া আসিল।

সরোজ বলিল, "লীলা, এস এই বারান্দায় এস।"

লীলা বারান্দায় গেলে সরোজ বলিল, "আজ কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে দেখ লীলা!'

লীলা ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'বেশ।"

'আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?—এই জ্যোৎস্নায় দুজনে ময়দানে কিংবা ব্যারাকপুর রোডে খানিক বেড়িয়ে আসি। যদি হুকুম কর, সমুখের বাড়ী থেকে এখনই আমি ফোন করে' গাড়ীটা আনাই।"

লীলা বলিল, "বাবা ঘুমিয়েছেন!"

"তাঁর বিনা অনুমতিতে রাত্রে আমার সঙ্গে বেড়াতে পার না, এই কথা বলছ ত? দুদিন বাদে যে তোমার স্বামী হবে, তার সঙ্গে রাত্রে তুমি বেড়াতে বেরুলে বাবা নিশ্চয়ই রাগ করবেন না। বল লক্ষ্মীটি—গাড়ী আনাই?'

লীলা দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

"সব কথাতেই না! না—না—না এই তোমার বুলি হয়েছে। এমন পাষাণ কেন হলে লীলা? এমন ত তুমি ছিলে না!—আচ্ছা, বেড়াতে না যাও না যাবে। এস এইখানে আমরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসে দুজনে গল্প করি। তোমাতে আমাতে একসঙ্গে বসে মনের কথা কইনি যেন কত কাল—কত বছর। এ ক'দিন একটি চুমো পর্য্যন্ত দাওনি তুমি আমায়। এস—আজ একবার তোমায় বুকে নিই।"—বলিয়া সরোজ লীলার হস্ত ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিল।

"না"—বলিযা লীলা হাত ছাড়াইয়া, দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

সরোজ দুঃখিত স্বরে বলিল, "কেন লীলা?—তুমি কি আমায় আর সহ্য করতে পারছ না?—আমি কি তোমার চক্ষুশূল হয়েছি? তোমায় বিরক্ত করছি? চলে যাব?"

"না।"

"ওগো মিস 'না'—ওগো 'না' সুন্দরী!—তোমার মুখে কি না ছাড়া অন্য কোনও কথা জীবনে আর শুনতে পাব না?"

লীলা বলিল, "সরোজ, তুমি মনে দুঃখ কোর না। তোমায় বিবাহ করা, আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। আমি তোমায় যে বাক্য দান করেছিলাম—দয়া করে, সে বাক্য আমায় ফিরিয়ে দাও!"

সরোজ লীলার কাছে সরিয়া আসিয়া, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ না করিয়া বলিল, "সে কি? কি বলছ তুমি? কেন, এক হপ্তা আগে যা সম্ভব ছিল, আজ তা হঠাৎ অসম্ভব হল কেন?—আমার নামে, আমার চরিত্র সম্বন্ধে কেউ কি কোনও মিথ্যা কথা তোমায়

বলেছে—যা বিশ্বাস ক'রে তুমি আমায় পরিত্যাগ করাই স্থির করেছ? যদি সে রকম কিছু শুনে থাক—তবে জেনো—তা সর্ব্বৈব মিথ্যা—মিথ্যা—কোনও স্বার্থপর লোক, নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায়—বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে, মিথ্যা করে তোমায় বলেছে!"—শেষ কথাগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবেই সরোজ উচ্চারণ করিল।

লীলা বলিল, "না সরোজ—তুমি শান্ত হও—সে রকম কোনও কথা কেউ আমায় বলেনি! কার এমন সাহস যে ও রকম কথা আমায় বলে? আর, বললেই বা আমি তা বিশ্বাস করবো কেন? না—তা নয়। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ—এক হপ্তা আগে যা সম্ভব ছিল, তা আজ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল কেন?—কেন তা তোমায় বলছি, শোন। যখন তোমার আমার মিলন সম্ভব ছিল—তখন তোমার আমার সাংসারিক অবস্থাও সমান ছিল। এখন তুমি রাজার ঐশ্বর্য্য লাভ করেছ—আমি যে ফকীরের মেয়ে সেই ফকীরের মেয়েই আছি। অবস্থাগত সাম্য না থাকলে, সে মিলন কি কখনও সুখের হতে পারে? তাই আমি তোমায় বিবাহ না করাই স্থির করেছি। আমি গরীবের মেয়ে, চিরকাল গরীবানা ভাবেই কাটিয়েছি—আজ তোমায় বিয়ে ক'রে, রাজরাণীর মত জীবনযাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব—অসম্ভব। সে কল্পনা পর্য্যন্ত আমার অসহ্য! সে নিম—নিমের চেয়েও তেতো, আমায় গিলতে বাধ্য কোর না সরোজ। তুমি বলেছিলে আমায় ভালবাস। যদি যথার্থই আমায় ভালবাস, তাহলে এ নির্য্যাতন আমায় কোর না—আমি কিছুতেই তোমার হতে পারবো না সরোজ! আমায় দয়া কর—আমায় ক্ষমা কর—আমায় মুক্তি দাও। আমার বুকে তুমি মৃত্যুবাণ হেন না—আমায় বেঁচে থাকতে দাও—তুমি আমায় ভুলে যাও—তুমি চলে যাও।" বলিয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া, লীলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সরোজ বলিল, "আচ্ছা লীলা, প্রথমটি পারবো না, তোমার দ্বিতীয় আদেশ আমি পালন করচি—আমি যাচ্ছি। কিন্তু এও তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি—তোমার প্রতি আমার সে ভালবাসা,—কোনও দিন এক তিল কমবে না। ভুলতে আমি তোমায় পারবো না—অন্ততঃ কবরে যাবার আগে নয়। আচ্ছা তবে আসি।"—বলিয়া সরোজ মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ির ব্যানিষ্টর ধরিয়া নামিয়া গেল।

দুই সপ্তাহ পরে বোম্বাই হইতে সরোজের নামে আর একখানি চিঠি আসিল।

সরোজ সেখানি পাঠ করিয়া, ম্লানমুখে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কি চিন্তা করিল। তারপর হঠাৎ তাহার মুখখানি প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল।

চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া, সে তাড়াতাড়ি সান্যাল গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন ১১টা। বয়ের নিকট শুনিল, সাহেব আহার সারিয়া, পেন্সন আনিতে গিয়াছেন, মিস সাহেব উপরে আছেন।

সরোজ উপরে গিয়া দেখিল, লীলা বসিবার ঘরে সোফায় পড়িয়া কি একখানি বহি পড়িতেছে। তাহার চেহারা অত্যন্ত শুষ্ক—এই দুই সপ্তাহেই সে অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে।

সরোজকে হঠাৎ প্রবেশ করিতে দেখিয়া, লীলা উঠিয়া বসিল—বিস্মিতভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সরোজ আসিয়া, হঠাৎ লীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে গাঢ় চুম্বন করিয়া বলিল, "লীলা—ঈশ্বর দয়া করেছেন। তোমার আমার মধ্যে রূপোর যে পাহাড় উঠে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে চেয়েছিল, ঈশ্বর সেটা সরিয়ে নিয়েছেন। এই চিঠিখানি পড়ে দেখ লীলা।"—বলিয়া খামখানি লীলার হস্তে দিল।

লীলা পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িল ঃ—

প্রিয় মহাশয়,

গত মাসের ২০শে তারিখে আমরা আপনাকে তারযোগে, এবং ঐ তারিখে লিখিত পত্রযোগেও জানাইয়াছিলাম যে, আপনার ক্রীত জার্ম্মাণ লটারির টিকিটখানি ৫০ হাজার পাউণ্ড ষ্টার্লিং প্রাইজ লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, ঐ সংবাদ ভুল; টেলিগ্রামের দোষেই ঐ ভুল ঘটিয়াছে। জার্ম্মাণী হইতে যে টেলিগ্রাম আমরা পাইয়াছিলাম তাহাতেই স্পষ্টই লিখিত ছিল যে ৬৫৯৭৯ নং টিকিট, ঐ ৫০ হাজার পাউণ্ড প্রাইজ লাভ করিয়াছে। উহা, আপনার টিকিটেরই নম্বর—তদনুসারেই আপনাকে আমরা টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। কিন্তু গতকল্য আমরা জার্ম্মাণী হইতে যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে লেখা আছে, ঐ প্রাইজ প্রাপ্ত টিকিটখানির নম্বর—৬৫৯৯৭—টেলিগ্রাফ কর্ম্ম-চারীদেব দোষে নম্বরটি এরূপ ভাবে উল্টাইয়া আসিয়াছিল। অতএব ভিক্ষা, আপনাকে এই ভুল সংবাদ প্রদানের জন্য আপনি আমাদের ক্ষমা করিবেন।" ইত্যাদি

পত্রখানি পাঠ শেষ করিয়া, লীলা বলিল, "এ কি কাণ্ড সরোজ!"

সরোজ বলিল, "আর ত আমি রাজা নই?"

"না।"

"ফকীরের সঙ্গে ফকীরণীর মিলন সম্পূর্ণ সম্ভব ত?"

"সম্ভব।"

"এবং সঙ্গত?"

"এবং সঙ্গত।"

"এবং, সেটা যত শীঘ্র হয়—তাই উচিত নয় কি?"

লীলা হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয় উচিত, রাজা মশাই।"

সরোজ বলিল, "আবার তুমি আমায় রাজা বলে গাল দিচ্ছ?"

'সে রাজা বলিনি—আমার হৃদয়ের রাজা।"—বলিয়া লীলা এই নূতন রাজার গলাটি দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া, কয়েকটি চুম্বন, নজর স্বরূপ প্রদান করিল।

একমাস পরে বিবাহ হইয়া গেল। বাড়ী কেনা হইল না, রোলস রয়েসখানাও কেনা হইল না। সকল অবস্থা শুনিয়া, ফারমেব বড় সাহেব সরোজকে চুক্তি হইতে মুক্তি দিলেন কিন্তু একমাসেব ভাড়া স্বরূপ ৫০০৲ টাকা চার্জ্জ করিলেন। লীলা তার গহনা বেচিয়া ঐ টাকা শোধ করিয়া দিল।

তিনটি গরীব—গবীবানা ভাবে মহানন্দে বাস করিতে লাগিল। বৎসরখানেক পরে, একটি ক্ষুদ্র নূতন গরীব আসিয়া এই গরীবদের কুটীর আলোকিত করিল। সরোজও হেডক্লার্ক হইল।

সে সংবাদ শুনিয়া লীলা বলিল, "আমরা যদি হিন্দু হতাম ত বলতাম, খোকার পয়েই তোমাব মাইনে বেড়েছে।"

উপন্যাস কলেজ

"সুন্দরী যত হোক আর না হোক ভাল রকম লেখাপড়া জানা মেয়ে ভিন্ন, আর কাউকে বিয়ে করবো না"—ইহাই ছিল অবিনাশের আকৈশোর প্রতিজ্ঞা। একটি মাত্র ছেলে—পিতা অবিনাশের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণও করিয়াছিলেন। সে ম্যাট্রিকে এবং আই-এ-তে বৃত্তি পাইয়াছিল, ডবল অনার্স লইয়া বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িতেছে, দেশে কিছু বিষয় সম্পত্তিও আছে—এমন সুপাত্র—বিবাহের বাজারে তাহার দর আট হাজার পর্য্যন্ত

উঠিয়াছিল; কিন্তু সদয়-হৃদয় পিতৃদেব নগদ ছয় হাজার টাকা লোকসান স্বীকার করিয়া, বেসরকারী কলেজের গরীব অধ্যাপক হরকুমার গাঙ্গুলীর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিলেন।

বিশেষ করিয়া সুন্দরী বধূ কামনা না করিলেও, প্রজাপতি অবিনাশকে সুন্দরী বধূই দিলেন। কনের নাম সুষমা, বয়স ১৬॥ বৎসর, এ বৎসর সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে—রেজাল্ট এখনও বাহির হয় নাই।

বিবাহ হইল ৫ই আষাঢ়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই হইতে পারিত, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ছেলের বিবাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইতে নাই। অবিনাশের পিতা রাধাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খুলনা জেলার অধিবাসী। পুত্রবিবাহ জন্য সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া এক মাসের জন্য শ্যামবাজারে বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন।

ফুলশয্যার রাত্রেই কনেকে বিশেষ ভাবে জেরা করিয়া অবিনাশ জানিতে পারিল যে, সে কবিতা লেখে এবং কবিতায় পরিপূর্ণ দুইখানি খাতা ভবানীপুরে তাহার বাক্সমধ্যে আছে। শুনিয়া আনন্দে অবিনাশ যেন পাগল হইয়া উঠিল। বলিল, 'আসবার সময় খাতা দু'খানি আনলে না কেন সুষু?—আমি দেখতাম।'

নববধূ বলিল, "সে খাতা আমি কাউকে দেখাই?"

অবিনাশ বলিল, "কিন্তু আমি কি 'কাউ'?"

কনে বলিল, "তুমি 'কাউ' হবে কেন, তুমি বুল্।"

বধূর এই রহস্যপটুতায় একটা দীনবন্ধু বা ডি-এল রায়ের প্রতিভার সন্ধান পাইয়া অবিনাশ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, "সাধে কি আর শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করবো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম?"—কোনও কবিতা যদি মুখস্থ থাকে, তবে তাহাই শুনিবার জন্য অবিনাশ বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু কোনও কবিতাই সুষমার মুখস্থ নাই। বরের আগ্রহ ও আক্ষেপ দর্শনে অবশেষে সে আশ্বাস দিল—"আট দিন পরে, আমার সঙ্গে তুমি ত যোড়ে যাবে আমাদের বাড়ী, তখন দেখাব।"

অবিনাশ বলিল, 'আট দিন ধৈর্য্য ধরে থাকাই বা যায় কেমন করে?"

দুই

আট দিন আট রাত্রি অতিবাহিত হইল। উভয়ের আত্মীয়তা অন্তরঙ্গতা, অভিন্ন-হৃদয়তা এই আট দিনে এতই বিশাল ও গভীর হইয়াছে যে, অবিনাশের স্থির বিশ্বাস—বোধোদয় কথামালা পড়া কোনও মেয়ের সহিত বিবাহ হইলে, আট বৎসরেও তাহা হইত কি না তাহা সন্দেহ।

আটদিন পরে অবিনাশ "যোড়ে" শ্বশুরবাড়ী গেল। স্ত্রীর লিখিত কবিতা পাঠে তাহার অষ্টাহব্যাপী আকুল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল। কবিতাগুলি পড়িয়া সে এতই প্রশংসা করিতে লাগিল যে, বেচারী সুষমা সত্য সত্যই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, 'কি বল তুমি তার ঠিক নেই! ভারি ত কবিতা—তারই এত সুখ্যাতি!" অবিনাশ, রবিবাবু কোট করিয়া বলিল, 'পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা—জান না নিজে মোহন কি যে তোমার মালিকা!"—অবিনাশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—যত শীঘ্র সম্ভব, কবিতাগুলি পুস্তাকাকারে সে ছাপাইয়া ফেলিবে। কলেজ খুলিলেই মেসে বসিয়া স্বহস্তে খাতা নকল করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিবে।

নিজালয়ে অষ্টাহ, শ্বশুরালয়ে অষ্টাহ—এই ষোড়শ দিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল অবিনাশ ভাল বুঝিতেই পারিল না। অবশেষে বিদায়-রজনী উপস্থিত হইল। গভীর নিশীথে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, পরস্পরের বক্ষে অবিরল অশ্রুজল সেচন ইত্যাদি ইত্যাদি একরকম শেষ হইলে অবিনাশ বলিল, "তুমি রোজ একখানি ক'রে চিঠি আমার

লিখবে। নইলে আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠবে—পড়াশুনো চুলোয় যাবে—আমি ফেল হব।"

সুষমা বলিল, "তা লিখবো বইকি। তুমিও আমায় রোজ একখানি চিঠি লিখবে ত?"

অবিনাশ বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

"আর কি শনিবারে আসবে ত? বাবা ত তোমায় বলেই রেখেছেন—মা-ও যাবার সময় তোমায় বলবেন। শনিবার বিকেলে আসবে, রবিবার থেকে, সোমবার সকালে উঠে চা-টা খেয়ে মেসে ফিরে যাবে। কেমন, কথা রইল ত?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়!—কিন্তু, অতদিন অতদিন বাদে এক একটিবার দেখা—সহ্য করা শক্ত যে সুষু! মাঝে অন্ততঃ একটি দিন—ধর বুধবার—তোমার মুখখানি আর একবার আমার দেখতে পাওয়া চাই।"

সুষমা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কিন্তু তা কি করে হবে?"

অবিনাশ বলিল, "আমি তার একটা উপায় স্থির করেছি। তুমি, প্রতি বুধবারে, বেলা ঠিক আটটার সময়, তোমাদের ছাদে উঠে, উত্তর-পশ্চিম কোণটায় দাঁড়াবে। আমিও ঠিক সেই সময় হরিশ মুখুয্যের রোড দিয়ে যাব। যদিও এ বাড়ী গলির ভেতর, কিন্তু হরিশ মুখুয্যের রোড থেকে ছাদের প্রায় আধখানা বেশ দেখা যায় তা জান ত?"

সুষমা বলিল, 'হ্যাঁ, তা জানি। হরিশ মুখুয্যের রোড দিয়ে যখন বর-টর যায় আমরা ছাদে উঠে দেখি কিনা।'—বলিয়া সুষমা ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

হাসির কারণ জানিবার জন্য অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুষমা বলিল, "একটা কথা মনে হ'ল তাই হাসলাম।'

'কি কথা—বল—বল।'

'মনে হ'ল এতদিন ছাদে উঠে পরের বর দেখে মরেছি, এখন নিজের বরটিকে দেখে বাঁচবো। কেবল রোশনাই বাজনাবাদ্যি থাকবে না এই যা তফাৎ।"

অবিনাশ প্রিয়তমার এই রসিকতায় স্বয়ং কালিদাসের কবিত্বমাধুর্য্য উপলব্ধি করিল। আনন্দবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া, চুম্বনের ফাঁকে ফাঁকে বলিতে লাগিল, "কি সুন্দর তোমার ভাব; কি সুন্দর তোমার প্রকাশ-ভঙ্গি! কিন্তু কেন রোশনাই থাকবে না? চোখে যাদের প্রেমের মাণিক জ্বলছে, তাদের কি রোশনাইয়ের অভাব? হৃদয়ে যাদের স্বর্গের বীণা বাজছে তাদের অন্য বাজনার দরকার কি?"

অবিনাশ শ্বশুরালয় হইতে শ্যামবাজারে পিতামাতার নিকট ফিরিবার দিন দুই পরেই, তাঁহাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। অবিনাশ কিন্তু বাড়ী যাইবার কোনও উদ্যোগ করিল না। পিতাকে বলিল, "আর মোটে তিন হপ্তা ত আছে কলেজ খুলতে। আবার যাওয়া, আবার আসা, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ বইত নয়! তার চেয়ে বরঞ্চ মেসেই গিয়ে থাকি!"

পুত্রের অন্তরের গোপন অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, পিতা মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, সেই ভাল। পড়াশুনা বেশ মন দিয়ে কোর।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—সে আমায় বলতে হবে না। এখন মেস ত প্রায় খালি, পড়াশুনোর বেশ সুবিধে হবে। অনেকটা সেই কারণেও, এখন বাড়ী যেতে চাচ্ছিনে।"—বলিয়া অবিনাশ সরিয়া পড়িল। ভাবিল, বুড়োদের ঠকানো কি সহজ!

তিন

পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

এ পাঁচ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সুষমা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস হইয়াছে—ইহা ত বিবাহের অল্পদিনের পরেরই ঘটনা। অবিনাশ উচ্চ সম্মানের সহিত

এম-এ পাস হইয়া, আশুবাবুর কৃপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছে। এই সময় তাহার একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করে—কন্যাটি এখন তিন বৎসরের। ভবানীপুরে, শ্বশুরালয়ের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া লইয়া অবিনাশ সস্ত্রীক বাস করিতেছে।

একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর ফিরিয়া নিজ কক্ষে বসিয়া অবিনাশ ডাকিল, "ও বউ, শোন"—অবিনাশ তার স্ত্রীকে এইরূপই সম্বোধন করিয়া থাকে; শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কিন্তু অবিনাশ তাহা গ্রাহ্য করে না।

"বউ, একটা কথা শুনে যাও।"—

বউ তখন ঝির সাহায্যে রান্নাঘরে বসিয়া রুটি বেলিতেছিল—স্বামীর আহ্বানে উঠিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ঘরে আসিল। দেখিল, স্বামী একখানি খবরের কাগজ নিবিষ্ট-মনে পাঠ করিতেছেন।

স্ত্রীর পদশব্দে অবিনাশ মুখ তুলিয়া বলিল, "ব্যস্ত ছিলে?"

"রুটি বেলছিলাম।"

"দেরী কত বউ?"

"কেন, ক্ষিদে পেয়েছে? আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব তৈরী হয়ে যাবে।"

"না, ক্ষিদে পায়নি। একটা বিশেষ কথা ছিল,—তা, সব সেরেই তুমি এস।"

"কেন, কি হয়েছে, বল না।"

"সে, একটু সময় লাগবে। তুমি কাজ সেরে এস, তার পর ধীরে সুস্থে কথাবার্ত্তা হবে।"

স্বামীর গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সুষমা ভীত হইযা বলিল, "হ্যাঁগা, কোনও মন্দ খবর নাকি?"

অবিনাশ ব্যস্তভাবে বলিল, "না না কোনও মন্দ খবর নয়—ভাল খবরই। যাও তুমি কাজ সেরে এস।"

"আচ্ছা"—বলিয়া সুষমা চলিয়া গেল।

অবিনাশ আবার সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইয়া, নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিতে লাগিল :—

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

সাহিত্য-সেবাকাঙ্ক্ষীর অপূর্ব্ব সুযোগ

উপন্যাস কলেজ

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কথা-সাহিত্যের কিরূপ সমাদর তাহা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এ যুগটা বিশেষ করিয়া গল্প ও উপন্যাসেরই যুগ বলিতে হইবে। ভাল গল্প ভাল উপন্যাসের জন্য প্রকাশকেরা, মাসিক সম্পাদকগণ হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন, অথচ তাঁহারাই প্রতিদিন, নবীন লেখক লেখিকাগণের রচিত শত শত গল্প ও উপন্যাস, অনুপযুক্ত বোধে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ, লেখক লেখিকাগণ কোন রূপ ট্রেণিং (তালিম) না পাইয়াই লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। রীতিমত গুরূপদেশ ভিন্ন, কোনও কার্য্যেই দক্ষতা লাভ করা যায় না। দেশের এই মহা অভাব দূর করিবার জন্য কয়েকজন বিখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক মিলিয়া এই "উপন্যাস কলেজ" স্থাপন করিয়াছেন। রীতিমত উপদেশ দিয়া, সাপ্তাহিক এক্সারসাইজ সংশোধন করিয়া শিক্ষার্থিগণকে কথাসাহিত্য-রচনার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলেজে দুইটি বিভাগ আছে—ছাত্র বিভাগ ও ছাত্রী বিভাগ। সোম, বুধ ও শুক্রবারে ছাত্র বিভাগে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে ছাত্রী বিভাগে লেকচারাদি হইবার বন্দোবস্ত

হইয়াছে। ভর্ত্তি হইবার ফী ১০৲ টাকা এবং মাসিক বেতন ৬৲ টাকা মাত্র। এখনও উভয় বিভাগে কয়েকটা করিয়া সীট খালি আছে—যাঁহাদের প্রয়োজন, সত্বর আবেদন করুন। অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে, এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ আবেদন করুন। ঠিকানা —২২৫ নং সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।"

বিজ্ঞাপনটির উপরিভাগে একটি সুবৃহৎ পাঁচতলা বাড়ীর ছবি আছে।

বিজ্ঞাপনটি বার দুই পড়িয়া, অবিনাশ কাগজখানি রাখিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইল। স্ত্রীর অসাধারণ কবিত্বশক্তি দর্শনে. তাহার মনে বড় আশা হইয়াছিল যে, সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীমতী সুষমা দেবীর পদার্পণ মাত্র দেশময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে—তাহার বৈঠকখানার পুস্তক-প্রকাশক ও মাসিক সম্পাদকগণের ভিড় লাগিয়া যাইবে, দেশশুদ্ধ লোক সমস্বরে বলিবে, হাঁ, এতদিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় খাঁটি কাব্যরসের আস্বাদ পাওয়া গেল বটে! কিন্তু অবিনাশের সে মনের আশা মনেই লয় পাইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর কয়েক মাস মধ্যে, স্ত্রীর অনেকগুলি কবিতা একত্র করিয়া. অবিনাশ "পুষ্পহার" নামক একখানি বহি ছাপাইয়া বাজারে বাহির করিয়াছিল। কিন্তু পুষ্পহারের আদর হয় নাই—আগাগোড়া সব কথা ভাবিলে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হয় যে. সমালোচকগণ ও পাঠক সাধারণ জোট বাঁধিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া, তার বউয়ের বইখানি বয়কট করিয়াছে। তা ছাড়া বই বাহির হইবার পর বছরখানেক ধরিয়া, সুষমার অন্ততঃ একশোটি নূতন কবিতা অবিনাশ ভিন্ন ভিন্ন মাসিকে পাঠায়—তার মধ্যে ৯৫টি ফেরৎ আসিয়াছিল, পাঁচটি মাত্র ছাপা হইয়াছিল, তাও মফঃস্বলের পত্রিকায়। এই কারণে, অবিনাশ বড়ই ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। সে স্থির বুঝিয়াছে, কাব্যের যুগ এখন আর নাই;—এ যুগে স্বয়ং কালিদাস একখানি নূতন মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি হাতে করিয়া কলিকাতায় আসিলে, কোন প্রকাশকই নিজব্যয়ে তাহা ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে সম্মত হইবেন না—অথচ তাঁহারাই রামা শ্যামা নিধের অতি ওঁচা উপন্যাসও গোগ্রাসে গিলিতেছেন! বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিত হইয়াছে—বঙ্গে গল্প উপন্যাসেরই যুগই আসিয়াছে বটে। সুষমার মত প্রতিভাশালিনী লেখিকা যদি উপন্যাস রচনায় মন দেয়. তবে তাহার প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু উহারা বিজ্ঞাপনে ঐ যে কথা লিখিয়াছে, গুরূপদেশ ভিন্ন কেহ কোনও কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারে না তাহাও ঠিক। ঐ কলেজেই বউকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া অবিনাশের ইচ্ছা—এখন বউ রাজি হইলে হয়।

চার

বউ রাজি হইল, কিন্তু অনেক তর্কবিতর্ক মান অভিমানের পর।

সুষমা বলিয়াছিল, "আমি না হয় একটু ইংরিজিই শিখেছি, কিন্তু তা বলে' মেম ত আর হইনি! জুতো মোজা প'রে ট্রামে চ'ড়ে এ বয়সে আমি কলেজে যেতে পারি কখনও?"

"কেন, জুতো মোজা প'রে ট্রামে চড়ে তুমি বায়স্কোপ দেখতে যেতে না বউ? আজকালই না হয় খুকী হয়ে অবধি—"

"সে ত তোমার সঙ্গে যেতাম।"

"তা বেশ ত! একলা যেতে যদি তোমার ভয় হয়, আমি সঙ্গে করে তোমায় রেখে আসবো গো!"

"দু'জনকার ট্রাম ভাড়া লাগবে ত? তার পর, কলেজের ছ' টাকা মাইনে আছে, কাপড়-চোপড়ের খরচ, ধোবার খরচও বাড়বে—চালাবে কেমন ক'রে?"

"মাইনের টাকায় না কুলোয়, আমি না হয় একটা প্রাইভেট টিউশন-মিউশন যোগাড়

ক’রে’ নেবো এখন, তার জন্যে ভাবনা কি? না হয় দিনকতক একটু টানাটানি করেই কাটানো যাবে। তার পর যখন তোমার এক একখানি উপন্যাস বেরুবে, তখন টাকা যে হুড় হুড় করে আসতে আরম্ভ হবে বউ।”

“তা কি কিছু বলা যায়? এতদিন কবিতা লিখেছি—গল্প উপন্যাস লিখতে কখনও ত চেষ্টা করিনি! চেষ্টা করলেই যে সফল হব এমন কি কথা আছে?”

“আসল কথা কি জান? প্রতিভাই হল আসল জিনিষ। সে প্রতিভা তোমার যথেষ্ট রয়েছে—সেটা তুমি কাব্যেই খাটাও আর উপন্যাসেই খাটাও—তোমার হাত থেকে উঁচুদরের রচনা বেরুতে বাধ্য যে।”

“প্রতিভা-টতিভা আমার কিছুই নেই। ও সব আমি পারবো না,—এ নিয়ে আমায় পীড়াপীড়ি কোর না গো তোমার দুটি পায়ে পড়ি।”—বলিয়া সুষমা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

অবিনাশ অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সুষমা আড়চোখে স্বামীর পানে চাহিল, একটু অনুতাপের স্বরে বলিল, “অমনি রাগ হল পুরুষের!”

স্ত্রীর দিকে না চাহিয়া অবিনাশ বলিল, “রাগ নয় বউ, দুঃখ।”

স্বামীর হাত ধরিয়া সুষমা বলিল, “কেন কিসের দুঃখ তোমার? সবাইকের স্ত্রী কি আর অনুরূপা নিরুপমা হতে পারে?”

অবিনাশ বলিল, “না না, আমার দুঃখের কারণ তা নয়। আমার দুঃখের কারণ, মোহভঙ্গ।”

“কেন, কি মোহ তোমার ভঙ্গ হল শুনি?”

অবিনাশ আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “দেখ, এতদিন আমার ধারণা ছিল যে আমাদের দুজনের প্রেম, আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম। এখন দেখছি আমার সে ধারণাটা একটা মোহ—একটা ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।”

সুষমা ক্ষুন্নস্বরে বলিল, “কেন ভুল কিসে?”

অবিনাশ বলিল, যথার্থ দাম্পত্য-প্রেম কাকে বলে? প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বরী ব’লে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়াই কি দাম্পত্য-প্রেম? বঙ্কিমবাবু কি বলেছেন মনে নেই? সমহৃদয়তা, একাভিসন্ধিতা—সেইটেই হল আসল দাম্পত্য-প্রেম। নইলে, আমি বলবো যাব দক্ষিণে, তুমি বলবে যাবে উত্তরে—এ রকম হলে আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম হয় না।”

স্বামীর বেদন-জড়িত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুষমার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। সস্নেহে তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল “তুমি দুঃখ কোরো না—আমি তোমার অবাধ্য হব না। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।”

তখন আবার দুইজনে ‘ভাব’ হইয়া গেল। বিজ্ঞাপনটি আবার পঠিত হইল। কত কথার আলোচনা হইল। সুষমা সেই বিজ্ঞাপনের উপরিভাগের মুদ্রিত পঞ্চতল অট্টালিকা দেখিয়া বলিল “উঃ বাড়ীটা ত মস্ত!” অবিনাশ বলিল, “তা হবে না? এত বড় একটা ব্যাপার—কত ছাত্র ছাত্রী ভর্ত্তি হবে তার কি হিসেব আছে?”

পাঁচ

ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে, উভয়ে একদিন গিয়া কলেজটি দেখিয়া আসিবার পরামর্শ ছিল, সেই পরামর্শ আজ কার্য্যে পরিণত হইবে। আজ বিকালের ঘণ্টায় অবিনাশের ক্লাস ছিল না; বেলা দুইটার সময় সে বাড়ী আসিয়াছে। চারিটা বাজিলেই, স্ত্রীকে প্রস্তুত হইবার জন্য সে তাগাদা দিতে লাগিল।

সুষমা জুতা মোজা পরিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, বেলা সাড়ে চারিটার সময় স্বামীর সহিত বাহির হইল। দুজনে ট্রামেই গেল। কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে নামিয়া, পাঁচ মিনিট মধ্যেই নূতন রাস্তায় উপন্যাস কলেজ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিল, বাড়ীটা বিজ্ঞাপনের ছবির অনুরূপ প্রকাণ্ড পঞ্চতল অট্টালিকাই বটে; কিন্তু সমস্তটাই উপন্যাস কলেজ নহে। নীচের তলায় কুঠুরিগুলিতে চা চপ কাটলেটের "কেবিন", সাইকেল মেরামতের দোকান, পানবিড়ির দোকান, ময়রার দোকান প্রভৃতি—দোতলাটা মাত্র কলেজ। ত্রিতল চতুস্তল ও পঞ্চতলে মাড়োয়ারীগণ বাস করে।

যাহা হউক, উভয়ে দ্বিতলে উঠিল। প্রথমেই একটা কক্ষের বাহিরে আঁটা তক্তায় "অফিস" অঙ্কিত দেখিয়া, পর্দ্দা ঠেলিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। গোঁফদাড়ি কামানো ঝাঁকড়া চুল, চোখে সোণার চশমা আঁটা এক যুবক রেজিষ্টারি বহি, খাতাপত্র লইয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি আগন্তুকদ্বয়ের পানে চাহিয়া, চেয়ার দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া, একখণ্ড নিয়মাবলী এবং একখানি ভর্ত্তি হইবার ফরম্ অবিনাশের হাতে দিলেন। অবিনাশ ও সুষমা একত্র তাহা পাঠ করিতে লাগিল।

পাঠ শেষে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল "ছাত্রীবিভাগে কতগুলি মেয়ে ভর্ত্তি হয়েছে মশাই?"

বাবুটি বলিলেন, "জন ত্রিশ এ পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হয়েছে। আরও অ্যাপ্লিকেশন আসছে। পঞ্চাশ পূর্ণ হলে আর আমরা নেবো না; মেয়েদের ক্লাস ঘরে আর বেশী ধরবে না। এত ছাত্রী ভর্ত্তি হতে চাইবে আগে তা আমরা ভাবিনি।"

"মেয়েদের ক্লাসে কে কে পড়াবেন?"

কেরাণীবাবু একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া তাহার উপর চক্ষু রাখিয়া বলিলেন, "ছোট গল্প সম্বন্ধে লেকচার দেবেন সরোজ রায়, আর শৈলেন চাটুয্যে। উপন্যাস সম্বন্ধে রজনীবাবু আর লীলাবতী সেন। ভাষা বর্ণনা শেখাবেন নৃপেন সোম আর চঞ্চলা দেবী।"

সকলেই জানেন—সুষমা অবিনাশও জানিত—বর্ত্তমান বঙ্গীয় তরুণ সাহিত্যে এই লেখক লেখিকাগণের স্থান খুব উচ্চে। অবিনাশ বলিল "এঁরা ত আজকালকার খুব নামজাদা সাহিত্যিক।"

কেরাণীবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়।"

"ঐ যে সরোজবাবুর নাম করলেন 'নবরশ্মি' মাসিকপত্রের সম্পাদক সরোজবাবু কি?"

"তিনিই।"

"তা হলে ষ্টাফ্ ত খুব ষ্ট্রং হয়েছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। নইলে আর ভর্ত্তি হবার জন্যে এত ভিড়!"

"আচ্ছা—নমস্কার মশাই—এখন তাহলে আমরা উঠি।"—বলিয়া অবিনাশ দাঁড়াইল। কেরাণীবাবু বলিলেন, "যদি ভর্ত্তি হওয়াই স্থির হয়, তবে বেশী দেরী করবেন না,—কারণ স্থান বড়ই কম—আর যে রকম অ্যাপ্লিকেশন আসছে—"

"যে আজ্ঞে—দেরী করবো না—খুব সম্ভব, কালই এসে টাকা জমা দিয়ে যাব।"—বলিয়া অবিনাশ স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

ছয়

পরদিনই অবিনাশ গিয়া সুষমার ভর্ত্তি হওয়ার ফী প্রভৃতি জমা দিল। সপ্তাহ পরে লেকচার আরম্ভ হইল। সেদিন অবিনাশ বেলা দুইটার সময় স্ত্রীকে তাহার কলেজে পেঁছাইয়া, নিজকর্ম্মে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। বেলা চারিটায় সুষমার ছুটি হইবে—

অবিনাশের কার্য্যও তৎপূর্ব্বেই শেষ হইবে। উপন্যাস কলেজে গিয়া স্ত্রীকে লইয়া সে ট্রামে বাড়ী ফিরিবে।

ছুটির পর রাস্তায় বাহির হইয়া সুষমা স্বামীকে বলিল, "ওগো দেখ, বলেছিল যে পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত ছাত্রী নেওয়া হবে—তা নয়, আমি নিয়ে মোটে সাতাশটি মেয়ে ত দেখলাম—আর সবাই কোথায় গেল?"

অবিনাশ বলিল, "আজ ত মোটে প্রথম কিনা। যারা ভর্ত্তি হয়েছে, সবাই বোধ হয় আজ আসেনি। ক্রমে ক্রমে সব আসবে বোধ হয়।"

ট্রামে উঠিয়া, দুজনে বেশী কথাবার্ত্তা হইল না। বাড়ী আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর, চা খাইতে বসিয়া অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি কি হল বউ?"

"আমরা সবাই ক্লাসে বসলাম। তার পর ঘণ্টা বাজলো, বর্ণনা শিক্ষার প্রোফেসার নৃপেন সোম এলেন। বোর্ডের গায়ে একখানা মস্ত ছবি টাঙিয়ে দিলেন। বড় বড় চুল, বড় বড় দাড়ি এক মিন্সে; চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে; বয়স ত্রিশের বেশী নয়। প্রোফেসার বললেন,—'এই লোকটার চেহারা তোমরা সবাই এক মনে বেশ করে খানিকক্ষণ দেখ—তার পর, খাতায় এর চেহারার বর্ণনা লেখ—আর, উপস্থিত এর মনের ভাব কি হওয়া সম্ভব—তাও অনুমান ক'রে লেখ।'—এই ব'লে তিনি পকেট থেকে এক তাড়া প্রুফ বের করে, দেখতে বসে গেলেন। আমরা ছবিখানা দেখে, বর্ণনা লিখতে লাগলাম।"

"তার পর?"

"ঘণ্টা শেষ হলে, তিনি খাতাগুলো সব নিলেন। দ্বিতীয় ঘণ্টায় এক একখানা খাতা নিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন, আর ভুল ত্রুটিগুলি সব বোঝাতে লাগলেন।"

"তুমি কি লিখেছিলে?'

"আমি চেহারাটা বর্ণনা করবার পর লিখেছিলাম, প্রথম যৌবনে একটি মেয়ের সঙ্গে এর ভালবাসা হয়েছিল; কিন্তু মেয়ের বাপের ঘোর আপত্তি থাকায় বিয়ে হতে পারেনি। তখন দুজনে পরস্পরের নিকট এই প্রতিজ্ঞা ক'রে বিদায় নিয়েছিল যে, তারা আজীবন কৌমার্য্য ব্রত পালন ক'রে, পরলোকে মিলনের আশায় থাকবে। মেয়েটি পিতৃগৃহেই রইল, যুবকটি মনের খেদে বনবাসী হল। দশ বৎসর পরে যুবকের ইচ্ছা হল,—দূর থেকে একবার তার প্রিয়তমাকে চোখের দেখা দেখে আসবে। বন ছেড়ে লোকালয়ে এসে দেখলে, তার প্রিয়তমা দিব্যি বিয়ে থাওয়া ক'রে, ছেলে মেয়ের মা হয়ে সংসার ধর্ম্ম পালন করছে। তাই, দেখে, যুবকের মনে ভয়ানক দুঃখ ও রাগ হয়েছে।"

অবিনাশ বলিল, "এনক আর্ডেন। অন্য ছাত্রীরা সব কি লিখেছিল?"

সুষমা বলিল, "সে সব অদ্ভুত। কেউ লিখেছিল এ খুন কিম্বা ডাকাতি করতে যাচ্ছে—কেউ লিখেছিল গাঁজা খেয়ে এ পাগল হয়ে গেছে—এই রকম সব।"

"প্রোফেসর কি বললেন?"

"তিনি আমারটাই খুব ভাল হয়েছে বললেন। বললেন, যে সকল লোকের সঙ্গে তুমি সংস্রবে আস,—তোমার স্বামী, আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী—সকলের মুখ দেখে তাদের মনের ভাবটা বিশ্লেষণ করতে সর্ব্বদা চেষ্টা করবে। মনস্তত্ত্বই হ'ল আসল জিনিষ—সেইটে যিনি যত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন,—উপন্যাস রচনায় তিনি তত বেশী সিদ্ধিলাভ করবেন।'—বললেন, 'তোমার ভিতর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, এক মনে সাধনা কর।'—আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন।"

এই সংবাদ শ্রবণে অবিনাশের বুকটা আহ্লাদে দশ হাত হইল। বলিল, "তোমার ভিতর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ যে আছে, এটা ত অনেক দিন আগেই তোমার এ অধম ভৃত্য আবিষ্কার করেছিল!"

সপ্তাহে তিন দিন সুষমার ক্লাস হইয়া থাকে। অবিনাশ তাহাকে নিয়মিত ভাবে কলেজে পৌঁছাইয়া দেয় এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসে। লেক্‌চার, এক্সারসাইজ প্রভৃতি কিরূপ হইতেছে তাহা নিত্যই সে খবর লয়।

একদিন সুষমা বলিল, "ওগো, কালকে আমাদের ডবল ক্লাস—বেলা একটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলেজ। ছোট গল্পের প্রোফেসর সরোজ রায়, আমাদের একটি গল্পের চুম্বক দেবেন—ক্লাসে বসে—সেই গল্পটি চা'র ঘণ্টায় আমাদের সবাইকে লিখতে হবে। যে গল্প সবচেয়ে ভাল হবে, সেটি সরোজবাবু তাঁর 'নবরশ্মি' কাগজে ছেপে দেবেন বলেছেন।"

"আচ্ছা বেশ, কাল আমি তোমায় সময় মত কলেজে পেঁছে দেবো এখন।"

পরদিন অবিনাশ তাহাই করিল। তার নিজ ক্লাস সেদিন তিনটা হইতে চারটা। সুতরাং দুই ঘণ্টা কাল তাহাকে গোলদীঘির ধারে বসিয়া "স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে" কাটাইতে হইল। বৃক্ষছায়ায় বেঞ্চির উপর বসিয়া, বায়ুভরে গোলদীঘির ঈষত্তরঙ্গিত বক্ষের পানে চাহিয়া, তাহার নিজ বক্ষও আশার হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—এমন একদিন কি আসিবে না, যেদিন উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী সুষমা দেবীর নব প্রকাশিত উপন্যাসের প্লাকার্ডে কলিকাতার দেওয়াল ছাইয়া যাইবে! এমন একদিন কি আসিবে না, যেদিন পথে, ট্রামে, ট্রেণে, সভাসমিতিতে, আমাকে দেখাইয়া লোকে ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া বলাবলি করিবে—'ও লোকটা কে জান হে? ওই হচ্চে সুষমা দেবীর স্বামী!'—আশা কাণে কাণে কহিল—"আসিবে, সেদিন আসিবে।'

সাত

এক্সারসাইজ স্বরূপ লিখিত সুষমার গল্পটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে বিবেচনায় প্রোফেসার সরোজ রায় সেটি 'নবরশ্মি' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। যেদিন উহা প্রকাশিত হয়, অবিনাশ স্বয়ং 'নবরশ্মি' কার্য্যালয়ে গিয়া ঐ সংখ্যা পঁচিশখানি কিনিয়া আনিয়া, কুড়িখানা ডাকযোগে আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট পাঠাইয়া দিল। বউয়ের গল্পটির শিরোনামার উভয় পার্শ্বে মোটা লাল পেন্সিলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল। কোনও বন্ধু বান্ধব সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, দুই চারি কথার পরই অবিনাশ বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, ভাল কথা, 'নবরশ্মি' কাগজে বউয়ের একটা গল্প বেরিয়েছে পড়েছ কি?"—এবং বন্ধুকে, সেখানে বসাইয়া, গল্পটি আগাগোড়া না পড়াইয়া ছাড়িত না। একখানি 'নবরশ্মি' সর্ব্বদাই তাহার পকেটে থাকিত, এবং প্রায় প্রতিদিনই সে নিজে গল্পটি দুই একবার পড়িত।

একদিন অবিনাশ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজকাল তোমাদের কি বিষয়ে লেকচার হচ্চে বউ?"

সুষমা বলিল, "প্রেম-তত্ত্ব। প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমের স্বরূপ আর প্রেমের প্রকারভেদ হয়ে গেছে—কথা-সাহিত্যে প্রেমের প্রভাব এখন হচ্চে। কিন্তু সরোজবাবু যা বলছেন, তা কিন্তু আমার মনে লাগে না।"

"সরোজবাবু কি বলছেন?"

"তিনি বলছেন, দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে, নিষিদ্ধ, পরকীয় পরকীয়া প্রেমের রস বেশী—আবেগ বেশী, উন্মাদনা বেশী, তাই নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র থাকলেই গল্প উপন্যাস সব চেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়। এই কথা শুনে, সাত আটটি মেয়ে চটেমটে ত কলেজ ছেড়েই দিয়েছে।"

"আজকাল তোমাদের কলেজে ছাত্রী সংখ্যা কত?"

"আমি নিয়ে ঊনত্রিশটি।"

"কেন? প্রথম দিনেই ছিল সাতাশটি। পঞ্চাশজন পর্যন্ত নেওয়া হবে—সে পঞ্চাশ ত কোন কালে পূরে যাবার কথা। এত কমে গেল কি করে বউ?"

সুষমা বলিল, "পঞ্চাশ কোনও দিনই হয়নি। একচল্লিশ বিয়াল্লিশ জন হয়েছিল। তার পর আবার অনেকে ছেড়ে দিলে।"

"কেন? ছেড়ে দিলে কেন?"

"দু'জনার, ছেলে হবে বলে তারা চলে গেছে। প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে সাত আটজন পালালো। আরও তিন চারজন তাদের স্বামীদের মত থাকলেও শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মত নেই, তাঁরা শুনে রাগ করেছেন, সেই ওজুহাতে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। দেখ, আমারও কিন্তু আর ভাল লাগছে না—পাছে তুমি রাগ কর, সেইজন্যে এতদিন আমি তোমায় বলিনি। বিশেষ ঐ সরোজ রায়—যখন থেকে 'নবরশ্মি'তে আমার গল্পটা বেরিয়েছে, তখন থেকে আমার সঙ্গে যেন কি রকম ব্যবহার করে।"

"কি রকম ব্যবহার করে?"

"পুরুষ শিক্ষক আর যুবতী ছাত্রীর মধ্যে যে শোভন ব্যবধানটুকু থাকা দরকার তা সে আর রেখে চলছে না।"

অবিনাশ হাসিয়া বলিল, "ওটা তোমার ভুল, সুষমা। তরুণ সাহিত্যের তিনি একজন অত বড় লেখক—অত বড় কাগজের সম্পাদক—হঠাৎ তাঁর প্রতি কোন মন্দ উদ্দেশ্য আরোপ করা তোমার উচিত নয়। তুমিই হলে ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্রী—সবার চেয়ে তোমার উপরেই বেশী ভরসা রাখেন—তাই বোধ হয় একটু আত্মীয়তার ভাব এসে পড়েছে। ওটা কিছু নয়।"

কিছুদিন পরে সুষমার খুকীর জ্বর হইল। জ্বরটা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই কারণে এক সপ্তাহ সুষমা কলেজ যাইতে পারিল না।

সপ্তাহ পরে, খুকী আরোগ্য লাভ করিলে, অবিনাশ স্ত্রীকে আবার যথারীতি কলেজে পোঁছাইয়া দিয়া আসিল।

যথাসময়ে স্ত্রীকে আনিতে গিয়া অবিনাশ শুনিল, আজ কলেজ বন্ধ—রাসপূর্ণিমার ছুটি। স্ত্রীর খোঁজ করিতে দ্বারবান বলিল, মাইজী বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। প্রবল জ্বরে তিনি কাঁপিতেছিলেন, চক্ষু দুইটি 'লাল-সুরুখ' হইয়াছিল, দ্বারবান ট্যাক্সি ডাকিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়াছে।

অবিনাশ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে ট্রামে বাসায় ফিরিল। বাসায় আসিয়া ভৃত্যের নিকট শুনিল,—মাইজী কলেজ হইতে ট্যাক্সিতে ফিরিয়া আর উপরে উঠেন নাই, ঝিকে ডাকিয়া গঙ্গাস্নানের বস্ত্রাদি আনিতে আদেশ দিয়া কালীঘাট যাতায়াতের জন্য তাহাকে ঠিকাগাড়ী আনিতে বলিলেন। গাড়ী আসিবামাত্র খুকীকে ও ঝিকে লইয়া তিনি কালীঘাট যাত্রা করিয়াছেন।

শুনিয়া অবিনাশ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর শরীর কেমন দেখলি?" ভৃত্য বলিল, "কেন, শরীর ত ভালই ছিল বাবু। তিনি বলেছেন, গঙ্গাস্নান করে কালীঘাটে পুজো দিয়ে তার পর ফিরবেন। বললেন বাবু এলে বোলো তিনি যেন না ভাবেন।"

ব্যাপারটা অবিনাশের নিকট দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত মনে হইল। প্রবল জ্বর ও রক্তচক্ষু লইয়া কলেজ হইতে যে মানুষ চলিয়া আসিল, বাড়ী আসিয়াই, তার জ্বর ভাল হইয়া গেল, সে গঙ্গাস্নানে বাহির হইল! হঠাৎ কালীঘাটে পূজা দিবারই বা অর্থ কি? যাহা হউক, অবিনাশ ধৈর্য্য সহকারে স্ত্রীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

আট

সন্ধ্যার সময় সুষমা ফিরিল। সদ্যস্নাতা, পরিধানে গরদ, সীমন্তে মোটা করিয়া সিন্দুর লিপ্ত—অবিনাশ স্ত্রীর এই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া প্রীতিবিহ্বলনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সুষমা আসিয়াই গড় হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল।

অবিনাশ বলিল, "বউ, ব্যাপার কি? জ্বর হয়েছে বলে তুমি কলেজ থেকে ট্যাক্সি করে চলে এসেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ জ্বর হল কেমন করে? আর তাই হয়েছিল যদি ত গংগাস্নান করতে গিয়েছিলে কেন বউ?"

"জ্বর হয়নি।"

"কিন্তু দারোয়ান যে বললে!"

"সে তাই মনে করেছিল বটে। জ্বর আমার হয়নি।"

"তবে? হঠাৎ এই অবেলায় স্নান—আর, তাড়াতাড়ি কালীঘাটে পুজো দিতে যাওয়া—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে বউ!"

সুষমা বলিল, "পরে বলবো।"

"কখন বলবে?"

"রাত্রে। এখন এই সব ঝি চাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটু নিরিবিলি না হলে তোমায় সব কথা খুলে বলতে পারবো না।"

অবিনাশ বলিল, "তুমি যে আমায় বড়ই দুশ্চিন্তায় ফেললে সুষমা। কোনও অমঙ্গল, কোনও অশুভ ঘটেছে কি?"

"হ্যাঁ—না।"

"ঘটেওছে, ঘটেওনি? কি বলছ তুমি? বিস্তারিত না পার, সংক্ষেপে বল।"

সুষমা বলিল, "সংক্ষেপেই বলছি—আমি আর ও কলেজে পড়বো না। সব কথা শুনলে, তুমিও আমায় আর সেখানে যেতে বলবে না। এখনও আমার মনটা বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত রয়েছে—আর কোনও কথা এখন তুমি আমায় জিজ্ঞেস কোর না গো তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"—বলিয়া, প্রায় সাশ্রু নয়নে সুষমা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। রান্নাঘরে গিয়া স্বামীর চায়ের উদ্যোগ করিতে বসিল।

রাত্রে সুষমা স্বামীর কাছে সকল কথাই বলিল—"তোমায় ত আমি আগেই বলেছিলাম, সরোজ রায় লোকটা কী রকম ভাবে আমার পানে চায়—দেখে আমার ভারি রাগ হয়। তুমি আমাকে বলেছিলে, ও সব কিছু নয়, ও সব আমার মনের ভ্রম।—খুকীর অসুখের জন্যে সাত দিন কলেজে যাইনি ত। আজ তুমি আমায় সিঁড়ির কাছে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলে। আমি উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, ক্লাস সব শূন্য। দারোয়ান বললে, আজ রাসপূর্ণিমার ছুটি আপনি কি জানতেন না?—আমি বললাম, না, আমি ত এক হপ্তা কলেজে আসিনি। বলে, আমি বারান্দায় গেলাম, তোমায় যদি রাস্তায় দেখতে পাই ত তোমায় ডাকবো ব'লে। রেলিং-এর উপর ঝুঁকে দেখলাম তুমি প্রায় কলুটোলা ষ্ট্রীটের কাছে গিয়ে পৌঁছেছ—ডাকলে তুমি শুনতে পাবে না। কলেজেই অপেক্ষা করবো—একটা ট্যাক্সি আনিয়ে বাড়ী ফিরবো, দাঁড়িয়ে ভাবছি—এমন সময় দেখি, সরোজ রায় ক্লাস ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে—'সুষমা, শুনে যাও।'—'আজ ছুটি আমি জানতাম না স্যার'—ব'লে আমি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। সরোজ রায় কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এ ক'দিন আসনি কেন?' বললাম, 'আসতে পারিনি স্যার—আমার খুকীর অসুখ হয়েছিল।'—'কি অসুখ হয়েছিল?'—বলতে বলতে সরোজ আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল, খুকীর যা অসুখ হয়েছিল, আমি সংক্ষেপে বললাম। শুন্য

ক্লাস ঘরে আমার গা ছম্ছম্ করছিল, কোনও রকমে কথাটা সেরে পালাতে পারলে বাঁচি। সরোজ বললে—'এখন খুকী ভাল হয়েছে ত? যাক্। কিন্তু তুমি যে কামাই করলে, ছুটি নিয়েছিলে?'—বললাম, 'আজ্ঞে না, ছুটি নিতে হয় তা আমি জানতাম না স্যার।' সরোজ বললে, 'কামাই করার জন্যে তোমার জরিমানা হবে তা জান?'—বললাম, 'তা যদি হয় ত দেবো স্যার।'—সরোজ বললে, 'দেবে? দেবে?'—তার কথার স্বরে আর তার ভঙ্গি দেখে আমার গা কেঁপে উঠলো। চলে আসবার জন্যে আমি ফিরে দাঁড়াতেই—সরোজ পিছন থেকে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে—এই তোমার জরিমানা—ব'লে—না গো—আর আমি বলতে পারবো না।"—বলিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাগে অবিনাশের সর্ব্বশরীর দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। স্ত্রীর মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া, সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কেঁদ না—যা হবার তা হয়ে গেছে। সে দুর্ব্বৃত্তকে তার উপযুক্ত শাস্তি আমি দেবো। তারপর, তুমি কি করলে তাই আমায় বল।"

সুষমা ক্রমে স্বামীর বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে, ঠাস্ করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলাম।—চড় মেরে, আমার নিজেরই হাত ঝন্ঝন্ করতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দারোয়ানকে বললাম, 'দারোয়ান আমায় শীগ্গির একখানা ট্যাক্সি ডেকে দাও আমি বাড়ী যাব।'—আমি তখন ঠক্ঠক্ করে কাঁপছি। দারোয়ান বললে, 'বোখার হুয়া মাইজী?'—আমি বললাম, 'হ্যাঁ বাবা, বহুৎ বোখার হুয়া। দাঁড়াতে পারছিনে।' সে নিজের টুল ছেড়ে উঠে বললে, 'আঁখভি বহুৎ লাল হুয়া। আপ হিঁয়া বৈঠিয়ে মাইজী, হাম আভি টেক্সি বোলায়ে দেতে হাঁয়।'—ট্যাক্সিতে বসে বসেই স্থির করেছিলাম, এ অপবিত্র দেহ নিয়ে বাড়ী ঢুকে স্বামীর মন্দির কলুষিত করবো না—গঙ্গাস্নান ক'রে সতী শিরোমণি কালীমাকে প্রণাম ক'রে, তাঁর প্রসাদী সিন্দুর মাথায় প'রে পবিত্র হয়ে তবে বাড়ী ঢুকবো।"—বলিয়া সুষমা নীরব হইল। স্বামীর কোলে মাথা দিয়া বিছানার উপর দেহ এলাইয়া দিল। অবিনাশও নীরবে স্ত্রীর মাথায়, কপালে, বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।

স্বামীর এই নীরব সান্ত্বনায় কিয়ৎক্ষণ পরে সুষমা অনেকটা শান্ত হইল। ক্রমে সে উঠিয়া বসিল।

"আমি প্রতিজ্ঞা করলাম সুষমা, এর উপযুক্ত প্রতিফল সেই পাষণ্ডকে আমি দেবো, এবং কালই।—তুমি শান্ত হও—যা হয়েছে তা ভুলে যেতে চেষ্টা কর।"—বলিয়া অবিনাশ স্ত্রীকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল।

সুষমা বাধা দিয়া বলিল, "এখন না—গঙ্গাস্নান ক'রে গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়ে এই ঠোঁট দুটো বেশ করে আমি মেজে ফেলেছি। তারপর, মা কালীর মন্দিরের চৌকাঠের উপরও ঠোঁট দুটো বুলিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার মনের গ্লানি যায়নি—তোমার পায়ের ধুলো দাও, তাই আমি ঠোঁটে মেখে এ দুটোকে পবিত্র ক'রে নিই।"—বলিয়া সুষমা স্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া, নিজ মস্তকে ঠেকাইয়া তাহাতে চুম্বন করিতে লাগিল।

পরদিন 'নবরশ্মি' আফিসে প্রবেশ করিয়া ক্রোধোন্মত্ত অবিনাশ সরোজকে সড়াং সড়াং করিয়া কয়েক ঘা বেত মারিয়াছিল, সে কথা লইয়া সাহিত্যিক মহলে কিরূপ হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু আসল কারণ কেহই জানিতে পারে নাই। 'নবরশ্মি'র তরফ হইতে ইহাই প্রচার করা হইয়াছিল যে, অবিনাশ-বাবুর প্রেরিত কোনও প্রবন্ধ অমনোনীত করার জন্যই নিরীহ সম্পাদক মহাশয় গুরুতরভাবে তাঁহার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

যোগবল না সাইকিক ফোর্স ?

অধিক বয়স পর্য্যন্ত মেয়ের বিবাহ না দিয়া ইংরাজি বোর্ডিং-এ রাখিয়া কলেজের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাকে "মেম সাহেব" বানাইবার পর, সে যদি পিতৃনির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করিতে অসম্মত হয়.—পিতামাতার অবাধ্যতা করে,—তবে সে দোষ কাহার? মেয়ের, না তার পিতার? নবগোপালবাবু এখন স্বকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ করিতেছেন!

ইঁহার পুরা নাম নবগোপাল চট্টোপাধ্যায়। বহির্ব্বাটীতে বাবুর্চ্চি প্রকাশ্যভাবে মুর্গীও রন্ধন করে, আবার অন্তঃপুরে লক্ষ্মীপূজা ইতুপুজাও হয়। আমদানী রপ্তানির কারবার—ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ইঁহার বড় 'হউস' আছে, তিনটা ব্যাঙ্কে চলতি হিসাব, দুইখানা মোটর কার। দুটি পুত্র সুবোধ ও প্রবোধ—সুবোধ বিলাতে; প্রবোধ প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়িতেছে। একটি মাত্র কন্যা প্রমীলা—সেই সর্ব্বকনিষ্ঠা—বয়স আঠারো বৎসব—চেহারাটিও ভাল। আই-এ পরীক্ষা শেষ হইলে সিমলা পাহাড়ে তার মাসি ও মেসোমহাশয়ের নিকট বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিল। সেখানে তার মাস দুই অবস্থানের পর, মাসিমা পত্র লিখিলেন, তাঁর কর্ত্তার কোনও পাঞ্জাবী বন্ধুর এক বিলাতফেরত পুত্র নব্য ব্যারিষ্টার মিষ্টার যোশীর সঙ্গে প্রমীলার অত্যন্ত "ভাব" হইয়াছে—উহারা পবস্পরকে বিবাহ করিতে ব্যাকুল।

নবগোপালবাবু ইতিমধ্যে কিন্তু কন্যার জন্য অন্য একটি পাত্র ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। রায় বাহাদুর খেতাবধারী জমিদারের ছেলে, এম-এ এবং আইন একসঙ্গে পড়িতেছে, দেখিতেও সুপুরুষ, কলিকাতায় বাপের পাঁচখানা বাড়ী আছে, ছেলে আইন পাস করিয়া এক বড় অ্যাটর্ণি আফিসের অংশীদার হইবে স্থির হইয়া আছে। পাত্রটিকে কর্ত্তা গৃহিণী উভযেরই ভরি পছন্দ; প্রমীলা সিমলা হইতে ফিরিলে আষাঢ় মাসে কিংবা শ্রাবণের প্রথমেই বিবাহ হইবে পরামর্শ হইয়া আছে।

এমন সময় সিমলা পাহাড় হইতে ঐ ভয়ানক পত্র আসিল। নবগোপালবাবুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। পাঞ্জাবী পাত্রটি ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যজাতি, পত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণ হইলেও, বাঙ্গালীতে পাঞ্জাবীতে বিবাহ সমাজনিয়মের একান্ত বহির্ভূত কর্ম্ম—জাতি যাইবে। তাঁর গৃহিণী ত কাঁদিযা কাটিযা অস্থিব হইলেন। পূর্ব্বে তাঁর ফিটের ব্যারাম ছিল, এদিকে অনেক দিন সেটা আর দেখা দেয নাই। আবার ফিট হইতে লাগিল। নবগোপালবাবু কন্যাকে টেলিগ্রাম কবিয়া দিলেন, "তোমার জননী অত্যন্ত পীড়িতা, শীঘ্র এস।"

টেলিগ্রাম পাইয়া প্রমীলা একটি মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল। মা কত স্তুতি-মিনতি কত কান্নাকাটি করিলেন, পিতা কত বুঝাইলেন, শেষে রাগ করিলেন, কিন্তু প্রমীলার মন অচল অটল! সে বলিল, "যাকে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি, তার সঙ্গে তোমরা বিয়ে যদি না দাও ত আমি বরং চিরকুমারী থাকবো—অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।"

দুই

গেজেট বাহির হইল, প্রমীলা আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্য সময় হইলে ইহা লইয়া পরিবারে যেরূপ আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইত, এখন সেরূপ কিছুই হইল না। নবগোপালবাবুর মুখখানি সর্ব্বদাই গম্ভীর, গৃহিণীর মুখখানি বিষণ্ণ, 'ছোড়দা' প্রবোধ কেবল বোনটির দুঃখের সমদুঃখী।

গ্রীষ্মাবকাশের পর সমস্ত কলেজগুলি খুলিল। কর্ত্তা ও গৃহিণীতে পরামর্শ করিয়া প্রমীলাকে বি-এ পড়িবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়াই স্থির করিলেন—পড়াশুনা লইয়া থাকিলে, তবু উহার মনটা একটু ভাল থাকিবে—এমন কি ক্রমে সেই অসামাজিক উদ্ভট বিবাহের বাসনা সে পরিত্যাগ করিতে পারে। তবে বোর্ডিং-এ মেয়েকে আর রাখা হইবে না, বাড়ী হইতেই প্রত্যহ কলেজে যাইবে।

প্রমীলা নিয়মিত ভাবে কলেজ যায়। কলেজের ফেরৎ সব সময় বাড়ী আসে না, তার সখীদের গৃহে গিয়া সময় যাপন করে। মেয়ের মন খারাপ, মা বাপ তাহাতে আপত্তি করেন না। সুকুমারী-নাম্নী তাহার এক সখীর, গত বৎসর নব্য ব্যারিষ্টার বসন্ত রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে—তাহারা ভবানীপুরে বাস করে, প্রমীলা অনেক সময় সেই সুকুমারীর গৃহে গিয়া দীর্ঘ সময় যাপন করে। সুকুমারীও মাঝে মাঝে প্রমীলাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসে।

কার্ত্তিক মাসের শেষে প্রমীলা জ্বরে পড়িল। জ্বরের বিরাম হয় না। গৃহচিকিৎসক দত্ত সাহেব আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন—জ্বরটা টাইফয়েডে না দাঁড়ায়!

সপ্তাহ অতীত হইল। রক্ত পরীক্ষা করিয়া, টাইফয়েডই সাব্যস্ত হইল। বড় বড় ডাক্তারদের পরামর্শ সভা বসিল। শুশ্রূষার জন্য তিনজন মেম নার্স নিযুক্ত হইল। যথারীতি চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতে লাগিল।

মহা দুশ্চিন্তায় এক একটা করিয়া তিনটা সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সুকুমারী প্রত্যহ আসে। সারাদিন থাকে, বিকালে বাড়ী যায়। ক্রমে ডাক্তারেরা বলিলেন, আর আশঙ্কা নাই। কিন্তু অন্য একটা মহা বিভ্রাট উপস্থিত! গত তিন দিন প্রমীলার মুখে কেহ বাক্যস্ফুরণ হইতে শুনে নাই। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে ইসারায় উত্তর দেয়।

পিতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন আছ মা?"

প্রমীলা মাথা হেলাইয়া জানায়—"ভাল।"

মা আসিয়া বলেন, "ক্ষিধে পেয়েছে কি? একটু বেদানার রস খাবে?"

প্রমীলা মাথা নাড়িয়া জানায়—খাইবে না।

ছোড়দা জিজ্ঞাসা করে—"তুই কথা কোস্‌নি কেন পিসি?"

প্রমীলা ওষ্ঠযুগল সঙ্কুচিত করিয়া জানায়—কি জানি?

"তুই কি কথা কইতে পারছিসনে?"

প্রমীলা স্পষ্টভাবে মাথা নাড়িয়া জানায়—"না।"

ডাক্তারেরা বলিলেন, ব্রেণের স্পীচ্ সেণ্টর ডিষ্টার্বড্ হইয়াছে—একটু সুস্থ হইলেই, দেহে একটু বল পাইলেই ওটা বোধ হয় আপনিই ঠিক হইয়া যাইবে।

নিজ্জ্বর হইবার দশ দিন পরে প্রমীলা অন্নপথ্য করিল; কিন্তু কথা কহিল না।

প্রমীলা এখন উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়—বই পড়ে—কিন্তু কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইসারায় অথবা কাগজে লিখিয়া উত্তর দেয়। পিতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কাগজে লিখিয়া দিল—"বাবা, আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না।"

আবার বড় বড় ডাক্তারদের বৈঠক বসিল; প্রেস্ক্রিপসন প্রস্তুত হইল, ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল; কিন্তু কোনও ফল দর্শিল না।

পিতামাতা আত্মীয় স্বজন তখন হতাশ হইলেন; স্থির করিলেন, মেয়েটি জন্মের মত বোবা হইয়া গেল।

দুঃখের দিন, একটি একটি করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল।

তিন

পূজার ছুটির পর আবার কলেজ খুলিয়াছে। নবগোপালবাবু কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কলেজ যাবে না?"

প্রমীলা একটা কাগজে লিখিয়া দিল, "না বাবা, আমি বোবা মেয়ে, কলেজে আমার ভারি লজ্জা করবে।" নবগোপালবাবু রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

নবগোপালবাবু ও তাঁহার পত্নী, নানাবিধ উপায়ে দুঃখিনী কন্যার মনস্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কন্যার ব্যবহারের জন্য একখানি স্বতন্ত্র মোটর গাড়ী কিনিয়া দিলেন। সেই গাড়ীতে প্রমীলা সকালে বিকালে বেড়াইতে বাহির হয়। সুকুমারীর বাড়ী গিয়াও মাঝে মাঝে সারাদিন যাপন করে।

শীতকাল আসিল। কলিকাতা বিবিধ প্রকার আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী হোটেলগুলি, য়ুরোপ হইতে আগত ভূপর্য্যটনকারিগণে পরিপূর্ণ। সংবাদ বাহির হইল, সম্মোহন-বিদ্যাপারদর্শী (hypnotist) সাবাটিনি নামক একজন ইতালীয় ভদ্রলোক আসিয়া গ্র্যাণ্ড হোটেলে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সম্মোহন-বিদ্যা বলে নানা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন।

ক্রমে, সংবাদপত্রে আশ্চর্য্যজনক দুই একটা আরোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল। সুকুমারী আসিয়া প্রমীলার মাতাকে ঐ সমস্ত পড়িয়া শুনাইল। নবগোপালবাবুর বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনার মেয়েটিকে একবার দেখান না।"

নবগোপালবাবু বাড়ী গিয়া, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী লইয়া "রজনী" উপন্যাসের অন্তর্গত "যোগবল না সাইকিক ফোর্স" পরিচ্ছেদটি পাঠ করিলেন। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসেও, রামানন্দ স্বামী কর্তৃক, শৈবলিনীর সম্মোহন-ব্যাপারটিও মনোযোগ সহকারে পড়িলেন। গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন প্রাতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাত করাই স্থির হইল।

নবগোপালবাবু ইংরাজী পোষাকেই গিয়াছিলেন। হোটেলের দ্বারবানের নিকট সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সে ব্যক্তি সসম্মানে তাঁহাকে দ্বিতলে লইয়া গিয়া সাহেবের খাস চাপরাশির জিম্মা করিয়া দিল। চাপরাশি বলিল, সাহেব এখন ছোট হাজরি খাইতেছেন, দশ মিনিট মধ্যেই সাক্ষাৎ হইবে। বলিয়া তাঁহাকে একটি বসিবার কক্ষে লইয়া গেল। নবগোপালবাবু দেখিলেন, কক্ষখানির সমস্ত দেওয়াল ও উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত, সেই বস্ত্রাবরণের স্থানে স্থানে বিভিন্ন বর্ণের রেশম সূত্রের সূচিকর্ম্মে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত জানোয়ার ও মনুষ্যের কঙ্কাল অঙ্কিত। এক কোণে টেবিলের উপর একটা মড়ার মাথা, অপর এক কোণে বিভিন্ন বর্ণের কয়েকটি স্ফটিক গোলক রক্ষিত।

নবগোপালবাবু একটা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। ঐ সব কঙ্কালের চিত্রের প্রতি চাহিয়া তাঁহার গা-টা যেন ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। তারপর ভাবিলেন, আমি ত কোনও জঙ্গলে, কোনও কাপালিক বা যাদুকরের গুহামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হই নাই! ইংরাজ রাজধানী কলিকাতা এবং তাহার সর্ব্বোত্তম হোটেল—এখানে ভয় কি?

কিয়ৎক্ষণ পরে সাবাটিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সুশ্রী যুবাপুরুষ, বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না, চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল, তারকাযুগল ইংরাজের ন্যায় নীলবর্ণ নহে—ইতালীয়গণের অনুরূপ কৃষ্ণবর্ণ। যুবক সহাস্যবদনে নবগোপালবাবুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া ইংরাজী ভাষায় বলিলেন, "আমি আপনার জন্য কি করিতে পারি, মহাশয়?"

নবগোপালবাবু তখন তাঁহার কন্যার পীড়ার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া সাহেব নীরবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মেয়েটির বয়স কত?"

নবগোপাল। আঠারো।

সাহেব। বিবাহ হইয়াছে?

নব। না,—সে এখনও কলেজে পড়ে—অর্থাৎ পীড়ার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত পড়িয়াছে।

সাহেব। ক্ষীণাঙ্গী না স্থূলাঙ্গী?

নব। ক্ষীণাঙ্গী।

সাহেব। গাত্রবর্ণ কিরূপ?

নব। আমার চেয়ে ফর্সা।

সাহেব। স্বভাব কিরূপ? একগুঁয়ে—যা ধরেন তাই করেন? না, অন্যে সহজেই তাঁহাকে চালিত করিতে পারে?

নব। না, অন্যে সহজে তাহাকে চালিত করিতে পারে না। মেয়েটি আমার বিলক্ষণ একগুঁয়েই বটে।

সাহেব। তরল-প্রকৃতি না গম্ভীর? মাফ করিবেন মিষ্টার চাটার্জ্জি—তাঁহাকে হিপ্‌নটাইজ্‌ করা আমার পক্ষে সহজ হইবে, না কঠিন হইবে, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য এ সকল কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

নব। তাহা আমি বুঝিয়াছি। আমার কন্যা তরল প্রকৃতি নহে, বরং গম্ভীর।

সাহেব। বেশ। আমি তাঁহার আরোগ্য-চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি—অবশ্য সফল হইব কি না তাহা বলিতে পারি না। আপনার কন্যাকে আমি হিপ্‌নটিক নিদ্রায় অভিভূত করিব। করিয়া, তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। যদি তাঁহার এই ব্যাধির কোনও ঔষধ বা নিরাময়ের অন্য কোনও উপায় থাকে, তবে তিনি সেই হিপ্‌নটিক নিদ্রার অবস্থায় স্বয়ং তাহা বলিয়া দিবেন। যদি না থাকে, তবে তাহাও তিনি বলিবেন। আমার ফী কত আপনি জানেন কি?

নব। না।

সাহেব। হিপ্‌নটাইজ করিবার জন্য আমি ৫০০্ লইব। যদি ব্যাধি আরোগ্যের উপায় করিয়া দিতে পারি—তবেই আর ৫০০্ লইব নচেৎ আর কিছু লইব না। আপনি সম্মত আছেন?

নব। আহ্লাদের সহিত।

সাহেব। আপনার কন্যাকে কি এখানে লইয়া আসিবেন, না, আমি আপনার বাড়ীতে যাইব?

নব। আমার বাড়ীতে হইলেই ভাল হয়।

সাহেব। আচ্ছা, তবে কাল রাত্রি ১০টার সময় আমি আপনার কন্যাকে হিপ্‌নটাইজ করিব। কাল সারাদিন মেয়েটিকে উপবাসী থাকিতে হইবে: জলবিন্দুটিও তাঁহার মুখে যেন না প্রবেশ করে। সারাদিন তিনি কোথাও বাহির হইবেন না, শয্যায় শুইয়া কাটাইবেন। আমার করণীয় শেষ হইলে, তবে তিনি খাইতে পাইবেন। আপনি কি আমায় লইতে আসিবেন, না আপনার ঠিকানা দিয়া যাইবেন? এই অপরিচিত নগরে রাত্রে কিন্তু আপনার বাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হইতে পারে।

নব। না, আমিই আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব। চেকখানাও সঙ্গে আনিব।

"উত্তম। রাত্রি সাড়ে ন'টার মধ্যেই আপনি আসিবেন। গুড মর্ণিং।" বলিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। নবগোপালবাবু তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইলেন।

চার

পরদিন দ্বিপ্রহরে সুকুমারী আসিল। প্রমীলার মাতা হিপ্‌নটাইজ করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল কথা তাহাকে জানাইলেন। সুকুমারী বলিল, "দেখুন, ঈশ্বর যদি মুখ তুলে চান।" ঘণ্টা দুই প্রমীলার নিকট থাকিয়া, বিদায় গ্রহণ কালে সুকুমারী বলিয়া গেল, "কি হল না হল শোনবার জন্যে আমার প্রাণটা ছট্‌ফট করবে মা—কাল বেলা দশটার পর, ওঁর সঙ্গেই আমি বেরুব, ওঁকে হাইকোর্টে নামিয়ে দিয়ে সেই গাড়ীতেই এখানে চলে' আসবো।"

"আসবে বইকি মা!"—বলিয়া গৃহিণী সুকুমারীকে বিদায় দিলেন।

যথাসময়ে নবগোপালবাবু সাহেবকে লইয়া আসিলেন। সাহেব প্রমীলার শয়নকক্ষে গিয়া একটি চেয়ার নির্ব্বাচিত করিয়া, উহাতেই তাহাকে বসাইলেন। সে কক্ষের মধ্যস্থলে বিদ্যুৎ-বাতির একটি ঝাড় জ্বলিতেছিল। সাহেব বলিলেন, "এত বেশী আলোতে ত ঠিক হইবে না। এ আলো নিবাইয়া, দুইটি মোমবাতি জ্বালিয়া দিতে বলুন।"

সাহেবের আদেশ মত কার্য্য হইল। তারপর তিনি বলিলেন, "আপনার স্ত্রী এবং আপনি ভিন্ন এ কক্ষে অপর কেহ থাকিতে পাইবে না। সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া দিন, বাহিরের কোনও শব্দ এখানে না আসিতে পাবে। আপনারা দু'জনে কন্যার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকুন। আমি পাস্ দিতে আরম্ভ করি।"

এ আদেশও সম্পন্ন হইল।

তারপর সেই ক্ষীণ আলোকে সাহেব নিজ প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পাস দিবার পর, প্রমীলার চক্ষু মুদ্রিত হইল, মাথাটি চেয়ারের পিঠে ঢলিয়া পড়িল। সাহেব মাঝে মাঝে সুগম্ভীর অথচ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—Sleep—sl—eep—Dee—p sl—eep !

প্রায় ১৫ মিনিট কাল এইরূপ প্রক্রিয়া চলিলে পর, সাহেব নিরস্ত হইলেন। নবগোপালবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন—"আপনার কন্যা, গভীর হিপ্‌নটিক নিদ্রায় অভিভূত। এইবার আমি ইহাকে প্রশ্ন করি?"

নবগোপালবাবু শিরশ্চালনে সম্মতি জানাইলেন।

সাহেব, ইংরাজি ভাষায়, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যে, তোমার নাম কি?"

প্রমীলার পিতামাতা দুরু দুরু হৃদয়ে প্রতীক্ষায় রহিলেন। আহা!—এতদিন পরে আবার কি তাঁহারা আদরিণী কন্যার কণ্ঠস্বর শ্রবণে কর্ণ জুড়াইবেন?

প্রমীলা কিন্তু নিরুত্তর।

প্রায় এক মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া, এবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কন্যে, তোমার নাম কি বল। আমার আদেশ! তোমায় বলিতেই হইবে।"

অতি ক্ষীণস্বরে উত্তর হইল—"প্রমীলা—চাটার্জ্জি।"

সেই ক্ষীণস্বর, প্রমীলার পিতা-মাতার কর্ণে যেন মধুসিঞ্চন করিল, তাঁহাদের হৃদয়ে আবার নব আশা জাগরিত হইয়া উঠিল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "স্বাভাবিক অবস্থায়, যখন তুমি জাগিয়া থাক, তখন কথা কহ না কেন?"

ইংরাজি ভাষায়, ক্ষীণস্বরে অতি ধীরে ধীরে উত্তর হইল—"আমি টাইফয়েড জ্বরে—ভুগিয়াছিলাম, সেই অবধি—বাক্‌শক্তি হারাইয়াছি।"

সাহেব। সে টাইফয়েড জ্বরে তোমার বাক্‌শক্তি কি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে?

প্রমীলা। না—ধ্বংস হয় নাই। জগতে—কিছুই—ধ্বংস হয় না। বাক্‌শক্তি আছে,—তবে তাহা—চাপা পড়িয়া—গিয়াছে—আমি আর—তাহাকে—খুঁজিয়া পাই না।

সাহেব। কিসে চাপা পড়িয়াছে?

প্রমীলা। দুঃখে। আমার—জীবনে—একটা—গভীর দুঃখ আছে—সেই দুঃখরাশির নিম্নে—আমার বাক্‌শক্তি—চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

সাহেব। তোমার জীবনে কি সে দুঃখ? তোমার পিতামাতা কি তাহা অবগত আছেন?

প্রমীলা। হাঁ আছেন বইকি—দুঃখের—কারণ কি—তাহা জানেন,—কিন্তু—সে দুঃখের—পরিমাণ কি,—তাহা কত গভীর—তাহা আমার জীবনীশক্তিকে কি পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেটা উঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

সাহেব। কি সে দুঃখ, তুমি আমায় বল।

প্রমীলা নীরব। সাহেব অর্দ্ধ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া, গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমার আদেশ, তোমার সে দুঃখ কি, তাহা এই মুহূর্ত্তে আমার নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।"

তথাপি প্রমীলা নীরব। নবগোপালবাবু হস্তসঙ্কেতে নিরস্ত করিলেন এবং ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "থাক্, ওবিষয়ে উহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া কাজ নাই। আপনি শুধু জিজ্ঞাসা করুন, তোমার সে দুঃখ তোমার পিতামাতা যদি ঘুচাইয়া দেন, তবে তুমি তোমার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইবে কি না?"

সাহেব ফিরিয়া আসিয়া, প্রমীলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঐ প্রকার প্রশ্ন করিতেই প্রমীলা উত্তর দিল "ফিরিয়া—পাইব। আমার—পতি-দেবতার চরণে—যেদিন আমি—প্রথম প্রণাম করিব—তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ মাত্র—আবার আমি—বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন—হইব। নচেৎ এ জীবনে আর তাহা হইব না।"

সাহেব, নবগোপালবাবুর পানে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাগাই?"

নবগোপালবাবুর ইঙ্গিত পাইয়া, সাহেব উল্টা পাস দিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট মধ্যে প্রমীলা জাগিয়া উঠিল।

সাহেব বলিলেন, "আপনার স্ত্রী ইহাকে এখন খাইতে দিন। আপনি একটু বাহিরে আসুন।"

নবগোপালবাবু সাহেবকে লইয়া বৈঠকখানায় আসিলেন। সাহেব বলিলেন "আপনার কন্যার কথা আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন ত? আমি কিন্তু ভাল বুঝিতে পারি নাই।"

নবগোপালবাবু বলিলেন, "আর কিছু নয়, ও একটি যুবককে বিবাহ করিবার জন্য বড়ই উতলা হইয়াছিল, বিবাহে আমরা সম্মতি দিই নাই সেই উহার দুঃখ।"

সাহেব বলিলেন, "Oh! I see!—তা, যদি মেয়েকে আরোগ্য করিতে চান, তবে তাহারই সঙ্গে উহার বিবাহ দিন—এ ছাড়া কিন্তু অন্য উপায় নাই।"

নবগোপালবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই দিব।"

সাহেবকে বহু ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, আর একখানি ৫০০৲ টাকার চেক তাঁহার হস্তে গুঁজিয়া দিয়া, নবগোপালবাবু তাঁহাকে নিজ কারে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

পাঁচ

গ্র্যাণ্ড হোটেলে নামিয়া, নবগোপালবাবুর শোফেয়ারকে দুইটি টাকা বখশিস করিয়া, সাবার্টিন উপরে নিজ বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ব্যারিস্টার বসন্ত রায় ও সুকুমারী, যুগল মূর্ত্তিতে তথায় বিরাজ করিতেছে।

সাবার্টিন টুপী খুলিয়া সহাস্য বদনে বলিল, "Hallo, Mrs. Roy,—*you* here? What an unexpected pleasure!" (বিবি রায়! আপনি এখানে? এ আনন্দ যে আশার অতিরিক্ত!)

বসন্ত রায় বলিল, "কি করি, গিন্নী ছাড়িলেন না। খবরটা জানিবার জন্য আমিই এখানে আসিব কথা ছিল, ইনি ছাড়িলেন না—সঙ্গ লইলেন। রাত-বিরাত উনি আমায় একা কোথাও যাইতে দেন না।"—বলিয়া বসন্ত স্ত্রীর পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

"Silly !"—বলিয়া সুকুমারী তার স্বামীর বাহুতে মৃদু চপেটাঘাত করিল।

সাবার্টিনি বসিয়া বলিল, "তাই নাকি? তবে ত তুমি খুব শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছ। লণ্ডন মিউজিক হলের সেই গানটা মনে পড়ে?—যার প্রতি কলির শেষে আছে—"And his little wife was with him all the time !" (বউটি তার, সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকতো)।

বসন্ত বলিল, 'খুব মনে পড়ে। তুমি, আমি, যোশী—তিনজনেই দিনকতক সে গানটা খুব গাহিয়াছিলাম।—সে যাক। ওখানে কি রকম হইল তাই বল।"

সাবার্টিনি বলিল, "যাহা যাহা পরামর্শ ছিল—ঠিক সেইরূপই হইল। প্রমীলাকে মিসেস রায় যেমন শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, সে ঠিক ঠিক সেইরূপই বলিল। মেয়েটা অভিনয় করিল চমৎকার—বাহাদুরী আছে!"

সুকুমারী বলিল, "তারই বুঝি বাহাদুরী! তোমার মাথা হইতে যে এতবড় ষড়যন্ত্রটা বাহির হইল মিষ্টার সাবার্টিনি, তোমার বাহাদুরী নয়? তারপর 'পাপা' কি বলিলেন?"

সাহেব বলিল, 'রাজি—on the spot ! বিবাহ স্থির।"

রায় বলিল, "সাবার্টিনি তোমার বেয়ারাকে ডাক ত, একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম্ম দিক। সেই রাস্কেল যোশীকে আনন্দ সংবাদটা তার করিয়া দিই।"

রায়ের মোটর গাড়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল। টেলিগ্রাম লিখিয়া, নিজ শোফেয়ারকে ডাকাইয়া রায় উহা 'বড়া তারঘরমে' 'লাগাইয়া' আসিতে আদেশ দিল।

সাবার্টিনি বলিল, 'আজিকার আনন্দ উৎসবটা শ্যাম্পেনে সম্পন্ন করা যাক।—অবশ্য মিসেস রায় যদি অনুমতি করেন।"

মিসেস রায় অনুমতি দিলেন। শ্যাম্পেন আসিল। বয়, তিনজনের সম্মুখে তিনটি শ্যাম্পেন গ্লাস রাখিল। সুকুমারী এক গ্লাসের বেশী গ্রহণ করিল না। ইঁহারা দুই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে শ্যাম্পেনের বোতল শেষ করিয়া, হুইস্কির ও সোডার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। হাস্য পরিহাসের মধ্যে গল্প খুব জমিয়া উঠিল। গল্পের মধ্যে যে তথ্যগুলি প্রকাশ পাইল তাহা দফাওয়ারি এইঃ—

(১) যোশী, বসন্ত ও সাবার্টিনি তিনজনে একই সময়ে লণ্ডনে প্রবাস-যাপন করিয়াছিল—তখন হইতেই ইহাদের বন্ধুত্ব।

(২) সাবার্টিনি যথার্থই হিপনটিজম্ ও ম্যাজিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, প্রাচ্য দেশে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় আসিয়াছিল; সে প্রথমে সিমলায় গিয়া যোশীর আতিথ্য গ্রহণ করে। এবং সেইখানেই বন্ধুর প্রণয়-সঙ্কটের বিষয় অবগত হয়।

(৩) যোশী ও প্রমীলার মধ্যে বসন্ত ও সুকুমারী মারফৎ রীতিমত প্রেমপত্র-বিনিময় চলিত। প্রমীলার পীড়ার সময়, সুকুমারী প্রত্যহ যোশীকে টেলিগ্রাম করিত প্রমীলা কেমন আছে।

(৪) বাক্‌শক্তি হারাইবার ভাণ করার মৎলব সর্ব্বপ্রথমে সাবার্টিনির মস্তিষ্কেই উদিত হয়। পরে পত্রযোগে বসন্ত ও সুকুমারীর সহিত এ ষড়যন্ত্র পাকা করা হইয়াছিল।

কিন্তু পিতামাতার সহিত এরূপ প্রতারণা করা প্রমীলার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছিল সন্দেহ নাই—অন্ততঃ, আমাদের মতে। কিন্তু পাশ্চাত্য মত এই যে, Everything is fair in love and war—প্রেমে ও যুদ্ধে কিছুই দোষের নহে।

এক মাসের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল। সাবার্টিন তখনও কলিকাতায় ছিল, তাহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। যৌতুকরাশির মধ্যে দেখা গেল, নবগোপালবাবুর প্রদত্ত চেক দু'খানি, বরকন্যাকে সাবার্টিনের উপহার।

সুধার বিবাহ

এক

বৃহদায়তন সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ। কর্ত্তা সাটিনমোড়া সোফায় হেলান দিয়া, রূপার গুড়্‌গুড়ি হইতে সোণার মুখনলে ধূম আকর্ষণ করিতেছিলেন। গৃহিণী অদূরে এক-খানি গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। কর্ত্তা-গিন্নীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

গিন্নী বলিলেন, "আর তুমি দো-মনা করছ কেন? অতুলের সঙ্গেই খুকীর বিয়েটি দিয়ে ফেল। দেখতে দেখতে মেয়ে ডাগর হয়ে উঠল, যেঠের কোলে চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছে, আর দেরী হ'লে সমাজে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "দেখ, তুমি ও-সব মতটতগুলো ছাড়। মেয়ে চৌদ্দ বছরের হয়েছে ত ভারি একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে কিনা হ্যাঁ!"

গিন্নী বলিলেন, "আবার কি? হিঁদুর ঘরের আইবুড়ো মেয়ে চৌদ্দ বছরেব হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না?'

কর্ত্তা বলিলেন, "কুয়োর ব্যাঙ! কুয়োয় ব'সে আছ, দুনিয়ার খবর ত রাখ না! বিলেতের, আমেরিকার বড় বড় ডাক্তারদের আজকাল মত এই যে, ষোল বছরের কমে কখনই মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ষোল বছরের কমে কখনই আমি মেয়ের বিযে দেবো না—নির্ম্মলার দিইনি। আমার মত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ কববো না—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

গিন্নী বলিলেন, "তা আমরা ত বিলেতেও বাস করিনে, আমেরিকাতেও বাস করিনে। যে সমাজের যা প্রথা—"

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "এই কলকেতা সহরে কত বড় বড় লোকের ঘরে, ষোল সতেরো কুড়ি বছরের পর্য্যন্ত আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে, সে খবর রাখ কুয়োর ব্যাঙ? সেজন্যে তাদের কি কেউ নিন্দে করছে, না তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারছে না? ঐ ওগুলোর হাতে মেয়ে দেবার কল্পনাও কোরো না—সে অসম্ভব একেবারে।"

"কেন, অসম্ভব কিসে শুনি? অতুলকে মেয়ে দিলে মেয়ে অজাতে পড়বে, না অঘরে পড়বে?"

"অ-জাতে পড়বে না তা স্বীকার করছি কিন্তু অ-ঘরে পড়বে নিশ্চয়। তবে তোমরা অঘর বলতে যা বোঝ আমি সে অর্থে বলছিনে।"

"কি অর্থে বলছ তুমি?"

"তা হ'লে বুঝিয়ে বলি, শোন। তোমার মেয়ে ধনী পিতার গৃহে আজন্ম প্রতি-পালিত। ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অবধি এতকাল সে যেভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত, যে ঘরে গেলে সে সমস্ত সে না পাবে, সেই ঘরই তার পক্ষে অঘর। তোমার মেয়ে দামী জরিপাড় শান্তিপুরী ভিন্ন অন্য শাড়ী পরে না। একখানা শাড়ী একদিন পরা হলেই ধোবাকে ফেলে দেয়। রূপোর থালা বাসনে খেয়ে-দেয়ে এমনই তার অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কাঁসার থালা-বাসনে খেতে হ'লে তার গন্ধ লাগে। বিদ্যুৎপাখার তলায় না শুলে রাত্রে তার

খুসীই হয় না। দু'টো তিনটে দাসী সারাদিন তার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। সে কি তোমার ঐ দু'শো টাকা মাইনের অতুল-মাষ্টারের ঘরে গিয়ে, মিলের শাড়ী প'রে বঁটি পেতে কুট্‌নো কুট্‌তে পারবে, না শিল পেতে বাটনা বাটতে পারবে, না কয়লা ধরিয়ে ভাত রাঁধতে পারবে?"

গিন্নী নীরবে বসিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কেন, পারবেই না বা কেন? হ'লেই বা বড় মানুষের মেয়ে। হিঁদুর মেয়ে ত—মেমসাহেব ত আর নয়! নিজের সংসারে, নিজের স্বামী পুত্তুরকে রেঁধে-বেড়ে খাওয়ান, ঘরের কাজকর্ম্ম করা—সেটা ত মেয়েমানুষের ভাগ্যের কথা। ও যদি বলে, আমি পারবো, ও যদি বলে আমি তাতেই খুসী, তবে আমরা কেন তাতে বাধা দিই? দু'টিতে ভাব হয়েছে বড্ড, এ বিয়ে না দিলে মেয়ে কিন্তু আমার অসুখী হবে, তা তোমায় ব'লে রাখলাম। শুধু অসুখীই বা বলি কেন? অধর্ম্ম হবে। মেয়েমানুষের যা প্রধান ধর্ম্ম—সতীধর্ম্ম—তাতে আঘাত লাগবে।"

কর্ত্তা কয়েক মুহূর্ত্ত সবিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ-মণ্ডলে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তারপর বলিলেন, "ওঃ—এতদূরে গড়িয়েছে? খুকী তোমাকে বলেছে বুঝি ঐ সব কথা? অ্যাঁ, দু'টিতে ভাব হয়েছে বড্ড? তাই নাকি?"—বলিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন।

গৃহিণী আনত-নেত্রে সভয়ে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভাব হয়েছে? অর্থাৎ লভ্ হয়েছে? ওর গুষ্ঠীর পিণ্ডি হয়েছে! ডাক ত একবার হারামজাদীকে, কোথায় গেল? সব কথা তার নিজের মুখে শুনে একটা বিহিত করি।"

গিন্নী বলিলেন, "নাও, আর বাপগিরি ফলাতে হবে না। ভারী বিহিত করবে তুমি! সে স্কুলে চ'লে গেছে। এই ত গাড়ী তাকে রেখে ফিরে এল। এগারোটা বাজে, এখন উঠে স্নান করবে? না, আমার সঙ্গে ব'সে ব'সে ঝগড়াই করবে কেবল?"

কর্ত্তা ঘড়ির দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "হুঁ—আমিই ত ঝগড়া করছি বটে। কিন্তু তুমি যে ভাবিয়ে দিলে গিন্নী! 'ভাব হয়েছে' এ আবার কোন্ দেশী কথা?"

গিন্নী বলিলেন, "কেন, এই যে এখনই বলছিলে বিলেতের আমেরিকার ডাক্তারদের মত অনুসারেই আমাদের চলা উচিত। তা, সে সব দেশে বিয়ের আগে বর-কনের ভাব হয় না? মনের ভিতর একজনকে ভালবাসবে, বাইরে অন্যজনকে বিয়ে ক'রে তার ঘর করতে যাবে, এটা কি ধর্ম্ম?"

কর্ত্তা চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন, "তা সেজন্যে বিশেষ চিন্তা নেই, লভ্-ফভ্ ও সব-গুলো নিছক ছেলেমানুষী বইত নয়! দেখাশুনো বন্ধ হলে সেটা সময়ে আপনিই সেরে যাবে। আর কিন্তু খবর্দ্দার সুধা যেন নির্ম্মলের বাড়ীতে না যায়, বুঝলে? তা হ'লেই ও সব বাঁদরামি দু'দিনেই চুকে-বুকে যাবে।"

"হ্যাঁ চুকে যাবে! দিনকের দিন যতই বুড়ো হচ্ছেন, ততই ভীমরতি ধরছে!"—বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার স্নানের জন্য ভৃত্যগণের প্রতি আদেশ প্রচার করিতে উঠিয়া গেলেন।

তা, ব্যাপারটা এই। এই যিনি রূপার গড়্‌গড়িতে সোণার মুখনলে তামাক খাইতে খাইতে এতক্ষণ দাম্পত্যকলহে নিযুক্ত ছিলেন, ইঁহার নাম বরদাকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী, তা ছাড়া দেশে জমিদারী আছে। অগাধ টাকা। ইঁহার দুই কন্যা একটি মাত্র পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা নির্ম্মলহাসিনী বা নির্ম্মলা কলি-কাতাতেই স্বামী-গৃহে বাস করে। তাহার বয়স আঠারো বৎসর মাত্র। তাহার স্বামী

বিনয়ভূষণ প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক। শ্বশুরের তুল্য না হইলেও, বিনয়-ভূষণ ধনী-লোক, দেশে তার বিষয়-সম্পত্তি আছে, চাকরিটুকুই ভরসা নহে। খুকী অর্থাৎ কনিষ্ঠা কন্যার নাম সুধাংশুনলিনী বা সুধা। তাহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, বেথুন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। বরদাবাবুর পুত্রটি এখন সপ্তমবর্ষীয় বালক মাত্র। অতুলও রসায়নের অধ্যাপক, কিন্তু বেসরকারী কলেজের। দুইশত টাকা মাত্র বেতন পায়। অতুল ও বিনয় পূর্ব্বে সহপাঠী ছিল। বন্ধু-গৃহেই বন্ধু-শ্যালিকা সুধার সহিত অতুলের পরিচয়ের সূত্রপাত। ক্রমে সেই পরিচয় রীতিমত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মলা ও তার স্বামী উভয়েরই ইচ্ছা, অতুলের সঙ্গেই সুধার বিবাহ হয়।

অতুলের যেদিন আসিবার কথা, নির্ম্মলা সেদিন বাপের বাড়ী গিয়া সুধাকে লইয়া আসে। আবার সুধা কোনও দিন আসিলে, অতুলকে খবর দিতে বিনয় ভুলে না। বস্তুতঃ ইহাদিগের ষড়যন্ত্র বা সহযোগিতার ফলেই ব্যাপারটি এরূপ 'সঙীন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহারা দু'টি বোনেই সুন্দরী, তবে সুধা বেশী সুন্দরী। বিশেষ তাহার গাত্রবর্ণটি চমৎকার। এমন রঙটি বাঙ্গালী-ঘরে দুর্লভ—আর্ম্মাণী বিবির অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন-প্রভ নহে।

দুই

তিন মাস পরে, একদিন সন্ধ্যায় আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ করিতে করিতে বরদাবাবু পত্নীকে বলিলেন, "ওগো, কালকে খুকীকে দেখতে আসবে।"

"কারা, কোথা থেকে?"

"মৈমনসিং জেলার মুকুন্দনগরের রাজবাড়ী থেকে। রাজা মুকুন্দনাথের নাম শুনেছ ত? মস্ত বড়লোক। যেখানে তাঁর রাজধানী, সেখানকার নাম পূর্ব্বে কি একটা ছিল; এখন এই রাজার নামে সে স্থানের নাম মুকুন্দনগর হয়েছে। রাজা উপাধি হ'লে কি হয়, অনেক মহারাজার চেয়ে টাকা বেশী।"

গৃহিণী বলিলেন, "রাজা মুকুন্দনাথের নাম ত ছেলেবেলা থেকে শুনছি। তাঁর বয়স হয়েছে নিশ্চয়! এ বয়সে আবার বিয়ে করবেন নাকি?"

"দূর্ পাগলী! রাজা কেন, রাজকুমারের জন্যে। রাজা মুকুন্দনাথের এক মামা, কুমারের গৃহশিক্ষক, তার এক বন্ধু, আর একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত—এই চা'রজনে কুমারের জন্যে পাত্রী খুঁজতে বেরিয়েছে। আমাদের স্ব-শ্রেণীর লোক যিনি যেখানে আছেন, সকলের বাড়ী গিয়ে তারা মেয়ের সন্ধান করছে। তিন মাস হ'ল তারা এই কাজে বেরিয়েছে, নানা স্থানে ঘুরে এখন তারা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে।"

"রাজকুমারের বয়স কত?"

"কুড়ি-একুশ।"

"স্বভাব-চরিত্র কেমন? বড়লোকের ঘরের বওয়াটে ছেলে নয় ত? তা যদি হয়, তা হ'লে কিন্তু তাঁকে মেয়ে দেবো না, তা তিনি রাজকুমারই হোন, আর বাদশা-কুমারই হোন।"

এই কথায় বরদাবাবু একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। লুচি ছিঁড়িয়া আলুর দমে মাখিতে মাখিতে বলিলেন, "তা স্বভাব ভাল হবারই সম্ভাবনা। অত বড় রাজার ছেলে!"

গিন্নী বলিলেন, "যা বললে! বড়লোকের ছেলের, রাজার ছেলের স্বভাব-চরিত্র কি আর বেগড়ায়? যত বেগড়ায় গরীবের ছেলের! যত গরীব কেরাণী, মাষ্টার, এদের ছেলেরাই সচরাচর মদ খেয়ে কু-পল্লীতে প'ড়ে থাকে, রাত্রে বাড়ী আসতে পারে না—নয়?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে কথা বলছিনে! তবে সহবং ব'লে একটা জিনিষ আছে ত? সে যাই হোক, মেয়ে যদি তাদের পছন্দই হয়, সে সব বিষয়ে খোঁজ খবর না নিয়েই কি আর বিয়ে দেবো?"

"কখন দেখতে আসবে?"

"কাল বিকেলে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। আমি তিনটের পরেই আপিস থেকে ফিরে আসবো।"

"নির্ম্মলাকেও আনানো উচিত ত?"

বরদাবাবু যেন কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "আচ্ছা, আনিও তাকে।"

অতঃপর বরদাবাবু নীরবে জলযোগ সমাপ্ত করিলেন। তিনি যখন উঠিতেছিলেন, গৃহিণী তখন বলিলেন, "হ্যাঁগা, তবে যে বলেছিলে, মেয়ের ষোল বছর না হ'লে কোন মতেই বিয়ে দেবে না—তোমার মত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করবে না!"

ভৃত্য রুপার জগ্ হইতে জল ঢালিতেছিল, প্রকাণ্ড রুপার চিলিমচির উপর বরদা-বাবু হস্ত প্রক্ষালন করিতেছিলেন, সহসা কোনও উত্তর দিলেন না। মুখাদি ধৌত করিয়া তোয়ালে দিয়া হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'এক সময় তাই বলতাম বটে। এখন ভেবে দেখছি, এরকম একটা সুযোগ যদি পাওয়া যায়—"

গৃহিণী বলিলেন, "তা হ'লে বল, তোমার মত-বিশ্বাস-ফিশ্বাস কিছুই নয়—ও-সব ভণ্ডামি মাত্র, তুমি একজন সুযোগবাদী!'

বরদাবাবুর মনে হইল, সুযোগবাদী না হইলে কি তিনি এত বড় একটা এটর্ণী হইতে পারিতেন? কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ গিন্নী, তোমায় যখন বিয়ে ক'রে এনেছিলাম, তখন তখন তুমি ক-খও চিনতে না। নিজে রাত জেগে মাষ্টারি ক'রে তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, তার কি এই প্রতিফল?"

"কেন?"

"নইলে আজ তুমি আমায় এমন সাধু-ভাষায় গালাগালি দিচ্চ!"

"কখন আবার তোমায় আমি গালাগালি দিলাম?"

"কেন, শালা না বললে কি গালাগালি হয় না? ঐ যে তুমি আমায় সুযোগবাদী বললে!"

"সেটা বুঝি গালাগালি হ'ল?"

"ভয়ঙ্কর! তুমি যদি পরিবার না হ'য়ে খবরের কাগজের সম্পাদক হ'তে, তা হ'লে আমি তোমার নামে মানহানির নালিশ ক'রে দিতাম।

সেই রাত্রিতেই সুধা শুনিল, রাজবাড়ীর লোকে তাহাকে দেখিতে আসিবে। শুনিয়া তাহার প্রাণে বড়ই ভয় হইল। এই তিন মাস কাল অতুলের সহিত সাক্ষাৎ নাই—পিতার আদেশে দিদির বাড়ী যাওয়া তাহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবে দিদি মাঝে মাঝে আসে বটে, এবং দিদির নিকট হইতে অতুলের সংবাদ পায়। দিদির মধ্যস্থতায় অতুলের সঙ্গে গোপনে সে পত্রব্যবহার করিবার অভিলাষও জ্ঞাপন করিয়াছিল, কিন্তু নির্ম্মলা তাহাতে রাজি হয় নাই, বলিয়াছিল, "না ভাই, কি জানি, বাবা যদি শেষ পর্য্যন্ত মত নাই করেন, সে সব তুই ভুলে যাবারই চেষ্টা কর্।" সুধা বলিয়াছিল, "দিদির যেমন কথা! চেষ্টা করলেই বুঝি মানুষকে মানুষ ভুলতে পারে?"

সে রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলো নিবাইয়া বিছানায় বসিয়া সুধা প্রথমটা খানিক কাঁদিল। তারপর আলো জ্বালিয়া, নিজ আলমারি হইতে অতুলের ফটোগ্রাফখানি বাহির করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেখানি দেখিল। শেষে আলো আবার নিবাইয়া অতুলের ছবিখানি বালিসের তলায় রাখিয়া মনে মনে দেব-দেবীগণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে মা কালী, হে মা দুর্গা, হে বাবা মহাদেব, হে বাবা জগন্নাথ!

তোমাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। রাজবাড়ীর সেই পাজি ছুঁচোগুলো আমায় যেন পছন্দ না করে।—আমায় যেন তারা বিষ-নয়নে দেখে! আমি তোমাদের সব্বাইকের পুজো দেবো—আমায় তোমরা রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

আজ রাত্রিতে সুধার ভাল ঘুম হইল না! মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে। দেব-দেবী-গণের চরণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রার্থনা করিতে করিতে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। অতুলের ছবিখানি দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভয়ে আলো জ্বালিতে পারে না, কারণ পাশের কক্ষেই মাতা শয়ন করেন এবং মাঝের দরজা খোলাই থাকে। পূর্ব্বে কতবার রাত্রি জাগিয়া নভেল পড়িতে গিয়া ধরা পড়িয়া মা'র নিকট বকুনি খাইয়াছে। আজ এমন করিয়াই রাত পোহাইল।

বেলা একটার সময় নিৰ্ম্মলাকে আনিবার জন্য গাড়ী পাঠানো হইল। দুইটার মধ্যেই নিৰ্ম্মলা আসিয়া পৌঁছিল।

রাজবাড়ীর লোকেরা যথাসময়ে আসিয়া কন্যা দেখিলেন। জ্যোতিষী-মহাশয় প্রথমে সুধার কোষ্ঠীখানি পরীক্ষা করিয়া, অভিমত প্রকাশ করিলেন, "মেয়েটি সুলক্ষণা বটে।" রাজ-মাতুল বলিলেন, "বরদাবাবু, এতদিনে আমাদের ভ্রমণ শেষ হ'ল। চা'র মাস কাল আমরা নানা স্থানে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আপনার মেয়ের মত এমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে আমরা কোথাও পাইনি। রঙটার উপরেই রাজা-বাহাদুরের বিশেষ রকম ঝোঁক। আপনার এই মেয়ের মত বা এর চেয়েও সুশ্রী মেয়ে যে আমরা দেখিনি, তা নয়। তবে গায়ের এমন বর্ণটি আর কোথাও পাইনি। যাকে শাস্ত্রে আসল গৌরী বলে, এ মেয়ে তাই। এই মেয়েই আমাদের পছন্দ। আজ রাত্রেই আমরা দেশে ফিরবো, রাজাবাহাদুরকে রাণীমাকে গিয়ে সব কথা বলি। কুমার বাহাদুর হয়ত নিজে এসে একবার দেখতে চাইবেন। তারপর শুভকার্য্যের দিন স্থির করা যাবে। যদি অনুমতি করেন, আজ তা হ'লে আমরা উঠি।"

বিবাহ-পরীক্ষায় মেয়ের এই উচ্চ অনার্সের সহিত পাসের সংবাদে বরদাবাবু আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কিঞ্চিৎ "মিষ্টিমুখ" করিয়া যাইবার জন্য ইঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বিলক্ষণ আয়োজনাদি চলিতেছিল। শুধু মিষ্টরসে নহে, ষড়রসে রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া আগন্তুকগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহিণীও আনন্দিত হইলেন। এ তিন মাসে তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, সুধা অতুলকে ভুলিয়াছে। মেয়ে রাজরাণী হইবে, এ সংবাদে কোন্ মাতা না আনন্দিত হইবেন?

সুধার কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়াই রাত্রি কাটিল। অবশেষে সে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল,—দেব-দেবীগণ সমস্তই ঝুটা;—হিন্দুধৰ্ম্ম একেবারেই ফাঁকি।

তিন

কুমার-বাহাদুর কবে সুধাকে দেখিতে আসিবেন, এই চিন্তায় বরদাবাবু দিবানিশি ব্যস্ত রহিলেন। সপ্তাহান্তে মুকুন্দনগর হইতে পত্র আসিল। রাজ-মাতুল লিখিয়াছেন, "আমরা ফিরিয়া আসিয়া রাজা-বাহাদুর ও রাণীমার বরাবর আপনার কন্যার বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছি। শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। কুমার-বাহাদুর যাইবেন না, তবে রাজা-বাহাদুর স্বয়ং একবার গিয়া আপনার কন্যাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি রাজকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা বিধায়, বোধ হয়, আগামী মাসের পনরই তক্ কলিকাতা যাত্রা করিতে পারিবেন।"

সুতরাং রাজা-বাহাদুরের শুভাগমনের এখনও প্রায় একমাস বিলম্ব আছে জানিয়া

বরদাবাবু আবার নিজ কাজকর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলেন।

অতুলবাবু তাঁহার বন্ধু বিনয়বাবুর মুখে বরদাভবনের সকল সংবাদই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পাইয়া থাকেন। মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর লোকেদের মেয়ে দেখার কথা, গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে রাজাবাহাদুরের বিশেষ ঝোঁকের কথা এবং একমাস পরে রাজাবাহাদুর যে স্বয়ং কন্যা দেখিতে আসিবেন, সে সংবাদও পাইলেন।

দুই বন্ধুতে অত্যন্ত গোপনে কি পরামর্শ চলিতে লাগিল।

অতুলবাবু প্রত্যহ নিজ কলেজের পর প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়া বিনয়বাবুর রসায়নাগারে দুই তিন ঘণ্টা করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। উভয়েই রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উভয়ে মিলিয়া কি সব রাসায়নিক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন তাঁহারাই জানেন।

সপ্তাহকাল দুইজনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বসিয়া এইরূপে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাইলেন।

তাহার পর একদিন নির্ম্মলা কিসের একটা শিশি বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া পিত্রালয়ে গিয়া তাহার কনিষ্ঠাকে দিল। চুপি চুপি কি সব উপদেশও তাহাকে দিয়া আসিল। সুধা শিশিটা নিজ আলমারির মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

ইহার কয়েকদিন পরে, সন্ধ্যার পর কর্ত্তা-গৃহিণীতে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। রাজা বাহাদুরের আসিবার ত অধিক বিলম্ব নাই—এক সপ্তাহ মাত্র। মেয়ে দেখিয়া, তবে বিবাহের দিনস্থির হইবে সে বিষয়ে যদি মতামত জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে কি বলা যাইবে এই সম্বন্ধে বরদাবাবু পত্নীর সহিত আলোচনা করিতে চাহিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, 'দিনস্থির ত করবে, কিন্তু মেয়ের ভাবভঙ্গি দেখে আমি যে মোটেই সাহস পাচ্ছিনে।

'কেন, কি ভাবভঙ্গি দেখলে ?'

সেইদিন তারা এসে মেয়ে দেখা অবধি, ও যেন কেমন মনমরা হয়ে থাকে। মুখে হাসি নেই, ভাল ক'রে খায় না,—রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে এও আমি টের পেয়েছি। দেখছ না, কি রকম রোগা হয়ে যাচ্ছে, ভেবে ভেবে বাছার আমার সোণার বরণ কালী হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে ডাগর হয়েছে, তার অমতে জোর জবরদস্তি ক'রে বিয়ে দিতে চাইলে শেষে হিতে বিপরীত হ'য়ে না দাঁড়ায়।'

বরদাবাবু বলিলেন 'হ্যাঁঃ—ঐ সব ছেলেমানুষী কথা শোন কেন ?"—কিন্তু মনে মনে তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বলাই যায় কি, কালের যেরূপ গতি, কাপড়ে কেরোসিন ভিজাইয়া আগুনই ধরাইয়া দিবে না আফিম আনাইয়া ভক্ষণ করিবে, কে বলিতে পারে ? গৃহিণীকে অবশেষে তাঁহার আশঙ্কার কথা খুলিয়াই বলিলেন এবং মেয়ে সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

পরদিন বরদাবাবু সুধাকে ডাকিয়া মিষ্ট-কথায় তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। কিন্তু সুধা কোনও উত্তর করিল না—কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

দিনের পর দিন এই ভাবেই কাটিতে লাগিল। দিনের পর দিন সুধার দেহবর্ণ মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল। কন্যার এ অবস্থা দেখিয়া বরদাবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভাবী পুত্রবধূর গাত্রবর্ণের উপরই যে রাজার অত্যধিক ঝোঁক।

মুকুন্দনগর হইতে পত্র আসিল, অমুক দিন অমুক সময় স-পারিষদ রাজা বাহাদুর মেয়ে দেখিতে বরদাভবনে উপস্থিত হইবেন।

বড় বড় সাহেবী দোকান হইতে বরদাবাবু মেয়ের জন্য দামী দামী ফেস্‌ক্রীম, কম্‌প্লেক্সন-লোশন প্রভৃতি আনিয়া দিলেন। তাঁহার কড়া আদেশে সে সকল সুধার সর্ব্বাঙ্গে মালিসও হইতে লাগিল। কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল,—মেয়ে দিন দিন কালো হইতে লাগিল।

চার

রাজা-বাহাদুরের আসিবার আর একদিন মাত্র বিলম্ব আছে। আগামী কল্য প্রাতের ট্রেণে তিনি আসিয়া পৌঁছিবেন এবং অপরাহ্নকালে মেয়ে দেখিতে আসিবেন। কি উপায় হইবে, প্রাতঃকালীন চা-পানান্তে দ্বিতলের বৈঠকখানায় বসিয়া ইহাই বরদাবাবু চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার গৃহদ্বারে একখানি মোটর গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইল।

বরদাবাবু জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক একটা ট্যাক্সি হইতে নামিতেছেন। দেহটি স্থূল, গায়ে একটা আধময়লা সুতি পিরাণ, তার উপর ময়লা একটা লাট হইয়া যাওয়া একটা সিল্কের চাদর।

কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বারবান আসিয়া নিবেদন করিল, মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর একজন কর্ম্মচারী দর্শনপ্রার্থী।

"নিয়ে এস"—বলিয়া বরদাবাবু গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

লোকটি দ্বারবানের সহিত আসিয়া, বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া প্রবেশ করিল। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত বরদাবাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল, "অসময়ে এসে হুজুরকে বিরক্ত করলাম না ত?"

বরদাবাবু বলিলেন, "না না বিলক্ষণ। বিরক্ত কেন করবেন? বসুন বসুন।"

লোকটি হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, সে গোস্তাকী কি করতে পারি? আজ বাদে কাল হুজুর হবেন আমার অন্নদাতা মনিবের বৈবাহিক—সুতরাং হুজুরও মনিবস্থানীয়। দু' একটা কথা নিবেদন করবার জন্যে এসেছিলাম, হুকুম হ'লে বলতে পারি।"

বরদাবাবু বলিলেন, "বলুন না, আমাদের সঙ্গে ও সব ফর্ম্মালিটির কিছু দরকার নেই। বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ?"

লোকটি সঙ্কুচিতভাবে চেয়ারে বসিয়া বলিল, "আমাদের রাজা-বাহাদুর কাল সকালের ট্রেণে আসবেন, এই স্থির ছিল। হুজুরকেও পত্রে তা জ্ঞাত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি হঠাৎ আজকেই এসে পড়েছেন। ল্যান্সডাউন রোডে নাটোর রাজবাড়ীতে উঠেছেন। আমাকে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, কালকের পরিবর্ত্তে আজ বিকেলে তিনি যদি মেয়ে দেখতে আসেন, তাতে আপনাদের কোনও অসুবিধে আছে কি? কারণ কাজটা যদি আজ সেরে ফেলতে পারেন, তা হ'লে আজ রাত্রেই আবার রাজধানী রওয়ানা হতে পারেন, সেখানে জরুরী কাজ আছে।"

বরদাবাবু বলিলেন, "রাজা-বাহাদুর পৌঁছে গেছেন নাকি? বেশ বেশ। তা আজ বিকেলে যদি তিনি আসেন তাতে আমার কোনই অসুবিধে নেই। আমি বরঞ্চ নাটোর-রাজবাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবো। ক'টার সময় যাব বলুন দেখি?"

লোকটি বিনীতভাবে বলিল, "আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন? আমি ত বাড়ী দেখে গেলাম। আমিই তাঁকে সঙ্গে ক'রে আনবো। আচ্ছা যদি অনুমতি হয়, এখন তা হ'লে উঠি।"—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বরদাবাবু বলিলেন, "বসুন বসুন, তাড়াতাড়ি কি? একটু চা খেয়ে যান।"

লোকটি বলিল, "আজ্ঞে তা আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করবো। কিন্তু তার সঙ্গে আরও একটু প্রার্থনা আছে।"

"কি, বলুন।"

"মাকে—আমাদের বউ-রাণীমাকে এখন একবার দেখতে পাব না? ও-বেলা অবশ্য রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে এসে ত দেখবই। কিন্তু মা'র রূপ-গুণ সম্বন্ধে যে রকম বর্ণনা শুনেছি,—তাঁকে একটিবার দেখবার জন্যে মনটা বড়ই উতলা হয়েছে।"

বরদাবাবু ভৃত্যদ্বারা সুধাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

এক মিনিট পরেই সুধা আসিয়া বলিল, "ড্যাডি, আমায় ডাকছেন ?"

"হ্যাঁ মা। মুকুন্দনগর রাজবাড়ী থেকে এই ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তোমার মাকে গিয়ে বল এ'র জন্যে এক পেয়ালা চা, আর কিছু খাবার যেন পাঠিয়ে দেন।"

লোকটি বলিল, "বরদাবাবু, থাক্ থাক্। চা খাব ওটা ভুলে বলেছি। আমার এখনও যে স্নান-আহ্নিক হয়নি সেটা খেয়ালই ছিল না। মা লক্ষ্মি, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও ত!"

একে ত মুকুন্দনগর রাজবাড়ীর নাম শুনিয়াই সুধা জ্বলিয়া গিয়াছিল। কে এ ব্যক্তি যে এমন আদেশের স্বরে তাহার সহিত কথা কহে? উভয় নেত্র হইতে লোকটার প্রতি অগ্নিবাণ হানিয়া সুধা প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া যাইবামাত্র আগন্তুকের মুখ হইতে সেই বিনীত ও নম্রভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ব্যঙ্গপূর্ণ-স্বরে তিনি বলিলেন, "এইটিই ত আপনার মেয়ে সুধাংশুনন্দিনী? মুকুন্দনগরের রাজবাড়ীর লোকেরা এই মেয়েকেই ত দেখে গিয়েছিল?"

কথা বলার ধরণে বরদাবাবু একটু রুষ্টভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই।"

লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল "কেন মশাই, আর কি জুচ্চুরি করবার জায়গা পেলেন না? এই মেয়ে আপনার আর্ম্মাণী বিবির মতন সুন্দরী? এ ত রীতিমত শ্যামবর্ণ—কালো বললেও অন্যায় হয় না। বলি, কি রং-টং আরক-টারক মাখিয়ে রাজ-বাড়ীর লোকেদের চোখে সেদিন ধুলো দিয়েছিলেন, বলুন ত?"

বরদাবাবুও ক্রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মশাই, স'রে পড়ুন দেখি। ফের যদি কোনও অপমানসূচক কথা এখানে উচ্চারণ করেন, তবে দারোয়ান দিয়ে আপনাকে বের ক'রে দেবো। আপনার রাজাকে গিযে না হয় বলবেন আমার মেয়েকে যে রকম দেখে গেলেন,—তাতে তিনি আমার মেয়েকে না নেন, নাই নেবেন!"

লোকটি বলিল, 'রাজা-বাহাদুরকে কোনও কথা বলবার দরকার হবে না,—কারণ আমিই রাজা মুকুন্দনাথ রায়। আমি ইচ্ছা ক'রেই একদিন আগে কলকাতায় এসেছি—আর, মেয়ের যথার্থ স্বরূপ কি তাই দেখবার জন্যেই, নিজের কর্ম্মচারী সেজে অসময়ে এ ভাবে এসেছি। কারণ, আমি জানি, কলকাতার লোকেরা অনেকে ভয়ানক জোচ্চোর। তার উপর বাঙ্গাল দেশের লোককে তারা গো-গর্দ্দভ ব'লেই মনে করে—ভাবে বাঙ্গালকে অতি সহজেই ঠকানো যায়। কিন্তু সেটা আপনাদের ভুল। বাঙ্গালকে সহজে ঠকানো যায় না। ভাগ্যিস্ এভাবে এসে দেখলাম! নইলে ও-বেলাই ত আবার রং-টং মাখিয়ে পেত্নীর বাচ্ছাটিকে পরীর বাচ্ছা সাজিযে দেখাতেন! উঃ—বাপরে বাপ—কলকাতার লোকেরা কি জোচ্চোর—কি জোচ্চোর!"—বলিয়া গট্ গট্ করিয়া সদর্পে রাজা বাহির হইয়া গেলেন।

পাঁচ

তার পর কি হইল? প্রমাণ হইল হিন্দু-দেব-দেবীগণ মিথ্যা নহেন, হিন্দুধর্ম্মও ফাঁকি নহে। সুধার এতদিনকার সকরুণ আবেদনে দেব-দেবীগণ কর্ণপাত করিয়াছেন।

বরদাবাবু অবশেষে বুঝিলেন, অতুল ছাড়া অন্য পাত্রে বিবাহ দিলে মেয়ে সুখী হইবে না—হয়ত বাঁচিবেই না। সুতরাং বিবাহে তিনি মত করিলেন।

সুধার মুখে আবার হাসি দেখা দিল। দিদির দেওয়া সেই আরকের শিশিটা খালি হইয়া গিয়াছিল, আর তাহা ভর্ত্তি করিয়া আনানোর প্রয়োজন হইল না।

মলিন বর্ণ দিনে দিনে আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। পরের মাসে বিবাহ। সুধার দেহবর্ণ তখন আবার পূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে।

বিবাহ হইয়া গেলে বিনয়বাবু বরের কাণে কাণে বলিলেন,—"জয়, রসায়নের জয়!"

নূতন বউ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রাবণ মাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। মাধব দত্ত মহাশয় তামাকু সেবন করিতে করিতে তিনজন নিষ্কর্ম্মা পল্লীবৃদ্ধের সহিত গল্প করিতেছেন—হারাণ মুখুয্যে রাখাল মিত্র ও কেদার চক্রবর্ত্তী। দত্ত মহাশয়ের বয়সও পঞ্চাশের উপরে উঠিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া, গঙ্গাস্নান সারিয়া আহ্নিক-পূজা শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ জল-যোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন।

বেলা তখন প্রায় দশ ঘটিকা। পিয়ন আসিয়া তাঁহার হস্তে দুইখানি খামের চিঠি দিয়া গেল—একই হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা। একখানি তাঁহার নিজের নামে, অপরখানি তাঁহার মধ্যমা কন্যা নির্ম্মলকুমারীর নামে।

হুঁকা হইতে কলিকাটি খুলিয়া হারাণ মুখুয্যের হাতে দিয়া, চোখে চশমা লাগাইয়া দত্ত মহাশয় নিজ নামের পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, উহাতে সন্তোষ ও প্রসন্নতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া দত্ত মহাশয় হাঁকিলেন, "রামা!" বৃদ্ধ রামা ভৃত্য আসিলে, তাহার হাতে কন্যার নামের পত্রখানি দিয়া বলিলেন, "তোর মেজদিদিমণিকে দিগে যা।"

হারাণ মুখুয্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি হে, দত্তজা?"

"কলকাতা থেকে মেজজামাই লিখেছেন—এই দেখ না।"—বলিয়া পত্রখানি মুখুয্যের হস্তে দিলেন।

পত্রখানির মর্ম্ম প্রতিবেশিগণের মধ্যে প্রচারিত হয় ইহাই দত্ত মহাশয়ের অভিপ্রায়। তাহার একটু বিশেষ কারণও ছিল। দত্ত মহাশয় বড় মেয়েটির বিবাহ বেশ খরচ-পত্র করিযা দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাই তাদৃশ সুবিধাজনক হয় নাই। মেজ মেয়ে নির্ম্মলার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিতে গেলে এক কুড়াইয়া পাওয়া যোত্রহীন পাত্রের সহিত—সে পাত্রের বয়সও তখন ৩০ বৎসরের কম হইবে না। পিতামাতা জীবিত নাই, কলিকাতায় মাতুলালয়ে মানুষ হইয়াছিল, সে মামা-মামীও পরলোকগত—ছেলেটি তখন কলিকাতায় মেসে থাকিয়া দালালী ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করে। আয় অল্প, সুতরাং বিবাহ করিয়া বধূকে লইয়া যাইতে পারে নাই। আজ পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, চারি বৎসর হইল একটি কন্যা জন্মিয়াছে, কিন্তু এতাবৎকাল নির্ম্মলা পিতৃ-গৃহেই রহিয়াছে। ইহাতে পাড়ার লোক দত্ত মহাশয়কে ছি ছি করিত। জামাই প্রতি মাসে দুই তিন বার করিয়া আসে, দুই এক দিন থাকিয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে কি? লোকে বলে সস্তায় কিস্তি পাইয়া দত্ত মহাশয় চালচুলাহীন এমন জামাই করিলেন যে, মেয়েটা বাপের বাড়ীতেই চিরস্থায়ী হইয়া রহিল, স্বামীর ঘর করা তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না। নির্ম্মলাও এ জন্য লজ্জিত—তার মা ইদানীং মাঝে মাঝে জামাইকে ইহা লইয়া একটু গঞ্জনা দিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। জামাই লিখিয়াছেন, এত দিনে কর্ম্মে তাঁহার একটু উন্নতি হইয়াছে, আয়বৃদ্ধি হইয়াছে, একটি ছোট বাড়ীও স্থির করিয়াছেন, এখন

শ্বশুর মহাশয়ের আদেশ পাইলে স্ত্রী-কন্যাকে আসিয়া লইয়া যান।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে দত্ত মহাশয় বলিলেন, "পড়ুন, হেঁকে হেঁকেই পড়।" তাঁহার ইচ্ছা, উপস্থিত অপর দুইজনেও পত্রখানি শ্রবণ করিয়া, যথাসময়ে পাড়ায় এই কথা রটনা করুক।

মুখোপাধ্যায় তখন পড়িতে লাগিলেন,—

কলিকাতা
৯ই শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল

সংখ্যাতীত প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

অদ্য একটি শুভসংবাদ আপনাকে দিবার জন্য এই পত্রখানি লিখিতেছি। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এত দিনে আমার একটু উন্নতি হইয়াছে। আমি একটি ভাল চাকরী যোগাড় করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বের দালালী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বিগত ইংরাজী ১লা তারিখ হইতে নূতন কর্ম্মে বাহাল হইয়াছি। আমার বেতন আপাততঃ দেড়শত টাকা হইয়াছে। সাহেব খুব অনুগ্রহ করিতেছেন এবং বলিয়াছেন যে, কাজকর্ম্ম ভাল করিতে পারিলে বৎসরান্তে আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

এত দিন অর্থাভাববশতঃ আমার স্ত্রী-কন্যার ভরণ-পোষণের কোনও ভারই আমি লইতে সমর্থ হই নাই। এ জন্য আমি মহাশয়ের নিকট নিতান্তই লজ্জিত ছিলাম। এখন ঈশ্বরের কৃপায় কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া স্ত্রী-কন্যাকে কাছে আনিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। মাসিক ৫০ টাকা ভাড়ায় শ্যামবাজারে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহও ঠিক করিয়াছি। এখন যদি মহাশয়ের অনুমতি হয় এবং পূজনীয়া শ্বশ্রূদেবী আপত্তি না করেন, তবে এক দিনের ছুটী লইয়া গিয়া নির্ম্মলাকে লইয়া আসি। আগামী ১৭ই শ্রাবণ ইংরাজী মাসের ১লা তারিখ হইবে, ঐ দিন আমি আপিসে বেতন পাইব—ইহার পরে শ্রাবণ মাসমধ্যে একটি শুভদিন যদি স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। কারণ, ভাদ্র মাস পড়িয়া গেলে, এক মাস আবার অপেক্ষা করিতে হইবে।

পূজনীযা শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাইবেন এবং আপনিও জানিবেন। আমি ভাল আছি। আপনাদের আদেশের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আমার পূর্ব্ব ঠিকানাতে পত্র লিখিলেই আমি পাইব। ইতি—

সেবক
শ্রীবসন্তকুমার বসু

পাঠ শেষ করিয়া পত্রখানি দত্ত মহাশয়ের হস্তে ফেরত দিয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বেশ বেশ। ছোকরা বাহাদুর আছে—দেড়শো টাকা মাইনের চাকরী বাগানো—আজ কালকার বাজারে কি সোজা কথা।"

রাখাল মিত্র বলিলেন "ছোকরা বেশ চালাক-চতুর, সে ত আমরা বরাবর দেখছি!"

কেদার চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আর, বেশ বিনয়ী। চিঠিখানি কেমন বিনয় ক'রে লিখেছে দেখ! আজকালকার ছেলেদের মত উদ্ধত-প্রকৃতি নয়। তারা হ'লে মনে করত, নিজের লিগাল ওয়াইফকে নিয়ে আসবো, তার জন্যে অত দয়া ভিক্ষা, অত কাকুতি-মিনতি কেন?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং—মুখ্যু ত নয়, ছোকরার লেখাপড়া-জ্ঞান আছে—সদ্বংশে জন্মও বোধ হয়, হবে না কেন?"

সুবিধা পাইয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আহা, সেই জন্যেই ত! কি ঘটনায় বিবাহ দিয়েছিলাম, সবই ত তোমরা জান। গঙ্গার সাঁতার কাটতে গিয়ে নির্ম্মলা ডুবে গিয়েছিল। বসন্ত নৌকোয় যাচ্ছিল, তাই দেখে নৌকো থেকে লাফিয়ে প'ড়ে নির্ম্মলাকে জল থেকে তোলে। খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম, পাল্কী ক'রে মেয়েকে বাড়ী নিয়ে

এলাম—বসন্তকেও সঙ্গে নিয়ে এলাম। ৩।৪ দিন তাকে বাড়ীতে রাখলাম, যেতে দিলাম না। দেখলাম, ছেলেটি রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বংশে, সব বিষয়েই ভাল, কেবল মাত্র দোষ—গরীব। বললে দালালী করে, মেসে থাকে, সামান্য আয়, মা-বাপ নেই, বাড়ী-ঘর নেই, তাই এত দিন আইবুড়ো আছে—নইলে কুলীন কায়েস্থের ঘরের ত্রিশ বছরের ও রকম ছেলে কি আর অবিবাহিত থাকে? গিন্নীরও ছেলেটিকে বেশ পছন্দ হয়ে গেল; মেয়েও অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল। আমি বললাম, বেশ ত, ও যখন নির্ম্মলার জীবন দান করেছে তখন নির্ম্মলা ওরই প্রাপ্য। হলেই বা গরীব—চিরদিন কি কারও সমান যায়? আমার মেয়ের ভাগ্যে ধন থাকে, জামাই ধনী হবে; যদি না থাকে, আমি মস্ত জমিদারের ছেলে এনে বিয়ে দিলেও, সে ছেলে বাপের বিষয় পেয়ে দু'দিনে বরবাদ ক'রে গরীব হয়ে যেতে পারে।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "আসল কথাই তাই। অদৃষ্টই মূল, ও ছাড়া আর পথ নেই. যতই যিনি হাঁকুপাকু করুন না কেন।"

রাখাল মিত্র বলিলেন 'কোন্ আপিসে চাকরী হয়েছে, তা বাবাজী লেখেন নি! কোনও গভর্মেণ্ট আপিসে বোধ হয়।'

দত্ত মহাশয় বলিলেন, 'তা কি ক'রে হবে? পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কি কেউ গভর্মেণ্টের চাকরী পায়? কোনও মার্চ্চেণ্ট আপিসে-টাপিসে হয়ে থাকবে বোধ হয়। যা হোক, বাবাজী এলেই জানতে পারা যাবে। মুখুয্যে ভায়া, ভাল দিন একটা স্থির ক'রে দাও না, পাঁজিখানা নিয়ে আসি।"

বলিয়া দত্ত মহাশয় উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী কন্যার প্রমুখাৎ সংবাদটা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। কর্ত্তা বলিলেন, "তা হ'লে একটা দিন ঠিক ক'রে পাঠাই, কি বল?"

মেয়েকে লইয়া যায় না বলিয়া গৃহিণী জামাতাকে কত গঞ্জনা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখন কন্যার আসন্নবিরহে তাঁহার মাতৃহৃদয় কাতর হইয়া উঠিল। বলিলেন, "এই পুজো আসছে—দুটো মাস পরে পাঠালে হ'ত না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "এখন যাক না, কিছুদিন পরে তখন মেয়ে নিয়ে এলেই হবে। আমার কলঙ্কভঞ্জনটা হয়ে যাক।"

"আচ্ছা, যা ভাল বোঝ, তাই কর'—বলিয়া গৃহিণী পঞ্জিকা বাহির করিয়া দিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ২১শে শ্রাবণ শুভদিন বলিয়া ধার্য্য করিলেন। দত্ত মহাশয় বিকালে তদনুসারে জামাতাকে পত্র লিখিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—প্রায় সারাদিনই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। বৈঠকখানায় তক্তপোষের বিছানায় মাধব দত্ত মহাশয় বৈকালিক নিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময় দেওয়ালের ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল। সেই শব্দে দত্ত মহাশয়ের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া, জানালা দিয়া চাহিয়া, আকাশের অবস্থা দেখিয়া, আরও খানিক ঘুমাইবার লোভে তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ মধ্যম জামাতা বাবাজীউ সন্ধ্যার ট্রেণে আসিয়া পৌঁছিবেন, সুতরাং রাত্রি-ভোজনের জন্য একটু বিশেষ আয়োজন করা আবশ্যক। সুতরাং তিনি উঠিয়া বসিয়া, হাই তুলিয়া, তিনটি তুড়ি দিয়া হাঁকিলেন, "রামা, তামাক দে।"

রামা ভৃত্য উঠানে বসিয়া বঁটী পাতিয়া ঘস্-ঘস্ শব্দে গোরুর জন্য খড় কাটিতে-ছিল, উত্তর দিল, "আজ্ঞে, যাই কত্তা।"

এই সময় দত্ত মহাশয়ের চারি বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রী কমলা (নির্ম্মলার কন্যা) নাচিতে নাচিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ও দাদু, এখনও ঘুমুচ্ছ? কখন উঠবে তুমি, বেলা যে গেল!"

দত্ত মহাশয় দৌহিত্রীকে নিকটে ডাকিয়া, তাহার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে শালী! আমি ঘুমুচ্ছি কি উঠেছি, তা কি তুই দেখতে পাচ্ছিসনে?"

কমলা বলিল, "তাতো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু দিদিমা যে বললে, বৈঠকখানায় গিয়ে তোর দাদুকে বল্‌গে, ও দাদু এখনও ঘুমুচ্ছ, কখন উঠবে তুমি?—তবে দিদিমাকে বলি গে যাই, তুমি উঠেছ?"

"আচ্ছা, বলবি এখন। বোস না একটু। আজ কে আসবে জানিস?"

"জানি। বাবা।"

"বাবা আসা অবধি তুই জেগে থাকতে পারবি?"

বালিকা আগ্রহভরে উত্তর করিল "থাকতেই হবে। বাবা যে আমার জন্যে পুতুল নিয়ে আসবে মাকে লিখেছে, আমি পুতুল দেখবো না?"

রামা হুঁকা হাতে জ্বলন্ত কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিল। দত্ত মহাশয় হুঁকা লইয়া বলিলেন, "ওরে রামা, তুই একবার চট করে গঙ্গার ঘাটে যা দেখি। আজ সারা দিন ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আজ খুব ইলিশ মাছ উঠবে। জেলেরা এতক্ষণ মাছের নৌকো ঘাটে লাগাচ্ছে। কেষ্টা, কি মতিলাল, কি বামধন—যে জেলের কাছে ভাল ইলিশ মাছ দেখবি, একটা নিয়ে আসবি। বেশ বড় দেখে একটা, আর বেশ চ্যাটালো রকম—লম্বা সরুঙ্গে মাছ আনিসনে যেন, সেগুলো তেমন সোয়াদি হয় না। জেলেকে বলিস যে, আজ কর্ত্তার জামাই আসছেন, বেশ ভাল মাছ যেন দেয়। কাল সকালে এসে দাম নিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ—বাজারে হরিশ ময়রার দোকানে অমনি ব'লে যাস যে, এক সের ভাল কাঁচাগোল্লা চাই। বেশ বড় ক'রে যেন মণ্ডা বেঁধে রাখে। আসবার সময় এক হাতে ইলিশ মাছ, এক হাতে সন্দেশ নিয়ে আসবি। বেশ ক'রে ওজন দেখে নিবি, বুঝলি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া রামা প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে হারাণ মুখুয্যে প্রবেশ করিয়া, ব্রাহ্মণের হুঁকাটি সংগ্রহ করিয়া, তক্তপোষের উপর বসিয়া ছিলেন, বলিলেন, "আজ যে রকম ইলশেগুঁড়ি বষাচ্ছে—মাছ আজ ভালই পাবে বোধ হয়। তা, জামাই কখন এসে পৌঁছবেন?"

"সন্ধ্যে ৭টার গাড়ীতে। কলকাতায় থাকেন, রেলের ইলিশের মুখে-ন্যাজে দড়ি বেঁধে ধনুকাকার ক'রে জেলে বেটারা যা বেচে, তাই গঙ্গার ইলিশ ব'লে খান ত! আসল গঙ্গার ইলিশ যে কি বস্তু তা আজ বাবাজীকে দেখিয়ে দিই।

মুখোপাধ্যায় কমলাকে আদর করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ দিদি, তুই নাকি আমাদের ছেড়ে চললি? তোর দাদুকে দিদিমাকে ছেড়ে চ'লে যাবি, তোর মন কেমন করবে না? সেখানে গিয়ে থাকতে পারবি?

বালিকা গর্ব্বভরে বলিল, "খুব পারবো!"

দত্ত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "শুনলে হে মুখুয্যে! হাঁ রে নেমখারাম, এত দিন যে আমরা তোকে বুকে ক'রে মানুষ করলাম, আমাদের ছেড়ে চ'লে যেতে তোর মনে একটু কষ্টও হবে না?"

বালিকা বুঝিল, কথাটা ভুলক্রমে সে বেফাঁস বলিয়া ফেলিয়াছে। বড় লজ্জা হইল। মাতামহের দিকে ফিরিয়া, তাঁহার বুকের পাকা চুল টানিতে টানিতে বলিল, "মনে কষ্ট হবে না? খুব হবে। কিন্তু বেশী দিন ত সেখানে থাকবো না দাদু, আবার শীগ্‌গির চ'লে আসবো। আর তোমার জন্যে একটা খুব ভাল পুতুল কিনে আনবো। কলকাতায়

অনেক পুতুল পাওয়া যায়—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, দুশো তিনশো।"

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া কমলার গাল টিপিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? কলকাতায় আর কি পাওয়া যায় রে?"

কমলা উত্তর করিল, "উঃ—অনেক জিনিষ। থিয়েটর পাওয়া যায়, চিড়িয়াখানা পাওয়া যায়, কালীঘাট পাওয়া যায়—আরও কত সব ভাল ভাল জিনিষ মা বলছিল, সব আমার মনে নেই।"

এমন সময় ঝি আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিল, "খুকী, মা ডাকছে, দুধ খাবি চল্।" কর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "গিন্নীমা আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

"চল যাচ্ছি।"—বলিয়া দত্ত মহাশয় উঠিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যার পর মুখুয্যে আসছো ত?"

"হ্যাঁ, আসবো বইকি। জামাই বাবাজীর সঙ্গে দেখা করবো। জামাই বাবাজী সাতটার গাড়ীতে এসে পৌঁছবেন ত? তুমি কি নিজে যাবে ইষ্টিশানে?"

"না, যে জল কাদা! লণ্ঠন হাতে রামাকেই পাঠিয়ে দেবো এখন।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে, আমি তা হ'লে ৮টার মধ্যেই আসবো।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় বিদায় লইলেন, দত্ত মহাশয়ও নাতিনীর হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি ৮টার পর মুখোপাধ্যায় লাঠি ও লণ্ঠন হস্তে দত্তভবনে আসিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানা শূন্য। শুনিলেন, জামাইবাবু আসিয়াছেন, এখন জলযোগ করিতেছেন। মুখোপাধ্যায় প্রতীক্ষায় রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে স-জামাতা দত্ত মহাশয় প্রবেশ করিলেন। "কি বাবা বসন্ত, ভাল আছ ত?"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি কাকা!"—বলিয়া জামাতা, মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম করিলেন।

সকলে বসিলে মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "তোমার ভাল চাকরী হয়েছে, তোমার শ্বশুরের কাছে শুনে বড়ই সুখী হলাম, বাবাজী! সে দালালী-ফালালী ছেড়ে দিয়েছ, ভালই করেছ। তোমরা শিক্ষিত লোক, ঐ সব উঞ্ছবৃত্তি কি তোমাদের পোষায়? তা, কোন্ আপিসে চাকরী হ'ল?"

"আজ্ঞে, ইংলিশম্যান আপিসে।"

"কিসের কারবার তাদের?"

"ইংলিশম্যান খবরের কাগজ। সাহেবদের কাগজ, খুব প্রতিপত্তি—বড় কাগজ। বড় বড় ইংরেজ কর্ম্মচারীরা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার সাহেবেরা পর্য্যন্ত বেনামীতে তাতে প্রবন্ধ লেখেন।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বটে? মস্ত কাগজ তা হ'লে। অনেক সব বাঙ্গালী সেখানে চাকরী করে বোধ হয়?"

"বিস্তর।"

"কত মাইনে সব?"

"তার কি ঠিক আছে? ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশো, দুশো—যার যেমন পদ।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "বটে! তোমার পদটি ত তা হ'লে বড় পদই বলতে হবে! তুমি যদি আমার একটি উপকার কর বাবা!"

"কি, বলুন।"

"আমার মেঝ ছেলেটা—তাকে তুমি দেখেছ—গেল বছর ম্যাট্রিক ফেল করলে। কত করে বললাম, ওরে আর এক বছর পড়্, আর এক বছর পড়্, তা সে কিছুতেই শুনলে

না। সেই অবধি বাড়ীতেই ব'সে আছে। গাঁয়ের যত সব বওয়াটে ছেলের সঙ্গেই তার মেলামেশা। ফ্লুট বাজায়, থিয়েটার করে—এই সব নিয়েই আছে। তাকে যদি বাবা, সাহেবকে ব'লে কয়ে তোমার আপিসে একটা ছোটখাট কাজে ঢুকিয়ে নিতে পার, তবে গরীব ব্রাহ্মণের বড়ই উপকার করা হয়।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায়, জামাতার হাত দুটি ধরিলেন।

বসন্ত বিব্রত হইয়া বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, কাকা! অত ক'রে আমায় বলতে হবে কেন? এখন ত আমাদের আপিসে কোনও কাজ খালি নেই—একটা খালিটালি হলেই আমি চেষ্টা করব বইকি।"

মুখোপাধ্যায় হাত ছাড়িয়া বলিলেন, তাই কোরো, বাবা! দেখ, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে আমার বন্ধুত্ব। একসঙ্গে পাঠশালায় গিয়েছি। সেই সময় থেকে দু'জনে আমরা হরিহর আত্মা বললেই হয়। তোমার উপর তোমার শ্বশুরের যদি কোন দাবী থাকে, তবে আমারও সেই দাবী আছে জেনো।"

বসন্ত বলিল, আজ্ঞে, সে ত ঠিক।"

তাহার পর অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কোথায় বাড়ী ভাড়া লইয়াছে, কিরূপ বাড়ী, আপিস হইতে কত দূর—ইত্যাদি। ক্রমে রাত্রি অধিক হয় দেখিয়া মুখোপাধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিলেন। বসন্তকে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ডাকিয়া পাঠাইলেন সে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

পরদিন বসন্ত উঠিয়া, মুখহাত ধুইয়া চা পান করিতেছে, এমন সময় তাহার শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী আসিয়া, আধঘোমটা দিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, নির্ম্মলের কাছে একটা কথা শুনে যে আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।"

বসন্ত কহিল, "কি কথা, মা?"

"তোমার আপিস নাকি রাত্তিরে?"

হ্যাঁ মা, তাই বটে। সকালবেলা আমাদের খবরের কাগজ বেরোয় কিনা তাই রাত ৯টা ১০টার সময় আমায় আপিসে যেতে হয়, সারা রাত সেখানে থাকতে হয়। আবার, দিনের বেলাও ২।৪ ঘণ্টার জন্যে গিয়ে একটু দেখাশুনো ক'রে আসতে হয়।"

তবেই ত! বড়ই যে ভাবনার কথা হ'ল, বাবা! তুমি নাকি নির্ম্মলাকে বলেছ যে, দিন-রাত থাকবার জন্যে একটা ঝি ঠিক ক'রে রেখেছি, সেই তোমায় রাত্রে আগলাবে, তোমার ভয় কি? কিন্তু নির্ম্মলা যে মোটেই সাহস পাচ্ছে না বাবা! বিদেশ-বিভুঁই, তায় ছেলেমানুষ, সারা রাত বাড়ীতে একটা পুরুষমানুষ থাকবে না, অসুখ-বিসুখ আছে, দায়-বিপদ আছে, আপিস থেকে তোমায় যদি ডেকে আনতে হয় ত কে যাবে বল দেখি? নির্ম্মলা ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে। কর্ত্তাও শুনে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েছেন।"

বসন্ত বলিল, "সে জন্যে কোনও ভাবনা নেই, মা! আমি যে বাড়ীটা নিয়েছি, সেটা একটা বড় বাড়ীর আধখানা অংশ। এক অংশে বাড়ীওয়ালা সপরিবারে বাস করেন, এক অংশ ভাড়া দিয়েছেন। অবশ্য দুই অংশই আলাদা,—আলাদা সদর দরজা, কল, পাইখানা সবই আলাদা। দু' বাড়ীর একতলায় দোতলায় মাঝের দরজা জানালা আছে। সেই দরজা খুললেই দু' বাড়ীর মেয়েদের স্বচ্ছন্দে যাতায়াত চলতে পারে। বাড়ীওয়ালা বাবুটির প্রবীণ বয়স, অতি ভদ্রলোক। তিনি আমায় বলেছেন, কোনও ভাবনা নেই তোমার, আমরা রয়েছি, দেখবো শুনবো—যখন যা দরকার।"

এই সময় দত্ত মহাশয় আসিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন। বলিলেন "বাবা বসন্ত, এক কাজ কর তুমি। দিনরাত্রির ঝি রেখেছ, বেশ সে-ও থাক্। রামাকেও তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। রামা নির্ম্মলাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে, বাড়ীতে ও থাকলে, নির্ম্মলার কোনও ভয় থাকবে না, আমরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো।"

বসন্ত বলিল, "রামাকে নিয়ে যেতে বলছেন? তা হ'লে—"

দত্ত মহাশয় বুঝিলেন, রামাকে লইয়া যাইতে জামাতার তেমন ইচ্ছা নাই। বলিলেন, "তুমি কেন দোমনা হচ্ছ, তা আমি বুঝতে পারছি। অবশ্য, এখন তোমার অল্প বেতন, তায় কলকাতার খরচ, পেরে উঠবে কি না, তাই ভাবছ ত? রামাকে কেবল দুটি দুটি খেতে দিও। ও মাইনে যেমন এখান থেকে পায়, তেমনই পাবে। আর দুমত কোরো না বাবা, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ওর দ্বারা তোমার অনেক উপকারও হবে।"

বসন্ত বলিল, "আজ্ঞে, আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন ওকে নিয়েই যাব।"

বেলা দুইটার পর বসন্ত যাত্রা করিল। তিনটার সময় ট্রেণ। দত্ত মহাশয় ষ্টেশনে গিয়া কন্যা-জামাতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। হারাণ মুখুয্যেও সঙ্গে গিয়াছিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার সময় বসন্তকে তিনি গত দিনের আবেদনের কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন।

নির্ম্মলা কলিকাতার বাসায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাড়ীখানি ছোট হইলেও সুন্দর ও সুসজ্জিত। দ্বিতলে দুইখানি মাত্র ঘর, কিন্তু ঘরগুলি বেশ বড় বড়। দেয়ালগুলি সুন্দর পেণ্টিং করা। মেঝেগুলিতে চক্‌চকে সাদা কালো মার্ব্বেল-পাথরের টালি বসানো। ধবধবে নেটের মশারিযুক্ত দুইখানি 'হোগ্নি পালিস' পালঙ্ক পাশাপাশি রক্ষিত। ভাল ভাল চেয়ার, টেবিল রহিয়াছে দেওয়ালে মানুষ সমান দুইখানা বড় বড় বেলোয়ারি আর্শি টাঙ্গানো। উভয় কক্ষেই বিদ্যুৎ-বাতি ঝুলিতেছে। জানালা দরজা-গুলিতে চিকণের কার্টেন দেওয়া। একতলার ঘরগুলিও বেশ সুপরিসর--আলো বাতাস যথেষ্ট। সুন্দর একটি স্নানের ঘর, তার শুধু মেঝেতে নহে, আধখানা দেওয়াল পর্যন্ত মার্ব্বেল টালি বসানো। কলিকাতাবাসী ওয়াকিবহাল কেহ এই বাড়ীখানি দেখিলে বলিত—"পাগল নাকি!—এই বাড়ীর ভাড়া ৫০৲ টাকা!" কিন্তু নির্ম্মলা বা রামার নিকট ভাড়ার এই অসঙ্গতি ধরা পড়িল না। তবে আসবাবগুলি দেখিয়া নির্ম্মলা বলিল, "হ্যাঁ গা, এই সব তুমি কিনেছ? এ সব ত দামী দামী জিনিষ, অনেক টাকার জিনিষ!"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "এ সব একটাও আমার নয়। আমি এত টাকা কোথায় পাব?"

'কার তবে এ সব? বাড়ীওয়ালার?'

না। আমাদের আপিসের বড় সাহেব সেদিন বিলেত গেলেন কিনা। এক বছরের ছুটী নিয়েছেন তিনি। আমাকে বললেন, 'বসন্ত, আমার আসবাবপত্রগুলো রাখবার জন্যে মিছামিছি একটা বছর বাড়ী ভাড়া গুণবো! তার চেয়ে কতক ছোট সাহেব রাখুন কতক তুমি রাখ। আমি এসে আবার নেবো, বেশ যত্ন ক'রে রেখ, যেন নষ্ট না হয়।' আমি দেখলাম, আমায় কিছু কিছু আসবাবপত্র কিনতেই হবে—একবারে সব পারবো না অবিশ্যি—মাসে মাসে দুটো একটা ক'রে কিনতে হবে। আপাততঃ এইগুলোতে কাজ চালাই—তার পর সাহেব এলে, তখন নিজের কেনা যাবে। সাহেবের বাড়ী থেকে এই-গুলো গিয়ে নিয়ে আসতে—মুটে ভাড়াই গেল ১৭৲ টাকা—অবশ্য সাহেবই দিলেন।"

সরলা বালিকা গালে হাত দিয়া বলিল, "ও বাবা! মুটে ভাড়া স—তে—রো টাকা! আর, এই সব বিদ্যুৎ-পাখাগুলো?"

"এগুলোও সব বড় সাহেবের জিনিষ।"

সে রাত্রি বসন্ত বাড়ীতেই রহিল। বলিল, "দু'দিনের ছুটী নিয়েছিলাম কিনা। কাল খাওয়া-দাওয়ার পর দিনের বেলা একবার বেরুতে হবে। তার পর আবার রাত্রে যেতে হবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সপ্তাহ পরে একদিন নির্ম্মলা তার স্বামীকে কহিল, "হ্যাঁ গা, এ বাড়ীর ভাড়া না কি শুনলাম একশো টাকা? তুমি যে বলেছিলে, পঞ্চাশ টাকা?"

বসন্ত বলিল "কে বললে তোমায়?"

"বাড়ীওয়ালাবাবুর মেয়ে সুহাসের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে কিনা। তুমি যখন দুপুরবেলা কাজে বেরিয়ে যাও, তখন আসে। আমায় লুডো খেলতে শিখিয়েছে, আমরা লুডো খেলি। আজ আমাকে সুহাস জিজ্ঞেসা করলে, 'তোমার স্বামীর মাইনে কত, ভাই?' আমি বললাম, 'দেড়শো টাকা।' সে বললে, "কক্ষণো নয়। তোমার স্বামীর মাইনে নিশ্চয়ই বেশী। যার দেড়শো টাকা মাইনে, সে কি কখনও মাসে একশো টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া নিতে পারে?"

বসন্ত হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "ওঃ—হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। আমি এই বাড়ী যখন ভাড়া নিই, তখন বাড়ীওয়ালা আমায় বলেছিল, 'অনেক খরচপত্র ক'রে বাড়ী তৈরি করেছি, এ বাড়ীর একশো টাকা ভাড়াই আমি ধার্য্য করে রেখেছিলাম, কিন্তু একশো টাকা কেউ দিতে চায় না। খালি প'ড়ে থাকে, তার চেয়ে আপনাকে পঞ্চাশ টাকায় দিচ্ছি—কিন্তু কাউকে বলবেন না, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ত বলবেন, একশো টাকা ভাড়া, কেননা আপনি যদি অন্য বাড়ীতে উঠে যান, তা হ'লে কেউ আর তখন ৫০৲ টাকার বেশী দিতে চাইবে না'—মেয়েদের পেটে ত কথা থাকে না, তাই বোধ হয়, বাড়ীতে বলেছেন, একশো টাকা ভাড়া পান।"

নির্ম্মলা বলিল, ওঃ— এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

বসন্ত বলিল ফের যদি এ কথা ওঠে ত তুমি বোলো যে হ্যাঁ, একশো টাকাই ভাড়া ঠিক হয়েছে বটে, তবে ওঁকে ত সব টাকা পকেট থেকে দিতে হয় না, অর্দ্ধেক বাড়ীভাড়া আপিস থেকে পান।"

"আচ্ছা, তাই বলবো।"

প্রাতে বসন্ত যখন আসে, তখন বেলা প্রায় ৯টা। আসিয়া স্নানাহার করে তার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাহির হইয়া যায়। কোনও দিন বৈকালে ৫টায়, কোনও দিন ৬টায় ফিরিয়া আসে, আবার রাত্রি ৯টা কিম্বা ১০টার সময় বাহির হইয়া যায়। প্রথম দিনই সে নির্ম্মলাকে বলিয়াছিল, "রাত্রির জন্যে আমার খাবার কোরো না—আপিসে গিয়ে খাই কিনা। রাত্রিতে যারা কাজ করে, আপিসেই রোজ তাদের জন্যে খানা তৈরী হয়—আপিসেরই খরচে।" সুতরাং নির্ম্মলা একবেলা রাঁধিয়া দুইবেলা খায়। দুর্গা ঝি রামার স্বজাতীয়, সে নিজের জন্য ও রামার জন্য রন্ধন করে, সে-ও এক বেলা রাঁধে। সুতরাং সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে উনান জ্বলে না।

বসন্ত রামাকে বাজার চিনাইয়া দিয়াছে, বাজার হাট সেই করে। দুর্গা ঝি গোয়ালা-বাড়ীতে গিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাঁটি দুধ দোহাইয়া আনে। একদিন রামা বলিল, 'জামাইবাবু, আপনার আপিসটি ত আমায় চিনিয়ে দিলেন না। যদি হঠাৎ কোনও দরকারই হয়!"

বসন্ত বলিল, "আরও দিনকতক যাক্, নিয়ে যাব একদিন তোকে সঙ্গে ক'রে। কলকাতার পথঘাট আগে তোর অভ্যাস হোক। নইলে শেষে কি মোটর চাপা প'ড়ে বুড়ো বয়সে প্রাণটা খোয়াবি?"

একদিন সন্ধ্যার সময় বসন্ত বাড়ী আসিলে নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওগো, আজ সুহাস আমায় একটা ভারি মজার কথা বলেছে।"

বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

"ও বললে কি জান? বললে, 'তোমার স্বামী রোজ রাত্রে বাড়ীতে থাকেন না,

বাড়ীতে খানও না, রাত ৯টা ১০টার সময় চ'লে যান, আবার পরদিন সেই বেলা ৯টায় আসেন, কেন বল দেখি?' আমি বললাম, 'কি করবেন ভাই, ছাপাখানার চাকরি, সারারাত খবরের কাগজ ছাপেন, সকালবেলা কাগজ বেরোয়, কাজেই রাতে বাড়ী থাকতে পারেন না।' সে বললে, 'তুমি ভাই সরল মানুষ; আমার স্বামী যদি আমায় ঐ কথা বলতেন, আমি কিন্তু বিশ্বাস করতাম না। আমি মনে করতাম, আমায় বুঝি ঐ রকম বোকা বুঝিয়ে—'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নির্ম্মলা থামিল। বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "বোকা বুঝিয়ে—কি?"

নির্ম্মলা বলিল, "যাও, আমি বলবো না সে ছাই কথা।"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "তোমার সখী এই কথা বললে ত যে, আমি হ'লে মনে করতাম যে আমায় বোকা বুঝিয়ে, হয়ত আমার স্বামী কোনও কু-স্থানে গিয়ে রাত কাটান।"

নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, তাই। তবে, এমন রূঢ় ভাবে বলেনি। বলেছিল, 'অন্য কোথাও হাওয়া খেতে যান।' প্রথমে ত আমি 'হাওয়া খাওয়া' মানেই বুঝতে পারিনি, শেষে সে বললে। তুমি কিন্তু ইসারাতেই বুঝতে পেরেছ—উঃ, তোমার খুব বুদ্ধি কিন্তু!"

বসন্ত হাসিতে লাগিল। বলিল, "সুহাস আর কতদিন বাপের বাড়ী থাকবে?"

"পুজো পর্য্যন্ত। পুজোর সময় ওর বর আসবে—পুজোর পর ওকে নিয়ে আবার পশ্চিমে চ'লে যাবে।"

ইহার কয়েক দিন পরে, এক দিন বসন্ত আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি ভ্রান্তিবিলাস পড়েছ?"

"হ্যাঁ, পড়েছি। তুমিই ত সে বই কিনে বাপের বাড়ীতে আমার দিয়ে এসেছিল! কেন?"

বসন্ত বলিল, "আচ্ছা, কাল বেলা দু'টোর সময় আমি কোথায় ছিলাম?"

"কেন? তুমি এই খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে।"

"কাল সারাদিন আমি একবারও বেরিয়েছিলাম বাড়ী থেকে?"

"না, সেই রাত ৯টার সময় ত আপিসে গেলে। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ গা?"

"একটা ভারি মজা হয়েছে। আজ দুপুরের পর আমি আপিসে গেলে, একজন আমায় বললে, 'কাল বেলা দুটোর সময় মোটরে চ'ড়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?' আমি বললাম, 'কই, আমি ত কোথাও যাইনি—আমি ত কাল সারাদিন বাড়ীতেই ছিলাম।' সে বললে, 'বিলক্ষণ! আপনি একখানা হলদে রঙের মোটরে চ'ড়ে হ্যারিসন রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন, একজন বুড়ো মত লোক আপনার পাশে ব'সে ছিল, আর আপনি বলছেন, আমি যাইনি!' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই আমি নয়, তা হ'লে আমার মত চেহারা অন্য কাউকে আপনি দেখেছেন।' সে কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করলে না। বললে, 'না, নিশ্চয়ই আপনি। ঠিক আপনার চেহারা, এই রকম পাঞ্জাবী গায়ে, চাদর এই রকম খুলে গায়ে জড়ানো, আপনি ভিন্ন অন্য কেউ হতেই পারে না।'—ঠিক ভ্রান্তিবিলাস নয়?"

নির্ম্মলা বলিল, "হ্যাঁ তাই ত! ভারী আশ্চর্য্য ত!"

কয়েক দিন পরে নির্ম্মলা একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীকে বলিল, "হ্যাঁ গা, তুমি আপিস থেকে অন্য কোথাও গিয়াছিলে কি?"

বসন্ত বলিল, "না। কেন বল দেখি?"

"সুহাসের মুখে শুনলাম, আজ তার বাবা দেখেছেন, একখানা হলদে মোটরে চ'ড়ে তুমি হাওড়া ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছ।"

বসন্ত কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "তাই ত! ভারি মুস্কিল হ'ল যে! নিশ্চয়ই সেই লোকটা। আচ্ছা, আমি বাড়ী না থাকার সময় সেই লোকটা এসে তোমায় যদি ডাকে, তুমি ত তা হ'লে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে চ'লে যাবে!"

নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "রক্ষে কর!"

বসন্ত বলিল, "কেন মন্দ কি? গরীব স্বামীর পরিবর্ত্তে ধনী স্বামী পাবে! মস্ত মোটরে চ'ড়ে চ'লে যাবে, আমি ব্যাচারী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবো!"

নির্ম্মলা বলিল, "দেখ, ফের যদি ঐ সব আকথা কুকথা আমায় বলবে, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমি আর কথাই কইব না।"

দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস আসিয়া পড়িল। সুহাসিনীর স্বামী পশ্চিম হইতে আসিলেন; তিনি বসন্তের সমবয়সী। দুইজনে আলাপ-পরিচয় হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সপ্তমী পূজার দিন বেলা ৫টার সময় বসন্ত বলিল, "আজ আমি এখনই বেরুচ্ছি। আপিসে কাজ বেশী পড়েছে—আজ আর সন্ধ্যাবেলা আমি আসতে পারবো না।—কাল একবারে বেলা ৯টার সময় আসবো।"

নির্ম্মলা বলিল, "ভ্যালা চাকরী হয়েছে বাপু, হ্যাঁ! পূজোর তিন দিনও ছুটী নেই!"

বসন্ত বলিল, "ছুটী চুলোয় যাক—কাজের আরও বেশী ভিড়। রেল, পোষ্ট আপিস, খবরের কাগজের আপিসে, আর যারা থিয়েটারে চাকরি করে, তাদের পালে-পার্ব্বণে ছুটী ত নেই-ই; বরং কাজ চতুর্গুণ বেড়ে যায়।"

স্বামী চলিয়া গেলে নির্ম্মলা সুহাসিনীর নিকটে দুর্গাকে পাঠাইয়া একখানা উপন্যাস আনাইয়া তাহাই পড়িতে বসিল। অন্য দিন সন্ধ্যাবেলা সে গা ধোয়, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে আজ আর সে সব কিছু করার তার চাড় হইল না।

ছয়টার সময় সুহাসিনী আসিয়া বলিল, "তোমার ঝির কাছে শুনলাম দাদাবাবু না কি আজ সন্ধ্যেবেলা আর আসবেন না?"

"হ্যাঁ, সে ত সেই ৫টার সময়ই বেরিয়ে গেছে।"

"এক কাজ করবে ভাই?"

"কি?"

"আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি। আমার আর মা'র জন্যে উনি একটা বক্স নিয়েছিলেন। মা প্রথমে যাবেন বলেছিলেন, এখন আর যেতে চাচ্ছেন না। তুমি খুকীকে নিয়ে, চল না ভাই আমার সঙ্গে!"

নির্ম্মলা বহি বন্ধ করিয়া বলিল, "যাব? কিন্তু ওঁকে ত বলা হয়নি।"

"তার জন্যে কি আর হয়েছে?"

"তোমার উনি কোথায় বসবেন?"

"উনি কখ্খনো বক্সে বসেন না। বলেন, মেয়েদের সঙ্গে বসতে আমার লজ্জা করে। চল চল কাপড়-চোপড় ছেড়ে নাও, খুকীকে দুধ-টুধ খাওয়াও ঠিক ৭টার সময় বেরুতে হবে।"

"কি বই হবে?"

"কৃষ্ণকান্তের উইল।"

"সেই ভ্রমর রোহিণী-টোহিনী?"

"হ্যাঁ।"

"যেতে ত ইচ্ছে করছে খুবই।"

"রামাকেও নিয়ে চল। তুমি আমি একখানা গাড়ীতে যাব, রামা কোচবাক্সে ব'সে যাবে এখন। উনি ট্রামে যাবেন বলেছেন।"

"আচ্ছা, রামাকে জিজ্ঞাসা করি।"—বলিয়া নিৰ্ম্মলা তাহাকে ডাকিল। রামা আসিলে নিৰ্ম্মলা তাহাকে সুহাসিনীর প্রস্তাবের কথা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোদের জামাই-বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি. এ ভাবে গেলে তিনি শেষে রাগ করবেন না ত, রামুদা?"

রামা বলিল, "না রাগ করবেন কেন? কোনও অমন্দ কাজ ত করা হচ্চে না!"—সুতরাং নিৰ্ম্মলা থিয়েটারে যাইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিজ প্রসাধনে নিযুক্ত হইল।

নিৰ্ম্মলা ও সুহাসিনী যখন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বক্সে প্রবেশ করিল, তখন অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দুইজনে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিল।

প্রথম অংক সমাপ্ত হইলে আলো জ্বলিয়া উঠিল। সোডা-লেমনেড পাণ-সিগারেট-ওয়ালারা মহা কোলাহল বাধাইয়া তুলিল। নিৰ্ম্মলা ও সুহাসিনী অন্যান্য বক্সের অধিকারিণী মহিলাগণের বসনভূষণের পারিপাট্য দেখিতে লাগিল। কোনও কোনও বক্সে মহিলাগণের সঙ্গে দুই একটি পুরুষও বসিয়া আছে। তার পর তাহারা নিম্নে দৃষ্টিপাত করিল। সুহাসিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ ভাই ঐ খুকীর বাবা নয়?"

নিৰ্ম্মলা বলিল, "কোথায়?"

"ঐ যে একেবারে সামনের সীটে. গদী-আঁটা বেঞ্চের মাঝখানে?"

নিৰ্ম্মলা সেই লোকটির পানে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তিনিই ত! তা, এখানে তিনি কি ক'রে এলেন? বলে গেলেন যে, সন্ধ্যে থেকেই আপিসে খুব কাজ!"

সুহাস বলিল, "তা কিছু আশ্চর্য্য নয়। খবরের কাগজওয়ালাদের আবার থিয়েটরের অভিনয়ের সমালোচনা লিখতে হয় কিনা নইলে তারা বিজ্ঞাপন দেবে কেন? ওঁর আপিস থেকে আর কাউকে না পেয়ে আজ ওঁকেই পাঠিয়েছে বোধ হয়।"

নিৰ্ম্মলা যেন সান্ত্বনা পাইয়া বলিল, "তা হ'তে পারে বটে।"

খুকী এই সময় বায়না ধরিল, "মা, আমি বাবার কাছে যাব। এখান থেকে আমি ভাল দেখতে পাচ্ছিনে—আমি বাবার কাছে বসবো।"

নিৰ্ম্মলা বলিল, "কি ক'রে যাবি? কোথা দিয়ে কোথা যেতে হয়, তা কি তুই জানিস? শেষে হারিয়ে যাস যদি! উনি যদি আমাদের দেখতে পান, তা হ'লে নিশ্চয়ই এখানে আসবেন, তখন তুই সঙ্গে যাস।"

চোখো-চোখি হইবার আশায় নিৰ্ম্মলা একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু উদ্দিষ্ট ব্যক্তি উপরে চাহিল না। ক্রমে কনসার্ট থামিল, আলো নিবিল, দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক শেষে আলো জ্বলিলে দেখা গেল, নিম্নের সে আসন শূন্য, সেখানে কেহই নাই। ক্ষণকাল পরে নিৰ্ম্মলা দেখিল, তাহার সম্মুখে, বিপরীত দিকের বক্সে তার স্বামী প্রবেশ করিয়া, দুইটি মহিলার সহিত কথা কহিতেছেন। উভয়েই যুবতী—একজন স্থূলাঙ্গী, একজন কৃশকায়া। দুইজনের মাঝখানে একটি সাত আট বৎসরের বালক বসিয়া আছে। দেখিয়া নিৰ্ম্মলা খুব বিস্মিত হইল। সুহাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিল। খুকী বলিল, "ঐ মা, বাবা ওখানে এসেছে—আমি বাবার কাছে যাই!"

নিৰ্ম্মলা বলিল, "যা গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।"

বালিকা চলিয়া গেল। নিৰ্ম্মলা সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ভাই ওরা? উনি ওদের সঙ্গে কথা কোচ্ছেন কেন?"

সুহাস বলিল, "তাও আর বুঝতে পারলে না নেকুরাম! ওঁদের দুটির মধ্যে একটি

তোমার উপ-সতীন। ওঁরই আপিসে ত রোজ রাত্তিরে তোমার স্বামী চাকরী করতে যান।"

নির্ম্মলা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া, একদৃষ্টে সেই বক্সের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার যেন কান্না আসিতে লাগিল। অর্দ্ধ মিনিট পরেই দেখিল, স্বামী সেই বক্স হইতে বাহির হইয়া অদৃশ্য হইলেন।

একটু পরেই খুকী ফিরিয়া আসিল। তার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে। নির্ম্মলা ব্যস্তভাবে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খুকী, কি হয়েছে?"

খুকী ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "মা, বাবা বললে, আমি তোর বাবা নই। বললে আমি ত তোকে চিনি না বাছা! কার মেয়ে তুই? কোথায় থাকিস?"—বলিয়া সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

নির্ম্মলা বলিল, "ও মা, সর্ব্বরক্ষে! ছি ছি রাম রাম, কাকে আমার স্বামী বলে মনে করেছিলাম? না রে খুকী, ও তিনি ন'ন। ঠিক তাঁর মত দেখতে আর একজন। তুই তাঁর বুকের কলিজে তোকে কি তিনি বলতে পারেন, আমি তোর বাবা নই!"

সুহাস বলিল, "তুমি কি বলছ ভাই, আমি বুঝতে পারছিনে।"

নির্ম্মলা বলিল, "কেন, তোমায় কি আমি বলিনি—বলিনি বোধ হয়। সে দিন যে তুমি আমায় বলেছিলে, একখানা হলদে রঙের মোটর গাড়ীতে উনি হাওড়া ষ্টেশনে যাচ্ছেন, তোমার বাবা দেখে এসেছেন—সে উনি নন। ঠিক ওঁর চেহারা এই কলকাতায় আর একজন লোক আছে, সে একখানা হলদে রঙের মোটর চ'ড়ে বেড়ায়। ওঁর কত বন্ধু কত সময় তাকে দেখে উনি মনে করেছে—উনি সে কথা আমায় বলেছেন।"

সুহাস বলিল, "বল কি! খুব আশ্চর্য্য ত!"

এই সময় থিয়েটারের ঝিকে সেইখান দিয়া যাইতে দেখিয়া নির্ম্মলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ও ঝি তুমি একবার গিয়ে দেখে এস ত বাছা, একখানা বাড়ীর মোটর গাড়ী, হলদে রঙের, দাঁড়িয়ে আছে কি না; যদি থাকে ত জিজ্ঞাসা ক'রো, কার গাড়ী।"

"আচ্ছা"—বলিয়া ঝি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিল, "হলদে রঙের মোটর দাঁড়িয়ে আছে, বললে, ভবানীপুরের হেমন্তবাবুর গাড়ী।"

নির্ম্মলা সহাস্যে সুহাসিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "শুনলে ত?"

কনসার্ট থামিল, আলো নিবিল। তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল।

পরদিন বেলা ৯টার সময় বসন্ত বাড়ী আসিলে নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, কাল তুমি থিয়েটরে গিয়েছিলে?"

বসন্ত সবিস্ময়ে বলিল, "থিয়েটরে! তুমি স্বপ্ন দেখেছ নাকি? কাল সেই সন্ধ্যে থেকে সকাল ৭টা পর্য্যন্ত মাথার ঘাম মোছবার অবকাশ পাইনি—আমি যাব থিয়েটর দেখতে? তুমি ত বেশ!"

নির্ম্মলা তখন গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। সুহাস প্রথমে কি সন্দেহ করিয়াছিল তাহা এবং ঝি পাঠাইয়া খবর লইবার কথাও বলিল। শুনিয়া বসন্ত বলিল, "তুমিও তা হ'লে দেখেছ তাকে? কি সর্ব্বনাশ! সে যদি তোমায় এসে বলত, চল, বাড়ী যাই, তুমি ত তা হ'লে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে চ'লে যেতে!"

নির্ম্মলা বলিল, "বোকো না বাপু, যাও! রোজ রোজ এক ঠাট্টা কি ভাল লাগে? দূরে থেকে দেখছি বলেই আমার ভুল হয়েছিল, কাছে এসে ডাকলে কি আর আমার ভুল হ'ত?"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "আমার নিজের মেয়েই যখন চিনতে না পেরে তাকে বাবা বললে,—আমার শ্বশুরের মেয়ে কি তফাৎ বুঝতে পারত?"

নির্ম্মলা বলিল, "যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। আর কক্ষণো আমি তোমার সঙ্গে ভিন্ন এক পা বাইরে যাব না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূজা অন্তে সুহাসিনী তার স্বামীর সঙ্গে পশ্চিমে চলিয়া গেল। এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে নির্ম্মলা একটি সমবয়সী সহৃদয়া সখী পাইয়াছিল—তাহার অভাবে নির্ম্মলার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল।

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, নির্ম্মলার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার পর যথারীতি বসন্ত আপিসে চলিয়া গেল, কিন্তু তার পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে ফিরিয়া আসিল না। ১০টা বাজিল. ১১টা বাজিল. তথাপি স্বামী না আসায় নির্ম্মলা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রামাকে ডাকিয়া বলিল, "রামুদা, তুমি একবার আপিসে গিয়ে খবর নিয়ে এস না। কি হ'ল. কেন এলেন না. কিছুই বুঝতে পারছিনে যে!"

রামা বলিল, "কত দিন বলেছি, আমাকে কি জামাইবাবু তাঁর আপিস চিনিয়ে দিয়েছেন যে যাব?"

নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তা হ'লে কি হবে. রামুদা?"

"বাড়ীওয়ালাবাবুকে বলিগে। তিনি বোধ হয় সে আপিস চেনেন. তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।"

"তুমি যাও দাদা—শীগ্‌গির যাও।"

নির্ম্মলা উৎকণ্ঠিতভাবে রামার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ মাঝের দরজা খুলিয়া, বাড়ীওয়ালাবাবুর স্ত্রী আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাছা, রামু বলছে আজ ছেলে নাকি বাড়ী আসেন নি?"

"হ্যাঁ মা। আমি বড় ভাবনায় পড়েছি। কি হবে মা?"

"ভয় কি, হয়ত কোনও কাজে আটকে পড়েছেন। তিনি বললেন, মেয়েকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস ,জামাই কোন্ আপিসে চাকরী করেন, তা হ'লে উনি এখনই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবেন।"

নির্ম্মলা সরোদনে বলিল, "খবরের কাগজের আপিসে কাজ করেন।"

"তা ত হ'ল. কিন্তু কোন্ খবরের কাগজের আপিসে?"

"ইংরিজী খবরের কাগজ।"

"কিন্তু সে কাগজের নাম কি? ইংরিজী খবরের কাগজ ত অমন কত বেরোয় কলকাতায়।"

"তা জানিনে মা ইংরিজী খবরের কাগজ. তাই জানি।"

"আচ্ছা, কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করি. দাঁড়াও।' বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "উনি ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, সমস্ত প্রধান প্রধান ইংরেজী খবরের কাগজের আপিসেই আমি যাব, গিয়ে খোঁজ করব।"

নির্ম্মলা তখনও আহার করে নাই জানিয়া তিনি তাহাকে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা বলিল. "না মা, তাঁর খবর না পেলে আমি কিছুতেই খেতে পারব না। আমার গলা দিয়ে অন্ন-জল গলবে কেন?" অবশেষে অনেক কষ্টে তিনি নির্ম্মলাকে এক গ্লাস সরবৎ পান করাইয়া গৃহে গেলেন।

বেলা দেড়টার সময় বাড়ীওয়ালাবাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া নির্ম্মলাকে জানাইলেন, কলিকাতার সমস্ত ইংরাজী দৈনিকের আপিসেই তিনি গিয়াছিলেন. কিন্তু বসন্তকুমার বসু কেহ কোথাও চাকরী করে না।

নির্ম্মলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার বাবাকে এখানে আসবার জন্যে টেলিগ্রাফ ক'রে দিতে বল।"—নির্ম্মলা পিতার ঠিকানা বলিয়া দিল।

সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হইল, তথাপি বসন্তের দেখা নাই অথবা তাহার তরফ হইতে কোনও সংবাদও নাই। পিতাও আসিয়া পোঁছিলেন না।

রাত্রি এগারোটার সময় দুয়ারের কড়ায় খট্-খট্ করিয়া আওয়াজ হইল। পিতা আসিয়াছেন মনে করিয়া নির্ম্মলা নিজে ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। একটি ৭।৮ বৎসর-বয়স্ক বালকের হাত ধরিয়া তার স্বামী দাঁড়াইয়া—তাহার চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকাইয়া আধখানি হইয়া গিয়াছে। সে ভগ্নস্বরে ডাকিল—"নির্ম্মল!"

সেই মুহূর্ত্তে খোলা দরজার ভিতর দিয়া নির্ম্মলার দৃষ্টিতে পড়িল, হলদে রঙের বৃহৎ এক মোটরকার বাহির-বারান্দার নিম্নে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নির্ম্মলা একটু অস্ফুট ভীতধ্বনি করিয়া দুই তিন পদ পিছাইয়া গেল।

"ভয় নেই নির্ম্মলা!—তোমারই স্বামী আমি, অন্য কেউ নই। এইমাত্র নিমতলার ঘাট থেকে ফিরছি। সেদিন থিয়েটরে বক্সে যে রোগা স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলে, সে সত্যিই তোমার সতীন—উপসতীন নয়—আমার প্রথমা স্ত্রী—তাকে পুড়িয়ে এলাম।—এই ছেলেটিকেও সেদিন তুমি বক্সে দেখেছিলে। এই নাও—আজ থেকে খোকা তোমারই ছেলে হ'ল।"

বালক এই কথায় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে নির্ম্মলা সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে ছুটিয়া গিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। স্বামীর হাতখানি ধরিয়া বলিল, "ভিতরে এস।"

বসন্ত—অথবা হেমন্ত (কারণ হেমন্তই এই দুর্ভাগ্যের আসল নাম) বলিল, "দাঁড়াও, গাড়ীটার ব্যবস্থা ক'রে আসি।"—বলিয়া সে বাহির হইয়া বলিল, "বিনোদ, গাড়ী নিয়ে আবার নিমতলায় যাও। ওদের সব বাড়ী পৌঁছে দিয়ে, গাড়ী সেখানেই রেখ। আজ রাত্রে আমি আর খোকা এইখানেই রইলাম—কাল বেলা ৯টার সময় গাড়ী নিয়ে আসবে।"

নির্ম্মলা রান্নাঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি লেবু দিয়া চিনির সরবৎ প্রস্তুত করিয়া, স্বামীকে ও খোকাকে পান করাইয়া বলিল, "হ্যাঁ গা, দুটি ভাত চড়িয়ে দিই, ভাতে-ভাত?"

হেমন্ত বলিল, "আমি ত কিছুই খেতে পারবো না। খোকাও বোধ হয়, ভাত হ'তে হ'তে ঘুমিয়ে পড়বে। দুধ-টুধ থাকে ত ওকে একটু দাও।"

"আজ সারাদিন বোধ হয় তোমার খাওয়া হয়নি?"

"না হওয়ারই মধ্যে। ক'দিন থেকেই খোকার মা অসুখে পড়েছিলেন। কাল রাত ১০টার সময় ভবানীপুরে বাড়ী গিয়ে দেখলাম, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, জীবনের আশা ডাক্তারেরা ছেড়েই দিয়েছে। সেই তখন থেকে, আজ বেলা তিনটে অবধি যমে-মানুষে যুদ্ধ। তিনটের সময় সব শেষ হয়ে গেল। যোগাড়যন্তর ক'রে বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যে হ'ল। আমি না আসাতে তুমি কত ভাবছো—তা মাঝে মাঝে মনে পড়ছে বটে—কিন্তু কাউকে দিয়ে একটা খবর যে পাঠাব তোমাকে, তা পেরে উঠলাম না। তোমার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?"

নির্ম্মলা বলিল, "দুপুরবেলা সরবৎ খেয়েছি।"

হেমন্ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা আগেই জানি। আচ্ছা, দাও দুটো ভাত চড়িয়ে—দু'জনেই খাব এখন। খুকী কোথা?"

"সে উপরে ঘুমুচ্ছে।"

"তুমি উপরে চল।"

"আচ্ছা, তাই চল।"

দ্বিতলে গিয়া নির্ম্মলা খোকাকে কোলে করিয়া সোফার উপর বসিয়া তাহাকে দুধ

ও সন্দেশ খাওয়াইতে লাগিল। হেমন্ত খাটের উপর বসিয়া, ঘুমন্ত খুকীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে চুমো খাইতে খাইতে বলিতে লাগিল, "মা—আমায় বাবা বললে যে, আমি তোর বাবা নই!—এই ব'লে বাছা আমার সেদিন কেঁদেছিল। 'আমি তোর বাবা নই'—বলতে আমার বুকটা ফেটে গিয়েছিল রে, তা কি তুই জানিস?"—বলিয়া হেমন্ত ঘুমন্ত মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

পরদিন বেলা ১০টার ট্রেণে দত্ত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রথমটা জামাতার উপর মনে মনে তাঁহার খুব রাগ হইল—কিন্তু শেষে যখন শুনিলেন, সম্প্রতি ইংলিসম্যানে' চাকরী করার কথাটা কল্পিত হইলেও, প্রথমে কথিত দালালী ব্যবসায়টা খাঁটি সত্য, সে ব্যবসায় বিশেষ জাঁকালো রকমের, এবং সে ব্যবসায় হইতে বাবাজীউ বৎসরে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; তখন তাহার সমস্ত রাগ জল হইয়া গেল।

পরদিন দত্ত মহাশয় জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাবাজী, প্রথম যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা তখন তুমি পরিচয়টি গোপন করেছিলে কেন?"

হেমন্ত বলিল, "আজ্ঞে না। নির্ম্মলাকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে গঙ্গার ঘাটে আপনি যখন পাল্কী এনেছিলেন, আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তখন আমার প্রকৃত নামই বলেছিলাম—হেমন্তকুমার বসু। বাড়ী নিয়ে গিয়ে আপনি আমায় বসন্ত বসন্ত ব'লে ডাকতে লাগলেন। আমি প্রতিবাদ করিনি কারণ তা করার কোনও দরকার মনে করিনি।"

"গরীব সেজেছিলে কেন?"

"আজ্ঞে, কুলীন কায়েথের ছেলে, ৩০ বছর বয়স হয়েছে, গরীব না সাজলে, তত দিন পর্য্যন্ত আইবুড় থাকার কৈফিয়ৎ কি দিই? আর প্রকৃত কথা জানলে আপনি কি আর সতীনের উপর মেয়ে দিতেন?"

নির্ম্মলা এক দীর্ঘ পত্রে সুহাসিনীকে সমস্ত ব্যাপার জানাইল। শেষে লিখিল, 'তুমি যাহা অনুমান করিয়াছিলে, তাহাই সত্য হইয়া দাড়াইল।—উনি রাত্রে চাকরী করিতে যাইতেন না;—আমাকে বোকা বুঝাইয়া হাওয়া খাইতেই যাইতেন বটে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে, উহা বিশুদ্ধ বায়ু, দূষিত হাওয়া নহে!"

পরলোকগতা পত্নীর শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ম্মলাকে হেমন্ত এই বাড়ীতেই রাখিল। তাহার পর একটা ভাল দিন দেখিয়া হেমন্তের জননী তাঁহার নূতন বউকে আনাইয়া বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

ডোরা

রাত্রি ৯টার সময় হ্যারিসন রোড হইতে একখানি ট্যাক্সি আসিয়া, পটলডাঙ্গার একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। আরোহিণী—দুইটি তরুণী। একজনের মাথায় হ্যাট, অঙ্গে ইংরাজী গাউন, অপরটির পরিধানে শাড়ী—কিন্তু পায়ে জুতা-মোজাও আছে। হ্যাট-ধারিণী সামনে ঝুঁকিয়া শোফেয়ারকে বলিল, "ডেখো, ২০ নম্বর কাঁহা?"

"জি হুজুর"—বলিয়া চালক গাড়ীর গতিবেগ কমাইল, এবং উভয় পার্শ্বের বাড়ী-গুলির নম্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিল। অবশেষে ২০ নম্বর দেখিতে পাইয়া, সেই

বাড়ীর সামনে গাড়ী থামাইল। শাড়ীপরা মেয়েটি মেম-জনোচিত উচ্চারণে তাহার সঙ্গিনীকে ইংরাজীতে বলিল, "ডক্টর রবিনসন ২০ নম্বরই বলিয়াছিলেন ত? আমার কিন্তু স্মরণ নাই।"

অপরা যুবতী বলিল, "হ্যাঁ—২০ নম্বর বলিয়াছিলেন আমার ঠিক মনে আছে।"

শোফেয়ার ট্যাক্সির দরজা খুলিয়া দিল। উভয়ে তখন নামিয়া সদর দরজার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। শাড়ীপরা মেয়েটি দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একজন খোট্টা চাকর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

শাড়ীধারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাড়ীতে রোগী আছে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"ডক্টর রবিনসন চিকিৎসা করছেন?"

"আজ্ঞে, মেটিয়া কলেজের ডাংদার সাহেব ইলাজ করছেন।"

"হ্যাঁ ঠিক। বলগে, ডাক্তার সাহেব আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা নার্স।"

"বহুৎখু।" বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। গাউনপরা মেয়েটি তখন রাস্তায় নামিল। ট্যাক্সির ভাড়া দিয়া উহাকে বিদায় করিয়া আবার সঙ্গিনীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাড়ীপরা মেয়েটির বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি হইবে,—রঙটি বেশ ফর্সা। অন্য মেয়েটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের কম নয়—হ্যাট ও গাউন পরিলে কি হইবে—রঙটি তাহার কালো, তবে, "গদাধরের পিসীর" মত কালো নহে বটে।

অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্য ফিরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "আসুন।" যুবতীদ্বয় ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বাড়ীখানি বিদ্যুৎ আলোকে আলোকিত। নিতান্ত নূতন না হইলেও বেশী পুরাতন নহে। উঠানটি জঞ্জাল ভর্ত্তি নহে,—সিঁড়ির দেওয়ালে পানের পিক নাই,—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিতেছে।

যুবতীদ্বয় দ্বিতলের বারান্দায় পেঁীছিয়া দেখিল, বিশ বাইশ বছরের এক যুবক, একটা আধ-ময়লা টুইল-সার্ট গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ইংরাজীতে বলিল, "ডক্টর রবিনসন কি আপনাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন?"

ইংরাজী বেশধারিণী বলিল, "হাঁ। তিনিই আমাদের পাঠাইয়াছেন। এ বাড়ীর কর্ত্তা কে?"

যুবক উত্তর করিল, "যিনি কর্ত্তা, তিনিই অসুস্থ।"

"ফীজ্ সম্বন্ধে আমরা তবে কাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিব?"

"আমার সঙ্গেই কহুন।"

"আপনি তাঁর পুত্র বুঝি?"

যুবক ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "না, আমি তাঁর বন্ধু—তিনি আমারই সমবয়সী। তিনি নিজ অধিকারে একজন জমীদার—মৈমনসিং জিলার অধিবাসী—এখানে থাকিয়া বিজ্ঞান কলেজে এম এস-সি পাঠ করিতেছেন।"

এই পরিচয় শুনিয়া যুবতীদ্বয়ের মনে যেন একটু সম্ভ্রমের ভাব উদয় হইল। শাড়ীপরা মেয়েটি এবার বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিন জ্বর হয়েছে?"

"আজ এগারো দিন।"

"বাড়ীর মেয়েছেলেরা সব কোথায়?"

"এ বাড়ীতে মেয়েছেলেরা কেউ থাকে না। এটা ত বাসা-বাড়ী কিনা! আমিও থাকি অন্য বাসায়। তবে, এ ক দিন এখানেই রয়েছি, নইলে রোগীকে দেখে শোনে কে?"

"রোগী কোথায়? কোন্ ঘরে? চলুন, রোগীকে আমরা দেখি।"

যুবক উভয়কে লইয়া সেই বারান্দার প্রান্তস্থিত একটি কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। পালঙ্কের উপর একটা রেশমী চাদরে আবৃত হইয়া তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সের এক

যুবক শুইয়া আছে। একজন বৃদ্ধ ভৃত্য পালঙ্কের ধারে বসিয়া ধীরে ধীরে রোগীর পায়ে হাত বুলাইতেছে। মেমসাহেবদ্বয়কে দেখিয়া সে ব্যক্তি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

যুবতীদ্বয় প্রায় আধ মিনিটকাল রোগীর মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর চার্ট দেখিতে চাহিল। ডাক্তার সাহেবের আদেশক্রমে ছয়ঘণ্টা অন্তর রোগীর দেহের উত্তাপ ও নাড়ীর গতি এই চার্টে লিপিবদ্ধ হইতেছে। যুবতীদ্বয় চার্ট দেখিতে-ছিল, যুবকটি বলিল, "শুশ্রূষা সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব কি—"

হ্যাটধারিণী নিজ আবদ্ধ ওষ্ঠযুগলে অঙ্গুলিস্থাপন করিয়া যুবককে কথা কহিতে নিষেধ করিল। তারপর অতি মৃদুস্বরে বলিল, "গোল করেন কেন? দেখিতেছেন না, রোগী নিদ্রিত?" তারপর সঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া সেইরূপ স্বরে বলিল, "ডোরা, তুমি রোগীর নিকট থাক, আমি অন্য ঘরে গিয়া বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহি।" যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এস, বাবু।"

দুই

এ কক্ষখানি এই গৃহস্বামীর পড়িবার ঘর। সবচেয়ে ভাল চেয়ারখানি দখল করিয়া শুশ্রূষাকারিণী বলিল, "ব'স বাবু, ব'স।"

ইহার মুরুব্বীয়ানা দেখিয়া যুবকের হাসি পাইতেছিল। যুবতী বলিল, "তোমার নামটি জানিতে পারি কি?"

যুবক বলিল, "আমার নাম অনিল চাটার্জ্জি।"

যুবতী বলিল, "আমার নাম মিস জেসি ব্রাউন। আমার সঙ্গে যে আসিয়াছে, তাহার নাম মিস ডোরা রয়।"

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "উনিও কি ক্রিশ্চান নাকি?"

"নিশ্চয়। কামাক ষ্ট্রীটে যে নার্সেস হোম আছে, সেইখানে আমরা থাকি। ক্রিশ্চান না হইলে কি ডোরা সেখানে থাকতে পাইত?"—বলিতে বলিতে জেসি তাহার হাতব্যাগ খুলিয়া একটা সিগারেট কেস বাহির করিল। নিজে একটি সিগারেট ধরাইয়া কেসটি অনিলের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "হ্যাভ্ ওয়ান।" (খাও একটা)

অনিল বলিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু আমি ধূমপান করি না।"

জেসি অনিলের দিকে চাহিয়া ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ইনডীড!—হোয়াট্ এ গুড লিটল্ বয়!" (বল কি! ভারি নক্ষি ছেলে ত!)

অনিল বলিল, "তোমার সখী ঐ ডোরা—"

জেসি বাধা দিয়া বলিল, "মিস রয়, ইফ্ ইউ প্লীজ!" (মিস রয় বলা উচিত!)

অনিল বলিল, "হাঁ—মাফ করিবেন। মিস রয়ও কি সিগারেট খান নাকি?"

জেসি নিজ সিগারেটে দুই তিন টান দিয়া "না"-সূচক শিরশ্চালনা করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "বেঙ্গালী হ্যায়!"

অনিল মনে মনে বলিল, "আহা মরি! তুমি যে কত খাঁটি ইংরেজ, তা তোমার গায়ের রঙেই মালুম!" প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ, যে কথা তোমায় ও ঘরে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। শুশ্রূষা কি ভাবে করিতে হইবে, ডাক্তার সাহেব কি তোমাদের জানাইয়াছেন?"

জেসি কয়েক টান সিগারেট টানিয়া বলিল, "আমাদের কাজ আমরা জানি,—সে সম্বন্ধে তোমার কোনও আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই বাবু। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, আমরা দুইজনে পালাক্রমে চব্বিশ ঘণ্টাই রোগীর নিকট থাকিব। মিস রয়ের ফীজ দৈনিক ১০৲ টাকা করিয়া, আমার ১৫৲ টাকা—আমি সিনিয়র কিনা!—আমি উহার ৩ বৎসর পূর্ব্বে পাস করিয়াছিলাম।"

অনিল বলিল, "বেশ, ঐ ফীই তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।"

"আর যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া সেও তোমরাই দিবে।"

"অবশ্যই দিব।"

"উত্তম কথা। রোগীর নাম কি?"

"নিরঞ্জন রায়চৌধুরী।"

"বলিলে জমিদার। জমিদাররা খুব বড়লোক হয়, না?"

"হ্যাঁ, বড়লোক বইকি!"

"মিষ্টার রায়চৌধুরীর বয়স কত?"

"চব্বিশ।"

"বাপ, মা, আত্মীয়স্বজন সব কোথা?"

"বাপ, মা, ভাই, বোন কেহই নাই। আত্মীয়স্বজন যাঁহারা আছেন, দেশেই আছেন। এঁর এক আত্মীয়,—সম্বন্ধে মাতুল, তিনিই এষ্টেটের ম্যানেজার। নিরঞ্জনের বয়স যখন ১০ বৎসর, সেই সময়ে উঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন হইতেই ঐ মাতুল আদালত হইতে গার্জ্জেন নিযুক্ত হইয়া বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, নিরঞ্জনকেও লেখাপড়া শিখাইতেছেন। উনি আজও বিবাহ করেন নাই। এম-এস-সি পাশ করিয়া বিলাতে গিয়া 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' শিক্ষা করিবেন ইচ্ছা আছে। বিলাত হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে বিবাহ করিবেন না।"

জেসি বলিল, "বাবু, তুমি বড্ড বাজে বকো। ও সব কথা তোমায় কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে?"—বলিয়া সে একমনে সিগারেট টানিতে লাগিল।

মিস জেসি সিগারেট শেষ করিয়া ছাইদানী অভাবে উহা বারান্দায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "টাইফয়েড রোগীর শুশ্রূষার জন্য যে সকল সরঞ্জাম আবশ্যক, তাহার কি কি আছে, কি কি নাই, আমায় দেখাও। যাহা যাহা নাই, সে সকল এখনই আনাইয়া লইতে হইবে।"

অনিল তখন উঠিয়া জেসিকে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লইয়া গেল। জিনিষ-পত্র দেখিয়া, আর যাহা যাহা আবশ্যক, জেসি সে সমস্ত জিনিষের একটি তালিকা লিখিয়া দিল। বলিল, "এগুলি কাল সকালে আনাইয়া লইলেই চলিবে। যাহা আছে, আজ রাত্রের জন্য তাহাই যথেষ্ট। এখন মিস রয়কে একবার ডাকিয়া দাও, তুমি রোগীর নিকট থাক। পালা সম্বন্ধে মিস রয়ের সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া লই।"

অনিল উঠিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ডোরা আসিয়া প্রবেশ করিল। জেসি প্রস্তাব করিল—আজ রাতটা ডোরাই থাকিবে, কল্য প্রাতে ৮টার সময় আসিয়া জেসি উহাকে ছুটি দিবে। তাহার পর ছয় ঘণ্টা অন্তর পালা বদলাইবে। ডোরা কোনও আপত্তি করিল না।

জেসি বলিল, "তবে তুমি রোগীর কাছে যাও। ঐ চাটার্জ্জি ছোকরাকে একটা ট্যাক্সির জন্য লোক পাঠাইতে বল। গুড্ নাইট্ ডিয়া।"—বলিয়া জেসি হস্ত প্রসারণ করিল।

"গুড নাইট" বলিয়া ডোরা উঠিয়া জেসির করমর্দ্দন করিল।

জেসি বলিল, "খুব সাবধান, রোগীর ঘরে যেন গোলমাল না হয়। ঐ চাটার্জ্জি লোকটা ভারি বক্ বক্ করে। গোল করে ত উহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিও। আর দেখ, চার্ট যেন ঠিক ঠিক তৈয়ার হইতে থাকে। ডক্টর রবিনসন এ বিষয়ে কি রকম কড়াক্কড়, তা জান ত? আর উত্তাপ ১০২ ডিগ্রীর উপর উঠিলেই মাথায় আইস-ব্যাগ দিবে। যেন ভুল না হয়।"

"ভুল হইবে না। গুড নাইট"—বলিয়া ডোরা প্রস্থান করিল।

তিন

যে দিনের ঘটনা উপরে বর্ণিত হইল, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার সাহেব আসিয়া নিরঞ্জনের ব্যাধি টাইফয়েড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত শুশ্রূষাকারিণীদের দ্বারা চব্বিশ ঘণ্টা শুশ্রূষার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া যান। যে বৃদ্ধ ভৃত্যকে রোগশয্যার প্রান্তে বসিয়া তাহার মনিবের পায়ে হাত বুলাইতে দেখা গিয়াছিল, তাহার নাম রামকৃষ্ণ—সে নিরঞ্জনের পিতার আমলের ভৃত্য—নিরঞ্জনকে সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। রাত্রি ৯টার মধ্যে দুইজন নার্স আসিবে, ইহা বলিয়া ডাক্তার সাহেব প্রস্থান করিবার পর, দেশে মাতুল মহাশয় রাজেন্দ্রবাবুকে নিরঞ্জনের পীড়ার সংবাদ তারযোগে জানাইয়া তাঁহাকে আসিতে বলা হয়। অনিলই ট্যাক্সিতে গিয়া টেলিগ্রাম করিয়া আসিয়াছিল। তদনুসারে বৃদ্ধ রাজেন্দ্রবাবু তৃতীয় দিন প্রভাতেই কলিকাতায় আসিয়া পেঁছিলেন। ডাক্তার সাহেব এবং অপর একজন খ্যাতিমান বাঙালী ডাক্তার দুই বেলাই আসিয়া রোগীকে দেখিতেছেন, এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে জেসি এবং ডোরা কর্তৃক অক্লান্ত শুশ্রূষাও চলিতেছে। অনিলও প্রত্যহ আসে,—বন্ধুকে দেখিয়া যায়।

সঙ্কটের দিনগুলি একে একে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। চারি সপ্তাহ পরে চিকিৎসকগণ বলিলেন, আর কোনও আশংকা নাই,—তবে পথ্য দিবেন আরও কয়েক দিন বিলম্বে। তাঁহারা ইহাও জানাইলেন যে, এখন আর দুইজন শুশ্রূষাকারিণীর প্রয়োজন নাই—একজন থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। ডোরা প্রথম প্রথম ছুটী হইলে "নার্সেস্ হোম"-এ গমন করিত। তাহার পর এই বাড়ীতেই তাহাকে নিভৃত ও স্বতন্ত্র একটি ঘর দেওয়া হয়, বামুনঠাকুরের রান্না ডাল, ভাত, তরকারী উপাদেয় জ্ঞানে আহার করিয়া ছুটীর সময়টা সে এই বাড়ীতেই যাপন করিতে থাকে। তা ছাড়া, ডোরা কোনও মেমসাহেবগিরি ফলায় না বলিয়াও বটে এবং অতি যত্নে রোগীর শুশ্রূষা করে বলিয়াও বটে, ইহাকে সকলেরই বড় ভাল লাগিয়াছে। রাজেন্দ্রবাবু তাহাকে মাতৃ-সম্বোধন করেন, রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য ভৃত্যেরা তাহাকে অসংকোচে দিদিমণি বলিয়া ডাকে,—সে যেন পরিবারস্থ একজনের মতই হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং মিস জেসিকে বিদায় দিয়া ডোরাকে রাখাই স্থির হইল।

পরদিন রাজেন্দ্রবাবু নিরঞ্জনকে বলিলেন, "বাবা এখন তুমি বেশ সেরে উঠেছ, এইবার আমি ফিরে যাই না কেন? দু'হপ্তার উপর হ'ল এসেছি—সেখানে কাজকর্ম্ম কি ভাবে চলছে না চলছে কিছুই ত বুঝতে পারছি না। একবার মনে করেছিলাম তুমি পথ্য পেলে তার পর যাব—কিন্তু তা হ'লে আরও ৩।৪ দিন দেরী হয়ে যায়।"

নিরঞ্জন বলিল, "আমার জন্যে বেশী কিছু ভাববেন না মামাবাবু। আমি ত এখন বেশ ভাল হয়ে উঠেছি—ক্ষিদেও খুব হয়েছে—দুটি ভাত পেলেই এখন বাঁচি। আপনি কবে যেতে চান?"

"আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে রওয়ানা হই।"

"আচ্ছা বেশ, যা ভাল হয় তাই করুন মামাবাবু।"

এই সময় ডোরা প্রবেশ করিল। রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ডোরা মা, তোমার চা খাওয়া হ'ল?"

"না মামাবাবু, আমি যে আজ আপনার সংগে চা খাব কাল আপনি বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, বেশ ত। চল, তোমার ঘরে বসেই দু'জনে চা খাইগে।"

নিরঞ্জন বলিল, "ডোরা, তুমি চা খেয়ে এসে আমায় খবরের কাগজ প'ড়ে শোনাবে ত?"

"শোনাব বইকি"—বলিয়া ডোরা রাজেন্দ্রবাবুর সহিত চলিয়া গেল।

এক টেবিলে, ডোরার সহিত একত্র বসিয়া চা পান করিতে করিতে রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তোমার সংগে নির্জ্জনে একটু কথাবার্ত্তা কইবার জন্যেই তোমাকে এখানে

ডেকে এনেছি। আজ ত আমি চললাম, মা!"

"চললেন? আমিও তা হ'লে যাই, কি বলেন?"

"তুমি আরও দিনকয়েক থাক না, নির, পথ্য পাক্—তারপর যেও।"

মাথাটা নত করিয়া ডোরা বলিল, "আচ্ছা, তাই।"

"কিন্তু মা, যে সব কথা আমি তোমায় বলেছি, তা মনে রেখ।"

ডোরা পূর্ব্ববৎ অবনত মস্তকে বলিল, "সব মনে রাখবো, মামাবাবু।"

"যখন কোনও কিছু তোমার দরকার হবে, তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে লিখে পাঠিও।"

"লিখবো।"

"তোমার পিতা জীবিত থাকলে, তাঁর কাছে তুমি যা বলতে পারতে, যা চাইতে পারতে, যা আব্দার করতে পারতে—আমার কাছেও তুমি ঠিক তাই করবে।"

"সে ত আমার সৌভাগ্য, মামাবাবু।"—ডোরার চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

চা-পান শেষ করিয়া রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "যাও মা, তুমি এখন নিরুর কাছে গিয়ে ব'সগে। আমি একবার বাজারে বেরুন। কিছু জিনিষ-পত্তর কিনতে হবে।"

ডোরা বলিল, "আমিও আজ খেয়ে দেয়ে একবার নার্সেস হোমে যাব। বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবো। আপনি ত সন্ধ্যেবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর রওয়ানা হবেন?"

"হ্যাঁ, রাত ৯টায় ট্রেণ।"

"আমি আপনাকে ষ্টেশনে তুলে দিতে যাব, মামাবাবু?"

"বেশ। তা যেও মা।"—বলিয়া রাজেন্দ্রবাবু একটি চুরুট ধরাইয়া, স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া, ছড়ি হাতে করিয়া বাহির হইলেন। ডোরাও গিয়া নিরঞ্জনের কক্ষে প্রবেশ করিল

চার

"আজ ত আপনি পথ্য পেলেন, আমি ওবেলা তবে চ'লে যাই?"

নিরঞ্জন বলিল, "ভাত খেয়ে কেমন থাকি, সেটা দেখা কি আমার দয়াবতী নার্সের কর্ত্তব্য নয়, ডোরা?"

"ভালই থাকবেন, নিরঞ্জনবাবু।—আচ্ছা, না হয় কালই আমি যাব। কি বলেন?"

"আমার বলার আর মূল্য কি, বল!"

ডোরা হাসিয়া নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া বলিল, "আপনি ভারি ছেলেমানুষ!"

নিরঞ্জন বলিল, "আমি ছেলেমানুষ যদি, তবে আমাকে তুমি, আপনি, মশাই, নিরঞ্জনবাবু—এসব বল কেন?"

ডোরা বলিল, "বয়সে কি ছেলেমানুষ? বুদ্ধিতে ছেলেমানুষ।"

নিরঞ্জন বলিল, "কাল থেকে, রোজ বিকেলে ট্যাক্সিতে গঙ্গার ধারের রাস্তায়, ময়দানে, ডাক্তার আমায় বেড়াতে বলেছেন, শুনেছ ত?"

"শুনেছি।"

"তবে?—সে সময় তুমি যদি আমার সঙ্গে না থাক, আমার হঠাৎ যদি কিছু হয়?"

"আমি বুঝি রোজ রোজ তোমাকে সঙ্গে ক'রে হাওয়া খেতে নিয়ে যাব? এটাও কি নার্সদের একটা ডিউটির মধ্যে গণ্য নাকি?"—বলিয়া ডোরা হাসিতে লাগিল।

নিরঞ্জন বলিল, "নার্স আর রোগী—মানুষের সঙ্গে মানুষের এ ছাড়া কি আর অন্য কোনও সম্বন্ধ হ'তে পারে না?"

এই সময়ে রামকৃষ্ণ খানসামা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, তোমার ভাত দিয়েছে, খাবে এস।"

ডোরা উঠিল। নিরঞ্জন খপ্ করিয়া ডোরার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।"

ডোরা রামকৃষ্ণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখছ রামুদা, আমি খিদেয় মরছি, আমায় যেতে দিচ্ছেন না!"

নিরঞ্জন ডোরার হাত ছাড়িয়া দিল। ডোরা হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

ডোরা আসনের উপর বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। অদূরে রামকৃষ্ণ বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। এ কথা, সে কথার পর বলিল, "দিদিমণি, দাদাবাবু ত আরাম হয়ে উঠলেন, এইবার তুমি—"

বৃদ্ধের কথা আটকাইয়া গেল। ডোরা মুখ তুলিয়া বলিল, "এইবার আমি—কি রামুদা? আমায় বিদায় করতে চাচ্ছ?"

রামু বলিল, "না না—বিদায় কেন? বিদায় কেন? সে কথা কি আমি মুখে আনতে পারি, দিদি? তবে বলছিলাম কিনা, তোমার ত কাজ-কর্ম্ম—এ ভাবে ব'সে থাকলে—"

ডোরা পাতে খানিকটা মাছের ঝোল ঢালিয়া বলিল, "কেন, তুমি ত আমায় রোজ দশটি ক'রে টাকা ফী যুগিয়ে যাচ্ছ। ভাবছ বোধ হয়, এখন আর আমার মনিবের টাকা-গুলো মিছে কেন লোকসান হয়? তোমার মনিবের ত গাদা গাদা টাকা রামুদা—পাঁচশো গাধায় বইতে পারে না। আমি না হয় রোজ দশটা ক'রে টাকা নিলামই বা!"

রামকৃষ্ণ বলিল, "না না, সে কথা কি বলছি দিদিমণি? তা নয়। তবে কিনা—"

ডোরা কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিল, "যাও যাও রামুদা, বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতি ধরেছে—আমি কোথাও যাব না, আমি এইখানে থাকব। আমি খৃষ্টান ব'লে যদি তোমাদের আপত্তি থাকে,—ঐ কি সব বলে আজকাল, শুদ্ধি-টুদ্ধি করিয়ে আমায় হিন্দু ক'রে নাও না! দু'দিন না হয় খৃষ্টানই হয়েছি—হাজার হোক হিঁদুর মেয়ে ত বটি!"

রামকৃষ্ণের মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল। সে নতনেত্রে বসিয়া রহিল। অবশেষে বলিল, "আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ না দিদিমণি।"

ডোরা বলিল, "আমি খুব বুঝেছি। যাও, তুমি এখন খেতে ব'সগে—১১টা বেজে গেছে। আমি তোমার দাদাবাবুর জাত মেরে দেবো না, কিছু ভয় নেই। হ্যাঁ জাত ত ভারি আছে কিনা! আমি এ বাড়ীতে আসা অবধি কতগুলো মুর্গী তোমাদের ঐ উঠানে, জবাই হয়েছে, বল দেখি! তোমাকে এক দিন রামপাখীর ঝোল খাইয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও!"

"রাম রাম, ছি, ছি"—বলিতে বলিতে রামকৃষ্ণ উঠিয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, ডোরা আর চারিদিন এ বাড়ীতে রহিল, প্রত্যহ বিকালে নিরঞ্জনকে হাওয়া খাওয়াইয়াও আনিল। তবে, রোজ একবার করিয়া "নার্সেস হোম"-এ ঘুরিয়া আসিত।

পাঁচ

আজ বিকালে চা-পান করিয়া ডোরা বিদায় লইবে। সে যাইবার সময় নিরঞ্জন বলিল, "ডোরা, তুমি আমার জীবন দান করেছ। তোমার সেবা-শুশ্রূষাতেই আমি বেঁচে উঠেছি। নইলে বোধ হয়, এ যাত্রা মহাযাত্রাই করতে হ'ত।"

ডোরা নিরঞ্জনের গায়ে একটা থাবড়া মারিয়া বলিল, "হ্যাঃ—কি বল তুমি, যাও! ভাল লাগে না ও সব কথা!"

নিরঞ্জন বলিল, "আমি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলিনি, সত্যি কথাই বলছি আমি, ডোরা!

তাই ভেবেছি, আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ—তোমার যদি আপত্তি না থাকে—"

ডোরা বলিল, "আছে—আমার আপত্তি আছে—আমি তোমার কৃতজ্ঞতা চাইনে!"

নিরঞ্জন বলিল, "আচ্ছা, কৃতজ্ঞতা নাই নিলে। আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ—"

ডোরা বলিল, "উঃ, তুমি ত আজকাল অনেক ভাল ভাল কথা শিখেছ দেখছি! নিদর্শন মানে কি ভাই? সত্যি আমি জানিনে।"

নিরঞ্জন বলিল, "তোমার বাপ মা মারা যাওয়ার পর পাঁচ বছরের বেলা থেকে তুমি মিশনারীদের হাতে—কে তোমায় বাঙ্গালা শেখাবে বল! নিদর্শন মানে হচ্ছে, কি বলে গিয়ে—ইয়ে—অর্থাৎ—"

ডোরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "চিহ্ন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—চিহ্ন—চিহ্ন।"

"তার পর? ব'লে যাও—এখনও শেষ বলনি।"

নিরঞ্জন বলিল, "কৃতজ্ঞতা নিতে তোমার আপত্তি থাকে থাকুক—বন্ধুত্বের—"

ডোরা বলিল, "স্নেহের—স্নেহের আরও ভাল কথা।"

নিরঞ্জন বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ স্নেহের—স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ—আমি তোমার জন্যে একযোড়া ব্রেসলেট আনিয়ে রেখেছি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে—"

ডোরা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপত্তি? না—না কিছু না, কিছু না। কই সে ব্রেসলেটযোড়া দেখি না ভাই?"

নিরঞ্জন উঠিয়া আলমারী খুলিতে খুলিতে বলিল, "ডোরা, তুমি একটা প্রহেলিকা। তোমায় বোঝা ভার।"

ডোরা বলিল, "আমি তোমার ভার বোঝা বলেই ত আমায় তাড়াচ্ছ। তবু এখনও বউ আসেনি।"

নিরঞ্জন বলিল, "বউ কি আসবে?"

"আসবে না? তোমার কপালে থাকে ত একদিন আসবে বইকি!"

নিরঞ্জন একটি ক্যাস-বাক্স আলমারী হইতে বাহির করিয়া আনিতে আনিতে বলিল, "ডোরা, সত্যিই তুমি কি পাঁচ বছর বয়স থেকে মিশনারীদের হাতে? এ সব খাঁটি বাঙ্গালী বোলচাল শিখলে কোথা তুমি?"

ডোরা বলিল, "আমাদের হোম্-এ এমনও সব বাঙ্গালী ক্রিশ্চান নার্স আছে, যারা বাঙ্গালী ঘরের হাঁড়ির খবর সবই জানে। তাদের কাছে আমি শিখেছি।"

নিরঞ্জন ক্যাস-বাক্স খুলিয়া একটি ভেলভেটের কেস বাহির করিল এবং সেটি খুলিয়া ডোরার সামনে ধরিল। "বাঃ—কি সুন্দর!"—বলিয়া ডোরা তাহা নিরঞ্জনের নিকট হইতে চিলের মত ছোঁ মারিয়া লইল এবং ব্রেসলেট পরিতে উদ্যত হইল।

নিরঞ্জন বলিল, "এস ডোরা, আমি নিজে তোমার হাতে পরিয়ে দিই।"

ডোরা বলিল, "না না, তোমায় পরাতে হবে না, তুমি লাগিয়ে দাও আর কি! আমি নিজে পারি।"

ব্রেসলেট পরিয়া হাত দুখানি তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে ডোরার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। ছোট মেয়ে, মনের মত খেলানা পাইলে তাহার মুখে যে খুসীর হাসিটি ফুটে—ঠিক সেইরূপ।

পরমুহূর্ত্তে ডোরা গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া নিরঞ্জনকে প্রণাম করিল। নিরঞ্জন তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে নত হইবামাত্র, ডোরা হরিণীর মত ক্ষিপ্রচরণে উঠিয়া পলাইল এবং বারান্দায় গিয়া রামুদা! রামুদা! বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

রামু আসিলে বলিল, "রামুদা, দেখ, তোমার দাদাবাবু আমাকে কেমন গহনা দিয়ে-

ছেন!"—বলিয়া বালিকার ন্যায় আনন্দোচ্ছ্বাসে হাত দুটি তুলিয়া ঘুরাইতে লাগিল।

রামু হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেশ হয়েছে দিদি—বেশ হয়েছে। ও আমি আগে দেখেছি—মামাবাবু যে দিন সায়েব-বাড়ী থেকে কিনে আনেন, সেই দিনই আমি দেখেছি। বেশ মানিয়েছে দিদির হাতে।"

ডোরা বলিল, "মামাবাবু কিনে এনেছিলেন বুঝি? ওঃ—তাই বুঝি সে দিন সকালে চা খাওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'আমি বাজারে যাচ্ছি জিনিষ কিনতে!'—তোমরা ভিতরে ভিতরে বুঝি এই ষড়যন্ত্রটি পাকিয়েছিলে?"

নিরঞ্জন বলিল, "রামুরই ত দোষ। আমি মামাবাবুকে বললাম ডোরা আমার এত সেবা করলে, যাবার সময় ওকে ত কিছু উপহার দেওয়া উচিত। মামা বললেন, একটা চেক দেওয়া যাবে। রামু সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ও বললে, না না, ও সব চাঁক্‌চোঁকে দরকার নেই। যে হাতে দিদিমণি তোমার অত সেবাটা করলে, সে হাত দুখানি সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দাও। তাই ত ব্রেসলেট কেনা পরামর্শ হ'ল।"

ডোরা বলিল, "তাই বুঝি? আমাকে কিছু বলা হ'ল না! বললে, আমি মামা-বাবুর সঙ্গে যেতাম; নিজে দেখে পছন্দ ক'রে কিনতাম, আরও হয়ত কত সব ভাল ভাল ছিল, পেলাম না।"—বলিয়া মুখে বিষণ্ণতার ভান করিল।

খোট্টা ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "দিদিমণি, ট্যাক্সি আয়া হ্যায়।"

ডোরার নির্দ্দেশমত ভৃত্য তাহার জিনিষ-পত্র নামাইয়া লইয়া গেল। ডোরা আবার নিরঞ্জনকে প্রণাম করিল। নিরঞ্জন ডোরার সহিত নামিয়া তাহাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়া আসিতে চাহিল, কিন্তু ডোরা বলিল, "তুমি এস না। রামুদা'র সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।"

নিরঞ্জন মনে করিল, গাড়ীতে উঠিবার সময় ভৃত্যগণকে বখশিস্ দিবে বলিয়া ডোরা তাহাকে সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিল। ধরা গলায় বলিল, "আচ্ছা, এস তা হ'লে।"

পাচক ও ভৃত্যকে ডোরা আগেই বখশিস্ দিয়া রাখিয়াছিল। সদর দরজার নিকট পৌঁছিয়া সে হঠাৎ ঝুঁকিয়া রামুর পদস্পর্শ করিল।

রামু স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "ছি ছি দিদি ও কি, ও কি? আমায় পেন্নাম করতে আছে? আমি যে শুদ্দুর।"

ডোরা বলিল, "প্রণাম করতে আছে। তুমি আমায় ভালবাসলে কেন? আমরা খৃষ্টান যীশু ভজি—ও সব জাতিভেদ টাতিভেদ মানিনে।"—বলিয়া চোখের জল মুছিয়া ডোরা ট্যাক্সিতে উঠিল।

"মেয়েটা পাগলা!" আপন মনে এই কথা বলিতে বলিতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে রামু ভিতরে গেল।

ছয়

ডোরা চলিয়া গেলে নিরঞ্জনের মনে হইল,—বাড়ীটা যেন বিষণ্ণ শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে। বিদ্যুতের আলোক যেন আর তেমন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে না। একখানা ঈজি-চেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া নিরঞ্জন কত কি ভাবিতে লাগিল।

রাত্রি ৮টার সময় রামু তাহার পথ্য—দুধ-পাঁউরুটী আনিয়া হাজির করিল। নিরঞ্জন খাইতে বসিল, কিন্তু ভাল লাগিল না। এ কয় দিন ডোরাই তাহার পথ্য আনিয়া দিত এবং কাছে বসিয়া খাওয়াইত।

কোনও রকমে কতকটা খাইয়া, আচমন করিয়া, নিরঞ্জন আবার ঈজি-চেয়ারে আশ্রয় লইল। চেয়ারে পড়িয়া থাকাও ভাল লাগে না। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া, বাহিরের বারান্দায় পায়চারী করে। ক্লান্ত হইলে আবার আসিয়া চেয়ারে বসে।

এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি সাড়ে নয়টা বাজিয়া গেল। ঘুম পায় না।

রামু আহার সারিয়া এই ঘরের মেঝেতেই নীচে বিছানা পাতিতে পাতিতে বলিল, "দাদাবাবু এখনও শুলে না? দশটা যে বাজতে চলল। শোও, নইলে অসুখ করবে যে!"

নিরঞ্জন বলিল, "ঘুম আসছে না রে!"

"কেন দাদাবাবু? রোজ ত এ সময় ঘুমোও তুমি।"

"আজ মনটা বড় খারাপ। আজ অনেক কথা ভাবছি।"

রামু নিজ বিছানার উপর আরাম করিয়া বসিয়া বলিল, "কি ভাবছ, দাদাবাবু?"

নিরঞ্জন বলিল, "দ্যাখ্—একা একা আর ভাল লাগে না। আমারি বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে।"

রামু বলিল, "বেশ ত! সে ত ভাল কথা দাদাবাবু!—তুমি বিলেত থেকে ফিরে না এলে বিয়ে করবে না বলেছিলে.—তাই ত এত দিন, মেয়ে দেবার জন্যে যে এসেছে, তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামাবাবুকে আমি চিঠি লিখে দিই—স্বঘর স্বজাতের একটি সুন্দরী পাত্রী স্থির ক'রে রাখুন। সামনে আশ্বিন কার্ত্তিক মাস, অগ্রহায়ণ মাস পড়তেই তোমার বউ এনে দিই। আমিও ত বুড়ো হয়েছি, কবে আছি কবে নেই,—তোমায় যেমন কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছিলাম, তোমার দু একটি ছেলেমেয়েকেও মানুষ ক'রে দিয়ে যাই।"

নিরঞ্জন বলিল, "স্বঘরে স্বজাতে যদি নাই হয়! আমি যদি অন্য জাতের কোনও মেয়েকে—যদি সে খৃষ্টানও হয়,—তাকে বিয়ে করি, তাতেই বা কি?"

রামু বলিল, "কায়েতের ছেলে হয়ে তুমি খিষ্টেন বিয়ে করবে কেন, দাদাবাবু? তাতে পিতৃপুরুষের জল পিণ্ডি লোপ হয়ে যাবে যে! মামাবাবুই বা মত দেবেন কেন?"

নিরঞ্জন বলিল, "মামাবাবু ত আর তোমাদের মত গোঁড়া হিন্দু নন!"

রামু বলিল, "হ্যাঁ তা আমি জানি। মামাবাবু ত ছোঁড়া বয়সে যখন এখানে কলেজে পড়তেন, তখন ত বেহ্ম সভায় গিয়ে খিষ্টেন হবার মৎলবই করেছিলেন। ওনার বাপ মা এসে কত কষ্টে ওঁকে ফিরিয়ে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিয়ে দ্যান।"

"তুই এত খবর জানলি কি ক'রে রে?"

"আমি জানিনে? আমার যখন গোঁফ উঠেনি, তখন থেকেই ত তোমাদের সংসারে আমি রয়েছি। কর্ত্তামশায়ের বিয়ের পর, তিনি যখনই শ্বশুরবাড়ী যেতেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ওনাদের ঝি-চাকরের কাছে তখন সব কথাই আমি শুনেছিলাম।"

"তা হলেই বুঝে দ্যাখ্, কোনও খৃষ্টান মেয়েকে যদি আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় —মামাবাবু বোধ হয় বাধা দেবেন না।"

রামু উচ্চ হইয়া উঠিয়া বলিল. "কি সর্ব্বনাশ!—দাদাবাবু কি ভাবছ বল দেখি? তুমি কি ডোরা দিদির কথা মনে ক'রে আমায় এই সব কথা বলছ?"

নিরঞ্জন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যদি তাই হয়। তবে বলি শোন্। আমি মনে স্থিরই করেছি, যদি বিয়েই করি, তবে ডোরাকে ছাড়া আর কাউকে করবো না!"

রামু ভীতস্বরে বলিয়া উঠিল, "রাম রাম, দুর্গা দুর্গা! ছি ছি দাদাবাবু, ও কথা তুমি মুখেও এন না। কি সর্ব্বনাশ!"

রামুর এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে নিরঞ্জন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন রামুদা ও কথা বলছিস কেন?"

রামু বলিল, "তবে শুনবে দাদাবাবু? মামাবাবু তোমায় জানাতে বারণই ক'রে গিয়েছিল.—কিন্তু এখন আর না ব'লে উপায় কি? রাম রাম। দুর্গা দুর্গা! হে মা কালী, রক্ষা কর!"

নিরঞ্জন চেয়ারে উচ্চ হইয়া উঠিয়া বলিল, "কি রে রামু, ব্যাপার কি? হঠাৎ পাগল হয়ে গেলি নাকি?"

রামু তখন যেন এলাইয়া পড়িল। বলিল, "পাগল হইনি দাদা—তবে শোন। ঐ ডোরা—তোমার—আপন বোন!"

নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "সে কি রে?—বোন কি রে? আমার ত কোনও দিন বোন হয়েছিল ব'লে শুনিনি!"

রামু বলিল, "তোমার—মা'র পেটের বোন নয়। তবু—ও তোমার—আপন বোন।"

"আমার বাবার মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

নিরঞ্জনও এতক্ষণে ঈজি-চেয়ারে এলাইয়া পড়িল। বলিল, "বাবার যে আর এক বিয়ে ছিল, তা ত আমি কোনও দিন শুনিনি রামুদা।"

রামু বলিল, "কর্ত্তার বিয়ে আর ছিল না বটে। কিই বা বলি ছাই!—তুমি দাদাবাবু তখন বছর দুয়েকের হবে। কর্ত্তা তখন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, এক মাস দু'মাস ক'রে থাকতেন। সেই সময় ঐ ঘটনা হয়। কর্ত্তা তাঁকে ভবানীপুরে বাড়ী কিনে দিয়েছিলেন, মিশনারী মেম রেখে তাঁকে লেখাপড়া শেখাতেন। ঐ ডোরা যখন জন্মালো, তখন ত আমরা ভবানীপুরের বাড়ীতেই। তোমার বয়স তখন তিন কি বড় জোর চার।"

নিরঞ্জন প্রথমটা এ কথাগুলির অর্থ ভাল বুঝিতে পারিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে—আসল অর্থটা তাহার মাথায় আসিল। সে কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার মা এ কথা জানতেন?"

"না।"

"মামাবাবু?"

"প্রথম প্রথম তিনিও জানতেন না, পরে জেনেছিলেন। কর্ত্তার স্বর্গলাভের পর, মামাবাবু মাঝে মাঝে এসে ডোরার মা'র সঙ্গে দেখা করতেন, তখন ওর নাম ডোরা ছিল না, তখন ওর নাম ছিল পুঁটি—মিশনারীরা ওর ডোরা নাম রেখেছিল। পুঁটির মা, মামাবাবুকে দাদা দাদা বলতো। পুঁটিকে তিন বছরের রেখে কর্ত্তা স্বর্গে গেলেন, পাঁচ বছরের রেখে পুঁটির মাও গেলেন। মরবার আগেই বাড়ীখানি, টাকা-কড়ি, গহনাপত্র যা তাঁর ছিল, মিশনারীদের ফন্ডে দান ক'রে যান, আর ব'লে যান, আমার মৃত্যুর পর আমার মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে তোমরা মানুষ কোরো—ওকে লেখাপড়া শিখিও, ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিও।"

"এ সমস্ত কথা তোকে কে বললে?"

"মামাবাবু সে সময় খোঁজ-খবর নিতে কলকাতায় এসেছিলেন, তিনিই গিয়ে আমাকে বলেন।"

নিরঞ্জন আবার দুই তিন মিনিটকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রামুদা, ডোরা কি এ সব কথা কিছু জানে? তার আমার কি সম্বন্ধ, তা কি সে জানতে পেরেছে?"

"পেরেছে বইকি। আপন ভাই জেনেই ত প্রাণ দিয়ে তোমার সেবা করেছে। নইলে ভাড়াটে নার্স কি আর অত করে দাদাবাবু?"

"ডোরা কি ক'রে জানলে?"

"মামাবাবু আসবার ৩।৪ দিন পরে, একদিন তিনি ডোরাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বাপের নাম জিজ্ঞাসা করতেই—সে কর্ত্তার নাম ক'রে দিলে। তার পর কথায় কথায় সবই বেরিয়ে পড়লো। ডোরার বাসায় তার মা-বাপের ফটোগেরাপ ছিল,

—এনে দেখালে। কর্ত্তা চেয়ারে ব'সে রয়েছেন, ডোরার মা চেয়ারের পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। সে ফটোগেরাপও ভবানীপুরের বাড়ীতে আমার সামনেই তোলা হয়েছিল!— উঃ, বাপ রে! সে সব কথা যাক্—তুমি এখন শোও দাদাবাবু। আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্চে না। আর কিছু যদি শুনতে চাও, কাল আবার শুনো।"—বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইল।

নিরঞ্জন সেইভাবে অনেকক্ষণ চেয়ারে বসিয়া রহিল। তাহার পর আলো নিবাইয়া শয়ন করিল।

পরদিন নিরঞ্জন বামুর সহিত পরামর্শ করিয়া, মামাবাবুকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিল। প্রস্তাব করিল ডোরাকে নার্সে'স হোম হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিবে এবং প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধি করাইয়া, বিলাত-ফেরত সমাজে তাহার বিবাহ দিবে। অবশ্য ডোরার জন্মরহস্য—অন্ততঃ পাত্রের নিকট প্রকাশ করিয়া, সে সম্মত হইলে, তার পর বিবাহ। কিছু বেশী টাকাই না হয় লাগিবে।

মামাবাবুর উত্তর যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি সানন্দে মত দিয়াছেন। সেই দিনই বিকালে নিরঞ্জন নার্সে'স হোম-এ গিয়া বোনটিকে বাড়ী লইয়া আসিল।

শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তান্তে ডোরার নূতন নাম হইল—কমলা। পরবৎসর যোগ্য পাত্রের সহিত কমলার এবং যোগ্যা পাত্রীর সহিত নিরঞ্জনের বিবাহ হইয়া গেল—কিন্তু সে সব ত অন্য গল্প।

বেকসুর খালাস

চব্বিশ বৎসর বয়সে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। তখন আমি কয় ছেলের বাপ হইয়াছি, এই কথাই তোমরা জিজ্ঞাসা করিতেছ ত? না, আমার সন্তানাদি তখনও কিছু হয় নাই। লোকে বলিত, হইবার আশাও খুব কম, কারণ, আমার স্ত্রীর বয়স তখন কুড়ি বৎসর।

আমার নাম নগেন্দ্রনাথ মন্ডল, জাতিতে আমরা সদ্‌গোপ। নিবাস, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালীনগর গ্রামে। যে দেবীর নাম হইতে গ্রামের নামের উৎপত্তি, তিনি খুব জাগ্রত দেবতা—দূরদূরান্তর হইতে লোকে তাঁহার মন্দিরে মানস-পূজা দিতে আসে।

গ্রামে আমাদের বহু ঘর সদ্‌গোপের বাস। সহর অঞ্চলের সদ্‌গোপেরা অনেকে সে দিনেও ইংরাজী লেখা-পড়া শিখিয়া "বাবু" হইয়াছে কিন্তু আমাদের গ্রামটা নাকি "অজ" পাড়াগাঁ, তাই আমার স্বজাতীয়েরা তখনও "বাবু" হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনের কোণেও স্থান দিত না। কিন্তু পিতা আমার কলিকাতা ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, আমি চাষবাস করিব না, ইংরাজী পড়িয়া "বাবু" হইব এবং চাকরি করিব।

যথাকালে আমি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পাঠশালার পাঠ যখন সাঙ্গ করিলাম, তখন আমার বয়স চৌদ্দ উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন আমি উপযুক্ত হইয়াছি বিবেচনায়, পিতা আমার বিবাহ দিলেন এবং লোকের টিটকারী অগ্রাহ্য করিয়া আমায় দেড় ক্রোশ দূরে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দশ বৎসরের একটি বধূ এবং প্যারীচরণ সরকারের "ফাষ্ট' বুক" প্রায় একসঙ্গেই ঘরে আসিল। আমার স্ত্রীর নাম মন্দাকিনী; দেখিতে শুনিতে ভালই, নেহাৎ "পাঁচি-পাঁচি" শ্রেণীর নহে। এমন সুশ্রী

ও বুদ্ধিমতী মেয়ে আমাদের জাতির মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ, এ কথা আমি বলিলে হয় ত জাঁক করা হইবে; কিন্তু না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে ইহা নিশ্চয়।

খাজনার জমি আমাদের যাহা ছিল, তাহার অধিকাংশই ভাগে দেওয়া ছিল। অল্প কয়েক বিঘা, বাবা "কৃষাণ" রাখিয়া চাষ করাইতেন। বলিতেন, খোকা পাস করিয়া যখন চাকরি-বাকরি করিবে, তখন সে জমিগুলোও তিনি ভাগে বিলি করিয়া দিবেন।

কিন্তু তাঁর এত সাধের খোকার পাস করা তিনি ত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না! দুই বছর পূর্ব্বে অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে তিনি ও আমার জননী স্বর্গারোহণ করিয়া-ছিলেন।

বাইশ বৎসর বয়সেই আমার পাস করিবার কথা, কিন্তু উপর্য্যুপরি দুইবার ফেল হওয়ায় বয়সটা একটু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। পাসের সংবাদ পাইয়া আমি পাঁঠা বলি দিয়া কালীমন্দিরে পূজা দিলাম; বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া, লুচিমাংস ভোজন করাইলাম। সে দিন বড় আনন্দ হইয়াছিল। আবার বাবার কথা মনে পড়িয়া চোখে জলও আসিয়াছিল।

অতঃপর চাকরির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। নিজ চাষের জমিগুলি বাবার মৃত্যুর পরেই আমি ভাগে বিলি করিয়া দিয়াছিলাম; চাষবাস দেখিতে হইলে আর পড়া-শুনা হয় না। এখন চাকরি কোথায় পাই? এ পল্লীগ্রামে চাকরি আমায় কে দিবে? বউ বলিল, "আমায় বাপের বাড়ী রেখে, দুর্গা শ্রীহরি ব'লে তুমি বেরিয়ে পড়, কলকাতায় যাও। এত বিদ্যে শিখেছ, সেখানে গেলে তোমার চাকরির ভাবনা কি? চাকরি হ'লে একটা ছোট দেখে বাসা ভাড়া ক'রে আমায় এসে নিয়ে যেও।"

এ যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিলাম। সদ্গোপের ঘরের মেয়ে, তায় কুড়ি বৎসর মাত্র বয়স, মন্দার বুদ্ধি দেখিয়া সত্যই সময়ে সময়ে বিস্মিত হইয়া যাই। কিন্তু বড় সর্ব্বনেশে কথা যে! সাত আট বৎসরকাল একাদিক্রমে দুইজনে একসঙ্গে রহিয়াছি। গ্রামেই শ্বশুরবাড়ী, বউ বাপের বাড়ী গেলেও, দুইজনের বিচ্ছেদ ঘটে নাই। তাহাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে হইবে ভাবিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। তার হাতের রান্নাটি আমার যেমন মিষ্টি লাগে, কই, আর কাহারও রান্না ত তেমন লাগে না! সে কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে আমার যে খাইয়ারই সুখ হয় না। তার হাতের সাজা পাণ না হইলে পাণ খাইয়া আমার তৃপ্তি হয় না;—কত লোকের বাড়ী বেড়াইতে যাই, তারা পাণ দেয়, খাই ত! সে কাছে থাকিবে না, শয়ন করিলে আমার পায়ে হাত বুলাইয়া দিবে না, আমার ঘুম আসিবে কি করিয়া? এই সাত আট বৎসর কাল, প্রতিদিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া তার মুখখানি দেখিয়াছি—দিন ত এতকাল এক রকম সুখেই কাটিয়াছে। কলি-কাতায় প্রভাতে উঠিয়া কার মুখ দেখিব—তার পর ট্রাম হইতেই পড়িয়া যাইব, না গুণ্ডার ছুরীতেই প্রাণ হারাইব, কে বলিতে পারে?

বউয়ের প্রস্তাব শুনিয়া এই সকল কথাই আমি মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম, সে আমাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অত কি ভাবছ গা? কলকাতায় যেতে বলেছি ব'লে রাগ হ'ল বুঝি?"

বলিলাম, "না, রাগ হবে কেন?"

"তবে? মুখখানি অমন ক'রে রয়েছ যে?'

খোলাখুলি বলিয়াই ফেলিলাম। জানি, ইহা শুনিয়া তাহার দেমাক বাড়িবে—তা বাড়ে বাড়ুকগে! বলিলাম, "তোমায় ছেড়ে একলা আমি কলকাতায় কি ক'রে থাকবো, তাই ভাবছি!"

একথা শুনিয়া তাহার মুখখানি প্রসন্ন হইল। মিষ্টস্বরে বলিল, "তা কি করবে বল? পুরুষ-মানুষ হয়ে যখন জন্মেছ, তখন এ সব কষ্ট না সইলে চলবে কেন?

পুরুষমানুষ বিদেশে যখন চাকরি করতে যায়, সবাই কি আর বউকে গলায় বেঁধে নিয়ে যায়? ঐ ত মিত্তিরদের যদুবাবু রয়েছে, চাটুয্যেদের কেদারবাবু, তার পর তোমার গিয়ে ঐ হারাণ ঘোষ—কেউ বিদেশে চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ বউকে ত নিয়ে গিয়ে সঙ্গে রাখে না। ছুটিছাটা হ'লে বাড়ী আসে!"

আমি বললাম, "ওগো, ওটা কি জান? ওটা হচ্ছে সহ্যগুণের কথা, ওদের সহ্যগুণ বেশী, তাই ওরা পারে। এই দেখ না কেন, কেউ বা দশ ক্রোশ পথ স্বচ্ছন্দে হেঁটে যেতে পারে, কারু বা দুক্রোশ হাঁটতেই জিভ বেরিয়ে পড়ে। সবাইকার সহ্যগুণ কি আর সমান? তোমার সহ্যগুণ বোধ হয় আমার চেয়ে ঢের বেশী।"

বউ বলিল, "বেশীই ত! সহ্য করতে শিখতে হয়।"

এ কথা শুনিয়া আমার মনে একটু অভিমান হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "শিখতে হয় বললে, এটা কিন্তু ভুল। এটা জিওমেট্রি না অ্যালজ্যাবরা যে শিখতে হবে? অভ্যাস করতে হয় বলা তোমার উচিত ছিল।"

বউ বলিল, "ঐ হ'ল, যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি। আমি ত আর তোমার মত পাস করিনি।"—বলিতে বলিতে তাহার মুখে স্বামিগর্ব্ব স্পষ্টতঃ ফুটিয়া উঠিল। সত্যই ত, গ্রামে ক'টা মেয়ের পাস-করা স্বামী আছে? বিশেষ সদ্‌গোপের ঘরে! আমার মনের ব্যথাটুকু দূর হইয়া গেল!

গ্রামের হারাণ ঘোষ কলিকাতায় চাউলের কারবার করে। চাউল কিনিবার জন্য সে গ্রামে আসিয়াছিল; তাহাকে ধরিলাম। সে বলিল, "বেশ চল আমার সঙ্গে কলকাতায়। আমার ত সেখানে একটা বাসা আছে যতদিন না চাকরি-বাকরি হয়, আমার বাসায় থাকবে, খাবে-দাবে, চাকরির চেষ্টা করবে।"

হারাণ বয়সে আমার চেয়ে ৫।৬ বৎসরের বড়। তাহাকে আমি হারুদাদা বলিয়া থাকি। সে লেখাপড়া না জানিলেও দশ বৎসর কলিকাতাবাসের ফলে বেশ চালাক-চতুর হইয়াছে। মনটাও তার সাদা।

যাত্রার পূর্ব্বদিন বাড়ী-ঘরে তালা বন্ধ করিয়া, বউকে তাহার বাপের বাড়ীতে লইয়া গেলাম। স্থির হইল, শ্বশুর মহাশয় সর্ব্বদা আসিয়া আমার বাড়ী-ঘর দেখা-শুনা করিবেন।

সে রাত্রে বউ ত কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইল। আমিও চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলাম, "বাঃ, এই বুঝি তোমার সহ্যগুণ?"

সে বলিল, "সহ্যগুণের মুখে আগুন, তুমি কবে আসবে তাই বল?"

"চাকরি-বাকরি একটা জুটুক,—তবে ত আসবো।"

"যদি জুটতে দেরীই হয়, এক মাস বাদে তুমি এসে একবার আমায় দেখা দিয়ে যেও। বুঝলে?"

"বেশ, তাই আসবো।"

পরদিন দ্বিপ্রহরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

শ্বশুর মহাশয় আমাকে হারাণ ঘোষের হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহাকে অনেক মিনতি করিলেন, যাহাতে আমাকে কোনও অমঙ্গল স্পর্শ করিতে না পারে।

দুই

হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া হারুদা আমাকে লইয়া ট্রামযোগে ভবানীপুরে উপস্থিত হইল। এক স্থানে ট্রাম হইতে আমরা নামিলাম। হারুদা বলিল, "এইটি হচ্ছে জগুবাবুর বাজার।" বড় রাস্তা দিয়া খানিক গিয়া হারুদা একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু

দূরে একটা ছোট পুরাতন একতালা বাটীর সামনে দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই বুঝি তোমার বাসা? কিনেছ, না ভাড়া দাও?"

হারুদা বলিল, "মাসে বাইশ টাকা ক'রে ভাড়া দিই।"

অল্পক্ষণ পরে ভিতর হইতে শব্দ আসিল, "কে?"—স্ত্রীলোকের কণ্ঠ।

হারুদা বলিল, "আমি। খোল।"

দ্বার খুলিল। দেখিলাম, ২৩।২৪ বৎসর বয়স্কা একজন সধবা স্ত্রীলোক। আমাকে দেখিয়াই সে মাথায় ঘোমটা দিল।

হারুদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিও উঠানে প্রবেশ করিলাম। হারুদা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল ছিলে ত ক্ষান্ত?"

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ!

উঠানের কোণে চৌবাচ্চায় কল্ কল্ করিয়া কলের জল পড়িতেছিল। "ক্ষান্ত, তামাক সাজ একটু"—বলিয়া হারুদা আমাকে লইয়া একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল, 'জামা খুলে ফেল। সঙ্গে গামছা আছে ত? হাত-পা ধুয়ে ফেল। তার পর একটু চা খাওয়া যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হারুদা, এ বাড়ীতে আর কেউ থাকে নাকি?"

"না, আবার কে থাকবে?"

"ও স্ত্রীলোকটি কে?"

'বামনী। রাঁধে-বাড়ে—কাজ-কর্ম্ম করে।"—বলিয়া হারুদা ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

বাড়ীতে আর কেউ নাই, কেবল হারুদা আর ঐ যুবতী স্ত্রীলোক—তার উপর সেই হাসি দেখিয়া, ব্যাপারটা আমি তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করিলাম এবং তাহার "সদ্গুণের" রহস্যটাও বুঝিতে বাকী রহিল না।

হাত-পা ধুইতে ধুইতে আমি মনে মনে স্থির করিলাম, ও স্ত্রীলোকের হাতে আমি খাইব না। আমি নিজে রাঁধিয়া খাইব। ওর ছোঁয়া জলও পান করিব না।

মুখ-হাত ধুইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, হারুদা হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছে, আর "বাম্‌নী" হারুদার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা বলিতেছে। স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তক্তপোষের উপর হারুদার পাশে বসিয়া আমি বলিলাম, "হারুদা, আমার খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?"

"কেন, আমরাও যা খাব, তুমিও তাই খাবে।"

বলিলাম "কিন্তু তোমার ও বামনীর হাতে আমি খেতে পারবো না দাদা! হিন্দুয়ানী ব'লে একটা জিনিষ আছে ত?"

হারুদা গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি কি মনে করেচ, ও বামুনের মেয়ে নয়? সত্যি ও বামুনের মেয়ে। মেদিনীপুর জেলায় ওদের বাড়ী। ওর এক ভাই রয়েছে কলকাতায়, সে বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ী রাঁধে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু দাদা, তবু—"

হারুদা বলিল, "তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। আরে ভাই, হিন্দুয়ানী কি আমারই নেই? কিন্তু শাস্ত্রে যে বলেছে, প্রবাসে দোষং নাস্তি। কত সুবিধে, বুঝছ না? পরিবার নিয়ে এসে এ কলকাতা সহরে বাস করতে হ'লে খরচ কত প'ড়ে যেত? এ রাঁধুনীকে রাঁধুনী, ঝিকে ঝি, ভাত-কাপড় দিয়েই খালাস।"

আমি বলিলাম, "তা হোক দাদা, তুমি এক কাজ কর। আমায় তুমি একটু জায়গা দাও, আমি নিজেই রেঁধে বেড়ে খাব এখন।"

হারুদা বলিল, "জায়গা তোমায় দিচ্ছি। কিন্তু হাত পুড়িয়ে নিজে রেঁধে খাওয়া কি তোমার পোষাবে? তার চেয়ে বরং এক কাজ করতে পার। গলিতে ঢোকবার সময় ঐ মোড়েই দেখেছ ত সাইনবোর্ড রয়েছে "পবিত্র হিন্দু হোটেল"—ঐখানেই বরং দু'বেলা গিয়ে খেয়ে আসতে পার; এ-বেলা তিন আনা, ও-বেলা তিন আনা—এই ছ' আনা ক'রে রোজ লাগবে।"

আমি বলিলাম, "তবে দাদা, সেই ব্যবস্থাই আমায় ক'রে দিও।"

ক্ষান্তমণি দুই পেয়ালা চা লইয়া আসিল। তাহার ঘোমটার বহর এখন কমিয়াছে, মুখ কতকটা দেখা যাইতেছে। হারুদা এক পেয়ালা লইয়া আমার দিকে ধরিয়া বলিল, "চা খাও হে।"

আমি বলিলাম, "না হারুদা, চা খাব না, সহ্য হবে না।"

হারুদা বলিল, "কেন, আমাদের সহ্য হয়, তোমার হবে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার মত সহ্যগুণ আমি কোথায় পাব হারুদা?"

চা-পান করিয়া হারুদা বলিল "তুমি ব'স ভাই, আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।"—বলিয়া গামছা কাঁধে করিয়া কলতলার দিকে গেল। আমি সেই তক্তপোষেই বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম—যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি, কেমন করিয়া তাহা সিদ্ধ করিব?

মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া হারুদা বলিল "চল, একবার দোকানে যাওয়া যাক্। পথে, তোমার হোটেলের বন্দোবস্তটাও অমনি ক'রে যাব।"—বলিয়া তিনি হাঁকিলেন, "পাণ সাজা হ'ল গা তোমার?"

ক্ষান্তমণি কাঁসার ডিবার একটি খোলে চারিটি পাণের খিলি আনিয়া হারুদার হাতে দিল। হারুদা নিজে দুইটি লইয়া আমায় দুটি দিল। লইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ফিরাইয়া দিতেও চক্ষুলজ্জা হইল। ফি হাত কাঁহাতক আর "এটা খাব না", "ওটা খাব না" বলা যায়! পাণ লইয়া মুখে দিয়া, হারুদার সঙ্গেই বাহির হইলাম।

গলির শেষে মোড়ে পৌঁছিয়া হারুদা আমাকে লইয়া সেই "পবিত্র হিন্দু হোটেলে" প্রবেশ করিয়া ডাকিতে লাগিল "চক্রবর্ত্তী মশাই—ও চক্রবর্ত্তী মশাই!" হোটেলের মালিক বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হারুদা তাঁহার নিকট সবিস্তারে আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইনি দু'বেলা এখানে খাবেন। কিন্তু চার্জ্জের সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করতে হবে চক্রবর্ত্তী মশাই। চাকরি বাকরির চেষ্টায় আসা, অবস্থা ত বুঝতেই পারছেন!"

চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিলেন, "তা যখন উনি আপনার লোক, তখন আর কথা কি। তিন আনার জায়গায় উনি না হয় দু' আনা করেই দেবেন, দু' বেলায় চার আনা। আপনি তা হ'লে ক'টার সময় আসবেন নগেনবাবু? এই ৯টা আন্দাজ আমাদের রান্নাবান্না শেষ হয়ে যায়।"

নয়টার পর আসিব বলিয়া, হারুদার সঙ্গে আমি তাঁহার দোকানে চলিলাম। বলিলাম, "হারুদা, তোমার খুব খাতির ত! এক কথায় ছ' আনার জায়গায় চার আনা হয়ে গেল!"

হারুদা হাসিয়া বলিলেন, "আমার দোকান থেকে চক্রবর্ত্তী উঠনোয় চাল নেয় যে!"

দোকানখানি তেমন বড় নয়—তবে বড় রাস্তার উপর, তাই খরিদ্দার অনেক আছে। ঘণ্টা দুই হারুদা তাঁহার দোকানের হিসাবপত্র দেখিলেন। তার পর টাকা-কড়ি থলিয়াতে বাঁধিয়া আমায় বলিলেন "চল হে নগেন।"

গলির মোড়ে আসিয়া বলিলেন, "তুমি ঢোক,—একেবারে খেয়েই এস। বাড়ী চিনতে পারবে ত? সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি, ১৯ নম্বর বাড়ী।"

"হ্যাঁ, চিনতে পারবো বইকি!" বলিয়া আমি সেই পবিত্র হিন্দু হোটেলে ঢুকিলাম।

খাদ্য যাহা পাইলাম, সারাদিন অভুক্ত ছিলাম বলিয়াই সে সমস্ত উদরসাৎ করিয়া ফেলিলাম, নহিলে সাধ্য হইত না।

তিন

হারুদাদার আশ্রয়ে এই ভাবে বাস করিতে লাগিলাম। কি ভাবে, কাহার কাছে গিয়া চাকরির চেষ্টা করিতে হইবে, হারুদাদাকে সে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি তাহাতে উত্তর করিলেন, বড় বড় আফিসে গিয়া বড়বাবুদের সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ করা উচিত। কোথায় আফিস, তাও চিনি না, বড়বাবুরা কোথায় থাকেন, তা-ও জানি না। হারুদা একদিন অবসর মত আমায় আফিস অঞ্চলে লইয়া গিয়া কয়েকটি আফিস চিনাইয়া দিলেন।

প্রতিদিন আহারের পর আমি চাকরির চেষ্টায় আফিস অঞ্চলে যাই, ঘুরি ফিরি, বিকালে পদব্রজেই ভবানীপুরের বাসায় ফিরিয়া আসি। যেখানেই যাই, সেইখানেই তাড়া খাই। দেশে থাকিতে মনে করিতাম, পাস করিয়া আমি মস্ত একটা 'কেউকেটা' হইয়াছি। এখন দেখিলাম, আমি ত একটা মাত্র পাস, কত বি-এ, এম-এ চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ তাহাদের ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না।

কিছু দিন এই ভাবে হাঁটাহাঁটি করিয়া আমার ভারি বিরক্তি ধরিয়া গেল। বাবা ছিলেন অত্যন্ত সেকেলে, ভালমানুষ লোক। আজকাল চাকরির বাজার যে কিরূপ, তাহা তিনি জানিতেন না বলিয়াই আমার সম্বন্ধে মনে তিনি ওরূপ অভিপ্রায় পোষণ করিতেন। ভাবিলাম, আসিয়াছি যখন, আরও দিনকতক না হয় দেখি। তার পর দেশে ফিরিয়া যাইব।

হঠাৎ এক অচিন্তনীয় বিপদের মধ্যে পতিত হইলাম। দিনান্তে বাসায় ফিরিতে-ছিলাম। সে দিন একটু বিলম্বই হইয়া গিয়াছিল। ময়দানের পথ ধরিয়া আসিতে-ছিলাম, একটা রাস্তা পার হইবার সময় অতর্কিতে একটা মোটরগাড়ী আমার উপর আসিয়া পড়িল। ভীষণ একটা ধাক্কা খাইলাম, এইটুকুমাত্র আমার স্মরণ আছে—তার পর সব অন্ধকার!

যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম, আমি এক পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছি। মাথার উপর বিদ্যুৎ পাখা মৃদুভাবে ঘুরিতেছে। স্পষ্ট দিবালোক, কিন্তু ঘরে মনুষ্য নাই।

পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। পিঠে-কোমরে অত্যন্ত ব্যথা। কি করিয়া যে আমি এখানে আসিলাম, তাহা কিছু স্মরণ করিতে পারিলাম না; তবে এটুকু মনে পড়িল যে, আমি নগেন্দ্র মণ্ডল, ম্যাট্রিক পাস করিয়াছি, চাকরির চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। আমি যে মোটর চাপা পড়িয়াছিলাম, এ কথা আমার তখন কিছুমাত্র স্মরণ হইল না।

কক্ষটির চারিদিকে আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। আসবাবপত্রগুলি সমস্তই মূল্যবান্। ইহা কোনও ধনী ব্যক্তির গৃহ, তাহা বেশ বুঝিলাম। কিন্তু আমি এখানে আসিয়া এ বিছানায় শুইলাম কি করিয়া?

শুইয়া শুইয়া এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, একজন সুবেশা রমণী, বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর, চটিজুতা পায়ে দিয়া পালঙ্কের নিকট আসিতেছেন। আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

নিকটে আসিয়া মহিলাটি বলিলেন, "এই যে, জেগেছেন আপনি? কেমন আছেন বলুন দেখি?"

কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মুখ দিয়া কোনও শব্দ বাহির করিতে পারিলাম না। কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া রমণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

রমণী আমার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "না, জ্বর আর নেই, জ্বরটা তা'হলে ছেড়েছে। এখন কি কষ্ট আছে আপনার বলুন দেখি।"

আমি পূর্ব্ববৎ তাঁহার পানে নীরবে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন? উত্তর দিন!"

আমি প্রাণপণে কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না।

এই সময় আর একজনের পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। সেই রমণীর পার্শ্বে আসিয়া যে দাঁড়াইল, সে বালিকা, অত্যন্ত সুন্দরী, বয়স বোধ হয় ১৬।১৭ মাত্র। আমার চোখের পানে চাহিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "এই যে, ইনি জেগেছেন দেখছি!"

মহিলাটি বলিলেন, "জেগেছে ত, কিন্তু কথা কইছে না যে! তুই কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দেখি, লায়লী!"

মেয়েটি বলিল, "আমি কি জিজ্ঞাসা করব মা? তুমিই জিজ্ঞাসা কর।" বলিয়া একদৃষ্টে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আমি একবার তার মুখের দিকে, একবার তার মা'র মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম। মা-ও সুন্দরী বটে, কিন্তু মেয়ে তার বহুগুণ অধিক সুন্দরী। মহিলাটি এইবার প্রায় চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি? বাড়ী কোথায়?"

আমি পূর্ব্ববৎ নীরব। তিনি কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখলি? আমার বোধ হয় ছেলেটি বোবা কালা।"

বোবারা সাধারণতঃ কালাও হইয়া থাকে, এই কারণেই বোধ হয়, অমাকে বাক্‌শক্তিহীন দেখিয়া ইনি আমায় কালাও স্থির করিয়াছেন।

মেয়েটি বলিল, "তাই হবে মা। নইলে আর মোটর চাপা পড়ে! যাক্, এত দিনে আমার মনের আপশোষ গেল। সেই দিন থেকে মা, খালি আমার মনে হ'ত,—ছি ছি, কি করলাম? শেষে মানুষ চাপা দিলাম! তা হ'লে মা, আমার ত কোনও দোষ ছিল না, দেখতে পাচ্ছ ত!"

"মোটর চাপা দিলাম" শুনিবামাত্র আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ঠিকই ত বটে, আপিস অঞ্চল হইতে বাসায় ফিরিবার সময় মোটরেই ধাক্কা খাইয়াছিলাম। এই মেয়েটিই বোধ হয় সে মোটরে ছিল, অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আমায় বাড়ী আনিয়াছে। সে কবে, কত দিন হইল কে জানে!

সকল কথা ভাল করিয়া স্মরণ করিবার জন্য আমি চক্ষু মুদিলাম। তার পর কখন আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না।

আবার যখন চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম, পালঙ্কের নিকট সেই মহিলাটি দাঁড়াইয়া, এবং চেয়ারে এক ভদ্রলোক বসিয়া আমার নাড়ী টিপিয়া আছেন। আমাকে চক্ষু খুলিতে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে?" আমার উত্তর শুনিতে না পাইয়া বলিলেন, "এবার দুধটুকু খাইয়ে দিন পিয়ারী বিবি।"

লায়লী, পিয়ারী বিবি!—এরা মুসলমান নাকি? কিন্তু সাজপোষাক ত হিন্দুরই মত। জাতটা বোধ হয় গোল্লায় গেল! কিন্তু উপায় কি?

পিয়ারী বিবি একটা নলওয়ালা চীনা মাটির পাত্র আনিয়া আমার মুখে একটু একটু করিয়া দুধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। দুধ পান করিয়া আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পুনরায় যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে। একজন স্থূলকায় ভদ্রলোক, ইংরাজি পোষাক পরা, ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া পিয়ারী বিবির

সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। পিয়ারী বিবি সেই পুরুষকে "নবাব সাহেব" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

"নবাব" ইতিপূর্ব্বে কখনও চক্ষে দেখি নাই, লোকটির মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিলাম, নবাব যদি ত ইংরাজী পোষাক কেন? তাঁহারা নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, কোনও কথা আমি শুনিতে পাইলাম না।

নবাব সাহেব চলিয়া গেলে আমাকে আবার দুগ্ধ পান করানো হইল।

পরদিন প্রাতে আমার মনে হইল, আমি বোধ হয় উঠিয়া বসিতে পারি। চেষ্টা করিলাম, কৃতকার্য্যও হইলাম। লায়লী আসিয়া বলিল, "এই যে আপনি উঠে বসেছেন! মাকে ডেকে আনি।"—বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

চার

তিন চারি দিন পরে আমি খাট হইতে নামিতে পারিলাম, ঘরের মধ্যে একটু চলিয়া বেড়াইলাম। পরদিন খোলা ছাদে বাহির হইয়া একটু বেড়াইলাম। সেদিন লায়লী একটি বড় গোলাপফুল আনিয়া আমায় উপহার দিল। ফুলটি লইয়া আমি মাথায় ঠেকাইয়া, মাথা ঝুঁকাইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম।

তিন চারি দিন পরে আমি সেই শয়নকক্ষে একটা চেয়ারে বসিয়া আছি, পিয়ারী বিবি অদূরে বসিয়া এক টুকরা রেশমের উপর সূচের সাহায্যে ফুল তুলিতেছিলেন, এমন সময় সেই নবাব সাহেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিয়ারী বিবি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিলেন। আমিও তাঁহার দেখাদেখি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সেলাম করিলাম। নবাব সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বা রে বোবা কালা, তোর ত বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি!"

তাঁহারা বসিলে, আমিও উপবেশন করিলাম। তখন তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল—

নবাব সাহেব। চল না ও-ঘরে, একটু বিশেষ কথা আছে।

পিয়ারী। "এখানেই বলুন না—আর, ও ত বোবা কালা, ওকে আর ভয় কি?"

ইহা শ্রবণমাত্র আমার মনে একটা প্রবল কৌতূহল জন্মিল। ব্যাপার কি? কিন্তু মনের সে ভাবটা দমন করিয়া, আমি নির্লিপ্তভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিলাম।

নবাব সাহেব।...মহারাজ ত আর বেশী দিন এখানে থাকবেন না। আমাদের শেষ কথা জানতে চান।

(নবাব সাহেব পশ্চিমের একজন বিখ্যাত করদ নৃপতির নাম করিলেন।)

পিয়ারী। পাঁচ লাখের কম কি আর রাজি হওয়া যায়?

নবাব। তিনি কিন্তু দু'লাখের বেশী উঠতে চাচ্ছেন না। তিন লাখ বলবো? তোমার এক আমার দুই।

পিয়ারী। আমার এক, আপনার দুই বইকি! আধা-আধি।

নবাব। আচ্ছা, তাই তাই। কিন্তু লায়লীকে কি রাজি করা যাবে? ও ত মহারাজের নাম শুনলে জ্বলে যায়।

পিয়ারী। না, সে আমি ওর মন বুঝে দেখেছি। ও কিছুতেই রাজি হবে না।

নবাব। সেই বুঝেই মহারাজ একটা ফন্দী বের করেছেন। তিনি বলেন, তুমি আমি লায়লীকে নিয়ে দেশ বেড়াবার ছলে ওঁর রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হই। উনিও তার পরেই রাজ্যে ফিরে যাবেন। তখন লায়লীকে ওঁর হাতে দিয়ে আমরা চ'লে আসবো। আমাদের যাতায়াতের সমস্ত খরচ মহারাজ দেবেন বলেছেন।

পিয়ারী। এ পরামর্শ মন্দ নয়। কিন্তু কোনও পুলিস হাঙ্গামা হবে না ত?

নবাব। ইংরাজের পুলিস সেখানে কোথা? সেখানে ওঁর নিজের পুলিস। উনি যা খুসী তাই করতে পারেন। মহারাজ যদি ওকে খুনও ক'রে ফেলেন, তা হলেও কেউ বলবার নেই।

পিয়ারী। খুন করবে নাকি? তা হ'লে কিন্তু আমি মেয়ে দেবো না নবাব সাহেব। নেই বা হ'ল পেটের মেয়ে, এত দিন পুষেছি, একটা মায়া জন্মে গেছে ত! আখেরে ওর ভাল হবে, রাজরাণীর মত সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে, তাই আমি রাজি হয়েছিলাম।

নবাব। না না, পাগল নাকি? খুন করবে কেন? ওর উপর মহারাজের ভয়ানক ঝোঁক হয়েছে—মিষ্টি কথা ব'লে, ভালবেসে, ক্রমে ওকে বশীভূত ক'রে নেবেন।

পিয়ারী। এত ঝোঁকই হয়েছে যদি, তবে পাঁচ লাখ দিতে রাজি হচ্ছেন না কেন? আড়াই লাখ পেলে আপনার অনেকটা দেনাই ত মিটে যেত।

নবাব। চেষ্টা করতে আমি কি কসুর করছি, না করবো? যদি তিন লাখের বেশী মহারাজ উঠতে না-ই চান, তা হ'লে, দেড় লাখ তোমারই বটে, কিন্তু আপাততঃ এক লাখ তুমি নিয়ে দু'লাখ আমায় দিও পিয়ারী! তা হ'লে দুটো বড় বড় মহাল আমি ছাড়িয়ে নিতে পারবো, আমার আয় বাড়বে, তোমার টাকা আমি দুই এক বছরেই শোধ ক'রে দেবো।

পিয়ারী। মহারাজ কবে আমাদের যেতে বলেন?

নবাব। তিনি এক হপ্তার বেশী আর কলকাতায় থাকতে চাইছেন না! বলছেন, আমি যে দিন রওনা হব, তার দুই এক দিন আগেই তোমরা রওয়ানা হলে ভাল হয়।

পিয়ারী। তা হ'লে আজ থেকে ধরুন, পাঁচ দিন পরে। কালা-বোবাটার সম্বন্ধে কি করা যায়?

নবাব। ও ত এখন ভাল হয়েছে, উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে, ওকে তখন বিদেয় ক'রে দিলেই হবে।

পিয়ারী। সেই ভাল।

নবাব। এখন তবে আমি উঠি পিয়ারী!

পিয়ারী। এখনই যাবেন? সন্ধ্যার পর আসবেন কি?

নবাব। না, আজ নয়। বড় ব্যস্ত আছি। আচ্ছা, কাল সন্ধ্যার পর এসে তোমার দুটো গান শুনবো।

পিয়ারী। এখানেই কিন্তু আপনার খাবার তৈরী থাকবে।

নবাব। বেহেতর।

ব্যাপার আমি সবই বুঝিলাম। এই নর-রাক্ষস ও নারী-রাক্ষসীর প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধে আমার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি নবাবকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম করিলাম।

নবাব আবার আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "গুড্ বয়। গুড্ বয়!" পিয়ারী নবাবের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

সে রাত্রে লায়লী আসিয়া আমার খাবার দিল। দুধে ভিজানো পাঁউরুটী এবং একটা আপেল। আমি আহার-দাত্রীর পানে বিষণ্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিলাম।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহার শেষ করিয়া পিয়ারী লায়লীকে বলিল, "আজ নবাব সাহেব রাত্রে এখানে খাবেন। আমি মার্কেটে চললাম। তুই ঘর-দোর দেখিস শুনিস, বুঝলি?"

লায়লী বলিল, "আচ্ছা মা।"

"খানিকটা সেগো-পুডিং তৈরি করা আছে,—বেলা তিনটের সময় বোবা-কালাকে খেতে দিস।"

"আচ্ছা। তুমি কখন ফিরবে মা?"

"আমার ফিরতে চারটে বাজবে।"—বলিয়া পিয়ারী প্রস্থান করিল। গাড়ীবারান্দা হইতে শব্দ করিয়া মোটরগাড়ী বাহির হইয়া গেল, আমি শুনিতে পাইলাম।

লায়লী তখনও সেই ঘরে দাঁড়াইয়া, জানালায় মুখ দিয়া বাহিরে কি দেখিতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই সে মুখ ফিরাইল, আমি অমনই তাহাকে হস্তসঙ্কেতে ডাকিলাম।

লায়লী আশ্চর্য্য হইয়া আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমি হস্তেঙ্গিতে তাহাকে কাগজ পেন্সিল দিতে বলিলাম।

অদূরে একটি টেবিলের উপর হইতে সে একটা রাইটিং-প্যাড এবং পেন্সিল আনিয়া আমার হাতে দিল।

আমি প্যাডে লিখিলাম—"আমি কালা ত নই-ই, জন্ম-বোবাও নই। তোমার মোটরের ধাক্কা খেয়েই আমি বাক্‌শক্তি হারিয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। লিখবো কি? তুমি উত্তর দাও, আমি সে কথা শুনতে পাব।"

লায়লী সবিস্ময়ে বলিল, "কি কথা?"

আমি লিখিলাম, "কাল বিকেলে যখন নবাবসাহেব এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে তোমার পালিকা মা'র অনেক কথাবার্ত্তা আমি শুনেছি। আমাকে কালা মনে ক'রে তাঁরা অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা চালিয়েছিলেন। তাঁদের কথা থেকে আমি বুঝেছি যে, তোমার সম্মুখে মহাবিপদ।"

লায়লী বলিল, "অ্যাঁ, বলেন কি? কি বিপদ?"

লিখিলাম, "তুমি...মহারাজকে জান?"

"হ্যাঁ, জানি জানি। তিনি আমাকে তাঁর রাজ্যে নিয়ে যেতে চান।"

লিখিলাম, "তুমি একান্ত অনিচ্ছুক, তা-ও আমি ওঁদেরই মুখে শুনেছি। নবাব-সাহেব আর তোমার পালিকা মা, একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছেন। দেশ-ভ্রমণের ছলে, তোমাকে নিয়ে তাঁরা সেই রাজ্যে গিয়ে, তিন লক্ষ টাকায় তোমাকে রাজার নিকট বিক্রী ক'রে আসবেন।"

লায়লী বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! আপনি বলেন কি? তবে আমার কি হবে?"

লিখিলাম, "তুমি কি এ'দের আশ্রয় পরিত্যাগ করতে চাও?"

সে বলিল, "নিশ্চয় নিশ্চয়! আমি কখনও সে পোড়ারমুখো রাজার উপরাণী হব না। তার চেয়ে বরং আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো।"

লিখিলাম, "ইচ্ছা করলে তুমি পালাতে পার।"

"কাজেই। আমি যদি বলি, না, আমি তোমাদের সঙ্গে দেশভ্রমণে যাব না, ওরা হয়ত আমায় কিছু খাইয়ে-টাইয়ে অজ্ঞান ক'রে নিয়ে ট্রেণে তুলবে। মায়া-দয়া ত নেই, পেটের মেয়ে ত নই আমি। আমার আসল মা এই কলকাতায় গঙ্গা নাইতে এসে আমায় হারিয়ে ফেলেন। আমি যাদের হাতে পড়ি, আমায় খুব সুন্দরী দেখে, এই পিয়ারী বাইজী তাদের কাছ থেকে আমায় কিনে নিয়ে পুষেছে। আমার এক দিনও এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না—এক মুহূর্ত্ত না। পালাতেই হবে আমায়! কিন্তু পালিয়ে আমি কোথা যাব, আমায় ব'লে দিন আপনি! আমায় রক্ষা করুন।"—বলিয়া লায়লী কাতর-ভাবে আমার দুই হাত জড়াইয়া ধরিল।

আমার তখনই মনে হইল, ইহা ত ভাল নহে!—একজন অনাত্মীয়া মেয়ে নির্জ্জনে এমনভাবে আমার হাত জড়াইয়া ধরিবে, সেটা কি উচিত? আমি হাত ছাড়াইয়া প্যাডে লিখিলাম—"তুমি যদি আমায় দাদা বল, তবে আমি তোমার উদ্ধারের উপায় করতে পারি।"

লায়লী বলিল, "নিশ্চয়—নিশ্চয়। আপনি দয়া ক'রে আমায় উদ্ধার করুন, আমি আপনার মায়ের পেটের বোনের মতই চিরদিন আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবো।"

লিখিলাম. "আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আমিও ব'সে ব'সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, বিছানায় শুয়ে একটা কোনও উপায় চিন্তা করি। আচ্ছা, এটা কোন জায়গা? কলকাতা ত?"

লায়লী বলিল. "হ্যাঁ. কলকাতা বইকি. পার্ক লেন; কিছু দূরেই লোয়ার সার্কুলার রোড।"

"পিয়ারী কি হিন্দু, না মুসলমান?"

"হিন্দু। তবে বাইজী কিনা, তাই মুসলমানী নাম নিয়েছে। আমাকেও বাইজী বানাবে ব'লে আমারও মুসলমানী নাম দিয়েছে—নইলে আমার আগেকার নাম ছিল—হিরণকুমারী।"

"বেশ। তুমি এখন যাও।"

"আচ্ছা দাদা"—বলিয়া সে আমার পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিল। আমিও খাটে উঠিয়া শুইলাম।

উপায় চিন্তা করিতে করিতে আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়িল—আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যার পর আবার ঘুম ভাঙ্গিলে, কক্ষান্তর হইতে গানের শব্দ পাইলাম। বুঝিলাম, নবাব সাহেব আসিয়াছেন।

পাঁচ

পরদিন অপরাহ্নকালে লায়লী আমার ঘরে আসিলে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলাম 'তোমার মা কোথায়?"

সে কহিল, "নবাব সাহেব এসে মাকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গেছে। বোধ হয় তারা সেই রাজা পোড়ারমুখোর সঙ্গে দেখা করতে গেছে—কারণ, শুনলাম, শোফারকে হুকুম দিলে গ্র্যাণ্ড হোটেল। সেই রাজা পোড়ারমুখো গ্র্যাণ্ড হোটেলে থাকে কিনা। —হ্যাঁ দাদা, আপনার বোনটির উপায় কিছু স্থির করলেন?"

আমি লিখিলাম, "ভেবে চিন্তে দেখলাম, তোমার শুধু পালালেই চলবে না, কোনও নিরাপদ স্থানে কিছুকাল তোমার লুকিয়ে থাকা দরকার। তাই ভাবছি, তোমায় আমাদের দেশে নিয়ে যাব, সেখানে আমার স্ত্রী আছেন, তাঁর কাছে তুমি থাকবে। এরা আমার নাম-ধাম কিছুই জানে না, কস্মিন্‌কালেও তোমায় খুঁজে বার করতে পারবে না।"

"আপনার দেশ কোথা, দাদা? বউদিদির নাম কি?"

লিখিলাম—"সে সবই ত দু'দিন পরে জানতে পারবে। এখন বাজে কথায় সময় নষ্ট কোরো না। আমি যে তোমায় নিয়ে যাব, আমার কাছে কিন্তু টাকা-কড়ি কিছুই নেই। ভবানীপুরে আমার বাসায় কিছু টাকা আছে বটে, কিন্তু সেখানে গিয়ে আনি কি ক'রে?"

লায়লী বলিল, 'টাকার জন্যে কোনও ভাবনা নেই, দাদা। আমার কাছে শ-খানেক নগদ টাকা আছে। তাতে হবে না?"

লিখিলাম, "ঢের হবে। তোমার মা কি তোমার কাছে এখনও দেশভ্রমণে যাবার কথা পেড়েছে?"

"না। আজ রাজার সঙ্গে সব কথা পাকাপাকি ক'রে এসে বোধ হয় বলবে।"

লিখিলাম, "তুমি মৌখিক আহ্লাদ প্রকাশ কোরো। তা হ'লে ওদের কোনও সন্দেহ হবে না। তার পর, সুযোগ বুঝে তোমাকে নিয়ে আমি পালাবো।"

"আপনার দেশে যেতে হ'লে কোন্ ইষ্টিশানে গাড়ী চড়তে হয় দাদা? শিয়ালদা না হাওড়া?"

"হাওড়া।"

"ভালই হয়েছে। দেখুন, হাওড়ায় আমরা ট্রেণে উঠবো না। এরা হয়ত আমাদের না দেখতে পেয়ে, হাওড়া আর শিয়ালদহে লোক পাঠাবে আমাদের ধরতে। তার চেয়ে বরং ট্যাক্সিতে আমরা চন্দননগর কি ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত গিয়ে ট্রেণে উঠবো। কেমন, সেই ভাল হবে না?"

"সেই ভাল হবে।"

পরদিন প্রভাতে লায়লী আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিল, "কাল সন্ধ্যায় পঞ্জাব মেলে দেশভ্রমণে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কাল ভোরেই আমাদের পালানো দরকার।"

দ্বিপ্রহরে নবাব সাহেব আসিয়া পিয়ারীকে লইয়া জিনিষপত্র কিনিতে গেলেন। লায়লীকেও তাঁহারা সংগে লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শিরঃপীড়ার ছুতা করিয়া সে গেল না।

খালি বাড়ী পাইয়া আবার আমাদের পরামর্শের বৈঠক বসিল। লায়লী বলিল, "নবাব আজ রাত্রে এখানেই থাকবে। দুজনেই মদ খাবে, কাল বেলা ৮টা ৯টার কম ওদের ঘুম ভাংগবে না। চাকর-বাকর সকলেই জানে, নবাব সাহেব রাত্রে এখানে থাকলে ওরা কখন ওঠে, তাই তারাও নিশ্চিন্ত হয়ে বেলা অবধি ঘুমোয়।

পরামর্শ স্থির হইল, ভোর পাঁচটায় লায়লী আসিয়া আমাকে জাগাইয়া দিবে, আমরা উভয়ে পদব্রজে বড় রাস্তায় গিয়া পড়িয়া সেখানে ট্যাক্সি ধরিব।

বেলা তখন ৯টা হইবে, আমাদের ট্যাক্সি পূরা দমে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া ছুটিতেছিল। কিছু দূরে দেখা গেল, কয়েকখানা গোরুর গাড়ী রাস্তার মধ্যভাগ জুড়িয়া চলিয়াছে। সে গাড়ীগুলিকে পাশে যাইবার জন্য ট্যাক্সিচালক ক্রমাগত হর্ণ দিতে লাগিল, নিজ গাড়ীর বেগও কমাইয়া দিল। গাড়ীগুলা পাশে গেলও। কিন্তু আমাদের ট্যাক্সিটা গাড়ীগুলার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া হর্ণ দিবামাত্র একটা গাড়ীর গরু ভয় পাইয়া, ছুটিয়া গাড়ীখানা আড়াআড়িভাবে রাস্তার মধ্যস্থলে লইয়া গেল! ফলে আমাদের ট্যাক্সি ভীষণ ধাক্কা খাইয়া রাস্তার পার্শ্বস্থ খালের দিকে কাৎ হইয়া পড়িল। আমি ছিটকাইয়া কিয়দ্দূরে আছাড় খাইয়া পড়িবামাত্র হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—বাপ্!

কষ্টে উঠিয়া বসিলাম। ট্যাক্সি কাৎ হইবার পূর্ব্বেই ড্রাইভার লাফ দিয়া নামিয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম, গাড়ীর দরজা খুলিয়া, লায়লীর হাত ধরিয়া তাহাকে সে টানিয়া বাহির করিতেছে।

বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া লায়লী থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। দুই হাতে নিজ মাথা চাপিয়া ধরিল। আমি যেখানে পড়িয়াছিলাম, সেইখান হইতে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বড্ড লেগেছে, লায়লী?"

অস্ফুট স্বরে যাহা বলিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই সময় কলিকাতার দিক হইতে আর একখানি মোটর গাড়ী ছুটিয়া আসিতেছে দেখা গেল। আমি ভাবিলাম, "এই রে! আমাদের ধরতে আসছে বোধ হয়।" কিন্তু দেখিলাম, সে আশঙ্কা অমূলক। এক সাহেব ও এক মেম সে গাড়ীর আরোহী। আমাদের অবস্থা দেখিয়া, তাহারা গাড়ী দাঁড় করাইয়া আমাদের নিকট আসিল। লায়লীর অবস্থা দেখিয়া সাহেব বলিল, "মেয়েটি মূর্চ্ছা যাইতেছে—" বলিয়া পকেট হইতে ব্র্যাণ্ডি-ফ্লাস্ক বাহির করিয়া লায়লীকে পান করাইয়া দিল। বলিল, "কুছ ডর নেই বেটী! আবি আচ্ছা হো যাগা।" আমার কাছেও আসিল এবং হাত ধরিয়া আমাকেও তুলিল, আমাকেও ব্র্যাণ্ডি পান করাইয়া দিল। আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কোথায় যাইতেছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম—"ব্যাণ্ডেল।"

সাহেব বলিল, "ব্যাণ্ডেল আর বেশী দূর নহে—চল, আমরা তোমাদের পৌঁছাইয়া দিই।"

আমি এক দিকে, সাহেব এক দিকে লায়লীকে ধরিয়া, গাড়ীর নিকট লইয়া গেলাম। মেমসাহেব তাহাকে তুলিয়া লইয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন। আমি সামনের দিকে সাহেবের পার্শ্বে বসিলাম।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে পৌঁছিয়া শুনিলাম, দশ মিনিট পরে একখানি 'আপ্ ট্রেণ' আসিবে। লায়লীকে ওয়েটিং রুমে বসাইয়া আমি গিয়া টিকিট কিনিয়া আনিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিলাম, যাহাতে লায়লী আরামে শুইয়া যাইতে পারে।

ট্রেণ ছাড়িলে লায়লী বলিল, "দাদা, তুমি এত দিন বোবা সেজেছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "সেজেছিলাম? তুমি কি মনে কর, আমি ভাণ করতাম?"

"তবে এখন কথা কইছ কি ক'রে?"

বলিলাম, "কি ক'রে তা জানিনে। একটা ধাক্কায় বাক্‌শক্তি হারিয়েছিলাম, আর একটা ধাক্কায় বাক্‌শক্তি ফিরে পেলাম। কি ক'রে পেলাম, তা আমি জানিনে,—তা ডাক্তারেরা বলতে পারেন বোধ হয়।"

ছয়

ট্রেণে আমি লায়লীকে বলিলাম, "দেখ, তুমি আর লায়লী নও, আজ থেকে তুমি আগেকার হিরণকুমারী।" ষ্টেশনে নামিয়া গরুর গাড়ী ভাড়া করিলাম। সন্ধ্যার পরে গো-যান আমাদের গ্রামে প্রবেশ করিল। গরুর গাড়ী বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড় করাইয়া আমি ছুটিলাম শ্বশুরবাড়ী, বউকে আনিতে। বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া তখনই একবস্ত্রে তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসিয়া বলিলাম, "গোরুর গাড়ীতে তোমার ননদ ব'সে আছে, যাও ওকে নামিয়ে আন।"

"ননদ?"—বউ ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আমার সঙ্গে গিয়া লায়লীকে নামাইয়া লইল। ভাড়া দিয়া গরুর গাড়ী বিদায় করিলাম।

বউ বলিতে লাগিল, "হাঁ গা? কি হয়েছে বল না? কে ও? কোথায় পেলে ওকে?"

আমি বলিলাম, "সে অনেক কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বলবো। এখন কিছু খাবার যোগাড় কর দেখি। সারাদিন অন্নের মুখ দেখিনি।"

বউ তাড়াতাড়ি আলুভাতে ভাত চড়াইয়া দিল। সারাদিনের পর তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া দেহে প্রাণ আসিল।

ছোট ঘরে হিরণের জন্য বউ শয্যা রচনা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া আসিল। গ্রাম ছাড়িবার পর যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে সমস্তই তাহাকে বলিলাম।

শুনিয়া বউ খানিকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল। তার পর বলিল, "হ্যাঁ গা, তারা সব বড়লোক, রাজা-উজীর, তোমায় কোনও বিপদে ফেলবে না ত?"

বলিলাম, "বিপদ কিসের? কোনও মন্দ কাজ ত আমি করিনি,—ভাল কাজই করেছি। তার জন্যে বিপদ হবে কেন? তুমিও যেমন, কি ক'রেই বা তারা আমাদের সন্ধান পাবে!"

শেষে বউ বলিল, "কাল সকালে পাড়ার লোক যখন হিরণকে দেখে জিজ্ঞাসা করবে এ মেয়েটি কে, তখন কি বলা যাবে?" আমি ভাবিতে লাগিলাম, কিছুই কূল-কিনারা পাইলাম না।

অবশেষে বউ বলিল, "দেখ, বলা যাবে, তোমার যেখানে চাকরি হয়েছে, সেই মনিবের মেয়ে। চিরকাল কলকাতায় মানুষ, কখনও পাড়া-গাঁ দেখেনি, তাই পাড়া-গাঁ দেখতে এসেছে। কাল সকালে উঠেই ওকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রে নেবো।"

বুদ্ধির তারিফ করিলাম। বাস্তবিক, সদ্‌গোপের ঘরের মেয়ে, তায় মোটে ১৮ বছর বয়স, এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

বউয়ের সঙ্গে হিরণের খুব ভাব হইয়া গেল। প্রথম দিন হইতেই হিরণ মন্দাকে বউদিদি সম্বোধন করিতেছিল।

দিন পনেরো পরে একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, বাড়ীর চারিদিকে পুলিস ঘেরাও করিয়াছে। কলিকাতা হইতে ডিটেক্‌টিভ ইনস্পেক্টর আসিয়াছে। ওয়ারেণ্টের বলে তাহারা হিরণকে এবং আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় লইয়া চলিল। হিরণের জন্য পাল্কীর বন্দোবস্ত তাহারা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিল।

সাত

পরদিন বেলা ১০টার সময় তাহারা আমাদিগকে লালবাজারে আনিয়া এক বাঙ্গালী ডেপুটী কমিশনরের নিকট হাজির করিল। ডেপুটী কমিশনরবাবু আমায় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; আমি আমূল বৃত্তান্ত সমস্তই খোলাখুলি বলিয়া দিলাম।

একজন দেশীয় করদ নৃপতি এ ব্যাপারে জড়িত শুনিয়া বাবুটি কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। তার পর তিনি উঠিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদিগকে অন্য কামরায় এক সাহেবের ঘরে যাইতে হইল। পরে শুনিয়াছি, তিনিই স্বয়ং পুলিস কমিশনর। সাহেব আমায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি সমস্তই আবার তাঁহাকে বলিলাম। নবাবসাহেব ও পিয়ারী বাইজীর ষড়যন্ত্রের বিষয় আমি কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত বলিলাম।

কমিশনর সাহেব উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। তারপর ঘটনা যাহা হইয়াছিল, আমি তখন সে সব কিছু জানিতে পারি নাই, পরে জানিয়াছি।

কমিশনর সাহেব মোটর ছুটাইয়া তখনই নবাব সাহেবের বাড়ী গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। নবাব সাহেব সমস্তই অস্বীকার করেন। এমন কি! ......মহারাজার সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের কথা পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। তখন কমিশনার সাহেব ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টের খাতা খুলিয়া নবাব সাহেবকে দেখাইয়া দিলেন,—নবাব সাহেব কবে কবে কোন্ কোন্ দিন গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়া মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, মহারাজা কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ সময় পিয়ারী বাইজীর বাড়ী গিয়া নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন—সে সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ডিটেক্‌টিভগণ তাহাতে লিখিয়া রাখিয়াছে!

(এই ডিটেক্‌টিভগণ অদ্ভুত জীব; ইহাদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। শুনিয়াছি, আমাদের 'পলায়নের পর পিয়ারী বিবি আমার নামে 'কিড্‌ন্যাপিং' চার্জ্জ আনিলে, ডিটেক্‌টিভগণ কলিকাতার সমস্ত ট্যাক্সিচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমাদের ট্যাক্সিওয়ালার নিকট খবর পাইয়া ব্যাণ্ডেলে যায় এবং ব্যাণ্ডেল হইতে ঐ ট্রেণে দুইখানি মাত্র সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট বিক্রয় হওয়া দেখিয়া আমাদের ষ্টেশনে আসিয়া নামিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আমায় বাহির করে।)

সেখান হইতে কমিশনব সাহেব নাকি সোজা গভর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়া লাট সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। করদ নৃপতির নাম শুনিয়া, লাট সাহেব বিশেষ চিন্তিত

হইয়া পড়েন এবং এ ব্যাপার নাকি 'হাশ্‌-আপ' করিতে (চাপিয়া যাইতে) আদেশ দেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল তথায় থাকিয়া কমিশনর লালবাজারে ফিরিয়া আসেন।

কমিশনর সাহেব আসিয়া আমার পানে চাহিয়া মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন, "ইয়ংম্যান—তুমি বেকসুর খলাস।" লায়লীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "পিয়ারী বিবি তোমায় হেপাজতে পাইবার জন্য আমার নিকট দরখাস্ত করিয়াছে। কিন্তু তুমি প্রাপ্ত-বয়স্কা। তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার। পিয়ারী বিবির কাছে যাইবে?"

লায়লী বলিল, "না সাহেব, দয়া করিয়া সেখানে আমায় পাঠাইবেন না। সে পতিতা স্ত্রীলোক; আমি পবিত্র জীবন যাপন করিতে চাই। আমি শুনিয়াছি, আমার ন্যায় অসহায়া স্ত্রীলোককে, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা পাইলে সাদরে গ্রহণ করেন এবং সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করেন। আমি সেইরূপ স্থানে যাইতে চাহি।"

সাহেব আবার টেলিফোন ধরিলেন; একজন উচ্চপদস্থ ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, একজন ডেপুটী কমিশনরের জিম্বায় লায়লীকে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইয়ংম্যান, তোমার সাহস, কার্য্যতৎপরতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের বিষয় শুনিয়া লাট সাহেব অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন। পুলিসের চাকরি করিতে তুমি সম্মত আছ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ হুজুর।"

"উত্তম! আজই তোমায় বাহাল করিলাম।—আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুমি নিয়োগপত্র পাইবে। কিন্তু এখন ছয় মাস তুমি রাঁচি গিয়া কাজকর্ম্ম শিখিবে। এ ছয় মাস ৩০, হিসাবে ভাতা পাইবে। সেখানকার পরীক্ষায় পাস করিলেই তুমি ৭০, বেতনে সাব ইন্‌স্পেক্টার হইবে। কেমন, খুসী হইলে ত?"

আমি বলিল, "ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

তারপর সাহেব হাসিতে হাসিতে অঙ্গুলি নাড়িয়া বলিলেন, "যে ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া আজ তুমি এখানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা কিন্তু জীবনে কোনও দিন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না ইহাই লাট সাহেবের আদেশ। যদি কর, তৎক্ষণাৎ তোমার চাকরি যাইবে। যে কয়দিন তুমি দেশের বাড়ীতে ছিলে, মহারাজার বিষয় তুমি কাহারও কাছে গল্প করিয়াছিলে কি?

"কেবল আমার স্ত্রীর কাছে বলিয়াছিলাম, আর কাহারও কাছে না।"

"তোমার স্ত্রী কি কাহারও কাছেও গল্প করিয়াছেন?"

"সম্ভব নয়। কারণ, কলঙ্ক ভয়ে লায়লী সম্বন্ধে গ্রামে আমরা একটা কাল্পনিক কথা প্রচার করিয়া আসল ঘটনা চাপা দিয়াছিলাম।"

"ভাল করিয়াছিলে; আজই তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, তোমায় ৭ দিনের ছুটী দেওয়া গেল। তোমার স্ত্রীকে তুমি খুব সাবধান করিয়া দিবে, কাহারও কাছে এ ব্যাপার যেন প্রকাশ না হয়। প্রকাশ হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার চাকরি যাইবে,—তোমার জেলও হইতে পারে।"

সাহেব টাকা দিলেন; সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেণেই আমি আবার বাড়ী ফিরিয়া গেলাম।

বউ তাহার পিত্রালয়েই ছিল। যে দিন আমি গ্রেপ্তার হই, সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে শ্বশুর মহাশয় আমার উদ্ধারের চেষ্টায় কলিকাতায় রওনা হইয়াছিলেন। আমার খালাসের সংবাদ পাইয়া, পরদিন তিনি গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

বাবার অভিলাষ পূর্ণ হইল,—চাকরি হইল, আমি বাবু হইলাম। তা-ও যে সে বাবু নহে,—পুলিসের বাবু—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

ছয় মাস পরে, কলিকাতায় ফিরিয়া পাকা দারোগা হইলাম। বাসা ভাড়া করিয়া

বউকে লইয়া আসিলাম।

হিরণ, ব্রাহ্মসমাজের এক উচ্চশিক্ষিত যুবককে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। মাঝে মাঝে বউয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে।

কানাইয়ের কীর্ত্তি

কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোডের উপর এক ত্রিতল অট্টালিকা। ফটক পার হইয়া খানিকটা বাগান,—তারপর বাড়ীর গাড়ীবারান্দা। সেই গাড়ীবারান্দার সিঁড়ির নিকট এক ছিন্ন মলিন বেশ যুবক, পায়ে জুতা নাই, বয়স আন্দাজ ১৮।১৯—নীরবে বসিয়া ছিল। গতকল্য তাহার আহার হয় নাই। আজ এখন বেলা ৮টা—আজ ত হয়ই নাই। এমন সময় সিঁড়ি দিয়া কেহ নামিবার পদশব্দ হইল। যুবক সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

যিনি নামিয়া আসিলেন, তিনিই এ গৃহের কর্ত্তা—ধুতির উপর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, পায়ে চটিজুতা। বয়স তাঁহার পঞ্চান্ন বৎসরের কম হইবে না। রঙ বেশ ফর্সা। গোঁফ দাড়ি কামানো।

ভদ্রলোক নিম্নে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র তাঁহার দৃষ্টি সেই ছিন্নবেশ যুবকের উপর পতিত হইল। যুবক মাথা খুব ঝুঁকাইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তাঁহার পশ্চাৎ, বৃহৎ গুড়গুড়ি হস্তে এক ভৃত্য নামিল। বাবুটি কোনও কথা না বলিয়া, তাঁহার বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন,—ভৃত্য গুড়গুড়িটি সেখানে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিল। যুবক নিম্নস্বরে বলিল, "খানসামাজি! একবার বল না।"

ভৃত্য মুখ বাঁকাইয়া আবার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ফিরিয়া আসিয়া, ইঙ্গিতে যুবককে বলিল, "যাও।"—বলিয়া সে উপরে চলিয়া গেল।

ছেলেটি তখন সভয় পদবিক্ষেপে ভিতরে গিয়া বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে গৃহস্বামী তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "কি হে ছোকরা, তুমি কি চাও বল দেখি?"

যুবক বলিল, "আজ্ঞে, একটা চাকরী-বাকরী।"

"লেখাপড়া জান?"

"আজ্ঞে, বাংলা জানি। দেশে থাকতে ছেলেবেলায় গুরু মশাইয়ের পাঠশালে পড়েছিলাম কিছুদিন। লিকতে পড়তেও জানি, হিসেব নিকতেও পারি। বড় গরিব, দিন চলে না, তাই কলকাতায় এসেছি একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টায়।"

"থাক কোথায়?"

"আজ্ঞে কালীঘাটে আমাদের দেশের একজন—"

বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "বাজার সরকারী-টরকারী এই রকম একটা কোন চাকরী খুঁজছ বোধ হয়? তা বাপু, বাজার সরকার ত আমাদের থাকে না। বেয়ারার কাজ করতে রাজী হও ত বল। আমার বেয়ারা কাজ ছেড়ে চ'লে গেছে। কি জাত তুমি, নাম কি তোমার?"

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীকানাইলাল নন্দী। আমরা কায়স্থ। অন্য কোনও কাজ যদি খালি না-ই থাকে, তবে বেয়ারার কাজই আমায় দিন বাবু। তবু ত দুটো খেয়ে পরে বাঁচবো!"

"এখানে খাবে কি ক'রে? এখানে ত বাবুর্চ্চিতে রাঁধে। আমি ত হিন্দু নই,—ক্রিশ্চান।"

"আজ্ঞে সে কথা বলিনি। মাইনে পাব ত, সেই টাকায় খাব পরবো। আমায় কি করতে হবে বাবুমশাই?"

"এই, বেযারার যা কাজ—বাড়ীর সব আসবাবপত্র ঝাড়পোঁচ করা, ঘরে ঘরে বিছানা ঠিক করা, রূপোর বাসন-টাসনগুলো মাজা ঘষা, মিস বাবাকে কলেজে দিয়ে আসা নিয়ে আসা, বিকেলে ছোট ছেলেমেয়েদের পার্কে নিযে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আনা—এই রকম সব কাজ আর কি।"

"মাইনে কত পাব হুজুর?"

"কুড়ি টাকা। এ পাড়ার বাঁধা রেট।"

কানাই মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল। তার পর বলিল, "আচ্ছা যে আজ্ঞে হুজুর, কবে থেকে আসবো তা হলে?'

বাবু বলিলেন, 'কাল ইংরেজি মাসের পযলা তারিখ। কাল থেকে কাজে লাগো। ঠিক সাড়ে ছ'টায় আসতে হবে রোজ। সাতটায় আমি উঠি, আমায় তামাক-টামাক দিতে হবে। রাত্রে ডিনার হযে গেলে তার পর তোমার ছুটি। মাঝে অবশ্য দুপুরবেলা দু তিন ঘণ্টার জন্যে তোমায় খেতে ছুটি দেওয়া যাবে। কাজ খুব হাল্কা,—তবে সর্ব্বদা হাজিব থাকা চাই। কাল সকালে এসে, খানসামাকে বলবে, তোমার উর্দ্দি দেবে। পাগড়ী চাপকান আব ধুতি। এ সব ছেড়ে রেখে সেই উর্দ্দি পরে কাজ করবে।"—এই বলিয়া তিনি টেবিলের উপর রক্ষিত বিদ্যুৎ ঘণ্টার বোতাম টিপিলেন। খানসামা আসিয়া দাঁড়াইল। এই নবনিযুক্ত বেয়ারা সম্বন্ধে নিজ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া কানাইকে বলিলেন, "আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার।"

কানাই আবার ঝুঁকিযা প্রণাম কবিযা সে কক্ষ হইতে বাহির হইল। গাড়ীবারান্দা হইতে নামিয়া, চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া, বাড়ীর পিছন দিকে গেল। অদূরে বাবুর্চ্চিখানা, সেখান হইতে মাংস রান্নার গন্ধ আসিতেছে। সেই গন্ধে ক্ষুধাতুর যুবকের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইযা উঠিল। বাটীর পশ্চাতের বারান্দায় খানসামা বসিয়া একরাশ কাচের গেলাস ঝাড়ন সহযোগে পরিষ্কার কবিতেছিল। কানাই সেখানে গিযা বলিল "খানসামাজী তুমকো নাম কেযা?'

খানসামা হাসিযা বলিল, নাম কেয়া? তুমি আমাকে খোট্টা ঠাওরালে নাকি? আমার নাম গোলাম বসুল আমি বাঙ্গালী মুসলমান, হুগলি জেলায় চেড়াগাঁয়ে আমার ঘর। তোমার নাম কি? ঘব কোথায়?"

কানাই নিজ নাম ও নিবাস বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'এখানে বাবুব কে কে থাকেন?"

খানসামা উত্তব করিল "বাবু! বাবু কে? সাহেবের কথা পুছ করছ? বাবু বোলো না, সাহেব গোস্‌সা হবে।"

"বটে, তাই নাকি? তা আমি ত জানতাম না খানসামাজী! ধুতি পরে তামাক খাচ্চেন দেখে আমি ত বাবু বলে ফেলেছি!"

"উনি কি তোমাদের হেঁদু? ইশাই যে! সাহেব বলবে। সাহেবের মেম নেই, এন্তেকাল করেছে। এ কুঠিতে সাহেবের দুই বেটী, এক বেটা থাকে। ছোট সাহেবের এখনও সাদি হয়নি। ছোট মিস বাবারও সাদি হয়নি। বড় দামাদ সরকারী কাজে বিলাযেৎ মুলুক গিয়েছে তাই বড় বেটী এখন বাপের কাছে থাকে। তার দুই লেড়কা তিন লেড়কী! ব্যস্।" বলিযা খানসামা সজোরে কাচের গ্লাসে ঝাড়ন ঘষিতে লাগিল। বলিল 'যাও দেখি, এই টেবের উপর সাফ গেলাসগুলো রযেছে, এগুলো ঐ খানাকামরায় রেখে এস। দেখো, ফেলে দিয়ে ভেঙ্গো না যেন।"

কানাই সাবধানে ট্রে তুলিয়া লইযা খানাকামরায় প্রবেশ করিল। দেখিল, টেবিলের উপব দুইটি চীনামাটীব পাত্রে অনেকগুলি আপেল ও ন্যাসপাতি সাজানো রহিযাছে।

বাহিরে আসিয়া কানাই আবার খানসামার নিকট বসিয়া, সাহেব ও তাঁহার পরিবার-বর্গ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

অল্পক্ষণ পরে বাবুর্চ্চিখানা হইতে শব্দ আসিল, "রসুল ভাই—জেরা এদিকে আয় ত!"

রসুল, হাতের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল। এই সুযোগে কানাই চট্ করিয়া খানাকামরায় প্রবেশ করিয়া একটা ন্যাসপাতি ও দুইটা আপেল নিজ পকেটে পুরিয়া বাহিরে আসিয়া, আবার যথাস্থানে বসিল।

মিনিট পাঁচেক পরে রসুল ফিরিয়া আসিল। কানাই তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, এখন আসি তবে, বেলা হল। সেলাম ভাইসাহেব।"

"সেলাম। কাল বিহানে এসে, আমার কাছ থেকে তোমার উর্দ্দি চেয়ে নেবে। সাবুন দেবো, হাতমু আচ্ছিতরে ধুয়ে, উর্দ্দি পরে আপন কামে যাবে। সাহেবলোক ময়লা একদম দেখতে পারে না—খুব সাফাই চায়।"

"আচ্ছা"—বলিয়া কানাই প্রস্থান করিল। কিছুদূর গিয়াই পদ্মপুকুর। ঘাটে নামিয়া, পকেট হইতে ফল তিনটি বাহির করিয়া জলে ধুইয়া লইয়া, বোঁটাসুদ্ধ খোসা-সুদ্ধ কামড় মারিয়া গোগ্রাসে চিবাইতে লাগিল। ফল তিনটি নিঃশেষ করিয়া পদ্মপুকুরের জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিল। হাত পা ধুইয়া উপরে আসিয়া ছায়াতলে একখানি বেঞ্চি দেখিয়া, তাহার উপর শয়ন করিল। ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছিল; কানাই অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

দুই

চাকরিতে ভর্ত্তি হইবার এক সপ্তাহ পরে, কানাই অতি প্রাতে প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিবার সময় ফটকের বাহিরে একটি "মনিব্যাগ" কুড়াইয়া পাইল। সেটি লইয়া বাগানে লেবুগাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া খুলিয়া দেখিল, ভিতরে দুইখানি দশ টাকার নোট এবং খুচরায় তিন টাকা কয়েক আনা রহিয়াছে। তার মনের মধ্যে প্রলোভন হইল, টাকা-গুলি সে আত্মসাৎ করে। নোট ও টাকাগুলি বাহির করিয়া লইয়া, ব্যাগটা রাস্তায় ফেলিয়া দিলেই হইল। কিন্তু তাহার মনে একটু দ্বিধাও উপস্থিত হইল। ছি ছি—শেষকালে চুরি! একদিন পেটের জ্বালায় ফল চুরি করিয়া খাইয়াছিল বটে। কিন্তু টাকা চুরি একান্ত গর্হিত কর্ম্ম হইবে যে! খুব সম্ভব, বড় সাহেব কিংবা ছোট সাহেবেরই এ ব্যাগ। বড় সাহেবের বোধ হয় নয়, ছোট সাহেবেরই হইতে পারে। কারণ গত রাত্রে বড় সাহেব ত কোথাও বাহির হন নাই; ছোট সাহেবের বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, কানাই যখন বাড়ী যায়, তখনও তিনি ফেরেন নাই—তিনিই বোধ হয় বাড়িতে প্রবেশ করিবার সময় অসাবধানে এ ব্যাগ ফেলিয়া গিয়াছেন। নাঃ, লোভ করিয়া দরকার নাই, —তামাক দিতে গিয়া এ ব্যাগ বড় সাহেবের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

কানাই লোভ রিপুকে জয় করিল। বড় সাহেবের নিকট ব্যাগটি দিল।

সে ঠিকই অনুমান করিয়াছিল। ছোট সাহেব গতকল্য রাত্রি ১২টার সময় তাঁহার ক্লাব হইতে ডিনার খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া, ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া দিবার জন্য ব্যাগটি তাঁহার পাৎলুনের পকেট হইতে বাহির করিয়াছিলেন। তারপর, ভাড়া দিয়া, উহা পাৎলুনের পকেটে রাখিতে গিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। সাহেবের তখন বিলক্ষণ মত্তাবস্থা—ব্যাগ পড়া খেয়াল করিতে পারেন নাই।

পিতার অনুরোধে ছোট সাহেব কানাইকে তাহার এই সাধুতার জন্য দুইটি টাকা বখশিস করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে, কানাইয়ের পশার এ বাড়ীতে খুব বাড়িয়া

গেল। ত ছাড়া নিজ কাজকর্ম্মেও দিন দিন সে বেশ নিপুণতা দেখাইতে লাগিল।

তেতলায় একটি মাত্র ঘর,—সেই ঘরে ছোট সাহেব শয়ন করিতেন। সে ঘরে বাড়ীর অন্য কেহ সচরাচর প্রবেশ করিত না। একদিন বড় সাহেব ছোট সাহেব আপিসে চলিয়া যাওয়ার পর, কানাই তাঁহাদের ঘর ঠিক করিতেছিল। ছোট সাহেবের ঘর ঠিক করিতে গিয়া হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল, আলমারির গায়ে চাবিটি লাগানো রহিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ আলমারি চাবিবন্ধ করিয়া, চাবি নিজের কাছে রাখিল।

কালীঘাটের বাসা হইতে আহার সারিয়া কানাই বেলা দুইটার সময় ফিরিয়া আসিত। আজ সে সময় ফিরিয়া দেখিল, বড় মেম সাহেব (ব্যানার্জ্জি সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা) নিজ শয়নকক্ষে দ্বার বন্ধ করিয়া রহিয়াছেন—দ্বিপ্রহরে তিনি কিয়ৎক্ষণ নিদ্রা গিয়া থাকেন। মিস বাবাও কলেজে রহিয়াছেন।

কি মনে করিয়া, কানাই তেতলায় গিয়া ছোট সাহেবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। চাবি লইয়া আলমারিটি খুলিল। থাকে থাকে পোষাক সজ্জিত রহিয়াছে। আলমারির মধ্যভাগে তিনটি দেরাজ। সেগুলি একে একে টানিয়া খুলিল। একটা দেরাজে লাল সুতায় গাঁথা এক তাড়া নোট রহিয়াছে। নোটগুলি গণিয়া দেখিবার জন্য সে উঠাইল, কয়েকখানি গণনাও করিল তার পর কি মনে করিয়া সেগুলি রাখিয়া দিয়া আবার দেরাজটি বন্ধ করিয়া দিল। লাল সুতাটি খুলিয়া গিয়াছিল, ইহা সে লক্ষ্য করে নাই। পোষাকগুলির পানে চাহিয়া তাহার বড় লোভ উপস্থিত হইল। এক প্রস্থ পোষাক নামাইয়া লইল। তার পর সেগুলি একটি একটি নিজ অঙ্গে পরিধান করিল। বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নেকটাই বাঁধিল। ভাল হইল না। কয়েকটা হ্যাট ছিল, তাহার মধ্যে পছন্দসই একটা লইয়া মাথায় দিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া খুসিতে তাহার মনটি ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, একটা কি যেন অঙ্গহানি হইতেছে। ঠিক ঠিক। ছোট সাহেবের সিগারেট একটা লইয়া তাহা ধরাইল। পাৎলুনের বাঁ দিকের পকেটে বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সিগারেট টানিতে টানিতে ঘরের মধ্যে গর্ব্বিত ভাবে পদচারণা করিতে করিতে, আয়নায় নিজ মূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল এবং হাসিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দ পাইয়া চমকিয়া দেখিল, ছোট সাহেবের জ্যেষ্ঠা সহোদরা দাড়াইয়া!

ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। মেমসাহেব রক্তিমনেত্রে কম্পিত স্বরে বলিলেন, 'বেয়ারা! আচ্ছা, সাহেবরা আসুন, তার পর মজা দেখতে পাবি!"—বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ছোট সাহেব বাড়ী আসিয়া ভগিনীর নিকট এই ব্যাপার শুনিয়া ত রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন। পিতার নিকট গিয়া তাঁহাকে সব কথা জানাইয়া বলিলেন, "বাবা আজই ওকে ডিসমিস্ করুন।"

ব্যানার্জ্জি সাহেব কন্যার নিকটও সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। শুনিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সে পোষাক ছিল কোথায়? আলমারির ভিতরে?"

"হ্যাঁ।"

"বেয়ারা চাবি পেলে কোথা?"

"চাবি, আমি আপিস যাবার সময় ভুলে আলমারিতে লাগিয়ে রেখে চ'লে গিয়েছিলাম।"

"আলমারিতে টাকাকড়ি কিছু ছিল নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল মাইনে পেলাম,—১৭০ টাকা সমস্তই ঐ আলমারিতে ছিল।"

"সে টাকা আছে কি না, খোঁজ করেছ?"

"আজ্ঞে না, দেখে আসি।"—বলিয়া তিনি উপরে গেলেন।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "না, টাকাকড়ি ঠিক আছে। তবে নোট-গুলো একসঙ্গে গাঁথা ছিল সেগুলো নিশ্চয়ই ও খুলেছিল,—এলোমেলো হয়ে রয়েছে!"

ব্যানার্জ্জি সাহেব হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "দেখ, ইচ্ছা করলে বেয়ারা সমস্ত টাকাগুলি চুরি ক'রে নিতে পারতো। নিয়ে, তোমার চাবি কোথাও ফেলে দিলে, ওকে ধরে কে? তুমি নিজেই মনে করতে চাবি তুমি কোথায় হারিয়ে ফেলেছ।—টাকা চুরির প্রলোভন সে জয় করেছে। শুধু আজ ব'লে নয়। সেবার গেটের কাছে তুমি তোমার পার্স ফেলে এসেছিলে, তাতে কুড়ি টাকা না পঁচিশ টাকা ছিল, ইচ্ছা করলে ও স্বচ্ছন্দে গাপ করতে পারতো, কিন্তু তা করেনি। পোষাক প'রে সাহেব সাজলে নিজেকে কি রকম দেখায়, তাই দেখার লোভটুকু মাত্র ও জয় করতে পারেনি। ওটা নিছক্ ছেলে-মানুষী বই আর কিছুই নয়। ওকে কি সেই জন্যে ডিসমিস্ করা ন্যায়বিচার হবে? তোমরাই বল।"

পুত্র কন্যা, পিতার মতে মত দিতে বাধ্য হইলেন। ব্যানার্জ্জি সাহেব তখন কানাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কৃত্রিম রোষে তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন। নিজ হাতে নিজ কাণ মলিয়া, নাকে খৎ দিয়া কানাই সে যাত্রা রেহাই পাইল।

তিন

ছোট মিস সাহেবের নাম বীণা ব্যানার্জ্জি। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। তাহার বয়স সতেরো বৎসর,—ডায়োসীজন কলেজের ছাত্রী। শাড়ী ও জুতা মোজা পরিয়া পদব্রজেই সে কলেজে যায়। কানাই তাহার বহি খাতাগুলি বহন করিয়া লইয়া যায়। এবং চারি ঘটিকার সময় কলেজে গিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসে।

কলেজে যাইবার পথে একদিন কানাই দেখিল, ইংরাজি পরিচ্ছদে এক বাঙ্গালী যুবক অপর দিক হইতে আসিতেছে। বীণাকে দেখিয়া সে টুপী তুলিল, এবং পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই এক মিনিট মাত্র কথা কহিয়া, তাহার হাতে একখানি চিঠি গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বীণা সে চিঠি ব্লাউজের বুকের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। ঠিক পরদিন সেই সময়ে সেই স্থানেই আবার সেই যুবকের সহিত দেখা। এবার বীণা তাহার সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া, তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল।

কানাই মনে মনে বলিল, 'কে এ লোকটা? কই কুঠীতে কোনও দিন আসে না ত!'—অথচ, মিস বাবাকে এ বিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করাও যায় না।

এইরূপে পত্র চালা-চালি মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। এ বিষয়ে কানাইয়ের কৌতূহলও ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

তার পর কিছু দিন আর সে সাহেবের দর্শন পাওয়া গেল না।

একদিন কলেজে যাইবার পথে বীণা বলিল, "দেখ বেয়ারা, তুমি ১১টার সময় খেতে বাড়ী যাও?"

কানাই বলিল, 'জী হুজুর।'

"তুমি আমার একটি কাজ করিতে পারবে? আমি তোমায় বখশিস্ দেবো।"

"কেন পারবো না হুজুর?"

"তোমার বাসা কালীঘাটে ত? টাউনসেণ্ড রোড জান?"

"জানি হুজুর, তানসেন রোট আমার পথেই পড়ে।"

"এই চিঠিখানি নাও। এই নম্বরে গিয়ে চিঠিখানি দেবে। যা জবাব পাও তা নিয়ে আসবে। কিন্তু, আমার এ চিঠি কিংবা সে জবাবের চিঠি, কেউ যেন দেখতে না পায়। জবাব এনে চুপি চুপি তুমি আমায় দিলে, আমি তোমায় বখশিস দেবো।"

"বহুৎখুব হুজুর"—বলিয়া কানাই সেলাম করিয়া, পত্রখানি লইয়া, নিজ পকেটের মধ্যে লুকাইল।

খাইতে ছুটি পাইয়া বাড়ী যাইবার সময় কানাই পদ্মপুকুরের বাগানে প্রবেশ করিল। খামের মুখ জলে ভিজাইয়া, চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িল। যা ভাবিয়াছিল, তাই। প্রেমপত্র। কয়েক দিন হইতে প্রণয়ী যুবক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী—তাই বিরহ জ্বরাক্রান্তা প্রণয়িনী অত্যন্ত উদ্বিগ্না। চিঠি পড়িয়া, হাসিয়া, কানাই মনে মনে বলিল, "ওরে ছুঁড়ি! ডুবে ডুবে জল খাস্ তুই!" আবার উহা খামে বন্ধ করিল। জলে ভেজা অংশটুকু যাহাতে ভাল করিয়া শুকাইয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে উহাতে রৌদ্র লাগাইতে লাগাইতে টাউনসেণ্ড রোডে পৌঁছিয়া যথাস্থানে উহা দিল। সাহেবের বেয়ারা আসিয়া বলিল, "কাল এই সময় এসে জবাব নিয়ে যেও।"•

পরদিন দ্বিপ্রহরে নিজ বাসায় যাইবার পথে, জবাব লইয়া, কানাই পত্রখানি বাসায় গিয়া উহা খুলিয়া পাঠ করিল।

আরও কয়েকদিন কানাইকে এইরূপ ভাবে পত্র বহন করিতে হইল। বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পত্র খুলিয়া সে পড়িল। উভয়ের পত্রগুলি হইতে ইহা সে জানিতে পারিল যে, এই সাহেব মিস বীণার পাণিপ্রার্থী হইয়া ব্যানার্জ্জি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাত্রের পিতা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ধোপা ছিলেন বলিয়া, ব্যানার্জ্জি সাহেব আপত্তি করেন। মৌখিক অবশ্য কন্যার অল্প বয়সের জন্য আপত্তি জানাইযাছিলেন। পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছিলেন। সুযোগ মত পলাইযা, চন্দননগরের গির্জ্জায় উভয়ে বিবাহিত হইবার পরামর্শ এখন ইহা-দের চলিতেছে। কানাইয়ের বেশ বর্কশিষ লাভ হইতে লাগিল।

প্রণয়ী সাহেব সুস্থ হইযা পুনরায় কলেজের পথে বীণার সহিত সাক্ষাৎ ও পত্র বিনিময় কবিতে লাগিলেন।

ক্রমে পূজার বন্ধ আসিল। ছুটির মধ্যে একদিন বীণা গোপনে কানাইয়ের হাতে একখানা ডাকের চিঠি দিয়া বলিল, বাড়ী যাবার সময় এই চিঠিখানি তুমি ডাকে ফেলে দেবে।'

কানাই চিঠিখানির ঠিকানা দেখিল, সেই প্রণয়ী সাহেবেরই নাম, তবে ঠিকানা চন্দন-নগর। খুলিয়া উহা সে পাঠ করিল। বীণা লিখিয়াছে, তাহার পিতা বাযু পরিবর্ত্তনের জন্য শীঘ্রই দেরাদুন যাইবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে সে পলাইয়া চন্দননগরে যাইবে বিবাহের সমস্ত যেন ঠিকঠাক করিযা রাখা হয়।—চিঠি জুড়িযা কানাই উহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিল।

চার

ব্যানার্জ্জি সাহেবের যাত্রার দুইদিন পূর্ব্বে কানাই আবার ডাকে ফেলিবার জন্য মিস বাবার ঐরূপ আর একখানি পত্র পাইল। পড়িয়া দেখিল, বীণা পলায়নের দিন স্থির করিয়া লিখিয়াছে—পিতার যাত্রাব তিন দিন পরে, বেলা একটা চল্লিশের গাড়ীতে সে হাওড়া হইতে রওয়ানা হইবে। সাহেব যেন চন্দননগর ষ্টেশনে উপস্থিত থাকেন।

এই পত্র পড়িয়া কানাই অত্যন্ত চটিয়া গেল। বুড়া বাপের অমতে, তাঁর মনে দুঃখ দিয়া, ধোপার ছেলেকে বিবাহ না করিলেই কি নয়? মনে মনে বলিল, "দাঁড়াও তোমায় জব্দ করছি আমি।" স্থির করিল, ইহা ডাকে দেওয়া হইবে না, ইহা সাহেবকে দেখানোই উচিত। পত্রখানি সে রাখিয়া দিল।

অন্যদিন রাত্রি ৯টায় সকলের ডিনার শেষ হইলে, কানাই ছুটি পায়। দশটা না

বাজিলে ব্যানার্জ্জি সাহেব শয়ন করিতে যান না। সাহেবের প্রবাস যাত্রার জন্য কাপড়-চোপড় গুছাইবার অছিলায় কানাই বাসায় গেল না।

রাত্রি ১০টা বাজিলে ব্যানার্জ্জি সাহেব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্য দিন কানাই তাঁহার তামাকু সাজিয়া পালঙ্কের পার্শ্বে রাখিয়া যায়, শয়নকালে ব্যানার্জ্জি সাহেব দেশলাই জ্বালিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া ল'ন। আজ নিজেই সে কলিকা ধরাইয়া আনিয়া, মনিবের শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া বলিল, "হুজুর, আমার বেয়াদপি মাফ করবেন, এই চিঠিখানি প'ড়ে দেখুন।"—বলিয়া চিঠিখানি বিছানার উপর রাখিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যানার্জ্জি সাহেব খামের উপর কন্যার হাতের লেখায় সেই যুবকের নাম দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ চিঠি কোথা পেলি তুই?"

কানাই বলিল, "মিস সাহেব এটা ডাকে লাগাবার জন্যে আমায় দিয়েছিলেন।"

ব্যানার্জ্জি পত্র উল্টাইয়া দেখিলেন উহা খোলা। পত্র পড়িতে পড়িতে ক্রোধে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। পাঠশেষে চিঠি হাতে প্রায় দুই মিনিট কাল তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই খুলেছিস বুঝি?"

"হুজুর! চিঠি প'ড়ে ভাবলাম, যাঁর নুন খাই, তাঁর কোনও অনিষ্ট জেনে শুনে হতে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য হবে না। তাই এ চিঠি ডাকে না লাগিয়ে হুজুরকে দেখাবার জন্যে রেখেছি।"

"তা বেশ করেছিস—এতে আমি তোর কাছে উপকৃত হলাম। না হয় খৃষ্টানই হয়েছি, বামুনের ছেলে হয়ে ধোবা জামাই প্রাণ থাকতে আমি করতে পারবো না। কিন্তু ভাল কথা, এ চিঠি তুই কাকে দিয়ে পড়িয়েছিস?"

"কাউকে দিয়ে পড়াইনি হুজুর। আমি নিজেই পড়েছি। শুধু এখানা নয়, দু'জনের অনেক চিঠিই আগে আমি পড়েছি। পালাবার পরামর্শ হচ্ছিল, তাও আমি জানতে পেরেছিলাম কিছু দিন আগে।"

"কিন্তু এ যে ইংরেজী চিঠি, তুই পড়লি কি ক'রে?"

"আমি একটু একটু ইংরেজী জানি হুজুর। আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি।"

"তুই ম্যাট্রিক পাস? তবে যে বলেছিলি, সামান্য বাংলা জানিস মাত্র।"

"গেল বছর পাস করেছি। একটা কেরাণীগিরি-টিরির চেষ্টাতেই আমি কলকাতায় আসি। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কোথাও কিছু জোটাতে পারিনি! শেষকালে ভাবলাম, দূর হোক, যে চাকরি পাই সেই চাকরিই করবো। হুজুরের বেয়ারার দরকার আছে শুনে, তাই হুজুরের কাছে এসে চাকরি প্রার্থনা করেছিলাম। লেখাপড়া শিখে বেয়ারার কাজ করবো, তাই নিজেকে মূর্খ ব'লে পরিচয় দিয়েছিলাম।"

"আচ্ছা, এখন তুই যা। তোকে বেয়ারার কাজ বেশী দিন আর করতে হবে না। ছুটির পর আপিস-টাপিস খুললে আমি তোর উপযুক্ত একটা চাকরি জুটিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।"

কানাই সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সাহেব বলিলেন, "হ্যাঁ, শোন্। এ চিঠির বিষয় কোনও কথা কারু কাছে যেন প্রকাশ করিসনে, বুঝলি!"

"না হুজুর—কারুর কাছে প্রকাশ করবো না।"—বলিয়া পুনরায় সেলাম করিয়া কানাই প্রস্থান করিল।

ব্যানার্জ্জি সাহেব একাকী দেরাদুন যাইবেন ব্যবস্থা ছিল, কন্যা বীণাকেও তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন। বীণা অনেক ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু সে সব কথায় তিনি কর্ণপাত করেন নাই।

দেরাদুন হইতে ফিরিয়া বীণাকে তিনি কলেজের বোর্ডিং-এ ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

কানাইকে তিনি ত্রিশ টাকা বেতনের একটা কেরাণীগিরি জুটাইয়া দিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে বীণার প্রণয়ী বিশ্বাসঘাতকতা করিল। টাকার লোভে সে অপর এক দেশীয় খৃষ্টান ভদ্রলোকের কুৎসিত কন্যাকে বিবাহ করিল।

বীণা শুনিয়া প্রথমটা খুবই কাঁদাকাটা করিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে সে সামলাইয়া লইল। বৎসরখানেক পরে, ব্যানার্জ্জি সাহেব নির্ব্বিঘ্নে নিজ মনোমত পাত্রে বীণাকে সম্প্রদান করিলেন।

পরের চিঠি

আহারাদি করিয়া, ধড়াচূড়া পরিয়া, বেলা ১১টার সময় সাব-ডেপুটিবাবু কাছারি রওয়ানা হইলেন। তাঁহার ভার্য্যা মণিকা দেবী তখন চুল খুলিয়া উহাতে চিরুণী দিতে দিতে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

মণিকার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ, সবেমাত্র এক বৎসর বিবাহ হইয়াছে। মণিকা বেথুনে আই-এ পড়িতেছিল, বিবাহ হইয়া পড়া বন্ধ হইল। স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ দেব, জাতিতে কায়স্থ, বয়স ২৭ বৎসর, বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, তবে রঙটি মণিকার মত ধব্‌ধবে নহে,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই বলিতে হইবে। সুরেনবাবু ইংরাজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম-এ, তাহার উপর একজন সুকণ্ঠ গায়ক। মণিকার মনে স্বামিসৌভাগ্য-গর্ব্বের অন্ত নাই।

কৈশোর কাল হইতে উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া দাম্পত্য প্রেমের একটা উচ্চ আদর্শ মনের মধ্যে মণিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস, প্রত্যেক মানুষ জীবনে একবার মাত্র ভালবাসিতে পারে। যদি কেহ প্রথমা স্ত্রীকে ভালবাসিয়া, তাহার মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করে, তবে সেই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর প্রতি তথাকথিত ভালবাসা জাল ও জুয়াচুরি মাত্র। উহাতে দেহের মিলন হয় বটে, প্রাণের মিলন, আত্মার মিলন অসম্ভব। মণিকার পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ;—সুশিক্ষিত এবং আধুনিক ভাবাপন্ন। সংসার খুব স্বচ্ছলের না হইলেও, কষ্টে সৃষ্টে মেয়েকে পড়াইতেছিলেন। মেয়ের রূপ আছে, তাহার উপর বিদ্যা-সংযোগ হইলে, কালে এমন কি একটা সিভিলিয়ন জামাতা জুটিয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে, ইহাই ছিল তাঁর মনের গোপন আশা। কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলেন, বিলাত-ফেরৎ হইলে কি হইবে? চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী! সে শ্রেণীর পাত্রের দর অতিরিক্ত চড়া। চারি অঙ্কে কুলায় না, পাঁচ অঙ্ক আবশ্যক। তাই অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া একটি উচ্চপদস্থ দ্বিতীয়পক্ষ পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। বয়স তাহার এমন কিছু বেশী নয়, সন্তান সন্ততিও ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ শুনিয়া মণিকা এমন বাঁকিয়া বসিয়াছিল যে, সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। অবশেষে সাব-ডেপুটি সুরেন্দ্রনাথের হস্তেই তিনি কন্যাদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু এক্ষণে রঙ্গপুরে কার্য্য করিতেছেন।

স্নান সারিয়া, মণিকা ঝিকে আদেশ করিল, "বামুনঠাকুরকে বল্‌ আমার ভাত বেড়ে নিয়ে আসতে।"

আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে মণিকা একটা বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা হস্তে সোফায় অঙ্গ ঢালিল। এখানি "তরুণ" দলের কাগজ। মণিকা একটা গল্প পড়িতে আরম্ভ করিল। স্বামিপ্রেম-বঞ্চিতা এক তরুণী গোপনে কিরূপ ভাবে পুরুষা-

ন্তরের সহিত প্রেম করিয়াছিল তাহারই বর্ণনা। কিছুদিন পরে স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে স্বামীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন সেই সেকেলে সঙ্কীর্ণমনা নরপশুটা মাঝে মাঝে অসময়ে অতর্কিতে গৃহে আসিয়া দেখিত স্ত্রী কি করিতেছে! এই ভাবে লাঞ্ছিতা অপমানিতা তরুণী অবশেষে স্বামীর নামে সমাজতত্ত্বঘটিত খুব উচ্চ দরের চিন্তাপূর্ণ একটা পত্র লিখিয়া রাখিয়া, গৃহত্যাগ করিয়া তাহার প্রণয়ীর গৃহে গিয়া আশ্রয় লইল এবং তথায় নিজ "নারীত্ব সফল" করিতে লাগিল। গল্পটা পড়িয়া ঘৃণায় মণিকার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রেমে অমন অভিশাপ লাগেনি।"

গল্পের শেষাংশ পাঠ করিতে করিতে মণিকার চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। গল্প শেষ করিয়া, মাসিকপত্রখানি পার্শ্বস্থ টেবিলে রাখিয়া মণিকা সেই সোফাতেই একটু গড়াইবার আয়োজন করিতেছে,—এমন সময় বাংলোর হাতায় একটা গাড়ী প্রবেশ করিবার শব্দ শুনিতে পাইল। কে আসিল? ইন্‌স্পেক্টারবাবুর স্ত্রী? যদুবাবু উকিলের স্ত্রীও হইতে পারেন। কিন্তু সিঁড়িতে পদশব্দ উঠিল—তার স্বামীর। মণিকা দেওয়াল-ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল, বেলা সবে তখন দেড়টা। পাঁচটার পূর্ব্বে স্বামী ত কোনও দিন ফেরেন না, তবে আজ এমন অসময়ে কেন? সে মনে মনে হাসিয়া বলিল, "ওগো, আমার নারীত্ব বিফল হয়নি। তোমার গোয়েন্দাগিরির কোনও দরকার নেই!"

পদশব্দ হঠাৎ অত্যন্ত মৃদুভাব ধারণ করিল। মণিকা বেশ বুঝিতে পারিল, আগন্তুক সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছেন। সত্যই তবে এটা গোয়েন্দাগিরি নাকি? অবশেষে সুরেনবাবু ভেজানো দুয়ারটি আস্তে আস্তে ফাঁক করিলেন। তারপর ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "কি গো, তুমি এখনও ঘুমোওনি? পাছে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায় সেই ভয়ে আমি পা টিপে টিপে আসছি।"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

মণিকা সপ্রেম দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল। বলিল, "আজ হঠাৎ এমন অসময়ে যে?"

"হঠাৎ সাহেবের হুকুম হল, একটা সরেজমিন তদন্তের জন্যে বাইরে যেতে হবে। ৩টের গাড়ীতেই রওয়ানা হতে হবে।"

"কোথায়?"

"তিস্তা জংসন থেকে নেমে ১২ মাইল। তুমি যাবে? চল না বেড়িয়ে আসবে। সেখানে ছোটখাট রকমের একটা ডাকবাংলা আছে।"

মণিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, আমাকে বাড়ীতে একা রেখে যেতে তোমার অবিশ্বাস হয় নাকি?"

"অবিশ্বাস? তোমাকে? তোমার প্রতি যেদিন অবিশ্বাস হবে সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয়।"—বলিতে বলিতে তিনি স্ত্রীর পাশে সোফায় বসিলেন।

মণিকা রাগিয়া স্বামীর গালে একটা ঠোনা মারিয়া বলিল, "আহা! কথার ছিরি দেখ না পুরুষের! খুব রসিকতা হল, না?"

"রসিকতা আমি করলাম? না তুমি করলে?"

"আমিও করিনি। দেখ, ঐ হতভাগা মাসিকপত্রের একটা হতভাগা গল্প আমার মাথার ভিতরে ঘুরছিল। আমি যেতাম গো, তোমার সংগে গিয়ে এই বাহের দেশের পাড়া-গাঁ দেখে আসতাম। কিন্তু শরীরটে কেমন ভাল ঠেকছে না।"

"কেন, আবার জ্বর করবে নাকি?"

"কি জানি!"

"তাই ত! ভারি মুস্কিল করলে যে! স্নানটা আজ বাদ দিলেই হত! কিন্তু আমার ত না গেলেই নয়!"

"তুমি এস গিয়ে। ও আমার কিছু নয়! রাত্রে একটা উপোস দেবো না হয়। চল তোমার গোছ-গাছ ক'রে দিইগে।"

গোছগাছের বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। দুই একদিনের জন্য টুরে যাইবার বস্ত্রাদি একটা সুটকেসে গোছানই থাকিত। গৃহভৃত্য ও আর্দ্দালিতে মিলিয়া বিছানা বাঁধিয়া ফেলিল। আর্দ্দালি ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া আনিল। বিছানা, সুটকেস ও জলের সোরাই সহ সাব-ডেপুটিবাবু ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলিয়া গেলেন, পরশু দুপুরবেলা নাগাইদ ফিরিয়া আসিবেন।

সেইদিন বৈকালে ধোবা আসিল। গতবারে তাড়াতাড়িতে ধোবাকে দেওয়া কাপড়ের তালিকা লিখিয়া রাখা হয় নাই—তবে কোন্ কোন্ কাপড় গিয়াছে তাহা মণিকার বেশ মনে ছিল। মণিকা কাপড়গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, "বাবুর একটা এণ্ডির কোট গিয়েছিল যে! সেটা আনিসনি?"

ধোবা বলিল, "না মা, এ ক্ষেপে ত যায়নি।"

মণিকা বলিল, "গিয়েছিল বইকি। আমার মনে হচ্চে।"

ধোবা সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল। বলিল, উহা গত মাসে গিয়াছিল, এবং যথাসময়ে সে উহা দিয়াও গিয়াছে, মা খুঁজিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই উহা বাড়ীতেই পাইবেন।

মণিকা বলিল, "আচ্ছা আমি খুঁজে দেখবো। কিন্তু যদি না পাই তা হলে তোমার হিসেব থেকে দাম কাটা যাবে বাপু!"

দুই

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মণিকা দেখিল, মাথাটা কেমন ভার ভার, চোখ দুটাও জ্বালা করিতেছে। চা-পান শেষ করিয়া সে স্বামীর এণ্ডির কোটের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল। শয়নকক্ষের আলমারি ট্রাঙ্ক প্রভৃতি খোঁজা শেষ হইলে, অপর এক কক্ষে একটা কালো রঙের সুটকেসের প্রতি মণিকার নজর পড়িল;—তখন তাহার স্মরণ হইল, ঐ সুটকেস ত কোনও দিন সে খোলে নাই, উহাতে কি আছে তাহাও সে অবগত নহে। নাড়িয়া দেখিল, উহা ভারি মন্দ নহে, বস্ত্রাদি থাকাই সম্ভব। সেই এণ্ডির কোট স্বামী যদি উহার ভিতর রাখিয়া থাকেন! কিন্তু উহার চাবি কই? যে রিঙে অন্যান্য চাবি রহিয়াছে, সে রিঙে উহার চাবি ত নাই! সে রিঙের সব চাবিই ত মণিকার সুপরিচিত। আর একটা রিঙ আছে, উহাতে স্বামীর আফিসের চাবি থাকে। উহা শয়নঘরে শেল্ফের উপর থাকে, আপিস যাইবার সময় স্বামী উহা প্যাণ্টলুনের পকেটে পুরিয়া লইয়া যান। মণিকা শয়নঘরে গিয়া সেই রিঙ লইয়া আসিয়া, দুই তিনটা চাবি লাগাইতেই কলটা খুলিয়া গেল।

সুটকেসের ভিতর হইতে কয়েকটা পুরাতন কাপড় জামার তলেই বাহির হইল, সিল্কের রুমালে বাঁধা কতকগুলি চিঠি। কোনওখানিরই খাম নাই। স্ত্রীলোকের সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি, স্বাক্ষর স্থানে "তোমারই মনোরমা।" রুমালখানি সহ চিঠির বাণ্ডিলটি বাহির করিয়া লইয়া, সুটকেস বন্ধ করিয়া মণিকা শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সোফায় বসিল। চিঠিগুলি কোলের উপর রাখিয়া, পড়িবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

কার চিঠি কে জানে! তবে, স্বামীর সুটকেসের মধ্যে আর কার চিঠি থাকিবে? পরের চিঠি পড়া কি উচিত?—কিন্তু স্বামী কি পর? স্বামী যে তার অন্তরের অন্তরতম দেবতা। তারা দু'জনে যে এক প্রাণ এক আত্মা, দেহই কেবল ভিন্ন। না না, পর তিনি কখনই নহেন। মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়া, অবশেষে মণিকা মাঝখান হইতে

একখানি চিঠি টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

পত্রখানির আরম্ভ ভাগ পড়িয়াই মণিকার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ কি, এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! চিঠিতে তারিখ দেখিল, তার বিবাহের পূর্ব্বের তারিখ। রচনায় ভাষার ভুল নাই, বানান ভুল নাই,—কোনও শিক্ষিতা মেয়ের হস্তাক্ষর। তবে, বিবাহের পূর্ব্বে স্বামী কি অন্য কাহারও সংগে প্রেমে পড়িয়াছিলেন? উঃ—কি সর্ব্বনাশ!

পত্র শেষ করিয়া মণিকার মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। আর একখানি খুলিয়া পাঠ আরম্ভ করিল। পরস্পরের অটুট অনাবিল গভীর প্রেমের পরিচায়ক। মনোরমার পিতা-মাতা কিন্তু এ বিবাহে সম্মতি দিবেন কি না, সে বিষয়ে আকুল আশঙ্কা। পড়িয়া মণিকার কান্না আসিতে লাগিল।

তৃতীয় পত্রে, পিতা-মাতা মত করিলেন না ইহাই প্রকাশ। আজীবন উভয়ের কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বনে, জন্মান্তরে মিলন প্রতীক্ষায় এ জীবন যাপনের প্রস্তাব। মণিকার চক্ষু হইতে ঝর ঝর ধারায় অশ্রু বহিল।

ঝি আসিয়া বলিল, "মা, ১১টা যে বাজতে চলল,—চান করবে না?"

মণিকা চক্ষু মুছিয়া ধরা গলায় বলিল, "না স্নান করবো না, শরীরটে আজ ভাল বোধ হচ্চে না।"

"তা হলে. বামুন ঠাকুরকে ভাত বাড়তে বলি?"

"না, খেতেও ইচ্ছে নেই।"

ঝি কাছে আসিয়া হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "গা যে গরম হয়েছে দেখছি। ওমা, জ্বর করবে নাকি? বাবুও যে বাড়ী নেই! কি হবে গো মা!"

আর কোনও পত্র পড়িতে মণিকার প্রবৃত্তি হইল না। সবগুলি গুছাইয়া বাঁধিয়া মণিকা এখন বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল. ঝির কথা মিথ্যা নয়, জ্বরই আসিতেছে বটে।

মণিকা তখন চিঠির বাণ্ডিল আলমারিতে তুলিয়া রাখিয়া শয্যায় উঠিয়া শয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে খুব কম্প দিয়াই জ্বর আসিল। ম্যালেরিয়া। রঙ্গপুরে আসিয়া আর একবার সে এইরূপ জ্বরে পড়িয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবুর স্ত্রী কল্যাণী বেলা দুইটার সময় বেড়াইতে আসিয়া দেখেন. এই ব্যাপার! মণিকা তখন বেহুঁস। তিনি তখনই বামুন ঠাকুরকে কাছারিতে পাঠাইয়া নিজ স্বামীকে ডাকাইয়া আনিলেন। ইন্‌স্পেক্টরবাবু আসিয়া, স্ত্রীর নিকট সাব-ডেপুটি-গৃহিণীর অবস্থার কথা শুনিয়া, নিজেই ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ দিলেন, বলিলেন, "কোনও ভয় নেই. ম্যালেরিয়া জ্বর। সহরে জ্বরটা আজকাল খুবই হচ্ছে।"

পরদিন বেলা ২টার সময় সাব-ডেপুটিবাবুও ফিরিলেন।

তিন

এক সপ্তাহ অবিশ্রান্ত শুশ্রূষার পর গতকল্য হইতে মণিকার জ্বরটা ছাড়িয়াছে। আজ সে দু'খানা সুজির রুটি খাইবে। বলা বাহুল্য সে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সুরেনবাবু তাহার মুখধোয়ানো শেষ করিয়া ঔষধ পান করাইয়া দিয়াছেন। খোলা জানালার কাছে সোফা টানিয়া, দুই তিনটা কুশনে ঠেস দিয়া তাহাকে বসাইয়াছেন। বুক অবধি একটা পাৎলা শাল চাপা। সুরেনবাবু পার্শ্বে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

বেলা ৯টা বাজিলে মণিকা গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি আর কতদিন আফিস কামাই করবে?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আমি যে তিন মাসের ছুটি নিয়েছি।"

"তিন মাসের! তুমি কি মনে করেছিলে আমার এদিক ওদিক যা হোক একটা কিছু হ'তে তিন মাস লেগে যাবে?"

"এদিক—আবার 'ওদিক' কেন?"—বলিয়া সুরেনবাবু শাস্তি স্বরূপ পত্নীর গাল টিপিয়া দিলেন। তার পর বলিলেন, "রঙপুরে থাকবার আর ইচ্ছে নেই। যে ম্যালেরিয়া! তিন মাস ছুটি নিলে অন্য জায়গায় বদলি ক'রে দেয় কিনা, তাই তিন মাসের ছুটিই নিয়েছি। তুমি একটু সেরে উঠলেই আমি তোমায় দার্জ্জিলিঙে নিয়ে যাব হাওয়া বদলাতে। এপ্রিল মাসে লাট সাহেবের দপ্তরও দার্জ্জিলিঙ যাবে। সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা ক'রে আলিপুরে বদলি হবার চেষ্টা করবো।"

মণিকা ক্লান্তভাবে বলিল, "কেন, তোমার মনোরমা আলিপুরে থাকে নাকি?"

সুরেনবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার মনোরমা? আমার মনোরমা আবার কে? কি বলছো তুমি?"

মণিকা স্বামীর পানে না চাহিয়া ক্লান্তস্বরে বলিল, "মনোরমা—তোমার ভালবাসা গো! আজকাল সে আর তোমায় চিঠি লেখে না? চিঠি এখন আপিসের ঠিকানায় আনাও বুঝি? ওহো, তুমি কৌমার্য্য ব্রত ভঙ্গ করেছ কিনা, সেই রাগে মনোরমা আর বোধ হয় চিঠি লেখে না তোমায়, না?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "এ সব কি তুমি ভুল বকছো বল দেখি? মনোরমা ব'লে কোনও জন্মে আমার কোনও ভালবাসাও ছিল না, কেউ আমায় চিঠিও লেখে না।"

মণিকা বলিল, "বিয়ের পর থেকে তোমায় কতবার আমি জিজ্ঞাসা করেছি, হ্যাঁ গা, আমি ছাড়া তুমি কোনও দিন আর কাউকে কি ভালবেসেছিলে? তুমি বরাবর উত্তর করেছ—স্বপ্নেও না। আমি আগে মনে করতাম তুমি সত্যবাদী। এখন দেখছি সেটা আমার ভুল। আমি তোমার চিঠি দেখেছি। নিজে পড়েছি।"

"আমার চিঠি? কাকে চিঠি লিখেছি আমি? কোথা সে চিঠি?"

"তুমি লেখনি। তোমার মনোরমা তোমায় লিখেছিল। তোমার সুটকেসের ভিতরে ছিল। যত্ন করে রেশমী রুমালে তুমি বেঁধে রেখেছিলে মনে নেই? এক গাদা চিঠি। ভয় নেই, বেশী পড়িনি আমি, তিন চারখানা মাত্র পড়েছি। আর পড়তে ভাল লাগলো না।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আমার সুটকেসের ভিতর কারু কোনও চিঠি ত কোনও দিন ছিল না। কই সে চিঠি?"

"যে সুটকেস তুমি টুরে নিয়ে যাও, সে সুটকেস নয়। যে সুটকেসটা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে ও-ঘরে! তুমি যেদিন টুরে যাও, তার পরদিন সকালে তোমার এণ্ডির কোট খুঁজতে গিয়ে আমি সেই সুটকেস খুলে সেই সব চিঠি দেখতে পাই।"

সুরেনবাবু আর বাক্যব্যয় মাত্র না করিয়া, তাড়াতাড়ি গিয়া সেই সুটকেস হাতে করিয়া লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সুটকেসের মধ্যে চিঠি ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এ সুটকেস ত আমার নয়!"

"ঐ যে ডালায় তোমার নামের অক্ষর ছাপা রয়েছে—S. D.!"

সুটকেস মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া, সুরেনবাবু স্ত্রীর পানে চাহিয়া হা হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। দীর্ঘ এবং উচ্চ হাসি। তাঁহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া মণিকা একটু বিরক্ত হইল। বলিল, "ও সুটকেস তোমার নয় ত কার তবে শুনি!"

কষ্টে হাসির বেগ সম্বরণ করিয়া সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা আমি কি তোমায় বলিনি যে আমার একজন বন্ধু আছে তার নাম শরৎ দত্ত?"

"যে কাশ্মীরে চাকরি করতে গেছে?"

"হ্যাঁ। আমি কি তোমায় বলিনি যে কলকাতায় সে টিউশনি করতে করতে ল আর এম-এ পড়তো?"

"বলেছ।"

"আমি কি তোমায় বলিনি, যে ব্রাহ্ম মেয়েটিকে সে পড়াতো, তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়ের বাপ-মাও রাজি হয়নি, আর শরতের বাপ তাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়?"

"হ্যাঁ, সে কথাও বলেছ।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আর এ কথাও বোধ হয় তোমায় বলেছি যে, এখানকার কলেজে একটা মাষ্টারির চেষ্টায় সে এসে আমার বাসায় দিন কয়েক ছিল—তখনও তোমার সঙ্গে আমায় বিয়ে হয়নি।"

"কই আমার মনে পড়ে না।"

"ও সুটকেস তারই। এখানকার সে মাষ্টারি চাকরিটা হল না। যাবার সময় সুটকেসটা এখানে সে ভুলে ফেলে কলকাতায় চ'লে যায়। আমি তাকে ওটা রেল পার্শ্বেলে পাঠিয়ে দিতেও চেয়েছিলাম। সে লিখলে কাশ্মীরে একটা চাকরি পেয়ে সে রওয়ানা হচ্চে; ওতে বিশেষ দরকারী জিনিষ তার কিছু নেই,—আমার কাছেই রেখে দিতে বলে,—পরে এসে নেবে।"

মণিকা কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। শেষে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি!"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এ সুটকেস তুমি খুললে কি ক'রে? এর চাবি ত আমাদের কাছে নেই!"

মণিকা বলিল, "কেন, তোমার আপিসের রিঙে এর চাবি ছিল। আমি ভেবেছিলাম, পাছে আমি ও সুটকেস কোনও দিন খুলি, সেই ভয়ে ওর চাবি তুমি বাড়ীর রিঙে রাখনি।"

সুরেনবাবু চাবির রিং লইয়া আসিয়া বলিলেন, "কোন্‌টা?"

মণিকা একটা চাবি বাছিয়া বলিল, "এইটে বোধ হয়।"

"এটা ত আমার আপিসের একটা টানার চাবি।"—বলিয়া সেই চাবি দিয়া সুটকেস খুলিলেন। কাপড় জামা হাঁটকাইতে হাঁটকাইতে দুইখানা বহি এবং একটা খামে ভরা খানকতক সার্টিফিকেট বাহির হইল। বহিগুলিতে ইংরাজিতে নাম লেখা এস ডট্‌। সার্টিফিকেটগুলি কলেজের প্রোফেসারদের লিখিত। তাহাতে পুরা নাম শরৎচন্দ্র দত্তই লেখা আছে। সেগুলি স্ত্রীকে দেখাইয়া সুরেনবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "হুজুরাইন ধর্ম্মাবতার, আমার এই সাফাই সাক্ষীগুলির এজেহার কি আপনি বিশ্বাস করছেন না?"

হুজুরাইন রায় প্রকাশ করিলেন—"যাও, তুমি বে-কসুর খালাস।"

বাপকী বেটী

এক

বৈশাখ মাস। আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়ীতে, মিষ্টার জি· লাহিড়ী বার-এট-ল (পুরো নাম গিরীন্দ্রনাথ লাহিড়ী) সন্ধ্যার পর পায়জামা সুট পরিধান করিয়া, দ্বিতলের খোলা বারান্দায় ঈজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। একটা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে, দুই এক পেগ হুইস্কি পান করিয়া ডিনারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার

বেয়ারা. একটা কলাই করা ট্রের উপর একখানা চিঠি আনিয়া, টেবিলের উপর তাঁহার সামনে রাখিয়া প্রস্থান করিল। চিঠিখানি পড়িয়া লাহিড়ী সাহেব ডাকিলেন, "সরযূ—ও সরযূ—শোন!"

তাঁহার পত্নী মিসেস লাহিড়ী এই আহ্বানে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কেন?"

"সুরেশের মুহুরি কি চিঠি লিখেছে দেখ।"—বলিয়া লাহিড়ী সাহেব পত্রখানি পত্নীর হস্তে দিলেন।

সরযূ পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন, "তাই ত! সুরেশবাবুর এমন অবস্থা? পরশুও ত তুমি তাঁকে দেখে এসে বললে, অনেকটা ভাল। তা তুমি কি এখনই বেরুতে চাও? ডিনার খেয়ে গেলে হত না? তৈরী প্রায়। সেখানে গিয়ে কি অবস্থা দেখবে, ফিরতে কত রাত হবে, বলা ত যায় না!"

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "না, দেরী ক'রে দরকার নেই। দেখছ না, লিখেছে, এখন-তখন অবস্থা। আমি এখনই যাই, ফিরে এসেই ডিনার খাব। তোমরা বরং খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দিও। এই বেয়ারা—একঠো ট্যাক্সি বোলাও—জল্‌দি।"

"বহুৎখুব"—বলিয়া বেয়ারা ট্যাক্সি আনিতে গেল।

মিসেস লাহিড়ী নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন. "আহা সুষমা ছুঁড়ির অদৃষ্টটা দেখ একবার! বিয়ের পর দু'বছর যেতে না যেতেই স্বামী গেল। মা ত আগেই গিয়েছিল, বাপও চলল! কি যে দশা হবে মেয়েটার কে জানে! আত্মীয়স্বজন কে কে আছে?

বাগবাজারে সুষমার মামারা আছে। সুরেশ তার শ্বশুরবাড়ীতে থেকেই কলেজে পড়তো কিনা। তারপর, আমি গেলাম ব্যারিষ্টারি পড়তে, সুরেশ ল-কলেজ জয়েন করলে।"

"ওর শ্বশুরবাড়ীতে?"

"শ্বশুর শ্বাশুড়ী ত আগে থেকেই ছিল না। দেওর ভাসুর-টাসুর আছে বোধ হয়। কিন্তু সে কি এখানে? মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর গ্রামে। তাদের সংসারে গিয়ে পড়লে বউকে তারা ফেলতে পারবে না বটে। কিন্তু সুষমা লেখাপড়া গান বাজনা জানা নব্যতন্ত্রের মেয়ে, সেখানে বাস করা কি ওর পোষাবে? বিশেষ তারা গরীব গৃহস্থ। ও সেখানে গিয়ে তাদের ঘরও নিকাতে পারবে না, ধানও সিদ্ধ করতে পারবে না।"

মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "দেখ. এইগুলো কিন্তু বাপ মায়েদের ভারি অন্যায়। মেয়েকে যদি কলেজে পড়িয়ে মেমই ক'রে তুললি, তা হলে সেই রকম ঘর বরে তাকে দে—গরীবের ঘরে দিস্ কেন?"

"গরীবের ঘরে কি আর সাধে লোকে মেয়ে দেয়?—টাকার জোর না থাকলে কাজেই দিতে হয়। ওকালতী ব্যবসাতে কোন দিন তেমন সুবিধে ত করতে পারেনি! তবে বাঙ্গালী ষ্টাইলে থাকে, খরচপত্র কম. এই যা সুবিধে। নইলে অবস্থা ত সুরেশের আমারই মত! তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে বইত নয়!"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল ট্যাক্সি আসিয়াছে। লাহিড়ী সাহেব বেশ-পরিবর্ত্তন না করিয়াই, সেই পায়জামা সুটের উপরেই একটা ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ট্যাক্সির নিকট গিয়া দেখিলেন, পত্রবাহক ভৃত্য সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুই এখনও রয়েছিস? আচ্ছা গাড়ীতে ওঠ্, ড্রাইভারের পাশে বোস্।"—বলিয়া নিজেও আরোহণ করিয়া আদেশ দিলেন, "বৌবাজার।"

ট্যাক্সি ছুটিল। এই সময় লাহিড়ী সাহেবের ঘর গৃহস্থালীর কথা কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখি। আজ প্রায় বিশ বৎসর তিনি ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। তাঁহার নিজ মুখেই প্রকাশ, তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে রিসিভারি কর্ম্ম পান। স্ত্রীকও

মাঝে মাঝে দুই চারিটা যে না পান, এমন নহে। কিন্তু পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানার খরচ তাহাতে পোষায় না। বাড়ীখানি তাঁহার নিজের নহে,—ভাড়ার। মোটর কিনিতে পারেন নাই, ট্যাক্সিতে আদালত যান। গৃহে তাঁহার স্ত্রী মাত্র। কোনও সন্তানাদি জীবিত নাই। একটা বাসনমাজা জলতোলা চাকর এবং একটা বেয়ারা আছে। ঝিকে ঘাগরা পরাইয়া তাহাকে আয়া বানাইয়াছেন। বাবুর্চ্চি আছে কিন্তু রাঁধে সে দিনেরবেলায় ভাত, ডাল, "ছেঁচকি কারি", মাছের ঝোল—বাঙ্গালীর খাদ্য সবই রাঁধে। তবে সব ব্যঞ্জনেই পেঁয়াজ দেয়, মায় মাছের ঝোলে পর্য্যন্ত। রাত্রে লুচি ভাজে, বেগুন ভাজে, কোনও দিন বা মাছের, কোনও দিন বা পাঁঠার কালিয়া রাঁধে, ফাউল কারিও মাঝে মাঝে রাঁধে। সে সকল রান্না, ডিশের ভিতর ভরিয়াই টেবিলে আসে,—ছুরি কাঁটা চামচের সাহায্যেই ভক্ষিত হয়। মৃত্যুপথযাত্রী বাল্যবন্ধু সুরেশবাবুও মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া খাইয়া যাইতেন। সুরেশবাবু কুসংস্কারবর্জ্জিত আধুনিক হিন্দু। ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লেখান নাই সে হিসাবে লাহিড়ী সাহেবও হিন্দু। তবে তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়া, রাঢ়ী শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন—অবশ্য হিন্দুমতেই। আজকাল ত অনেকেই বলিতেছেন, ইহাতে জাতি যায় না এবং না যাওয়াই ত উচিত।

দুই

বৌবাজারে বন্ধুগৃহে পৌঁছিয়া লাহিড়ী সাহেব দেখিলেন, সুরেশবাবুর দেহ যেন শয্যার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। কন্যা সুষমা পিতার পদতলে পাষাণ-প্রতিমার মত বসিয়া। শয্যাপার্শ্বে চেয়ারের উপর একজন ডাক্তার এবং দুইজন বন্ধু—ইঁহারাও হাই-কোর্টের উকিল, লাহিড়ী সাহেবেরও পরিচিত। কিয়দ্দূরে, মাদুর পাতিয়া বসিয়া সুরেশবাবুর মুহুরী প্রৌঢ়বয়স্ক হরনাথ চক্রবর্ত্তী। ভৃত্য তাড়াতাড়ি লাহিড়ী সাহেবের জন্য একখানি চেয়ার আনিয়া দিল।

লাহিড়ী নিম্নস্বরে একজন উকীল বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুচ্চেন ?"

"হ্যাঁ,—একটু আগেও জিজ্ঞাসা করছিলেন, লাহিড়ী এখনও এল না ? উইল করেছেন, আপনাকেই তার এক্জিকিউটার করেছেন। মুখে আপনাকে কিছু বলে যাবেন, সেই জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছেন।"

"ডাক্তার কি বলছেন ?"

"আজ রাত কাটার আশা কম।"

নিদ্রিত বন্ধুর মুখপানে কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে লাহিড়ী সাহেব উঠিলেন। ইঙ্গিতে সুষমাকে ডাকিয়া, তাহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গেলেন।

সোফার উপর নিজ পার্শ্বে সুষমাকে বসাইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "মা, সব বুঝছ ত ?"

সুষমা এবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "কি হবে জ্যেঠামশাই ?"

লাহিড়ী সাহেব সুষমার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কেঁদ না মা, চুপ কর। ঈশ্বর যা করবেন, তাই হবে। তোমার মামাদের খবর দেওয়া হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, বড়মামার কাছে মুহুরীবাবুকে পাঠিয়েছিলাম।"

"কবে ?"

"আজ বেলা দুটোর পর। তার আগে ত বিশেষ কোনও ভয় আছে বলে জানতে পারিনি।"

"মামারা কি বলেছেন ? এখনও এলেন না ?"

"সন্ধ্যার পর আসবেন বলে দিয়েছেন।"

এই সময় উকিল বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "আসুন মিস্টার লাহিড়ী, সুরেশবাবু জেগেছেন।"

লাহিড়ী তাড়াতাড়ি রোগীর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। চেয়ারে বসিয়া বন্ধুর একখানি হাত নিজ দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিলেন, "কেমন আছ ভাই, এখন?"

সুরেশবাবু কোনও উত্তর না করিয়া, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া লাহিড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লাহিড়ী আবার বলিলেন, "কোন কষ্ট হচ্চে কি?"

রোগী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কষ্ট? কই? হ্যাঁ। গিরীন, ভাই, আমি ত চললাম। একটা বিশেষ কথা—কি একটা কথা ছিল! হ্যাঁ—তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।"

একজন উকিল বন্ধু দাঁড়াইয়া উঠিয়া অপর সকলকে বলিলেন, "চলুন না, আমরা একটু ও ঘরে যাই।"

রোগী ধীরে ধীরে একটি শীর্ণ হস্ত তুলিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "না—না—কেউ যেও না। থাকো।"

উকিলবাবু আবার বসিলেন।

রোগী তখন কন্যার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "জল।"

সুষমা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া, ফীডিং কাপের সাহায্যে পিতাকে পান করাইয়া দিল।

জলপান করিয়া, রোগী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "গিরীন, ভাই, আমার সুষীকে আমি তোমার জিম্মায় দিয়ে যেতে চাই। ওর ভার তুমি নিতে পারবে ভাই?"

লাহিড়ী বলিলেন, "নিশ্চয়! ও যেমন তোমার মেয়ে, তেমনি আমারও মেয়ে। আমার ত কোনও সন্তানাদি নেই, আমি ওকে নিজের মেয়ের মতন করেই পালন করবো, তার জন্যে তুমি কিছু ভেব না ভাই।"

রোগী বলিলেন, "তুমিই নাও। ও যেমন লেখাপড়া শিখছে, তেমনি শিখতে থাকুক। ওর মার পনেরো হাজার টাকা ছিল, সেই টাকাটা ওর জন্যে রেখে যাচ্চি। তাই থেকে ওর খরচপত্র চালিও। একটি ভাল পাত্র দেখে ওর আবার বিয়ে দিও ভাই। ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়েছে—পুরো দুটি বছরও স্বামীর ঘর করতে পায়নি। ওর জীবনের কোনও সাধ আহ্লাদই ত মেটেনি। সেইজন্যেই ওকে আমি তোমার হাতেই দিয়ে যেতে চাই। ওর মামারা বড়লোক হলেও, গোঁড়া হিন্দু—তারা ওর বিয়ে দেবে না। ওর ভাসুর দেওররা, তাদের ত কথাই নেই। তুমিই আমার মেয়েটিকে নিয়ে যেও ভাই, —নিয়ে গিয়ে, যাতে ওর ভাল হয়, যাতে ও সুখে থাকে, তাই কোরো—তা হলে পরলোকে আমি শান্তি পাব।"

কথাগুলি শেষ করিয়া, সুরেশবাবু অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং হাঁফাইতে লাগিলেন। একটু সামলাইয়া উঠিলে সুষমা কহিল, "বাবা, একটু বেদানার রস খাবেন?"

ইঙ্গিতে সুরেশবাবু সম্মতি জানাইলেন। দুই চামচ বেদানার রস পান করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এই সময় সংবাদ আসিল, বাগবাজার হইতে সুষমার মামারা আসিয়াছেন। মুহুরি-বাবু ইঁহাদের আনিতে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন। সুষমার দুই মামা ও তিন মামী উপরে উঠিয়া আসিলেন। সিঁড়িতে উঁহাদের পদশব্দ পাইয়া, ডাক্তারবাবু প্রভৃতিকে লইয়া লাহিড়ী সাহেব পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুষমার বড়মামা অবিনাশবাবু সেই কক্ষে আসিয়া বলিলেন, "হাঁহে গিরীন, সুরেশের এ রকম অসুখটা হয়েছিল, আগে আমাদের খবর দিতে নেই?"

লাহিড়ী বলিলেন, "আগে কি আমরাই জানতে পেরেছিলাম? পরশুও ত আমি দেখে গেছি, তখনও কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়নি।"

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, কল্য প্রাতেই আবার আসিবেন বলিয়া লাহিড়ী সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। অবিনাশবাবুরা সকলেই রাত্রে এখানে থাকিবেন।

ভোর রাত্রে সুরেশবাবুর আত্মা, দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া অনন্তের পথে উধাও হইল। লাহিড়ী সাহেব বেলা ৮টার সময় আসিয়া দেখিলেন, "বল হরি হরিবোল" শব্দে শবাধার সিঁড়ি বাহিয়া নামান হইতেছে।

তিন

সুষমার বয়স যখন ১১ বছর, সেই সময় তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। সুরেশবাবুর বয়স তখন ৩৫ বৎসর মাত্র। বন্ধুবান্ধব সকলেই তখন পুনরায় বিবাহ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কয়েকজন "ডাগর" মেয়ের পিতাও তাঁহাকে এজন্য বিলক্ষণ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেশবাবু সম্মত হন নাই। ইতিপূর্ব্বে মেয়েকে তিনি বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখাইতেন। চাকর বামুন লইয়া বাসা,—তিনি আদালতে চলিয়া গেলে দীর্ঘ দিন মেয়েকে দেখে কে, তাই সুষমাকে তিনি বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তিন বৎসর পরে, গরীব গৃহস্থ ঘরের একটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র সুদর্শন যুবাকে পাইয়া, তাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন। মেয়েকে তখন অবশ্য স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইয়াছিল। ষোল বৎসর বয়সে সুষমার কপাল পুড়িল। মেয়েকে সুরেশবাবু শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আসিলেন। আবার তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সুষমা এখনও সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্রী, আগামী বৎসর তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার কথা।

বিধবা হইয়া, থান কাপড় পরিয়া, রিক্ত প্রকোষ্ঠেই সুষমা শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়াছিল। কিন্তু মেয়ের সে বেশ দেখিয়া বাপের বুকে বড় বাজিল, তাই পিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সুষমা সরুপাড় ধুতি, গলায় একটি সরু গোট হার এবং দুই হাতে দুইগাছি করিয়া চারিগাছি সোণার চুড়ি পরিল। হিন্দু বিধবার নিরম্বু একাদশী পিতা তাহাকে করিতে দিলেন না;—বলিলেন, "তুই যদি মা নিরম্বু উপবাস করিস, তবে আমিই বা কোন্ লজ্জায় খাব?" পিতা পুত্রী উভয়েই একাদশীর দিন ফল ও মিষ্টান্ন মাত্র গ্রহণ করিতেন। মাছ খাওয়াইবার জন্য কন্যাকে তিনি পীড়াপীড়ি করেন নাই, বিপত্নীক হইবার পর হইতে নিজে তিনি মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ছুঁৎমার্গের পথিক তিনি ছিলেন না। দুই তিনমাস পূর্ব্বেও তিনি লাহিড়ী-গৃহিণী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কন্যা সহ তাঁহার টেবিলে বসিয়া নিরামিষ আহার করিয়া আসিয়াছিলেন।

মামা মামীরা উপস্থিত থাকিয়া, বৌবাজারের বাসাতেই সুষমাকে দিয়া তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইলেন। সুষমা লাহিড়ী সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই পরিবারভুক্ত হইয়া অতঃপর বাস করিবে, একথা উইলেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল। ইহা অবগত হইয়া মামারা কিন্তু বড়ই বিরক্ত হইলেন। একে ত ভাগিনেয়ীর কপালদোষে ইহকালটি তাহার নষ্ট হইয়াই গিয়াছে, তদুপরি ম্লেচ্ছাচার-সম্পন্ন বিলাতফেরত লাহিড়ী সাহেবের গৃহে অবস্থান করিয়া এবং সম্ভবতঃ পুনরায় বিবাহ (তাঁহারা বলিয়াছিলেন 'নিকা') করিয়া পরকালটিও নষ্ট হইয়া যায় ইহা তাঁহাদের অসহ্য বোধ হইল। কিন্তু তাঁহাদের গৃহিণীরা একবাক্যে বলিলেন, "সেই ভাল, সেই ভাল। নিকুনে পড়ুনে গাইয়ে বাজিয়ে ঐ আগুনের খাপরা ক'ড়ে রাঁড়িকে আগলে থাকা কি সোজা কথা? ও দায় যে আমাদের ঘাড় থেকে নেমেছে সে ভাগ্যিই বলতে হবে।"

শ্রাদ্ধশান্তি হইয়া গেলে, লাহিড়ী সাহেব উদ্যোগী হইয়া মৃত বন্ধুর জিনিষপত্র

বিক্রয় করিয়া, দেনা-পাওনা মিটাইয়া, সুষমাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। মিসেস লাহিড়ী স্নেহ ও সমাদরে তাহাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।

চার

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুষমা বেথুন স্কুলে পড়িতেছে, স্কুলের গাড়ীতে যাতায়াত করে। তবে এখন পূজার ছুটি—সারাদিন সে বাড়ীতেই থাকে। তার বড়মামা অবিনাশবাবু, মাঝে একদিন মাত্র আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন।

লাহিড়ী সাহেব সুষমার সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া তাহারই নামে হিসাব খোলাইয়া দিয়াছেন। তবে চেক-বহিখানি তিনি নিজের কাছে রাখেন। তাহার খরচ-পত্রের হিসাবে প্রতিমাসে একখানি করিয়া চেক তিনি তাহাকে দিয়া সহি করাইয়া লন।

সুষমা যে পনেরো হাজার টাকার মালিক, ইহা হাইকোর্ট বার লাইব্রেরী ও উকীল লাইব্রেরীতে প্রচার হইতে দেরী লাগে নাই। সুষমার পুনরায় বিবাহ দিবার জন্যই যে তাহার পিতা মৃত্যুকালে কন্যাকে লাহিড়ী সাহেবের জিম্মা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাও অনেকে শুনিয়াছে। কিছু দিন হইতে হাইকোর্টের দুই চারিজন জুনিয়র ব্যারিষ্টার লাহিড়ী সাহেবের গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সুষমার নিকট তাহারা কেহই আমল পায় না। লাহিড়ী সাহেব তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, কিন্তু তিনিও উহাদিগকে উৎসাহ দেন না। কারণ তিনি জানেন এই যুবকগণের অবস্থা কাহারও তেমন ভাল নয় এবং সুষমার টাকার গন্ধেই তাহাদের এই ঘন ঘন যাতায়াত।

একদিন বিকালে স্বামীস্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সুষমা তখন তাহার সখী ললিতার গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে। সুষমা ও ললিতা এক ক্লাসে পড়ে। মিসেস লাহিড়ী বলিলেন. "হাঁগা, সুষীর বিয়ের কি করছ?"

লাহিড়ী বলিলেন, "তেমন মনের মতন পাত্র কই?"

"চেষ্টা করলে পাত্র কি আর মেলে না?"

"এ ত সাধারণ হিন্দু ঘরের মেয়ের বিয়ে নয় যে ঘটক লাগিয়ে পাত্র স্থির করব! লভ্ ম্যারেজ (প্রেমের বিবাহ) ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? কোনও ছেলের সঙ্গে যদি ওর ভালবাসা জন্মে যায়,—সে ছেলে নিজেই তখন বিয়ের প্রস্তাব করবে. তার গুণাগুণ. তার সাংসারিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমরা যদি ভাল বুঝি. তখন মত করবো।"

"ঐ যে কুমুদ চাটার্জ্জি আসে. ও ছেলেটি ত মন্দ নয়। সুষীর সঙ্গে ওর একটু মেলামেশায় দিনকতক একটু উৎসাহ দিলে হয় না?"

"ও তো এই সবে বছর তিনেক হল ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে। এখনও কিছুই করতে পারেনি। বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। বিয়ে ক'রে সংসার চালাবে কোথা থেকে?"

"আর, বিনয় সেন?"

"বাপের বিষয় সম্পত্তি কিছু পেয়েছিল বটে. কিন্তু শুনি. তার বেশীর ভাগই উড়িয়েছে। পাঁড় মাতাল!"

"আর ঐ যোগেশ মজুমদার?"

"ওর মা বাপ মহা হিন্দু। বিষয় আশয় বেশ আছে বটে; কিন্তু ছোঁড়াটা বড় অলস, কিছু করতে চায় না। বাপের কাছে মাসহারা পায়, তাইতে সাহেবিয়ানা চলে। ওর বাপের চেষ্টা, খাঁটী হিন্দু মতে ওর বিয়ে দেন। তাঁর অমতে যদি ও বিধবা বিবাহ করে. বাপ হয়ত রেগে মাসহারাটি বন্ধ ক'রে দেবেন, তখন খাবে কি?"

শুনিয়া লাহিড়ী গৃহিণী নীরবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরে লাহিড়ী জিজ্ঞাসা

করিলেন, "দেখ তেমন মনের মতন পাত্র একটি পাওয়াই যদি যায়, সুষী আবার বিয়ে করতে রাজি হবে ত? এত চেষ্টা করেও ওকে মাছ মাংস খাওয়াতে পারা গেল না। তারপর, তোমারই কাছে ত শুনেছি, আয়াকে দিয়ে ফুল আনায়, রোজ ঘরে দোর বন্ধ ক'রে ঠাকুরপুজো করে। ও কি ফের বিয়ে করতে রাজি হবে? তুমি বরঞ্চ আগে ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে, ওর মনটি বুঝে দেখ। এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কয়েছিলে কোনও দিন?"

"না, তা কইনি বটে। কিন্তু মনের মত বর পেলে বিয়ে করতে ওর আপত্তি হবে ব'লে ত বোধ হয় না। এত লেখাপড়া করছে, জুতো মোজা পরে বেড়াচ্চে, টেবিলে ব'সে বাবুর্চ্চির রান্না খাচ্চে—তা মাছ মাংস নাই খাক, বিলেতেও ত কত ভেজিটেরিয়ন (নিরামিষাশী) আছে—বিধবার বিয়ে করাকে নিশ্চয়ই ও দুষ্য ব'লে মনে ক'রবে না।"

লাহিড়ী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ওটা ভাবা কিন্তু তোমার ভুল। জুতো মোজা প'রে বেড়ায়, বাবুর্চ্চির রান্না খায়, ওগুলো সব বাইরের জিনিষ। কোন্‌টা কর্ত্তব্য, কোন্‌টা অকর্ত্তব্য, কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম,—এ সব হল অন্তরের জিনিষ। বাইরের আচারের সঙ্গে তার যে বড় বেশী যোগ আছে তা নয়। যা হোক, কথায়বার্ত্তায় তুমি ওর মনটি বুঝে দেখবার চেষ্টা কোরো।"

"আচ্ছা তা আমি করবো।"

এই সময় সুষমা ফিরিয়া আসিল। তাহার হাতে ফিকা নীল ফিতায় বাঁধা সুন্দর একটি বাক্স। আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "জ্যেঠাইমা, তোমার জন্যে আমি একটি গন্ধ এনেছি।"—বলিয়া বাক্সটি মিসেস লাহিড়ীর হাতে দিল।

মিসেস লাহিড়ী উহা খুলিয়া বলিলেন, "বাঃ শিশিটি কি সুন্দর! কোথায় কিনলি মা?"

"আমরা যে মার্কেটে গিয়েছিলাম।"

"তোরা কারা? কে কে গিয়েছিলি?"

"ললিতা, আমি, আর ললিতার দাদা ডক্টর ঘোষ।"

"কত দাম নিলে?"

"সাত টাকা। গন্ধ অবশ্য কেমন হবে জানিনে, কিন্তু শিশিটি দেখে আমার ভারি পছন্দ হ'ল, কিনে ফেললাম। আমার সঙ্গে টাকা ছিল, দাম দিতে গেলাম, কিন্তু ডক্টর ঘোষ কিছুতেই আমায় দাম দিতে দিলেন না। মনে করলাম তা হ'লে ফিরিয়ে দিই, নেবো না। কিন্তু হয়ত সেটা অভদ্রতা হবে, তাই অগত্যা নিতে হ'ল। আমাকেও এটা কিনে দিলেন, ললিতাকেও ঠিক এই রকম একটা কিনে দিলেন। আচ্ছা জ্যেঠামশাই, নিয়ে অন্যায় ক'রেছি কি?"

লাহিড়ী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "ফিরিয়ে দিলে অসৌজন্য হ'ত বইকি।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওরাই তোকে নামিয়ে দিয়ে গেল, বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"ওদের উপরে আনলিনে কেন, চা-টা খেয়ে যেত।"

"চা আমরা ওদের বাড়ী থেকেই খেয়ে বেরিয়েছিলাম। তবু আমি বললাম, চলুন, উপরে চলুন, জেঠাইমা জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না? ডক্টর ঘোষ বললেন, তোমার জ্যেঠাইমা জ্যেঠামশাইকে আমার নমস্কার দিও, আমি আর একদিন এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রব।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমরা এখনও চা খাইনি। যাও ত মা, আমাদের চা দিতে বল; আর গন্ধটিও আমার ঘরে রেখে এস।"

সুষমা চলিয়া গেলে মিসেস লাহিড়ী স্বামীর প্রতি কুটিল চাহনি হানিয়া হাসিতে

হাসিতে বলিলেন, "কি গো? হাওয়া কোন্ দিক থেকে বইছে, কিছু বুঝতে পারছ?"

লাহিড়ী সাহেব উত্তর করিলেন, "কিছু না। ঐ ঘোষ ছোকরা কি রকম ডাক্তার? পুরো নাম কি?"

"সুষীর কাছে শুনেছি, তার নাম সরোজনাথ—সে বিলেতফেরৎ ডাক্তার।"

"বয়স কত?"

"তা শুনিনি।"

অল্পক্ষণ পরে সুষমা ফিরিয়া আসিয়া ইঁহাদের নিকট বসিল।

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "হ্যাঁ সুষী, ললিতারা তোকে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, জিনিষ দেয়, তুই ওদের নেমন্তন্ন করিস না কেন?"

"করবো জ্যেঠামশায়?"

"করা উচিত নয় কি? তুমি কি বল গো?"—বলিয়া তিনি পত্নীর পানে চাহিলেন।

গৃহিণী বলিল, "নিশ্চয়ই উচিত।"

স্থির হইল, আগামী রবিবারে, ললিতাদের ভাই বোনকে সুষমা নিমন্ত্রণ করিবে—দিনের বেলায়।

পাঁচ

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ চলিতে লাগিল।

ইঁহারা দেখিলেন, সরোজ ছেলেটি ভাল। তার বাপ-মা জীবিত নাই। ঐ বোন ললিতা, আর, একটি ছোট ভাইও আছে। লাহিড়ী সাহেব খবর লইয়া জানিলেন, সরোজ যদিও তিন চারি বৎসর মাত্র বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, তথাপি ইহারই মধ্যে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে। ক্রমে ইহাও লক্ষ্য করিলেন, সরোজের পক্ষে সুষমা একটা আকর্ষণের বস্তু।

মাস দুই পরে একদিন সরোজ আসিয়া লাহিড়ী গৃহিণীর নিকট বলিল, "আপনারা কি সুষমার আর বিয়ে দেবেন না?"

গৃহিণী বলিলেন, "দেবারই ত ইচ্ছে। ওর বাবা এই জন্যেই ত ওকে আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন। নইলে ওর মামারা অবস্থাপন্ন লোক—সেইখানেই ত ওর থাকবার কথা। কিন্তু তাঁরা আবার গোঁড়া হিন্দু কিনা! এ কথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ, সরোজ? তোমার সন্ধানে কি কোনও ভাল পাত্র আছে?"

সরোজ বলিল, "পাত্র একটি আছে—তবে ভাল কি মন্দ সেটা অবশ্য আপনাদেরই বিচার্য্য।"

"কে বল দেখি?"

সরোজ একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকে কি আপনি সুষমার যোগ্য পাত্র মনে করবেন?"

গৃহিণী, খুব বিস্মিত হইয়াছেন এইরূপে ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি? তুমি সুষীকে বিয়ে করবে? সে ত তার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু সুষীর মন কি তুমি বুঝেছ?"

"না, সে চেষ্টাই আমি এখনও করিনি মিসেস লাহিড়ী। আপনাদের অনুমতি না পেলে—"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ত ঠিক। তুমি যেমন ভদ্র ছেলে, তার উপযুক্ত কাজই করেছ। আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি। উনি যে রকম বলেন, তোমায় জানাবো।"

"তাহলে দয়া ক'রে আজ কি মিষ্টার লাহিড়ীর মতটা জেনে রাখবেন? কাল আবার এ সময় আমি আসবো কি?"

মিসেস লাহিড়ী মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, বাবাজীর যে আর তর সইছে না দেখছি! প্রকাশ্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ ত, আমি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাখবো এখন, কাল আবার তুমি এস।"

সরোজ আশান্বিত হৃদয়ে প্রস্থান করিল।

রাত্রে নিভৃতে গৃহিণী স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িলেন। লাহিড়ী বলিলেন, "সরোজ যে সুষীর দিকে খুব ঝুঁকেছে তা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ত বটেই। কেমন, তোমার কোনও অমত নেই ত?"

লাহিড়ী বলিলেন, "ছেলেটি ত বেশ ভালই। ডাক্তারীতে এরই মধ্যে বেশ পশার ক'রে নিয়েছে। সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র—কিন্তু সুষী বেটী কি রাজী হবে?"

"কেন রাজি হবে না? এর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথায় পাবেন শুনি?"

"ভাল মন্দর কথা আমি বলছিনে। আমার কিন্তু মনে হয় ওর কেবল বাইরেটাই আধুনিক, কিন্তু ভিতরটা নিতান্ত সেকেলে। বিধবার আবার বিয়ে করা, ও হয়ত মহাপাপ ব'লে মনে করে। তা যদি না হত, তবে ও মাছ মাংসও ছাড়তো না, একাদশীতে ফলমূলও খেত না, আর লুকিয়ে ঠাকুর পূজোও করত না।"

"বেশ ত, সরোজ চেষ্টাই করুক না।"

"হ্যাঁ—সরোজকে বোলো, সে আগে বেশ ক'রে ওর মন বুঝে দেখুক। সরোজ যেমন ওকে ভালবেসেছে, সুষীও যদি তাকে সেই রকম ভালবেসে থাকে, তাহলে আর কথা কি!"

"তা হলে ঐ কথাই সরোজকে বলি?"

"হ্যাঁ, বোলো।"

দিন পনেরো পরে সুষমা একদিন মিসেস লাহিড়ীকে বলিল, "পরশু রবিবার বিকেলে ললিতার দাদা ললিতাকে আর তার ছোট ভাইকে আলিপুরে ফ্লাওয়ার শো (পুষ্প প্রদর্শনী) দেখাতে নিয়ে যাবেন। ললিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে তুই যাবি ভাই, তাহলে তোকে আমরা তুলে নিয়ে যাই। আমি বলেছি, আচ্ছা, জ্যেঠাইমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কাল বলবো।"

গৃহিণী সস্নেহে সুষমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বেশ ত! তা যেও মা! আর, ওদের দুজনকে নেমন্তন্ন কোরো, শো থেকে ফিরে, রাত্রে এখানে এসে খাওয়া-দাওয়া ক'রে যাবে।"

রবিবার বিকালে সরোজ আসিল, কিন্তু ললিতা কিংবা তার ছোট ভাই আসে নাই। বলিল, ললিতাকে এবং ছোট ভাইকে মাসীমা নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছেন, আজ রাত্রে সেখানে তারা থাকিবে।

মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "তা হ'লে আর কি হবে?"

সরোজ বলিল, "সুষমাকে নিয়ে যেতে পারি?"

মিসেস লাহিড়ী বলিলেন, "বেশ ত নিয়ে যাও।"

সুষমা বলিল, "আজ থাক্‌না জ্যেঠাইমা। অন্য একদিন গেলেই ত হবে।"

সরোজ বলিল, "আজ কিন্তু বিশেষ ক'রে গোলাপ ফুলেরই এগ্‌জিবিশন। এটা মিস্ করা উচিত নয়।"

সুষমা বলিল, "তা হলে তুমিও চল জ্যেঠাইমা।"

"আমার কি সময় আছে মা? কত কাজ আমার পড়ে রয়েছে, তা ছাড়া উনিও বাড়ী নেই। যাওনা, সঙ্গে গিয়ে তুমি ফুল দেখে এস। সরোজ, ফিরে এসে এইখানেই খাবে ত তুমি?"

"হ্যাঁ খাব বইকি মিসেস লাহিড়ী।"

সুষমা নিতান্ত অনিচ্ছায় বেশ পরিবর্তন জন্য উঠিয়া গেল।

এই সুযোগে, সরোজ বলিল, "দেখুন, অনেক চেষ্টা করেও ওর মনের কথা আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারলাম না।"

গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তারপর বলিলেন, "ওঁর পরামর্শে চলতে গিয়েই ত এ রকম হল। নইলে এতদিন কোন্‌কালে যাহোক একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত।"

"আমার প্রতি ওর যে মন আছে, তার কোনও লক্ষণ আপনি কি বুঝতে পারেন?"

"ও বড় চাপা মেয়ে। ও সবে আর দরকার নেই। আমি নিজে বরং আজ রাত্রে খোলাখুলি ওকে জিজ্ঞাসা করি।"

সরোজ মিনতির স্বরে বলিল, "আমি চলে গেলে তারপর জিজ্ঞাসা করবেন।"

"বেশ, তাই হবে।"

ছয়

লাহিড়ী সাহেব সস্ত্রীক ড্রয়িংরুমে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পর সুষমাকে লইয়া সরোজ ফিরিয়া আসিল। সুষমার হস্তে গোলাপ ফুলের মস্তবড় একটা সাজি, তাহাতে নানা আকার ও বর্ণের ফুল ফার্ণ-পাতা সহযোগে সজ্জিত। লাহিড়ী সাহেব ও তাঁহার গৃহিণী পর্য্যায়ক্রমে সাজিটি হাতে লইয়া পরীক্ষা ও আঘ্রাণ করিয়া, উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

লাহিড়ী সাহেব বলিলেন, "সরোজ, তুমি মুখ হাত ধোবে না?"

"হ্যাঁ ধোব।"

লাহিড়ী সাহেব বেয়ারাকে ডাকিয়া সরোজকে গোসলখানায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। সরোজ চলিয়া গেল।

লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত নিলে ফুলগুলো রে সুষী?"

"সাড়ে আট টাকা। কিনে, আমি দাম দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সরোজবাবু কিছুতেই আমায় দাম দিতে দিলেন না। একবার ভাবলাম তবে থাক্—নিয়ে কাজ নেই। আবার মনে হল, সেটা হয়ত একটু অভদ্রতা হয়, তাই অগত্যা নিলাম। অন্যায় করেছি জ্যেঠামশাই?"

"না, অন্যায় করনি মা!"—বলিয়া লাহিড়ী সাহেব পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল গো?"

গৃহিণী বলিলেন, "না নিলেই অন্যায় হত। যাও মা তুমি কাপড়চোপড় বদলাওগে—তারপর ফুলগুলি, কয়েকটা ফুলদানীতে জল দিয়ে বেশ ক'রে সাজিয়ে ফেলো।"

পনেরো মিনিট পরে সরোজ ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিল। আর কিছুক্ষণ পরে সুষমাও আসিল—তার হাতে দুটি গোলাপ। একটি জ্যেঠাইমার চুলে পরাইয়া দিল, একটি জ্যেঠামহাশয়ের কোটে বটন্‌ হোল করিয়া দিতে লাগিল।

লাহিড়ী সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি বুড়োমানুষ আমার কি সাজে রে বেটী? সরোজের কোটে পরিয়ে দে।"

সুষমা কিন্তু শুনিল না, জ্যেঠামহাশয়ের কোটেই ফুলটি পিন দিয়া আটকাইয়া দিল।

লাহিড়ী সাহেব উহা খুলিয়া, হাসিতে হাসিতে সরোজের কোটে লাগাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া গৃহিণী নিজের খোঁপার ফুলটি সুষমার চুলে গুঁজিয়া দিলেন।

"বাঃ—এ কি?"—বলিয়া সুষমা আর দুইটি ফুল লইয়া, জ্যেঠামহাশয় ও জ্যেঠাইমাকে অলঙ্কৃত করিল।

আহারান্তে, রাত্রি ১০টার সময় সরোজ বিদায় গ্রহণ করিল। লাহিড়ী সাহেবও রাতকাপড় পরিবার জন্য নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সুষী বলিল, "আমিও তা হলে শুইগে জ্যেঠাইমা!"

"হ্যাঁ মা। চল্—আমিও তোর ঘরে যাচ্ছি,—একটু কথা আছে।"

সুষমার শয়নকক্ষে গিয়া, একটা চেয়ারে বসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সরোজ ত মহা বায়না নিয়েছে মা।"

নিজ শয্যাপ্রান্তে বসিয়া সুষমা বলিল, "কি বায়না জ্যেঠাইমা?"

"তোকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছে।"

কথাটা শুনিবামাত্র সুষমা চক্ষু অবনত করিল। গৃহিণী দেখিলেন, তাহার মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। ক্ষণপরে সুষমা বলিল, "তা হলে, তিনি ক্ষ্যাপার মত কাজই করেছেন জ্যেঠাইমা!"

"কেন?"

"কারণ, বিয়ে ত আমি করবো না।"

"কেন করবে না বাছা? তোমার এই কাঁচা বয়স; ভাল ঘর বর পেলে বিয়ে ত করাই উচিত। কেন, সরোজকে কি তোমার পছন্দ হয় না? বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, দেখতেও ভাল, নিজে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করছে। এর চেয়ে ভাল পাত্র কোথায় পাওয়া যাবে মা?"

সুষমা বলিল, "সে কথা নয় জ্যেঠাইমা। কিন্তু আমি যে—বিধবা।"

"কেন, বিধবা-বিবাহ কি তুমি তবে ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মসঙ্গত মনে কর না? লেখাপড়া শেখার ফল কি হল তবে?"

"সকল বিধবার পক্ষে আবার বিবাহ করা অধর্ম্ম বা অন্যায় ব'লে আমিও মনে করিনে জ্যেঠাইমা।"

"তবে কেন তুমি বিয়ে করতে চাওনা বাছা?"

সুষমার মুখে আসিয়াছিল, "কারণ, আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি, আর যতদিন বেঁচে থাকবো, বাসবো।"—কিন্তু একথা বলিতে তাহার লজ্জা করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া সে বলিল, "আপনি ত জানেন জ্যেঠাইমা, আমার মা যখন চ'লে গেলেন, কতলোক ত বাবাকে ফের বিয়ে করার জন্যে বলেছিলেন। বাবার তখন মাত্র ৩৫ বৎসর বয়স—পুরুষ মানুষের পক্ষে সেটা পূর্ণ যৌবন কাল। কিন্তু বাবা ত বিয়ে করেন নি। বাবার ঘরে, মার যে অয়েলপেণ্টিং ছবিখানি টাঙ্গানো থাকতো, বাবা রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে, মার সেই ছবিখানি ফুল দিয়ে সাজাতেন—ব্যারাম হবার পরও কয়েক-দিন তার অন্যথা হয়নি। বাবা যদি আবার বিয়ে করতেন, তা হলে কেউ ত তাঁকে বলতে পারতো না যে তিনি অন্যায় বা অধর্ম্ম করলেন।"

লাহিড়ী গৃহিণী অবাক হইয়া কিছুক্ষণ সুষমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার কথাগুলির তাৎপর্য্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "তোমার বাবা, তোমার মাকে নিয়ে কত বচ্ছর ঘরকন্না করেছিলেন—কিন্তু তুমি ত বাছা, তোমার স্বামীর সঙ্গ পুরো দুটি বছরও পাওনি।"

সুষমা, নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। কোনও উত্তর করিল না।

গৃহিণী আরও কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিলেন। সুষমার প্রতি তাঁহার মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বলিলেন, "তোমার বাবা, তোমার মাকে বড্ড ভালবাসতেন তা আমরা জানতাম। তোমার মার মৃত্যুর পর কিছুদিন অবধি তিনি পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছা, একটা কথা আজ তোমায় জিজ্ঞাসা করি। তুমি রোজ আয়াকে দিয়ে ফুল আনাও,

আমরা মনে করতাম, লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি ঠাকুর পুজো ক'রে হিঁদুয়ানী বজায় রাখ। তুমিও কি তোমার বাবার মতন—"

সুষমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমার স্বামীর একখানি ফোটোগ্রাফ আমার কাছে আছে।"

গৃহিণী আরও কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "আচ্ছা মা রাত হল, শোও এখন। এ বিষয়ে আর কখনও আমি তোমায় অনুরোধ করবো না, তুমি আমার উপর রাগ কোর না মা।"

"না জ্যেঠাইমা, রাগ করবো কেন? আপনি ত ভাল ভেবেই বলেছিলেন। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না জ্যেঠাইমা।"—বলিয়া সুষমা গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

জ্যেঠাইমা চলিয়া গেলে সুষমা দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া, যে দেরাজে তার মৃত স্বামীর ছবি থাকিত, উহা খুলিল। ছবিখানির চারিদিকে অদ্য প্রাপ্ত তাজা গোলাপ ফুলগুলি তুলিয়া লইয়া সুষমা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল; বস্ত্রাঞ্চলে ছবিখানি বেশ করিয়া মুছিয়া, উহা মাথায় ঠেকাইয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—আমি ত জানতাম না যে ও ফুলগুলোর সঙ্গে অলক্ষ্যে একজনের বাসনার কালি মাখানো আছে।"

দিব্যদৃষ্টি

জ্যৈষ্ঠ মাস। কলিকাতা পটলডাঙ্গায় একটি ছাত্রাবাসে আজ মহা উৎসব লাগিয়াছে। ব্যাপারটা এই—

সুরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ম্যাট্রিক ও আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াই পাস হইয়াছিল, কিন্তু বি-এ পরীক্ষার মনোবিজ্ঞান বিভাগে সে একেবারে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথম হইবার খবর যে দিন বাহির হইল, সে দিন ছিল বুধবার।

সুরেনের পিতা জীবিত নাই—দেশে, পাবনা জেলায় চৌরীপুর গ্রামে, তাহার জননী আছেন; সুরেনের পিতৃব্যের অভিভাবকতায় তিনি বাস করেন। বাড়ীর অবস্থা তেমন ভাল নহে। তাই বি-এ পরীক্ষা কবে শেষ হইয়া গেলেও সুরেন কলিকাতায় থাকিয়া প্রাইভেট টিউশনি করিতেছে। সুরেনের বয়স তেইশ বৎসর, দিব্য সুশ্রী চেহারা, সদাই হাস্যবদন। সুরেন আজিও অবিবাহিত।

তাহার পরবর্তী শনিবারে মেস-বন্ধুগণ এক সান্ধ্যভোজের আয়োজন করিল। খরচটা অবশ্য সুরেনেরই। বাসার শরৎবাবু, বিপিনবাবু, যোগেশবাবু, উমাপদবাবু, যতীন্দ্রবাবু, সতীশবাবু, ললিতবাবু ত আছেনই। বাহির হইতে অতুলবাবু, কুমুদবাবু ও কুঞ্জবাবু নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

ভোজন-শক্তি-বৃদ্ধিকল্পে সিদ্ধির আয়োজন হইয়াছিল। যুবকগণ সকলে একত্র হইলে, সিদ্ধি বিতরিত হইল। কেহ এক পাত্র, কেহ দুই পাত্র গ্রহণ করিলেন, মাত্র দুইজন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, সিদ্ধি তাঁহাদের মোটেই সহ্য হয় না।

কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজবের পর, গান-বাজনা আরম্ভ হইল। হার্ম্মোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা সহযোগে দেড় কি দুই ঘণ্টা গান-বাজনার পর গায়ক ও বাদকেরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন সিদ্ধির নেশা সকলেরই বেশ জমিয়া আসিয়াছে। আবার গল্প-গুজব আরম্ভ হইল।

সতীশবাবু এক কোণে বসিয়া সে দিন প্রভাতের সংবাদপত্রখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, একটা মজার খবর শুনেছ?"

সকলে বলিয়া উঠিল, "কি? কি?"

"এই যে পড় না শুনি—অর্থাৎ শোন না, পড়ি।"—বলিয়া তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন :—

মফঃস্বল সংবাদ

কৃষ্ণনগর—নদীয়া

ছাত্রীর কৃতিত্ব। কৃষ্ণনগর বারের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রামজীবন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা কুমারী কুন্দমালা দেবী বিগত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইহা কৃষ্ণনগরবাসী সকলেরই অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয়! এই উপলক্ষে রামজীবনবাবু সহরস্থ তাবৎ গণ্যমান্য লোককে আগামী শনিবারে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্থানীয় যুব-নাট্যসমিতি নিমন্ত্রিত-গণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ ঐ রজনীতে রামজীবনবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গণে ডি-এল্ রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের অভিনয় করিবেন।

ললিত চীৎকার করিয়া উঠিল—"হুর্‌রে—থ্রী চিয়ার্স ফর এম-এ, বি-এল মহাশয়ের কন্যা মুণ্ডমালা!"

সুরেন বলিল, "মুণ্ডমালা নয় রে, কুন্দমালা। নামটি কিন্তু বেশ মিষ্টি।"

অতুলবাবু নামক এক ভদ্রলোক দেওয়ালে হেলান দিয়া উদ্ধমুখে গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!"

ললিত বলিল, "আহা, কি আর আশ্চর্য্য? বাঙ্গালীর মেয়ের ইউনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট হওয়া, আজকালকার দিনে মোটেই আর আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়।"

অতুলবাবু বলিলেন, "সে জন্যে আশ্চর্য্য বলিনি হে!—আমি দিব্যদৃষ্টিতে ব্যাপারটা যা দেখতে পাচ্ছি—তা আশ্চর্য্য! অতীব আশ্চর্য্য!"

যোগেশবাবু বলিলেন, "দিব্যচক্ষে কি দেখছ অতুল, বলই না শুনি!"

অতুল বলিল, "এর ভিতরে প্রজাপতির হাত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

উমাপদ বলিল, "কিসের ভিতর?"

অতুল বলিল, "প্রথমতঃ দেখ, সুরেনও ফার্ষ্ট হয়েছে, কুন্দমালাও তাই।"

"দ্বিতীয়তঃ?"

"দ্বিতীয়তঃ, সুরেনের কৃতিত্বের জন্যে আনন্দ-ভোজের আয়োজন আজ এখানে পটল-ডাঙ্গায়, কুন্দমালার কৃতিত্বের জন্যে আনন্দভোজের আয়োজন ঠিক আজই, ঠিক এই সময়েই কৃষ্ণনগরে চলছে।"

"তৃতীয়তঃ?"

"তৃতীয়তঃ, সে কুমারী, আর আমাদের সুরেন্দ্র—কুমার।"

"তার পর?"

"একজন চাটুয্যে, একজন মুখুয্যে—করণীর ঘর।"

"আর কিছু আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। যে মুহূর্ত্তে সুরেনের কাণের ভিতর দিয়া কুন্দমালা নামটি পশিল, অমনি আকুল করিল ওর প্রাণ! নামটি শুনেই ও বলেছে—খাসা মিষ্টি নামটি কিন্তু। —সুরেন, বলনি তুমি? এই একঘর লোক সাক্ষী আছে।"

সুরেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিনি, তবে ঐ ভাবের কথা বলেছি বটে।"

অতুল অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "এ বিবাহ অনিবার্য্য!"

শরৎ বলিল, "কি হে সুরেন, তুমি কি বল? অনিবার্য্য নাকি?"

সুরেন হাসিয়া বলিল, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনটের কোনটাই ত মানুষের হাতে নয় ভাই। প্রজাপতির তাই যদি নির্ব্বন্ধ হয়, তবে আমায় পরতেই হবে মাথায় টোপর, পালাবো কোথা?"

ললিত বলিল, "কি ভয়ানক কথা! আমাদের মধ্যে যে এমন একজন দিব্যদৃষ্টি-ওয়ালা মহাপুরুষ বিচরণ করছেন, তা আমরা কোন দিনই সন্দেহ করিনি! আচ্ছা অতুল-বাবু, মেয়েটির বয়স কত হবে?"

অতুল বলিল, "সতেরো—সতেরো বছরে পড়েছে, এখনও পূর্ণ হয়নি।"

"আচ্ছা, তার চেহারাটা কি রকম, দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছ ত?"

"আলবৎ পাচ্ছি।"

"কি রকম, বল না শুনি। কৃষ্ণা, না শ্যামা, না গৌরী?"

"গৌরী। নাম শুনেই বুঝতে পারছ না? কুন্দফুলের রঙ কি?"

উমাপদ বলিয়া উঠিল, "কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা, অয়ি অনিন্দিতা।"

যতীন চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে অতুল, এই দেখ আর একটা ভয়ঙ্কর মিল। সুরেন ভাই, সুরেন,—তোমার ভাবী প্রিয়ার একটা বন্দনা-গান গাও।"

কুঞ্জ গাহিয়া উঠিল—

"পদপ্রান্তে রাখ সেবকে।"

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল। হাসির হিল্লোল থামিলে যতীন বলিল, "যাই বল তাই বল ভাই, এতগুলো মিল কিন্তু আশ্চর্য্য বটে!"

অতুল যতীনের পানে চাহিয়া, হাসিতে হাসিতে ভেঙ্গাইল—"দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও, দ্যান আর ড্রেম্‌ট্ আফ ইন ইওর ফিলজাফি!"

ললিত বলিল, "সে যাক্—তুমি ব'লে যাও হে। মেয়েটির বয়স মাত্র সতের বছর, গৌরবর্ণা,—আর কি কি সব বল দেখি?"

"সংক্ষেপেই বলি। মুখ, চোখ, চুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবই ভাল, তবে একটু ত্রুটি আছে। চোখের তারা দুটি মিশ কালো নয়, একটু ফিকে বাদামী রঙের। এই ত্রুটি-টুকু ছাড়া, মেয়েটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলা যেতে পারে।"

সুরেন বলিল, "ওটা কি ত্রুটি নাকি? আমি ত ওটা সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলেই মনে করি।"

এই সময় খবর আসিল, আহার্য্য প্রস্তুত। যুবকগণ আনন্দকলরব করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল।

দুই

পরদিন বিকালে ৫টার সময় যতীনবাবু কলতলায় স্নান করিতেছিলেন, দুইটি অপরিচিত ভদ্রলোক বাসায় প্রবেশ করিলেন। একজন প্রবীণ-বয়স্ক, অন্য জন যুবা-পুরুষ। প্রবীণ ভদ্রলোক যতীনবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "এ বাসায় সুরেন্দ্রবাবু ব'লে কেউ থাকেন কি? সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী।"

যতীন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

"কৃষ্ণনগর থেকে।"

শুনিবামাত্র যতীনের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। উত্তর করিল, "সুরেনবাবু ত এখন বাসায় নেই, বেরিয়েছেন।"

"কখন ফিরবেন তিনি?"

"সন্ধ্যার আগেই আসবে বোধ হয়।"

"তাঁর ঘরে ব'সে আমরা কি অপেক্ষা করতে পারি?"

"নিশ্চয়। তাঁর ঘর বোধ হয় তালাবন্ধ আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় ডান-হাতি প্রথম ঘরটা আমার। দয়া ক'রে সেখানে ব'সে অপেক্ষা করুন, আমি স্নান সেরে আসছি।"

"আচ্ছা থ্যাঙ্কস্"—বলিয়া বাবু দুইজন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

যতীন তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া নিজ কক্ষে গিয়া দেখিল, বাবু দুইটি দুইখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছেন। যতীন মাথায় শুষ্ক তোয়ালে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "আপনাদের এক এক পেয়ালা চা দিতে পারি কি?"

প্রবীণ বাবুটি বলিলেন, "দোকানের চা? না, থ্যাঙ্কস্।"

যতীন বলিল, "দোকানের চা নয়। ঐ যে ষ্টোভ রয়েছে, আমি নিজে তৈরী করবো।"

প্রবীণ ভদ্রলোক সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "আবার কষ্ট করবেন আপনি?"

যতীন বলিল, "ষ্টোভ ত আমায় জ্বালতেই হবে। আমি একটু খাব কিনা!"

বাবুটি বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে—"

যতীন ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া, নিজ তক্তপোষের প্রান্তে আসিয়া বসিল। বাবুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

"শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।"

"এখানে পড়াশুনো করেন বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—সিটি কলেজে বি-এ পড়ি। এবার ফোর্থ ইয়ার।"

"বাড়ী কোথায় আপনার?"

"আজ্ঞে, খুলনা জেলায়।"

"কোথায়?"

"মাধবপুর গ্রামে।" একটু থামিয়া যতীন বলিল, "যদি বেয়াদবি না মনে করেন, মশাইয়ের নামটি জানতে পারি কি?"

"আমার নাম শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় মুন্সেফের পেস্কার। এটি আমার ভাগ্নে, নাম সুধীরকুমার মুখুয্যে। ইনি সম্প্রতি ওকালতী পাস ক'রে কৃষ্ণনগরেই প্র্যাক্টিস আরম্ভ করেছেন। এঁর পিতার নাম আপনি শুনে থাকবেন বোধ হয়, তিনি কৃষ্ণনগরের খুব নামজাদা উকীল, রামজীবন মুখুয্যে।"

গত কল্যকার আসরে, সংবাদপত্র হইতে পঠিত নামটা যেন রামজীবন বলিয়াই যতীনের মনে হইল। সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, "রামজীবন? রামজীবন? আচ্ছা, তাঁরই মেয়ে কি এবার ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হয়েছেন?"

সঞ্জীববাবু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,—কুন্দমালা—আমার ভাগ্নী।"

যতীনের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা রোমাঞ্চ বহিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য, অতুলবাবু কি তবে একটা ছদ্মবেশী যোগী নাকি? মানুষের দিব্যদৃষ্টি সত্যই কি তবে থাকিতে পারে? হিন্দুধর্ম্ম কি তবে নিতান্ত বুজরুকি নয়? সে মনে মনে বলিল, "নাঃ, সন্ধ্যে-আহ্নিকটা ছেড়ে দেওয়া ভাল হয়নি। কাল থেকে ফের সুরু করতে হবে!"

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেনের সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন, জানতে পারি কি?"

সঞ্জয়বাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, তার পর বলিলেন, "আমরা শুনেছি, সুরেনবাবু এখনও অবিবাহিত। তাঁর পিতাও বর্ত্তমান নেই, নিজেই তিনি নিজের অভিভাবক। কোথাও তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে কি না, তিনি এখন বিবাহ করতে রাজি আছেন কি না, আপনি বলতে পারেন?"

যতীন বলিল, "আজ্ঞে না—তা—ঠিক জানিনে।"

চায়ের জল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যতীন তিন পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল। চা-পান করিতে করিতে সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেনবাবু বি-এ ত পাস করলেন, এবার তিনি কি করবেন? আইন-ক্লাস জয়েন করবেন কি?"

"না, উকীল হবার তার ইচ্ছে নেই। এইবার এম-এ পড়বে।"

"বাড়ীতে ওঁর কে আছে?"

"মা আছেন। কাকা-টাকা কাকী-টাকীও আছেন শুনেছি।"

"ক' ভাই ওঁরা?"

"ভাই-টাই কিছু নেই। একটি বোন আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে।"

এই সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল। যতীন বলিল, "এই বোধ হয় আসছে।"

সুরেন্দ্র, যতীনের ঘরের সামনে আসিবামাত্র যতীন বলিল, "ওহে, এদিকে এস। এই ভদ্রলোক দু'টি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব'সে আছেন।"

"ওঃ, আচ্ছা,—আমার ঘরে আসুন।"—বলিয়া সুরেন্দ্র অগ্রসর হইল। আগন্তুকদ্বয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে বাবুরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। যতীনের ঘরের সামনে আসিয়া সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আজ আসি তা হ'লে যতীনবাবু। আবার দেখা হবে, নমস্কার।"—যতীন লক্ষ্য করিল, সঞ্জীববাবুর মুখখানি হাসি হাসি। "আজ্ঞে, আসুন, নমস্কার"—বলিয়া সে ইঁহাদের সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্যন্ত গেল। তার পর দ্রুতপদে সুরেনের ঘরে গিয়া দেখিল, সুরেন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। বলিল, "ব্যাপার কি হে?"

সুরেন চমকিয়া উঠিয়া যতীনের মুখপানে চাহিল। বলিল, "এঁরা কি জন্যে এসেছিলেন, তুমি জান যতীন?"

"স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই করেছিলুম হে! উত্তর দেন নি, অন্য কথা পেড়ে আমার প্রশ্নকে চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু কি জন্যে এসেছিলেন, তা অনুমান করতে পারি। কুন্দমালার সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছিলেন ত?"

সুরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কথা, বল দেখি!"

"আশ্চর্য্য বইকি!"

"কিন্তু এর এক্সপ্ল্যানেশন্ কি?"

"আমি ত কিছুই খুঁজে পাইনে।—কি হ'ল, তাই বল। রাজি হয়েছ?"

"হয়েছি। দেখ, যাই শুনলাম, উনি কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন, কুন্দমালার মামা, আমি যেন কি রকম হতভম্ব হয়ে গেলাম। যা যা বললেন, তাতেই আমি হাঁ ব'লে গেলাম। আসছে রবিবারে আমি কৃষ্ণনগর যাব মেয়ে দেখতে। মেয়ে দেখে আমার পছন্দ হ'লে ওঁরা দেশে আমার কাকা-মশাইকে চিঠি লিখবেন, পরে যা যা করতে হয়, সব করবেন। আষাঢ় মাসেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চান, কেন না, তার পরেই মেয়ের যোড়া বছর পড়বে। আচ্ছা যতীন, একটা জিনিষ তুমি লক্ষ্য করেছ?"

"কি?"

"ওর ভাইয়ের চোখের তারা? অতুলবাবু কুন্দ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, এরও অবিকল তাই। চোখের তারা কালো নয়, ফিকে বাদামী রঙের।"

"না ভাই, আমি ত সেটা লক্ষ্য করিনি!"

"আমি করেছি। কিন্তু যা-ই বল যতীন, অতুলবাবুর কিন্তু আশ্চর্য্য ক্ষমতা।"

"ব্যাপার কি, অতুলবাবুকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয় না? এখন ত কোনও কাজ নেই, চল না যাওয়া যাক তাঁর বাসায়। একটু বেড়ানও হবে।"

সুরেন বলিল, "তাকে এখন কি বাসায় পাবে? সে ত আজ চলল রাইবেরেলী। সেখানে একটা চাকরি জুটিয়েছে যে। এতক্ষণ বোধ হয় সে হাওড়া ষ্টেশনের পথে।"

তিন

অবিলম্বে মেসের অন্যান্য লোকের মধ্যে কথাটা প্রচার হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর সকলে আসিয়া সুরেনের ঘরে জটলা আরম্ভ করিল। যোগেশবাবু বলিলেন, "অতুলটা কি কোনও সূত্রে জানতে পেরেছিল যে, কুন্দমালার মামা তোমাকে আজ দেখতে আসবেন? জেনে শুনে ঐ রকম চালাকি খেলে গেল নাকি?"

শরৎ বলিল, "আমি ত' তার পাশেই ব'সে ছিলাম, কিন্তু সে সময় তার মুখ-চোখ দেখে ত ওরকম আমার মনে হয়নি ভাই! বিশেষ, সে ত নিজে কোনও কথাই তোলেনি, —হঠাৎ খবরের কাগজ প'ড়ে শোনালে ত সতীশ!—সতীশ, তুমিই প'ড়ে শোনালে না?"

সতীশ বলিল, "হ্যাঁ, আমিই ত প'ড়ে শোনালাম। কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, হঠাৎ ঐ প্যারাটা আমার চোখে পড়লো। তারও ফার্ষ্ট হওয়ার জন্যে আনন্দ-ভোজ শনিবারেই হচ্ছে এই কথা প'ড়ে আমার ভারি মজা লাগলো, তাই তোমাদের সেটা প'ড়ে শোনালাম।"

বিপিন বলিল, "হয় ওৎলোটা জানতো, নয়, সত্যিই তার একটা ক্ষমতা আছে—ওকেই ত ক্লেয়ারভয়েন্স বলে।"

উমাপদ বলিল, "যারা সাধনার খুব উচ্চ স্তরে উঠেছে, তাদের এ রকম ক্ষমতা জন্মে. তা স্বীকার করি। কিন্তু ওৎলোটা ত মহা নাস্তিক। মুসলমানের রান্না মুর্গী ভক্ষণ করে, ওর ওরকম ক্ষমতা থাকা আমি ত অসম্ভব বলেই মনে করি। নিশ্চয়ই সে জানতো।"

শরৎ বলিল, "জানতো কি না, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলছিনে অবশ্য, কিন্তু কোন-কোনও মানুষের স্বভাবতঃ ওরকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে, সেটা আমি জানি। আমি যখন প্রথম বছর কলকাতায় আসি, অষ্ট্রেলিয়া থেকে একটা সার্কাসের দল এসেছিল খেলা দেখাতে। তখন বড়দিনের ছুটী। গড়ের মাঠে প্যাণ্ডাল খাটিয়ে তারা খেলা দেখাচ্ছিল। নানা রকম খেলা হবার পর, একটা খেলা দেখালে, তা একেবারে অদ্ভুত। এক ছুঁড়ী মেম, বয়স এই আঠারো উনিশ, সে এসে বললে, 'দর্শকদের মধ্যে যে কাউকে আমি ছুঁয়েই, তার জন্মবার ব'লে দেবো। যদি আমার ভুল হয়, অনুগ্রহ ক'রে তিনি যেন বলেন।' এই ব'লে সে প্রথম সারি, দ্বিতীয় সারি, এক এক জনকে ছোঁয়, আর এক একটা বারের নাম ব'লে যায়, যেমন—শনিবার, বুধবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার—এই রকম। একটি লোকও বললে না যে, 'না ঠিক হ'ল না, তোমার ভুল হয়েছে।' আমি তৃতীয় সারিতে ব'সে ছিলাম, খালি ভাবছি, আমার জন্মবার ত সোমবার, দেখি ঠিক বলে কি না। ঐ রকম বলতে বলতে তৃতীয় সারিতে এসে, ছুঁড়ী আমার দিকে চ'লে এল, আমাকে ছোঁবামাত্র বললে—সোমবার।"

অনেকেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ, বল কি? নিজে তুমি দেখেছ—"

শরৎ বলিল, "নিজে নয় ত কি প্রক্সিতে?—পাঁচটি টাকা দিয়ে টিকিট কিনে আমি ঐ তামাসা দেখতে গিয়েছিলাম। আমার মনে হ'ল, আমার টাকা খরচ সার্থক হয়েছে। তার পর আরও মজা শোন। তৃতীয় সারি শেষ ক'রে ছুঁড়ী ফিরে গেল। তার পর বললে, 'প্রত্যেক লোককে ছুঁয়ে, কার পকেটে কি আছে, আমি তা ব'লে দিতে পারি।' এই ব'লে আবার প্রথম সারি থেকে আরম্ভ করলে। এক এক জনকে ছোঁয় আর বলে—রুমাল, চাবি, পেন্সিল, নস্যির ডিপে ইত্যাদি। জনপ্রাণী কেউ প্রতিবাদ করলে না।

আমার সারিতে এসে, আমায় ছুঁয়ে ছুঁড়ী বললে—ঐ সব রুমাল চাবি-টাবি—আর একটা জিনিষ, যা বয়স্ক পুরুষমানুষের পকেটে থাকা সম্ভব নয়,—ছেলেপিলের পকেটে থাকতে পারে। বললে, ভাঙ্গা বিস্কুট। আমি চমকে, পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম হ্যাঁ, ভাঙ্গা বিস্কুট রয়েছে আমার পকেটে—কিন্তু সত্যি বলছি ভাই, আমার নিজেরই তা মনে ছিল না। হয়েছিল কি জান? তার চার পাঁচ দিন আগে, সেই কোট গায়ে পায়ে হেঁটে আমি সহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। চাঁদনীতে এসে বড় ক্ষিদে পায়। চার পয়সার বিস্কুট কিনেছিলাম, খানকতক খেয়েছিলাম, খান দুই পকেটে প'ড়ে ছিল।—এ আমার প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা। কি বলতে চাও তোমরা? সে ছুঁড়ী ঋষি-তপস্বীও নয়, সাধনাও করে না, গরু-শুয়োর খায়, মদ খায়, এবং সম্ভবতঃ খারাপ চরিত্রের মেয়ে। ও কি জান? কোন-কোনও লোকের ঐ রকম একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে,—তাকে ক্লেয়ার-ভয়েন্সই বল, আর দিব্যদৃষ্টিই বল, আর যাই বল।"

বিপিন বলিল, "মাদ্রাজ অঞ্চলের গোবিন্দ চেট্টির কথা শুনেছ ত? এই পনর-ষোল বছর আগেকার কথা। সে সময় খবরের কাগজে প্রায়ই তার কথা বেরুতো। তবে সে ভবিষ্যৎ বলতো না, বর্ত্তমান বলতো। মাদ্রাজে সে নিজের ঘরে ব'সে তোমায় ব'লে দেবে, দেশে তোমার মা সে সময় কি করছেন, বাবা কি করছেন, তোমার স্ত্রী কি করছেন, ইত্যাদি। কলকাতা থেকে কত লোক দেখতে গিয়েছিল। সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' কাগজে তার বিবরণ বেরিয়েছিল। মনে আছে, আমার বাবা বলতেন, 'যদি আমার দেহটা ভাল থাকতো, আমি যেতাম।' সেই গোবিন্দ চেট্টিও শুনেছিলাম বদ্ধ মাতাল।"

কুমুদবন্ধু থিওজফি সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছিল। সেও কয়েক-জন মহাত্মার আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা প্রকাশ করিল। এইরূপ আলোচনায় রাত্রি-ভোজনের সময় সমাগত হইল।

পরবর্ত্তী রবিবারে সুরেন্দ্র কয়েকজন মেসবন্ধুসহ কৃষ্ণনগর যাত্রা করিল। মেয়ে দেখিয়া সকলেই খুসী। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিল, কুন্দমালার চক্ষুতারকা সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মত কালো নহে, উহা ফিকা বাদামী রঙেরই বটে।

চার

আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহে কুন্দমালার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে দেশ হইতে তাহার পিতৃব্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরদিন সকলে সদলবলে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন।

শুভ-দিনে কুন্দমালার সহিত সুরেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। কৃষ্ণনগরেই কুশণ্ডিকা-ক্রিয়া শেষ করাইয়া কাকা-মহাশয় বর-কনে লইয়া দেশে গেলেন, বরযাত্রীরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ফুলশয্যার রাত্রিতে প্রথম সম্ভাষণের পর সুরেন্দ্র নববধূকে বলিল, "দেখ, আমাদের এ মিলন-ব্যাপারের সঙ্গে খুব একটা আশ্চর্য্য ঘটনা জড়িত আছে।"

কুন্দ কৌতূহলী হইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য ঘটনা?"

সুরেন বলিল, "যখন তোমাতে আমাতে বিয়ের কোনও কথাই হয়নি, যখন তোমার মামা আমাকে দেখতেও যান নি, তখনই আমাদের এক বন্ধু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, তোমাতে আমাতে বিয়ে অনিবার্য্য। আমার সে বন্ধুর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ভবিষ্যতের সব ঘটনা তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান।"

কুন্দ বলিল, "বল কি? আমার নাম তোমার সে বন্ধু জানলেন কি ক'রে?"

পটলডাঙ্গার বাসায় এক মাস পূর্ব্বে শনিবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সুরেন তাহা

সবিস্তারে বর্ণনা করিল। ‘কুন্দমালা’ নামটি শুনিবামাত্র কিছু না জানিয়াও সুরেন যে মধুর মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলিল না।

কুন্দ অবাক্ হইয়া সমস্ত শুনিতেছিল। সুরেনের কথা শেষ হইলে বলিল, “খুব আশ্চর্য্য ত! তোমার সে বন্ধু নিশ্চয়ই একজন খুব ভাল গুরু পেয়েছেন, যোগসিদ্ধ বোধ হয়?”

সুরেন্দ্র বলিল, “ছাই সিদ্ধ।”

“তবে? তিনি কি করেন?”

“এই, আমরা সকলেই যা করি। অন্নের জন্যে রাত জেগে বই মুখস্থ ক’রে এগ্‌জামিন পাশ করেছেন, তার পর চাকরীর উমেদারী।—ওটা কি জান? এক একজন মানুষের ঐ রকম একটা ক্ষমতা জন্মে যায়। আপনা আপনি জন্মায়, তার জন্যে জপ-তপ সাধনা-টাধনা কিছুই করতে হয় না। ওকে বলে ক্লেয়ারভয়েন্স—ক্লিয়ার ভিশন—দিব্যদৃষ্টি আর কি। আর, ওরকম ক্ষমতা যার আছে, তাকে বলে ক্লেয়ারভয়েণ্ট।”—মুরুব্বিয়ানা-স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া সুরেন গোবিন্দ চেট্টির ক্ষমতার কথা এবং অষ্ট্রেলিয়ান সার্কাস দলের সেই মেমের ক্ষমতার কথাও যথাশ্রুত বর্ণনা করিল।

কিয়ৎক্ষণ কুন্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর মিনতির স্বরে বলিল, “হ্যাঁগা, তুমি এবার যখন এখানে আসবে তাঁকে সঙ্গে ক’রে নিয়ে এস না। আমি তাঁকে দেখবো।”

সুরেন বলিল, “সে ত এখন কলকাতায় নেই। পাঞ্জাব গেছে চাকরী করতে। যে দিন সে ঐ সব কথা বললে, তার পরদিনই সে চ’লে গেছে। রাইবেরেলী হাই স্কুলের হেড মাষ্টারী চাকরী নিয়ে সে গেছে।”

কুন্দ শুইয়া ছিল, হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, “কি বললে? রাইবেরেলী ইস্কুলের হেড মাষ্টার?”

সুরেন, কুন্দমালার এই হঠাৎ উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া বলিল, “হ্যাঁ। কেন?”

“তোমার বন্ধুর নাম কি বল দেখি?”

“অতুল—অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।”

“ও আমার পোড়াকপাল!”—বলিয়া কুন্দ মুখে হাত চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি আর থামে না।

“কেন? কেন? হাসছ কেন?”—বলিয়া সুরেনও উঠিয়া বসিয়া, কুন্দমালার মুখ হইতে হাত টানিয়া খুলিয়া দিল।

আরও মিনিটখানেক হাসিয়া তার পর কুন্দ আত্মসম্বরণ করিতে পারিল। বলিল, “হাসছি কেন জান? তোমার সে বন্ধুটি যোগীও নন, ঋষিও নন, গোবিন্দ চেট্টিও নন, ক্লেয়ারভয়াণ্টও নন। তিনি আমার অতুল-দা। ঐ যে আমার মামা তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন, তিনি অতুলদার পিসেমশাই। অতুলদা ত কতবার এখানে এসেছেন। বাবা তাঁকে একটি ভাল পাস-করা পাত্রের সন্ধান করবার জন্যে চিঠি লিখেছিলেন, অতুলদা-ই ত বাবাকে তোমার কথা লেখেন। অতুলদা রাইবেরেলী চ’লে যাবেন ব’লেই দাদাকে নিয়ে মামা তাড়াতাড়ি ঐ দিন তোমায় দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন তোমাদের ভোজের সভায় ঐ ক্লেয়ারভয়েন্টগিরি ফলাচ্ছিলেন, তখন তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে, মামাবাবু দাদাকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিন ১০টার গাড়ীতে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা রওয়ানা হবেন। বাবা আগে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন যে!”

“তোমায় সে দেখেছে?”

“হাজার দিন।”

সুরেন কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর বলিল, “কি আশ্চর্য্য

এমন ব্যাপার? ভারি ঠকানটাই শালা আমাদের ঠকিয়েছিল ত! উঃ—আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দ্দা উঠে গেল। আমায় এক গেলাস জল দাও।"

সুশোভনা

এক

শরৎকাল, পূজার ছুটীতে সহরের আফিস আদালত সবেমাত্র বন্ধ হইয়াছে। সেদিন বেলা ৯টার সময় রাইনগর ষ্টেশনে, কলিকাতা হইতে আগত ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা হইতে গুলী, বন্দুক প্রভৃতি শিকারের সরঞ্জামসহ দুইজন বাঙ্গালী যুবক অবতরণ করিল। একজনের অঙ্গে ইংরাজি ধরণের শিকারীর বেশ—বয়স আন্দাজ পঁচিশ হইবে। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, রঙটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নাম অমরেন্দ্রনাথ মল্লিক। অপর যুবকটি বয়সে ইহার অপেক্ষা দুই একবৎসরের ছোট, হাতে বন্দুক থাকিলেও, পরিধানে ধুতি ও কোট। ইহার রঙটি অপেক্ষাকৃত ফরসা, দেহ-গঠনেও পারিপাট্য আছে—বিশেষ করিয়া তাহার চুলগুলি ও চোখ দুটি বড় সুন্দর। ইহার নাম সুকুমার মজুমদার। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরা হইতে খানসামার উর্দ্দি-পরা এক মুসলমান ভৃত্য নামিল। তাহার সঙ্গে নামিল আমকাঠের এক সিন্দুক এবং একটা বড় বালতী। ঐ বালতীর ভিতর একটা বিলাতী চুলা (ষ্টোভ) ও অন্যান্য জিনিষ ভর্ত্তি ছিল। যুবকদ্বয় ধীরপদে অগ্রসর হইয়া ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে গিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়াছে। কুলীর মাথায় আমকাঠের সিন্দুক ও হাতে বালতী দিয়া খানসামাও আসিয়া ওয়েটিং-রুমে প্রবেশ করিল এবং কুলীকে পশ্চাতের বারান্দায় লইয়া গিয়া জিনিষ-পত্র নামাইয়া, ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

বখশিস লইয়া কুলীটা প্রস্থান করিতেছিল, অমরেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কি রে, তোর নাম কি?"

"আজ্ঞে, আমার নাম হরিদাস, আমরা কৈবর্ত্ত।"

"এইখানেই বাড়ী?"

"আজ্ঞে না, এখান থেকে কোশ-তিনেক হবে।"

"আচ্ছা, কুমীরদীঘি কোথায় জানিস?"

"তা আর জানিনে হুজুর? আমাদের গাঁ থেকে কোশখানেক পথ বইত নয়!"

"এখান থেকে কত দূর, সেই দীঘি?"

"এখান থেকে কোশ-দুই-আড়াই হবে।"

"কুমীরদীঘিতে কি সত্যি সত্যি কুমীর আছে?"

"আজ্ঞে ছিল, খুবই ছিল। কলকাতা থেকে সাহেবরা এসে মেরে মেরে তাদের বংশনাশ ক'রে দিয়েছে। তবে এখনও কুমীর যে একেবারে নেই, তা বলতে পারলাম না, হুজুর!"

অমরেন্দ্র ইংরাজিতে সুকুমারকে বলিল, "আমাকে বন্দুক-টন্দুক, টিফিন-বাক্স বইবার জন্যে একটা লোক ত দরকার, একেই নিযুক্ত করা যাক না।"

সুকুমার বলিল, "সেই ভাল। সেই জায়গারই লোক, চেনে শোনে।"

অমরেন্দ্র হরিদাসের মজুরী স্থির করিয়া, সারাদিনের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিল। হরিদাস বলিল, "কখন বেরুতে হবে, হুজুর?"

"এই, আধ ঘণ্টা পরেই।"

"আজ্ঞে হুজুর, তবে আমি বাসা থেকে ঘুরে আসি।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

চায়ের জল তৈয়ারি হইলে, খানসামা টেবিল "লাগাইয়া" টিফিন-বাক্স হইতে লুচি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, ফুলকপি-ভাজা ইত্যাদি বাহির করিয়া মনিব ও তাঁহার বন্ধুকে "ব্রেকফাস্ট" খাওয়াইল। জলের পরিবর্ত্তে চা দিল।

ব্রেকফাস্ট খাইতে খাইতে অমরেন্দ্র দেখিল, কয়েকজন লোক দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া, হাঁ করিয়া তামাসা দেখিতেছে। অমরেন্দ্র খানসামাকে বলিল, "পর্দ্দাটা টেনে দে।" খানসামা ছুটিয়া গিয়া, তাহাদিগকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া, দ্বারের পর্দ্দা টানিয়া দিল।

প্রাতরাশ সমাধা করিয়া দুই বন্ধু সিগারেট সেবন করিতেছিল, হরিদাস আসিয়া পেঁৗছিল।

অমরেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে, মুর্গী পাওয়া যায় এখানে?"

হরিদাস অঙ্গুলি নির্দ্দেশে মুক্ত বাতায়ন-পথে দেখাইল, "হুজুর, ঐ যে দেখছেন মাঠের পারে আমগাছগুলো, ঐখানে মোমিনপুর গেরাম। ওখানে অনেক চাষী মুসলমানের বাস। তাদের কাছে তালাস করলে মুর্গী, এণ্ডা সবই পাওয়া যাবে।"

অমরেন্দ্র নিজ ভৃত্যকে বলিল, "আমরা বেরিয়ে গেলেই ঐ মোমিনপুরে গিয়ে গোটা দু'চ্চার মুর্গী আর ডজন-খানেক ডিম কিনে আনবি। রাত্রের জন্যে একটা মুর্গীর রোষ্ট আর একটা মুর্গীর কারি বানিয়ে রাখবি। আমরা ফিরে এলে, তার পর ভাত বানাবি—বুঝলি?"

খানসামা বলিল, "জী হুজুর।"

বিধাতাপুরুষ কিন্তু অদৃশ্যে থাকিয়া এই ভোজনের আয়োজন শুনিয়া হাসিলেন,—কারণ, এখন কিছুকাল এই দুই যুবকের অন্ন তিনি স্থানান্তরে "মাপাইয়া" রাখিয়াছিলেন।

খানসামা, প্রভুর আদেশ অনুসারে, তাহার আমকাঠের সিন্দুক হইতে, বরফজল-পরিপূর্ণ দুইটি বড় বড় থার্ম্মোফ্ল্যাস্ক বাহির করিয়া, টিফিন-বাক্স সাজাইতে বসিল। হরিদাস সন্দিগ্ধনেত্রে টিফিন-বাক্সের পানে চাহিয়া বলিল, "হুজুর, এই বাক্সে রান্না মুর্গী-টুর্গীও যাচ্ছে নাকি?" অমরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না রে না। ঐ দেখ্ না, কচুরি, সিঙ্গাড়া, সন্দেশ-টন্দেশ ছাড়া আর কিছু নেই। ও কচুরি-সিঙ্গাড়াও আমার বাড়ীর বামুন-ঠাকুরের ভাজা। তোর কোনও ভয় নেই।"

টিফিন-বাক্স, বন্দুকের বাক্স প্রভৃতি হরিদাসের মাথায় চাপাইয়া দুই বন্ধু শিকারে যাত্রা করিল। উভয়েই হিন্দুর ছেলে "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া যাত্রা করাই উচিত ছিল, কিন্তু কলির প্রাবল্যে সে কথা তাহাদের স্মরণ ছিল না।

দুই

এইখানে এই যুবকদ্বয়ের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক। কলিকাতা বাদুড়বাগানে উভয়েরই বাস, উভয়েই বৈদ্যবংশসম্ভূত। অমরেন্দ্রনাথ "মুখে রূপার চামচ" লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—তার পিতা অত্যন্ত ধনী ছিলেন, কলিকাতায় তাঁহার বিস্তৃত কারবার। নিজ বসত-বাটী ছাড়া এখানে ওখানে তাঁহার পাঁচখানি বাড়ী ভাড়া খাটে। তিনি এখন স্বর্গগত, তাঁহার একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রনাথই তাঁহার পরিত্যক্ত ব্যবসায় ও তাবৎ ভূসম্পত্তির মালিক। তিন বৎসর পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল, গত বৎসর তাহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। স্ত্রী সুভাষিণী রূপে-গুণে অমরেন্দ্রনাথের মনোমত সহধর্ম্মিণী, তাহার সহিত অমরেন্দ্রনাথের প্রণয় এখনও উদ্দাম। অমরেন্দ্র-

নাথের জননী, সধবা অবস্থাতেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী ছাড়া, গৃহে তাহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে, তার নাম সান্ত্বনা, এবং এক বৃদ্ধা জেঠাইমা আছেন, তিনি বধূর হাতে সংসারের ভার তুলিয়া দিয়া এখন হরিনাম জপ, এবং লোকজনকে তর্জ্জন-গর্জ্জন ও এ-কালের সর্ব্ববিষয়ের নিন্দা করিয়া কাল-যাপন করেন।

অপর যুবক সুকুমার মজুমদার দরিদ্রের সন্তান। তার পিতা অল্পবেতনে কেরাণী-গিরি করিতেন, দুইটি কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সুকুমারও কেরাণীগিরি করিয়া জীবন-যাপন করিতেছেন। গৃহে বিধবা জননী ছাড়া দুইটি ছোট ভাই এবং একটি অবিবাহিতা ভগিনীও বর্ত্তমান।

সাংসারিক অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও, অমরেন্দ্র ও সুকুমারের মধ্যে বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব অত্যন্ত নিবিড়। বিদ্যালয়ে তাহারা একই শ্রেণীতে পড়িত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অমরেন্দ্র পড়া ছাড়িয়া, পিতার হউসে প্রবেশ করে। সুকুমার বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল, কাজেই উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইল। বাপের আফিসের বড়সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে চাকরী দিলেন;—সেই চাকরীই সে করিতেছে।

আর একটি কথা বলিলেই ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ হয়। অমরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্য-ভাবে স্থির করিয়াছে, তাহার ভগিনী সান্ত্বনার সহিত সুকুমারের বিবাহ দিয়া নিজেদের বন্ধুত্ব পাকা করিয়া লইবে, এবং তাহার মনের গোপন অভিপ্রায়, বিবাহান্তে সুকুমারকে তার অল্পবেতনের কেরাণীগিরি ছাড়াইয়া নিজ ব্যবসায়ে শূন্য অংশীদার করিয়া লইবে। কিন্তু সান্ত্বনা অগ্রজের মনের এই গোপন অভিপ্রায় অবগত ছিল না। এখন সে আর নিতান্ত ক্ষুদ্র বালিকা নহে, তাহার বয়স হইয়াছে চতুর্দ্দশ বর্ষ। এ বিবাহের প্রস্তাব হওয়া অবধি সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আছে। সুকুমারদের বাড়ী সে কতবার গিয়াছে। সে বাড়ীতে বিদ্যুৎ নাই—সুতরাং ফ্যান নাই, এবং তেলের আলো জ্বলে। আসবাবপত্র কুশ্রী এবং বিরল। দাস-দাসী ও অশন-বসনের ব্যবস্থাও তাহার পিতৃগৃহের তুলনায় অত্যন্ত হীন। তাই এ বিবাহে তার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। ফলে সুকুমারকে দেখিলেই তাহার গা জ্বলিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটিয়া সে এ কথা কাহাকেও না বলিলেও, তার বৌদিদি তার মনের ভাব বুঝিতে পারেন, কিন্তু ইহা বালিকাসুলভ নির্ব্বুদ্ধিতা বিবেচনা করিয়া, ওটা বড় গ্রাহ্য করেন না।

বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসের সুরুতেই হইবে, ইহার স্থির হইয়া আছে।

তিন

চারিদিকে নীচু প্রাচীর-ঘেরা একটি ছোট বাগান, মধ্যস্থলে একটি নবনির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকা। ফটকের দুই পাশে দুইটি ঘর, একটিতে একজন দ্বারবান্ থাকে, অপরটিতে মালী বাস করে। গৃহের নিম্নতলের ঘরগুলি প্রায় সবই খালি মাত্র একটিতে বাড়ীর সরকার থাকে। বাটীর পশ্চাতে কয়েকটি মৃৎকুটীরে কয়েকজন দুলিয়া-জাতীয় লোক বাস করে, তাহারা গৃহস্বামীর পাল্কীবাহক। দ্বিতলে গৃহস্বামী তাঁহার একমাত্র কন্যাকে লইয়া বাস করেন, তাঁহার আর কেহ নাই।

দ্বিতলে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় একটি চেয়ারে পড়িয়া গৃহস্বামী পেন্সনপ্রাপ্ত সব-জজ্ বৃদ্ধ হরিশঙ্করবাবু মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন।

একটি ছোট টেবিলে রূপার ডিবায় দুই খিলি পাণ। অপর পার্শ্বে মেঝের উপর তাঁহার গুড়গুড়ি রহিয়াছে—সটকা-নলটি চেয়ারের হাতলের উপর পড়িয়া। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে কাগজ নামাইয়া নলটি তুলিয়া লইয়া কিঞ্চিৎকাল ধূমপান করিতেছেন, আবার

নল রাখিয়া কাগজ উঠাইয়া পাঠে মন দিতেছেন।

চটিজুতা পায়ে ষোল-সতেরো বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তার কুঞ্চিত কেশরাশি পিঠের উপর পড়িয়াছে—পরিধানে একখানি দেশী ডুরে শাড়ী, গায়ে শিমপাতা রঙের ফ্ল্যানেলের একটি হাপ-হাতা ব্লাউজ। রঙটি যাহাকে বলে দুধে-আলতা, চক্ষু দুইটি বড় বড়, দেহটি যৌবন-লাবণ্যে টলটল করিতেছে। মেয়েটি বৃদ্ধের চেয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা, আপনাকে আর দু'টো পাণ দিয়ে যাব কি?"

হরিশঙ্করবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "দিয়ে কোথা যাবি? শুতে?"

"না বাবা, আমি ছাদে যাব চুল শুকুতে।"

"তা যাবি যা, কিন্তু দিনের বেলায় ঘুমুসনে, মা। শীতকালে দিনে ঘুমুলে শরীর খারাপ হয়।"

"না বাবা, ঘুমুবো না আমি। যদি ঘুম পায়, নেমে বাগানে গিয়ে বেড়াব। কিন্তু পাণের কথা ত আপনি বললেন না, আর দু'টো পাণ দিয়ে যাব কি?"

হরিশঙ্করবাবু পাণের ডিবার পানে এক নজর চাহিয়া বলিলেন, "ঐ ত দু'টো রয়েছে, আর পাণ কি হবে?"

মেয়েটির নাম সুশোভনা। সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বোর্ডিং-এ থাকে, পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে।

সুশোভনা তখন ধীরপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আপন শয়ন-ঘরে গিয়া, টেবিলের উপর বিক্ষিপ্ত খানকয়েক বহি হইতে একখানি উপন্যাস বাছিয়া লইয়া ছাদে গিয়া দেখিল, বাটীর ঝি কিশোরীর-মা, আহারান্তে পাণ ও দোক্তা গালে দিয়া, এক বাটি দাইল-বাটা লইয়া বড়ী দিতে বসিয়াছে। সুশোভনা কিছুক্ষণ ঝির নিকট দাঁড়াইয়া তাহার বড়ী দেওয়ার কৌশল দেখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি ডাল বেটেছিস্, কিশোরীর-মা?" ঝি বলিল, "কড়াইয়ের ডাল, দিদিমণি।"

সুশোভনা তখন ঝির নিকট হইতে সরিয়া, ছাদের আলিসার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে, কোথাও একটা বৃক্ষের অন্তরাল পর্য্যন্ত নাই। মাঠের মাঝে উচ্চ পাড়যুক্ত কুমীরদীঘি নামক জলাশয়। সুশোভনা লক্ষ্য করিল, দীঘির পাড়ে তিনটি মনুষ্য বিচরণ করিতেছে—একজনের মাথায় শাদা শিকার-হ্যাট রৌদে চক্‌চক্ করিতেছে। বলিল, "ঐ দেখ্ কিশোরীর-মা, কারা আবার কুমীর মারতে এসেছে!"

কিশোরীর-মা বড়ী-হাত বাটির কাণায় মুছিয়া সুশোভনার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। সেই দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিল, "একজন সায়েব এসেছে দিদিমণি!"

সুশোভনা বলিল, "সায়েব তোকে কে বললে?"

ঝি বলিল, "দেখছনি, টোপা মাথায় দিয়ে বেড়াচ্চে।"

সুশোভনা বলিল, "সায়েব না হাতী! টোপা মাথায় দিলেই বুঝি সায়েব হয়? বাঙ্গালীরাও ত শিকার করতে যাবার সময় ইংরেজি কাপড় পরে, হ্যাট মাথায় দেয়। যা না, আমার ঘর থেকে দূরবীণটে নিয়ে আয় না, ভাল ক'রে দেখি ওদের।"

কিশোরীর-মা নামিয়া গিয়া, একটা বাইনকুলার দূরবীণ লইয়া আসিল। এটি তাহার গত জন্মদিনে তাহার পিতার উপহার। সুশোভনা বাইনকুলার চোখে দিয়া ফোকাস্ ঠিক করিয়া দীঘির পাড়ে মনুষ্যদিগকে দেখিল। একজন ইংরাজি বেশধারী এবং একজন ধুতি-পরা বাঙ্গালী, উভয়েরই হাতে বন্দুক! অপর ব্যক্তি মুটিয়া-শ্রেণীর বলিয়া বোধ হইল। তখন যন্ত্রটি ঝির হাতে দিয়া বলিল, "বাঙ্গালীই ত। সবাই বাঙ্গালী। দ্যাখ্।"

ঝি কিন্তু যন্ত্রটি চোখে লাগাইয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। সে কথা সে বলিলে, সুশোভনার স্মরণ হইল, বয়সের পার্থক্য-হেতু উভয়ের দৃষ্টিশক্তির তারতম্য হওয়াই স্বাভাবিক। তখন সে ঝির চক্ষুলগ্ন যন্ত্রটির পেঁচ ঘুরাইতে লাগিল; ক্ষণকাল পরে

ঝি বলিল, "হ্যাঁ, এইবার বেশ পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সায়েব ত নয়, বাঙ্গালীই ত বটে, দিদিমণি!"

কয়েক মুহূর্ত্ত ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া, ঝি বলিল, "ঐ দেখ দিদিমণি, অন্য লোক দুটো স'রে গেল, সায়েবটা শুয়ে পড়লো।"

সুশোভনা বলিল, "বোধ হয়, কোনও কুমীরে গা ভাসান দিয়েছে, গুলী করবে।" —বলিয়া যন্ত্রটি চাহিয়া লইয়া সে নিজ চক্ষুতে লাগাইল।

তাহার অনুমানই সত্য হইল। ধোঁয়া দেখা গেল, দুই তিন সেকেন্ড পরেই বন্দুকের আওয়াজও কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল।

সুশোভনা দেখিল, শিকারী উঠিয়া দাঁড়াইল, যে লোক দুই জন পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছিল, তাহারাও ছুটিয়া আসিল। তিনজনেই একত্র উচ্চ পাড় হইতে নামিতে লাগিল, এবং হঠাৎ শিকারী পদস্খলিত হইয়া, গড়াইতে গড়াইতে জলের কাছে গিয়া স্থির হইল।

সুশোভনা দূরবীণ নামাইয়া বলিয়া উঠিল, "যাঃ, প'ড়ে গেল।"

"কে দিদিমণি?"

"ঐ শিকারী।"

"দূরবীণটে দাও না দিদিমণি, দেখি।"

"দাঁড়া!"—বলিয়া সুশোভনা দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, অপর লোক দুইজন সাবধানে পাড় হইতে নামিয়া সেই শিকারীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শিকারীর নিকট তারা ঝুঁকিয়া বসিল। একজন দীঘি হইতে জল আনিয়া শিকারীর মুখে-চোখে সেচন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে, ভূপতিত ব্যক্তি উঠিয়া বসিল, তার পর আবার সে শুইয়া পড়িল।

সুশোভনা বলিল, "আহা, বড্ড বোধ হয় জখম হয়েছে!" বলিয়াই তাহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। আহা, এই জনশূন্য তেপান্তর মাঠে, এই বিপদে, উহাদের কি হইবে? বাইনকুলার ঝির হাতে দিয়া, সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গিয়া ডাকিল—বাবা।"

হরিশঙ্করবাবুর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি মা?"

সুশোভনা বলিল, "বাবা, কুমীরদীঘিতে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক শিকার করতে এসে, পাড় থেকে নীচে প'ড়ে ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন। এই তেপান্তর মাঠের মধ্যে তাঁর কি উপায় হবে, বাবা?"

হরিশঙ্করবাবু চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কে বললে তোমায়?"

"আমি ছাদ থেকে বাইনকুলার দিয়ে দেখছিলাম বাবা। তাঁকে প'ড়ে যেতে দেখলাম। অজ্ঞান হয়ে গেছেন বোধ হ'ল।"

"কতক্ষণ?"

"এখনও পাঁচ মিনিট হয়নি বোধ হয়। বাবা, পাল্কী-বেয়ারা ছুটিয়ে দিন, তাঁকে নিয়ে আসুক এখানে। নইলে আর ত কোনও উপায় নেই!"

হরিশঙ্করবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নিজেই তা হ'লে পাল্কী নিয়ে যাই। তুমি ততক্ষণ এক কাজ কর, মা। তাকে এনে উপরে তোলা বোধ হয় চলবে না। নীচের ঘরে যে লোহার খাটখানা আছে, তারই উপর ততক্ষণ বিছানা ক'রে রাখ। আমার জামাটা জুতোটা দাও।"

সুশোভনা ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া পিতার জামা ও জুতা লইয়া আসিল। পাল্কী-বাহকগণ বাড়ীতেই থাকিত—তাহারা তখন আহারান্তে দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। পাল্কীতে বিছানা বিছাইয়া হরিশঙ্করবাবু স্বয়ং উহাতে আরোহণ করিয়া কুমীরদীঘি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুশোভনা ছাদে গিয়া ঝির হাত হইতে বাইনকুলার লইয়া, চোখে লাগাইয়া দেখিল,

শিকারীর সঙ্গে যে দুইজন লোক ছিল, তাহাদের একজন কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে,—অপর জন আহতের শুশ্রূষায় নিযুক্ত। তার পর ঝিকে বলিল, "কিশোরীর-মা, বাবা রোগীকে আনতে পাল্কী নিয়ে নিজে গেছেন। নীচের ঘরে যে লোহার খাটখানা আছে, তাতে গদি পাতাই আছে, গদিটার ধুলো বেশ ক'রে ঝেড়ে, তার উপর একখানা তোষক আর একটা সাফ চাদর পেতে, বালিস-টালিস দিয়ে বিছানা পেতে রাখ্ গে—বাবা ব'লে গেছেন।"

"ও মা, কি আপদ হ'ল! হে মা মধুসূদন!"—বলিয়া ঝি প্রস্থান করিল।

সুশোভনা দেখিতে লাগিল। ঐ তাহার পিতার পাল্কী ছুটিয়াছে। এক মিনিট, দুই মিনিট, প্রায় মাঝামাঝি গিয়া পেঁছিল। হঠাৎ একটা কথা তাহার স্মরণ হইল। সে নীচে নামিয়া গেল। কিশোরীর-মা তোষক ও বিছানার চাদর অন্বেষণে-ব্যাপৃত। সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "কিশোরীর-মা, তুই চুণে-হলুদ তৈরি করতে জানিস?"

"হ্যাঁ দিদিমণি, তা আর জানিনে?"

"তবে যা, তুই হলুদ বেটে একটা এনামেলের বাটিতে চুণ আর হলুদ মিশিয়ে ষ্টোভ জ্বেলে চড়িয়ে দিগে যা, বিছানা-টিছানা আমিই সব ঠিক ক'রে রাখছি।"

কিশোরীর-মা চলিয়া গেল। তোষক প্রভৃতি লইয়া সুশোভনা শয্যা প্রস্তুত করিয়া, আবার ছাদে গিয়া উঠিল। যন্ত্রে চক্ষুলগ্ন করিয়া দেখিল, পাল্কী ফিরিতেছে—তাহার পিতা ও অপর ভদ্রলোকটি পদব্রজে আসিতেছেন। পাল্কী দ্রুত আসিতেছে।

তাই ত, রোগী আসিয়া পড়িবে, পিতা পশ্চাতে রহিলেন যে! সুশোভনা আবার নামিয়া গেল। সরকারবাবুকে ডাকিয়া তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিল। সরকারবাবু ফটকের নিকট গিয়া দ্বারবান্ ও মালীকে ডাকিয়া, রোগীকে নামাইয়া বিছানায় লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন। বামুনঠাকুর ও রামকিষণ ভৃত্যও সাহায্য করিবে। সুশোভনা বারান্দায় উঠিয়া পথপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে পাল্কী আসিয়া পেঁছিল। পাল্কী বারান্দার উপরে উঠানো হইল। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া রোগীকে নামাইয়া শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া দিল। রোগী যন্ত্রণায় কাৎরাইতে কাৎরাইতে, একবার চক্ষু খুলিয়া সুশোভনার প্রতি চাহিল। বলিল, "টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতা থেকে ডাক্তার আনান্—বড় যন্ত্রণা।"

সুশোভনা বলিল, "তাই আনাচ্ছি। বাবা আসুন। আপনার কোন্খানে বেশী লেগেছে, বলুন দেখি!"

রোগী কাৎরাইতে কাৎরাইতে বাম পদে হাঁটুর নিম্নস্থান দেখাইয়া বলিল, "বোধ হয়, ফ্র্যাকচার হয়েছে।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই হরিশংকরবাবু রোগীর বন্ধু সুকুমারের সঙ্গে আসিয়া পেঁছিলেন। চুণে-হলুদ প্রস্তুত জানিয়া তিনি জখমের স্থানে উহা লাগাইয়া ফ্ল্যানেল জড়াইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হইল, তাহার কাৎরানি বন্ধ হইল, নিদ্রার আবেশ দেখা দিল।

হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে কলকাতায় যাবার ট্রেণ ত নেই—তাতে অনেক সময় নষ্ট হবে যে! বরঞ্চ অমরবাবুর ফার্ম্মের ম্যানেজার—কি নাম বললেন যে—তাঁকে টেলিগ্রাম ক'রে দিন, তিনি মেডিকেল কলেজের কোন ভাল সার্জ্জনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। এখন বেলা দেড়টা—সন্ধ্যা নাগাদ তিনি ডাক্তার নিয়ে এসে পড়তে পারবেন।"

তদনুসারে রোগীর অবস্থার সব কথা খুলিয়া একখানি দীর্ঘ টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল।

রোগী জাগিলে, মাঝে মাঝে তাহাকে গরম দুধ পান করানো হইল।

বেলা পাঁচটার সময় তার আসিয়া পেঁছিল, ম্যানেজারবাবু সাহেব ডাক্তারসহ সন্ধ্যা

আটটার ট্রেনে আসিয়া পেঁছিবেন, অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনী ঐ সঙ্গে আসিতেছেন; স্টেশনে যান-বাহনের যেন ব্যবস্থা থাকে।

হরিশঙ্করবাবু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার সরকারকে স্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। সুকুমার বলিল, "সরকার-মশাই, অমরেন্দ্রবাবুর একজন বাবুর্চি এসেছিল আমাদের সঙ্গে, ওয়েটিং-রুমে বারান্দায় তাকে দেখতে পাবেন, তাকে একখানা টিকিট কিনে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বলবেন, এই টাকা নিন।"

রাত্রি নয়টার মধ্যেই সকলে আসিয়া পেঁছিলেন।

ডাক্তার সাহেব অমরেন্দ্রনাথের ভাঙ্গা হাড় "সেট" করিয়া মক্কমরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া, এক্সটেন্সন প্রোসেসে লোহার শিকের ফর্ম্মায় উহা আটকাইয়া, সেই ফর্ম্মা পালঙ্কের ছত্রীতে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিলেন। ভাঙ্গা পা বিছানা হইতে চার-পাঁচ ইঞ্চি উর্দ্ধে, বদ্ধ অবস্থায় দোদুল্যমান। বলিলেন, পুরা তিন সপ্তাহকাল, যত দিন ভাঙ্গা হাড় না যোড়া লাগিবে, ততদিন রোগীকে এই অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। সে শুইয়া থাকিবে, যদি যন্ত্রণাবোধ না হয়, তবে একটু উঠিয়া বসিতেও পারে। কিন্তু শয্যাত্যাগ করিতে পারিবে না।

ডাক্তার সাহেব সপ্তাহে একবার করিয়া আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইবেন স্থির হইল।

অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ও ভগিনী উভয়েই এখানে রহিয়া গেলেন। সুকুমারও রহিল। হরিশঙ্করবাবু ও তাঁহার কন্যার যত্ন ও সৌজন্যে সকলেই আপ্যায়িত।

চার

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে—এখনও অমরেন্দ্রনাথের বদ্ধাবস্থা। প্রথমে ডাক্তার সাহেব তিন সপ্তাহের কথা বলিলেও, গত সপ্তাহে তিনি রোগীর ভাঙ্গা পায়ের এক্স-রে ফটো তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এ সপ্তাহে সেই ছবি আনিলেন এবং সকলকে উহা দেখাইলেন যে, হাড় বেমালুমভাবে যোড়া লাগিয়া গিয়াছে। বলিলেন, তথাপি নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য আরও দুই সপ্তাহ রোগীর বাঁধন খুলিবেন না। বাঁধন খুলিলেও রোগী বাড়ী যাইতে পাইবে না, এক সপ্তাহ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া পায়ে মালিস করাইতে হইবে, কারণ, এই দীর্ঘকালের অ-সঞ্চালনে পা অসাড় হইয়া গিয়াছে, আরও যাইবে।

অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুভাষিণী ও ভগিনী সান্ত্বনা দু'জনেই এখানে। প্রথম চারি পাঁচ দিনের পর যখন দেখা গেল যে, রোগীর কোনও প্রকার দৈহিক যন্ত্রণা আর নাই, অধিক শুশ্রূষারও আবশ্যক হয় না, তখন ইঁহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, সান্ত্বনাকে লইয়া সুভাষিণী ফিরিয়া যাউন, গৃহস্থের যথেষ্ট আশ্রমপীড়া ঘটানো হইতেছে, তাহার যতটুকু লাঘব করা যায়। সুকুমারের আপিস খুলিলে একদিনমাত্র গিয়া সে এক মাসের ছুটী লইয়া আসিয়া এখানে থাকুক। কিন্তু হরিশঙ্করবাবু কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি হন নাই—বিনীতভাবে উত্থাপিত আশ্রমপীড়ার কথা তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "আমরা এতগুলি লোক যদি দু'বেলা দু'মুটো খেতে পাই, তবে তোমাদেরও দু'মুটো খাওয়াতে আমার কষ্ট হবে না। এই সংকটের দিনে স্ত্রী, ভগিনী কাছে থাকলে, আর কিছু না হোক, মনটাও ভাল থাকবে, তাই কি কম লাভ? না না, ও সব ছেলেমানুষী খেয়াল তোমরা ছেড়ে দাও।"

ও দিকে আবার এক বিষম বিভ্রাট বাধিয়া গিয়াছে। সুভাষিণী, সান্ত্বনা রোগীর পরিচর্য্যার জন্য রহিয়া গেল, সুকুমারের থাকিবার বিশেষ কিছু আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু সে-ও আছে। আপিস খুলিবার দিন আপিসে গিয়া সে দুই সপ্তাহের ছুটী

লইয়া আসিয়াছে—এবং তাহার থাকিবার কারণ যে নিছক বন্ধুপ্রীতি, এ কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। আসল কথা এই যে, এ বাড়ীর মেয়ে সুশোভনাকে তাহার বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। সান্ত্বনা, সুভাষিণী প্রায় সারাদিনই রোগীর নিকট থাকে, সুকুমার আসিলে সুভাষিণী একটু সংকুচিতা হয়, সান্ত্বনা "মুখ হাঁড়ি" করে,—সুতরাং রোগীর পার্শ্বে বসিয়া থাকার তাহার প্রয়োজনও হয় না এবং উহা প্রীতিকরও নয়। সুতরাং সে প্রায় সারাদিন সুশোভনার আশে-পাশেই থাকে এবং এটাও সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সুশোভনা তাহাতে বিরক্ত ত নয়ই, বরং তাহার উল্টা। সুশোভনা ও সান্ত্বনাকে যখনই সে একত্র দেখে, তখনই তাহার মনের কম্পাস-কাঁটা সান্ত্বনার প্রতি বিমুখ হইয়া, সুশোভনার প্রতি বেগে ধাবিত হয়। মেয়েরা স্নান করিতে গেলে, সুকুমার আসিয়া বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে বসে। বন্ধুকে সব কথাই সে বলিয়াছে।

কবে এবং কি অবস্থায় ইহাদের দুজনের মন জানাজানি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু সুশোভনার কলেজ খুলিবার দুই দিন পূর্ব্বে, অপরাহ্ণে বাগানের আমগাছের ছায়ায় লোহার বেঞ্চে বসিয়া দুইজনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

সুকুমার। পরশু ত তোমার কলেজ খুলছে, তুমি ত চললে!

সুশোভনা। হ্যাঁ, যেতেই ত হবে। ঐ দিন তোমারও ত ছুটী ফুরোবে?

সুকু। হ্যাঁ, আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু তার আগে বাবার কাছে আমি কথাটা পাড়তে চাই, তুমি কি বল?

সুশো। আমি আর কি বলবো? বাবা শুনে যে কি বলবেন, তাই ভেবেই আমার গা কাঁপছে।

সুকু। আমি অবশ্য তাঁকে বলবো যে আমার সাংসারিক অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ জেনে শুনেই তুমি আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছ। তা' হলেও কি তিনি অমত করবেন?

সুশো। কি জানি, হয়ত বলবেন, ও ছেলেমানুষ, ও নিজের ভাল-মন্দের কি বোঝে, ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়।

সুকু। তিনি যদি বোঝেন যে, আমাদের এই মিলনে বাধা দিলে দুটো বুক ভেঙ্গে যাবে—আমার যাক না হয়, তাতে তাঁর কি আসে যায়?—তোমার বুকও ভেঙ্গে যাবে—তা হ'লে কি তিনি মত না দিয়ে থাকতে পারবেন? মা যদি বেঁচে থাকতেন এ সময়, তা হ'লে বোধ হয়, আমাদের এত ভাবতে হ'ত না।

সুশো। বাবা যে মা'র চেয়ে আমায় কম ভালবাসেন, তা নয়। কিন্তু তবু ভয় যে ঘোচে না!

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর সুকুমার বলিল, "আচ্ছা, কলকাতায় কি তোমাতে আমাতে দেখা-সাক্ষাৎ সম্ভব হবে না?"

সুশো। তা কি রকম ক'রে হবে?

সুকু। বোর্ডিং-এ ত মেয়েদের আত্মীয়-বন্ধুরা গিয়ে দেখা করতে পারে, সপ্তাহে একদিন না মাসে একদিন, কি একটা নিয়ম আছে, শুনেছি।

সুশো। হ্যাঁ, সে বাপ-মা। অন্য কেউ দেখা করতে চাইলে, বাপের চিঠি চাই।

সুকু। আচ্ছা, বাবা যদি রাজি হন, তা হ'লে তিনি কি আমাকে ঐ রকম চিঠি দেবেন না?

সুশো। কি জানি। কিন্তু বাবা অনুমতি দিলেও, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে মহা মুস্কিল হবে যে।

সুকু। কেন?

সুশো। অন্য মেয়েরা সবাই আমায় জিজ্ঞাসা করবে, ও তোর কে? তুমি যে

আমার কে, এবং কি, তা ত আমি প্রকাশ করতে পারবো না! তা হ'লেই তারা বুঝে নেবে—ভারি ঝানু মেয়ে সব। তখন ঠাট্টা ক'রে তারা আমায় দেশছাড়া করবে যে। কিন্তু তার দরকারই বা কি? সে শুভযোগই যদি আসে, বাবা যদি সম্মতই হন, তা হ'লে পরীক্ষা পর্য্যন্ত এ ক'টা মাস কি আমরা ধৈর্য ধ'রে থাকতে পারবো না?

এই সময় দেখা গেল, রামকিষণ ভৃত্য এই দিকে আসিতেছে, সুতরাং ইহারা কথা-বার্ত্তা স্থগিত রাখিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের চা কি এইখানে পাঠানো হবে, না আপনারা টেবিলে যাবেন?"

সুকুমার সুশোভনার প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এইখানেই আনুক না।" কিন্তু সুশোভনা বলিল, "না, আমরা বাড়ীতেই যাই চল। রামকিষণ, বাবাকে বলগে, আমরা আসছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে সুশোভনা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার সঙ্গে ও-কথা কখন কইবে তুমি?"

"রাত্রে, খাওয়ার পর। তুমি কি বল?"

"বেশ।"

পাঁচ

রাত্রিতে আহারের পর, সুশোভনা সুভাষিণীর সহিত দেখা করিতে রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিল, সুকুমার হরিশঙ্করবাবুর সহিত উপরে চলিয়া গেল।

হরিশঙ্করবাবু বারান্দায় ইজি-চেয়ারে উপবেশন করিলেন। রামকিষণ তামাক দিয়া গেল। হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "সুকুমার, তোমায় কবে আপিসে জয়েন করতে হবে?"

"পরশু। কালই আমি কলকাতায় ফিরবো ভাবছি।"

"কোন্ ট্রেণে?"

"বিকেলের ট্রেণে!"

"আমিও ত ঐ ট্রেণেই শোভনাকে কলেজে রাখতে যাব।"

"ভালই হ'ল, তা হ'লে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।" বলিয়া সুকুমার নীরব হইল। হরিশঙ্করবাবুও নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

প্রায় এক মিনিটকাল অপেক্ষা করিবার পর সুকুমার হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হরিশঙ্কর-বাবু, আজ আমি একটা বিশেষ কথা আপনাকে বলবার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

হরিশঙ্করবাবুর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল, কিন্তু অন্ধকারে সুকুমার উহা দেখিতে পাইল না। তিনি শান্তস্বরে বলিলেন, "কি বলবে, বল।"

সুকুমার তখন তাহার আবেদন জানাইল। নিজ দারিদ্র্যের কথাও অপকটে প্রকাশ করিল। সুশোভনা যে উহা জানিয়া শুনিয়াই তাহার সহধর্ম্মিণী হইতে সম্মত, সে কথাও বলিতে সে ত্রুটি করিল না।

সুকুমারের কথা শেষ হইলে, হরিশঙ্করবাবু কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। সুকুমারের বুকটি দুরু দুরু করিতে লাগিল,—খুনী আসামী যেন জজ সাহেবের রায় শুনিতে আসিয়াছে।

অবশেষে হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, সুকুমার, তোমরা ত পাকা হিন্দু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ বিলেত-টিলেত গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে না।"

"তোমার মা বেঁচে আছেন বলেছিলে না?"

"হ্যাঁ।"

হরিশঙ্করবাবু আবার মৌনভাব ধারণ করিলেন। সুকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাঁহার এ সব প্রশ্নের অর্থ কি?

শেষে হরিশঙ্করবাবু বলিলেন, "দেখ, তুমি তোমার সাংসারিক অবস্থার কথা যা বললে, সেটা আমার পক্ষে কোনও বাধা নয়। মেয়ের বিয়ের সময় জামাইকে আমি যে যৌতুক দেবো, তাতে অনেক বছর তাদের জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারবে। আমার ঐ একমাত্র মেয়ে। আমার অবর্ত্তমানে সমস্তই আমার মেয়ে-জামাইয়ের হবে। তবে আর একটু বাধা আছে—সে বিষয়ে আজ রাতটা আমায় বিবেচনা করতে সময় দাও —আমি কা'ল সকালে তোমার কথার উত্তর দেবো।"

পরদিন বেলা আটটার সময় সুকুমার যখন হরিশঙ্করবাবুর শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তাহার মুখখানি উল্লসিত।

নীচে নামিবার সিঁড়ির কাছে সুশোভনা দাঁড়াইয়া ছিল, কোন ভৃত্যাদি তখন সেখানে নাই। সুশোভনা অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বললেন?"

সুকুমার সুশোভনাকে বক্ষে জড়াইয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিল, "আসছি, এসে বলবো।"—বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে নিম্নে অবতরণ করিল। সুশোভনাও হাসি-মুখে নিজ কার্য্যে গেল।

সুকুমার রোগীর কক্ষে গিয়া দেখিল, অমরেন্দ্র একা। জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা কোথায়?"

অমরেন্দ্র বলিল, "স্নানের ঘরে।"

"ভালই হ'ল।"—বলিয়া সুকুমার শয্যাপার্শ্বস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বন্ধুর হাতখানি ধরিয়া বলিল, "ভাই, আমি তোমার বোনকে বিয়ে করতে পারবো না বলেছিলাম, তাতে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলে, নয়?"

"সেটা ত খুব স্বাভাবিক।"

"না ভাই, তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না, আমার উপর রাগ কোরো না, তোমার বোনকেই আমি বিয়ে করবো।"

"কেন, কি হ'ল? সুশোভনা সম্বন্ধে হরিশঙ্করবাবু অমত করলেন? তবে তোমার মুখ এমন হাসি হাসি কেন? তুমি যে একটি প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়ালে হে!"

"তোমায় বুঝিয়ে বলছি। হরিশঙ্করবাবু একটা বাধা সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে আজ আমার প্রস্তাবের উত্তর দেবেন বলেছিলেন, জান ত?"

"কা'ল রাতে তুমি আমায় ব'লে গিয়েছিলে।"

"ওঁর বাধাটা কি শোন। শোভনা ওঁর ঔরস-কন্যা নয়, ওঁর পালিতা-কন্যা, একরকম কুড়িয়ে পাওয়া। ও কি জাতের মেয়ে, তা-ও তিনি জানেন না। আমরা পাকা হিন্দু, হয়ত সব কথা জানলে আমাদের আপত্তি হ'তে পারে, তাই ছিল ওঁর বাধা। চৌদ্দ বছর পূর্ব্বে, তিন বছর বয়সের সুন্দরী মেয়েটিকে কোথায় কি অবস্থায় তিনি পেয়েছিলেন, সমস্ত আমায় আজ বললেন।"

"কোথায় পেয়েছিলেন?"

"লক্ষ্ণৌয়ে।"

শুনিবামাত্র অমরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল। বলিল, "লক্ষ্ণৌয়ে?"

সুকুমার বলিল, "হ্যাঁ, লক্ষ্ণৌয়ে। যে বদমাইসরা লক্ষ্ণৌয়ে তোমার বোনকে চুরি ক'রে নিয়ে যায়, তারা ওকে তিনশো টাকায় এক পতিতা স্ত্রীলোকের কাছে বিক্রী করেছিল। হরিশঙ্করবাবু তার কিছুদিন পরেই সস্ত্রীক লক্ষ্ণৌয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌ-

-বাসী ওঁর এক মনুসলমান বন্ধুর কাছে মেয়েটির কথা শোনেন,—আর শোনেন যে, বদমাইসরা বলেছিল, ওটি বাঙ্গালীর মেয়ে। উনি সেই পতিতা স্ত্রীলোককে পুলিসের ভয় দেখিয়ে, তার উপর পাঁচশো টাকা দিয়ে, মেয়েটি কিনে নেন। তার পর থেকে নিজের মেয়ের মত পালন করেছেন। তোমার বোন হারানোর সমস্ত ইতিহাসই আমি তোমার কাছে, তোমার বাবার কাছে, তোমার মা'র কাছে শনুনেছিলাম ত! স্থান, কাল. সমস্তই দেখ মিলে যাচ্চে। সনুশোভনাই যে তোমার সেই হারানো বোন তাতে আমার মনে ত কোন সন্দেহই নেই।"

অমরেন্দ্র বলিল, "তুমি এ কথা হরিশঙ্করবাবনুকে বলেছ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"ভাই, তুমি একবার গিয়ে তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস, আমি নিজে তাঁকে সব কথা জিজ্ঞাসা করি।"

হরিশঙ্করবাবনু আসিলেন। বোন হারানোর সময় অমরেন্দ্রনাথ বারো বৎসরের বালক। সকল কথাই তার স্মরণ ছিল। হরিশঙ্করবাবনুর প্রদত্ত বিবরণ সমস্তই ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল।

অমরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সনুশোভনার বাঁ-কননুয়ের উপর-টায় একটা জড়নুল আছে কি? আমার নিজের অবশ্য সেটা ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু মা'র কাছে আমি শনুনতাম যে, আমার সে বোনের হাতে ঐ চিহ্ন ছিল।"

হরিশঙ্করবাবনু বলিলেন. "হ্যাঁ, ঠিক সেইখানে জড়নুল আছে।"

স্থির হইল, এখন শোভনাকে এ-সব কথা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ, হরিশঙ্করবাবনু তাহার জন্মদাতা পিতা নহেন শনুনিলে বালিকার হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে। বিবাহের পর, সময় বনুঝিয়া, প্রয়োজনীয়তা বনুঝিয়া সনুকুমারই তাহাকে আসল কথা জানাইবে।

ঘড়ি

ঘড়ি অর্থে ঘটিকা-যন্ত্র নহে। উহা একজন ষোড়শী পাহাড়িয়া সনুন্দরীর নাম। বায়নু-পরিবর্ত্তন জন্য পাহাড়ে গিয়া সেই ঘড়িকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছিলাম, কেবল মা মঙ্গলচন্ডীর কৃপায় সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সে কথা পরে বলিব, আগের কথা আগে বলাই ভাল।

ইদানীং কিছনুদিন হইতে আমার স্বামীর শরীরটা তেমন ভাল যাইতেছিল না, মাঝে মাঝে জ্বর হয়, হজমের গোলমাল, রাত্রিতে ভাল ঘনুম হয় না—এইরনুপ নানানখানা, ঔষধ-পত্রও খান, কিন্তু ফল তেমন পাওয়া যায় না। বয়স হইয়াছে (আমার হয় নাই, আমি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) তার উপর আপিসের হাড়ভাঙ্গা খাটনুনী, (তিনি আলিপনুরের ট্রেজারির হাকিম) সহ্য হইবে কেন? তাই তাঁহাকে বলিলাম, "তোমার ছনুটি.ত ঢের পাওনা রয়েছে, মাস-তিনেকের ছনুটি নিয়ে দার্জ্জিলিঙ কি সিমলে পাহাড়ে গিয়ে হাওয়া বদলাবে?"

তিনি বলিলেন, "ছনুটি ত পাওনা আছে। কিন্তু ধর, দার্জ্জিলিঙ কি সিমলে পাহাড়ে গিয়ে তিন মাস বাস করা, সে ত বিস্তর খরচ।"

আমি বলিলাম, "টাকা আগে, না প্রাণটা আগে?" বহনু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, প্রাণটাই আগে। এপ্রিল, মে ও জনুন তিন

মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিলেন, এ-দিকে দার্জ্জিলিঙে তাঁহার এক বন্ধুকে চিঠি লিখিলেন, যেন মাসিক শ'খানেক টাকা ভাড়ায় একটি ভাল বাড়ী তিনি ঠিক করিয়া রাখেন।

সংসারে আমাদের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটি ওঁর প্রথম পক্ষের, নাম সুধীরকৃষ্ণ, আমরা ডাকি সুধা বলিয়া। আমায় যখন উনি বিবাহ করিয়া আনিলেন, তখন সুধার বয়স নয় মাস মাত্র। আমিই সুধাকে মানুষ করিয়াছি। সুধা বড় হইয়া জানিয়াছে বটে যে, আমার গর্ভে সে জন্মে নাই—কিন্তু তাহা মস্তিষ্কের ভিতর জানিয়াছে মাত্র,—হৃদয়ের ভিতর সে জানে যে, আমি উহার জননী। সুধার বয়স একুশ বছর, সে বি-এ পড়িতেছে, আগামী বৎসর পাস দিবে। কন্যার নাম ইন্দিরা; কিন্তু আমরা ডাকি খুকী বলিয়া—যদিও সে নিতান্ত খুকী নহে, চৌদ্দ বৎসরের হইয়াছে, গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। তাহার বিবাহ এখনও দিই নাই, মেয়ের ষোল বছর বয়স হওয়ার আগে বিবাহ দেওয়া উঁহার মত নয়।

ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে, কিন্তু দার্জ্জিলিঙের বন্ধু চিঠি লিখিয়াছেন, দার্জ্জিলিঙে এবার অত্যন্ত ভীড়, একশো টাকার ভিতর ভাল বাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, কার্সিয়াঙে ঐ টাকায় ভাল ভাল বাড়ী পাওয়া যায়, যদি মত হয় ইত্যাদি। উনি বলিলেন, তবে চল, কার্সিয়াঙেই যাওয়া যাক্। সেইমত চিঠি লিখিয়া দেওয়া হইল। কয়েক দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল—"আমি নিজে কার্সিয়াঙে গিয়া, সেণ্ট মেরি পাহাড়ের গায়ে একখানি সুন্দর বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়াছি, তিন মাসে দুই শত পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিতে হইবে। সেখানে আমার এক বন্ধু ডাক্তার গিরিজাবাবু আছেন, তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি, তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি কোন্ তারিখে পৌঁছিবেন, তাঁহাকে আপনি পত্র লিখিবেন, তিনি আপনার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।" ইত্যাদি।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কলেজ বন্ধ হইতে তখনও তিন সপ্তাহ বিলম্ব আছে, খুকীর ছুটী হইতে বুঝি এক মাস। উনি বলিলেন, খুকীর স্কুল কামাই হয় হউক, সুধার কলেজ কামাই করিয়া কাজ নাই, শেষে পার্সেণ্টেজের গোলমাল হইতে পারে। সুধা তাহার এক সহপাঠী বন্ধুর সহিত বন্দোবস্ত করিল, তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া তিন সপ্তাহ সে কলেজ করিবে—কলেজ বন্ধ হইলে আমাদের নিকট যাইবে। আমাদের এক বামুন-ঠাকুর আছে, রামখেলাওন নামে এক ভৃত্য আছে এবং সতু বা সত্যবতী নামে এক ঝি আছে। আমাদের ক্ষুদ্র সংসার, বেশী চাকরবাকর লইয়া কি করিব, ইহাতেই আমাদের বেশ চলিয়া যায়। স্থির হইল, বামুন-ঠাকুর ও রামখেলাওন আমাদের সঙ্গে যাইবে, ঝি তিন চারি বৎসর বাড়ী যায় নাই, অনেক দিন হইতে সে ছুটী ছুটী করিতেছিল, তাহাকে তিন মাসের ছুটী দেওয়া গেল।

ধার্য্য দিনে আমরা দুর্গানাম স্মরণ করিয়া দার্জ্জিলিঙ মেলে গিয়া উঠিলাম। পরদিন প্রাতে শিলিগুড়িতে নামিয়া ছোট রেলে চড়িয়া, পর্ব্বতগাত্রে রেল-লাইন পাতার বিষয়ে ইংরাজের অদ্ভুত কৌশল এবং মেঘের ও ঝরণার অপরূপ খেলা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। রেললাইন কখনও কার্ট রোডের উপর দিয়া কখনও নীচে দিয়া, কখনও পাশে পাশে চলিয়াছে। বেলা দশটার সময় কার্সিয়াং ষ্টেশনে গিয়া নামিলাম।

ডাক্তারবাবু ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সহজেই খুঁজিয়া লইলেন। আমার স্বামীকে বলিলেন, "এ কি করেছেন আপনারা? রেলে কেন এলেন? আজকাল দার্জ্জিলিঙ কিম্বা কার্সিয়াং যাত্রী কি কেউ রেলে আসে? শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সিতে আসে। রেলের চেয়ে তাতে ভাড়াও কম পড়ে, আর দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা আগে পৌঁছান যায়।"

স্বামী বলিলেন, "তা ত আমি জানতাম না। আমি সটান কার্সিয়াঙেরই টিকিট কিনেছিলাম।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "চলুন এখন, বাড়ীতে আপনার সবই ঠিকঠাক ক'রে রেখেছি—চাল-ডাল, তরী-তরকারী, ঘি, মশলা, কাঠ-কয়লা পর্য্যন্ত। একটা নানীও ঠিক ক'রে রেখেছি ?"

স্বামী বলিলেন, "নানী কি ?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন "এখানে ঝিকে নানী বলে। আপনি শুধু একজন বামুন আর একজন চাকর নিয়ে আসবেন লিখেছিলেন, তাই ঘর সাফ করা, বাসন-টাসন মাজার জন্যে একটা নানী ঠিক ক'রে রেখেছি।"

কেটা-কেটির (পাহাড়িয়া কুলী-কুলিনীর) স্কন্ধে জিনিষপত্র চাপাইয়া, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমরা নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। বাড়ীটির নাম "বেলাভিউ কটেজ"—চারিদিকে হাতার মধ্যে অজস্র ড্যালিয়া, গোলাপ, ফরগেট-মি-নট ও নাম-না-জানা অন্যান্য শত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।

ডাক্তারবাবু সব দেখাইয়া শুনাইয়া বলিয়া কহিয়া দিয়া নমস্কারান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দুই

নানীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম—এ কি ঝি না মেমসাহেব? তার ছিটে ঘাগ্‌রার কি বাহার! মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত ঝোলানো ফুলকাটা ওড়নার কি বাহার! পায়ে জুতা মোজা—তবে লেডী জুতা নয়, পুরুষ-মানুষের জুতা। খট্-মট্ করিয়া এ-ঘর ও-ঘর বেড়ায়, বাসন মাজিয়া শেষে তাহা সাবান দিয়া ধুইয়া ঘরে তোলে, আমাদের সহিত বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে, সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া, চুল আঁচড়াইয়া, তার সাজগোজের কি ঘটা! সদাই গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহে, কর্ম্মের অবসরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া নির্ভীকভাবে "কাটোয়া" পান করে—মনিব বলিয়া গ্রাহ্যও নাই। (কাটোয়া হাতে গড়া স্বদেশী সিগারেট বিশেষ। বাজারে এক প্রকার কুচোনো তামাক পাতা বিক্রয় হয়, সেই তামাক কাগজে পাকাইয়া সুবৃহৎ সিগারেটের আকার ধারণ করিলে "কাটোয়া" হয়।) নানীর কার্য্য বাসন মাজা, ঘর ঝাঁড়-দেওয়া ও বেড়াইতে যাইবার সময় আমাদের ছাতা প্রভৃতি বহন করিয়া পথপ্রদর্শন করা। এ দেশে এ সময় কখন বৃষ্টি আসে, কিছুই ঠিক নাই। হয় ত, যখন বাহির হইলাম, তখন রৌদ্র চন্-চন্ করিতেছে, পনের মিনিট পরেই দেখি, ও-মা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল। তাই সঙ্গে ছাতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এমন লোক নাই, এমন স্থান নাই—যাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ নানী বলিতে পারে না; এমন বিষয় নাই—যাহা তাহার অজ্ঞাত। এমন কি, সাহেব লোক মরিলে তাহার কবর খুঁড়িতে নয় ফিট গর্ত্ত করা নিয়ম, তাহাও সে অবগত আছে। সে জাতিতে পাহাড়িয়া (নেপালী) হইলেও হিন্দী বেশ বলিতে পারে; সুতরাং তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আমাদের কোনও অসুবিধা নাই। নানী ডোমারাম বস্তিতে মাসিক দুই টাকা ভাড়ায় এক ঘর লইয়া বাস করে। প্রাতে আসিয়া, এবং রাতে বিদায়কালে নিত্য বলে, বাবু সেলাম, মাইজী সেলাম, খুকী সেলাম, ঠাকুর সেলাম।—যদিও তাহার শুধা মাহিনা, তথাপি ঠাকুর রোজ তাহাকে এক-থালা ভাত দেয়—তাই ঠাকুরও সেলাম—ঠাকুরের এই খাতির।

আমরা পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে খুকী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "মা, শুনেছ, নানীর এক মেয়ে আছে, তার নাম কি জান ?"

বলিলাম, "না, কি নাম ?"

"তার নাম—ঘড়ি।"—বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইতে লাগিল। হাসি থামিলে বলিল, "আচ্ছা মা, সে মেয়েকে যদি আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি করতে হয়, তবে রেজিস্টারিতে তার

কি নাম লেখানো হবে? শ্রীমতী ঘাড়িসুন্দরী দেবী?"—বলিয়া পুনশ্চ সে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল।

আমি বলিলাম, "যেমন অদ্ভুত দেশ, নামগুলোও কি তেমনি অদ্ভুত! কত বড় মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিস?"

"হ্যাঁ, আমার চেয়ে বড়। নানী বললে, তার বয়স সতেরো। কোন্ এক সাহেবের কুঠিতে সে আয়াগিরি করে, মেম-সাহেবের লেড়কা খেলায়। মা, তাকে একদিন নিয়ে আসতে বল না নানীকে, আমি ঘাড়ি দেখবো।"

বলিলাম, "আচ্ছা, বলবো।"

দু'এক দিন পরে নানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নানী, তোর খসম্ আছে ত?"

নানী বলিল, "উ তো বহুৎদিন ভাগ্ গিয়া।"

বলিলাম, "ভাগ্ গিয়া কি রে? কোথা ভাগ্ গিয়া?"

নানী তখন তার জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিল। বলিল, তাহার কন্যা যখন মাত্র দুই বৎসরের, তখনই তার স্বামী পলাইয়া এক সাহেবের সহিত কলিকাতা চলিয়া যায়। না লেখে চিঠি-পত্র, না পাঠায় টাকা-কড়ি। কিছুদিন তার জন্য অপেক্ষা করিয়া নানী উদরান্নের জন্য, ডাউহিল স্কুলে আয়াগিরি চাকুরী গ্রহণ করে। সে স্কুলে খালি সাহেব-দের মেয়ে পড়ে। অনেক মেয়ে সেই স্কুলে বাসও করে, বোর্ডিং হাউস আছে, আবার অনেক মেয়ে বাহির হইতে আসিয়া পড়িয়াও যায়। চারি পাঁচ বৎসর পরে, কলিকাতা হইতে আগত এক সাহেবের খানসামার মুখে সে তার স্বামীর সংবাদ পায়। সে নাকি এক বড়া সাহেবের বাবুর্চিগিরি করিতেছে, এবং সেখানেই এক স্বজাতীয়া মেয়েকে বিবাহ করিয়া, নূতন সংসার পাতিয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। সেই সাহেবের ঠিকানায় স্বামীকে সে এক পত্রও লেখাইয়াছিল; কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। তার পর হইতে কত লোককে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার স্বামীর সংবাদ বলিতে পারে নাই। দুই বৎসর হইল, স্কুলের সে চাকরী তাহার গিয়াছে। তাহার জিম্মা হইতে এক দুষ্ট "বাবা" (মেয়ে) পলাইয়া যায়, তাই সাহেবরা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তারপর হইতে সে কখনও সাহেবের বাড়ীতে আয়াগিরি, কখনও বাঙ্গালীর বাড়ীতে নানী-গিরি করিয়া জীবন-যাপন করিতেছে।

বলিলাম, "তবে এদিকে দশ বারো বছর তোর স্বামীর আর কোনও খবর পাসনি?"

"না মাইজী!"

"সে বেঁচে আছে কি ম'রে গেছে তাও জানিস না?"

"না, মাইজী।"

"খোঁজ নে না। যদি ম'রে গিয়ে থাকে, তবে ত তুই আবার সাদি করতে পারিস। তোদের দেশে ত বিধবা-বিবাহ হয়।"

নানী বলিল, "না মাইজী, সাদি আর আমি করতে চাইনে। পাহাড়ী লোগ বড় মদ খায়, খেয়ে জরুকে মারে।' এ আমি বেশ আছি।"

"এখানে তোর মেয়ে ছাড়া আর কেউ আছে?"

"আছে মাইজী। আমার এক ভাই আছে, সে ক্লারেণ্ডনে চাকরী করে।"

"তার নাম কি?"

"আঠ নম্বর।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আঠ নম্বর কি রে? মানুষের নাম কি ও রকম হয়?"

নানী বলিল, পূর্ব্বে তার অন্য নাম ছিল বটে, কিন্তু ক্লারেণ্ডনে ঢুকিয়া অবধি তাহার নাম হইয়া গিয়াছে আঠ নম্বর। ঐ নামেই সকলে তাকে ডাকে।"

কর্ত্তার কাছে আমি এই গল্প করিলে তিনি বলিলেন, নানীর ভাই বোধ হয়, ক্লারেণ্ডন হোটেলে ৮নং খিদমৎগার। মণ্টিক্রুষ্টো গল্পের নায়ক এডমণ্ড ড্যাণ্টেসের সুদীর্ঘ কারাবাস-কালে তাহার নাম লুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া যেমন একটা নম্বরে পরিণত হইয়াছিল, ইহাও বোধ হয় তাই।

আমার অনুরোধে নানী তাহার মেয়েকে একদিন লইয়া আসিল। দেখিলাম, মেয়েটি বেশ সুশ্রী, নূতন যৌবন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঢল্ ঢল্ করিতেছে, বেশ সভ্য-ভব্য, ফিট্-ফাট্। পাহাড়িয়া মেয়েদের বস্ত্রেই তাহার অঙ্গ আবৃত, তথাপি উহা তার মাতার অপেক্ষা দামী ও সুদৃশ্য। মা মাথায় দেয় সুতি ওড়না, মেয়ের মাথায় সিল্কের ওড়না। মা'র মত সে মামুলী জুতা-মোজা পরে না—সিল্কের ফ্লেশ-কলার মোজার উপর রীতিমত লেডি জুতা। মা'র মত সে 'কাটোয়া' পান করে না, কাঁচি সিগারেট খায়। কর্ত্তার সাক্ষাতেও সে সিগারেট ধরাইল, কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। নানী বলিল, যে সাহেব-বাড়ীতে সে চাকরী করে, সেখানে মাসে পঁচিশ টাকা বেতন পায়—সব টাকাই নিজ বিলাসিতায় ব্যয় করে। খুকী ত ঘাঁড়় দেখিয়া মহা খুসী।

কয়েক দিন পরে শুনিলাম, ঘাঁড়র সে চাকরী গিয়াছে, তাহার মনিব সাহেব অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন, ঘাঁড়় অন্য চাকরীর চেষ্টায় আছে। এখন সে প্রতিদিন তার মা'র সহিত আমাদের বাড়ী আসিতে লাগিল। খুকীর সহিত তার খুব ভাব হইয়া গেল। এখন সে প্রতিদিন ঘাঁড়় দেখিতেছে। তার সঙ্গে খুকী লুডো খেলে, তাস খেলে, ঘুঁটি খেলে—এই শেষের খেলাটি খুকীই তাহাকে শিখাইয়া লইয়াছে।

তিন

আমরা এক মাস কার্সিয়াঙে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে কর্ত্তার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যাইতেছে। জ্বর আর হয় নাই, হজমের গোলমালও নাই, রাত্রিতে বেশ নিদ্রাও হইতেছে। আরও উন্নতি হইত, যদি তিনি আরও বেশী করিয়া বেড়াইতেন। সকালের দিকে তিনি মোটেই বাহির হইতে চান না—আমি খুকীকে লইয়া বাহির হই। সঙ্গে অবশ্য নানী যায়,—আমাদের ছাতা, ওভার-কোট প্রভৃতি বহন করিয়া। বেড়াইতে যাইতে নানীর মহা উৎসাহ। বিকালে চা-পানের পর কর্ত্তাকে লইয়া বাহির হই। বেশী হাঁটিতে তিনি পারেন না, বুড়া মানুষ ত! অথচ—বুড়া বলিবার যো নাই, বলিলে রাগ করেন। তিনি যখন আমায় বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ষোল, তাঁহার বয়স চৌত্রিশ বৎসর মাত্র —পূর্ণ যুবাকাল। তখন তিনি আমায় চিঠি লিখিয়া নীচে সহি করিতেন—"ইতি তোমার বুড়ো।"—এখন, বিশ বৎসর পরে, আর তিনি নিজেকে বুড়া বলিয়া স্বীকার করিতে চান না।

এক সপ্তাহ হইল, সুধার কলেজ বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু এখনও সে আসে নাই। সে জন্য আমরা মহা ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছি। আমরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়াছিলাম, তখনও মহাত্মা গান্ধীর লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় নাই। লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার কথা এখানে আসিয়া খবরের কাগজে পড়িয়াছি। মহিষবাথানে গোলমালের কথা, যতীন সেনগুপ্তের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের কথা প্রভৃতিও পড়িয়াছি। প্রত্যহই সংবাদপত্রে দেখি, গোলমাল বাড়িয়াই চলিয়াছে, থামিবার কোনও লক্ষণ নাই। সুধা যদিও সত্যাগ্রহী দলে যোগদান করে নাই, তথাপি আমরা জানি, তাহার ষোল আনা ঝোঁক সেই দিকেই। কলেজ বন্ধ হইল, ছেলে কলিকাতায় কি করিতেছে? এমন সময় কর্ত্তার নামে সুধার এক পত্র আসিল, সে পত্র পড়িয়া আমাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাহার পিতাকে লিখিয়াছে—

"আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ফল কি হইল? যে ফল দশ বৎসর পরে প্রকট হইবে, সে ফলের কথা না ধরিলেও আমরা যে আশাতীত ফল পাইয়াছি, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আপনি লাঠি লইয়া মারিতে আসিলে আমিও লাঠি লইয়া মারিতে যাই, এটা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু আপনি তোপ-বন্দুক লইয়া গুলী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন, আর আমি বুক ফুলাইয়া 'মারো' বলিয়া দাঁড়াই, এটা বাঙ্গালীর পক্ষে ত বটেই, সকল জাতির পক্ষেই অসাধারণ ব্যাপার। আর যেখানে এরূপ ব্যাপার একটি দু'টি নহে, সহস্রাধিক হইয়া গিয়াছে, সেটাকে আশাপ্রদ চিহ্ন বলিয়াই ধরিতে হইবে।"

কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছে—

"সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয়, বিনা চেষ্টায়, বিনা প্রোপাগাণ্ডায় একদিনে বাঙ্গালী সিগারেট ছাড়িয়া দিয়াছে। কোনও পাণওয়ালার নিকট সিগারেট পাইবেন না। একজন নির্লজ্জ বাঙ্গালী এক খোট্টা পানওয়ালার কাছে কাঁচি-মার্কা সিগারেট চাহিয়াছিল, সে খানিকক্ষণ অবাক হইয়া বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—'বাবু, কাঁচি-মার্কা নেহি হ্যায়, জুতি-মার্কা হ্যায় খাওগে'?"

ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পত্রে সে তার পিতাকে কর্ম্মে ইস্তফা দিবার জন্য বিশেষ অনুনয় করিয়া লিখিয়াছে।

পত্র পড়িয়া উনি ত তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। বলিলেন, "দেখেছ ছেলে বেটার কাণ্ড! আমি জয় মহাত্মা গান্ধী ব'লে চাকরীটি ছেড়ে দিই, তারপর খাই কি? নুণ? নুণ খেয়ে ক'দিন বাঁচবো?"

ছেলেটা পাছে সত্যাগ্রহীর দলে ভিড়িয়া যায়, এই ভাবনায় আমরা স্বামী-স্ত্রী অস্থির হইয়া উঠিলাম। বুদ্ধি খাটাইয়া ছেলেকে পত্র লিখিলাম—

"বাবা সুধা, উনি তোমার পত্র পাইয়াছেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ নিজে উত্তর লিখিতে পারিলেন না। শরীরের উন্নতির জন্য পাহাড়ে আনিলাম, কিন্তু উন্নতি তেমন ত দেখিতে পাইতেছি না। বিদেশ-বিভূঁই, যদি অসুখ বাড়ে, তবে আমি একা স্ত্রীলোক তাঁহাকে লইয়া আতান্তরে পড়িয়া যাইব। এক সপ্তাহ হইল, তোমার কলেজ বন্ধ হইয়াছে, তুমি সেখানে কেন দেরী করিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। পত্রপাঠমাত্র তুমি চলিয়া আসিবে, একটি দিনও বিলম্ব করিও না।"

এ চিঠির ফল ফলিল, সুধা চলিয়া আসিল। পোষাক তাহার আগাগোড়া খদ্দরে নির্ম্মিত। খুকীর ও আমার জন্য এক বোঝা খদ্দরের শাড়ী, শেমিজ প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছে। বলিল, "মা, তোমাদের খদ্দর ছাড়া অন্য কিছুই আর পরা চলবে না।" আমি বলিলাম, "খদ্দর ত পরবোই বাবা! কিন্তু যা আছে, সে কাপড়-চোপড়গুলো ছিঁড়ুক আগে।" প্রথমে সে বলিল, ও-সব পোড়াইয়া ফেলাই উচিত। অনেক টাকার জিনিষ, সব পোড়াইয়া লোকসান করিবার মত অবস্থা আমাদের নয়, এই সব অজুহাতে শেষে রফা হইল, বাড়ীতে সেগুলো পরা চলুক, কিন্তু বেড়াইতে বাহির হইবার সময় খদ্দরই পরিতে হইবে। তথাস্তু।

সুধা আসিয়া চা খাইল না, বলিল, উহাতে বিলাতী চিনি আছে, তা ছাড়া ওটা একটা অনাবশ্যক বিলাসিতা। উনি এখানে আসা অবধি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কিনিতেন—সুধা আসিয়া তাঁহার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কেনা বন্ধ করিয়া দিল। দেশী খবরের কাগজ পূর্ব্বাবধিই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং কলিকাতার, তথা সারা দেশের আর কোনও সংবাদ পাই না। একদিন লোকমুখে শুনিলাম, মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সেদিন সুধা উপবাস করিবে বলিয়া বাহানা ধরিল। অনেক কষ্টে তাহাকে কিছু দুধ ও মিষ্টান্ন খাওয়াইলাম, আমিও তাহাই খাইয়া রহিলাম। ছেলে উপবাসী—মা খায় কোন্ লজ্জায়?

চার

তিন চারি দিন পরে খুকী আসিয়া বলিল, "মা, ঘাড়ি বেশ ইংরেজী কথা কইতে পারে। দাদার সঙ্গে ফর্-ফর্ ক'রে ও ইংরেজী বলছিল, আমি ত বুঝতেই পারলাম না?"

নানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ নানী, তোর মেয়ে ইংরেজী কথা কইতে জানে?"

সে বলিল, "হ্যাঁ মাইজী, জানে বইকি। আমি যখন ডাউহিল স্কুলে চাকরী করতাম, ও তখন ইংরাজ বাবাদের সঙ্গেই খেলা করত কিনা। সেখানকার বড় সাহেব যিনি ছিলেন, তিনি পাদরী। তিনি দয়া ক'রে ইংরাজ মেয়েদের সঙ্গে ক্লাসে ব'সে ওকে পড়তে হুকুম দিয়েছিলেন,—যদিও কোনও কালা আদমির মেয়েকে সেখানে ভর্ত্তি করা হয় না।"

ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ সুধা, ঘাড়ি নাকি ইংরেজী বলতে পারে?"

সুধা বলিল, "হ্যাঁ মা, ও বেশ ইংরেজী বলে। কিন্তু কথা যেমন বলতে পারে, বই তেমন পড়তে পারে না। আর, বানান সব অশুদ্ধ। কাণে শুনে শেখা কিনা। আমি ওকে বই পড়তে শেখাব মনে করছি। খুকীও সেই সঙ্গে পড়বে।"

দুই-একদিন পরে দেখিলাম খুকী ও ঘাড়িকে লইয়া সুধা রীতিমত স্কুল খুলিয়া বসিয়াছে। দুবেলায় তিন চারি ঘণ্টা উহাদের পড়ায়।

কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, "ও পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে সুধাকে মিশতে বারণ ক'রে দিও।"

আমি বলিলাম, "কেন, তাতে আর দোষ কি?"

তিনি বলিলেন, "তোমার সোমত্ত ছেলে, ঐ সুন্দরী সোমত্ত মেয়েটার সঙ্গে বেশী মেশা কি ভাল? শেষে কি থেকে কি হবে বলা যায় কি? জান ত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঘি আর আগুন একসঙ্গে স্থাপন করবে না।"

আমি বলিলাম, "না না, ছেলে আমার সে চরিত্রের নয়। কোনও ভয় নেই। ঐ একটা নেশা নিয়ে মেতে আছে, থাকুক না। নয় ত শেষে কোন্ দিন ব'লে বসবে, চললাম আমি নুণ তৈরী করতে।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

দিন পনেরো পরে একদিন খুকী আসিয়া চুপি চুপি আমায় বলিল, "মা সর্ব্বনাশ হয়েছে।"—তার চক্ষু দুটি ছল্ছল্।

ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে রে?"

"ঘাড়িকে দাদা ভালবাসে। ওকে বিয়ে করবে।"

বলিলাম, "দূর পাগ্লী! ঘাড়ি হ'ল পাহাড়ি-মেয়ে, ওকে তোর দাদা বিয়ে করতে যাবে কেন?"

খুকী বলিল, "হ্যাঁ মা, দাদা ওকে ভালবেসেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঘাড়ির বই-খাতার মধ্যে একখানা কাগজ রয়েছে, তাতে লেখা আছে, I love you—তার মানে, আমি তোমায় ভালবাসি। দাদার নিজের হাতের লেখা—আমি দাদার হাতের লেখা চিনি ত!"—বলিতে বলিতে মেয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কাঁদিবার তাহার কারণ আছে। উহাদের ক্লাসেই একটি মেয়ে পড়ে, উহার চেয়ে বছর দুইয়ের বড়, তার নাম লীলাবতী ব্যানার্জ্জী। আমার স্বামী মুখার্জ্জী। খুকী তাহাদের বাড়ী যায়, লীলাও আমাদের বাড়ী আসে। দুইজনে অত্যন্ত ভাব। খুকীর একান্ত ইচ্ছা, সেই লীলার সঙ্গেই তার দাদার বিবাহ হয়। বালিকাদের এই মতলব শুনিয়া, লীলার মাও নিজে আমার কাছে এই প্রস্তাব করিয়াছেন,—তবে আমি এখনও স্পষ্টাক্ষরে আমাদের সম্মতি জানাই নাই। মেয়েটি দেখিতে শুনিতে ভাল, তাহার পিতাও সম্পন্ন লোক; সুতরাং প্রাপ্তিযোগও ভাল আছে, হইলে মন্দ হয় না।

উঁহার ইচ্ছা, ছেলে বি-এ পাস করিয়া ডেপুটী হইলে তবে তাহার বিবাহ দিবেন, সেই জন্যই লীলার মাকে আমি স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলি নাই। খুকী আমার মন ভিজাইবার জন্য সময়ে অসময়ে লীলার নানা সদ্‌গুণের কথা আমায় বলিয়া থাকে। তাই এ ব্যাপারে খুকীর এত দুঃখ।

কথাটা শুনিয়া আমার মাথায় ত বজ্রাঘাত হইল। লীলার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিই আর না দিই, একটা পাহাড়িয়া মেয়ের সঙ্গে দিব কেন? কর্ত্তাকে গিয়া জানাইলাম। শুনিয়া তিনি খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "সেই কালেই আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিইনি?"—খুব খানিকটা বকিলেন। তা বকুন, বকুনি আমার পাওনা হইয়াছে বইকি। আমি চুপ-চাপ বসিয়া বকুনি হজম করিয়া, শেষে বলিলাম, "সে ত যা হবার তাই হয়ে গেছে, এখন উপায় কি বল?"

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিবার পর তিনি বলিলেন, "সুধা যে ওকে বিয়ে করতে চায়, সে কথা তোমায় কে বললে? সুধা বলেছে?"

উত্তর করিলাম, "না, সুধা বলেনি, খুকী বললে। ঐ যে ইংরেজীতে ওকে লিখেছে, আমি তোমায় ভালবাসি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "খুকী এখন নভেল পড়তে শিখেছে কিনা ও মনে করে, ভালবাসলেই বুঝি বিয়ে করতে হয়। আমাব ত মনে হয়, বিয়ে করবার কল্পনা সুধা করেনি, এত নির্ব্বোধ সে নয়। তুমি পাহাড়ী মেয়েদের চরিত্র জান না, ওদের এ বিষয়ে নীতিজ্ঞান খুব শিথিল, কিন্তু আমি যা আশঙ্কা করছি, তাই যদি হয়ে থাকে বা হবার উপক্রম হয়ে থাকে, সেও ত ঠিক নয়। অত্যন্ত অন্যায়। তুমি এক কাজ কর। মেয়েটাকে ত বিদায় করই, নানীকেও বিদায় কর। এ বিষয়ের জড় মেরে দাও।"

কর্ত্তার আদেশ প্রতিপালন করিলাম। নানীকে তাহার বেতন চুকাইয়া দিয়া বলিলাম, "তুমি আর কাল থেকে এস না, আমি অন্য নানী ঠিক করবো!"

নানী "কাহে মাইজী কেয়া কসুর হুয়া?" ইত্যাদি কত কথা বলিল, আমি গম্ভীর হইয়া রহিলাম, কোনও উত্তর দিলাম না।

ঘণ্টাখানেক পরে সুধা আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, নানীকে তুমি জবাব দিয়েছ? কি দোষ হয়েছে ওর?"

গম্ভীরভাবে বলিলাম, "ওর কোনও দোষ হয়নি। দোষ হয়েছে তোমার।"

সুধা বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার? কি দোষ করেছি আমি?"

আমি কঠোরভাবে বলিলাম, "দোষ করনি তুমি? ধাড়ি একটা যুবতী মেয়ে, ওর সঙ্গে কি ব্যবহার করছ তুমি? আমাদের এতদিন ধারণা ছিল, তুমি অতি সৎ ছেলে। তুমি যে এমন ইতর হ'তে পার, তা ত আমরা জানতাম না। তোমার এই ইতর ব্যবহারে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, উনি ত রেগে কাঁই হয়েছেন।"

সুধা পূর্ব্ববৎ বিস্মিতভাবে বলিল, "কেন, কি ইতর ব্যবহার করেছি আমি?"

"তুমি ওকে ইংরেজীতে লেখনি—'আমি তোমায় ভালবাসি?' খুকী ওর খাতা-পত্রের মধ্যে সেই কাগজ দেখেছে খুকী তোমার হাতের লেখা চেনে।"

সুধা বলিল, "ওঃ, এই কথা? তবু ভাল। হ্যাঁ মা, আমি ও কথা তাকে লিখেছি বটে, কিন্তু আমি ত কোনও, কি বলে গিয়ে, dishonourable—অর্থাৎ অসাধুভাবে ও-কথা তাকে লিখিনি। আমি তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছি এবং সেও আমায় গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।"

বলিলাম, "সে কি রে? বামুনের ছেলে হ'য়ে তুই একটা অজাতের মেয়েকে বিয়ে করবি?"

সুধা বলিল "কেন মা, তাতে দোষ কি? সেও ভারতবর্ষে জন্মেছে—নেপাল ভারত-

বর্ষেরই অন্তর্গত, আমিও ভারতবর্ষের সন্তান। মহাত্মা বলেছেন, জাতিভেদ-প্রথা এ দেশ থেকে যত শীঘ্র উঠে যায়, ততই মঙ্গল।"

বলিলাম, "জাতিভেদ তুই না মানিস, আমরা ত মানি। কেন, বাঙ্গালা-দেশে স্বজাতির ঘরে ইংরেজী কইতে পারে, এমন মেয়ে কি নেই? ঘাড়কে বিয়ে করবার মতলব তোর কেন হ'ল? এত দিন যে তোকে খাইয়ে পরিয়ে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম, তার কি এই প্রতিফল তুই দিচ্ছিস আমাদের? যে আমার বাসন-মাজা ঝি, তাকে আমায় বলতে হবে বেয়ান? আর ঘড়ির বাপ কোন সাহেবের বাবুর্চ্চি, উনি তাকে বেয়াই ব'লে অভ্যর্থনা করবেন?"

সুধা বলিল, "মানুষ যে, সে মানুষ,—সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান,—জন্মগত বা কর্ম্মগত হীনতার জন্যে মানুষে মানুষের প্রভেদ করা ত উচিত নয় মা"—বলিয়া মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে সে মস্ত এক লেক্‌চার ঝাড়িল। সব কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সুধাও কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "শোন মা, আমার জীবনের প্রোগ্রাম তোমায় বলি। তোমরা যে মনে করেছ, আমি বি-এটা পাস করলেই লাটসাহেবকে ধ'রে বাবা আমাকে একটি ডেপুটি বানিয়ে দেবেন, সেটি হচ্চে না। আমি চিরজীবন দারিদ্র্য বরণ ক'রে নিয়ে দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করতে চাই। সে কাজে একজন উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী আমার আবশ্যক। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি, ঘাড়ই আমার জীবন-সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত। প্রথমতঃ সে চির-স্বাধীন নেপাল দেশের মেয়ে, চির-পরাধীন বাঙ্গালীর মেয়ে নয়। জীবনের কর্ম্মে যখন আমার অবসাদ আসবে, নৈরাশ্য আসবে, ক্লৈব্য আসবে, সে তখন তার নৈতিক বল দিয়ে আমাকে আবার সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার জীবনের কর্ম্মে ও তোমার সহায় হবে কি বিঘ্ন হবে, এখন থেকে তা তুমি কি ক'রে বুঝলে বাপু?"

সুধা সোৎসাহে বলিল, "তা আমি না বুঝেই কি এ কাজে প্রবৃত্ত হচ্চি মা? আমার সঙ্গে দারিদ্র্যের কঠোর জীবনযাপন করতে ও হাসিমুখে প্রস্তুত। ও বলেছে, এক মুঠো ভুট্টা-ভাজা খেয়ে ও দিন কাটিয়ে দিতে পারে। ওর কাপড়-চোপড় যা আছে সেগুলো ছিঁড়ে গেলে খদ্দর ভিন্ন আর কিছু ও পরবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে। দিনে ও এক প্যাকেট ক'রে কাঁচি সিগারেট খেত, প্রকাশ্যভাবেই খেত—এ দিকে তিন চারিদিন আর ওকে সিগারেট খেতে দেখেছ? তুমি বোধ হয় অত লক্ষ্য করনি—সিগারেট ও একদম ছেড়ে দিয়েছে। পাহাড়ীরা চা না খেলে বাঁচে না, সে চা-ও ও ছেড়ে দিয়েছে। আমি মহাত্মা গান্ধীর একখানি ছবি দিয়েছি, সেখানি ও বাড়ী নিয়ে গিয়ে মাথার শিয়রে রেখেছে, সকালে উঠে ভক্তিভরে সেই ছবিকে ও প্রণাম করে। ওকে আমার চাই মা—ওকে না পেলে জীবনের ব্রত একা উদ্‌যাপন করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হবে।"

"কিন্তু বাবা, কর্ত্তার হুকুমে আমি কাল থেকে নানীকে জবাব দিয়েছি।"—ছেলের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, উপস্থিত ইহার বেশী আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না।

সুধা বলিল, "এ বাড়ী ছাড়াও ভগবানের পৃথিবীতে যথেষ্ট স্থান আছে মা।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কর্ত্তাকে গিয়া সকল কথা জানাইলাম। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ছেলেটার অদৃষ্টে যদি এতদূর অধোগতিই লেখা থাকে, তবে তাই হবে।"

তাই হবে কি? আমার ছেলে বিবাহ করিবে ঐ ঝিয়ের মেয়েকে? কখনই তা হইতে দিব না। হিন্দুধর্ম্ম কি মিথ্যা? দেব-দেবীরা কি নিদ্রিত? আমি মা মঙ্গলচণ্ডীর শরণ লইব, দেখি, তিনি আমার মঙ্গলবিধান করেন কি না, এ বিপদ হইতে আমায়

উদ্ধার করেন কি না—আমার ছেলের মতিগতি ফিরাইয়া দেন কি না। আমি মনে মনে মাকে বারংবার প্রণাম করিয়া একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে মা-মঙ্গলচণ্ডী, আমার ছেলেকে সুমতি দাও, আমি তোমায় ষোল আনার পূজা দিব।"

ঘড়িকে ত বিদায় করিলাম। কিন্তু সংবাদ পাইলাম, প্রতিদিন বিকালে সুধা বেড়াইতে বাহির হইয়া ঘড়ির সঙ্গে মিলিত হয়, তাহাকে লইয়া দুই তিন ঘণ্টা বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে।

একদিন খুকী সুধাকে বলিল, "দাদা, তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাও না, একলা যাও কেন?"

"তোদের সঙ্গে আমার মতের মিল হয় কই?"

"কার সঙ্গে বেড়াও, ঘড়ির সঙ্গে?"

প্রশ্ন শুনিয়া সুধা রাগে কট্‌মট্‌ করিয়া ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, "আমার যা খুসী তাই করি, তোদের কি?"

খুকী বলিয়াছিল, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। ঘড়িকে নিয়েই বেড়াও ত?"

সুধা বলিয়াছিল, "হ্যাঁ, আমি তাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করছি।"

পাঁচ

আট দিন কি দশ দিন পরে, একদিন বেলা দশটার সময় গোইথাল হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছি, বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া মনে হইল, তরকারীপাতি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, একবার বাজারটা দেখিয়া যাই। সুতরাং রামখেলাওনকে বিদায় দিয়া খুকীকে লইয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

মইলির দোকানে ঢুকিয়া তরকারীপাতি দর করিতেছি, এমন সময় খুকী আমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "মা, দেখ, ঐ ঘড়ি না?"

রাস্তার অপর দিকে একটা দোকানের সামনে আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া যেন ঘড়ির মতই একটা মেয়ে দাঁড়াইয়া কি কিনিতেছে। জিনিষ লইয়া সে রাস্তায় উঠিবা-মাত্র দেখিলাম, ঘড়িই বটে, হাতে এক প্যাকেট সিগারেট। একটা সিগারেট বাহির করিয়া, ধরাইয়া সে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল—আমরা মইলির দোকানের ভিতর ছিলাম, আমাদের অবশ্য সে দেখিতে পাইল না।

খুকী বলিল, "তবে যে মা, দাদা বলে, ঘড়ি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে!"

বলিলাম, "নিজের চোখেই ত দেখলি। দাদাকে তোর বলিস গিয়ে।"

খুকী বলিল, "হুঁ—দাদা আমার কথা বিশ্বাস করবে কিনা! মনে করবে, তার মন ভাঙ্গাবার জন্যে আমি মিছে কথা বলছি।"

মনে বড় ধিক্কার হইল। বাঃ, আমার বউমা, প্রকাশ্য বাজারের মধ্য দিয়া, সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিয়াছেন! কি ভাগ্যবতী শ্বাশুড়ী আমি!

তরকারী কিনিয়া একটা কোটি (মুটিয়ানী বালিকা) লইয়া খুকীর সহিত আমি সেই দোকানটায় গেলাম। দেখিলাম, দোকানদার খোট্টা নয়—একজন পাহাড়িয়া। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু আগে একজন পাহাড়িয়া মেয়ে তোমার দোকান হইতে এক প্যাকেট সিগারেট কিনিয়া লইয়া গেল, ও কে বলিতে পার?"

দোকানদার বলিল, "ওর নাম ঘড়ি। কেন মাইজী, উহাকে আপনার কোন দরকার আছে কি?"

আমি বলিলাম, "না, উহার মা আগে আমার বাড়ীতে চাকরী করিত, উহাকে দেখিয়াছিলাম, চেনা-চেনা মনে হইতেছিল, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

দোকানদার বলিল, "ও রোজ এই সময় আসিয়া এক প্যাকেট করিয়া কাঁচি সিগারেট কিনিয়া লইয়া, আপনার কাজে যায়।"

"কি কাজ করে ও?"

"কাছারীর রাস্তায় পাহাড়িয়া মেয়েদের জন্য যে ইংরাজী স্কুল খুলিয়াছে, সেই স্কুলে ও পড়ায়। সাড়ে দশটায় স্কুল বসে।"

"ওঃ"—বলিয়া কিঞ্চিৎ সওদা তাহার দোকান হইতে কিনিয়া আমি গৃহে ফিরিলাম। খুকীর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিলাম, বেড়াইতে বাহির হইবার সময় সুধাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে এবং বেলা দশটার সময় বাজারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, যাহাতে ঘড়ির কীর্ত্তি সে দেখিতে পায়।

পরদিন চা-পানের পর খুকী সুধার ঘরে গিয়া বলিল, "দাদা, বিকেলে ত তুমি আমাদের একদিনও বেড়াতে নিয়ে যাবে না, তোমার ঘড়িকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করবার সেই সময়। যা হোক, বাবা বিকেলে বেরোন, তোমার জন্যে কিছু আটকায় না। এ বেলা ত বাবা বেরোন না, এ বেলা কেন তুমি আমাদের সঙ্গে চল না।"

সুধা বলিল, "কেন, রামখেলাওনকে সঙ্গে নিয়ে যা না।"

খুকী বলিল, "রামখেলাওন ত যাবেই, নইলে ছাতা-টাতাগুলো বইবে কে? তুমি আমাদের সঙ্গে একদিনও বেরোও না ব'লে মা কত দুঃখ করেন।"

সুধা বলিল, "করেন নাকি? আচ্ছা, তবে চল্, আমিও যাচ্ছি।"

যে মতলব করিয়া সুধাকে বেড়াইতে লইয়া গেলাম, তাহা সিদ্ধ হইল না। দশটার পূর্ব্বে বাজারের ভিতর ঢুকিয়া তরকারী কিনিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এবং মাঝে মাঝে সেই দোকানের দিকে চাহিতে লাগিলাম; কিন্তু ঘড়িকে দেখিতে পাইলাম না। দশটা বাজিল, সওয়া দশটা হইল, সাড়ে দশটা হইয়া গেল, তথাপি ঘড়ির দর্শন নাই। অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

সে রাত্রিতে একমনে মা মংগলচণ্ডীকে ডাকিতে লাগিলাম। কেন মা, আমার প্রতি এমন নিদয়া হইলে তুমি? তোমার চরণে আমি কি অপরাধ করিয়াছি মা, যে জন্য আমার মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করিতেছ না?

পরদিন প্রাতে আবার সুধাকে লইয়া বেডাইতে বাহির হইলাম। ফিরিবার পথে দশটার পূর্ব্বে বাজারেও প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না।

সে দিন বিকালে সুধা যেমন বেড়াইতে বাহির হয়, সেইরূপই হইল। অন্য দিন কর্ত্তার সঙ্গে আমরা বেড়াইয়া ফিরিবার অল্পক্ষণ মধ্যে সেও ফিরে। কিন্তু আজ তাহার বিলম্ব হইতে লাগিল।

যত রাত্রি হইতে লাগিল, ভাবনাও তত বাড়িতে লাগিল। এত দেরী কেন? ছেলের কোন বিপদ-আপদ ঘটিল না ত? উঁহাকে বলিলাম, উঁনি তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, "কচি খোকাটি ত নয়, ভাবনা কিসের? যখন হয় আসবে। রাত হ'ল, আমাদের খাবার দিতে বল।"

খুকীর ও উঁহার খাবার দিতে বলিলাম। আমার ঠাঁই হয় নাই দেখিয়া উঁনি বলিলেন, "তুমি এখন খাবে না?"

প্রবীণা গৃহিণীরা আমায় ক্ষমা করিবেন। চিরদিন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বিদেশে কাটাইয়াছি, যদিও সাহেব-মেম বনি নাই, বিশেষ কোনও অখাদ্য কুখাদ্য খাই না, মেঝের উপর আসন পাতিয়া বসিয়া কাঁসার থালা-বাটিতে ভাত-ডালই খাইয়া থাকি, তথাপি স্বামী ও পুত্র-কন্যা সহ একত্র বসিয়া খাওয়াই আমাদের প্রথা। নহিলে উঁনি ছাড়েন না। সেই যে কথায় বলে না—

'পড়েছি যবনের হাতে
খানা খেতে বলে সাথে।'

—আমারও হইয়াছে তাই।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম, "সুধা আগে বাড়ী আসুক, তার পর খাব।"

তিনি আর কোন কথা না বলিয়া, আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে পাণ-জল দিলাম, ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিল।

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল, কিন্তু সুধা ফিরিল না। মা হওয়া বড় জ্বালা! বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভৃত্যও লণ্ঠন লইয়া ছেলেকে খুঁজিতে বাহির হইবে কি না ভাবিতেছি, এমন সময় আমাদের বাড়ী উঠিবার পথে টর্চ্চ-লাইট পড়িল। ঐ বোধ হয় সুধা আসিতেছে।

টর্চ্চ-লাইট আমাদের বাড়ীর দিকেই উঠিতে লাগিল। সুধা আসিল। "হ্যাঁ রে, এত রাত্তির করলি কেন?" বলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভীত হইয়া পড়িলাম। মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, চোখের দৃষ্টিও কেমন বিভ্রান্ত। উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ বাবা, শরীর ভাল আছে ত?" বলিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, গরম নয়।

"চল মা, বলছি"—বলিয়া সুধা তাহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া সুধা বলিল, "তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে মা?"

বলিলাম, "উনি খেয়েছেন, খুকীও খেয়েছে।"

"তুমি খাওনি কেন মা?"

"ছেলের খাওয়া না হ'লে মা কি খেতে পারে বাবা?"

সুধা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁস্-ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া মুখ হইতে হাত টানিয়া খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বাবা অমন করছিস? কি হয়েছে?"

সুধা হঠাৎ তক্তপোষ হইতে নামিয়া আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া ক্রন্দনের স্বরে বলিল, "আমি বড় অভাগা, মা! আমায় তুমি মাফ কর।"

আমি তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিলাম, "কেন রে, কি হয়েছে, শীগ্‌গির বল্ বাবা, আমার যে কান্না পাচ্ছে।"

সুধা বলিল, "তোমাদের কথার অবাধ্য হ'য়ে, তোমাদের মনে দুঃখ দিয়ে, ঘড়িকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, সে সংকল্প আমি পরিত্যাগ করেছি মা। আমার অপরাধ তোমরা ক্ষমা কর।"

এ কথা শুনিয়া আনন্দে মন উল্লসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, "জয় মা মঙ্গলচণ্ডী, এ কলিতে তুমিই মা জাগ্রত দেবতা। ষোল আনার পুজো মেনেছিলাম, আমি বত্রিশ আনার পুজো তোমায় দেব মা—কলকাতায় ফিরেই।" কিন্তু মনের আনন্দ মনেই চাপিয়া, দুঃখের অভিনয় করিয়া বলিলাম, "তা সে সংকল্প পরিত্যাগ করেছ, ভালই করেছ। কিন্তু কি হ'ল বাবা?"

সুধা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "মহাত্মাকে সে অপমান করেছে মা!"

"কি ক'রে অপমান করলে?"

"মহাত্মাকে সে গান্ধী-চ্যাপ্ বলেছে, আরও অকথা কুকথা বলেছে।"

"কি রকম? তোমার সাক্ষাতে এমন সব কথা বলতে সে সাহস করলে?"

"আমার সাক্ষাতে নয় মা। আমি তার সঙ্গে রোজ যেমন বেড়াই, তেমনি বেড়িয়ে, তাকে উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে বাড়ী আসছিলাম। সেও বাড়ীর দিকে গেল। খানিক

দূর এসে হঠাৎ মনে হ'ল, তাকে আর একটা কথা ব'লে আসি। যদি তার নাগাল পাই, এই ভেবে ফিরে গেলাম। স্টেশনের কাছে গিয়ে তাকে দেখতে পেলাম। তখন সে আর একা নয়; ইংরেজী-কাপড় পরা একটা পাহাড়ী ছোঁড়াও তার সঙ্গে আছে। দু'জনে গিয়ে এক পাণওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়াল। ওরা কথাবার্ত্তা কি কয়, শোনবার জন্যে আমি নিঃশব্দে তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছোঁড়াটা পাণওয়ালার কাছে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট চাইলে। পাণওয়ালা বললে, 'বিলাতী সিগ্রেট বেচ্না গান্ধী মহারাজকা হুকুম নেহি হ্যায়, সাহেব!" ঘড়ি বললে,—"That Gandhi Chap has become a great nuisance"—অর্থাৎ সেই গান্ধীটা এক মহা আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।—এই শুনেই রাগে আমি আর থাকতে পারলাম না। তাদের সমুখে গিয়ে বললাম—অবশ্য ইংরেজীতে—'ঘড়ি, এ কি কথা বলছ তুমি?' ছোঁড়াটা ত আমাকে দেখেই স'রে পড়ল। ঘড়ি কি উত্তর দেবে, খানিকক্ষণ ভেবে পেলে না। তার পর হেসে বললে —'ওটা আমি ঠাট্টা ক'রে বলেছি বইত নয়!'—আমি তাকে কপট, মিথ্যাবাদিনী এই সব ব'লে তিরস্কার ক'রে, তার মুখের উপর স্পষ্ট ব'লে এসেছি মা—এ মুহূর্ত্ত থেকে তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধ আমার রইল না—যে মুখে তুমি মহাত্মাকে অপমান করেছ, সে মুখ আমি আর দেখতে চাইনে।"

আমি বলিলাম, "তা বেশ করেছ বাবা। ও-সব পাহাড়ী মেয়ে, ওদের কি কোনও নীতিজ্ঞান আছে? তোমাকে ব'লে, ও সিগারেট খাওয়া বন্ধ করেছে, অথচ লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে ছাড়তো না, এ আমি নিজের চক্ষে দেখেছি বাবা, খুকীও দেখেছে।"

"খেত নাকি মা? কবে দেখেছ তুমি?"

আমি কবে এবং কোথায় উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা সুধাকে বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল, "তাই নাকি? কি ঘোর মিথ্যাবাদিনী! অথচ আজ বিকেলেই সে আমাকে বলেছে, 'যে দিন থেকে তুমি মানা করেছ, সে দিন থেকে সিগারেট আমি স্পর্শ করিনি —সিগারেটের উপর আমার ভয়ানক ঘৃণা জন্মে গেছে'।"

মাতা-পুত্রে উভয়েই প্রায় পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, "রাত হ'ল, এবার খাবে চল বাবা। ও-সব চিন্তা মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেল।"

সুধা বলিল, "খাব মা, কিন্তু আজ আমি আলাদা থালায় খাব না। তোমার পাতের প্রসাদ খেয়ে, তোমাদের মনে দুঃখ দিয়ে যে পাপ করেছি আমি, সে পাপ থেকে আমি মুক্ত হব।"

"আচ্ছা, তাই হবে। দু'জনকার লুচিই এক থালায় দিতে বলি। তুমি ততক্ষণ কাপড়-চোপড় বদলে নাও।" বলিয়া আমি বাহির হইলাম।

দুয়ার খুলিয়াই দেখি, খুকী দাঁড়াইয়া ছিল, সরিয়া গেল। হলে গিয়া খুকী আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সব কথা শুনেছি মা! বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে—ঘড়ি হতচ্ছাড়ী উননমুখী বাঁদ্‌রী —তুই নিমতলার ঘাটে যা—নিমতলার ঘাটে যা—তুই মর্ মর্ মর্!" বলিয়া সে মট্-মট্ করিয়া আপন আঙ্গুল মট্‌কাইতে লাগিল।

"ছি মা, কাউকে কি মর্ মর্ বলতে আছে? সবাই সেই ভগবানের ছেলে-মেয়ে! রাত হয়েছে, যাও, তুমি এখন শুয়ে পড়গে।"—বলিয়া আমি রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

রাত্রে সুসংবাদটা শুনাইলে উনি বলিলেন, "আমি জানি, আমার ছেলে, অমন দুর্ব্বুদ্ধি তার বেশী দিন থাকবে না!"

দেখ একবার অবিচার! ওঁর ছেলে বলিয়াই নিজ বাহুবলে সে যেন জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারিয়াছে! আর আমি মাগী যে মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে কত মাথা খুঁড়িয়া, কত পূজা মানিয়া ছেলের মন ফিরাইলাম, সে কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসিল না!

একালের ছেলে

এক

আমি পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ. আমার নাম শ্রীকরালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খিজিরপুর। আমার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র, তখনই আমার পিতা স্বগ্রামনিবাসী ৺রেবতীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বিরাজ-মোহিনী দেবী ওরফে রাজুর সহিত আমার বিবাহ দেন। রাজুর বয়স তখন আট বৎসর —আমার শ্বশুরমহাশয় গৌরীদান করিয়া, আশা করি পরলোকে তাঁহার পুণ্যোচিত পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হন নাই। শ্বশুর-মহাশয়ের কোনও পুত্রও ছিল না, সুতরাং তাঁহার স্বর্গারোহণে তাঁহার বাসগৃহ, পুষ্করিণী, আমবাগান এবং প্রায় পঞ্চাশ বিঘা লাখেরাজ জমি আমি প্রাপ্ত হই এবং এতাবৎ কাল ভোগদখল করিতেছি। আমার পিতাও নিঃস্ব ছিলেন না, পিতা ও শ্বশুরের মিলিত সম্পত্তির উপস্বত্বে, তাঁহাদের মিলিত আশীর্ব্বাদে, আমি পল্লীগ্রামের পক্ষে, স্বচ্ছল অবস্থাতেই জীবন যাপন করিতেছি।

আমি ক্রমে ক্রমে দুইটি পুত্র ও তিনটি কন্যা লাভ করি, ঈশ্বরেচ্ছায় সকলগুলিই জীবিত আছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম প্রফুল্লকুমার, গ্রামের ইস্কুলে সে মাইনর পাস করিলে, বর্দ্ধমানে তাহাকে এক আত্মীয়ের বাসায় রাখিয়া রাজস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিই। তথা হইতে সে ম্যাট্রিক পাস করিয়া মাসিক দশ টাকা জলপানি পায়। আই-এ পড়িবার জন্য কলিকাতা যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অত দূরদেশে ছেলে পাঠাইতে গৃহিণীর মত হইল না। শরীর আছে. অশরীর আছে, দায় আছে, বিপদ আছে তার চেয়ে বর্দ্ধমানই ভাল, তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছান যায়। আমার সে আত্মীয়টি ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী। সে সময় তিনি বর্দ্ধমান হইতে বদলী হইয়া গেলেন, সুতরাং ছেলেকে রাজকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ষ্টুডেণ্ট মেস অথবা ছাত্রাবাসে তাহাকে স্থাপন করিয়া আসিলাম। এই ছাত্রাবাসটি মহাজনটুলীতে অবস্থিত।

গত বৎসর ফাল্গুন মাসে কামারহাটী গ্রামনিবাসী শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ঊষাবালার সহিত প্রফুল্লকুমারের বিবাহ দিয়াছি। বৈদ্যনাথের সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল নহে, কিছুই দিতে পারেন নাই। গৃহিণীর তাহাতে খুবই আপত্তি ছিল, কিন্তু মেয়েটি ভারি সুন্দরী দেখিয়া আমি সেদিকে বিষম ঝুঁকিয়া পড়ি। ঠিকুজী-কোষ্ঠীতেও রাজযোটক দেখা গিয়াছিল। উহারা বলিয়াছিল মেয়ের বয়স এগারো, কিন্তু গৃহিণী বলিয়াছিলেন, "কখ্‌খনো নয়। তেরোর একদিন কম যদি হয় ত আমার নাক কাণ কেটে দিও।"—আমার গৃহিণীটি কিঞ্চিৎ মুখরা।

আমার দ্বিতীয় পুত্রটির বয়স দশ বৎসর মাত্র। তাহার নাম হরেন্দ্রনাথ, সে গ্রামস্থ মাইনর ইস্কুলে পাঠ করে। কন্যা তিনটি যথাযোগ্য ঘরে-বরে বিবাহ দিয়াছি, তাহারা এখন ছেলেপুলের মা হইয়াছে, নিজ নিজ সংসার করিতেছে।

মহালয়ার দিন প্রফুল্লকুমার বাড়ী আসিল। ষ্টেশনে গো-যান পাঠাইয়াছিলাম, হরেন সেই গো-যানে তার দাদাকে আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিল। ইহা আমার নিজস্ব গো-যান। এখানে আসিতে হইলে মেমারি ষ্টেশনে নামিতে হয়, মেমারি এখান হইতে সাত ক্রোশ ব্যবধান।

পরদিন এক প্রহর বেলা থাকিতে কামারহাটী হইতে প্রফুল্লকুমারের পূজার তত্ত্ব আসিতে দেখিয়া আমার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। না জানি কিরূপ তত্ত্ব বেহাই পাঠাইয়াছেন এবং সে তত্ত্ব গৃহিণীর পছন্দ হইবে কি না। তত্ত্ব পছন্দ না হইলে গৃহিণী রাগিয়া "কুরুক্ষেত্র" করিবেন, এ আশঙ্কা আমার মনে ছিল। গত জামাইষষ্ঠীর

সময় ইহার সূচনা পাইয়াছিলাম। ছেলের তখন গ্রীষ্মের ছুটী, বাড়ীতে রহিয়াছে। বেহাই স্বয়ং আসিয়া তাঁহার জামাতাকে লইয়া গেলেন। সপ্তাহ পরে ছেলে শ্বশুর-বাড়ী হইতে ফিরিল। আমি তখন বাড়ীর ভিতরেই ছিলাম, দিবানিদ্রান্তে উঠিয়া তামাক খাইতেছিলাম। ছেলে হাত-পা ধুইয়া জল খাইয়া ঠাণ্ডা হইলে গৃহিণী বলিলেন, "ওরা কি কি দিলে, দেখি?"

প্রফুল্ল তোরঙ্গ খুলিয়া বলিল. "এই ধুতি-চাদর দিয়েছেন।"

গৃহিণী বলিলেন. "জুতো?"

"না, জুতো দেন নি।"

"সিল্কের জামা-টামা?"

"না, সিল্কের জামা দেন নি। বললেন, বাবাজী, জুতো-জামা এ পাড়াগাঁয়ে ত পাওয়া যায় না. এক কলকাতা থেকে আনানো। তা আন্দাজি আনালে মাপে ছোট হবে কি বড় হবে তার ত ঠিক নেই। সেইজন্যে আর—"

গৃহিণী পুত্রকে ভেঙাইয়া বলিলেন. "সেই জন্যে আর সে ব্যবস্থা করেন নি! তা বেশ ত, তোর হাতে দু'খানা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন না কেন, বাবাজী, ছুটীর পর বর্দ্ধমানে গিয়ে জুতো-জামা কিনে নিও?"

প্রফুল্ল নির্ব্বাক হইয়া নতমুখে চোরটির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রোধে গৃহিণীর চক্ষু লাল। কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া বলিলেন, "বল্। আমার কথার জবাব দে!"

ছেলেরই যেন অপরাধ! গৃহিণী তখন ধুতি-চাদর হস্তে লইয়া, তাহার জমি পরীক্ষা করিয়া, আমার গায়ের উপর উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন. "দেখ একবার তোমার পেয়ারের বেয়াইয়ের আক্কেল-খানা। ধুতির জমিটা একবার দেখ। মোটা ক্যাট্-ক্যাট্ করছে। এই ধুতি মানুষ জামাইকে দেয়?"

আমি হুঁকা নামাইয়া বস্ত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, "কেন, জমি মন্দই বা কি? সুতো মোটা নয়, বেশী খাপি জমি তাই মোটা দেখাচ্ছে। দু'দিন টিকবে।"

গৃহিণী আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "নাঃ, সুতো মোটা নয়! চোখে ধরেছে চাল্‌সে, সরু কি মোটা দেখতে পাচ্ছ, না ছাই পাচ্ছ। চশমা চোখে দিয়ে, একবার দেখ দেখি।"

আমি বলিলাম. "গাঁয়ের তাঁতিদের বোনা কাপড় ত! বেশী মিহি সুতো তারা পাবে কোথা বল? সে ছোট পাড়াগাঁ—ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরের কাপড়-চোপড় সেখানে কি কিনতে পাওয়া যায়?"

গৃহিণী চক্ষু রাঙাইয়া বলিলেন, "বেয়াইয়ের হ'য়ে তুমি ওকালতী কোরো না খপর্দ্দার বলছি।" ছেলেকে বলিলেন. "তোর আর এ ধুতি-চাদর প'রে কাজ নেই। এ তুলে রেখে দিই, পুজোর সময় ঠাকুর-মশাইয়ের ছেলেকে দিলেই হবে।"—

পুরোহিত-মহাশয়. তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানকে আমি পূজায় প্রতি বৎসর বস্ত্রাদি দিয়া থাকি।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সেই সকল ঘটনা স্মরণ করিয়াই আমি আশঙ্কায় আকুল হইলাম। একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি তত্ত্ব বহিয়া আনিয়াছে। সে ব্যক্তি আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া একখানি পত্র দিল। তাহার পরিচয় লইলাম—নাম গোবর্দ্ধন, জাতিতে সদ্‌গোপ, বৈবাহিক-মহাশয়ের অনুগত লোক, তাঁহার জমি চাষ করে। দ্রব্যাদিসহ লোকটিকে বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া, আমি পত্র পড়িলাম। বৈবাহিক মহাশয় তত্ত্ব-সামগ্রীর দৈন্য ও অপ্রচুরতা জন্য অনেক বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। অবশেষে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, প্রেরিত লোকটির সহিত প্রফুল্লকুমার বাবাজীবনকে যেন কয়েক দিনের জন্য

পাঠাইয়া দিই।

অল্পক্ষণ পরেই ঝি আসিয়া বলিল, "মা ডাকছেন।"

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখি, যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। গৃহিণী, উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তি। তত্ত্ব-সামগ্রী বারান্দাময় ছড়ানো—পরে শুনিয়াছিলাম, তিনি সেগুলি, লাথাইয়া লাথাইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমাকে দেখিবামাত্র ঝঙ্কার দিয়া তিনি যে সব কথা বলিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আর কাজ নাই। যে লোকটি তত্ত্ব আনিয়াছিল, সে বারান্দার কোণে বসিয়া হাঁটুর ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। গৃহিণী তাহাকে বলিতেছেন, "ওঠ্ বেটা নচ্ছার পাজি চাষা, তোল্ এ-সব জিনিষ তোর তোরঙ্গে, ফিরিয়ে নিয়ে যা—এ-সব আমি চাইনে।"

আমি গৃহিণীকে বলিলাম, "ছি ছি কি করছ পাগলামী?" বলিয়া জিনিষগুলি আমি কুড়াইয়া কুড়াইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিলাম।

কত কষ্টে কত সাধ্য-সাধনায় তাঁকে ঠাণ্ডা করিলাম তাহার বিস্তারিত বিবরণে আর প্রয়োজন নাই। জিনিষগুলি তিনি রাখিলেন, কিন্তু ছেলেকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। অধিকন্তু তাহাকে বলিলেন, "খপর্দ্দার সে বউয়ের কখনও মুখ দেখবি ত মাতৃহত্যের পাতক হবি। এগ্‌জামিনটে হয়ে যাক, এবার কোনও ভদ্দর-লোকের মেয়ে এনে তোর বিয়ে দেবো। সে বউ ত্যাগ করলাম আমি।"

গৃহিণীকে বলিলাম, "অনেক পথ হেঁটে এসেছে, লোকটিকে জল-টল খাবার দাও।" তাহাকে বলিলাম, "তুই বাবা আজ এখানে থেকে বিশ্রাম কর্। কাল ভোরে উঠে তখন যাস্।"—বলিয়া আমি বৈঠকখানায় চলিয়া গেলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, লোকটি বাহির হইয়া আসিতেছে। আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবা-ঠাকুর, আমি চললাম।"

আমি বলিলাম, "এখনি চললি? খাওয়া-দাওয়া হ'ল না। খাওয়া-দাওয়া ক'রে এখানে ঘুমিয়ে কাল সকালে গেলে হত না?"

সে বলিল, "কাল সকালেই রওয়ানা হব বাবা-ঠাকুর। এ-গাঁয়ে আমার একঘর কুটুম্ব আছে, তাদের সঙ্গে দেখা-শুনো করাও দরকার, রাতটে সেইখানেই থাকবো।"

"সেইখানে থাকবি? আচ্ছা তা বেশ। বোস্ তাহ'লে একটু। বেয়াই-মশাইকে চিঠি একখানা লিখে দিই। ঐখানে তামাক-টিকে সব আছে, তামাক সাজ্।"

গোবর্দ্ধন তামাক সাজিতে বসিল। আমি বেহাইকে পত্র লিখিলাম। লিখিলাম, "আপনার প্রেরিত উপহার দ্রব্যগুলি পাইয়া আমরা সকলে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আপনার সাদর আহ্বানে প্রফুল্ল বাবাজীবনকে এই সঙ্গে পাঠাইতাম, কিন্তু পরীক্ষার আর বেশী বিলম্ব না থাকায়, বাবাজীবন এখন পড়াশুনা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। এখন সেখানে গেলে বৃথা কয়েকদিন সময় নষ্ট হইবে। পরীক্ষাটা হইয়া যাক্, আপনার জামাই আপনারই রহিল, বাবাজীর এখন যাওয়া হইল না বলিয়া আপনি বা বেয়ান-ঠাকুরাণী যেন দুঃখিত না হন ইহাই আমার প্রার্থনা। বধূমাতার জন্য সামান্য কিঞ্চিৎ উপহার যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আগামী পঞ্চমীর দিন তাহা পাঠাইব। দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।"—ইত্যাদি।

পত্র লেখা শেষ করিয়া, গোবর্দ্ধনকে নিকটে ডাকিয়া তাহার হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলাম, "বাবা গোবর্দ্ধন, এই চিঠিখানি বেয়াইকে দিবি। আর, আমার একটি কথা তোকে রাখতে হবে, বাবা!"

"কি কথা কর্ত্তা-মশাই?"

"এখানে যা দেখলি শুনলি—এই, রাগের মাথায় গিন্নী যা বলেছেন করেছেন, সে

সব আর সেখানে প্রকাশ করিসনে বাবা! কুটুম্বিতা স্থলে এ সব আকছার হয়েই থাকে, কোন্ সংসারে না হয়? কিন্তু জানতে পারলে বেয়াই বেয়ান মনে বড়ই কষ্ট পাবেন। এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও সেখানে প্রকাশ করিসনে লক্ষ্মী বাপ আমার! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোকে আশীর্ব্বাদ করছি, তোর ভাল হবে। আমি চিঠিতে লিখে দিলাম যে জিনিষপত্তর তিনি যা পাঠিয়েছেন তা পেয়ে আমরা খুব খুসী হয়েচি। বুঝলি ত? তুইও সেই রকম বলবি। আর এই নে, দু'টি টাকা, কা'ল যাবার সময় পথে জলটল খাবি।"—বলিয়া তাহার হাতে দু'টি টাকা দিলাম।

গোবর্দ্ধন হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা যখন নিষেদ করলেন, তখন এ সব কথা আমি চেপে যাব বইকি। ছিছি, এ সব কি পেরকাশ করবার কথা?" টাকা দু'টি টেঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "কিন্তু মাঠাকরুণ ঐ যে বললেন ছেলের আবার বিয়ে দেবেন সেটা বাবাঠাকুর?"—বলিলাম, "না রে না। ওটা রাগের মাথায় বলেছেন বইত নয়। ওকি একটা কথা হল? ও-সব কথা কিছু তুই প্রকাশ করিসনে।"

গোবর্দ্ধন স্বীকৃত হইল। বলিলাম, "দেখিস বাবা! ব্রাহ্মণের কাছে কথা দিয়ে যেন কথার খেলাপ করিসনে।"

"না বাবা ঠাকুর, কথার খেলাপ হবে না।"—বলিয়া সে আমার পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিল।

কয়েক দিনই লক্ষ্য করিলাম, ছেলেটার মনে সুখ নাই, মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বেড়ায়। তার গর্ভধারিণীর আচরণে মনে সে ব্যথা পাইয়াছে। তাহাও বটে,—এবং সেই জামাই-ষষ্ঠীর সময় গিয়াছিল, পূজার ছুটীতেও শ্বশুর-বাড়ী যাইবে আশা করিয়াছিল, তাহার সে আশা ভংগ হওয়াতেও বোধ হয় সে মনঃক্ষুণ্ণ। এখনই না হয় বুড়া হইয়াছি, কিন্তু যে বয়সের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, যে সাধ-আহ্লাদ, তাহাও ত জানি! ফাল্গুন মাসে উহার পরীক্ষা। মাঘ মাস গেলেই বিবাহের এক বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে, ছেলে বাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই বৌমাকে আনাইয়া রাখিব।

দেখিতে দেখিতে মহাপূজা আসিয়া পড়িল। উৎসবের হাওয়ায়, বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য্যে ছেলের মুখখানিও আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

দুই

ছুটি ফুরাইলে বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া প্রফুল্ল বর্দ্ধমানে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বলিল, এবার বড়-দিনের ছুটিতে আর বাড়ী আসিবে না, কারণ, তখন পরীক্ষা অত্যন্ত সন্নিকট—পড়াশুনা লইয়া তাহাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইবে। পরীক্ষা শেষ হইলে, একেবারে ফাল্গুন মাসে আসিবে। গৃহিণী বলিলেন, "চা—র মা—স। চার মাস বাদে বাড়ী আসবি? মাঝে একটা ছুটি-ছাটাতে দু'তিন দিনের জন্যেও এসে দেখা দিয়ে যেতে পারবি নে?"

প্রফুল্ল বলিল, "ছুটি-ছাটা তেমন আর কই?"

"কেন জগদ্ধাত্রী পুজোর ছুটি, তবে গিয়ে সরস্বতী পুজোর ছুটি?"

"জগদ্ধাত্রী পুজোর দু'দিন ছুটি আছে বটে, সঙ্গে একটা রবিবারও পড়েছে। কিন্তু তিন দিনের জন্যে আসতে গেলে সাতটি দিন পড়াশুনোর ক্ষতি। আগে দু'দিন কতক্ষণে বাড়ী যাব কতক্ষণে বাড়ী যাব এই ক'রে ক'রে পড়ায় মন বসবে না। ফিরে গিয়েও, পড়ায় মন বসাতে দু'দিন লেগে যাবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সারা বছরই ত মেহনত করলি বাবা, এক হপ্তায় আর কি এসে যাবে? তাতে কি আর পাস হওয়া আটকাবে?"

ছেলে বলিল, "পাস হওয়া না আটকাতে পারে। কিন্তু শুধু পাস হলেই ত চলবে না মা! গতবারে যেমন জলপানিটি পেয়েছিলাম, এবারও যাতে সেই রকম পেতে পারি সেই চেষ্টাই করছি কিনা।"

পড়াশুনায় প্রফুল্লর বরাবরই খুব আঁঠা।—অন্য ছেলেদের যেমন "ওরে পড়্ রে ওরে পড়্ রে" বলিয়া তাগাদা করিতে হয়, প্রফুল্লকে কোনও দিন সেরূপ করিতে হয় নাই। ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ—ছেলে আমার সে তপস্যায় কোনও দিন অবহেলা করে নাই। তাই আমি বলিলাম, "প্রফুল্ল যা বলছে তা ঠিক কথাই। আচ্ছা বাবা, পরীক্ষা হয়ে গেলেই তুমি এস। তোমার পড়ার বিঘ্ন আমরা করতে চাই না।"

ঘট প্রণাম করিয়া, আমাদিগকে প্রণাম করিয়া প্রফুল্ল শুভযাত্রা করিল।

প্রফুল্ল প্রতি রবিবার আমাকে একখানি করিয়া পত্র লেখে, সে পত্র আমি পাই সোমবার বেলা তিনটার সময়। শুক্রবারে জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল, শনিবার মা'র বিসর্জ্জন, রবিবার প্রাতে গৃহিণী বলিলেন, রাত্রে প্রফুল্ল-সম্বন্ধে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মন বড় খারাপ হইয়াছে। আমি বলিলাম, "জগদ্ধাত্রী পুজোর ছুটিতে ফি-বছরই ছেলে বাড়ী আসে, এবার আসেনি ব'লে আমার মনটাও খারাপ ছিল। তোমারও ছিল নিশ্চয়। সে জন্যেই ও রকম স্বপ্ন দেখেছ—ও কিছু নয়, সে ভালই আছে, কোনও চিন্তা নেই।"

গৃহিণী বলিলেন, "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাই যেন হয়! কিন্তু তবু, তুমি গিয়ে একবার তাকে দেখে এস।"

বলিলাম, "আজ রবিবার, আমি বর্দ্ধমানে গিয়ে ছেলেকে দেখে ফিরে আসতে কাল বেলা দুপুরের কম ত নয়,—কাল সোমবার বেলা তিনটের সময় তার চিঠিই ত আসবে।"

সমস্ত দিন গৃহিণীর মনটি বিষন্ন হইয়া রহিল। সোমবার আহারাদি সারিতে বেলা একটা বাজিল। তামাক খাইয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "আমি যাই পোষ্ট আপিসে গিয়ে ছেলের চিঠি নিয়ে আসি। বেলা দেড়টার সময় রাণার ডাক আনে, তবু দেড় ঘণ্টা আগে চিঠিখানা পাব।" বলিয়া আমি বাহির হইলাম। গ্রামেই পোষ্ট আফিস আছে।

ডাকবাবু সমাদর করিয়া আমায় আপিস-ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন। দেড়টা তখন বাজিয়া গিয়াছিল। শুনিলাম রাণার এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। দুইটা বাজিতে চলিল, তখনও রাণারের দেখা নাই। ডাকবাবু বলিলেন, "ট্রেণ লেট থাকলে একটু দেরীও হয়।"

ঠিক যখন সওয়া দুইটা, তখন বাহিরে রাণার আসিবার ঝম্-ঝম্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। ডাক আসিল, ডাকবাবু ব্যাগ কাটিলেন। ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কই না, আপনার কোনও চিঠি ত নেই।"

ভগ্নমনে গৃহে ফিরিলাম। চিঠি আসে নাই শুনিয়া গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার চোখ মুছাইয়া বলিলাম, "ছি ছি, চোখের জল ফেলতে আছে? তাতে যে ছেলের অকল্যাণ হবে। আমি এখনই বর্দ্ধমান রওয়ানা হচ্ছি। সন্ধ্যা নাগাদ সেখানে পৌঁছিব। আজ রাত্রের মধ্যেই ছেলের ভাল খবরটি তোমায় এনে দেবো। তুমি ধৈর্য্য ধর, আর ঠাকুরদের ডাক,—তাঁরা সমস্তই মঙ্গল করবেন।"—বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যেই গরুর গাড়ীতে মেমারি যাত্রা করিলাম। বর্দ্ধমানে মহাজনটুলীতে ছেলের বাসায় যখন পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা সাতটা।

ঘর সব খালি। "প্রফুল্ল" বলিয়া ডাকিতে, একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল, সে আমার পরিচিত, আমাদের পাশের গ্রামেই বাস। তার নাম সুরেন্দ্র, বাল্যকাল হইতে প্রফুল্লর বিশেষ বন্ধু। আমাকে সে জ্যেঠামশাই বলিয়া ডাকে। আমাকে দেখিবাই, "জ্যেঠামশাই যে!" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। বলিলাম, "ভাল আছ ত বাবা? প্রফুল্ল কই? সে কেমন আছে?"

সুরেন বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি। প্রফুল্লও ভাল আছে।"

"কই সে?"

সুরেন বলিল, "আজ্ঞে সে ত এখন বাসায় নেই।"

"কোথা গেল? কখন আসবে?"

সুরেন বলিল, "আজ্ঞে সে—সে—কি একটা গ্রামে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বল্তির—"

"বল্তির? বল্তির গেছে কেন?"

"আজ্ঞে সেখানে, আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের বিয়ে কিনা। সেই জন্যে গেছে। কালই রওয়ানা হয়েছে।"

"ফিরবে কখন?"

"কাল বোধ হয় ফিরবে, এসে কলেজ করবে। নয় ত বড় জোর পরশু। তবে বৌভাতটা না হয়ে গেলে তারা যদি না ছাড়ে, তবে দুই-একদিন দেরীও হতে পারে। পার্সেন্টেজ তার যথেষ্ট আছে, দুই-একদিন দেরীতে কোনও ক্ষতি হবে না। আসুন না জ্যেঠামশাই, আমার ঘরে এসে বসুন।" বলিয়া আমাকে হাত ধরিয়া তাহার ঘরে লইয়া গেল।

আমায় বসাইয়া বলিল, "ঐ বিয়েতে আমারও নেমন্তন্ন ছিল, আমাকেও ধরেছিল যাবার জন্যে। আমি অনেক কষ্টে কাটিয়ে দিয়েছি, প্রফুল্ল আর কাটাতে পারলে না। আমার চেয়ে প্রফুল্লর সঙ্গে তার বেশী ভাব কিনা! প্রফুল্লর বিয়েতে সে ত আপনার বাড়ীতে গিয়েছিল, স্মরণ নেই বোধ হয়? রোগা ছিপ্‌ছিপে, কালো, বাঁ-গালে একটি আঁচিল আছে।"

আমি বলিলাম, "কই বাবা আমার মনে পড়ছে না। তোমাদের আট-দশ জন বন্ধু গিয়েছিল, বিশেষ, আমি তখন ভারি ব্যস্ত—অত স্মরণ হচ্চে না।"

সুরেন বলিল, "আজ্ঞে তা তো বটেই! তা হঠাৎ যে জ্যেঠামশাই? সহরে কোনও কাজ ছিল বুঝি?"

কি কাজে আসিয়াছি তাহা সুরেনকে খুলিয়াই বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ প্রফুল্ল সকালে বলছিল বটে যে কাল পোষ্ট কার্ড কিনে রাখতে ভুলে গেলাম, আজ রবিবার, বাবাকে চিঠি লিখি কি ক'রে? একদিন দেরীই হয়ে গেল, কাল পারি ত বল্তির থেকেই চিঠি লিখবো এখন। জ্যেঠাইমা যখন অত উতলা হয়েছেন, তা হ'লে জ্যেঠামশাই, আর আপনার এখানে দেরী করা উচিত নয়। জ্যেঠাইমা সেখানে ভেবে খুন হচ্চেন, আপনি তা হ'লে সাতটা বাইশ মিনিটের গাড়ীতে রওয়ানা হোন।"

বলিলাম, "হ্যাঁ বাবা, তাইতে রওনা হব মনে করেই এসেছি। মেমারিতে আমার গরুর গাড়ী অপেক্ষা করছে।"

"তাই ত! আপনাকে জল-টলও কিছু খাওয়াতে পারলাম না! বাড়ী পেঁছিতে বোধ হয় রাত দুপুর হ'বে?"

"রাত এগারোটা ত বটেই। ইষ্টিশানে গিয়ে কিছু মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে খেয়ে নেবো এখন, সে জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না বাবা! আচ্ছা, এখন তা হ'লে উঠি। বল্তিরে সেই গোলমালে যে প্রফুল্ল চিঠি লিখতে পারবে, সে আশা কম। সে ফিরে এলেই—কালই আসুক বা দু'দিন পরেই আসুক—পেঁছেই যেন একখানা চিঠি আমার লিখে দেয়।" বলিয়া আমি উঠিলাম।

সুরেনও আমার সঙ্গে ষ্টেশনে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অনর্থক সময় নষ্ট করিতে তাহাকে মানা করিয়া আমি প্রস্থান করিলাম।

রাত্রি বারোটায় বাড়ী পেঁছিয়া গিন্নীকে সুখবরটি দিতে তবে তিনি শান্ত হইলেন।

বৃহস্পতিবারের দিন প্রফুল্লর চিঠি আসিল। বর্দ্ধমান হইতেই লিখিয়াছে। বৌভাত

পর্য্যন্ত উহারা তাহাকে কিছুতেই আসিতে দেয় নাই। পোষ্ট কার্ড কিনিয়া রাখিতে নিজ ভুলের জন্য আমরা এত কষ্ট পাইয়াছি, এ জন্য অনেক দুঃখ করিয়াছে।

তিন

প্রতি সোমবারে নিয়মিতভাবে প্রফুল্লর পত্র আসিতে লাগিল।

পৌষ-তত্ত্বের পূর্ব্বে, গৃহিণীকে লুকাইয়া, বেহাই-মহাশয়কে আমি রেজিষ্ট্রি করিয়া দুই শত টাকা পাঠাইয়া দিলাম। লিখিয়া দিলাম, আজকাল যে নূতন ফ্যাসানের দোরোকা শাল উঠিয়াছে, তাহাই গায়ে দিতে তাঁহার জামাতার অত্যন্ত সখ। তিনি যেন স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া ভাল শাল একখানি কিনিয়া আনেন, আর ষোল গিরা একটি কাশ্মীরা কোট, গরম গেঞ্জি, গরম মোজা প্রভৃতি। আমি কিঞ্চিৎ টাকা পাঠাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলাম বলিয়া তিনি যেন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হন; তাঁহার কিরূপ অনটনের সংসার তাহা আমি অবগত আছি বলিয়াই, কুটুম্ব হিসাবে নয়, বন্ধুভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিলাম, ইহাতে তিনি যেন আমার অপরাধ না লয়েন এবং কথাটা গোপন রাখেন ইত্যাদি।

পৌষের তত্ত্ব দেখিয়া গৃহিণী খুসী হইলেন। বলিলেন, "আহা, ছেলে যদি বাড়ী থাকতো, তবে বড় আনন্দ হতো।"

বলিলাম, "দু'মাস পরেই ত সে আসছে। এসে দেখবে এখন।"

গৃহিণী ধরিলেন, "না গো তুমি একবার যাও বর্দ্ধমান। ছেলেকে এ সব দিয়ে এস। সে তার বন্ধুবান্ধবকে দেখাবে, কত আমোদ হবে তার।"

নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় গৃহিণীর অনুরোধ পালন করিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইল। জিনিষগুলি লইয়া একদিন আহারাদির পর রওয়ানা হইলাম। ছেলেকে দেখিয়াও আসিলাম, জিনিষগুলি দিয়াও আসিলাম। শুনিলাম বাইশে ফাল্গুন তাহার পরীক্ষা শেষ হইবে, তেইশে সে বাড়ী যাইবে।

গৃহে ফিরিয়া পাঁজি দেখিলাম, বাইশে ফাল্গুনের পূর্ব্বে দ্বিরাগমনের ভাল দিন নাই। সেই অনুসারে বেহাই-মহাশয়কে পত্র লিখিলাম।

বাইশে ফাল্গুন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেহাই নিজে আসিয়া তাঁহার মেয়েকে ঘর-বসত করিবার জন্য রাখিয়া গেলেন। বিবাহের সময় মা'র আমার যেমন রূপ দেখিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে। ঘর আলো-করা পুত্রবধূ যদি কাহারও আবশ্যক হয়, তবে সে যেন পুত্রের জন্য এমন পাত্রীরই সন্ধান করে।

পরদিন আমি স্নান করিবার জন্য বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিলাম, গৃহিণীর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ লাল, চক্ষু ছল্‌ছল্ করিতেছে, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ। বলিলেন, "ওগো, সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কি হয়েছে?"

তিনি বলিলেন, "বউমা নিজের ত মাথা খেয়েইছে, আমাদেরও মাথাও খেয়েছে।"

"কেন, কি করেছেন বউমা?"

গৃহিণী আমার কাণে-কাণে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেন।

আমি বলিলাম, "মাথা খেয়েছে কেন বলছ? কেন? ক'মাস? প্রফুল্ল কি মাসে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিল? হ্যাঁ, জষ্টি মাসে। তা হ'লে—তুমি কি বলছ—"

মাথামুণ্ড কি বলিব, কথা শেষ করিতে পারিলাম না। শঙ্কাকুল নয়নে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া রহিলাম।

গৃহিণী বলিলেন, "তা হ'লে ত ভরাভত্তিই হত—খালাস হবার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। তা নয়। চার মাস কি বড় জোর পাঁচ মাস।"

আমি নিজ কপাল টিপিয়া ধরিয়া, চক্ষু মুদিয়া নারায়ণ স্মরণ করিলাম। একটু সামলাইয়া লইয়া, মুখ তুলিয়া বলিলাম, "তোমার ভুল হয়নি ত?"

গৃহিণী বলিলেন, "শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি পাঁচ-পাঁচটা সন্তানের মা, তিনটে মেয়ে আমার কাছে থেকে খালাস হ'ল,—আমারই ত ভুল হবে! সে যাক্, বউমাও ত অস্বীকার করছে না। এ সর্ব্বনাশ কে করলে জিজ্ঞাসা করলে কোনও উত্তর দিচ্ছে না। খালি কাঁদছে। এখন বউ নিয়ে কি করবে কর। ঝাঁটা মেরে বিদেয় কর।"

আমার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আহা, মেয়েটাকে আপন সন্তানের মতই ভালবাসিয়াছিলাম। আমায় এ কি শাস্তি দিলে, ভগবান? চক্ষু মুছিয়া বলিলাম, "আহা, ওর দোষ কি, দুধের বাছা! দোষ ওর বাপ মা'র—যারা এমন অসাবধান। ঝাঁটা মারা উচিত তাদেরই মাথায়।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, অসাবধান! জেনে শুনেই তারা এমনটা ঘটতে দিয়েছে। গোড়া থেকেই আমি তোমায় বলিনি, ও ছোট-লোকের মেয়েকে ঘরে এন না। তুমি কি আমার কথা তখন শুনলে? বউয়ের রূপ দেখে একেবারে গ'লে গেলে। এখন রূপ ধুয়ে ধুয়ে খাও। ছোটলোক—ছোটলোক! মেয়ের রোজগার খাচ্ছিল, বুঝতে পারছ না? নইলে পৌষের তত্ত্বে অত টাকা খরচ করলে কোথা থেকে? উদ্ খেতে ক্ষুদ নেই যার, সে জামাইকে দেড়শো টাকা দামের শাল দিতে পারে? পুজোর-তত্ত্বও ত দেখেছিলে!"

দেড়শো টাকা দামের শাল কোথা হইতে আসিল, অন্য অবস্থা হইলে আমি এখনই তাহা প্রকাশ করিতাম। কিন্তু প্রকাশ করিয়া ত কণামাত্র ফল নাই! জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়ীর আর কেউ এ কথা জানতে পেরেছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, বোধ হয় না!"

বলিলাম, "তা হ'লে খুব সাবধান, কেউ কিছু যেন জানতে না পারে। আমি নিজে গিয়ে বউমাকে তার বাপের বাড়ী রেখে আসবো এখন।"

"রেখে এস, কিন্তু আজই। আজ তেইশে ফাল্গুন, আজ রাতেই ছেলে বাড়ী এসে পৌঁছবে মনে আছে ত?"

"হ্যাঁ, তা তো মনে আছে। আচ্ছা, আজই গিয়ে রেখে আসি। তেল দাও, যাই স্নানটা সেরে ফেলি।"

বেলা একটার সময় গরুর গাড়ী ঠিক থাকিতে বলিয়া স্নান করিতে গেলাম। স্নানান্তে আসিয়া পাতের কাছে বসিলাম মাত্র। ভাতের গ্রাস গলা দিয়া নামিতে চাহে না। চোখ ফাটিয়া কেবল জল আসে।

অর্দ্ধেক ভাত ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম, "বউমাকে চারটি খাইয়ে দাও। ছেলে এসে পৌঁছবার আগেই বেরিয়ে পড়া দরকার।"

খাটের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলাম। গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "গাড়ী সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়।"

"বউমা খেয়েছেন?"

"না, কিছুই খায়নি। আমারও মনের অবস্থা এমন নয় যে, পীড়াপীড়ি করি। চুলোয় যাক্—ওর ত এখন মরাই মঙ্গল।"

"এই কাল মোটে বউ এল। আজই হঠাৎ আবার বাপের বাড়ী চলল, লোকে জিজ্ঞেস করলে কি বলবে?"

"বলবো কি, বলেছি। বলেছি যে বেয়াই কাল রাতে বাড়ী ফিরে গিয়েই দেখলেন, তার পরিবারের কলেরা হয়েছে। বাঁচবার আশা কম। তখনই লোক ছুটিয়ে দিয়েছিলেন মেয়েকে আনবার জন্যে। অপর লোকের সঙ্গে না পাঠিয়ে কর্ত্তা নিজেই যাচ্ছেন তাঁকে

রাখতে গাড়োয়ানও এই কথাই জানে।"

"বউমাকে তৈরী হ'তে বলগে।" বলিয়া আমি জামা গায়ে দিলাম।

এই সময় বাহিরে ঠঠ-ঠং করিয়া বাইসিক্লের শব্দ হইল। কে আসিল? উঠিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, বাইসিক্ল হস্তে প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া, গাড়োয়ানের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তার পাশে, অপর বাইসিক্ল হস্তে তার সেই বর্দ্ধমানের বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ।

এক মিনিট পরে প্রফুল্ল ও সুরেন আসিয়া প্রবেশ করিল। উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত—দর-দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। প্রফুল্ল আসিয়াই আমার পা জড়াইয়া বলিল, "বাবা আমায় মাফ করুন।"

"কেন, কেন বাবা, হঠাৎ কি হয়েছে?"

"শ্বশুর-মশায় তাঁর মেয়েকে এখানে রেখেই বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন আমায় আনতে। গাড়োয়ানের কাছেও শুনলাম। বাবা, আপনি যখন জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় বর্দ্ধমানে আমায় দেখতে গিয়েছিলেন, তখন আমি কারুর বিয়ের নেমন্তন্নে যাইনি, আমি গিয়েছিলাম শ্বশুরবাড়ী। আপনাদের লুকিয়ে গিয়েছিলাম, সুরেন সব কথাই জানতো, তাই আমায় বাঁচাবার জন্যে সে মিথ্যে ক'রে ঐ সব কথা আপনাকে বলেছিল।"

সুরেন ছোকরা নত মস্তকে দাঁড়াইয়া।

শুনিয়া আমার বুক হইতে হাজার মণ পাথরের ভার নামিয়া গেল। আমি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, যুগ্মকর ললাটে স্পর্শ করিয়া, উদ্দেশে নারায়ণ প্রণাম করিলাম।

প্রফুল্লর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার গর্ভধারিণীও আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। সমস্ত শুনিয়া চোখে অঞ্চল দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন,—বোধ হয় বউমার কাছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্ল ও সুরেনকে স্নানাহার করাইতে লইয়া গেলেন।

অপরাহ্ণে স্বয়ং বেহাই-মশাই গোযানে আসিয়া উপস্থিত—কামারহাটী হইতে নয়, বর্দ্ধমান হইতে, প্রফুল্ল ও সুরেন্দ্রের সহিত এক ট্রেণে আসিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে সকল কথা শুনিলাম।

বর্দ্ধমান হইতে কামারহাটি যাইতে হইলে, পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে নামিয়া তিন ক্রোশ। কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে কামারহাটি অবধি পাকা সড়ক আছে, উহা সাত ক্রোশ ব্যবধান। প্রফুল্ল সাত ক্রোশ পথ বাইসিক্লে অতিবাহন করিয়া, শুধু সেই জগদ্ধাত্রী-পুজোর ছুটিতে যে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছিল তাহা নয়, প্রতি শনিবারে শ্বশুরবাড়ী যাইত এবং সোমবার ভোরে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া, বাসায় আসিয়া স্নানাহার করিয়া কলেজ করিত। তার শ্বশুর জানিতেন যে জামাই লুকাইয়া যাওয়া-আসা করে। স্বভাবতঃ তিনি জামাইয়ের গোপন কথা ব্যক্ত করিতে চাহেন নাই। মাঝে মাঝে চিঠি লিখিতেন, কোন চিঠিতেই কোনও দিন লেখেন নাই যে, প্রফুল্ল বাবাজীবন আসিয়াছিলেন তিনি ভাল আছেন, বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গিয়াছেন। কথা তিনি প্রকাশ করিবেন না শ্বাশুড়ীর কাছে এই আশ্বাস পাইয়াই প্রফুল্লর যাতায়াত তখন ঘন-ঘন হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাই নয়। শুনিলাম, পাজীটা নাকি বউমাকেও, নিজের পায়ে হাত দেওয়াইয়া শপথ করাইয়া লইয়াছিল যে, ঘর-বসত করিতে আসিয়া সে কথা তিনিও যেন এখানে প্রকাশ না করেন।

আমাদের কালে যে সব ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব বলিয়া গণ্য ছিল, একালের ছেলেদের পক্ষে তাহা আর নাই, আমরা স্ত্রী-পুরুষে এই আলোচনা করিয়া গোপনে অনেক হাসাহাসি করিলাম।

আষাঢ় মাসে প্রফুল্লর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। জলপানি ত পায়ই নাই, পাস হইয়াছে মাত্র, তাও থার্ড ডিভিজনে।

জামাতা বাবাজী

এক

আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আজ প্রায় এক মাস হইতে চলিল, আমার একমাত্র জামাতাটি নিরুদ্দেশ, অথচ কারণ কিছুই জানা যায় নাই।

রাজসাহী জিলা-স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাস করিয়া বাবাজী (তখনও আমার জামাতা হন নাই) কলিকাতায় গিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন। দুই বৎসর তথায় পড়িয়া, আই-এ পরীক্ষা দিয়া বৈশাখ মাসে তিনি রাজসাহীতে পিতার নিকট ফিরিয়া আসেন। পিতা তাঁহার রাজসাহীর প্রসিদ্ধ গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় শ্রীযুক্ত শশিশেখর দত্ত বাহাদুর। সেই সময় তাঁহার এই পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রের সহিত আমার কন্যা লীলাবতীর বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। ৮ই শ্রাবণ বিবাহ হইল—তখন সপ্তাহখানেক মাত্র গেজেট বাহির হইয়াছিল, বাবাজী দ্বিতীয় বিভাগে পাস হইয়াছিলেন। পূজার ছুটীতে বাবাজী রাজসাহী আসিলে, আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনিয়াছিলাম। এক সপ্তাহকাল বাবাজী আমার নিকট ছিলেন, কিন্তু তখন ত এ বিপত্তির কিছুমাত্র সূচনা আমি পাই নাই। কলেজ খুলিবার অব্যবহিতপূর্ব্বে বাবাজী আবার আসিয়া তিন দিন ছিলেন, বস্তুতঃ এখান হইতেই তিনি কলিকাতায় রওয়ানা হয়েন, তখনও ত আমাদিগকে এ বিষয়ের কিছুমাত্র আভাস তিনি দেন নাই!

কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া মাসখানেক বাবাজী যথারীতি পত্রাদি লিখিয়াছিলেন,—তার পর হইতে নিস্তব্ধ। বাবাজীকে পত্র লিখিয়া উত্তর পাই না। খুকী, পূর্ব্বে যে প্রতি সপ্তাহে তাঁহার পত্র পাইত, সে-ও কোনও পত্র পায় নাই। তিন সপ্তাহ এইরূপ ভাবে কাটিলে ব্যাকুল হইয়া বৈবাহিক মহাশয়কে রাজসাহীতে পত্র লিখিলাম, তাঁহার উত্তরে জানিলাম, তিনিও তিন সপ্তাহ পুত্রের কোনও পত্র পান নাই। পুত্রকে জবাবী টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ফেরৎ আসিবার পর, অনুসন্ধানার্থে নিজ মাতুলকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাসার ছেলেরা নাকি বলিয়াছে, "কেন? পূর্ণ ত আজ তিন সপ্তাহ হ'ল, বাড়ী চলে গেছে।"—বাড়ী যায় নাই শুনিয়া বাসার ছেলেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। কোথায় সে গিয়াছে, উহা তাহারাও অনুমান করিতে অসমর্থ। বৈবাহিক আরও লিখিয়াছেন, "ছেলের এরূপ ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবার কারণ কি? শেষবার যখন আপনার ওখানে গিয়াছিল, সে সময়ে বউমার সহিত তাহার কোনও ঝগড়া-কলহ হইয়াছিল কি না, সন্ধান লইবেন ত!" কন্যার নিকট জানিয়া আসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "না, সে রকম কিছুই ত হয়নি।"—আমিও সেই মর্ম্মে বেহাই মহাশয়কে পত্র লিখিয়া দিলাম।

এই ত অবস্থা! আমি এখন কি করি বলুন দেখি! বেহাই মহাশয় ত বেশ নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় আছেন দেখিতেছি! তাঁর আর দুই পুত্র আছে, তিনি নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার যে ঐ একমাত্র কন্যা! শুধু তাহাই নহে, আমার পরলোকগতা প্রথমা পত্নীর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন—আমার বড় আদরের ধন। আমার খুকুরাণীর মুখে আর হাসি দেখিতে পাই না, সর্ব্বদাই মুখখানি তার বিষণ্ণ, চক্ষু দুইটি ছলছল করে। এখন আর নিতান্ত বালিকাটি নাই, চৌদ্দ বছরে পড়িয়াছে, জ্ঞান-বুদ্ধি হইয়াছে, সবই বুঝিতে পারে ত! তাহার বিষাদ-মলিন মুখখানি দেখিলে আমার বুকের ভিতরটা হাহাকার করিয়া উঠে।

ছেলেটি ভাল দেখিয়া, মহাশয়, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া ওখানে মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলাম। আমার মত অবস্থার লোকের, এক মেয়ের বিবাহে, পাঁচ হাজার

টাকা খরচ করা কি সোজা কথা? কিন্তু তবু আমি করিয়াছিলাম—কেন? না মেয়েটি আমার সুখে থাকিবে, এই আশায়। কিন্তু দেখুন দেখি একবার দৈব-বিড়ম্বনা!

আমার অবস্থাও বলি, শুনুন। আমার নিবাসও রাজসাহী জিলায়, ইছমাইলপুর গ্রামে, নাটোরের তিনটা ষ্টেশন পরে রঘুরামপুরে নামিয়া তিন ক্রোশ আসিতে হয়। ষ্টেশনে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়, পাল্কীও পাওয়া যায়, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী নাই। আমার নাম শ্রীপ্রমথনাথ দেব—উত্তররাঢ়ী কায়স্থ আমরা। পিতার মৃত্যুতে আমি কিছু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলাম, আর কিছু কোম্পানীর কাগজ। তা কোম্পানীর কাগজগুলি মেয়ের বিবাহে ত প্রায় নিঃশেষই হইয়া গিয়াছে। ভূসম্পত্তি ছাড়া, আমার একটি সামান্য কারবারও আছে—গুড় প্রস্তুতের একটি কারখানা। কয়েকটি ইক্ষুমাড়াই কল আছে, সেই কলে ইক্ষু মাড়িয়া, রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করি। আমি অবশ্য নিজ হস্তে করি না, বেতনভোগী কারিগরেরা আছে। কতক ইক্ষু আমার নিজের চাষের, বাকীটা কিনিয়া আনি। আশে-পাশে পাঁচখানা গ্রামের ব্যাপারীরা আসিয়া সেই গুড় খরিদ করিয়া লইয়া যায়। ভূসম্পত্তির আয়ে এবং কারখানার মুনাফায় একরূপ ভদ্রভাবেই আমার দিন গুজরাণ হয়। আমার প্রথমা পত্নী জীবিতা নাই, সে আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। খুকীকে চারি বৎসরের রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। আমার বয়স তখন বত্রিশ বৎসর মাত্র। আত্মীয়-বন্ধুরা সকলেই আবার বিবাহ করিবার জন্য আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না।—আমার এত সাধের—এত আদরের খুকীকে আমি বিমাতার হাতে তুলিয়া দিতে পারিব না। আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, তিনি বিধবা, নিজ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাকে আনাইয়া খুকীর লালন-পালনের ভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিলাম।

এ দিকে আত্মীয়-বন্ধুরা বিবিধ প্রকারে আমায় বুঝাইতে লাগিলেন—"এই মোটে বত্রিশ বছর তোমার বয়স, সারাটা জীবন প'ড়ে রয়েছে, কি ক'রে তোমার কাটবে? তোমার দিদিই বা নিজের সংসার ছেড়ে কত দিন তোমার কাছে থাকতে পারবেন? বিমাতা হলেই যে একটি আস্ত রাক্ষসী হবে, এমনই বা কি কথা? সে রকম হয় কারা? যারা ছোট-লোকের ঘরের মেয়ে। ভদ্রবংশের একটি ডাগর দেখে মেয়ে বিয়ে ক'রে আন, সে তোমার মেয়েকে নিজ সন্তানের মতই লালন-পালন করবে—তোমার সংসার বজায় রাখবে।" —ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাত আট মাস থাকিয়া, দিদিও ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন কি করি, অগত্যা বিবাহই করিয়া ফেলিলাম। দিদি নববধূকে সংসার বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহাকে ঘরে আনিলাম, তিনি মাতৃবৎ স্নেহাদরেই আমার খুকীকে বুকে তুলিয়া লইলেন। এ পক্ষেও আমার দুইটি কন্যা ও তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্র তিনটি আপনাদের আশীর্ব্বাদে জীবিতই আছে, কিন্তু কন্যা দুইটিকে তাহাদের শৈশবেই যমের মুখে তুলিয়া দিয়াছি।

দুই

এক মাস কাটিয়া গেল, জামাতার কোনও সংবাদ নাই। গত পূর্ণিমা-রাত্রিতে বাবা সত্যনারায়ণের সিন্নী দিয়াছি। গৃহিণী স্থানীয় কালী-মন্দিরে মানত করিয়াছেন, জামাতা ফিরিলেই যোড়া পাঁঠা দিয়া মা'র পূজা করিবেন। পাড়ার বর্ষীয়সী জ্ঞানদা-ঠাকুরাণী প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া গৃহিণী ও খুকীকে "নীলকুল বাসুদেবের কথা" শুনাইয়া যাইতেছেন—আমিও শুনিতেছি। ইহার ফলশ্রুতি এই প্রকার—"ধন না থাকলে তার ধন হয়, পুত না থাকলে তার পুত হয়, বন্দী থাকলে ছাড়ান পায়, দূরের সুসমাচার নিকটে

আসে।"—জ্ঞানদা-ঠাকুরাণী বলিয়াছেন, ইহা একেবারে অব্যর্থ,—এই কথা শুনাইয়া, অনেক গৃহস্থকে তিনি চিঠি আনাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত করিয়াছেন,—তবে ভক্তি থাকা চাই।

কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তুমি নিজে একবার কলকাতায় গিয়ে সন্ধান কর। বাসার ছেলেরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় গেছে, বেয়াইয়ের মামার কাছে সে কথা তারা গোপন করেছে! তাদের বাপু-বাছা ব'লে খোসামোদ ক'রে কথা বের ক'রে নাও গে। মেয়েটার মুখপানে ত আর তাকানো যায় না!"

অদ্য আহারাদির পর কলিকাতা যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। গোরুর গাড়ীও বলিয়া রাখিয়াছি।

বেলা তখন এগারটা। স্নানের পূর্ব্বে বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, হঠাৎ নজর পড়িল, বাঁড়ুয্যেদের পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ীর উঠান দিয়া, লাল পাগড়ী মাথায় ব্যাগ কাঁধে পিয়ন আসিতেছে। একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলাম—দেখি এই দিকেই আসে কি না। বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল।

এই যে, এই দিকেই যে আসে!

পিয়ন আসিয়া প্রণাম করিল। তার পর হস্তস্থিত একগোছা চিঠির মধ্য হইতে বাছিয়া একখানি আমার হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। খামের চিঠি।

আমি তাড়াতাড়ি ভিতর হইতে চশমা আনিয়া চোখে দিয়া ঠিকানা পড়িলাম। জয় বাবা সত্যনারায়ণ! জয় বাবা নীলকুল বাসুদেব! খুকীর নামে চিঠি, জামাতার হস্তাক্ষর! কোথা হইতে লিখিল, জানিবার জন্য টিকিটের উপরকার ছাপটা পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু তেল-কালী, এমন ধ্যাবড়াইয়া গিয়াছে যে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, বাবাজী যে প্রাণগতিকে ভাল আছেন, ইহাই আপাততঃ পরম লাভ মনে করিয়া, দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে ডাকিলাম। তিনি আসিলে হাসি-মুখে বলিলাম, "বাবা সত্যনারায়ণ, বাবা নীলকুল বাসুদেব মুখ তুলে চেয়েছেন। এই নাও তোমার জামাইয়ের চিঠি, খুকীকে দাও গে। আর তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে আমায় বল, জামাই কোথা আছেন, কেমন আছেন, কবে বাড়ী আসবেন। আমি ঘরে গিয়ে বসছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহিণী চিঠি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন,—তাঁহার মুখখানি গম্ভীর, চোখ দুটি ছলছল করিতেছে, সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেকার সমস্ত আনন্দ উৎসাহ কোথায় উড়িয়া গেল। আমি ভীতভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

গৃহিণী চিঠি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড।"

বলিলাম, "কেন? জামাই লিখেছেন মেয়েকে চিঠি, আমি পড়বো কেন?"

"পড়, দোষ নেই। আমিও পড়েছি। মেয়ে ত চিঠি পড়েই আছাড় খেয়ে পড়েছে। আমায় বললে, 'মা, চিঠি বাবাকে দেখাও, যা করতে হয়, তিনি করুন'।"

কম্পিত হস্তে খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া পড়িলাম। পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, চোখে অন্ধকার দেখিলাম। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল—

"সাধ্বি!

আমি মাসখানেক নানা গুরুতর কার্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, তোমায় চিঠি লিখিবার তিলমাত্র অবসর পাই নাই।

আমরা কয়েক জন যুবক মিলিয়া সন্তানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। তুমি আনন্দমঠ পড়িয়াছ কি না, জানি না যদি পড়িয়া থাক, তবে সন্তান কাহাকে বলে, তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছ। জননী জন্মভূমিকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাই সন্তানের জীবন-ব্রত। কলিকাতা হইতে "যুগান্তর" নামে আমরা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির

করিতেছি, আমার অনুরোধ, বাবাকে বলিয়া তুমি তাহার গ্রাহক হইয়া নিয়মিতভাবে উহা পাঠ করিবে।

আমি দল গঠন করিয়া আপাততঃ গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছি। কবে কোথায় থাকি, কিছুরই স্থিরতা নাই। যে স্থান হইতে এই পত্র তোমায় লিখিতেছি, কল্যই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব।

মা'র শৃঙ্খল যত দিন না ভগ্ন করিতে পারি, তত দিন আমাদের গৃহ-সংসার নাই, পিতামাতা নাই, স্ত্রী পুত্র নাই,—কিছুই নাই। আছে কেবল দেশ। (আনন্দমঠ দেখ) এ জীবনে এ পবিত্র ব্রত যদি উদ্‌যাপন করিতে পারি, তবেই গৃহে ফিরিব, তোমার সঙ্গে আবার আমায় মিলন হইবে, আবার আমি সংসারী হইব; নচেৎ এই শেষ। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, আমার বিশ্বাস আছে যে. ধর্ম্মপথে তুমি আমার সহায় হইবে, বিঘ্ন-রূপিণী হইবে না। বিভুপদে সতত প্রার্থনা করিবে, যেন আমাদের উদ্যম সফল হয়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, ব্রত উদ্‌যাপনান্তে এক দিন গৃহে ফিরিতে পারি। ইতি—

দেশমাতার সন্তান
শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।"

পুনশ্চ। পত্রখানি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে, কারণ. অদূর-ভবিষ্যতে বাড়ী খানা-তল্লাসী হওয়া বিচিত্র নহে।

পত্র পড়িয়া গৃহিণীর হস্তে উহা ফেরত দিয়া, দুই হাতে দুই রগ্ টিপিয়া, বালিস বুকে দিয়া, কিছুক্ষণ আমি শয্যায় পড়িয়া রহিলাম। অগ্রহায়ণ মাসের শীতেও দেহ হইতে দর-দর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। "ও মা, কি বিপদ হ'ল গো! বিপত্তে মধু-সূদন! বিপত্তে মধুসূদন!"—বলিতে বলিতে গৃহিণী আমায় পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

মিনিট পাঁচেকে আমি একটু সামলাইয়া উঠিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম, "তুমি মেয়ের কাছে যাও, এখানে কি করছ? তাকে সামলাও গে।"

গৃহিণী চলিয়া গেলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, এত দিন মনে মনে আশা ছিল, বেহাই-মহাশয় সাহেবদের প্রিয়পাত্র অনুগত লোক,—ছেলেটা বি-এ পাস করিলে সাহেবদের ধরিয়া তাহাকে তিনি একটা ডেপুটী করিয়া দিতে পারিবেন। অন্ততঃ পক্ষে আইন পাসের পর মুন্সেফী পদ দেওয়াইতে পারিবেন, মেয়ে আমার হাকিমের পরিবার হইবে। সে সব আশা-ভরসা সমস্তই ফর্সা হইয়া গেল!

ক্রমে মনে ক্রোধের সঞ্চারও হইল। তোর কি বাপু সমস্তই অদ্ভুত? স্বদেশী হয়ে একেবারে গৃহত্যাগ! কেন রে বাপু. এত বাড়াবাড়ি কেন? যা রয় বসে, তাই করলেই ত হয়! স্বদেশী হয়েছিস, বেশ ত! মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পর্, দেশী চিনি, করকচ নুণ ব্যাভার কর, বিড়ি খা—কেউ ত মানা করছে না। একেবারে গৃহত্যাগ, পত্নী-ত্যাগ! তাই যদি তোর মনে ছিল, তবে এক ভদ্রকন্যাকে বিবাহ ক'রে তার সর্ব্বনাশ করলি কেন?

তখন মনে পড়িল যে, বিবাহের সময় এরূপ মনোভাব তাহার ত ছিল না! স্বদেশীর ঢেউ ত পূর্ব্বাবধিই উঠিয়াছিল। বিবাহে, পূজার তত্ত্বে, বিলাতী জুতা, সিল্কের বিলাতী ছাতা, বিলাতী সাবান, এসেন্স প্রভৃতি প্রসাধন-দ্রব্য কত তাহাকে উপহার দিয়াছি, সে সব ত হাসিমুখেই সে গ্রহণ করিয়াছে ও ব্যবহার করিয়াছে দেখিয়াছি। তবে এবার কলি-কাতায় ফিরিয়া সে এমন উৎকট স্বদেশী হইয়া উঠিল কি করিয়া?

এ অবস্থায় আমি আর কলিকাতায় গিয়া কি করিব? তার চেয়ে বরং রাজসাহী গিয়া বৈবাহিকের সঙ্গে দেখা করিয়া, এ বিপদে কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করি। গৃহিণী ফিরিয়া আসিলে সেই কথাই তাঁহাকে বলিলাম,

তিনিও এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

গোরুর গাড়ী পূর্ব্বেই বলা ছিল। স্নানাহার সারিয়া, দুর্গা বলিয়া রাজসাহী যাত্রা করিলাম।

তিন

যে দিনের কথা বলিতেছি, তখন ঈশ্বরদি হইতে রাজসাহী যাইবার রেল খুলে নাই। নাটোরে নামিয়া অশ্বযানে বত্রিশ মাইল অতিবাহন করিয়া রাজসাহী যাইতে হইত। রাজসাহীর উকিলবাবুরা একটা কোম্পানী গঠন করিয়া, যাতায়াতের জন্য কতকগুলি অশ্বযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলের আড্ডা ছিল।

নাটোরে নামিয়া, অশ্বযানে আরোহণ করিয়া যখন রাজসাহী গিয়া পৌঁছিলাম, বেলা তখন চারিটা, বৈবাহিক-মহাশয় তখনও কাছারী হইতে ফিরেন নাই। তাঁহার পুত্রেরা অতি সমাদরে আমার অভ্যর্থনা করিল। হাত-মুখ ধুইয়া, ডাব ও সরবৎ পান করিয়া, বৈঠকখানা-ঘরে আরাম-কেদারায় পড়িয়া আমি বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

সাড়ে পাঁচটায় বৈবাহিক-মহাশয় বাড়ী ফিরিলেন। আমি আসিয়াছি শুনিয়া কাছারীর বেশেই আমার নিকট আসিয়া বসিলেন। অদ্য প্রভাতে প্রাপ্ত পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইলাম। পড়িয়া বলিলেন, তিনিও গতকল্য পুত্রের নিকট হইতে ঐ ধরণের একখানি চিঠি পাইয়াছেন। বলিলেন. "আচ্ছা ভাই. বোসো তুমি, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে এই ধড়া-চূড়াগুলো ছেড়ে মুখে হাতে একটু জল দিয়ে আসি। অনেক কথা আছে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি আমায় অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তেতলার একটি নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তিনি ধূমপান করিতেছিলেন আমি সেইখানে গিয়া বসিলাম। তিনি আমার হাতে গুড়গুড়ির নলটি দিয়া বলিলেন, "আমার কি হয়েছে ভাই জানো? চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কাউকে আমার বলবারও উপায় নেই যে, ছেলে আমার সন্তান হয়েছে—গ্রামে গ্রামে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করতে বেরিয়েছে। কথাটা প্রকাশ হলেই ক্রমে সাহেবদের কাণে গিয়ে উঠবে, তখন আমার চাকরী বজায় রাখাই হবে দায়।"

বলিলাম, "এখন কি উপায় হবে বেয়াই-মশাই? কোথায় সে আছে, জানতে পারলে না হয় সেখানে গিয়ে কেঁদে কেটে পড়া যায়, তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা যায়।"

বেয়াই বলিলেন, "চিঠিখানা ত লিখেছে পাবনা জেলার চন্দ্রপুর পোষ্ট আপিস থেকে। অন্ততঃ. ছাপ থেকে যা বোঝা গেল।"

"ছাপ ত আমিও পরীক্ষা করেছিলাম, কালীর ধ্যাবড়া, কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"আমার চিঠিতে ছাপটা অত অস্পষ্ট নয়।—দাঁড়াও, চিঠিখানা বের করি।"—বলিয়া বেয়াই লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। পত্র পড়িয়া দেখিলাম, আমার কন্যার পত্রে যে সব কথা ছিল, সেই সব কথাই আছে, কেবল ভাষার একটু এদিক ওদিক। ছাপ দেখিলাম. কয়েকটা মাত্র অক্ষর পড়া গেল—চন্দ্রপুর হইতে পারে।

এই সময় ভৃত্য দুই পেয়ালা চা আনিল। বেয়াই এক পেয়ালা আমার হাতে দিয়া বলিলেন. "এখন কিছু খাবে, ভাই? দুট এক টুকরো ফল-টল, দুই একটা মিষ্টি-টিষ্টি?"

আমি বলিলাম, "না ব্যাই-মশাই,—এই ত ঘণ্টাখানেক আগে জল খেয়েছি। এখন আর কিছু নয়। ছেলের সম্বন্ধে কি উপায় ঠাওরালেন?"

বলিলেন, "মাথা-মুণ্ড কি আর ঠাওরাব বল? চন্দ্রপুর কোথা, তাও ত জানিনে।

কাল ঐ চিঠি পেয়ে, মামাকে পাবনা পাঠিয়ে দিয়েছি। পাবনায় গিয়ে প্রথমে সে খবর নেবে, চন্দ্রপুর কোথা। তারপর চন্দ্রপুরে গিয়ে সন্ধান নেবে, সেখান থেকে সেই দল কোথায় গেছে। এই রকম ক'রে যদি তাদের ধরতে পারে।"

"এই মামাটি কে? সেই, যাঁকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন? আপনার কি রকম মামা ইনি?"

"দূর-সম্পর্ক। সম্বন্ধে মামা হলেও, আমার চেয়ে অন্ততঃ বছর দশেকের ছোট। দেশে থাকতো, অবস্থা খারাপ, এখানে আমার কাছে আসে চাকরীর চেষ্টায়। চাকরী বাকরী কিছু জুটিয়ে দিতে পারিনি, তবে জজ-আদালতের নকল-সেরেস্তায় ব'লে দিয়েছি, ঠিকেঠোকা কাজ ক'রে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। বাকী সময় টাউটগিরি করে উকীল-দের কাছে মক্কেল ধ'রে নিয়ে যায়, ফীয়ের টাকা থেকে কিছু কিছু কমিশন পায়। লোকটা খুব চালাক চতুর আছে।"

"তার কথা কি ছেলে মানবে?"

"ছেলের গর্ভধারিণী অনেক কাঁদাকাটা ক'রে এক চিঠি লিখে দিয়েছেন, সেই চিঠি মামা নিয়ে গেছে। কিন্তু ধরতে পারলে তবে ত!"

সকল দিক চিন্তা করিয়া, মামা না ফেরা পর্য্যন্ত এইখানেই অপেক্ষা করিব স্থির করিলাম। পরদিন সকল কথা বর্ণনা করিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিয়া দিলাম।

চারিদিন পরে মামা ফিরিয়া আসিলেন। ছেলের দেখা পান নাই, তবে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, ঐ পত্র লেখার তারিখ হইতে তিন দিন পরে, সেই স্বদেশীর দল রেলে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে গিয়া টিকিট আপিসেও অনুসন্ধান করিয়া-ছিলেন, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করতে পারেন নাই।

বৈবাহিক বলিলেন, "যাক্ আর ভেবে কি হবে? অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। এখন বাবাজী যদি কেবলমাত্র স্বদেশী প্রচার করেই ক্ষান্ত হন, তা হলেও রক্ষে। কিন্তু ঐ যে লিখেছে অদূর-ভবিষ্যতে বাড়ী সার্চ্চ হওয়া বিচিত্র নয়, এ থেকে ভয় হয়, হয় ত স্বদেশী ডাকাতি-টাকাতি করারও মৎলব আছে। তা হ'লেই ধরাও পড়বেন, আর বছর চার পাঁচ শ্রীঘরে বাস। কয়েক স্থানেই ত স্বদেশী ডাকাতি হয়ে গেছে—ওঁরা ঐ রকম করেই ত দেশ উদ্ধার করার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেন কিনা! আজকাল এ সব বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের খুব কড়া নজর। মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায় সার্কুলার গেছে।"

ক্ষুণ্ণ-মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

বাবাজী গ্রেপ্তার হইলে সে কথা খবরের কাগজে বাহির হইবে। বাড়ী আসিয়াই তাই কলিকাতার দৈনিক বসুমতী সংবাদপত্রের গ্রাহক হইলাম। কাগজের ঠিকানা প্রভৃতি রাজসাহী হইতেই টুকিয়া আনিয়াছিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই স্বদেশীওয়ালাদের কর্তৃক খুন বা ডাকাতীর সংবাদ বাহির হয়। খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদণ্ডের কথার ত বিরাম নাই। খবরের কাগজের মোড়ক খুলিবার সময় আমার হাত কাঁপে—খুলিয়াই হয় ত দেখিব, খুন বা ডাকাতি অপরাধে আমার জামাই গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র কাটিল, বৈশাখ আসিয়া পড়িল। একদিন এক ভীষণ সংবাদ পাঠ করিলাম। মজঃফরপুরের উকীল কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও কন্যা, স্থানীয় জজ কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে রাত্রে ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, কে বা কাহারা সে গাড়ীতে বোমা মারিয়া কিংসফোর্ড সাহেব ভ্রমে মেমদ্বয়কে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে—জোর পুলিস-তদন্ত চলিয়াছে। পড়িয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। হা রে ভ্রান্ত নির্ব্বোধ পাষণ্ডগণ! এইরূপ মহাপাপ করিয়া তোরা দেশ উদ্ধার করিবি? সেই সত্য-

যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, পাপের ফল কি কখনও শুভ হইয়াছে, না হইতে পারে ?—পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল, আমার জামাই যদি এই দলে থাকে, তবেই ত সর্ব্বনাশ! ধরা পড়িলে ফাঁসী ত অনিবার্য্য! কাগজখানা আর বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলাম না, বৈঠকখানাতেই লুকাইয়া রাখিলাম, কি জানি, যদি স্ত্রী-কন্যার চোখে পড়ে।

ক্রমে জানিতে পারিলাম, দুই জন হত্যাকারী ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন নিজেকে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, ক্ষুদিরাম বসু নামক এক যুবকের বিচারে ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

ইহার কিছুদিন পরেই কাগজে দেখিলাম, কলিকাতার মুরারিপুকুর বাগানে পুলিস এক বোমার কারখানা আবিষ্কার করিয়াছে, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন যুবক এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে, ঐ ব্যাপারে দেশব্যাপী খানাতল্লাসী চলিতেছে, আরও কত লোক ধরা পড়িবে।—ঈশ্বর জানেন, আমার জামাইও সেই দলে ছিলেন কি না। দুশ্চিন্তায় আমার আহার-নিদ্রা একরূপ বন্ধ হইল। খবরের কাগজ খুলিয়া প্রথমেই ধৃত-ব্যক্তিদের নামের তালিকা পাঠ করি। সে দলে আমার জামাই ছিল, পুলিস যদি ইহা জানিতে পারিয়া থাকে, তবে বৈবাহিকের বাড়ী ত তল্লাস হইবে নিশ্চয়, আমার বাড়ীও হইতে পারে।

দুর্গানাম জপ করিয়া দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ধৃত ব্যক্তিদের তালিকায় আমার জামাতার নাম দেখিলাম না, আমার বাড়ীও তল্লাস হইল না। তখন কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলাম।

চার

দ্বিতীয় পক্ষে আমার বিবাহ মৈমনসিংহ জিলায় হইয়াছিল। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। আমার শ্বশুর কালীচরণ সরকার মহাশয় সেই গ্রামের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশবাবু গৃহে বসিয়া বিষয়সম্পত্তি দেখেন, মধ্যম আশুতোষবাবু মৈমনসিংহ বারের একজন প্রধান উকীল, কনিষ্ঠ হরেন্দ্রবাবু জামালপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর।

আষাঢ় মাসে আমার মধ্যম শ্যালক আশুবাবুর নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম—৫ই শ্রাবণ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহ। বিবাহ-কার্য্য পৈতৃক ভিটায় আসিয়া সম্পন্ন করিবেন। সপরিবারে যাইবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

সাত আট বৎসর হইল গৃহিণী পিত্রালয়ে যান নাই সে কারণেও বটে, সকলেরই মন খারাপ, গোলেমালে আনন্দ-উৎসবে কয়েকদিন মনের ভার কিছু লঘু হইবে সে আশাতেও বটে, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়াই স্থির করিলাম।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সদানন্দ, বাল্যকালে একবার মাতুলালয়ে গিয়াছিল, মধ্যম হাবু ও কনিষ্ঠ বাদল মামার বাড়ী কখনও দেখে নাই—মামার বাড়ী যাইবার আনন্দে তিনজনেই নৃত্য করিতে লাগিল। যথাদিনে আমরা যাত্রা করিলাম।

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া দেখিলাম, আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্বে গৃহখানি ভরিয়া গিয়াছে। পরদিন বিবাহ হইয়া গেল, তৎপরদিন জামাই-মেয়ে বিদায় করিয়া গৃহ বিষাদের ছায়ায় ডুবিল।

আহারান্তে কনিষ্ঠ শ্যালক হরেন্দ্রবাবুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, তাঁহার এলাকায় স্বদেশী হাঙ্গামা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বলিলেন, "আমাদের হয়েছে দাদা, শাঁখের করাত। স্বদেশীওয়ালারা মনে করে, পুলিস তাদের পরম

শত্রু। আবার গভর্ণমেণ্ট মনে করেন, আমরা তলে তলে স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে সহানুভূতি করি।"

এই প্রসঙ্গ যখন উঠিল, হরেনকে আমার জামাইয়ের সকল কথাই বলিলাম। আমরা কিরূপ উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতেছি, তাহাও জানাইলাম।

হরেন বলিল, "আপনার জামাইয়ের নামটি কি? সে রাজসাহীর গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের ছেলে, না?"

উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম। হরেন বলিল, "আমার এলাকায় ও নামের কোনও স্বদেশীওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না, থানায় গিয়ে লিষ্টিখানা দেখতে হবে। চারিদিকে পুলিসের গোয়েন্দা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফি হপ্তায় প্রত্যেক থানা থেকে রিপোর্ট আসছে। গভর্ণমেণ্টের একেবারে কড়া হুকুম।"

হরেন মাত্র তিন দিনের ছুটী পাইয়াছিল। আগামী কল্যই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বলিল, "দাদা, এক কাজ করুন না। বেরিয়েছেন যখন, একটু ভাল ক'রে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে নিন না। চলুন না জামালপুরে। আমার ওখানে হপ্তাখানেক থেকে, তার পর বাড়ী যাবেন।"

আমি সম্মত হইলাম। বিশেষ, জামালপুর মহকুমার লিষ্টিতে আমার জামাইয়ের নাম উঠিয়াছে কি না, তাহাও দেখিতে পাইব।

হরেন বলিল, "আমি ত ফিরবো ঘোড়ায়। আপনি দিদিকে নিয়ে, আপনার ছোট শালাজকে নিয়ে নৌকোয় আসুন। ঘুরে ঘুরে যেতে হবে, পৌঁছতে দেরী হবে বটে, কিন্তু জলপথে বেশ আনন্দ পাবেন।"

এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

পরদিন হরেন প্রস্থান করিল। আশুবাবু মৈমনসিং ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদির সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। মেয়ে অষ্টমঙ্গলার পর যোড়ে ফিরিয়া আসিলে, জামাই-মেয়ে লইয়া তিনি মৈমনসিংহ যাইবেন। তাঁহার অনুরোধে, আমরা আর দুই দিন গোবিন্দপুরের বাটীতে অবস্থান করিলাম।

গোবিন্দপুর গ্রাম নন্দিনী নাম্নী একটি ছোট নদীর তীরে অবস্থিত। ঘাটে ভাউলে সর্ব্বদাই পাওয়া যায়; বজরাও দুই চারিখানা আছে; কিন্তু যাত্রার দিন বজরা একখানিও পাওয়া গেল না। বজরাগুলি বেশ বড় বড় হয়। তাহার ভিতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কামরাসকল থাকে, অনেক লোক ধরে, বেশ আরামে যাওয়া যায়। অগত্যা দুইখানি ভাউলে ভাড়া করা গেল, কারণ, একখানিতে দুইটি পরিবারের সঙ্কুলান হইবে না। সকলে মিলিয়া একত্র বজরায় যাওয়ারই ইচ্ছা ছিল, সে সুযোগ না হওয়াতে উভয় গিন্নী গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিলেন।

একদিন এক রাত্রি নন্দিনী বাহিয়া গিয়া, অবশেষে আমরা বংশজ নদীতে পড়িলাম। এই বংশজ নদী, মধুপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এই নদী জামালপুর অবধি গিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

বংশজ নদী দিয়া কয়েক ঘণ্টা গিয়া যে বন্দরে আমরা সন্ধ্যার মুখে পৌঁছিলাম, সেখানে গিয়া দেখিলাম, একটি বজরা খালি হইতেছে। এক মাড়োয়ারী মহাজন নদীপথে নানাস্থানে গিয়া চাষীদের পাটের দাদন দিয়া বেড়াইতেছিল, জামালপুর অবধি তাহার যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কি কারণে জানি না, সেইখানে নামিয়া সে বজরা ছাড়িয়া দিল। জামালপুর তখনও এক রাত্রি ও অর্দ্ধ দিনের পথ। গৃহিণীদের আগ্রহে, সেইখানেই আমরা ভাউলে দুইখানির ভাড়া মিটাইয়া দিয়া সেই বজরা লইলাম। আকাশে মেঘ ছিল না, ত্রয়োদশীর চন্দ্র উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিতেছিল, মাঝি সানন্দে বজরা ছাড়িয়া দিল।

পাঁচ

রাত্রি ১০টায় আহারাদি শেষ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করা গেল। অনেক রাত্রিতে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, গরমে আর ঘুম আসিতে চাহে না। আমি বিছানা ছাড়িয়া বজরার ছাদে উঠিয়া বসিলাম।

উভয় তীরে ঘন জঙ্গল। চন্দ্রালোকে সেই জঙ্গলের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে কাটিলে, সহসা জঙ্গল হইতে দুইবার বন্দুক ডাকিল —দুরুম্ দুরুম্।

জঙ্গলের কোলে অন্ধকারে দুইখানা ছিপ বাঁধা ছিল, সেই ছিপ দুখানা সন্‌সন্‌ করিয়া আমাদের বজরার দিকে আসিতে লাগিল। "ডাকাত পড়িছে কর্ত্তা"—বলিয়া মাল্লাগণ দাঁড় ফেলিয়া ঝুপঝাপ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল।

বিপদ গণিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। এক মিনিট পরেই ডাকাইতরা আসিয়া বজরায় উঠিল, শব্দে বুঝিতে পারিলাম। তাহারা দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "মাড়োয়ারীবাবু, এ মাড়োয়ারীবাবু, জলদি দরজা খোলো।"

মুহূর্ত্তে আমি বুঝিতে পারিলাম, পূর্ব্বের সেই ধনী মাড়োয়ারীবাবুই যে এ বজরায় এখনও আছে, এই ভ্রম করিয়া ইহারা বজরা আক্রমণ করিয়াছে।

তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "জল্‌দি খোলো। কুছ ডর নেহি। রুপিয়া লেলেঙ্গে, জান ছোড় দেঙ্গে।"

সাহস সংগ্রহ করিয়া কম্পিত স্বরে আমি উত্তর করিলাম, "বাপ্‌সকল, এ বজরায় মাড়োয়ারী ত কেউ নেই। আমরা সকলেই বাঙ্গালী, গরীব গেরস্ত মানুষ।"

তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "বলে কি রে? ভুল হ'ল নাকি?"

এক ব্যক্তি বলিল, "না না, ভুল হয়নি, এই বজরাই বটে। কাল দুপুরবেলা থেকে আমি পিছু নিয়েছি। এ বেটা বোধ হয় সরকার-টরকার, মনিবকে বাঁচাবার জন্যে চালাকি করছে। দরজা ভেঙ্গে ফেল।"

দরজার উপর কুড়ালির ঘা পড়িতে লাগিল, শব্দে ইহা বুঝিলাম। বলিলাম, "না না বাপু, তোমাদের ভুলই হয়েছে। কুড়ুল থামাও, দরজা খুলে দিচ্ছি, তোমরা ভিতরে এসে স্বচক্ষে দেখ।"

কুড়ুলের ঘা থামিল। দরজা খুলিয়া দিলাম। দুই তিনটা জ্বলন্ত টর্চ্চলাইট হাতে করিয়া দশ বারোজন ডাকাত হুড়মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তাহারা সকলেই তরুণ বয়স্ক—এই আঠারো উনিশ, বড়জোর বিশ বাইশ—ইহার বেশী নহে। তা ছাড়া চেহারা ও কেশবেশ কাহারও ডাকাইতের মত নয়, সকলেই ঠিক যেন ভদ্রসন্তান। ধুতি সকলেরই মালকোঁচা-মারা, কাহারও গায়ে কোট, কাহারও শার্ট, দুই তিনজনের চোখে সোণার চশমা, দুইজনের হাতে দুইটা পিস্তল। মনে মনে বুঝিলাম, ইহারা নিঃসন্দেহ স্বদেশী ডাকাইতের দল।

টর্চ্চলাইটের সাহায্যে সর্ব্বত্র তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। একধারে গিন্নীরা তাঁহাদের বালকবালিকাগণকে বুকে আগলাইয়া গাদাগাদী করিয়া বসিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, একজন ডাকাইত তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "মা লক্ষ্মী সকল, আপনারা ভয় পাবেন না। স্ত্রীলোকমাত্রেই আমাদের মা, তাঁদের গায়ে আমরা হাত দিইনে, আপনারা নির্ভয়ে থাকুন।"

এক ছোকরা আমাকে ধমক দিয়া বলিল, "তোমরা কারা? এ বজরায় যে মাড়োয়ারী মহাজন ছিল, সে কোথা গেল?"

আমি বলিলাম, "আমরা মাত্র আজ সন্ধ্যেবেলা, মোল্লাগঞ্জের ঘাটে এ বজরা ভাড়া নিয়েছি, বাবা। যে মাড়োয়ারী মহাজন এতে আসছিল, সেইখানেই সে নেমে গেল কিনা। আমরা গরীব গৃহস্থ লোক, সঙ্গে টাকাকড়ি বেশী কিছুই নেই, পথ-খরচের মত সামান্য দশ বিশ টাকা আছে। এই চাবি নাও, বাক্স-তোরঙ্গ সব খুলে তোমরা দেখ বাবা।"

একজন হাত বাড়াইয়া চাবির গোছা লইল। অপর এক ব্যক্তি বলিল, "ও ড্যাম্ ইট্! দশ বিশ বি হ্যাংড্। ফেলে দে চাবি। চল্ এখন স'রে পড়া যাক্!"

ঠিক এই সময় বাহিরে দুইবার সিটির আওয়াজ হইল,—সেই বাঁশীগুলা, ফুটবল খেলিবার সময় যাহা বাজায়,—ভিতরে মটর না কাঁকর কি থাকে, ফর্ ফর্ করিয়া বাজে।

এই আওয়াজ শুনিবামাত্র সকলের মুখে ভীতি-চিহ্ন দেখা দিল। বাহির হইতে একজন কে বলিল, "পুলিসবোট। যারা যারা সাঁতার জান, জলে লাফিয়ে পড়।"

এ কণ্ঠস্বরে আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঠিক যেন আমার জামাতার কণ্ঠস্বর!

পর-মুহূর্ত্তে ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া কয়েকজনের জলে লাফাইয়া পড়িবার শব্দ হইল। আমি বাহিরে গিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম, দুইটা পান্সীভর্ত্তি লাল পাগড়ী—এক-খানাতে স্বয়ং ইন্‌স্পেক্টর হরেন্দ্রবাবু। বজরাব গায়ে পান্‌সী লাগিবামাত্র সকলে টপাটপ্ বজরায় উঠিয়া পড়িল। এক ব্যক্তি জলে লাফাইতে যাইতেছিল, হরেন্দ্রবাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। যাহারা ইতিপূর্ব্বে জলে পড়িয়াছিল, তাহাদের ধরিতে পুলিস কোনও চেষ্টা করিল না। একজন সিপাহী বড় একটা টর্চ্চলাইট্ জ্বালিল, অপর সিপাহীরা এক এক জনে এক এক ডাকাইতকে সজোরে জাপ্‌টাইয়া ধরিল। তাহাদেরই আলোকে আমি সভয়ে দেখিলাম হরেনবাবু যাহাকে ধরিয়াছেন, সে আর কেহ নহে, আমারই জামাতা শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র বাবাজী!

হরেনবাবু আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? আপনি!"

আমি ইঙ্গিতে তাঁকে কথা বলিতে নিষেধ করিলাম। ভিতরে কোনও রহস্য আছে বুঝিয়া তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ধৃত আসামীদের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

তাঁহার আদেশে কনেষ্টবলরা প্রত্যেক আসামীকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিল। এক-একজনকে বাঁধিয়া, ধরাধরি করিয়া পুলিসবোটে নামাইতে লাগিল।

আমি ইসারা করিয়া হরেনবাবুকে ভিতরে ডাকিলাম। ভিতরে গিয়াই তিনি বলি-লেন, "আপনি দাদা এ বজরায় এলেন কি ক'রে?"

বলিলাম, "সে অনেক কথা, পরে সবই বলবো। এখন উপস্থিত বিপদ থেকে বাঁচাও।"

"কেন? আর বিপদ কি?"

"ঐ যে ছোকরা জলে লাফিয়ে পড়ছিল, তুমি তাকে ধ'রে টেনে তুললে, সেই আমার জামাই।"

হরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "অ্যাঁ! তাই নাকি? তা হ'লে ত বিপদই বটে।"

আমি তার হাত দু'টি ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলাম, "তোমার ভাগ্‌নী-জামাইকে, যেমন ক'রে পার, বাঁচাও ভাই।"

হরেন বলিল, "আচ্ছা দাঁড়ান, কি করতে পারি দেখি।" বলিয়া সে বাহির হইল। আমিও তাহার পিছু পিছু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তাহার আদেশ অনুসারে বাকী আসামীদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধা হইতে লাগিল। আমার জামাইকেও বাঁধিল। বাবাজী কাতর ভিক্ষা-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতে লাগিল।

একে একে সব আসামীকে পুলিসবোটে নামানো হইল, শুধু বাকী রহিল পূর্ণ।

হরেনের ইসারায় আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

পূর্ণকে লইতে দুই তিনজন কনেষ্টবল বজরায় আসিল। কোনও আসামী না দেখিয়া, শুধু হরেনকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহারা বোধ হয় স্থির করিল, অন্য কনেষ্টবলরা তাহাকে পুলিসবোটে স্থানান্তরিত করিয়া থাকিবে।

হরেন কহিল, "সব আসামী ঠিক হ্যায়?"

উত্তর হইল, "হাঁ হুজুর, সবকোইকো শিকলি চড়ায়া।"

"গিনো, কয়ঠো হুয়া?"

তাহারা গণনা করিয়া বলিল, "আঠ আসামী হুজুর।"

"আচ্ছা, ঠিক হ্যায়।"—বলিযা হরেন তাহাদিগকে আর আর কি সব আদেশ দিতে লাগিল।

ডাকাইতগণের ছিপ দুইখানিকে পশ্চাতে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, পুলিসের পান্সী দুই-খানি খুলিয়া দিল।

আমাদের বজরার মাঝি-মাল্লারা বোধ হয় দূরে দূরে অন্ধকারে জলে ভাসিতে ভাসিতে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ভিজা বিড়ালের মত একে একে তাহারা আসিয়া বজরায় উঠিতে লাগিল।

হরেন ভিতরে আসিয়া স্বহস্তে পূর্ণর হাতের বাঁধন খুলিতে খুলিতে বলিল, "কেমন হে ছোকরা, স্বদেশী করবার সখ মিটেছে ত এখন?"

আমি বলিলাম, "আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?"

হরেন আমার পানে চাহিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, "এখনি খাঁড়ার ঘা হয়েছে কি? আপনার জামাই ব'লে যে ছেড়ে কথা কইব, তা ভাববেন না। আমরা পুলিসের লোক, বাগে পেলে নিজের বাপকেও রেয়াৎ করিনে। থানায় নিয়ে গিয়ে প্রথম ত উত্তম-মধ্যম প্রহার। তার পর হাতে হাতকড়ি দিয়ে চালান দেবো—সাতটি বছর শ্রীঘর।"

মিনতির স্বরে বলিলাম, "ছেলেমানুষ, না বুঝে একটা কাজ ক'রে ফেলেছে, এবার ওকে মাপ করুন—ছেড়ে দিন। আর কখ্‌খনো এমন কাজ ও করবে না।"

"ছেড়ে দেবো?—ছেড়ে দিলেই ত আবার গিয়ে ঐ সব দলে মিশবে। এবার ডাকাতি করেছে—এর পরে বোমা ফেলবে—মানুষ খুন করবে।"

বলিলাম, "না না, তা আর ও করবে না।"

হরেন বলিল, "কি হে ছোকরা,—ছেড়ে দিলে আবার এই সব করবে ত?"

পূর্ণ মাথা নাড়িয়া জানাইল, আর করিবে না।

হরেন বলিল, "শুনলাম, ইনি তোমার শ্বশুর। আচ্ছা, এ'র পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করতে পার?"

পূর্ণ ঝুঁকিয়া আমার পদস্পর্শ করিয়া হরেনবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল।

হরেন বলিল, "বল, স্বদেশী দলে আর আমি কখনো মিশবো না।"

পূর্ণ শপথ করিল।

"বল, আবার কলেজে ভর্ত্তি হয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো করবো।"

সে শপথও পূর্ণ করিল।

আমি তখন পূর্ণর পানে চাহিয়া বলিলাম, "বাবাজী, উনি তোমার মামাশ্বশুর হন, —তোমার শাশুড়ী-ঠাকরুণের সহোদর ভাই। ওঁকে প্রণাম ক'রে ওঁর পা ছুঁয়েও ঐ রকম দিব্যি কর।"

পূর্ণ তাহাই করিল।

পূর্ণর পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে হরেন বলিল, "সঙ্গে ত দুটো পিস্তল ছিল, কি ভাগ্যি খুন করনি কাউকে।"

পূর্ণ সলজ্জভাবে বলিল, "আজ্ঞে, গুলীর সাপ্লাই ফুরিয়ে গিয়েছিল। বারুদ ত আমরা নিজেরাই তৈরি করি।"

হরেন আমার দিকে চাহিয়া বলিল. "দাদা, দেখুন, মাঝিমাল্লারা সব জুটেছে কি না। বজরা ছেড়ে দিতে বলুন।"

বজরা খুলিলে, আমি বলিলাম, "বাবাজীর এখন কি ব্যবস্থা করা যায় ভায়া ?"

"তাই ত ভাবছি। কনেষ্টবলরা সবাই ওকে দেখেছে। জামালপুরে বজরা থেকে নেমে বাসায় যাবার সময় তারা যদি ওকে চিনে ফেলে, তা হ'লেই মুস্কিল। একখানা উড়ো চিঠির ওয়াস্তা। এক কাজ করা যাক না। বাবাজীকে মেয়ে সাজানো যাক। পুলিস-বোট দু'খানা আমাদের ঢের আগেই জামালপুরে পৌঁছে যাবে। ঘাটে দু'খানা ঘোড়ার গাড়ী রাখতে হুকুম দিয়েছি। একখানাতে মেয়েরা—দিদি, লীলা-টীলা যাবে এখন। সেই গাড়ীতে, বউ সেজে ঘোম্‌টা দিয়ে জামাইও উঠবে। অপর গাড়ীখানায় আপনি, আমি. ছেলেরা।"

সেই পরামর্শ-ই স্থির হইল।

তার পর হরেনের কাছে ব্যাপার সব শুনা গেল। গোবিন্দপুর হইতে থানায় ফিরিয়াই সে গোয়েন্দার মুখে সংবাদ পায়, একজন ধনী মাড়োয়ারী অনেক টাকা লইয়া বজরা ভাড়া করিয়া নানাস্থানে চাষীদের পাটের দাদন দিয়া বেড়াইতেছে। স্বদেশীর একটা দল তাহার পিছু লইয়াছে—খুব সম্ভব, ডাকাতি করাই অভিপ্রায়। হরেন তাই প্রস্তুত হইয়া ছিল। তাহার এলাকায় বজরা প্রবেশ করার পর হইতেই বজরার পিছু পিছু তার পুলিস-বোট দু'খানি আসিতেছিল। মোল্লাগঞ্জ তার এলাকার বাহিরে। সেখানে আরোহী বদলের খবরটা সে পায় নাই এবং দেখা যাইতেছে, স্বদেশী ডাকাইতরাও পায় নাই।

পূর্ণ বলিল, "না, আমরাও পাইনি। আমাদের লোক মোল্লাগঞ্জের বাজারের ভিতর দিয়ে বাইসিক্লে চ'লে এসেছিল, ঘাটে ত সে যায়নি।"

হরেন বলিল, "সে মাড়োয়ারীটা বোধ হয় কি রকম ক'রে গন্ধ পেয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি মোল্লাগঞ্জে নেমে পড়েছে।"

ছয়

থানায় পৌঁছিয়া, হরেন আমার ও মাঝি-মাল্লাগণের এজেহার লিখিয়া লইয়া, পরদিন সাক্ষিস্বরূপ আদালতে হাজির হইবার জন্য আমাদের সমন ধরাইল।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মোকর্দ্দমা উঠিলে, দশ দিনের জন্য উহা মুলতুবী হইয়া গেল।

আমি এই অবসরে স্ত্রী-পুত্রকন্যা ও বধূবেশী জামাতাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলাম। জামালপুর মহকুমার এলাকা পার হইবার পর, সুযোগ বুঝিয়া, বাবাজীকে বস্ত্রপরিবর্ত্তন করাইয়াছিলাম—তাহাই হরেনের পরামর্শ ছিল।

জামাতাকে নিজ বাটীতেই রাখিয়া, আমি নিজে গেলাম রাজসাহীতে বেহাইকে সুসংবাদটা দিতে। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর লোক ছাড়া এ কথা কি আর কেউ জানতে পেরেছে?"

বলিলাম, "না, কারুর কাছে এ কথা যাতে প্রকাশ না হয়, সেই রকম ব্যবস্থা করেছি।"

"ভাল করেছ। প্রকাশ হলে, ছেলেও যাবে, হরেনবাবুরও জেল অনিবার্য্য।"

"সে কথা সে আমায় আগেই বলেছে।"

অল্পক্ষণ চিন্তার পর বেহাই বলিলেন, "গ্রীষ্মের ছুটীতে পূর্ণ বাড়ী এল না কেন,

কেউ কেউ এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলেছি, সে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে গেছে হাওয়া খেতে।"

"কলেজও বোধ হয় এত দিনে খুলে থাকবে।"

"আচ্ছা, তুমি গিয়ে পূর্ণকে এখানে পাঠিয়ে দাওগে। কিংবা দাঁড়াও, কাল শনিবার আছে, কাছারীর পর আমিও তোমার সঙ্গে যাই চল। ছেলেকে, বউমাকেও সঙ্গে নিয়ে আসি। তার পর হপ্তাখানেক বাদে ছেলেকে কলকাতায় রেখে আসবো। একটা বছর নষ্ট হয়ে গেল তা কি আর করা যাবে!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু মেয়েকে ঘর-বসতে পাঠাবার কোনও আয়োজনই ত আমি করিনি।"

রেহাই ছলা-ছল নেত্রে ভারি গলায় বলিলেন, "সে সব পরে হবে এখন। যা আয়োজন করেছ, তারই ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না, ভাই।"

বি-এ পাশ কয়েদী

এক

পশ্চিমের একটি সহর। জজের আদালত, ফৌজদারী আদালত, কালেক্টরী প্রভৃতি সহরের ভিতর হইলেও, জেলখানাটি সহরের বাহিরে এক মাইল দূরে অবস্থিত। জেলের কর্ত্তা অর্থাৎ জেলরবাবুর নাম ইন্দ্রভূষণ সান্যাল—বয়স চুয়াল্লিশ বৎসর। স্ত্রীর নাম মনোরমা, বয়স আটত্রিশ। ইঁহাদের দুইটি পুত্র—নগেন্দ্র ও খগেন্দ্র, বয়স পনর এবং পাঁচ বৎসর। কন্যা হয় নাই।

জেলখানার ফটকের উপর দ্বিতলে জেলরবাবুর সরকারী বাসা। পশ্চাতে টানা বারান্দা। সে বারান্দায় দাঁড়াইলে জেলখানার ভিতরটা অনেকখানি দেখা যায়। জেলরবাবুর স্ত্রী মনোরমা সকালে বিকালে সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া জেলপ্রাঙ্গণে কয়েদিগণের আহার, গতিবিধি ও অন্যান্য কার্য্যকলাপ দেখিয়া চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন।

মনোরমার বড় কষ্ট। কোনও প্রতিবেশিনী নাই যে, আসিয়া দুই দন্ড গল্প করিবে, দু'হাত তাস খেলিবে, অথবা চুলটা তাঁহার বাঁধিয়া দিবে। ডেপুটি জেলরবাবু, অ্যাসিস্টাণ্টবাবু, জেলের ডাক্তারবাবু—সকলেই বাঙগালী, ইঁহাদেরও সরকারী বাসা রহিয়াছে, কিন্তু স্ত্রী নাই, বা থাকিয়াও নাই। ডেপুটিবাবু বিপত্নীক, অ্যাসিস্টাণ্টবাবুর স্ত্রী তিন মাস হইল সন্তান-সম্ভাবিতা হইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, ডাক্তারবাবুর গৃহের যিনি গৃহিণী, তাঁহাকে ডাক্তারবাবু স্ত্রী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জনশ্রুতি এই যে, বিবাহটা তাঁহাদের গান্ধর্ব্ব মতে হইয়াছিল—কাজেই উক্ত মহিলার কোনও ভদ্রপরিবারের সহিত মেলামেশা নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিত্রালয় হইতে মনোরমা এক অনাথা কায়স্থ-কন্যাকে ঝি-স্বরূপ আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে প্রায় মনোরমার সমবয়সী ছিল, তার নাম ছিল —কাতু বা কাত্যায়নী। নামে ঝি হইলেও, পূর্ব্বকালে রাজকন্যাদের যেমন "সহচরী" থাকিত, কাতু ছিল মনোরমার সেইরূপ সহচরী। উভয়ে বেশ আনন্দেই ছিল। কিন্তু গত বৎসর কাতুর গুরুজনপদস্থ কোনও আত্মীয়ের বিনা বেতনে একটি ঝির প্রয়োজন হওয়াতে, সে ব্যক্তি অনেক স্নেহ, করুণা এবং আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কাত্যায়নীকে পত্র লেখে এবং অবশেষে পুত্র পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যায়।

মনোরমাকে গৃহকার্য্য বেশী করিতে হয় না। বামুন আছে, চাকর আছে, তা ছাড়া সরকার হইতে দুইজন জল-আচরণী কয়েদী পাওয়া যায়, তাহারা প্রাতে আসিয়া জল তোলে, বাসন মাজে, গ্রীষ্মকালে পাখা টানে। বিকালে পাঁচটার সময় তাহাদের অবশ্য আবার জেলে প্রবেশ করিতে হয়। সাংসারিক কাজ-কর্ম্ম তেমন নাই, কি করিয়া মনোরমার দিন কাটে? তার স্বামী দুইখানি মাসিকপত্রের গ্রাহক—মাসের প্রথম সপ্তাহটা সেইগুলি পড়িয়া কাটে। আর বাকী সাড়ে তিন সপ্তাহ? উপন্যাস—তাও কালে-ভদ্রে দুই-একখানা কেনা হয় মাত্র। সুতরাং মনোরমার বড় কষ্ট।

দুই

জেলরবাবু প্রাতে উঠিয়া চা-পানান্তে সাতটার সময় আপিসে যান, আবার সাড়ে দশ কিংবা এগারোটায় বাড়ী আসিয়া স্নানাহার করেন। তৎপরে দিবানিদ্রান্তে বেলা সাড়ে তিনটায় উঠেন এবং চারিটার সময় আবার আফিসে গিয়া দুই তিন ঘণ্টা সরকারী কার্য্য করিয়া থাকেন।

আজ আহারাদির পর মনোরমার যখন অবসর হইল, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

মনোরমা পশ্চাতের বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া, খোলা চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া, একখণ্ড মাসিকপত্র হাতে লইয়া শয়ন করিল। চুল শুকাইবার উদ্দেশ্যেই এ সময় এভাবে তাহার শয়ন। ভিতরের ঘরে পালঙ্কের উপর তাহার স্বামী নিদ্রিত, বড় ছেলে নগেন স্কুলে গিয়াছে, ছোট খোকা অনেক দুষ্টামি করিবার পর অবশেষে পিতার পাশে শুইয়া ঘুমাইয়াছে।

মনোরমা পত্রিকার ছবিগুলি দেখা শেষ করিয়া, তার পর সূচীপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ সংখ্যায় কয়টা গল্প আছে, তাহাই দেখিবার বিষয়। গল্প-সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আপন মনে বলিল, "পোড়ারমুখো কাগজওয়ালাদের একটু যদি আক্কেল আছে! কেবল প্রবন্ধ আর প্রবন্ধ, কচুপোড়া খাও! প্রবন্ধ নিয়ে ত মানুষ ধুয়ে খাবে! হাতীর মত কাগজখানা—তিনটি মোটে গল্প! এ পড়তে কতক্ষণই বা লাগবে?"—বলিয়া প্রথম গল্পটি পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গল্পের অর্দ্ধেকটা পড়া হইবার পূর্ব্বেই পত্রিকাখানি বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বেলা যখন আড়াইটা, তখন হঠাৎ মনোরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কে তার পায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, ঠিকাদারবাবুর স্ত্রী সরোজিনী। "ও মা, তুমি!" বলিয়া মনোরমা উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কতক্ষণ এসেছ, ভাই?"

সরোজিনী বলিল, "তা প্রায় আধ ঘণ্টা হবে!"

"আধ ঘণ্টা চুপ ক'রে ব'সে আছ? আমায় জাগালে না কেন?"

"আহা অকাতরে শুয়ে ঘুমুচ্চ, তুলতে মায়া হ'ল। শেষে যখন দেখলাম, ঘুম আর ভাঙ্গে না, তখন কি করি, অগত্যা পাপ কাজটাই ক'রে ফেললাম। তা দিদি, খবর সব ভাল ত? ছেলেপিলে ভাল আছে? দশ-বারো দিন আসতে পারিনি, মেঝ ছেলেটার জ্বর হয়েছিল।"

মনোরমা বলিল, "ফটিকের জ্বর হয়েছিল? কি জ্বর? কেমন আছে, এখন বেশ সেরে উঠেছে ত?"

সরোজিনী বলিল, "হ্যাঁ ভাই, এখন সেরে উঠেছে তোমাদের আশীর্ব্বাদে। সর্দ্দি-জ্বরই হয়েছিল, তবু ভাবনা ত কম হয়নি! চার দিন হ'ল জ্বরটা ছেড়েছে, কাল দু'টি

মাছের ঝোল ভাত খেয়েছে। তোমাদের খবর সব ভাল ত?"

"হ্যাঁ ভাই, আমরা ভালই আছি। বোসো একটু, চোখে-মুখে জলটা দিয়ে আসি। এই মাসিকপত্রখানা ওল্টাও ততক্ষণ।"—বলিয়া মাসিকপত্র নবাগতার হাতে দিয়া মনোরমা উঠিয়া গেল।

সরোজিনী মাসিকপত্রের ছবিগুলা দেখা শেষ হইলে, কাগজ রাখিয়া বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়া জেলের প্রাঙ্গণের দৃশ্য দেখিতে লাগিল;—বিশেষ দেখিবার তখন যদিও কিছু ছিল না। কয়েদীরা সব বাহিরে কাজ করিতে গিয়াছে, কেবল চারিজন কয়েদী প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ পুষ্করিণী হইতে ঘড়া-ঘড়া জল তুলিয়া বাঁকে ঝুলাইয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে, আবার খালি ঘড়া লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

সরোজিনীর স্বামী ভূতনাথবাবু এই জেলের ঠিকাদার। কয়েদীদের আহারের জন্য চাউল, দাইল, নুণ, তেল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই তিনি সরবরাহ করিয়া, মাসান্তে জেলর-বাবুর নিকট তাঁহার বিল দাখিল করেন। সরকারী হুকুম অনুসারে জেলরবাবুকে প্রতি রবিবারে সহরে গিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদির বাজার-দর জানিয়া আসিতে হয়, তজ্জন্য তিনি গাড়ীভাড়া পাইয়া থাকেন। তিনি সেই জ্ঞান অনুসারে ঠিকাদারবাবুর বিল সংশোধনান্তে উহা পাস করেন। সুতরাং জেলরবাবুর উপর ঠিকাদারবাবুর অসীম ভক্তি। দেখা হইলেই আভূমি নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করেন এবং অপর কেহ সেখানে উপস্থিত থাকিলে, কারণে অকারণে জেলরবাবুর বিদ্যা. বুদ্ধি. ধার্ম্মিকতা, এমন কি তাঁহার আকৃতি অবয়বের পর্য্যন্ত অজস্র প্রশংসা করিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, "কি বলেন মশাই, অ্যাঁ? আমি একটি বর্ণও বাড়িয়ে বলছি?" এ-দিকে আবার ঠিকাদার-গৃহিণীও, জেলর-গৃহিণীকে "দিদি" বলিতে অজ্ঞান। বাড়ীতে গাই আছে, খাঁটি দুধের ছানা কাটিয়া সন্দেশ করিয়া আনিয়া দেয়, কুল পাকিলে কুলের আচার, কাঁচা আম উঠিলে কাসুন্দি ও আম-তেল প্রস্তুত করিয়া উপহার দেয়। বাজার হইতে উত্তম বোম্বাই আম কিনিয়া আনিয়া মনোরমাকে দিয়া বলে. "দেশ থেকে এসেছিল, আমাদের বাগানের আম।" বাঙ্গাল-দেশের মেয়ে, ভাল সৌখীন কাঁথা সেলাই করিতে জানে, এবার জেলর-গৃহিণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইলে কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিবে, বলিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় দশ মিনিট পরে মনোরমা পাণের ডিবা ও দোক্তার কৌটা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "পাণ ক'টা সেজে আনতে দেরী হয়ে গেল, ভাই। চাকর-বাকরের সাজা পাণ আমার মুখে রোচে না জানই ত!"

সরোজিনী বলিল. "হ্যাঁ, তা জানি বইকি, দিদি। কি চমৎকার যে তোমার পাণ-সাজা! যে খেয়েছে, সেই জানে। উনি কি বলেন জান? উনি বলেন. আমি এই যে কাজকর্ম্ম না থাকলেও নিত্যি জেলরবাবুর বাড়ী যাই, সে কেবল গিন্নীঠাকরুণের সাজা পাণ খাবার লোভে। আমায় বলেন তুমি তাঁর কাছে ঐ রকম পাণ-সাজা শিখে এস না কেন? দিও ত দিদি. দু'এক দিন দেখিয়ে।"

"আচ্ছা দেবো"—বলিয়া মনোরমা মুচকি হাসিল, কারণ, নিজ হাতে পাণ সে নিজের জন্যই সাজিয়া থাকে। অতিথি অভ্যাগত ত দূরের কথা, স্বামীর পাণও সে কদাচিৎ সাজে; কিন্তু সরোজিনী অপ্রতিভ হইবে বলিয়া সে আর তাহা প্রকাশ করিল না। পাণ ও দোক্তা সেবন করিতে করিতে দুইজনে গল্প করিতে লাগিল।

দুই চারি কথার পর সরোজিনী বলিল, "ভাল মনে প'ড়ে গেল। আমাদের বাড়ীর পাশে যে উকীলবাবু আছেন না—কেদার ভট্চায্যি—তাঁদের দেশ থেকে একজন অনাথা স্ত্রীলোক এসে রয়েছে। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, জাতে ব্রাহ্মণ। তার তিন কুলে কেউ নেই, দেশে থাকতে খেতে পেত না, এখানে এসেছে—যদি কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা রাঁধুনি-গিরি কাজ-কর্ম্ম জোটে। উকীলবাবুর বাড়ীতে আমি ত প্রায়ই যাই কিনা,

উকীলবাবুর বউ, মেয়েরাও আমাদের বাড়ী আসে যায়। তোমাদের সব কথাই আমি তাদের বলেছি ত! তাই উকীলবাবুর পরিবার সে-দিন বললে, তুমি ত জেলরবাবুর বাসায় প্রায়ই যাও, জিজ্ঞাসা কোরো না তাঁদের, তাঁরা যদি মেয়েটিকে রাখেন।"

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "বিধবা ত?"

"না, বিধবা কেন হবে? সধবা। কিন্তু স্বামী তার থেকেও নেই। সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে চ'লে গেছে. কোনও খোঁজ-খবরই নেই।"

"কত দিন নিরুদ্দেশ হয়েছে?"

"তা দিদি আমি জিজ্ঞাসা করিনি। পাঁচ-সাত বছর হবে বোধ হয়। না, অত হবে না—তার কোলে একটি ছেলে, তার বয়স চার বছর।"

"ছুঁড়ীর বয়স কত?"

"আমার চেয়ে ছোটই হবে। এই—আঠারো-ঊনিশ বোধ হয়। বললে, ওটি তার প্রথম সন্তান নয়—আর একটি হয়েছিল, সেটি ছ'মাসের হয়ে মারা গেছে।"

মনোরমার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে "আহা!" শব্দটি বাহির হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, "মানুষটা নষ্ট-দুষ্ট নয় ত?"

সরোজিনী বলিল, "তা কি ক'রে জানবো দিদি? সে নারায়ণই জানেন। কিন্তু দেখে ত নষ্ট-দুষ্ট ব'লে মনে হয় না। খুব ঠাণ্ডা, মুখে কথাটি নেই. চোখ দু'টি সদাই ছল্‌ছল্‌ করছে। তা ছাড়া ধর, নষ্ট-দুষ্টই যদি হত রাঁধুনিগিরি করতে আসবে কেন? ভরা সোমত্ত বয়স দেখতেও মন্দটি নয়!"

"নাম কি তার?"

"মোক্ষদা।"

"কোথায় বাড়ী বললে?"

"ঐ যে উকীলবাবুদের বাড়ী যেখানে। বরিশাল জেলার কোন্‌ একটা গ্রাম—নামটা মনে আসছে না।"

মনোরমা একটু ভাবিয়া বলিল, "একদিন নিয়ে এস না তাকে সঙ্গে ক'রে—দেখি মানুষটা কেমন। কর্ত্তার মতটাও জিজ্ঞাসা ক'রে রাখি। তাকে আমরা রাখবো কি রাখবো না, সে-কথা এখন থেকে কিছু ব'লে দরকার নেই।"

সরোজিনী বলিল, "বেশ,—তা কবে আনবো বল? তাকে শুধু বলবো এখন, চল এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি।"

মনোরমা বলিল, "কাল কি পরশু যে দিন হয় নিয়ে এস।"

"বেশ, পরশুই তাকে আনবো তা হ'লে।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথার পর সরোজিনী বিদায় গ্রহণ করিল।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে মনোরমা স্বামীর নিকট কথাটা পাড়িল।

ইন্দুবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বামনীর কাজ খুঁজছে. তা বামুন ত তোমার রয়েছে, কি করবে সে?"

মনোরমা কহিল, "রান্না-বান্নার কাজই যে তাকে দিয়ে করাতে চাচ্ছি, তা নয়। ঘর-কন্নার অন্য সব কাজও ত আছে। এই বিদেশে প'ড়ে আছি, একটা মানুষ-জন নেই, পাড়া-প্রতিবেশী নেই, দু'টো কথা কোয়েও ত বাঁচবো।"

ইন্দুবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তোমার একটি সহচরীর দরকার, তাই বল!"

মনোরমা কহিল, "সে তুমি যাই বল। তার পর, বামুনঠাকুরের যদি দু'দিন অসুখ-বিসুখই হ'ল, বামুনের মেয়ে, তাকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে কাজ চালিয়ে নিতে পারবো। হ'ল বা ছোটখোকাকে স্নানটা করিয়ে দিলে। এই রকম সব কাজ আর কি! তার পর ধর, যা সন্দেহ করছি তাই যদি শেষে দাঁড়ায়—" বলিয়া মনোরমা লজ্জায় অবনতমুখী হইল।

ইন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে। ছোটখোকা হবার সময় কাতি ধাই ছিল, তাই অনেক উপকার পাওয়া গিয়েছিল। আচ্ছা, তুমি ত তাকে আসতে বলেছ। আসুক, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কোয়ে দেখ, তার পর যা বিবেচনা হয় করা যাবে।"

তিন

মোক্ষদা আসিলে, তাহাকে দেখিয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মনোরমার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। সরোজিনী বলিয়াছিল, তাহার বয়স আঠারো-উনিশ, কিন্তু মোক্ষদা নিজে বলিল, তাহার একুশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, বাইশ চলিতেছে। পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে হইলেও, কথায়-বার্ত্তায় বেশ সভ্য-ভব্য, আর, একটু লেখাপড়া-জ্ঞানও আছে। বলিল, বাল্যকালে সে স্কুলে পড়িয়াছিল, চতুর্থমান পর্য্যন্ত পড়া হইলে তার বিবাহ হয় এবং সেজন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালার সঙ্গে তিনখানা ইংরাজী কেতাবও সে পড়িয়াছিল, মিশ্রভাগ পর্য্যন্ত অঙ্ক কষিয়া গঃ সাঃ গুঃ কষিতেও সুরু করিয়াছিল, তা ছাড়া ভূগোল-প্রবেশ, ইতিহাস-পাঠ ইত্যাদিও পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন সে-সব আর তাহার মনে নাই। ছেলেটিও তার বেশ শিষ্ট-শান্ত। কোনওরূপ অন্যায়-আব্দার নাই, দৌরাত্ম্য নাই।

মনোরমা তাহাকে খোরাক-পোষাক ও মাসিক চার টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছে। মনোরমা বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মোক্ষদা বলিয়াছিল, "আমি আর কি বলবো—আপনি বিবেচনা ক'রে যা দেবেন, তাই আমার যথেষ্ট। ভদ্রঘরে আশ্রয় পেলাম, এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

মোক্ষদার কাপড়-চোপড়ের দুরবস্থা দেখিয়া মনোরমার বড় দুঃখ হইল। স্বামীকে বলিয়া ঠিকাদারবাবুর দ্বারা মোক্ষদা ও তাহার পুত্রের জন্য আবশ্যক বস্ত্রাদি আনাইয়া দিল। ঠিকাদারবাবু যেরূপ সস্তায় জিনিষপত্র কিনিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না।

মোক্ষদা মনোরমার হাতের কাজ কাড়িয়া নিজে করে। নিজ পুত্র অপেক্ষা মনোরমার পুত্র দুইটিকে অধিক যত্ন করিয়া থাকে। কর্ত্রী-ঠাকুরাণীকে সে দিদি এবং কর্ত্তাকে দাদাবাবু বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—যদিও কর্ত্তার সামনে সে বাহির হয় না, তাঁহার সঙ্গে কথা কহা ত দূরের কথা।

আজ রবিবার। রবিবার বিকালে ইন্দুবাবু আফিস যান না, এই সময় তাঁহার বাজার-দর যাচাই করিবার জন্য সহরে যাইবার কথা। কাছাকাছি কোথাও ঠিকা-গাড়ীর আড্ডা নাই, গাড়ীর আবশ্যক হইলে সেই সহরে লোক পাঠাইতে হয়। ভৃত্য গিয়াছে গাড়ী আনিতে। বড় ছেলে নগেন ম্যাচ দেখিতে গিয়াছে। ইন্দুবাবু স্ত্রীর সহিত পশ্চাতের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, দেখ, ঐ পুকুরের পাড়ে নিমগাছের তলায় ছোক্‌রা-গোছ একজন কয়েদী দাঁড়িয়ে আছে দেখছ?"

মনোরমা বলিল, "হ্যাঁ, কে ও?"

"ও একজন সাধারণ কয়েদী নয়, ও বি-এ পাস।"

"বি-এ পাস? বল কি? চুরি করেছিল নাকি?"

"না, চুরি নয়, ডাকাতি করেছিল বলা যায়। ও যে একজন মস্ত স্বদেশী।"

"কোনও স্বদেশী ডাকাতি বুঝি?"

ইন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ডাকাতিও কি স্বদেশী আর বিলিতী হয়?"

"তা নয়। দেশ-উদ্ধারের জন্যে টাকা সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে যে ডাকাতি, তাকেই আমি স্বদেশী ডাকাতি বলছিলাম। ওর নাম কি? কোথায় ডাকাতি করেছিল?"

"ওর নাম শরৎ বাঁড়ুয্যে। কোথায় ডাকাতি করেছিল, তা এখন আমার মনে নেই, কিন্তু সে সময় খবরের কাগজে আমি ওর মোকদ্দমার কথা পড়েছিলাম।"

"কত দিনের কথা ?"

"বছর তিনেক হবে, কিম্বা কিছু বেশী। আমরা তখন পাটনায়। আগে ও আলিপুর জেলে ছিল—এই মাস-দেড়েক হবে এখানে এসেছে।"

"কত দিন পরে ওর খালাস হবে ?"

"পাঁচ বছর জেল হয়েছিল, এখনও বুঝি বছর-খানেক বাকী আছে।"

যাহার বিষয়ে এই আলোচনা হইতেছিল, এতক্ষণে সে লোক অদৃশ্য হইয়াছিল। মনোরমা বলিল, "আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে, উচ্চশিক্ষিত, দেখ দেখি একবার কর্ম্মের ভোগ! কেন বাপু, তোরা এ-সব করিস ? কি কাজ এখানে ওকে করতে হয় ? আপিসের কাজ করে ত ? লেখাপড়া-জানা কয়েদী যখন!"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "সাধারণতঃ লেখাপড়া-জানা কয়েদী হ'লে তাকে আপিসের কাজই দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এ যে অসাধারণ! গভর্ণমেণ্টের হুকুম নেই। ওকে বাগানের কাজে দিয়েছি, বেশী খাটতে হয় না।"

প্রত্যেক জেলের সংলগ্ন একটা করিয়া বাগান থাকে, সেখানে জেলের খরচের জন্য শাক-সব্জী তরকারি-পাতি উৎপন্ন করা হয়। জেলের কয়েদীরাই সে-সব বাগানের কার্য্য করিয়া থাকে।

এ সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী আসিয়াছে। ইন্দুবাবু প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

রাত্রিতে আহারাদির পর শয়ন করিয়া মনোরমা স্বামীকে বলিল, "ওগো দেখ, আমার মোক্ষদা ঐ ছেলেটির সম্বন্ধে অনেক কথা জানে। তোমাতে আমাতে যখন কথা হচ্ছিল, ঘরের ভিতরে পাণ সাজতে-সাজতে ও ব'সে শুনেছিল।"

"কোন্ ছেলেটি ?"

"ঐ যে যে তোমার বি-এ পাস করা ডাকাত, শরৎ মুখুয্যে না কি।"

"শরৎ বাঁড়ুয্যে।"

"যখন ঢাকায় ওর মোকদ্দমা হয়েছিল, খবরের কাগজে সব কথা মোক্ষদা পড়েছিল। বললে, ও ত ডাকাতি করেনি, গভর্ণমেণ্ট অন্যায় ক'রে ওকে জেলে পুরেছে। বি-এ পাস ক'রে ঢাকা জেলার কোন্ ইস্কুলে নাকি ও হেড-মাষ্টারি করত। সেখানে ওরা একটা সমিতি করেছিল। সেই গ্রামের আর আশপাশের গ্রামের অনেক ছোঁড়া সেই সমিতির মেম্বর ছিল। ও ছিল সেই সমিতির সভাপতি। কাছে একটা বড় গ্রামে কি সাহা নাম বললে, তার কাপড়ের দোকান ছিল। ওরা বার-বার তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিলিতী কাপড় আমদানী ক'রে দোকানে বিক্রী করছিল। টাকার মহাজনীও করতো। গরীব চাষাদের বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে ক্রমে তাদের জোৎ-জমা নীলেম ক'রে নিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করতো, এই রকমে সেই সাহা পোড়ারমুখো অনেক টাকা জমিয়েছিল! স্বদেশীওয়ালারা কত বারণ করে, তবু সে শোনে না। তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার হিসেবেও বটে, দেশের কাজে লাগাবার জন্যে টাকা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও বটে, সমিতির লোকরা নৌকো ক'রে গিয়ে এক রাতে সেই সাহা-মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতি করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরা পড়ে। একজন মহারাণীর সাক্ষী হয়ে সব কথা প্রকাশ ক'রে দেয়। ঐ শরৎ বাঁড়ুয্যে, সেই সমিতির সর্দ্দার ছিল কিনা, তাই গভর্ণমেণ্ট রাগে ওকে সুদ্ধ জেল দিয়েছে, নইলে ও নিজে ডাকাতি করেনি, ডাকাতদের সঙ্গে ছিলও না।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিও খবরের কাগজে ঐ রকমই যেন পড়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে। তোমার সহচরী ঐ দেশেরই লোক বুঝি ?"

"না না, ওর বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ী দুই-ই ত বরিশাল জেলায়। এ হ'ল ঢাকা

জেলার ঘটনা, ও খবরের কাগজে সেই সময় পড়েছিল বললে।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "আমিও ত পড়েছিলাম, আমার ত মনে ছিল না। ওর খুব স্মরণ-শক্তি ত!"

মনোরমা বলিল, "খবরের কাগজ পড়ার ওর ভারি সখ কিনা। তোমার যে ইংরিজি কাগজ আসে, ও ত পড়তে পারে না। একদিন বলছিল, দাদাবাবু একখানা বাংলা কাগজ নেন না কেন, তা হলে আমরাও পড়তে পারি।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "একখানা ইংরিজি কাগজ নিচ্ছি, আবার একখানা বাংলা—এত টাকা কোথায়?"

চার

মাসখানেক পরে, ইন্দুবাবুর পাচক ব্রাহ্মণ তিন মাসের ছুটী চাহিল। দেশে তার শ্বশুর নাকি মারা গিয়াছে, কন্যাই তার একমাত্র সন্তান, জ্যোৎজমি যাহা কিছু শ্বশুর রাখিয়া গিয়াছে, সমস্তই তাহার প্রাপ্য, কিন্তু দুষ্টপ্রকৃতি জ্ঞাতিরা সে সকল জবর দখল করিবার চেষ্টায় আছে। এই বলিয়া, কয়েকদিন পরেই বামুন-ঠাকুর দেশে রওয়ানা হইল।

ঠিকাদারবাবুর সাহায্যে অন্য একজন পাচক সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। পাকশালার ভার পড়িল মোক্ষদার উপর। মনোরমাও তাহাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করে।

এইরূপ কয়েকদিন চলিলে, ইন্দুবাবু একদিন দ্বিপ্রহরে আহারে বসিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ, সেই স্বদেশী কয়েদী শরৎ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা হ'ল।"

"কি কথা হ'ল।"

"সে আমায় বলছিল, 'মশাই, জেলের অন্ন খেয়ে খেয়ে আমার ত প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল! বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম করবার জন্যে আপনার ত দু'জন কয়েদী সরকার থেকে বরাদ্দ আছে, আমায় যদি সেই একজনের জায়গায় নিযুক্ত করেন ত একবেলা দু'টো খেয়ে বাঁচি!'—আমি বললাম, 'তুমি বি-এ পাস, তুমি কি জলতোলা, বাসনমাজা, এ-সব নোংরা কাজ করতে পারবে? তা ছাড়া, তুমি বামুনের ছেলে, এঁটো বাসনই বা তোমায় দিয়ে মাজাই কি ক'রে? রাঁধতে জান?' সে বললে, 'কেন আপনার বামুন ত আছে।'—জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি ক'রে জানলে আমার বামুন আছে?' সে বললে, 'ঐ নাথুনী আর গুরুচরণ যারা রোজ আপনার বাসায় কাজ করতে যায়, তারা বলে যে!' আমি বললাম, 'বামুন ছিল, পালিয়েছে। রাঁধতে জান ত বল, গুরুচরণের বদলে তোমাকে নিই।' সে বললে, 'আজ্ঞে, রান্না-বান্না মোটামুটি যে না জানি, তা নয়। মা-ঠাকরুণ একটু আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেই কাজ চালিয়ে নিতে পারবো।' আমি তাকে হেসে বললাম, 'আচ্ছা, দেখি বিবেচনা ক'রে।'—কি করবো, আনবো তাকে?"

এই বি-এ পাস কয়েদী সম্বন্ধে মনোরমার মনে কিছু কৌতূহল ছিল; তা ছাড়া ব্রাহ্মণ-সন্তান ডাকাতি না করিয়াও কারাক্লেশ ভোগ করিতেছে জানিয়া তাহার উপর সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। তাই সে স্বামীর প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইল।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "ও যে বলেছে, ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে, তুমি তা পারবে ত?"

মনোরমা বলিল, "সেই ত মুস্কিল। ওর সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা করবে যে!"

"কেন? কাল যদি একজন নতুন রাঁধুনী-বামুন আসে, তুমি কি তার সঙ্গে কথা কইবে না?"

মনোরমা বলিল, "কিন্তু, সে ত বি-এ পাস হবে না!"

ইন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি ভাগ্যিস আমি বি-এ পাস করিনি! তা হলে ফুলশয্যের রাত থেকে আজ পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে কথাই কইতে না বল?"

মনোরমা লজ্জিত-হাসি হাসিয়া বলিল, "কি যে বল তুমি, তার ঠিক নেই। তুমি আর ও সমান?"

পাঁচ

দুই দিন পরে শরৎ আসিয়া, স্নান করিয়া মনোরমার পাকশালায় প্রবেশ করিল। তাহার কথাবার্ত্তা, চালচলন অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্র। মনোরমাকে গোড়াতেই সে মাতৃ-সম্বোধন করায়, তাহার সম্বন্ধে সঙ্কোচের ভাব মনোরমার মন হইতে অনেকটা দূর হইল। তথাপি মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, "যাও না ভাই, কি কি রাঁধতে হবে, বামুন-ঠাকুরকে ব'লে দাও গে না।"

মোক্ষদা জিভ্ কাটিয়া বলিল, "না দিদি, আমি পারবো না ওর সঙ্গে কথা কইতে। তুমি গিন্নী-বান্নি মানুষ, তুমি যাও।"

অবশেষে মনোরমা গিয়া বামুন-ঠাকুরকে রান্নার বিষয় বলিল। আরও বলিল, "আমার বড় ছেলে নগেন দশটার সময় খেয়ে ইস্কুলে যাবে। বাবু খেতে বসবেন সাড়ে এগারো-টায়।"

বামুন-ঠাকুর বলিল, "তা হলে মা, বড়বাবুর ভাত ক'টা আগে চড়িয়ে দেবো এখন, কর্ত্তাবাবুর আর অন্য সবাইকের ভাত শেষে রাঁধবো।"

"তাই কোরো"—বলিয়া মনোরমা চলিয়া আসিল।

মাঝে মাঝে মনোরমা গিয়া আধঘোমটা দিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, দেখিল, বামুন-ঠাকুরের কার্য্যে কোনওরূপ ভুল হইতেছে না।

বামুন-ঠাকুর দুই তিনবার শয়ন-ঘরের নিকট আসিয়া ঘড়ি দেখিয়া গেল। নগেনকে যথাসময়েই সে ভাত দিল, যদিও সব রান্না তখনও তাহার হয় নাই।

ইন্দুবাবু আপিস হইতে ফিরিয়া, স্নান করিতে যাইবার সময় রান্না-ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া, সকৌতুকে একবার বি-এ পাস বামুন-ঠাকুরের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কি হে শরৎবাবু, রান্নার তোমার কত দূর?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে, আমায় আর বাবু ব'লে লজ্জা দেন কেন? আর সব রান্নাই আমার হয়ে গেছে, ভাতটা চড়িয়েছি, আপনি স্নান করুন, ততক্ষণ ভাতও হয়ে যাবে।"

খাইতে বসিয়া, অর্দ্ধেক খাওয়া হইলে ইন্দুবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি বামুন-ঠাকুর নিজে নিজেই রেঁধেছে? তুমিই বোধ হয় দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছ ওকে?"

মনোরমা বলিল, "আমি কিছু দেখিয়ে দিইনি।"

"তবে মোক্ষদা দেখিয়ে দিয়েছে বোধ হয়।"

"ও ত রান্না-ঘরের ত্রিসীমানায় যায়নি। কেন, বামুনঠাকুর রেঁধেছে কেমন?"

"বেশ রেঁধেছে গো!"—বলিয়া ইন্দুবাবু শরৎকে ডাকাইলেন।

শরৎ আসিয়া অনতিদূরে বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "আর কি এনে দেবো?"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "আর কিছু এনে দিতে হবে না। কিন্তু শরৎ, ঠিক ক'রে বল দিকিনি, সত্যিই কি তুমি বি-এ পাস?"

শরৎ কিছু উত্তর করিল না, শুধু একটু হাসিল।

ইন্দুবাবু আবার বলিলেন, "তুমি বলেছিলে মোটামুটি এক রকম রাঁধতে তুমি জান। এ ত মোটামুটি রকম নয়, এক্সপার্ট হাতের রান্না! এ তুমি শিখলে কি ক'রে?"

শরৎ বলিল, "আজ্ঞে, আমি যখন মাস্টারি করতাম, তখন ছেলেদের নিয়ে আমি একটা বোর্ডিং বলুন, আশ্রম বলুন, খুলেছিলাম। আমরা আশ্রমই বলতাম। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমরা অনুসরণ করতাম, নিজের নিজের সব কাজ আমরা নিজেরাই করতাম —এমন কি, বাসনমাজা, ঘর-ঝাঁড় দেওয়া পর্য্যন্ত। কোনও চাকর-বাকর আমাদের ছিল না। প্রথম প্রথম পাকপ্রণালী হাতের কাছে রেখে রোজই আমি নিজেই রাঁধতাম, ছেলেরা পালাক্রমে আমায় সাহায্য করত। ক্রমে তারাও সব শিখে ফেললে। তার পর, মাঝে মাঝে রাঁধতাম, পালা ছিল। হাতে-কলমে শেখা আর কি।"

ইন্দুবাবু হাসিতে লাগিলেন। মনোরমা বিস্ময় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে বামুন-ঠাকুরের পানে চাহিতে লাগিল। ইন্দুবাবু বলিলেন, "তোমার খালাসের বুঝি আর এক বছর বাকী আছে?"

শরৎ বলিল, "দশ মাস।"

"দশ মাস? হয় ত শেষে গুড্ কণ্ডাক্টের (সচ্চরিত্রতার) জন্যে এক মাস তুমি রেহাই পাবে। তবে তুমি স্বদেশী কয়েদী, বলা যায় না, এ অনুগ্রহ গভর্ণমেণ্ট তোমায় না-ও করতে পারেন। আপাততঃ আমি ব্যবস্থা করেছি, সারাদিন তুমি আমার বাসাতেই থাকবে, ও-বেলা তখন খাবার-টাবারগুলো ক'রে দিয়ে পাঁচটার সময় জেলে ঢুকবে। সারাদিন ব'সে তুমি কি করবে? তুমি তোমার আত্ম-জীবন-চরিত লেখ, খালাস হ'য়ে সে বই তুমি ছাপাবে। স্বদেশীর যে রকম হিড়িক, তোমার বই হু-হু করেই বিক্রী হবে। যত দিন আবার কাজ-কর্ম্ম একটা না জোটাতে পার, সেই বইয়ের আয়ে তোমার চ'লে যাবে।"

শরৎ বলিল, "যে আজ্ঞে, আপনার এ পরামর্শ ভাল।"

পরদিন বড়খোকা (নগেন্দ্র) ইস্কুল হইতে ফিরিয়া একখানা বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক্ (খাতা) বামুন-ঠাকুরকে দিল। মা তাকে পয়সা দিয়াছিলেন।

ছয়

তিন মাস অতীত হইল, কিন্তু ইন্দুবাবুর বামুন-ঠাকুর ফিরিয়া আসিল না। মনোরমা বলিল, "ওরা ত ঐ রকমই করে। একবার ছুটী নিয়ে দেশে গেলে আর সহজে আসতে চায় না।"

ইন্দুবাবু বলিলেন "শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে তার বোধ হয় অবস্থা ফিরে গেছে, আর চাকরী করবার দরকার নেই। কাজ ত চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু শরৎও বোধ হয় আর বেশী দিন এখানে থাকবে না।"

"বদলির হুকুম এসেছে নাকি?"

"না, আসেনি এখনও। কিন্তু আসতে কতক্ষণ? স্বদেশী কয়েদীকে গভর্ণমেণ্ট বেশী দিন ত এক জেলে রাখে না।"

"এখানে কত দিন হ'ল ওর?"

"মাস-ছয়েক হ'ল বুঝি।"

"ওর মেয়াদের ত আর ছ'মাস মাত্র বাকী আছে। বেশ কাজ-কর্ম্ম করছিল, অতি ঠাণ্ডা স্বভাব, সচ্চরিত্র—বাকী ছ'টা মাস এখানে ও থাকলেই বেশ হ'ত!"

এই তিন মাসে শরৎ সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য কয়েদী যাহারা জেলরবাবুর বাড়ীতে আসিয়া গৃহকার্য্য করিবার হুকুম পায়, একটা দুর্লভ সুযোগ তাঁহারা লাভ করে,—লুকাইয়া তামাক খাইতে পায়। বাড়ীর চাকর-বাকরের সঙ্গে ভাব করিয়া, এই সুবিধাটুকু ভোগ করিয়া লয়। কিন্তু জেলে ত তামাক খাবার কোনই

উপায় নাই। শরৎ তামাক, সিগারেট, বিড়ি কিছুই খায় না। এমন কি, আহারান্তে পাণ পর্য্যন্ত নয়। প্রথম দিন শরতের আহার হইয়া গেলে মনোরমা ভৃত্য-হস্তে দুটি পাণ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু শরৎ বলিয়াছিল, "মাকে বল, পাণ ত আমি খাইনে। দয়া ক'রে দুটো সুপুরি-লবঙ্গ যদি দেন ত খাই।" বড়খোকা, ছোটখোকা, এমন কি, মোক্ষদার ছেলেটির সঙ্গে পর্য্যন্ত শরতের অত্যন্ত ভাব। বড়খোকাকে শরৎ কত দেশ-বিদেশের গল্প বলে, বিশেষ নেপোলিয়নের যুদ্ধের গল্প এমন সুন্দর করিয়া বলিতে পারে যে, শুধু বড়খোকা নহে, মনোরমা, মোক্ষদাও শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। মনোরমা ত এখন শরৎকে দেখিয়া মাথায় কাপড় পর্য্যন্ত দেয় না। মনোরমা বলে, "ও আমার বড় ছেলে।" মোক্ষদা মাথায় কাপড় দেয় বটে, কিন্তু শরতের সঙ্গে রীতিমত কথা কহে। পূর্ব্বে ইন্দুবাবু মনোরমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার সহচরীটাকে শরতের কাছে বেশী যেতে-টেতে দিও না। দুজনেরই পুরো সোমত্ত বয়স, জান ত, চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, ঘি আর আগুন—একসঙ্গে রাখবে না।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "সে বুদ্ধি কি আমার নেই? হাজার হোক, গেরস্তের মেয়ে আমাদের আশ্রয়ে রয়েছে! ওর ভাল-মন্দ আমাকেই দেখতে হবে ত!"

কিন্তু অল্পে অল্পে এ নিষেধ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। একদিন মোক্ষদাকে শরতের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া ইন্দুবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মোক্ষদা এখন শরতের সঙ্গে কথা কয় দেখছি।"

মনোরমা বলিয়াছিল, "এক বাড়ীতে থেকে কথা না কইলে চলে? কুটনো কুটে দেওয়া, বাটনা বেটে দেওয়া, রান্না-বান্নার যোগাড় ক'রে দেওয়া, সবই ত এখন মোক্ষদাই করে। ওগো, শরৎ সে ছেলে নয়, দেবচরিত্র পুরুষ। ওরা দুজনে রান্নাঘরে ব'সে কাজ-কর্ম্ম করছে, কতদিন এমন আমি আচম্‌কা গিয়ে পড়েছি, কখনও দুজনকে কথা-বার্ত্তা কইতেও দেখিনি। গম্ভীর মুখ। কেউ কারু পানে তাকায়ও না।"

যে-দিন স্ত্রীর সহিত ইন্দুবাবুর শরতের অন্য জেলে বদলি হইবার প্রসঙ্গে কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার এক সপ্তাহ পরে তিনি আপিস হইতে আসিয়া বলিলেন, "ওগো, শরতের বদলির হুকুম এসেছে।"

"কোথা?"

"বক্সার সেণ্ট্রাল জেলে।"

"কবে যেতে হবে?"

"পাঁচ দিন পরে।"

ইন্দুবাবু শরৎকে ডাকিয়াও খবরটা দিলেন। শুনিয়া সে মুখখানি চূণ করিয়া রহিল।

শরতের বদলির সংবাদে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই দুঃখিত।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "ঠিকাদারবাবুকে বলি, যদি জানাশুনো একটা ভাল বামুন যোগাড় ক'রে দিতে পারেন।"

শেষ দিন কর্ম্ম করিয়া বিকালে জেলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শরৎ মনোরমাকে বলিল, "মা, এ-ক'মাস আপনার বাড়ীতে বড় সুখেই ছিলাম। যেন বাড়ীর ছেলের মত ছিলাম—আমি যে জেল খাটছি, তা আমার মনেই হত না। কাল বেলা ন'টার সময় আমায় নিয়ে যাবে। যাবার আগে একবার আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে চাই। আপনি বাবাকে ব'লে হুকুমটা করিয়ে দেবেন, নইলে ত সে সময় আমাকে আসতে দেবে না।"

মনোরমা সজল-নয়নে স্বীকৃত হইল।

পরদিন যথাসময়ে শরৎ আর আসিল না।

আজ মোক্ষদাই রাঁধিবে। তবে আজ ফতেহাদোয়াজ দাহামের ছুটী বলিয়া নগেনের

স্কুল নাই। রান্নার তাড়াতাড়ি নাই।

সাতটার সময় যখন জেলরবাবু আপিসে যাইতেছিলেন, তখন মনোরমা তাঁহাকে শরতের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। ইন্দুবাবু বলিলেন, "আমি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ইন্দুবাবু চলিয়া গেলে মনোরমা মোক্ষদাকে বলিল, "তুমি তা হ'লে স্নান-টান সেরে নিয়ে রান্নার যোগাড় দেখ। তোমার স্নান হয়ে গেলে আমিও স্নান ক'রে রান্নাঘরে যাব।"

সাত

অন্য দিন অপেক্ষা আজ একটু সকালেই—সাড়ে দশটা না বাজিতেই, ইন্দুবাবু আপিস হইতে বাড়ী ফিরিলেন। বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় মনোরমা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ইন্দুবাবু বলিলেন, "কি গো, কোথায় ছিলে?"

"রান্না করছিলাম।"

"কেন, মোক্ষদা?"

মনোরমা মুখখানি গম্ভীর করিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তার পর বলিল, "ওর হাতে আমাদের আর খাওয়া চলবে না।"

"কেন, কি হয়েছে?"

মনোরমা থামিয়া থামিয়া বলিল, "ও—খারাপ—মেয়ে!"

ইন্দুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "অ্যাঁ? সে কি? কে বললে? কোথা শুনলে তুমি?"

"আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। ভাত চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, এখনও ফুটতে দেরী আছে। সব কথা বলি, শোন।"—বলিয়া মনোরমা একখানা চেয়ারে বসিল।

ইন্দুবাবু শঙ্কিত-নেত্রে স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি বল দেখি।"

তখন মনোরমা বলিতে লাগিল, "তুমি আপিস যাবার সময়, শরৎকে পাঠিয়ে দিতে তোমায় বললাম ত? সে আটটার সময় আমায় প্রণাম করতে এল। মোক্ষদা তখন স্নানের ঘরে, আমি এই ঘরে ব'সে তেল মাখছি। শরৎ এসে আমার কাছে বসল। সে থাকতে থাকতেই মোক্ষদা স্নানের ঘর থেকে বেরুল, বেরিয়ে ওদিকে চ'লে গেল। তার পর শরৎ আমায় প্রণাম ক'রে বিদায় নিলে, আমি স্নানের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করলাম। স্নান করতে গিয়ে দেখি, আমার গামছাখানা নেই। আবার বেরিয়ে, গামছা খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরের বাইরে দেখি, শরৎ আর মোক্ষদা দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মোক্ষদার মাথা শরতের কাঁধের উপর, দু'জনে একবারে জ্ঞানশূন্য। তার পর মোক্ষদার মাথাটা শরৎ তুলে, তার মুখে চুমো খেয়ে, চোখ মুছতে মুছতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মনে করেছিল, গিন্নীমাগী স্নানের ঘরে বন্ধ, কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।"

"তুমি যে দাঁড়িয়ে আছ, তা শরৎ দেখলে?"

"না।"

"আর মোক্ষদা?"

"মোক্ষদা আমায় দেখলে বইকি—একটু পরেই।"

"তুমি কি বললে?"

"রাগে আমার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যাচ্ছিল, আমি দাঁড়িয়ে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিলাম। মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুচ্ছিল না। কোনও রকমে শুধু বললাম, 'মোক্ষদা, তুমি

আর রান্নাঘরে ঢুকো না।'—ব'লেই আমি গামছাখানা নিয়ে স্নানের ঘরে গেলাম। প্রায় পনেরো মিনিট স্নান করতে পারলাম না, কাঠের মূর্ত্তির মত ব'সে রইলাম। তার পর স্নান সেরে মাথা মুছতে মুছতে ও-ঘরে গিয়ে দেখি, কয়েদীদের নিয়ে যাবার জন্যে জেলের গাড়ী ফটকে দাঁড়িয়ে আছে, আর মোক্ষদা জানালার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে ফটকের পানে চেয়ে আছে। আমি যে ঢুকেছি, তা বিবির হুঁস পর্য্যন্ত নেই।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "অ্যাঁ, তুমি দেখে ফেলেছ জেনেও? পরেও লজ্জা-সরম একেবারে বিসর্জ্জন?"

মনোরমা বলিল, "ওগো, বুঝছ না, ধরা প'ড়ে দু'কাণ-কাটা হয়ে গেল কিনা! এক-কাণ-কাটা যায় গাঁয়ের বা'র দিয়ে দু'কাণ-কাটা যায় গাঁয়ের ভিতর দিয়ে।"

"কোথা সে এখন? পালিয়েছে বোধ হয়?"

"পালাবে কেন? নিজের বিছানায় শুয়ে, বিরহিণী বোধ হয় বিরহের কান্না কাঁদছেন।"

ইন্দুবাবু কিয়ংক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকার পর থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "সংসারে মানুষ, চেনবার উপায় নেই! ঐ পাজিটাকেই তুমি একদিন বলেছিলে—দেবচরিত্র পুরুষ! আর তাও ঐ মোক্ষদারই সম্বন্ধে। আর মোক্ষদাও যে এমন ভিজে বেড়ালটি, তা ত একদিনের জন্যেও সন্দেহ হয়নি! ছি ছি ছি, ভদ্রলোকের বাড়ীর মধ্যে এ কি কাণ্ড! দুপুরবেলা আমি এ-ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুই। তুমিও মাঝে মাঝে সহরে বন্ধুবান্ধবের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছ। দিব্যি সুযোগটি পেয়েছিল ওরা। ছি ছি ছি! চুলোয় যাক্! এখন কি করা যায় বল দেখি?"

মনোরমা বলিল, "ঝাঁটা মেরে বিদায় করা ছাড়া আর কি করবার আছে? তুমি স্নান ক'রে ফেল, আমার ভাতও বোধ হয় হয়ে এল।"

আহারান্তে ইন্দুবাবু শয্যায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। তামাকটা শেষ হইলেই শয়ন করিবেন।

মনোরমা মোক্ষদার ভাত বাড়িয়া অবহেলাভরে তাহার ঘরে থালাখানা ফেলিয়া আসিয়া, স্বামীর পাতে নিজে খাইতে বসিল।

ইন্দুবাবু তামাকটা শেষ করিয়া, কি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইবেন একটা বই-টই খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় বড়খোকা একখানা খাতা হাতে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবা, শরৎ-দা তার আত্ম-জীবনীখানা ফেলে গেছে।"

ইন্দুবাবু অন্য বহি না খুঁজিয়া, কৌতূহলবশতঃ সেইখানা হাতে লইয়াই শয়ন করিলেন। প্রথমে শেষটা দেখিলেন, সমাপ্ত হইয়াছে কি না। দেখিলেন, সমাপ্ত হয় নাই, ঢাকা জেলায় তাহার গ্রেপ্তারের কথা পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। পৃষ্ঠা উল্টাইয়া এখানে সেখানে দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, একটা পরিচ্ছেদের শিরোনামা রহিয়াছে—"আমার বিবাহ।" সেই পৃষ্ঠাতেই রহিয়াছে, অমুক গ্রামের অমুকের কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরীর সহিত আমার বিবাহ হইল।

পড়িয়াই তাঁহার মনে হইল, এই মোক্ষদাই নহে ত? পড়িতে পড়িতে শেষ দিকে দেখিলেন, গ্রেপ্তারের সময় দেশে স্ত্রী তাহার গর্ভবতী ছিল। তারিখ হিসাব করিয়া দেখিলেন, এই মোক্ষদার পুত্রের সহিত বয়স মিলিয়া যায়।

অবাক্ হইয়া ইন্দুবাবু বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় মনোরমা আহারান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দুবাবু বলিলেন, "ওগো, মোক্ষদাকে একবার এখানে ডাক ত।"

"কেন?"

"বিশেষ দরকার। এক মুহূর্ত্ত দেরী কোরো না।"

মনোরমা মোক্ষদার ঘরে গিয়া দেখিল, সে যেমন শুইয়া ছিল, তেমনই শুইয়া আছে,

তাহার ভাত যেমন তেমনি পড়িয়া আছে। কর্ত্তার জরুরী তলব মনোরমা কঠোর-স্বরে তাহাকে জানাইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে মনোরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মোক্ষদা ঘোমটা দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোক্ষদা, ঐ শরৎ কয়েদী কি তোমার কেউ হয়?"

মোক্ষদা চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার স্বামী।"

"তুমি তা হ'লে এখানে হঠাৎ এসে পড়নি? তোমার স্বামী এখানে বদলি হয়ে এসেছে জেনেই তুমি এসেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া মোক্ষদা যাইবার উপক্রম করিল।

ইন্দুবাবু কম্পিত-স্বরে বলিলেন, "মোক্ষদা, অন্যায় সন্দেহ করবার জন্যে তুমি আমাদের মাফ কর।"

মোক্ষদা গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইন্দুবাবুকে প্রণাম করিল।

মনোরমা সংশয়ভরে জিজ্ঞাসু-নয়নে স্বামীর পানে চাহিল। ইন্দুবাবু চক্ষু নত করিয়া বলিলেন, "মোক্ষদা সত্যি কথাই বলেছে।"

মনোরমা তখন "চল চল" বলিয়া আদর করিয়া মোক্ষদার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া, জোর করিয়া ভাতের থালার কাছে বসাইল।

পরে জানিতে পারা গেল, বহু দিন স্বামীর অদর্শন সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাকে মাঝে মাঝে শুধু যদি চোখের দেখা দেখিতে পায় এই আশায়, জেলখানার কোনও বাবুর বাড়ীতে চাকরি করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই মোক্ষদা এ সহরে আসিয়াছিল। প্রতিবেশী ঠিকাদারবাবুর স্ত্রীর এ বাড়ীতে যাতায়াত আছে শুনিয়া, সে হাতে স্বর্গ পাইয়াছিল। অবশ্য এতটা সে আশা করে নাই যে, যে বাড়ীতে কর্ম্মে নিয়োজিত হইবে, তার স্বামীও সেই বাড়ীতে প্রতিদিন আসিবেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার পর্য্যন্ত সুযোগ পাইবে।

মনোরমা বলিল, "দেখ, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।"

"কি?"

"শরৎ সেই যে তোমায় বলেছিল, জেলের অন্ন খেয়ে আমার প্রাণ গেল, আপনার বাড়ী আমি রাঁধবো, তার কারণ আছে। মোক্ষদা প্রায়ই পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জেলের উঠান দেখতো। আমি ভাবতাম, বুঝি তামাসা দেখছে। তখন কি জানি, ও স্বামীকে দেখছে। শরৎও পাঁচ দিন ওকে দেখে থাকবে। তাই এ বাড়ীতে কাজ করবার জন্যে ছোঁড়ার এত আগ্রহ হয়েছিল।"

ইন্দুবাবু বলিলেন, "তাই সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্য সংযম ওদের। তিন মাস ছিল দু'জনে এক বাড়ীতে, অথচ শেষ দিনটি ভিন্ন—"

মনোরমা বলিল, "সত্যি!"

মনোরমার ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষদা রহিল। বস্তুতঃ জেল হইতে খালাস পাইয়া শরৎ যখন স্ত্রীকে লইতে আসিল, মনোরমার ছেলে তখন দুই মাসের হইয়াছে।

"প্রেমের ইন্দ্রজাল"

এক

অবিনাশবাবু বেলা ৫টার সময় কলেজ হইতে ফিরিয়া, নিজ শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া ধড়া-চূড়া ছাড়িতে ছাড়িতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু পত্নী সুষমাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ভিতর-বারান্দায় ঝিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝি,

এ'রা গেলেন কোথায়?"

ঝি বলিল, "মা ছাদে আছেন, ডেকে দিচ্চি।"—বলিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল। একটু পরেই সুষমা নামিয়া আসিল। প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে বলিল, "হ্যাঁগা, তুমি কখন এলে? আমি ত তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পাইনি!"

অবিনাশ বলিল, "এই ত এসে কলেজের কাপড়-চোপড় ছাড়লাম। তুমি ছাদে ব'সে কি করছিলে, বউ?"

সুষমা একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটা রিভাইজ করছিলাম।"

"রিভাইজ শেষ হল?"

"একটু বাকি আছে। আর ঘণ্টা-খানেক বসতে পারলেই হয়ে যাবে।"

অবিনাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ তাই বল বউ! সেই জন্যেই আজ তুমি আমার পায়ের শব্দ শুনতে পাওনি। তুমি ত এখানে ছিলে না—এ ধুলো-মাটির পৃথিবীর বহু ঊর্দ্ধে, কল্পনার কল্পলোকে বিচরণ করছিলে।"

সুষমা বলিল, "তুমিই ত ক'দিন থেকে আমায় পীড়াপীড়ি করছ, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটা একটু বদলে ফেল, বদলে ফেল। ছাদে ব'সে আমি তোমারই হুকুম তামিল করছিলাম, তবে আমায় অত ঠাট্টা কেন?"—বলিয়া সুষমা ঠোঁট ফুলাইল।

অবিনাশবাবু স্নেহমিশ্রিত কৌতুকের সহিত স্ত্রীর মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "নিজের বউকে যদি একটু ঠাট্টা করবো না, তবে কার বউকে করবো বল দেখি?"—বলিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া এরূপ উদ্যমের সহিত স্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইলেন যে, সুষমা পিছাইয়া গিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "আঃ কি কর? বাইরে ঝি রয়েছে না! বুড়ো হ'তে চললেন তবু সখ মিটলো না। যাও হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি ততক্ষণ তোমার জলখাবার ঠিক করিগে।"—বলিয়া সুষমা বাহির হইয়া গেল।

দশ মিনিট মধ্যে অবিনাশবাবু হাত-মুখ ধুইয়া আসিলেন। চেয়ারে বসিয়া পাথরের টেবিলের উপর রক্ষিত জলযোগ বা চা-যোগ করিতে করিতে বলিলেন, "ওগো শুনছ বউ আজ একটা নূতন খবর আছে।"

"কি নূতন খবর?"

"ওরা ত ভয়ানক ধরেছে আমাকে।"

"ওরা কারা?"

"এই—গোপালবাবু, উমাচরণবাবু, যোগেনবাবু, নির্ম্মলবাবু, আরও ক'জন।"—অবিনাশবাবু যে নামগুলি করিলেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহার সহকর্ম্মী—বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রোফেসর।

সুষমা বলিল, "কি ধরেছেন, খাবেন?"

অবিনাশবাবু মৃদু হাসির সহিত বলিলেন, "না, তোমার নাটক শুনবেন।"

"অ্যাঁ!"—বলিয়া সুষমা নিকটস্থ খাটের উপর বসিয়া পড়িল।

অবিনাশবাবু বলিলেন, "ও কি, অমন আঁৎকে উঠলে যে? এমন কি বিপদটা হ'ল শুনি?"

সুষমা বলিল, "আমি নাটক লিখেছি না মাথামুণ্ডু কি একটা ছেলেখেলা করেছি তার ঠিক নেই, ঐ সব মহা-মহা পণ্ডিত লোকদের ডেকে এনে তা শোনাতে হবে?—শুনে তাঁরা কি ভাববেন বলদিকিন? ছি ছি ছি! আমার এমন লজ্জা করছে!"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "ঐ সব মহা-মহা পণ্ডিত লোকেরা তোমার নাটক শুনে যদি ছি ছি করবেন, তোমার নাটক তবে আমার এত ভাল লাগলো কি ক'রে? আমি তা হ'লে একটা মহামূর্খ বল!"—বলিয়া অবিনাশবাবু রাগ করিবার ভাণ করিলেন।

সুষমা বলিল, "এই দেখ, সকল কথার তুমি উল্টো মানে কর কেন বল দেখি? আমি কি তোমায় মহামূর্খ বলেছি? তুমিও ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর, তাঁরাও তাই। তুমি তাঁদের চেয়ে কিসে কম?"

"তবে? আমার মতামতের কোনও মূল্য নেই কেন?"

সুষমা খাট হইতে নামিয়া আসিয়া, স্বামীর স্কন্ধে হাত বুলাইয়া বলিল, "আমার নাটক তোমার অত ভাল লেগেছে, তা কেবল, তুমি আমায় অত ভালবাস ব'লে। আবার তাদের বউ যদি নাটক লিখতো, তবে তাদেরও খুব ভাল লাগতো।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "জানিনে,—আমার ধারণা ছিল, ভাল জিনিষ সবাইকেরই ভাল লাগে। তাই আমি গর্ব্ব ক'রে তাদের কাছে কথাটা বলেছিলাম।"

"তুমি তাঁদের কাছে কি বলেছ বল দেখি? নিশ্চয়ই অযথা খুব বাড়িয়ে বলেছ।"

"অযথা কেন বলবো? সযথাই বলেছি।"

"ঠিক কি কথা তাঁদের তুমি বলেছ, সত্যি ক'রে আমায় বল দেখি!"

"বলেছি, নাটকখানি খুব ভাল হয়েছে।"

"ব্যস, আর কিছু না? সত্যি ক'রে বল।"

অবিনাশবাবু ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আর বলেছি, গিরীশ ঘোষের প্রফুল্ল নাটকের পর, এ রকম ভাল গার্হস্থ্য নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যে আর জন্মায়নি। তা সত্যি কথা যা, তাই বলেছি। তাতে দোষটাই বা কি হয়েছে, আর রাগে তুমি ভুরুই বা কোঁচকাচ্ছ কেন?"

সুষমা বলিল, "আচ্ছা, সত্যি হোক মিথ্যে হোক তুমি ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ কর কেন বল দেখি? এটা কিন্তু তোমার একটা রোগ—তা তুমি যাই বল। আমি গোপনে একটা ছেলেমানুষী করলাম,—শুধু তুমি জানলে আর আমি জানলাম। তাই নিয়ে কি বাইরে ঢাক পিটোতে হয়?"

"ঢাক আমি না পিটোলে ঢাক যে আপনি পিটে যাবে বউ! তার উপায় কি বল?"

"ঢাক আপনি পিটবে কেন?"

"বই ছাপাতে হবে না?"

"কেন, আবার কিছু লোকসান দেবার ইচ্ছা হয়েছে? বিয়ের অল্পদিন পরেই কত খরচপত্র ক'রে আমার কবিতার বই ছাপিয়ে ছিলে। বিক্রী হল? তারপর আমায় অনুরূপা নিরুপমা বানাবার চেষ্টায় দিলে আমায় 'উপন্যাস-কলেজে' ভর্ত্তি ক'রে। কলেজ থেকে বেরিয়ে ক্রমাগত বলতে লাগলে, একখানা উপন্যাস লেখ উপন্যাস লেখ। কি করি, তোমার পীড়াপীড়িতে উপন্যাস লিখলাম। 'তাও ছাপালে গ্রন্থ হল নগদ মূল্য এক টাকা।' কোনও রকমে খরচটা উঠে গিয়েছিল—আর বিক্রী হয়? যে প্রথম সংস্করণ সেই প্রথম সংস্করণেই মা আমার বিরাজ করছেন ত!"

ঝি অবিনাশবাবুর গুড়গুড়ি প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল। অবিনাশবাবু ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, "প্রেমের ইন্দ্রজাল বেরুলে হয়ত প্রথমটা তেমন বিক্রী নাও হতে পারে, কিন্তু থিয়েটারে যখন প্লে হতে আরম্ভ হবে—তখন হুহু ক'রে বিক্রী হতে থাকবে যে, এডিশনের পর এডিশন উড়ে যাবে—তা জান?"

সুষমা বলিল, "থিয়েটারে প্লে হলে ত?"

"যত সব রাবিশ নাটক প্লে হচ্চে, আর তোমার নাটক প্লে হবে না?"

"আমার নাটক যে রাবিশ-ভরো নয়, তা কে বললে?"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "আমি বলছি। রবিবার দিন ওঁরা সব আসছেন ত? সেই সব মহা-মহা পণ্ডিত লোক যখন শুনবেন, তখন তাঁরাও বলবেন। তুমি একা রাবিশ বললে ত চলবে না গো!

পুষ্প সম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা
দেখনি নিজে মোহন কি যে তোমার মালিকা!

ছড়িগাছটা দাও, হরিশ পার্কে একটু বেড়িয়ে আসি। ফিরে এসে রবিবার সম্বন্ধে দুজনে পরামর্শ করা যাবে।"

দুই

এ কয়দিন ধরিয়া অবসর সময়টুকু স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া নাটকখানি বারংবার পাঠ করিয়া, মন্ত্রণা করিয়া, কথা বদলাইয়া, দৃশ্য বদলাইয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া শনিবার রাত্রে উহার প্রসাধনক্রিয়া সমাপন করিল। কাল রবিবার। অবিনাশবাবুর সহকর্ম্মী সাতজন অধ্যাপক —এবং অবিনাশবাবুর ক্লাসের একজন মেধাবী ছাত্র পঞ্চানন বসু—বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজি-সাহিত্যে সে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই আটজনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। বেলা ৫টার সময় তাঁহারা আসিয়া অবিনাশবাবুর গৃহে সমবেত হইবেন। চা-পানের পর নাটক পড়া আরম্ভ হইবে। পড়িতে তিন ঘণ্টার কম লাগিবে না। তারপর রাত্রি-ভোজন। এইরূপ পরামর্শ-ই হইয়াছে।

রবিবার প্রাতে চা-পান সমাধা করিয়া অবিনাশবাবু বাজার করিতে গেলেন। ফর্দ্দ অনুসারে কাঁচা ও পাকা বাজার করিয়া সে সব বাড়ীতে আনিয়া ফেলিয়া, ট্রামযোগে মিউনিসিপল মার্কেটে গমন করিলেন কেবল মটন্‌টার জন্য—আর সব ত জগুবাবুর বাজারেই পাওয়া গিয়াছে।

রন্ধন জন্য দুইজন রসুইয়ে-ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা রাঁধিয়া, পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইয়া যাইবে। বেলা ২টার পর ব্রাহ্মণেরা হুঁকা হাতে করিয়া আসিয়া নিম্নতলের পাকশালা দখল করিল। চা ও জল-খাবার প্রস্তুতের ব্যবস্থা সুষমা নিজের হাতে রাখিয়াছিল: উহা দ্বিতলে ষ্টোভ জ্বালাইয়া সম্পন্ন হইবে।

পাঁচটার পর নিমন্ত্রিতগণ একে একে, দুইয়ে দুইয়ে আসিতে লাগিলেন। সকলে আসিয়া জমায়েৎ হইতে সাড়ে-পাঁচটা বাজিয়া গেল। ঝির সহায়তায় অবিনাশবাবু চা ও জলযোগের দ্রব্যাদি বৈঠকখানায় আনিতে লাগিলেন:

চা-পর্ব্ব যখন শেষ হইল তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। গোপালবাবু এই অধ্যাপক দলের মধ্যে প্রবীণতম, তিনি বলিলেন,—"এবার নাটকখানি বের কর হে অবিনাশ।"

অবিনাশবাবু দ্বিতলে গিয়া, নাটকের খাতা হাতে সুষমাকে লইয়া নামিয়া আসিলেন। বৈঠকখানা ঘরের পাশেই আর একটি ঘর ছিল, লোকটা-জনটা আসিলে এই ঘরেই শয়নের ব্যবস্থা হইত। উভয় ঘরের মাঝে একটা দ্বার ছিল. এই দ্বারটির উপর পর্দ্দা ফেলা ছিল। পর্দ্দার অনতিদূরে একখানি চেয়ার পাতিয়া তাহাতে সুষমাকে বসাইয়া. অবিনাশবাবু বৈঠকখানা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি খুবই ছিল, কিন্তু তথাপি উত্তমরূপে পাঠ করিতে অবিনাশবাবুর কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না; কারণ বারংবার পড়িয়া পড়িয়া উহা প্রায় তাঁহার কণ্ঠস্থই হইয়া গিয়াছিল। অবিনাশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক—সাহিত্য-রসজ্ঞান তাঁর ভালই ছিল। বেশ দরদ দিয়াই তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রথমেই গোপালবাবু বলিয়া রাখিয়াছিলেন, পাঠ শেষ না হইলে কোনও শ্রোতা যেন কোন সমালোচনা না করেন। তথাপি শ্রোতৃগণ স্থানে স্থানে "বাঃ, কি সুন্দর!" "কি চমৎকার!" "খাসা হয়েছে এখানটি", ইত্যাদি মন্তব্য করিতে ছাড়িলেন না। এইরূপ এক একটা মন্তব্য শুনিয়া অবিনাশবাবুর কণ্ঠস্বর ভাবোচ্ছ্বাসে আর্দ্র হইয়া উঠে, পর্দ্দার আড়ালে বসিয়া সুষমার দেহেও রোমাঞ্চ উৎপাদিত হয়।

পাঠ যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকা। সকলেই বলিলেন, প্রথম প্রয়াসের পক্ষে নাটকখানি বেশ ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। স্থানে স্থানে চরিত্র-গুলিও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ গানগুলি বেশ সুন্দর। কেহ কেহ বলিলেন, ইহা কোনও ভাল থিয়েটারে অভিনয়ার্থ দেওয়া উচিত, গুণের আদর নিশ্চয়ই হইবে।

নির্ম্মলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানি ছাপাচ্ছেন ত?"

উমাচরণবাবু বলিলেন, "না হে, আগে ছাপিও না। আগে কোনও থিয়েটারে খাতা-খানি দাও। ওরা ত জিনিষটে ঠিক সাহিত্যের দিক থেকে দেখবে না, ওরা দেখবে স্টেজে এটা জমবে ভাল কি না। সেইজন্যে ওরা অনেক সময় নাট্যকারকে দিয়ে স্থানে স্থানে বদল-সদল করিয়ে নেয়, হয়ত একটা সীনকে সীনই বাদ দেয়, কিংবা নাট্যকারকে দিয়ে লিখিয়ে একটা নূতন সীনই ঢুকিয়ে নেয়। সেই সবগুলো হয়ে গেলে তারপর বই ছাপানো ভাল।"

গোপালবাবু মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, "না হে অবিনাশ, তা কোরো না। তোমার মত একটা লোকের পক্ষে, নাটকের খাতা বগলে ক'রে আর পাঁচটা ছেঁড়া নাট্য-কারের সামিল হয়ে থিয়েটারের কর্ত্তাদের কাছে হেঁইগো মশাই হেঁইগো মশাই ব'লে দরবার করতে যাওয়া—সেটা বড়ই অপমানজনক হবে। আমি কি চাই জান? আমি চাই, বইখানি ছাপা হোক,—কাগজে কাগজে তার সমালোচনা বেরুক, থিয়েটারওয়ালারাই এসে অভিনয়ের অধিকারের জন্যে তোমার কাছে দরবার করুক। কি বল হে যোগেন?"

গোপালবাবুর এই যুক্তিই সকলে মানিয়া লইলেন। অবিনাশবাবুর প্রিয়ছাত্র পঞ্চানন একজন কবি, নানা মাসিকপত্রিকার সহিত তাহার সম্পর্ক আছে, কবিতার বহিও সে দুইখানি ছাপাইয়াছে। প্রেস ঠিক করিবার প্রুফ দেখিবার ও সমালোচনা বাহির করাই-বার ভার সে গ্রহণ করিল।

তিন

"প্রেমের ইন্দ্রজাল" নাটক আজ ছয় মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে, কাগজে কাগজে উহার উচ্চ প্রশংসাযুক্ত সমালোচনাও বাহির হইয়াছে, কিন্তু কোনও থিয়েটারের অধ্যক্ষ এখনও উহার অভিনয় অধিকার লাভের জন্য অবিনাশবাবুর নিকট দরবার করিতে আসিলেন না।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। গুরুদাস লাইব্রেরী হইতে হিসাব পাওয়া গেল, ছয় মাসে মোট সতেরখানি মাত্র বহি বিক্রয় হইয়াছে।

হিসাব দেখিয়া সুষমার মুখখানি মলিন হইয়া গেল। অবিনাশবাবুর বুকটিও অত্যন্ত দমিয়া গেল। কিন্তু মনের সে ভাব তিনি গোপন করিয়া সুষমাকে বলিলেন, "দেখ বউ, এতে নিরুৎসাহ হবার কিছুই নেই। এ ত উপন্যাস নয়, এ হল নাটক। নাটক প্রধানতঃ কোথায় বিক্রী হয় জান? থিয়েটারে, অভিনয়ের সময়। থিয়েটার দেখতে গিয়েই লোকে নাটক কেনে। নইলে শুধু ঘরে ব'সে পড়বার জন্যে নাটক কেনে খুব অল্প লোকেই।"

সুষমা বলিল, "কিন্তু ওঁরা যে বলেছিলেন, বই বেরুলে থিয়েটারওয়ালারা অভিনয় অধিকারের জন্যে আমাদের দরজার মাটি চ'ষে ফেলবে, তাই বা কোথায়? কাগজে কাগজে বইয়ের যে অত সুখ্যাতি বেরুল, তারই বা ফল কি হল?"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "হ্যাঃ তুমিও যেমন! ঐ সব মাসিকপত্র-টত্র থিয়েটারওয়ালারা পড়ে বুঝি? তাদের সময় কোথা? এমন একখানা ভাল নাটক যে বেরিয়েছে, সে খবরই এখনও হয়ত তাদের কাছে পৌঁছয়নি। বই যে খুব ভালই হয়েছে, তার প্রমাণ ত

ঐ সব সমালোচনা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।"

"সব সমালোচনাই বোধ হয় তোমার ঐ ভক্তিমান ছাত্র পঞ্চাননেরই লেখা। সব কাগজেই ও কবিতা লেখে,—কাগজওয়ালাদের সঙ্গে খাতির আছে,—সে যা সমালোচনা লিখে দিয়েছে তাই বোধ হয় তারা ছেপেছে।"

যদিও পঞ্চানন স্পষ্টতঃ এ কথা স্বীকার করে নাই,—তথাপি অবিনাশবাবুরও মনে মনে সন্দেহ ছিল যে, সমালোচনাগুলি তাহার কর্তৃক,—অন্ততঃ তাহারই ইঙ্গিতে লিখিত। সুতরাং এ কথার জবাব না দিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু, যেদিন নাটক পড়া হল, ইউনিভার্সিটির অতগুলো দিগ্‌গজ প্রোফেসার, তাঁরা কি বলেছিলেন তোমার মনে নেই? —তুমি কি বলতে চাও, তাঁদের সে প্রশংসা আন্তরিক নয়, কপটতা-পূর্ণ?"

সুষমা বলিল, "তাঁদের প্রশংসা যে কপটতা-পূর্ণ সে কথা আমি বলতে চাইনে। সত্যিই তাঁদের ভাল লেগে থাকবে,—তাঁরা যা বলেছেন, সে তাঁদের আন্তরিক কথাই সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল দিক বিবেচনা ক'রে দেখ। তাঁরা সকলেই তোমার বন্ধু, তোমায় স্নেহ করেন, ভালবাসেন। বাঙলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার এই অবস্থার দিনে, তাঁদের এক প্রিয়বন্ধুর স্ত্রী বই লিখেছে এই সংবাদেই তাঁরা খুসী। তুমি আদর ক'রে বই শুনতে তাঁদের নিমন্ত্রণ করেছ—তাঁরা ত বই ভাল লাগবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তা ছাড়া, আগে থেকেই বইয়ের প্রশংসা ক'রে তুমি তাঁদের মনও ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলে। তাঁরা জিনিষটাকে দেখেছেন স্নেহের বন্ধুপ্রীতির রঙ্গীন চশমার ভিতর দিয়ে, সুতরাং ঠিক দেখেন নি।"

স্ত্রীর এই বক্তৃতা শুনিয়া অবিনাশবাবু কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "সে যা হোক, আমি কি স্থির করেছি জান? যস্মিন দেশে যদাচারঃ। এ যুরোপ নয়—ঘরে ব'সে থেকে গুণী তার ন্যায্য প্রাপ্য পায় না। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে গুণীকে তার প্রাপ্য আদায় ক'রে নিতে হয়। পঞ্চাননের সঙ্গে ডায়মণ্ড থিয়েটারের ম্যানেজারের আলাপ আছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি একদিন যাই, গিয়ে বই একখানা দিয়ে আসি। তুমি কি বল?"

সুষমা একটু ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি যা ভাল বোঝ, কর। আমি আর কি বলবো?"

॥ চার ॥

আরও ছয় মাস কাটিল। নাটকখানি পঞ্চাননের ওকালতী সত্ত্বেও "ডায়মণ্ড" থিয়েটার ফেরৎ দিয়াছে। তারপর "অ্যাভিনিউ" থিয়েটার, তারপর "বীণাপাণি" থিয়েটারে চেষ্টা করা হইয়াছিল, ফল পূর্ব্ববৎ। পাণ্ডুলিপিখানি এখন "লীলা" থিয়েটারের হস্তে—তাঁহারা কি করেন বলা যায় না।

"প্রেমের ইন্দ্রজাল"খানি সুষমা বাস্তবিক প্রাণ দিয়া লিখিয়াছিল। মুখে সে ইহাকে রাবিশ বলুক আর যাহাই বলুক, অন্তরের অন্তস্তলে তাহার বিশ্বাস যে নাটকখানি উচ্চদরের হইয়াছে। তাই বহি বিক্রয়ের হিসাব দেখিয়া এবং উপর্য্যুপরি তিনটি থিয়েটার হইতে নাটকখানি ফেরৎ আসায় সে বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িয়াছে।

ভাদ্র মাসে একদিন ভিজাকাপড়ে ঘণ্টাখানেক গৃহ-কার্য্য করায় সুষমার জ্বর হইয়া পড়িল। তিন চারি দিন জ্বরভোগের পর উহা ছাড়িল বটে, কিন্তু পরদিন আবার প্রবলতর বেগে দেখা দিল। সারা ভাদ্র মাস এইরূপ চলিল। ইহাতে সুষমার দেহ বলিতে গেলে কঙ্কালসার হইয়া পড়িল।

অবিনাশবাবু যে কয় ঘণ্টা কলেজে থাকেন, তা ছাড়া সমস্তক্ষণ রুগ্না পত্নীর শয্যা-

পার্শ্বে বসিয়া কাটান। তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রত্যহ সুষমার অবস্থার সংবাদ লন।

সুষমা এখন অনেক সময় অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। একদিন জ্ঞান হইলে সে স্বামীকে বলিল, "ওগো, দেখ আমি ভারি চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখেছি। যেন একটা প্রকাণ্ড বড় হল, তার শেষে ষ্টেজ, সেই ষ্টেজে যেন "প্রেমের ইন্দ্রজাল" প্লে হচ্ছে, লোক একেবারে গিস্ গিস্ করছে। কত সব সাহেব মেম পর্য্যন্ত দেখতে এসেছে। তোমাকেও দেখলাম সেই সাহেব মেমদের দলেই। আমি যেন দোতালায় চিকের আড়ালে ব'সে আছি। আচ্ছা লীলা থিয়েটারের হলটা কি খুব বড় ?"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "তাদের হল ত আমি দেখিনি। দু'তিন দিন শুধু ম্যানেজারের বসবার ঘরে ঢুকেছিলাম।"

"ওগো, তুমি যাও না একদিন, ম্যানেজার কি বলে জেনে এসো।"

"তোমায় ফেলে কি ক'রে আমি যাই বউ?"

"তা হোক, তুমি যাও একদিন। কালই যাও না, কলেজের পর। এত যখন দেরি হচ্ছে, তারা বোধ হয় নেবে ঠিক করেছে। ফিরে আসবার হ'লে এতদিনে আসতো বোধ হয়। ডায়মণ্ড থেকে, অ্যাভিনিউ থেকে, বীণাপাণি থেকে ফিরতে ত এত দেরি হয়নি।"

"আচ্ছা দেখি, যদি কাল সময় করতে পারি।"—বলিয়া অবিনাশবাবু ঘড়ি দেখিয়া, রোগিণীর মুখে চামচে করিয়া বেদানার রস দিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে ডাক্তারবাবু আসিলে, অবিনাশবাবু তাঁহাকে রোগিণীর অবস্থা, বিশেষ করিয়া ঐ স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত, খুলিয়া বলিলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মনটা অত খারাপ ব'লেই চিকিৎসার তেমন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। ঈশ্বর করুন লীলা থিয়েটার ওঁর নাটকখানি নেয়!" সেদিন কলেজের পর, পঞ্চাননকে সঙ্গে লইয়া অবিনাশবাবু লীলা থিয়েটারে গমন করিলেন। ম্যানেজারবাবু বলিলেন, "না মশাই, বইখানি চ'লবে না—এই নিন" বলিয়া পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিলেন।

গুরুপত্নীর রোগের অবস্থা, তাঁহার স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত, ডাক্তারবাবুর উপদেশ, পঞ্চানন সমস্তই অবগত ছিল। শিক্ষক ও ছাত্র অত্যন্ত বিমর্ষ মনে ফিরিতেছিলেন। পঞ্চানন হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, "স্যার!"

অবিনাশবাবু দাঁড়াইলেন। পঞ্চাননের মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার চক্ষু দুইটি ব্যাকুল মিনতি-পূর্ণ। বলিলেন, "কি হে?"

পঞ্চানন বলিল, "স্যার, আমি একটা অন্যায় কর্ম্ম করবো—একটা মিথ্যে কথা বলবো, আমায় অনুমতি দিন। আমি মাকে গিয়ে বলবো, 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' লীলা থিয়েটার নিয়েছে—বই রিহার্সলে পড়েছে—আসছে শনিবারের পরের শনিবারে প্লে আরম্ভ হবে।"

অবিনাশ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওঃ, চল। আচ্ছা ভেবে দেখি।"

বড় রাস্তার মোড়ে আসিয়া অবিনাশবাবু ট্রামের জন্য দাঁড়াইলেন। পঞ্চানন বলিল, "স্যার, আপনার বোধ হয় মিথ্যেকথা তেমন সহ্য হয় না, আপনার এখন বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। আমি বাড়ী গিয়ে মাকে ঐ কথা বলিগে। তাঁকে বলবো যে বিশেষ কাজে আটকে প'ড়ে আপনি লীলা থিয়েটার যেতে পারেন নি, আমাকে পাঠিয়েছিলেন, আমি গিয়ে দেখলাম অ্যাকচুয়ালি রিহার্সল চলচে। তাই ছুটতে ছুটতে স্যারকে খবর দিতে এসেছি, স্যার কই?"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তাই না হয় বলগে। আমি গোপালবাবুর বাড়ীতে খানিক ব'সে তার পর যাব এখন।"

পঞ্চানন বলিল, "আর স্যার, খাতাখানি কাইণ্ডলি উপরে নিয়ে যাবেন না, বৈঠকখানা ঘরে দেরাজে বন্ধ ক'রে তার পর উপরে যাবেন।"

"বেশ, তাই করবো।"—বলিয়া উভয়ে ট্রামে উঠিলেন। অবিনাশবাবু, চোরবাগানের

মোড়ে নামিয়া, গোপালবাবুর বাড়ীর দিকে চলিলেন।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ী পৌঁছিয়া অবিনাশবাবু দেখিলেন, সুষমা নিদ্রিত, তাহার গালে চোখের জলের দাগ।

ঘণ্টাখানেক পরে সুষমা জাগিয়া বলিল, "ওগো, পঞ্চাননের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?"

"হ্যাঁ, হয়েছে বইকি! তাকে লীলা থিয়েটারে পাঠিয়েছি। ম্যানেজার কি বললে কালকে কলেজে বোধ হয় শুনতে পাব তার কাছে।"

সুষমা ক্ষীণস্বরে বলিল, "সে এসেছিল ঘণ্টাখানেক আগে। ওরা বইটে নিয়েছে—রিহার্সাল চলচে—পঞ্চানন দেখে এসেছে। আসছে শনিবারের পরের শনিবারে নাকি খুলবে বলেছে!"

অবিনাশবাবু মুখে কৃত্রিম হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "নিয়েছে? আঃ, বাঁচা গেল। আজ হ'ল কি বার? বুধবার। বুধে বুধে আট, বৃহস্পতিতে নয়, শুক্রে দশ, শনিতে এগারো। এগারো দিন পরে প্লে আরম্ভ হবে, প্রথম রজনীতে আমরা দু'জনে দেখতে যাব না? তুমি শীগ্‌গির ভাল হয়ে নাও।"

সুষমা বলিল. "দেখি চেষ্টা ক'রে!"

সুষমার বেদানার রস পান করিবার সময হইয়াছিল। উহা পান করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

অবিনাশবাবু লক্ষ্য করিলেন. তাহার মুখে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

॥ পাঁচ ॥

এই কাল্পনিক শুভসংবাদ বাস্তবিকই সুষমার ব্যাধিতে মহৌষধির কার্য্য করিল। দিন দিন সে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল।

পঞ্চাননের পরামর্শে বিজ্ঞাপনের ভয়ে বাড়ীতে সংবাদ-পত্রের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সে মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার গুরুপত্নীকে রিহার্সল-সম্বন্ধে নানা কাল্পনিক-কাহিনী বলিয়া যায়।

শুক্রবার আসিল। সুষমার জ্বর আর নাই, কিন্তু, আজিও সে অন্নপথ্য করে নাই। স্বামীকে বলিল. "ওগো আমি ত পারলাম না, তুমি কাল থিয়েটারে যাও. কি রকম অভিনয় হয়, লোকে তা কি ভাবে নেয়, জেনে এস।"

অবিনাশ বলিল, "পাগল! আমি যাব একা, 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' দেখতে? যখন যাব, দু'জনে যাব. তুমি শরীরে একটু বল পাও আগে। পঞ্চাননকে পাঠিয়ে দেবো. সে দেখে এসে বলবে প্লে কেমন ওৎরালো।"

সুষমা আর কোনও কথা বলিল না।

"প্রেমের ইন্দ্রজাল"-এর পাণ্ডুলিপি পঞ্চানন পূর্ব্বেই চাহিয়া লইয়া গিয়াছিল। উহা হইতে সে একখানি প্রোগ্রাম ছাঁকিয়া তাহা ছাপাইয়া লইল। উপরে লীলা থিয়েটারের নাম. তারপর পাত্র পাত্রীর পরিচয়. অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক—এমন কি শেষে ইংরাজি হরপে ছাপা ম্যানেজারের নামটি পর্য্যন্ত।

রবিবার প্রাতে, এই প্রোগ্রাম হাতে লইয়া সে অবিনাশবাবুর গৃহে আসিল এবং অভিনয়-সম্বন্ধে অনর্গল অনেক কাল্পনিক-কাহিনী বলিয়া গেল। এমন কি. অভিনয়-কালে একজন মাতাল পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকের গাত্রে বমি করিয়া দিয়া কি ভাবে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয় তাহাও জানাইল।

॥ ছয় ॥

তিন দিন পরে সুষমা অন্নপথ্য করিল। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, যত শীঘ্র সম্ভব ইঁহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। পূজার ছুটি হইতে সপ্তাহ মাত্র বাকী, সে সপ্তাহ অবিনাশবাবু ছুটি লইয়াছেন। শুক্রবার দিন ছিল ভাল, ঐ দিন পঞ্জাব-মেলে তিনি সস্ত্রীক চুণার যাত্রা করিলেন।

চুণারে সুষমার স্বাস্থ্য দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। দুই মাস পরে স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় অবিনাশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া সুষমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' এখনও লীলা থিয়েটারে হচ্চে?"

"না,—তারা এখন অন্য বই আরম্ভ করেছে।"

"তাইত! আমাদের যে দেখা হল না।"

"না, পেশাদারী থিয়েটারে, দেখা হল না বউ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে সখের দল আছে, লাটসাহেব কলকাতায় ফিরলেই তারা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুটে 'প্রেমের ইন্দ্রজাল' অভিনয় করবে।"

এ কথাটা সত্য—কাল্পনিক নয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে পঞ্চাননই ছিল প্রধান পাণ্ডা।

সুষমা সত্যই একদিন দ্বিতলে চিকের আড়ালে বসিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক 'প্রেমের ইন্দ্রজাল'-এর অভিনয় দেখিল। অনেক সাহেব মেম আসিয়াছেন তাহাও দেখিল। দ্বিতীয় অঙ্কে ড্রপ পড়িলে কে এক সাহেব তাহার স্বামীর সহিত করমর্দ্দন করিয়া হাসিয়া হাসিয়া কি সব কথা বলিতে লাগিলেন। তার পরেই সাহেব অন্য কতকগুলি সাহেব ও মেমের সহিত বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ী আসিয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা সে সাহেবটা কে গা? তোমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড ক'রে হাসতে হাসতে কথা কইছিল দেখলাম।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "সে সাহেব কে শুনবে? বড় কেউকেটা নয়, স্বয়ং লাট-সাহেব। তিনি যখন উঠলেন, আমাদের ভাইসচ্যান্সলার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে এই বলে পরিচয় ক'রে দিলেন—'ইনিই এই নাটকের রচয়িত্রীর স্বামী—আমাদের একজন সম্মানিত অধ্যাপক'।"

"শুনে লাটসাহেব কি বললেন?"

"বললেন, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। তোমার প্রতিভাশালিনী পত্নীকে আমার সম্মান ও অভিনন্দন জানাইও।"

ইহার পর সুষমা যখন শুনিল যে "প্রেমের ইন্দ্রজাল" কোনও দিনই লীলা থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই, প্রোগ্রামখানি পর্য্যন্ত জাল, ঐ সংবাদ তাহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সস্নেহ ষড়যন্ত্র মাত্র—তখন আর তার মনে বিশেষ দুঃখ হয় নাই।

হারানো মেয়ে

॥ এক ॥

বহুকাল পশ্চিমে সমরবিভাগে চাকরি করিয়া ৫৭ বৎসর বয়সে সারদাবাবু পেন্সন লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, জীবনের শেষ বৎসর কয়েকটা পিতৃপিতামহের ভিটায় কাটাইয়া দিবেন।

সপরিবারে দেশে ফিরিয়া, ঘর-দুয়ার কতক কতক মেরামত করিয়া, নিজ গ্রামে তিনি বসবাস আরম্ভ করিলেন, কিন্তু মনও টিকিল না, তাহার উপর ম্যালেরিয়ার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন সারদাবাবু গ্রামের বাস উঠাইয়া, কলিকাতায় আসিয়া, ভবানী-পুরে একটি দ্বিতল বাটী খরিদ করিয়া স্থায়ী হইয়া বসিলেন।

তাঁহার দুই পুত্র তিন কন্যা। বড় ছেলেটি লাহোরে চাকরি করিতেছে এবং সপরিবারে সেখানেই আছে। ছোট ছেলে লাহোর কলেজে বি-এ পড়িতেছে। বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে, সে নিজ শ্বশুরালয় লক্ষ্ণৌয়ে থাকে। ছোট মেয়ে চৌদ্দ বৎসরে পড়িয়াছে, তাহার বিবাহ এখনও দিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেজন্য সারদাবাবু গৃহিণীর নিকট নিত্য গঞ্জনা লাভ করেন।

ভবানীপুরে আসিয়া সারদাবাবু উৎসাহের সহিত আদিগংগায় প্রাতঃস্নান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সূত্রে পাড়ার আর কয়েকজন গংগাস্নানার্থী ভদ্রলোকের সংগে তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহারাও সারদাবাবুর মতই নিষ্কর্ম্মা ও পরিণত-বয়স্ক। ক্রমে পরস্পরের গৃহে যাতায়াত এবং পরিণামে সারদাবাবুরই বৈঠকখানায় আড্ডা স্থাপন হইল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বন্ধুরা একে একে আসিয়া উপস্থিত হন। সারদা-বাবু পশ্চিমে ছিলেন, টাকাও রোজগার করিয়াছেন বিস্তর, দিল্ ছিল দরিয়ার মত বিস্তৃত, আতিথ্য-বিষয়ে চিরদিন মুক্ত-হস্তই ছিলেন। এখানেও চা-চুরুট তামাক বিতরণে কার্পণ্য করা তাঁহার ধাতে সাহল না।

যে বন্ধুগুলি সংগ্রহ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একটির প্রতি সারদাবাবুর মনো-যোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার নাম ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। বয়স তাঁহার সারদাবাবুর চেয়ে দুই এক বৎসর বেশীই হইবে। তিনিও গভর্ণমেণ্টের পেন্সন-ভোগী। ঠিক পাড়ায় নয়, একটু দূরেই তাঁহার গৃহ। তথাপি এই আড্ডায় আসিয়া প্রায়ই তিনি হাজিরা দেন।

এখন, ইঁহার প্রতি সারদাবাবুর বিশেষ আকর্ষণের কারণটা খুলিয়া বলি। ভগবতী-বাবুর একটি পুত্র আছে, বছর পঁচিশ ছাব্বিশ তার বয়স। তাহার নাম কুলদাচরণ, সেই ভগবতীবাবুর একমাত্র পুত্র। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে কুলদার বিবাহ হইয়াছিল, আজ এক বৎসর কাল সে বিপত্নীক। প্রথম সন্তান প্রসব করিবার কালেই কুলদার স্ত্রী মারা যান, একটি ছেলে হইয়াছিল; সেটি সাতদিন মাত্র জীবিত ছিল। কুলদা আই-এ পাস করিয়া আপিসে ঢুকিয়াছিল, এখন প'চাত্তর টাকা বেতন পায়। আপিস ভাল, উন্নতির আশা আছে, ছেলেটি দেখিতেও ভাল, তার উপর বেশ বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র। ভবানীপুরে আসিয়াও সারদাবাবু মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন, সুবিধা মত অন্য কোন পাত্র যদি না-ই পাওয়া যায়, তবে কুলদার সংগে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন, ইহাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়।

কিন্তু ভগবতীবাবুর সাক্ষাতে এখনও এ কথা তিনি পাড়েন নাই। আরও ভাল পাত্র যদি পাই, এই আশায়, কিছুদিন কাটাইলেন। কিন্তু তেমন মনের মত পাত্র জুটিতেছে না দেখিয়া, অবশেষে ভগবতীবাবুর কাছে তিনি কথাটা পাড়িলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘটনাক্রমে অন্য কোনও বন্ধু সারদাবাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন না। ভৃত্য আসিয়া দুই পেয়ালা চা দিয়া গেল। চা-পান করিতে করিতে সারদা-বাবু ভগবতীবাবুকে বলিলেন, "চাটুয্যে-মশাই, আপনার বৌমা তো প্রায় একবৎসর হ'ল গত হয়েছেন, ছেলের বিয়ে দিচ্চেন না কেন? আমার ছোট মেয়েটিকে আপনি দেখেছেন তো! মেয়ে বড় হয়েছে, সাজবেও ভাল আপনার ছেলের সংগে। যদি মত করেন—"

ভগবতীবাবু বলিলেন, "মেয়ে ত আপনার খাসা মেয়ে। কিন্তু হলে হবে কি! ছেলের বিয়ে আমি কি ইচ্ছে ক'রে দিচ্চিনে সারদাবাবু? ছেলে রাজি হয় কই?"

"কেন, রাজি হয় না কেন? কিই বা তার বয়স! ও-বয়সে কত লোকের তো প্রথম বিবাহই হয় না।"

ভগবতীবাবু বলিলেন, "তা সে বোঝে কই বলুন! আমার ধরুন ঐ একটি ছেলে। ও যদি আর বিয়ে না করে, তা হ'লে তো বংশটাই লোপ হ'ল। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এল, ও কিছুতেই রাজি হয় না। আমি কত বোঝালাম, ওর গর্ভধারিণী কত কান্নাকাটি করলেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। দেখে শুনে আমরা তো একরকম হালই ছেড়ে দিয়েছি মশাই। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! সবই অদৃষ্ট!"—বলিয়া ভগবতীবাবু চা-পান শেষ করিয়া পাণ মুখে দিলেন।

সারদাবাবু বলিলেন, "সে বউয়ের শোকটা বড্ড বেশী লেগেছে বোধ হয় ওকে।"

"তা লেগেছে বটে। বউমা যাওয়ার পর থেকে ও মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েছে, আতপান্ন ধরেছে, একবেলা মাত্র খায়,—বলে আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেছি। ব্রহ্মচর্য্য করছে, আর পদ্য লিখছে।"

"পদ্য লেখে নাকি?"

"হ্যাঁ, বউয়ের নামে রাশি রাশি পদ্য লিখেছে। ফি রবিবারে, খেয়ে দেয়ে, খাতা পেন্সিল নিয়ে, ইষ্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে শিবপুরে কোম্পানির বাগানে যায়, সেইখানে গাছতলায় ব'সে ব'সে না কি বউয়ের জন্যে কাঁদে, আর পদ্য লেখে। এ কথা তার বন্ধুদের মুখেই আমি শুনেছি।"

সারদাবাবু বলিলেন, "ও রকম তো কতই শোনা গেছে। ঐ রকম ব্রহ্মচর্য্য-টর্য্য বেশী দিন তো টেঁকে না—শেষ কালে হয় নিজেই খুঁজে পেতে আবার বিয়ে করে, না হয় একটা কেলেঙ্কারি ক'রে বসে।"

উভয়ে নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন। অন্যান্য বন্ধুগণও একে একে আসিয়া সভাস্থ হইতে লাগিলেন।

॥ দুই ॥

উপরে বর্ণিত ঘটনার মাসখানেক পরে, এক রবিবারে কবি-ব্রহ্মচারী কুলদাচরণ আহারাদি সারিয়া যথানিয়মে খাতা পেন্সিল লইয়া, শিবপুর যাত্রা করিল।

বৃক্ষতলে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, কবিতার খাতা খুলিয়া কুলদা কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত। আজ এক ঘণ্টার উপর এই ভাবে সে বসিয়া আছে, মোটে পাঁচটি লাইন লেখা হইয়াছে, ষষ্ঠ লাইনটি দুই তিনবার লিখিয়া, কাটিয়াছে, কিছুতেই আর মনের মত হইতেছে না, এমন সময় অদূরে কোনও রমণীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল।

কুলদা চমকিয়া উঠিল। এখানে, এ সময়ে, কে স্ত্রীলোক কাঁদে? খাতা ও পেন্সিল পকেটে ভরিয়া সে চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে ছুটিল।

দুইটা মাত্র বৃক্ষের অন্তরাল পার হইয়া কুলদা দেখিল, বৃক্ষতলে একটি বাঙ্গালীর মেয়ে বসিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। মুখখানি সে দেখিতে পাইল না, হাত দুখানির রঙ বেশ ফর্সা, বস্ত্রাদি ভদ্রলোকের মেয়ের মতই। আকার দেখিয়া, মেয়েটি বালিকা না যুবতী তাহা কুলদা ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না।

নিকটে গিয়া বলিল, "এখানে ব'সে আপনি কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?"

শুনিয়া মেয়েটি মুখ হইতে হস্তাচ্ছাদন খুলিয়া, একবার মাত্র আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল। আবার সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল; তাহার কান্নার বেগ বাড়িয়া গেল।

মেয়েটির তরুণ-মুখখানি দেখিয়া কুলদা অনুমান করিল, ইহার বয়স বড় জোর তের চোদ্দ বছর, সুতরাং স্থির করিল, ইহাকে আপনি বলার কোনই প্রয়োজন নাই। আবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি কাঁদছ বল না। তোমার কিছু ভয় নেই, কি হয়েছে বল। যদি তোমার কোনও উপকার আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তা নিশ্চয়ই আমি করবো।"

তবু মেয়েটি মুখও খোলে না, উত্তরও করে না। কুলদা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে, মেয়েটি অবশেষে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি হারিয়ে গেছি।"

কুলদার প্রশ্নের উত্তরে নিজের ইতিহাস মেয়েটি যাহা বলিল তাহা এই। জন্মাবধি পিতামাতার সহিত সে পাঞ্জাবে ছিল, জলন্ধরে কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে পাঠ করিত। তাহার নাম কমলা। সম্প্রতি পিতার সহিত সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। আজ বেলা দশটার পর ষ্টীমারে পিতা তাহাকে এই বাগান দেখাইতে আনিয়াছিলেন। বেড়াইয়া বেড়াইয়া তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা পায়; তাই পিতা তাহাকে এইখানে বসাইয়া, খাবার কিনিতে বাজারে গিয়াছেন। তিন ঘণ্টা অতীত হইয়াছে, এখনও তিনি ফিরিলেন না, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন অভাবনীয় বিপৎপাত হইয়াছে।

কুলদা মনে মনে বলিল, "দেখ দেখি একবার আক্কেল লোকটার! মেড়োর দেশে থাকে কিনা—কত আর বুদ্ধি হবে? এই সোমত্ত মেয়েটাকে এখানে একলা ফেলে বাজারে গেছেন খাবার কিনতে! বাজার কি এখানে?"

মেয়েটি আবার কান্নার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া কুলদা বলিল, "তুমি কিছু ভয় কোরো না, নিশ্চয়ই তোমার বাবা আর বেশী দেরী করবেন না, এইবার ফিরবেন। চল বরঞ্চ আমরা ফটকের কাছে গিয়ে ব'সে থাকি। তিনি আসছেন দূর থেকেই আমরা দেখতে পাব। তিনিও বাগানে ঢুকতেই তোমায় দেখতে পাবেন। এস আমার সঙ্গে, কিছু ভয় নেই তোমার। তোমাকে তোমার বাবার হাতে জিম্মে ক'রে দিয়ে তার পর আমি যাব এখান থেকে।"

মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে কুলদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যাইতে যাইতে বলিল, "সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা ক'রেও বাবার যদি দেখা না পাই, তা হ'লে কি হবে আমার?"

কুলদা বলিল, "তোমার কোনও চিন্তা নেই। সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করেও যদি তাঁর দেখা না পাওয়া যায়, তোমাকে ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব, তার পর তোমার বাবার সন্ধান করবো। জলন্ধরে তোমার মাকে চিঠি লিখবো তোমার আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছেন চিঠি লিখবো।"

বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইল, মেয়েটির পিতা কিন্তু ফিরিল না। কুলদা তখন শেষ ষ্টীমারে তাহাকে কলিকাতায় আনিল, এবং বাড়ী আসিয়া তাহাকে নিজ জননীর নিকট সমর্পণ করিয়া সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে জানাইল।

জননী গোপনে একটু হাসিলেন।

॥ তিন ॥

দিয়াছেন। এক সপ্তাহ কাটিল, কিন্তু মেয়েটির পিতার কোন সন্ধান কুলদা করিতে পারিল না।

ভগবতীবাবু, হারাণো মেয়েটির পিতার খোঁজ করিবার ভার পুত্র কুলদার উপরেই

কুলদা আপিসে গেলে, দ্বিপ্রহরে সারদাবাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রায়ই কমলাকে দেখিতে আসেন।

বলা বাহুল্য কমলা সারদাবাবুরই কন্যা। সারদাবাবু ও কুলদার পিতা উভয়ে ষড়যন্ত্র

করিয়া, কমলাকে শিখাইয়া পড়াইয়া সেদিন শিবপুর বাগানে বসাইয়া অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন।

আরও এক সপ্তাহ নিষ্ফলে কাটিয়া গেলে কুলদার মাতা বলিলেন, "কমলার বাপের কোনও খোঁজ যখন পাওয়াই গেল না, কি আর করা যাবে? হাজার হোক ব্রাহ্মণের মেয়ে ত, ফেলতে ত পারবো না, এখানেই ও থাকুক। আমার তো মেয়ে নেই, ওর দ্বারাই আমার মেয়ের অভাব পূর্ণ হবে। পরে তখন একটি পাত্র দেখে-শুনে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে।"

কন্যা-মহাবিদ্যালয়ে কমলা হিন্দী ও সংস্কৃত ভালই শিখিয়াছিল। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত নাটকাভিনয়ে সে একটি মেডেল পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা সে ভালরূপ শিখিবার সুযোগ কখনও পায় নাই। জননীর অনুরোধে কুলদা তাহাকে বাঙ্গলা পড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। অন্য দিন আপিস থাকায় বেশী সময় কমলাকে সে দিতে পারে না, রবিবারে বেশীক্ষণ পড়াইয়া পোষাইয়া লয়। শিবপুরের বাগানে যাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে।

শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতাও স্থাপিত হইয়াছে বেশ দেখা গেল। আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া ছাত্রীকে না দেখিলে, কুলদার পিপাসিত-চক্ষু চারিদিকে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। আর, কমলার রান্না পাঞ্জাবী ব্যঞ্জনগুলি তাহার মুখে লাগে যেন অমৃত!

মাসখানেক পরে কুলদার জননী একদিন কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, "উনি কমলার একটি সম্বন্ধ স্থির করছেন। বরের বয়স কিছু বেশী হয়েছে—তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করবে, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু লাগবে না।"—বলা বাহুল্য ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

এই কাল্পনিক সংবাদ শ্রবণমাত্র কুলদার বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। চোখে জল আসিল। জননীকে জানাইল, অমন সুন্দরী ভাল মেয়েকে ওরকম পাত্রের হাতে কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। তার চেয়ে না-হয় অগত্যা নিজেই সে উহাকে বিবাহ করিবে।

উত্তম কথা। দিনস্থির হইল।

বিবাহের মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে কমলার পিতারও সন্ধান পাওয়া গেল। কুলদা ভাবিল, আশ্চর্য্য কথা! তিনি এই ভবানীপুরেই বাস করিতেছিলেন! এবং এ বাড়ী হইতে অধিক দূরেও নহে। জলন্ধর হইতে তাঁহার স্ত্রীও নাকি আসিয়াছেন।

কমলাকে সারদাবাবু স্বগৃহে লইয়া গেলেন। যথা দিনে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইল।

কুলদা এখন আর আতপান্ন খায় না সিদ্ধ চাউলই খাইতেছে, মাছ মাংসও ধরিয়াছে এবং দুইবেলাই উত্তমরূপে ভোজন করে। শিবপুরেব বাগানে যাওয়া এবং "পদ্য" লেখা ত পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল।

দুধ-মা

॥ এক ॥

সারকুলার রোডের উপর বৃহৎ বাগানওয়ালা ঐ যে নীলবর্ণের দ্বিতল গৃহখানি, উহা ডাক্তার ডি· ভাদুড়ীর বাসভবন, ফটকের পার্শ্বে উজ্জ্বল পিত্তল-ফলকে কালির অক্ষরে সে কথা লেখাই আছে। বিলাতী পরীক্ষায় তিনি ইংরেজি বর্ণমালার কি কি অক্ষর উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহার ফিরিস্তিসহ ইহাও প্রকাশ যে, তিনি মিন্টো মেডিক্যাল

কলেজে ধাত্রী-বিদ্যার অধ্যাপক এবং উক্ত কলেজসংলগ্ন হাসপাতালে প্রসূতি-বিভাগের বড় কর্ত্তা। এই বাড়ীখানি তাঁহার নিজস্ব নহে, ভাড়াটিয়া বাড়ী। তাই বলিয়া কলিকাতা সহরে তাঁহার নিজের বাড়ী যে নাই, এমন নহে। ইটালী পদ্মপুকুরে তাঁহার পৈতৃক বাটী রহিয়াছে, তাহা ভাড়া খাটে। বিবেকানন্দ রোডের উপর তাঁহার একখানি ত্রিতল বাটী নির্ম্মিত হইতেছে। নির্ম্মাণ শেষ হইলে উহাও আপাততঃ তিনি ভাড়া দিবেন বলিয়া প্রকাশ। নিজের বাড়ী থাকিতে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিবার কারণ এই যে, তাঁহার প্র্যাকটিস্‌টা এই অঞ্চলেই বেশী, অন্যত্র বাস করা তাঁহার ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতি-জনক হইতে পারে।

কলেজের বেতনে এবং প্র্যাক্‌টিসে ডাক্তার সাহেব প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার গৃহিণীর দুই সেট জড়োয়া গহনা এবং কোম্পানীর কাগজে লোহার সিন্দুক ভর্ত্তি। তাঁহার দুইখানা মোটরকার, সমাজে মানসম্ভ্রমও যথেষ্ট, কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই। তাঁহারও নাই, তাঁহার স্ত্রীরও নাই। তাঁহারা নিঃসন্তান, ইহাই তাঁহাদের মন স্তাপের কারণ। ডাক্তার সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তাঁহার স্ত্রী বিভাবতীর বয়স চল্লিশ, সুতরাং সন্তান হইবার আশা-ভরসাও অনেক কাল বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস, কয়েক দিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া, গরমটা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুবৃহৎ শয়নকক্ষে ঘূর্ণায়মান বিদ্যুৎপাখার নিম্নে পালঙ্কোপরি ডাক্তার-দম্পতি আরামে নিদ্রা যাইতেছেন। পশ্চিম দিকের তিনটি জানালা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, সেই জানালা দিয়া ক্ষীণ ঊষালোক প্রবেশ করিতেছে। গৃহোদ্যানের বৃক্ষশাখাবাসী কাকরা ডাকাডাকি করিতেছে, এখনও মনস্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। এমন সময় হঠাৎ ডাক্তার সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হইল—বন্ধ দ্বারে বাহির হইতে কে সঘন করসন্তাড়ন করিতেছে। "কে ?"—বলিয়া ডাক্তার সাহেব শয্যায় উঠিয়া বসিলেন।

"মা, মা, গিন্নীমা !"

বেড্‌সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া ডাক্তার সাহেব ঘড়ী দেখিলেন, মাত্র পাঁচটা। এখনও এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ঘুমাইবার কথা—অসময়ে এ কি উৎপাৎ ? বিরক্তিতে ডাক্তার সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ? ঝি ?"

উত্তর হইল—"আজ্ঞে। দোরটা খুলুন, বাবা !"

বিলাত-ফেরত ডাক্তার সাহেবের পত্নী গিন্নীমা ? মেমসাহেব নহেন ? তাঁহার পরি-চারিকা যে, সে ঝি ? আয়া নহে ? আর সেই অসভ্য ঝি প্রভুকে বলে বাবা ? হুজুর বলে না ? কিন্তু ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে। গৃহকর্ত্রী বিভাবতীর মতামত এ সব বিষয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত। তাঁহাকে কেহ মেমসাহেব বলিলে তিনি দস্তুরমত চটিয়া যান। টেবিলে বসিয়া কাঁটা-চামচ সহযোগে আহার করেন বটে, কিন্তু রাঁধে ও পরিবেষণ করে বামুন ঠাকুর। তবে তিনি যে ঘোর হিন্দু বলিয়া বা অশিক্ষিতা বলিয়া এরূপ করেন, তাহাও নহে। তিনি বেথুনে পড়া মেয়ে, দুইটা পাশ করিয়াছিলেন এবং আজিও স্বামীর সহিত ইংরাজি হোটেলে গিয়া নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস গ্রহণেও আপত্তি করেন না।

"বাবা, দোরটা একবার খুলুন।"

ডাক্তার সাহেব ইতিমধ্যে শয্যা হইতে নামিয়া চেয়ারের উপর হইতে ড্রেসিং গাউনটা লইয়া গায়ে দিয়াছিলেন। দ্বার মোচন করিয়া দেখিলেন, ঝি সোণার মা দাঁড়াইয়া ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, ভয়ে মুখ তাহার বিবর্ণ, নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে।

ডাক্তার সাহেব তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, ঝি ?"

সোণার মা রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "আজ্ঞে, ছেলে।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছেলে ? কার ছেলে ? কি হয়েছে তার ?"

এই সময় ডাক্তার-গৃহিণীরও ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা, কি হয়েছে? কি বলছে ঝি?"

"ভিতরে এসে বল্"—বলিয়া ডাক্তার সাহেব টেবিলের নিকট গিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া আসিয়া পালঙ্ক-প্রান্তে পা ঝুলাইয়া বসিলেন।

সোণার মা বলিল, "কোন্ আবাগী শতেক্‌খোয়ারী এমন কাজ করলে মা, তা ত জানিনে! একটা মরা ছেলে এনে, আমাদের সদর বারান্দায় শুইয়ে রেখে গেছে।"

গৃহিণী। মরা ছেলে? কত বড় ছেলে?

সোণার মা। আঁতুড়ের ছেলে বলেই মনে হ'ল। একবারে কচি ছেলে মা, একবারে কচি। আমি ঘুম থেকে উঠে মনে করলাম, যাই, বাসি পাটগুলো সকালে সকালে সেরে ফেলি। সদর বারান্দা ঝাঁট দেব ব'লে ঝাঁটাগাছটা হাতে ক'রে যাই সদর দরজা খুলেছি, অমনি দেখি মা, ন্যাকড়ায় জড়ানো কি একটা প'ড়ে রয়েছে। একেবারে চৌকাঠের কাছেই, আর একটু হলেই মাড়িয়ে ফেলেছিলাম আর কি! বলি, কি ওটা প'ড়ে রয়েছে? ভাল আলো ত হয়নি। তায় বুড়ো মানুষ, চোখে একটু ঝাপসা দেখি। ঝুঁকে দেখি মা, কচি ছেলের মুখ। সব্বঙ্গ ন্যাকড়ায় জড়ানো, মুখটি শুধু বেরিয়ে রয়েছে। আহা, কোন্ আবাগীর বাছা, যেন রাজপুত্তুরটি গো! নড়েও না, চড়েও না। মা গোঃ ব'লে ভয়ে আমি ছুটতে ছুটতে এলাম আপনাদিকে খবর দিতে।

ডাক্তার। মেয়ে না ছেলে কি ক'রে জানলি তুই?

ঝি। কি জানি বাবা, নারায়ণই জানেন।

ডাক্তার। নারায়ণ কেন, গা খুলে দেখলে আমরাও বুঝতে পারবো।

গৃহিণী। মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক, এ নিশ্চয় কোনও নষ্ট স্ত্রীলোকের কাজ। বিধবা-টিধবা কেউ প্রসব হয়েছে, তার আত্মীয়-বন্ধুরা গলা টিপে মেরে এইখানে ফেলে রেখে গেছে।

সোণার মা। তাই হবেক্ গো, তাই হবেক্। পুলিসে খবর দাও মা, তারা ধ'রে নিয়ে গিয়ে হারামজাদী নচ্ছার মাগীকে ফাঁসি দিক।

ডাক্তার সাহেব মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, 'উঁহু, তা নয় বোধ হয়। গলা টিপে মারেনি বোধ হয়। তা হলে মরা ছেলে রাস্তার জঞ্জালের টিনে কিম্বা কোনও পুকুরে-টুকুরে ফেলে দিয়ে যেত। ডাক্তারের বিশেষতঃ ভাদুড়ী ডাক্তারের সদরে রেখে যাবে কেন? গিন্নী, তুমি যা বলেছ, কোনও নষ্ট স্ত্রীলোক ওকে প্রসব করেছে, সে কথা সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, সে বোধ হয় জ্যান্ত—ঘুমুচ্ছে ব'লে ঝি মনে করেছে মরা ছেলে। অন্ততঃ যখন রেখে গিয়েছিল, তখন জ্যান্তই ছিল আমার বিশ্বাস। আমি যদি ওকে বাঁচাতে পারি, সেই আশাতেই বোধ হয় এ কাজ করেছে। যাই, দেখি ব্যাপারটা কি।"—বলিয়া তিনি খাট হইতে নামিলেন।

গৃহিণীও কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সোণার মাও চলিল। সে বলিতে বলিতে গেল—"আহা বাছা রে! এলি এলি অমন রাক্ষুসীর গব্ভে কেন এলি? আর কি কোথাও ঠাঁই পেলিনে?" ইত্যাদি।

ডাক্তার সাহেব সদর বারান্দায় গিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার অন্যান্য ভৃত্যেরা সেখানে গিয়া অবাক হইয়া সেই পরিত্যক্ত মানবকের পানে চাহিয়া আছে। ন্যাকড়ায় নহে, ক্রিকেট ফ্ল্যানেলে শিশু জড়ানো। ডাক্তার সাহেব কিন্তু দৃষ্টিমাত্র বলিলেন, "কে বললে মরা ছেলে? ঘুমুচ্ছে। ঐ যে নিশ্বাস পড়ছে।"—বলিয়া তিনি শিশুর আবরণ ধরিয়া তাহাকে নাড়িয়া দিলেন। শিশু তখনই চক্ষু খুলিয়া ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সকলেরই বিমর্ষ মুখে হাসি ফুটিল। সোণার মা বলিয়া উঠিল, "জয় বাবা সত্য-

নারায়ণ! জয় মা কালীঘাটের কালী!”

গৃহিণী স্বামীর হস্ত স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁগা, বাঁচবে?”

ডাক্তার বলিলেন, “তা এখন বলা যায় না। চেষ্টা ক’রে দেখতে হবে।”

গৃহিণী বলিলেন, “চেষ্টা কর গো, ওকে বাঁচাও। আমি ওকে নেবো।”

ডাক্তার সাহেব শিশুকে তুলিয়া তাঁহার ডাক্তারখানা-ঘরে লইয়া গেলেন। বহিরাবরণ খুলিলেন, উহা কাহারও পাৎলুন ছেঁড়া বলিয়া বোধ হইল। তাহার নিম্নে সুকোমল সিল্ক ফ্ল্যানেল, উহাও যেন কাহারও কামিজ বা পাঞ্জাবী ছেঁড়া। মেয়ে নয়, ছেলেই বটে; এবং বাস্তবিক সদ্যোজাতই বটে! গতকল্য দিবসে বা হয়ত রাত্রিতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকিবে। নাড়ী কাটা হইয়াছে। স্নান করানোও হইয়াছে। শিশু সমভাবেই কাঁদিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন, “খিদে পেয়েছে বোধ হয় গো, তাই অত কাঁদছে। দুধ আনাবো?”

ডাক্তার বলিলেন, “না, একটু হর্লিক তৈরি কর।”

স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া গৃহিণী জল সেইখানেই গরম করিতে লাগিলেন।

॥ দুই ॥

শিশুর পরিচর্য্যার ভার আপাততঃ সোণার মার উপরই পড়িল। সে চারি পাঁচটি সন্তানের জননী—শিশুপালনবিধি ভালরূপেই জানে। এখন দিন দুই তিন হর্লিকে চলিবে, তার পর একজন দুগ্ধবতী ধাত্রীর প্রয়োজন। হাসপাতালে যাইবার সময় স্বামীকে বিভাবতী বলিয়া দিলেন, “দেখো না গো, তোমার প্রসূতি বিভাগে যদি কাউকে পাও।”

বেলা সাড়ে এগারোটায় ডাক্তার সাহেব হাসপাতাল হইতে ফিরিলেন। পুলিসের একজন ইনস্পেক্টরও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। হাসপাতালে পৌঁছিয়াই ডাক্তার সাহেব ঘটনার বিবরণ থানায় পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ইনস্পেক্টর বিনোদবাবু তাই “এনকোয়েরি” জন্য ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আসিয়াছেন।

দ্বিতলের একটি আলো-বাতাসযুক্ত ভাল ঘরে শিশু স্থান পাইয়াছে। ডাক্তার সাহেব বিনোদবাবুকে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। শিশুর জন্য ছোট খাটে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। মাথায় তার রেশমে বোনা সুন্দর কানঝাঁপা টুপী, গায়ে সাহেবদের কচি ছেলের মত ফ্ল্যানেলের লম্বা কুর্ত্তি, পায়ে লাল উলের মোজা। পাশে সোণার মা বসিয়া আছে। ডাক্তার সাহেব ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সব কোথা থেকে এল রে? কেউ দিয়ে গেল নাকি?”

সোণার মা মাথা হেঁট করিয়া বলিল, “আজ্ঞে না, মা এ সব কম্পাউন্ডার বাবুকে দিয়ে হগ সাহেবের বাজার থেকে আনিয়েছেন।”

ইনস্পেক্টরবাবু এতক্ষণ একদৃষ্টিতে শিশুর মুখ পানে চাহিয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “রঙ ত খুব ফর্শা! হ্যাঁ মশায়, এটা সাহেবদের ছেলে নয়ত?”

ডাক্তার সাহেব। না, না, তা নয়। য়ুরোপীয়ান কচি ছেলের রঙ এর চেয়ে আরও অনেক ফর্শা হয়—একবারে ধবধবে শাদা। আঁতুড়ের ছেলের রঙ এ রকম হ’লে ক্রমে সেটা শ্যামবর্ণে দাঁড়ায়।

বিনোদবাবু। তা হ’লে আপনার মতে এ সাহেবের ছেলে নয়, বাঙ্গালীরই ছেলে?

ডাক্তার। বাঙ্গালী, কি খোট্টা, কি মাড়োয়ারী, তা কি ক’রে বলবো? তবে এর পিতামাতা দেশী লোকই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

“এতকাল আপনি ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডের চার্জ্জে রয়েছেন, আপনি ত এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।”—বলিয়া ইনস্পেক্টরবাবু পকেট-বুক বাহির করিয়া কি লিখিয়া লইলেন।

বলিলেন, "সেই ফ্ল্যানেলগুলো, যার কথা চিঠিতে আপনি লিখেছিলেন, সেগুলো কোথায় ?"

ডাক্তার সাহেবের আদেশে সে সব আনীত হইল। বিনোদবাবু সেগুলো নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "ব্যাপারটা সম্ভবতঃ সি· আই· ডি-তে যাবে। ছেলের প্রসূতিকে যদি তারা খুঁজে বের করতে পারে, তবে এইগুলোর সাহায্যেই পারবে। আর ত কোনও সূত্র পাচ্ছিনে।—আচ্ছা, আপনাদের হাসপাতাল-সংক্রান্ত কোনও স্ত্রীলোকের এ কাজ নয় ত? কোনও দেশী নার্শ কিম্বা চাকরাণী ?"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "সেটা আপনিও খোঁজ ক'রে দেখুন। হাসপাতালের কেউ যদি হয়, তবে সে আজ তার নিজের বাসায় শয্যাগত—কাজে আসেনি।"

বিনোদবাবু আবার পকেট-বুক বাহির করিয়া কি লিখিলেন! পকেট-বুক বন্ধ করিয়া বলিলেন, "এই ফ্ল্যানেলগুলো আমায় নিয়ে যেতে হবে। দয়া ক'রে কাউকে বলুন, একটা খবরের কাগজে এগুলো বেঁধে আমায় দিক।"

একজন ভৃত্য আসিয়া ডাক্তার সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিল।

যাইবার সময় বিনোদবাবু বলিলেন, "দেখুন একবার ছেলেটার অদৃষ্ট! বুড়ো মুনি-ঋষিদের কথা এই জন্যেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়—অদৃষ্টই মূলাধার। জন্মালেন কোন্ বস্তির কোন্ খোলার ঘরে, মা হয়ত বাজারের কোন্ তরকারীউলী, বড় জোর কোনও গেরস্ত বাড়ীর ঝি, বাপ হয়ত চানাচুর বেচেন কিম্বা রিক্সাই টানেন, একটা অবৈধ সংস্রবের ফলে জন্ম, এক রাত্রি যেতে না যেতেই ভানুমতীর খেলা—ভিখারীর ছেলে একেবারে রাজপুত্তুর' আপনি নিঃসন্তান মানুষ, হয়ত একে প্রতিপালন করবেন, লেখাপড়া শেখাবেন, ক্রমে বিলেত পাঠাবেন, কালে উনি হবেন হয়ত কোনও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বা সিভিল সার্জ্জন, নয়ত হাইকোর্টের জজ। কি আশ্চর্য্য কারখানা!"—বলিয়া বিনোদবাবু হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ডাক্তার সাহেবও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বিনোদবাবু, আপনি পুলিস, না কবি ?"

বিনোদ। কেন ?

ডাক্তার। আপনার কল্পনা যে রকম সুদূরগামিনী, আপনাকে কবি বলেই বোধ হয়।

বিনোদ। বরং আমাকে জ্যোতিষী বলতে পারেন—আমি জাতকের কুষ্ঠীর একটা খসড়া করে দিলাম।

এই বলিয়া ইনস্পেক্টরবাবু হাসিয়া, শিশুর গালে দুইটি অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া, খবরের কাগজে জড়ানো বমালের বাণ্ডিলটি উঠাইয়া লইয়া "গুড্ ডে ডক্টর" বলিয়া ডাক্তার সাহেবের সহিত করমর্দ্দনান্তে মস্ মস্ শব্দে প্রস্থান করিলেন।

॥ তিন ॥

ইনস্পেক্টরবাবু অদৃশ্য হইবামাত্র গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "বলি হ্যাঁগা, তুমি পুলিসে চিঠি লিখতে গেলে কোন্ আক্কেলে বল দেখি ?"

ডাক্তার। পিনাল কোড অনুসারে একটা মস্ত অপরাধ হয়েছে যে! একে বলে abandonment—শক্ত সাজা! আমি সরকারী ডাক্তার, পুলিসে খবর দিতে যে আমি বাধ্য।

গৃহিণী। ঐ সব ফ্ল্যানেল নিয়ে গেল। ঐ সূত্র ধ'রে মাকে যদি খুঁজে বের করে?

ডাক্তার। জেল হবে। এ অপরাধে সাত বছর পর্য্যন্ত জেল হতে পারে।

গৃহিণী। তা হোক। সাত বছর কেন চৌদ্দ বছর জেল হোক। কিন্তু আমার ছেলেকে ত কেড়ে নিয়ে যাবে না?

ডাক্তার সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলে নাকি ?"

গৃহিণী। ছেলে নয়? ও যে আমায় মা বলেছে।

ডাক্তার। স্বপ্ন দেখেছ?

গৃহিণী। স্বপ্ন দেখবো কেন? তখন কাঁদছিল, ঠিক যেন শব্দ শুনলাম—ও মা! ও মা! নয় রে সোণার মা?

সোণার মা। হিঁ বাবা। আমি পষ্ট শুনলাম ও মা! ও মা! ব'লে ছেলে কান্‌তে নেগেছে।

ডাক্তার। পাগল নাকি? কচি ছেলে ওয়াঁ ওয়াঁ ক'রে কেঁদেছে. তুমি শুনেছ ও মা! ও মা!

গৃহিণী। সে যাই হোক, আমি কিন্তু ওকে দিচ্ছিনে—ওর মা-ই আসুক, আর ওর বাবা-ই আসুক।

ডাক্তার। ওর মা বাবা ছেলে দাবী করতে আসবে, সে সম্ভাবনা কম। ছেলের তাদের দরকার থাকলে এখানে এসে ফেলে যাবে কেন? হ্যাঁ, ভাল কথা। ছেলেকে দুধ দেবার জন্যে একজন ধাই খোঁজার কথা হচ্ছিল ত? তা ভাগ্যক্রমে একজন পেয়ে গেছি।

গৃহিণী। ধাই কোথায় পেলে? ক'মাসের ছেলে তার? দুধ আছে ত?

ডাক্তার। ছেলে নয়, মেয়ে। প্রসবের ঘণ্টাখানেক পরেই ম'রে গেছে। সাত মাসে না আট মাসে হয়েছিল, সে কি আর বাঁচে?

গৃহিণী। তোমাদের হাসপাতালেই?

ডাক্তার। না, এসব হয়েছিল বাইরেই। মেয়ে ম'রে যাওয়ার পর, প্রসূতির অবস্থা দেখে, কাল বিকেলে তাকে হাসপাতালে দিয়ে গেছে।

গৃহিণী। হ্যাঁগা, এ ছেলে ত সাত মাসে হয়নি? এ ত বাঁচবে?

ডাক্তার। দেখে বোধ হয় এ পুরো দশ মাসে প্রসব হওয়া ছেলে।

গৃহিণী। তা হলে এ বাঁচতে পারে, কি বল? আচ্ছা, হাসপাতালের সে মাগী হিন্দু না মুসলমান?

ডাক্তার। হিন্দু। ঐ যে মোড়ে লাল রঙের গির্জ্জে, তার পাদ্রী সাহেবকে জান ত? তাঁর মেমকেও জান। সেই যে গত বছর লাট সাহেবের গার্ডেন পার্টিতে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মনে পড়ছে না?

গৃহিণী। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে আছে। মেমসাহেব তার পর একদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। আমরা দু'জনেও ত তাঁদের বাড়ী চায়ের নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম। তা, কি হয়েছে?

ডাক্তার। ছুঁড়ী সেই মেমসাহেবের আয়ার মেয়ে কিনা। পাদ্রী সাহেবের চিঠি নিয়েই ওর মা এসে ছুঁড়ীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে গেছে।

গৃহিণী। ছুঁড়ীর বয়স কত?

ডাক্তার। ১৭/১৮ হবে। প্রথম পোয়াতি বোধ হয়।

গৃহিণী। ছুঁড়ী ভাল হবে, তবে ত আসবে। কেমন আছে? কত দিন লাগবে?

ডাক্তার। আজ সকালে ত তাকে ভালই দেখে এসেছি। ওষুধ দিয়ে এসেছি। চার-পাঁচদিনে সেরে উঠবে বোধ হয়।

গৃহিণী। চার-পাঁচ-দিন: অত দিন কেবল হর্লিক খেয়ে খোকা বাঁচবে?

ইতিমধ্যেই গৃহিণী শিশুর খোকা নাম দিয়াছেন শুনিয়া ডাক্তার সাহেব হাসিলেন। বলিলেন, "কাজেই।"

গৃহিণী। তুমি ত মনে মনেই কালনেমির লঙ্কা ভাগ করছ! ভাল হয়ে ছুঁড়ী বা তার মা যদি না রাজী হয়?

ডাক্তার। মনে মনে লঙ্কা ভাগ আমি করিনি। ছুঁড়ীর মা'র সঙ্গে কথা আমার

হয়নি বটে, তবে মেমসাহেব ছুঁড়ীকে দেখতে এসেছিলেন, তাঁর সংগে কথাবার্ত্তা কয়ে রেখেছি, তিনি বলেছেন, বেশ ত। আমি কি ভাবে একটা ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছি, তাঁকে সব বললাম কিনা। শুনে তিনি বললেন, তা হ'লে এই মেয়েটাই বোধ হয় দুধ দিয়ে সে ছেলেকে বাঁচাবে, এই রকমই ঈশ্বরের বিধান। বাইবেল কোট্ করলেন। সকল জীবের আহারের ব্যবস্থা ঈশ্বরই করেন, সে বিষয়ে তাঁর কোনও ভুল-চুক হয় না—এই ভাবের একটা বচন। তোমার কথাও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে। বলেছেন, শীঘ্রই একদিন তোমার সংগে দেখা করতে আসবেন।

গৃহিণী। আহা মেমসাহেবটি বেশ। খুব আমুদে—একটুও অহঙ্কার নেই। নিজে-দের চেয়ে নেটিভদের কিছুমাত্র হীন মনে করেন না। আর, কি সুন্দর বাংলা বলেন দেখেছ ?

ডাক্তার। উনি যখন কুমারী ছিলেন, ও'র অভিপ্রায় ছিল, মিশনরী হয়ে এ দেশে আসবেন। তাই বিলাতেই রীতিমত বাংলা শিখেছিলেন। তার পর পাদ্রী সাহেবের সংগে ও'র বিয়ে হয়।

বামুন ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল, ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। দুজনে খাইতে গেলেন।

আহার সমাপ্ত হইলে, ডাক্তার গেলেন একটু বিশ্রাম করিতে। কারণ, আবার তিনটার সময় তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইবে। গৃহিণী গেলেন খোকার তত্ত্বাবধানে।

চারিদিন পরে রিক্সা করিয়া খোকার দুধ-মা আসিল, আসিয়াই খোকাকে কোলে লইয়া শুইল। নাম বলিল, ফুলটুসিয়া। সোণার মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জেরা করিয়া সারা দিনে ফুলটুসিয়ার চৌদ্দপুরুষের খবর সংগ্রহ করিয়া লইল। জাতিতে তাহারা দোষাধ, পাটনা জেলায় বাড়ী, পিতা জীবিত নাই। এখানে শিয়ালদহের নিকট তাহার মাতুল সপরিবারে বাস করে, সেখানেই সে থাকিত। কারণ, তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী জীবিত নাই। আট বছর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, স্বামী পাটনা কলেজের কোন্ সাহেবের কুঠীতে বেয়ারার কাজ করে, গত বৎসর বড়দিনের ছুটীতে সাহেবের সংগে কলিকাতায় আসিয়াছিল। পূজার বন্ধে সাহেব যদি আসেন, তবে সেও আসিবে, কিন্তু পূজার বন্ধে সাহেব বড় একটা কলিকাতায় আসেন না, মসৌরী বা সিমলা পাহাড়ে যান, তবে বড়দিনের ছুটীতে নিশ্চয় আসিবেন—প্রতি বৎসরই আসেন। ইত্যাদি।

পরদিন ডাক্তার সাহেব আসিয়া পত্নীর সহিত চা-পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, তোমার খোকার দুধ-মা খোকাকে যত্ন-টত্ন করছে ?"

গৃহিণী। হ্যাঁ, তা করছে বটে। কিন্তু—

ডাক্তার। কিন্তু কি ?

গৃহিণী। মা গো—কি কাল ছুঁড়ী, যেন আবলুস কাঠ !

ডাক্তার। জাতে দোষাধ কিনা! দোষাধ পশ্চিমে খুব ছোট জাত। তুমি বলছ মাগোঃ কি কালো—ওর স্বামী বোধ হয় ওকেই দ্যাখে রম্ভা কি তিলোত্তমা—বলিয়া ডাক্তার সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "বলছিল, ওর স্বামী তার মনিবের সংগে পুজোর বন্ধে আসতে পারে। তখন ছুঁড়ী হয়ত দশ-বারোদিনের ছুটী চাইবে—তা হ'লে তখন খোকার কি হবে ?'

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "সে ত এখন মাস দুই দেরী আছে। ছুটী যদি চায়-ই, যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

দুধ-মা খোকাকে যেরূপ যত্ন করিতে লাগিল, তাহাতে সকলেই তাহার উপর প্রীত হইলেন। ফুলটুসিয়া নামটা বড় লম্বা বলিয়া উহা সংক্ষিপ্ত করিয়া সকলে তাহাকে

ফ্লি বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ফ্লি পাঁচ বৎসর হইতেই তার মা'র সহিত কলিকাতায় আছে, বাঙ্গালীর মতই বাংলা বলিতে পারে, বরং হিন্দী বলিতেই সময়ে সময়ে তার আটকায়। খোকা তাহার দুধ খাইবে বলিয়া ডাক্তার সাহেব তাহার আহারের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তার স্নানের জন্য উত্তম সাবান ও পরিধানের উত্তম ও প্রচুর শাড়ী শেমিজ আসিল।

॥ চার ॥

কয়েক দিন পরে পাদ্রী সাহেবের মেম, বিভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার আয়াকন্যা ফ্লটুসিয়া ভাল আছে দেখিয়া খুসী হইলেন। খোকাকেও দেখিলেন, আদর করিলেন। বলিলেন, "মিসেস ভাদুড়ী, শুনিলাম, ছেলেটিকে আপনি পোষ্যগ্রহণ করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন। ইহা ভাল কথা। ছেলেটি দেখিতেও বেশ সুশ্রী। ইহার নাম কি রাখিবেন?"

বিভাবতী। ছেলে বাঁচুকই আগে, মেমসাহেব। আমাদের বাঙ্গালী প্রথা, ছ'মাস বয়সে অন্নপ্রাশন হয়, সেই সময় শিশুর নামকরণ হয়।

মেমসাহেব। উহার নাম রাখিবেন থিওডোর। থিওডোর অর্থে ঈশ্বরের দান। আপনার সন্তান ছিল না, তাই ঈশ্বর দয়া করিয়া আপনার কাছে উহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। থিওডোর ভাদুড়ী—বেশ শুনাইবে না?

বিভাবতী হাসিয়া বলিলেন, "অদ্ভুত শুনাইবে। আপনি যে নাম প্রস্তাব করিলেন, তাহার বাঙ্গালা হয় ভগবৎপ্রসাদ বা নারায়ণপ্রসাদ।"

মেমসাহেব। পুলিস ছেলেটির পিতামাতাকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে, এখনও কোন সন্ধান তারা পায় নাই, ইহা আপনার স্বামীর নিকট শুনিলাম। যদি পুলিস-তদন্তে প্রকাশ হয়, ইহার পিতা হিন্দু নয়, মুসলমান, তবে কি নাম হইবে?

বিভাবতী। তবে ইহার নাম হইবে খোদাবক্স—খোদার বক্‌শিস—মানে ঠিক থাকিবে। কিন্তু মেমসাহেব, আমরা বাঙ্গালী, উহার বাঙ্গালা নামই রাখিব।

মেমসাহেব। দেখুন মিসেস ভাদুড়ী, আমার মনে হয়, পুলিস কোনও দিন ইহার পিতামাতাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে না—ইহার জাতিকুল চিরদিন রহস্যাবৃতই রহিয়া যাইবে। কালক্রমে ইহার বিবাহাদি দিতে হইবে, হিন্দু সমাজে ইহাকে চালাইবেন কি করিয়া? আমার পরামর্শ, ইহাকে প্রভু যীশুর ভৃত্য করিয়া দিন—ইহাকে ব্যাপ্‌টাইজ্‌ করুন। বৃহৎ একটা খৃষ্টান দেশীয় সমাজ রহিয়াছে, সেই সমাজে মিশিলে ইহার বিবাহাদি সম্বন্ধে কোনও গোল থাকিবে না। এমন কি, এ যদি কোনও য়ুরোপীয় কন্যাকেও বিবাহ করিতে চায়, তাহাতেও কোন বাধা হইবে না। আমার কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন, আপনার স্বামীর সঙ্গেও পরামর্শ করিবেন। যদি ইহাকে পবিত্র খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা আপনাদের অভিমত হয়, আমার স্বামীকে জানাইলে তিনি সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ব্যাপ্‌টিজ্‌মের সময় থিওডোর নাম পছন্দ না করেন, বরং ইহার নাম দিবেন দেবপ্রসাদ—নারায়ণপ্রসাদ নাম চলিবে না! কারণ, উহা পৌত্তলিক নাম।

বিভাবতী মেমসাহেবকে চা-পান করাইয়া বিদায় দিলেন। যাইবার সময় মেমসাহেব আবার বলিয়া গেলেন, "শিশুকে যদি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আপনাদের আপত্তি না থাকে ত আমায় জানাইবেন। বড়দিনের সময় সে ব্যবস্থা করা যাইবে।"

স্বামী বাড়ী আসিলে বিভাবতী তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো, পাদ্রী সাহেবের মেম যে মাঝে মাঝে কেন আসছেন, তা এত দিনে প্রকাশ হয়েছে। তাঁর মতলব কি জান?"

"কি?"

"আমাদের সবাইকার যীশু ভজাবার চেষ্টা।"

"কি রকম?"

মেমসাহেবের সঙ্গে আজ অপরাহ্ণে তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে বিভাবতী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ঐ ছেলে বই আমাদের আর কে আছে? ছেলে খৃষ্টান হলেই আমরা দুজনেও খৃষ্টান হব, এই বোধ হয় ওঁদের ভরসা।"

ডাক্তার সাহেব শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমাদের শুদ্ধ যীশু ভজাবার চেষ্টা ওঁদের না-ও থাকতে পারে। এ রকম কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে-মেয়েকে ওঁরা খৃষ্টান ক'রে নিজেদের দল পুষ্ট ক'রে থাকেন। ভাবছেন বোধ হয়, এও ত কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে, এটাই বা হাত ফস্কে যায় কেন? কিন্তু একটা কথা মেমসাহেব যা বলেছেন, তা ঠিক। ওকে হিন্দুসমাজে চালানও ত যাবে না। আমরা যে পরামর্শ করেছিলাম, ছ' মাস বয়স হলেই ঘটা ক'রে ওর অন্নপ্রাশন দেবো, সেও ত হবে না। অন্নপ্রাশনে যে রীতিমত পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করতে হয়। আমার পূর্ব্বপুরুষ ত ওর পূর্ব্বপুরুষ নয়।"

বিভা। তবে কোন্ সমাজে খোকা এর পরে মিশবে?

ডাক্তার। কেন, ব্রাহ্মসমাজ ত রয়েছে।

বিভা। তাঁরাও শুনতে পাই, বিবাহাদি ব্যাপারে আজকাল জাত সম্বন্ধে খুঁৎখুঁৎ করেন।

ডাক্তার। কেউ কেউ। সবাই নয়।

ফলে পৌষ মাস আসিল এবং চলিযা গেল। খোকার অন্নপ্রাশনও হইল না, ব্যাপ্‌টিজমও হইল না।

॥ পাঁচ ॥

খোকা এখন এক বৎসরের হইয়াছে। ডাক্তার সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইয়াছে—এখন তার দেহকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যায়। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি। সে বিভাবতীকে মা এবং ডাক্তার সাহেবকে বাবা বলিতে শিখিয়াছে; হামাগুড়ি দিয়া এ-ঘর ও-ঘরে ক'রে, বসিতেও পারে, এইবার কোন্ দিন দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠে, তাহার পালক পিতা-মাতা সেই প্রতীক্ষায় আছেন। দুধ-মাকে খোকা বলে ফুই-মা। ফুলিই তাহাকে ইহা শিখাইয়াছে।

সম্প্রতি তাহাকে স্তনদুগ্ধ ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রাত্রিতে পাছে ফুলি গোপনে স্তন্যদান করে, এই জন্য বিভাবতী তাহাকে নিজের বিছানায় শয়ন করাইতেছেন। ফুলিকে জবাব দিবারই কথা হইতেছে, কিন্তু এখনও খোকা অর্দ্ধরাত্রিতে জাগিয়া উঠিয়া "আমি ফুই-মা যাব" বলিয়া মহা কান্না জুড়িয়া দেয়। তখন ফুলিকে জাগাইয়া খোকাকে তাহার কোলে দিতে হয়। বিভাবতী সেখানে বসিয়া থাকেন। ফুলি খোকাকে চুমো খাইয়া আদর-সোহাগ করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দেয়, বিভাবতী তখন তাহাকে আবার নিজের শয্যায় লইয়া আসেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে সোণার মা বলিয়াছিল, "দেখ গিন্নীমা, ফুলি খোকার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কয়, এমন ভাবে ওকে সোহাগ করে—যেন ও-ই ওর মা।"

বিভা বলিলেন, "তা হবে না বাছা? পাঁচদিনের ছেলেটি থেকে বুকের দুধ খাইয়ে ওকে মানুষ করলে, আপন সন্তানের মতই খোকার উপর ওর মায়া ব'সে গেছে ত!"

সোণার মা বলিল, "খোকারও ফুলির কোলে যেতে পেলে কি হাসি, কি কথা, কি আনন্দ!"

বাস্তবিক ফুলির কোলে খোকাকে দেখিলে কে বলিবে, ফুলি খোকার বেতনভোগিনী ঝি মাত্র?

খোকার বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, এই সময় জানা গেল, ফুলটুসিয়া সন্তান-সম্ভাবিতা। তখন কর্ত্তা-গৃহিণীতে পরামর্শ করিলেন, এবার উহাকে বিদায় করা আবশ্যক। কর্ত্তা বলিলেন, "সেদিন ফুলির মা এসেছিল, আশ্বিন মাসে ওর ছেলে হবে বললে, ভাদ্র মাসের গোড়াতে ওকে ত যেতেই হবে। এখন থেকেই ওকে বিদেয় করা ভাল।"

বাস্তবিক খোকা দিনদিন ফুলির যেরূপ ন্যাওটো হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতে বিভাবতীর মনে একটু যে ঈর্ষার সঞ্চার হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "ক্রমে এখন খোকার জ্ঞান হচ্ছে। এখন ঐ দোষাধের মেয়েটার সংস্রবে ওকে রাখলে, ওর মনে নানা রকম কুশিক্ষার বীজ বপন করা হবে।"

বৈশাখের মাঝামাঝি ফুলিকে বিদায় করা হইল। সে অনেক কাঁদাকাটা করিল, যাইবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না। বলিল, "খোকাকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাকবো মা? কেমন ক'রে আমার মুখে ভাত-জল রুচবে?"

বিভাবতী বলিলেন, "তোর মামার বাসা ত এখান থেকে বেশী দূর নয়, মাঝে মাঝে আসবি, খোকাকে দেখে যাবি। আর আশ্বিন মাসে তোর নিজের খোকা হবে, তখন তাকে পেয়ে এ খোকাকে ভুলতে পারবি।"

খোকার জন্য নূতন ঝি রাখা হইল। প্রথম কয়েক দিন ফুলির জন্য খোকা খুব হেদাইল, রাত্রিতে "ফুলি-মা যাব" বলিয়া বায়না ধরিল। ডাক্তার সাহেব তাহাকে প্রত্যহ নূতন নূতন খেলানা আনিয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে খোকা ফুলিকে ভুলিল।

ফুলি মাঝে মাঝে খোকাকে দেখিতে আসে, তাহাকে কোলে করে—আদর করে। এক এক দিন সমস্ত দিন এইখানেই কাটাইয়া যায়। ক্রমে তাহার প্রসবকাল যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার আসাও তত কমিতে লাগিল।

আশ্বিন মাসে পাদ্রী সাহেবের আয়া আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, ফুলির একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে। আরও বলিল, তার জামাইয়ের মনিব কলিকাতার কলেজে বদলি হইয়া আসিতেছেন, জামাই এখন কলিকাতাতেই থাকিবে।

খোকার নূতন ঝি খোকাকে বেশ যত্ন করে। বিকালে ঠেলাগাড়ীতে তাহাকে পার্কে বেড়াইতে লইয়া যায়। কোনও কোনও দিন খোকা পিতা-মাতার সহিত বিকালে মোটরে হাওয়া খাইয়া আসে। এখন তাহার বেশ কথা ফুটিয়াছে।

ফুলির ছেলে তিন মাসের হইলে তাহাকে কোলে লইয়া ফুলি একদিন বেড়াইতে আসিল। ছেলেটি ফুলির চেয়েও এক পোঁছ কাল হইয়াছে, বোধ হয় পিতৃগুণে। ডাক্তার-গৃহিণী তাহাকে দুইটি টাকা এবং কয়েকটা কমলালেবু উপহার দিলেন।

॥ ছয় ॥

ফাল্গুন মাসে সহরে বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা দিল। ডাক্তার সাহেব পরিবারস্থ সকলকে, মায় ঝি-চাকরকে পর্য্যন্ত, টীকা দিলেন।

কয়েক দিন পরে খোকা কিন্তু জ্বরে পড়িল। তিন দিন পরে তাহার উদরে, মুখে ও গালে গুটিকা-চিহ্ন দেখা দিল। পরদিন আর সংশয় রহিল না যে, খোকা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

খোকার ঝি পলায়ন করিল। ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, "দশ এগারো মাস প্রতি-

পালন করিল, এত দিনেও খোকার প্রীতি মনে তাহার দয়া-মায়া স্নেহ-মমতা কিছুই কি জন্মিল না? আশ্চর্য্য!"

সোণার মা'র কথায় জানা গেল যে, খোকার পলাতকা ঝি ইদানীং অপরাহ্নে সব দিন খোকাকে পার্কে বেড়াইতে লইয়া যাইত না, গোপনে নিজেদের বস্তিতে লইয়া যাইত এবং সেখানে কোনও কোনও দিন খোকাকে মুড়ি, ফুলুরি কিনিয়াও খাওয়াইত। জ্বরে হইবার দুইদিন পূর্ব্বেও এরূপ করিয়াছিল। এত দিন এ কথা প্রকাশ করে নাই বলিয়া সোণার মা যথেষ্ট তিরস্কৃত হইল।

হাসপাতাল হইতে নার্স আসিল। চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা রীতিমতই চলিতে লাগিল। তথাপি রাত্রি-দিন খোকার কাছে থাকিবার জন্য একজন ঝির অভাব অনুভূত হইল।

পাছে তাহাকেই এই কার্য্যে নিয়োগ করা হয়, সম্ভবতঃ এই ভয়েই সোণার মা বলিল, "ফুলিকে ডেকে পাঠাও না। সে শুনলে এখনই ছুটে আসবে।"

ডাক্তার-দম্পতিও বিবেচনা করিলেন, ফুলি খোকাকে যেরূপ ভালবাসিত, এ সংবাদ শুনিলে সে বোধ হয়, না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।

হইলও তাহাই। জননী ও স্বামীর নিষেধ ও প্রবল বাধা সত্ত্বেও ফুলি তাহার পুত্রকে মাতুলানীর নিকট রাখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং সজল-নয়নে খোকাকে কোলে লইয়া বসিল।

অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা সত্ত্বেও খোকা বাঁচিল না।

গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বিভাবতী শয্যা লইলেন, কিন্তু ফুলির সে কি কান্না! "ওরে আমার ধন রে, আমার বুকের কল্‌জে রে, আমায় ছেড়ে তুই কোথায় চ'লে গেলি রে?" ইত্যাদি শুনিয়া পাষাণও যেন বিগলিত হইতে চাহিল।

॥ সাত ॥

সৎকারের এখন কি ব্যবস্থা হয়? কম্পাউণ্ডারবাবুকে তাহার আয়োজনে পাঠাইয়া ডাক্তার সাহেব একটা ইজি-চেয়ারে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, পাদ্রী সাহেব আসিয়াছেন।

ডাক্তার সাহেব একটু বিরক্ত হইয়াই নীচে নামিয়া গেলেন। ফুলি তখনও মাঝে মাঝে ডুক্‌রাইয়া ডুক্‌রাইয়া কাঁদিতেছে।

"ঈশ্বর দিয়াছিলেন, ঈশ্বরই লইলেন, তজ্জন্য শোক করা বৃথা" ইত্যাদি কয়েকটি প্রচলিত সান্ত্বনা-বাক্যের পর পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "ডাক্তার ভাদুড়ী, আপনার নিকট আমার একটি আবেদন আছে।"

ডাক্তার। কি, বলুন।

পাদ্রী। শিশুর মৃতদেহটি আমাকে দান করুন, আমি উহা খৃষ্টধর্ম্মের সকল অনুষ্ঠান অনুসারে সমাধিস্থ করিব।

ডাক্তার। তাহাতে আপনার লাভ? জীবিত থাকিলে উহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে আপনার লাভ—অর্থাৎ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পালনের সন্তোষ লাভ হইতে পারিত, ইহা আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু মৃতদেহকে খৃষ্টীয় প্রথায় সমাধিস্থ করিয়া কি ফল হইবে? আমি এতদিন উহাকে সন্তানবৎ পালন করিয়াছি, আমি খৃষ্টান নহি, উহাকে খৃষ্টীয় প্রথায় সমাধিস্থ করিতে দিতে আমার আপত্তি আছে। জনক না হইলেও, আমি উহার পিতা।

পাদ্রী সাহেব দৃষ্টি অবনত করিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি উহার পিতামহ।"

ডাক্তার সাহেব পরম বিস্ময়ে, উচ্চ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কি বলিতেছেন আপনি?"

পাদ্রী। বলিতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু না বলিলেও নয়। আপনি আমার পুত্র জোসেফকে দেখিয়াছেন?

ডাক্তার। আমি গত বৎসর আপনার আলয়ে চা-পানের নিমন্ত্রণে গিয়া আপনার এক পুত্রকে দেখিয়াছিলাম, বছর কুড়ি বাইশ বয়স।

পাদ্রী। সেই। সেই দুশ্চরিত্র কুলাঙ্গারই ঐ পুত্রের জনক।

ডাক্তার। আর, জননী?

পাদ্রী। যাহাকে আপনি শিশুর দুধ-মা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই হতভাগিনী বালিকা।

এই সময় দ্বিতল হইতে ক্রন্দনের শব্দ আসিল—"ওরে আমার সোণা রে, আমার মাণিক রে, তোর ফুলিমাকে ছেড়ে তুই কোথায় গেলি রে!"

পাদ্রী সাহেব বলিতে লাগিলেন, "Poor Girl ! Poor Girl !"

ফুলির আচরণ, শিশুর গাত্রবর্ণ-রহস্য, ডাক্তার সাহেবের নিকট দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া গেল।

তাহার পর পাদ্রী সাহেব যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই।—ব্যাপারটা জানাজানি হইলে মেমসাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাঁহার আয়ার ইচ্ছা, ফুলির গর্ভ নষ্ট করা, কারণ, জামাতা আসিয়া শিশুর গাত্রবর্ণ দেখিয়া কখনই বিশ্বাস করিবে না যে, শিশু তাহারই ঔরসজাত—বিশেষ যখন ফুলির মা সাহেবের বাড়ীতে চাকরী করে এবং ফুলিরও সেখানে যাতায়াত আছে। পাদ্রী সাহেব তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, খপরদ্দার, উহা পাপের উপর মহাপাপ। ওরূপ করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি পুত্রের কলঙ্কভয় এবং লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তখনই পুলিসে সংবাদ দিবেন। আয়া বলিয়াছিল, "আমার জামাই আসিয়া ছেলে দেখিলে তখনই আমার মেয়েকে পরিরত্যাগ করিবে, তাহার উপায়?" তাহাতে পাদ্রী সাহেব আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যাহা হউক একটা সুব্যবস্থা তিনি করিয়া দিবেন। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে ফুলির মাতা শিশুকে আনিয়া এই বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিল, কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নিঃসন্তান ডাক্তার ভাদুড়ী উহাকে পাইয়া যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবেন, এবং কার্য্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই। শিশুর জন্য একজন দুধ-মা আবশ্যক হইবে বুঝিয়াই ফুলিকে ডাক্তার সাহেবের হাসপাতালেই পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নচেৎ হাসপাতালে দিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আয়া তাহার কন্যাকে শিখাইয়া দিয়াছিল, তোর ছেলে হইয়াছিল না, বলিস মেয়ে হইয়াছিল, তাহা হইলে তোর সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইবে না। আর বলিল, দশ মাসে হয় নাই, আট মাসে হইয়াছিল। তাহা হইলে জামাইও কোন অন্যায় সন্দেহ করিতে পারিবে না।

এই সকল বিবরণ শেষ করিয়া পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "দেখুন পাপে ঐ শিশুর জন্ম। আমরা উহাকে ব্যাপ্‌টাইজ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাও তখন আপনি দিলেন না। এখনও উহার আত্মা প্রভু যীশুর শরণ লইলে অনন্ত নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবে—ইহাই আমি বিশ্বাস করি। সেইজন্যই আমার কর্ত্তব্য উহাকে খৃষ্টধর্ম্ম অনুমোদিত অনুষ্ঠানের সহিত সমাধিস্থ করা।"

ডাক্তার সাহেব সম্মত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সে পুত্র জোসেফ এখন কোথায়?"

পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "এ ব্যাপার ধরা পড়িবার পর আমরা তাহাকে বহু তিরস্কার করি এবং গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতে চাহি। অবশেষে উহার জননীর একান্ত

অনুরোধে উঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছি। এখন সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিভিনিটি অধ্যয়ন করিতেছে, কালক্রমে ধর্ম্মযাজক হইবে।"

ডাক্তার সাহেব মনে মনে বলিলেন, "ছেলের দুষ্কৃতির তবে ত খুব কঠোর শাস্তি-বিধানই হইয়াছে!" প্রকাশ্যে অবশ্য কিছু বলিলেন না।

পাদ্রী সাহেব বিদায় লইয়া গির্জ্জায় গিয়া লোকজনসহ একটা শবাধার পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন মৃতদেহ যথারীতি সমাধিস্থ করা হইল।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, কবরের শিরোদেশে মার্ব্বেল-পাথরে ক্ষোদিত কতকগুলি ইংরাজী কথা লিখিত রহিয়াছে—তাহার অনুবাদ এই—"নামহীন গোত্রহীন দুই বৎসর সাত মাস বয়স্ক শিশু, প্রভু যীশুর কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিল।"

পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর

নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের জমিদার পরলোকগত শ্রীযুক্ত শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে চন্দ্রমোহন নামক একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক পাকশালার সহকারীরূপে নিযুক্ত ছিল। ছেলেটি বড় চালাক, চতুর ও মিষ্টভাষী বলিয়া বাটীর সকলেই তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সে মুহুরিদের সাধ্যসাধনা করিয়া দুই চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়াছিল। অতঃপর তাহার মনে গ্রন্থকার হইবার উচ্চাভিলাষ জাগিতে লাগিল। খানকতক কাগজ সংগ্রহ করিয়া, চন্দ্রমোহন পুস্তকাকারের একখানি দিব্য খাতা সিলাই করিল। ভিতরে প্রথম পাতায় ধরিয়া ধরিয়া বড় বড় করিয়া অ আ লিখিল। পরের পাতায় আর একটু ছোট ছোট করিয়া ক খ লিখিল; তাহার পর কর, খল না লিখিয়া দুই অক্ষরে ঐরূপ অন্য অন্য কথা—কল, খগ,—ইত্যাদি লিখিল; এইরূপে বদলাইয়া বদলাইয়া অর্থযুক্ত ও অর্থবিহীন অসংযুক্ত বর্ণ শব্দরাশি স্থানে স্থানে সন্নিবন্ধ করিল। পাড়ার ছেলেগুলার নাম করিয়া, কে ছুরিতে পা কাটিয়া ফেলিয়াছে, কাহার পড়িবার বই নাই, কে পাঠশালায় যায় না, কে তিন দিনে নূতন বহি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, কে-ই বা তাহা যত্ন করিয়া পড়িয়া শেষে ছোট ভাইয়ের কাজে লাগাইয়া দেয় কে বাড়ীতে আসিয়া নানারূপ উৎপাত করে, কে "লক্ষ্মী" হইয়া পড়াশুনা করে,—ইত্যাদি সমসাময়িক ইতিহাসে পাঠের পর পাঠ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। পুস্তকের শেষে ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত অঙ্ক এবং উপরে প্রত্যেকের নাম, তাহারও ত্রুটি হইল না। এইরূপে প্রথমভাগ রচনা শেষ হইল। মলাটের উপর স্বীয় চিত্রবিদ্যার অপূর্ব্ব নমুনা রাখিযা বর্ডার প্রস্তুত করিল। তাহার পর যথাস্থানে লিখিল—"বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ —চন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগব প্রণীত।' বুঝি তাহার ধারণা ছিল, প্রথমভাগ লিখিতে পারিলেই বিদ্যাসাগর উপাধি গ্রহণের অধিকার জন্মে! একদিন একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— "প্রথমভাগে ঐ যে গোপালেব, রাখালের কথা লেখা আছে, ও সব কি সত্যি?" সে বলিল —"সত্যি না আরো কিছু! ও সব বানানো।" সেই অবধি সে মনে করিত, আমার প্রথমভাগে সমস্তই সত্যকথা রহিল, তবে আমার খানিই ভাল।

একদিন কেমন করিয়া এই গ্রন্থকার-বালকের প্রথম উদ্যমখানি কর্ত্তাদের চোখে পড়িল। তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া হাসিয়াই আকুল হইলেন। বাটীর সকলে একত্র হইযা এই অপূর্ব্ব প্রথমভাগ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন,—"বাঃ চন্দোর! তুই রাতারাতি যে বিদ্যেসাগর হয়ে গেলিরে!" সকলে পরামর্শ করিলেন, এবার অবধি ইহাকে বিদ্যাসাগর নাম দেওয়া যাক্। প্রথমে যুবকেরা তাহাকে অবিশ্রান্তভাবে বিদ্যাসাগর বলিতে লাগিল; পরে বালকেরাও তাহাই ধরিল; ক্রমে কর্ত্তারা, মহিলারা, ধরিলেন। অবশেষে কর্ম্মচারিবর্গ, দাসদাসী, পাড়াপ্রতিবেশী, সকলেই চন্দ্রমোহনকে বিদ্যাসাগর বলিতে লাগিল। পাঁচ সাত বৎসর পরে, তাহার পূর্ব্বনামের চিহ্নমাত্রও সে গ্রামে রহিল না; নবজাত বালকবালিকারা সে পুরাতন নামের কোন সংবাদই পাইল না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে শিবদাসবাবু একবার সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। এখন "বিদ্যাসাগর" তাঁহার প্রধান পাচক, সেও সঙ্গে আসিল।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়েব সহিত শিবদাসবাবুর সম্প্রীতি ছিল। কলিকাতায় আসার কিয়দ্দিন পরেই, শিবদাসবাবুর সাদর আহ্বানে তাঁহার আবাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শুভাগমন হইল। কর্ত্তা গোপনে সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন— আজ আসল বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন, খবরদার কেহ যেন আজ চন্দ্রকে বিদ্যাসাগর বলিয়া ডাকিও না। গৃহিণী ঠাকুরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম ভৃত্য বালকটাকে পর্য্যন্ত শিবদাসবাবু স্বয়ং বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। সকলে বিশেষ চেষ্টা করিয়া

কিছুক্ষণ চন্দ্রমোহনকে চন্দ্রমোহন বলিয়াই ডাকিল; কিন্তু শেষে আর রাখিতে পারা গেল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাঝে মাঝে, এ ঘর ও ঘর সে ঘর হইতে "বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর" শব্দ শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠেন, তাহার অব্যবহিত পরেই শব্দ আসে, "চুপ্ চুপ্ চুপ্।" আবার শুনিতে পান—"ও বিদ্যেসাগর! ডালে নুন হয়নি কেন?" "ও বিদ্যেসাগর! হাত চালিয়ে নাও না, হাঁ করে কি দেখছ!" "ও বিদ্যেসাগর! পায়েসটায় যে ধোঁয়ার গন্ধ বেরিয়েছে"—আবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আসে—"চুপ্ চুপ্ চুপ্।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ত কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। লজ্জায় কাহাকেও জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। অবশেষে এই মহাপুরুষেরও লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিল। অতিমাত্র কৌতূহলী হইয়া তিনি স্মিতমুখে শিবদাসবাবুকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবদাসবাবু হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বের ইতিহাস সবিস্তারে নিবেদন করিলেন —শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রচুর হাস্য করিতে লাগিলেন। আহারাদি শেষ হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই ত্রস্ত সঙ্কুচিত পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিয়া আপনার সম্মুখে বসাইলেন। বলিলেন—"তা বেশ হয়েছে, তুমিও বিদ্যেসাগর, আমি বিদ্যেসাগর, আজ অবধি তুমি আমার মিতে হলে।" সেই পাচক ব্রাহ্মণের সহিত প্রতিবেশীবন্ধুর মত তিনি আলাপ করিতে লাগিলেন—তাহার ঘরের সংবাদ লইলেন, তাহার সুখদুঃখের কাহিনী অবগত হইলেন। চন্দ্রমোহনকে লইয়া গিয়া ছাপাখানায় তিনি একটা চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী চন্দ্রমোহনের প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন না—সে সেখানে থাকিতে পারে নাই।

শাহাজাদা ও ফকিরকন্যার

প্রণয়-কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পারস্যদেশে প্রাচীনকালে এক মহা প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বাদশাহের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিল। আসন্নকাল উপস্থিত হইলে বাদশাহ নিজ ভ্রাতাকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া কহিলেন—"ভ্রাতঃ, আমি ত চলিলাম। আমার পুত্রটি অতি শিশু। যতদিন পর্য্যন্ত সে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহার স্থানে তুমিই রাজ্য কর। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণের মুখ যাহাতে উজ্জ্বল হয়, এইরূপ দয়া-ধর্ম্ম সহকারে প্রজাপালন করিতে থাক। আর আমার পুত্রটি শাস্ত্রপাঠ, অস্ত্রশিক্ষা, ব্যায়ামাদি বিষয় প্রভৃতি রাজোচিত সমস্ত বিদ্যায় যাহাতে পারদর্শী হইতে পারে, তাহার জন্যও তুমি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া, উহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিবে।"—ইত্যাদি প্রকার কহিয়া, আত্মীয় স্বজনগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বর ও মোহম্মদের পদে মন সমর্পণ করিয়া, তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ছোট ভাই বাদশাহ হইলেন, শাহজাদা যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন। নূতন বাদশাহ পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যুবরাজের শিক্ষা দীক্ষার বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু বাদশাহ হুকুম করিলেন—"যুবরাজ সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকিবেন, বাহিরে আসিতে পাইবেন না।"

শাহাজাদা দিন দিন শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বিচক্ষণ মৌলভিগণের যত্নে নানা শাস্ত্রে ও নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার যৌবনাবস্থা উপনীত হইল। তখন তিনি মাঝে মাঝে মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন, পিতৃব্য-কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে, এই সমগ্র রাজ্যের আমি অধীশ্বর হইব, পরম সুখে কালহরণ করিতে পারিব। কিন্তু পিতৃব্য যুবরাজের বিবাহ বা রাজ্যাভিষেকের কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। পরলোকগত বাদশাহের একটি অতি বিশ্বস্ত হিন্দুস্থানবাসী ভৃত্য ছিল, তাহার নাম মুবারক। সে সর্ব্বদা রাজপুত্রের নিকট অবস্থিতি করিত এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। একদিন রাজপুত্র মুবারকের নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"দেখ, একজন রাজভৃত্য আমাকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া মুবারক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নানাপ্রকারে রাজপুত্রকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহাকে লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বলিল। বাদশাহ দোষী ভৃত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া রাজপুত্রকে মিষ্ট কথায় অনেক সান্ত্বনা দিলেন। আরও বলিলেন—"শীঘ্রই তোমার বিবাহ দিব।" মুবারক শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। বলিল—"প্রভু, তবে আর বিলম্ব কেন? নজুমী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া দিন স্থির করিতে আজ্ঞা হয়।" বাদশাহ বলিলেন —"আমি কল্যই জ্যোতিষী পণ্ডিতগণকে আনাইয়া এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব।"

অতঃপর একজন বিশ্বস্ত রাজভৃত্য গিয়া পণ্ডিতগণকে কহিল—"দেখ, বাদশাহ কল্য প্রকাশ্য-সভায় তোমাদিগকে যুবরাজের শুভ বিবাহের জন্য দিন স্থির করিতে বলিবেন। তোমরা বলিবে যে, এখন এক বৎসর বিবাহের দিন নাই। এইরূপ বলিলেই বাদশাহ সন্তুষ্ট হইবেন, নতুবা তোমাদের বিপদ।"

পরদিন যথাসময়ে প্রকাশ্য-দরবারে পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেন। মুবারকও রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিয়া বসিল। প্রশ্নমত পণ্ডিতগণ কহিলেন—"শাহানশাহ, আমরা গণনা করিয়া দেখিতেছি, এখন এক বৎসরকাল বিবাহের কোনও শুভ দিন নাই।" ইহা শুনিয়া কপটী বাদশাহ মৌখিক দুঃখপ্রকাশ করিলেন। মুবারককে বলিলেন— "শুনিলে ত মুবারক, এখন এক বৎসর দিন নাই। কি করা যাইবে, এখন এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। তুমি যুবরাজকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও, যুবরাজ এখন মন দিয়া লেখা পড়া করুন। এক বৎসর পরে বিবাহ দিয়া তাঁহার পৈত্রিক গদী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকল আমীর ওমরাহগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বর্ত্তমান বাদশাহের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা, যুবরাজ পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতার ন্যায় রাজ্যপালন করেন। বাদশাহ সকলের এই মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলেন না।

এইরূপে কিছুদিন যায়। একদিন মুবারক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে যুবরাজের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া যুবরাজ অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন—"মুবারক দাদা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? কি হইয়াছে আমায় বল; তোমার কোনও অমঙ্গল হয় নাই ত? তোমাকে কেহ কি অপমান করিয়াছে? কি হইয়াছে আমায় খুলিয়া বল।"

মুবারক কহিল—"যুবরাজ, তোমায় সে দিন বাদশাহের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে মহা বিপদের সূচনা হইয়াছে। হায় হায়, যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তাহা হইলে এমন কার্য্য করিতাম না।"

যুবরাজ শঙ্কাকুল হইয়া কহিলেন—"কেন মুবারক, কি বিপদ হইয়াছে?"

মুবারক বলিল—"সে দিন তোমাকে রাজসভায় দেখিয়া, আমীর, ওমরাহ, রাজকর্ম্মচারী, সৈন্যগণ, সাধারণ প্রজাবর্গ,—সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। বৎসরান্তে

"তুমি রাজা হইবে শুনিয়া সকলেই পুলকিত। সকলেই বলিতেছে—আহা, আমাদের স্বর্গগত বাদশাহ পরম দয়াবান ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজ-সিংহাসন পাইলে আবার রাজ্যের সেইরূপ সুখ সম্পদ হইবে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তোমার পিতৃব্য রোষে ও হিংসায় জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'মুবারক, তুমি যদি কোনও মতে যুবরাজকে মারিয়া ফেলিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব।' শুনিয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করিলে সমূহ বিপদ, সেই কারণে কপটতাপূর্ব্বক বলিলাম—'বাদশাহ, ইহা আর শক্ত কথা কি—আমি অনায়াসেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া দিব। তবে উপায় স্থির করিতে কিছু সময় লাগিবে।' বাদশাহ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বিদায় দিয়াছেন।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া যুবরাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মুবারকের পদে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মুবারক দাদা, কিরূপে আমার প্রাণ বাঁচিবে?"

মুবারক বলিল—"ভয় কি, ঈশ্বর আছেন। আমি কোনও উপায় করিব। তুমি কাতর হইও না।"

নানাপ্রকারে যুবরাজকে সান্ত্বনা দিয়া মুবারক কহিল—"আমার সহিত এস, তোমাকে একটি গুপ্ত বিষয় দেখাইব।"

বিস্মিত হইয়া রাজপুত্র মুবারকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যেখানে স্বর্গীয় বাদশাহ সর্ব্বদা উপবেশন করিতেন, সে মহাল এখন বন্ধ ছিল। সেই মহালে উপস্থিত হইয়া, মুবারক ভিতরে প্রবেশ করিল। স্বর্গীয় বাদশাহ যে কুর্শীখানিতে উপবেশন করিতেন, সেই রত্নাসনখানিকে মুবারক বহু সম্মানে সেলাম করিল। তৎপরে, সেই কুর্শীর দক্ষিণ দিকে মেঝের একটি তক্তা ধরিয়া টান দিল। টান দিবামাত্র সেখানি সরিয়া গেল এবং নিম্নে ভূগর্ভে সোপানাবলী নামিয়া গিয়াছে দেখা গেল। যুবরাজ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কি মুবারক?" মুবারক বলিল—"ইহা তোমার পিতার গুপ্ত গৃহ। আমার সঙ্গে নামিয়া আইস।" বলিয়া মুবারক সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, যুববাজও পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলেন।

ভিতরে গিয়া রাজপুত্র দেখিলেন, চারিদিকে চারিটি কামরা আছে। প্রত্যেক কামরায় দশটি করিযা কলসী, সোণার শিকলে বাঁধা, কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতেছে। প্রত্যেক কলসীর মুখে একখানি করিয়া সোণার ইট রাখা আছে। ঊনচল্লিশটি কলসীতে, সোণার ইঁটের উপর একটি করিয়া কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত বানরমূর্ত্তি বসানো আছে, কেবল একটিতে নাই। যে কলসীতে বানর নাই, তাহার মুখ খুলিয়া শাহজাদা দেখিলেন, সেটি মোহরে পরিপূর্ণ। অন্য কলসীগুলি শূন্য। এই সমস্ত দেখিযা যুবরাজ বিস্ময়ে মুবারককে জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা এ সব কি?"

মুবারক বলিল—"জিনিদৈত্যগণের রাজা মালেক সাদেক তোমার পিতার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। প্রতি বৎসর একদিন করিয়া তিনি তোমার পিতার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে আসিতেন। এই ভূগর্ভস্থিত কক্ষগুলিতে তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিতেন। যাইবার সময় তোমার পিতা, মালেক সাদেককে এক কলসী মোহর উপহার দিতেন, মালেক সাদেক তোমার পিতাকে একটি করিয়া ভৌতিক প্রস্তর নির্ম্মিত বানর দিয়া যাইতেন। এই বানরের আশ্চর্য্য গুণ এই যে, যদি কোনও ব্যক্তি এইরূপ চল্লিশটি বানর পায়, তবে পৃথিবীতে আর তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। ঊনচল্লিশ বৎসর মালেক সাদেক যাতায়াত করিয়াছিলেন,—এই ঊনচল্লিশ ঘড়া মোহর তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও ঊনচল্লিশটি বানর দিয়াছেন। পর বৎসর আসিলে তাঁহাকে দিবার জন্য এক ঘড়া মোহর এইখানে রাখা আছে। ইতিমধ্যে তোমার পিতার মৃত্যু হইল। নহিলে

চল্লিশটি বানর পূর্ণ হইত, এবং ক্ষমতায় তোমার পিতা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইতেন। কিন্তু একটি কম বলিয়া এ সকল বানরের দ্বারায় কোন কার্য্যই হইবে না।"

রাজকুমার কহিলেন—"তবে ত সকলই ব্যর্থ হইল।"

মুবারক বলিল—"ব্যর্থ বৈ কি। আমি মনে করিতেছি—এখানে যখন তোমার এখন মহা বিপদ, তখন এখান হইতে তোমার পলায়ন করাই শ্রেয়স্কর। মালেক সাদেকের নিকট গিয়া, তোমাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে সকল কথাই বলি। তোমার পিতার প্রতি পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি তোমার সহায় হইতে পারেন। তোমাকে সকল বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করিতে পারেন। এক কলসী মোহর যাহা রাখা আছে, লইয়া গিয়া তাঁহাকে উপহার দেওয়া যাইবে। যদি শেষ বানরটি তিনি তোমায় দেন, তবে তোমার তুল্য নরপতি ধরাধামে কেহ থাকিবে না।"

শাহজাদা বলিলেন—"কিরূপে আমরা পলায়ন করিব?"

মুবারক বলিল—"তাহার জন্য কোনও চিন্তা নাই। সে উপায়ও আমি স্থির করিয়াছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই কথোপকথনের কয়েক দিন পরে, মুবারক একদিন রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল—"প্রভু, আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার একটি উপায় আমি স্থির করিয়াছি।"

বাদশাহ প্রীত হইয়া কহিলেন—"কি উপায় স্থির করিয়াছ?"

মুবারক বলিল—"যুবরাজকে যদি এখানে হত্যা করা যায়, তাহা হইলে লোকের মধ্যে ক্রমে জানাজানি হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে আপনার বিলক্ষণ অপযশ আছে। তাহা অপেক্ষা দেশভ্রমণের ছলে তাঁহাকে দূরদেশে লইয়া গিয়া হত্যা করাই নিরাপদ। ফিরিয়া আসিয়া রটনা করিয়া দিব যে, তিনি কোনও মারাত্মক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে প্রজাবর্গের এবং অপর কাহারও কোন সন্দেহের কারণ থাকিবে না।"

এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া বাদশাহ বলিলেন—"মুবারক, তুমি যথার্থই বলিয়াছ। যাও, যুবরাজকে লইয়া গিয়া, কোনও দূরদেশে কার্য্য শেষ কর। তাহা হইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পারিব এবং তোমাকেও পুরস্কার স্বরূপ প্রভূত ধনসম্পদ প্রদান করিব।"

মুবারক, দূরদেশে যাইবার ব্যয় এবং নিজ পুরস্কারের অর্দ্ধাংশ পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া, বাদশাহকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। সঙ্গে সৈন্য সামন্ত বা ভৃত্যাদি কেহই যাইবে না। মুবারক বাজার হইতে মালেক সাদেকের জন্য বিবিধ বহুমূল্য উপহারাদি ক্রয় করিল। ভূগর্ভস্থ সেই এক কলসী মোহর উঠাইয়া লইয়া, শুভদিন দেখিয়া, যুবরাজসহ যাত্রা করিল। দুইজনে দুইটি উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, ক্রমাগত চল্লিশ দিন গমন করিল।

সে দিন চলিতে চলিতে ক্রমে রাত্রি হইল, অন্ধকার হইয়া আসিল। রাত্রি এক প্রহর হইলে মুবারক বলিল—"খোদাতালাকে ধন্যবাদ, এতদিনের পর আমরা জিনদৈত্যের দেশে পৌঁছিয়াছি।"

শাহজাদা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কই?"

মুবারক বলিল—"এই যে,—এত আলো জ্বলিতেছে, এত লোকজন যাতায়াত করিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, পথ, বাগান, ঘরবাড়ী, ইহাই জিনদৈত্যপতি মালেক সাদেকের রাজধানী।"

রাজপুত্র বলিলেন—"মুবারক দাদা! আমার সহিত কৌতুক কর কেন? ইহা ত জঙ্গল এবং কেবলই অন্ধকার।"

মুবারক তখন ঈষৎ হাসিয়া নিজ পকেট হইতে একটি ডিবিয়া বাহির করিল। ইহার ভিতর আশ্চর্য্য সুলেমানী সুর্ম্মা ছিল। অল্প লইয়া রাজপুত্রের দুই চক্ষুতে লাগাইয়া দিল।

সুর্ম্মা চক্ষে লাগাইবামাত্র শাহজাদা দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে আলোকপূর্ণ। বিস্তৃত রাজপথ। স্থানে স্থানে লণ্ঠন জ্বলিতেছে। অনেক ঘরবাড়ী, লোকজন, কোন কোনও গৃহের উপরতলায় নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। বাজারে বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শাহজাদার মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুবারককে দেখিয়া অনেকেই চিনিতে পারিল এবং বন্ধুতাসূচক কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

সে রাত্রি একটি বন্ধু-গৃহে মুবারক অবস্থিতি করিয়া, পরদিন প্রাতে মালেক সাদেকের দরবারে রাজপুত্রকে লইয়া উপস্থিত হইল।

দৈত্যপতির রাজসভা স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিবিধ মণিমুক্তা দ্বারায় খচিত। স্থানে স্থানে চাঁদনী, দরী এবং মখমলের আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। বহু পণ্ডিত, গুণী, আমীর, ওমরাহ, উজীর ও ফকীর বসিয়া আছে। অঙ্গরক্ষক সিপাহীগণ সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান। মণিময় সিংহাসনের উপর, হীরকের মুকুট পরিয়া, মোতির হার গলায় দিয়া, মালেক সাদেক বসিয়া আছেন। মুবারক রাজপুত্রসহ নিকটে গিয়া সেলাম করিল। মালেক সাদেক দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"কি মুবারক? তুমি কবে আসিলে?"

মুবারক নত হইয়া বলিল—"শাহানশাহ! এ দাস পারস্যরাজ্য হইতে গত রাত্রিতে পৌঁছিয়াছে।"

মালেক সাদেক কহিলেন—"বেশ। তোমার সহিত এই যুবকটি কে?"

মুবারক উত্তর করিল—"মহারাজ! ইহাকে চিনিতে পারিলেন না? আপনি চিনিবেনই বা কি করিয়া, অতি বাল্যকালে ইহাকে দেখিয়াছিলেন কিনা। আপনার বন্ধু পারস্যের স্বর্গীয় বাদশাহের ইনি পুত্র।"

অতঃপর মুবারক এই কয়েক বৎসরের ঘটনা সমস্তই আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। এক কলসী মোহরও তাঁহাকে উপহার দিল। শেষে বলিল—"রাজপুত্রের বড়ই বিপদ। এ বিপদে আপনি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? আপনি যদি কৃপা করিয়া শেষ বানরটি দেন, তাহা হইলে ইহার আর কোনই কষ্ট থাকে না। আপনার বন্ধুর রাজ্য ও বংশ সমস্তই বজায় থাকে।"

সকল কথা শুনিয়া মালেক সাদেক বলিলেন—"আচ্ছা, সে উত্তম কথা। এ যখন এতদূর আসিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমি ইহাকে রক্ষা করিব। কিন্তু উহাকে একটু পরীক্ষা করিতে চাই। আমার একটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র করযোড়ে কহিলেন—"যাহা হুকুম হয়, এ অধীন তাহা যথাসাধ্য পালন করিবে।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"কার্য্যটি বড়ই কঠিন। পারিবে কি? যদি কার্য্যটি করিতে পার, তবে তোমার পিতাকে আমি যে পরিমাণ অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার অধিক অনুগ্রহ তোমাকে করিব। যাহা চাহিবে তাহাই দিব। কিন্তু যদি কার্য্যনাশ কর, তাহা হইলে আমার হস্তে তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

রাজপুত্র বলিলেন—"কার্য্যটি যদি আমার শক্তির মধ্যে হয়, তবে অবশ্যই তাহা আমি প্রাণপণে সম্পন্ন করিব। কার্য্যটি কি?"

ইহা শুনিয়া মালেক সাদেক নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি চিত্র বাহির করিলেন। রাজপুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন—"এই মনুষ্যকন্যার সন্ধান করিয়া, যদি তাহাকে আমার কাছে আনিতে পার, আমি তোমার সহিত চিরদিনের জন্য মিত্রতাপাশে বন্ধ থাকব। আর যদি না আনিতে পার, কিম্বা কোনওরূপ অন্যায় কর, তবে তুমি অত্যন্ত বিপদে পতিত হইবে। দেখ, এখনও সময় আছে। যদি কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিতে পার, তবেই ভার গ্রহণ কর। নতুবা এখনও নিবৃত্ত হও।"

রাজপুত্র দেখিলেন ছবিখানি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি পরমাসুন্দরী রমণীর মূর্ত্তি। বলিলেন—"প্রভু! কেন পারিব না? আমি এই রমণীকে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া অন্বেষণ করিব এবং যে প্রকারে পারি আপনার নিকট আনিয়া দিব।"

ইহা শুনিয়া মালেক সাদেক অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ছবিখানি দিয়া, বিবিধ ধনরত্ন ও পরিচ্ছদ উপহার দিয়া, রাজকুমারকে বিদায় দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মালেক সাদেকের নিকট বিদায় লইয়া, শাহজাদা ও মুবারক সেই মনুষ্যকন্যার উদ্দেশে বাহির হইলেন। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, ও জঙ্গলে জঙ্গলে, বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সেই মনুষ্যকন্যার সংবাদ পাইলেন না। এইরূপে সাতটি বৎসর অতীত হইয়া গেল।

একদিন এইরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে ইস্তাম্বুল সহরে বেড়াইতে বেড়াইতে অপরাহ্ন সময়ে শাহজাদা দেখিলেন, একজন ছিন্নবসন কৃশকায় বৃদ্ধ ফকীর রাজপথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। ফকীর অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে কিন্তু কেহই তাহাকে একটি পয়সাও দিতেছে না। যাহার দ্বারে যাইতেছে সেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। দেখিয়া শাহজাদার অন্তঃকরণে বড়ই দয়া হইল। তিনি পকেট হইতে একটি মোহর বাহির করিয়া ফকীরকে দিলেন। ফকীর বলিল—"হে দাতা! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি বোধ হয় পথিক, এ সহরের অধিবাসী নহ।"

বৃদ্ধ এইরূপে রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল। কিছুদূরে একটি দোকানে গিয়া, মোহর ভাঙ্গাইয়া, স্ত্রীলোকের উপযুক্ত একটি সুন্দর রেশমী বস্ত্র খরিদ করিল। বাকী টাকায় খাদ্য দ্রব্যাদি কিনিয়া, আবার চলিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া রাজপুত্র কিছু বিস্মিত হইলেন। স্বীয় সহচরকে কহিলেন—"মুবারক! এ ব্যক্তি ফকীর, তবে স্ত্রীলোকের উপযোগী রেশম বস্ত্র ক্রয় করে কেন?"

মুবারক বলিল—"কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না। বোধ হয়, উহার গৃহে স্ত্রী কন্যা কেহ আছে। তোমার যদি এতই কৌতূহল হইয়া থাকে, চল না, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই, তাহা হইলেই জানিতে পারিব।"

মুবারকসহ শাহজাদা ফকীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ফকীর ক্রমে নগর-সীমা ছাড়িয়া বাহিরে গেল। সেখানে রাজপুত্র দেখিলেন, বড় বড় অট্টালিকা গৃহাদির ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। বাগান ছিল অনুমানে বুঝা গেল, এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জলের ফোয়ারা ছিল, তাহা ভগ্ন। দেখিয়া রাজপুত্র মনে করিলেন, বোধ হয় পূর্ব্বে এখানে কোনও রাজা বা ধনবান ব্যক্তির বসতি ছিল, এখনও তাহারই চিহ্ন বিদ্যমান। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যবর্ত্তী একটি সামান্য মৃত্তিকাময় কুটীরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"বেটী! কোথা আছিস?" কুটীর হইতে উত্তর আসিল—"বাবা! আসিয়াছ? আজ এত শীঘ্র ফিরিলে কেন? মঙ্গল ত?" বৃদ্ধ বলিলেন—"বেটী। আজ ঈশ্বর করুণা করিয়া একটি যুবা পথিককে আমার

সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছিলেন। সে আমাকে একটি মোহর দিয়াছে। তাই আজ অনেক-দিনের পর তোর জন্য একটি রেশমী বস্ত্র কিনিয়া আনিয়াছি। মাংস, ঘৃত, মশলা, চাউল প্রভৃতিও কিনিয়া আনিয়াছি। পাক কর্, অনেকদিনের পর আজ সুস্বাদু খাদ্য আমাদের মুখে উঠিবে; এই নে।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধের কন্যা প্রফুল্লমুখে বাহিরে আসিল। রাজপুত্র তাহাকে দেখিবা-মাত্রই বুঝিলেন এ আর কেহ নয়, যাহার সন্ধানে আজ সাত বৎসর কাল দেশে দেশে, বনে জঙ্গলে বেড়াইতেছিলেন, তসবীর অঙ্কিত এই সেই যুবতী। দেখিয়া রাজপুত্র নতজানু হইয়া ঈশ্বরকে বহু ধন্যবাদ দিলেন। মুবারকও বলিল—"হাঁ, এই সেই মনুষ্যকন্যা বটে।" তাহার অভিনব যৌবন, আশ্চর্য্য রূপ যেন সেই স্থানকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজপুত্র মনে মনে ভাবিলেন, আমি সাত বৎসর ধরিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য কখনও চক্ষুগোচর করি নাই।

রাজপুত্র তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"হে ফকীর! দুইজন পথিককে একটু বিশ্রামের স্থান দিবেন কি?" ফকীর তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং মহা সমাদরে আহবান করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। বসাইয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মত দয়াবান লোকের আগমনে আজ আমার কুটীর পবিত্র হইল। বৎস! তুমি কে এবং কি জন্যই বা দেশভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ?"

রাজপুত্র কহিলেন—"আমি পারস্যদেশের যুবরাজ। ঘটনাক্রমে একখানি ছবি আমার হস্তগত হয়। সেই ছবিখানিতে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। সেই যুবতীর দর্শন লালসায় আমি সাত বৎসরকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি। এতদিন পরে সেই যুবতীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তিনি আর কেহই নহেন, আপনারই কন্যা।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া রাজপুত্রের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বলিলেন —"না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনার পদগৌরব অবগত ছিলাম না। অতএব ক্ষমা করিবেন।" অতঃপর বসিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন—"হায়, আমি কি হতভাগ্য! আপনার মত এমন সুপাত্রের হস্তে যদি আমি কন্যা সমর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ধন্য হইতাম। কিন্তু তাহার উপায় নাই। আমার কন্যা বড়ই বিপন্না। কাহারও সাধ্য নাই যে উহাকে বিবাহ করে।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—"কেন ফকীরসাহেব, এ কন্যা বিপন্না বলিতেছেন কেন? কেহ ইঁহাকে বিবাহ করিতেই বা পারিবে না কেন?"

কন্যাটি এই সময় খাদ্য পাক করিবার জন্য রন্ধনশালায় গেল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

"আমার ইতিহাস শুনিবেন? সে অনেক কথা। আমি পূর্ব্বে এই সহরের একজন বিশিষ্ট রহীস ও ধনী ব্যক্তি ছিলাম। এই যে সকল ভগ্নস্তূপ দেখিতেছেন, এইখানেই এক সময়ে আমার প্রাসাদ শোভা পাইত। আমরা বহুপুরুষ ধরিয়া এইখানে বসবাস করিয়াছি। ঈশ্বর আমাকে কেবল মাত্র এই কন্যা সন্তানটি দিয়াছিলেন। কন্যা বড় হইলে, ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী এতই প্রসিদ্ধিলাভ করিল যে, দেশ বিদেশের বড় বড় লোকগণ ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমার নিকট প্রস্তাব করিতে লাগিল। একমাত্র কন্যা, বিবাহ দিলেই পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, এই কারণে আমি স্নেহাধিক্যবশতঃ বিলম্ব করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে এই নগরের রাজপুত্র একদিন ইহাকে দৈবাৎ দেখিয়া, আত্মহারা হইয়া পড়িল। সে প্রণয়বিহবল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল, বাতুলের মত হইল, ক্রমে তাহার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাদশাহ এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন রাজবাটীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইয়া, নিজ পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ

দিবার প্রস্তাব করিলেন। আমি রাজাজ্ঞা অমান্য করিতে সাহসী হইলাম না। আরও ভাবিলাম, কন্যার বিবাহ ত একদিন না একদিন কাহারও সঙ্গে দিতেই হইবে, তবে যদি শাহজাদাকে জামাতা পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? সুতরাং সম্মত হইলাম। উভয় পক্ষে মহা ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে শুভদিন উপস্থিত হইল, বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহ শেষে, মহাসমারোহে, বর কন্যাকে শয্যাগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিয়া, বর কন্যার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে তাহারা বিদায় লইল, বাদশাহজাদা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রাসাদের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীত নৃত্যাদি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বর কন্যার শয্যাকক্ষ হইতে এক অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা গেল। যেন একত্র শত শত কামান গর্জ্জন করিতেছে। যেন শত শত বজ্রপাত একত্র সংঘটিত হইতেছে। রাজপ্রাসাদের সর্ব্বত্র নৃত্যগীত বন্ধ হইল। রাজপরিবারের নিমন্ত্রিত অভ্যাগতবৃন্দ, দাস দাসী, সকলেই মহা ত্রাসে নবদম্পতীর শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। অনেক ডাকাডাকি, কেহই দ্বার খুলে না। অবশেষে বাদশাহের আজ্ঞায় দ্বার সবলে ভগ্ন করিয়া ফেলা হইল। সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বাদশাহজাদার মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত, রক্তে শয্যা ভাসিয়া যাইতেছে। আমার কন্যা মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত। কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে কক্ষে কোনওরূপ অস্ত্রও ছিল না। অনেক কষ্টে দাসীগণ আমার কন্যার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইল। বাদশাহ পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"পরদিন শোক কতকটা প্রশমতা প্রাপ্ত হইলে বাদশাহ ক্রোধে আদেশ করিলেন—'এই কন্যা অতিশয় মন্দভাগিনী, সত্বর ইহার মস্তক কাটিয়া ফেল।' আজ্ঞা পাইয়া, দাস দাসীগণ, সৈন্য সামন্ত ডাকিয়া, আমার কন্যাকে বধ করিবার আয়োজন করিল। রাজবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গনে বধ্যভূমি নির্ম্মিত হইল। সশস্ত্র সৈন্যগণ চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বাদশাহ ও রাজকর্ম্মচারী সকলে উপস্থিত হইলেন। আমার কন্যাকে বধ করিবার জন্য জল্লাদ যখন প্রস্তুত হইতেছে তখন সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঝড় আসিল, অজস্র পরিমাণ প্রস্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদশাহ ও সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি প্রস্তরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল ঠিকানা নাই। কেবল আমার কন্যার গায়ে একখানি প্রস্তরও লাগিল না।

"ক্রমে প্রস্তরপাত বন্ধ হইল, শব্দ থামিয়া গেল, মেঘ অপসৃত হইল, তখন বাদশাহ বলিলেন,—এই কন্যা ভূতগ্রস্ত, নহিলে এমন ভৌতিক কাণ্ড হইবে কেন? ইহাকে কিছু আর বলিও না। রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া দাও এবং ইহার পিতাকে বধ করিয়া, ইহাদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, সমস্ত ধন সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লও।

"আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজভৃত্যগণ আসিয়া আমার গৃহাদি সমস্ত ভগ্ন করিল, আমার দ্রব্যাদি লুটিয়া লইল। আমার কন্যা রাজবাটী হইতে তাড়িত হইয়া একবস্ত্রে আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল। ক্রমে রাজসৈন্যগণ আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে জল্লাদের হস্তে দিল। এমন সময় পুনরায় আকাশ হইতে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা গেল, অন্ধকার হইয়া প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। সৈন্যগণ কেহ মরিল, কাহারও মস্তক হস্ত, পদ ভগ্ন হইল। তাহারা ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আমার এবং কন্যার গায়ে কোনও প্রস্তর লাগিল না।

"সেই অবধি ভীত হইয়া বাদশাহ আমার প্রতি আর কোনওরূপে অত্যাচার করেন না। তবে আমার ধন সম্পত্তি সমস্ত যাওয়াতে আমি পথের ভিক্ষুক হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য একটু কুটীর বাঁধিয়া কন্যাসহ কোনও মতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ মৌন হইয়া রহিলেন। রাজপুত্র ব্যাপার সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। ইহা মালেক সাদেকেরই কীর্ত্তি। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন এরূপ হইল, আপনার কন্যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কন্যা বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—'যখন আমাদের শয়নকক্ষ হইতে নর্ত্তকীগণ বিদায় গ্রহণ করিল, তখন শাহজাদা উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পালঙ্কে শয়ন করিলাম। শাহজাদা পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কোথা হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল। শূন্য হইতে যেন এক মণিময় সিংহাসন নামিয়া আসিল। তাহার উপর এক রূপবান যুবা-পুরুষ রাজবেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার হস্তে উলঙ্গ তরবারি। চক্ষু ক্রোধে রক্ত-বর্ণ। তরবারির এক আঘাতে শাহজাদার মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম, আর কিছুই জানি না।'—আমার বোধ হইল কোনও ভৌতিক কান্ড হইবে। সেই অবধি ভূতের ভয়ে বাদশাহ বহু প্রকার তাবিজাদি ধারণ করিয়াছেন. এবং সহরের সর্ব্বত্র মৌলানাগণ ইসিম আজম ও কোরাণ পাঠ করিতেছে।"

বৃদ্ধ আবার মৌনাবলম্বন করিলেন। রাজপুত্র ও মুবারক সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বিদায়-গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজপুত্র বাসস্থানে ফিরিয়া, আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। মুবারক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"শাহজাদা, এতদিনে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে. অথচ তোমার মন এমন বিষন্ন কেন?"

রাজপুত্র কহিলেন—"মুবারক, সেই রূপসী-রত্নকে দেখিয়া আমার মনে হরিষে বিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে।"

মুবারক বলিল—"কেন রাজকুমার, বিষাদ কিসের?"

শাহজাদা বলিলেন—"মুবারক, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, আমার মনের দুঃখ কি বুঝিবে? আমি যে দিন হইতে ঐ কন্যার ছবি দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার মন প্রেম-অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। এতদিন পরে যদি তাহার দেখা পাইলাম, তাহাকে লাভ করিতে পারিব না।"

মুবারক শুনিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ! এমন চিন্তা মনেও স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণয়িণীকে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া দিবার উপায় চিন্তা কর। অন্যরূপ কামনা পরিত্যাগ কর। এদেশের বাদশাহজাদার কি দশা হইয়াছে তাহা ত তুমি স্বকর্ণেই শুনিলে।"

রাজপুত্র বলিলেন—"শুনিলাম বলিয়াই ত এই বিষাদ।"

মুবারক তখন ফকীর-কন্যাকে কি উপায়ে লইয়া গিয়া মালেক সাদেকের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে, তাহার পরামর্শই করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, ফকীরকে বলিয়া কহিয়া, বুঝাইয়া, বিবাহ করিবার ছল করিয়া, শাহজাদা ঐ কন্যাকে লইয়া গিয়া মালেক সাদেক সমীপে অর্পণ করিবেন।

সে রাত্রি শাহজাদা নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সেই সুন্দরীর চন্দ্রমুখ যতই তাঁহার মনে পড়ে. ততই অন্তরে প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কোনও ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। রাজপুত্র স্নান করিয়া, বেশ বিন্যাস করিয়া, বাজারে গিয়া বিবিধ প্রকার শুষ্ক ও হরিদ্বর্ণ মেওয়া ফল, মাংস ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য ও পেয়, বিবিধ প্রকার বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি উপহার দ্রব্য ক্রয় করিয়া, মুবারকসহ ফকীরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ফকীর মহা সমাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর রাজপুত্র

বলিলেন—"মহাশয়, আমি গত রজনীতে অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি, আপনার নিকট আপনার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিব। আমার যেরূপ মানসিক অবস্থা, তাহাতে আপনার কন্যাকে লাভ করিতে না পারিলে আমার জীবনে সুখ নাই। আপনি মৃত্যু-শঙ্কার কথা বলিয়াছিলেন, আমি ভাবিয়া দেখিলাম, সুখহীন জীবনভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"বৎস ও কথা বলিও না। জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। এই আশঙ্কাটি যদি না থাকিত, আমি এখনি তোমাকে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইব।"

রাজপুত্র অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল। রাজপুত্র প্রত্যহই নানা উপহার দ্রব্যাদি লইয়া ফকীরের আলয়ে আসিতেন। এবং দিবসের অধিকাংশ ভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহই অনেক প্রকারে বৃদ্ধকে বুঝাইতেন কিন্তু কিছুতেই বৃদ্ধের মত করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ কেবলই বলিতেন, তোমাকে কন্যাদান করিয়া, তোমার বধের ভাগী আমি হইতে পারিব না।

এক মাস পরে হঠাৎ এক দিন বৃদ্ধ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রাজকুমার ও মুবারক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, ঔষধাদি আনিয়া বৃদ্ধকে সেবন করাইতে লাগিলেন। রাজকুমার নিজ হস্তে রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধকে খাওয়াইতেন। ফল কথা, বৃদ্ধের সেবা শুশ্রূষার কোনও ত্রুটি হইল না। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই বাঁচিলেন না।

তাঁহার মৃত্যুর পরে মুসলমান-ধর্ম্ম অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম শাহজাদা সম্পন্ন করিলেন। সর্ব্বদা কন্যার নিকটে থাকিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেন। এইরূপে আরও মাসখানেক কাটিল।

মুবারক এক দিন জনান্তিকে রাজকুমারকে বলিল—"আর এখানে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? চল এবার ফকীরকন্যাকে লইয়া মালেক সাদেকের নিকট সমর্পণ করি।"

রাজপুত্র ইহা শুনিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। অন্তরের বাসনা বড়ই প্রবল, অথচ মৃত্যুভয়ও কাটাইয়া উঠিতে পারেন না।

মুবারক সে দিন ফকীরকন্যাকে বলিল—"বেটী, আমরা বিদেশী লোক, এখন ত আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে। তুমি কি করিবে মনে করিয়াছ?"

ফকীরকন্যা বলিল—"মহাশয়, আমার আর এখানে কে আছে? আমি একা স্ত্রীলোক এখানে থাকিবই বা কি করিয়া? আমার কি উপায় হইবে?"

মুবারক বলিল—"এখানে একা থাকা যদি তোমার অনভিপ্রেত হয়, তবে আমাদের সংগে আমাদের দেশে চল। তাহার পর কোন একটা বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

ফকীরকন্যা সম্মত হইল। মুবারক পাল্কী ও বাহক সংগ্রহ করিয়া, ফকীরকন্যা ও রাজপুত্রকে লইয়া, মালেক সাদেকের রাজ্য-অভিমুখে যাত্রা করিল।

বহুদিনের পথ। নানা বন, উপবন, পর্ব্বত ও নদী অতিক্রম করিয়া ইঁহারা যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কোনও সুন্দর স্থান প্রাপ্ত হইলে দুই এক দিন সেখানে থাকিয়া বিশ্রাম করিতেন। কুমারীর নিয়ত সাহচর্য্যে রাজপুত্রের মনে প্রণয়-বহ্নি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুইজনে বিশ্রাম স্থান হইতে অনেক দূর অবধি বেড়াইতে যাইতেন। কোথাও একটি সুন্দর বনপুষ্প দেখিলে, রাজপুত্র তাহা যত্নে তুলিয়া ফকীরকন্যার কেশ-দামে পরাইয়া দিতেন। এইরূপে কয়েক মাস কাটিল। কিন্তু মালেক সাদেকের ভয়ে শাহজাদা কোনও দিন ফকীরকন্যার নিকট স্বীয় প্রণয় ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেন না।

একদিন মুবারক নির্জ্জনে রাজপুত্রকে অনেক ভৎর্সনা করিল। ইঁহার মনোভাব

জানিতে মুবারকের বাকী ছিল না। মুবারক বলিল—"রাজকুমার, তোমাকে পূর্ব্বাবধিই সাবধান করিয়া দিয়াছি, এ বাসনা মনে স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণয়িণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কতদূর বিপদজনক, তাহা কি তুমি অবগত নও? শেষে কি প্রাণটা খোয়াইবে?"

রাজপুত্র কহিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে মুবারক। কিন্তু আমি যে কিছুতেই হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ফকীরকন্যাকে বিবাহ করিলে মালেক সাদেকের হস্তে আমার মৃত্যু, আর প্রণয়বাঞ্ছা পূর্ণ না হইলেও আমার অবধারিত মৃত্যু। এখন আমি কি করিব?"

মুবারক যুবরাজের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। বলিল—"ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। হয়ত মালেক সাদেকের নিকট কন্যাকে উপস্থিত করিলে তিনি প্রীত হইয়া কন্যা তোমাকেই দান করিবেন। তাহাতে তোমার প্রাণরক্ষা, রাজ্যরক্ষা সকল দিকই বজায় থাকিবে।"

যুবরাজ বিষণ্ন মনে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে তাঁহারা একটি নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। স্থানটি সুন্দর দেখিয়া, কিছুদিন বিশ্রামের জন্য তাঁহারা সেইখানেই ছাউনি ফেলিলেন। তখন বসন্তকাল বিরাজ করিতেছে। নদীতীরে সহস্র সহস্র বন্য গোলাপ ফুটিয়া বায়ুকে আতর গন্ধে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। বুলবুল পক্ষীর গান শুনিলে বৃদ্ধেরও মনে তরুণ-ভাব উপস্থিত হয়। একদিন যুবরাজ ও ফকীরকন্যা নদীসৈকতে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রান্ত হইয়া একটি গোলাপের ঝাড়ের নিকট তৃণাস্তরণে উপবেশন করিলেন। সে দিন কথায় কথায়, শাহজাদা নিজ প্রণয় ব্যক্ত করিলেন। কিরূপ উন্মাদনা আসিয়া উপস্থিত হইল, কিছুতেই নিজেকে সেদিন সংযত করিতে পারিলেন না। রাজকুমারের প্রণয়-কথা শুনিয়া কুমারীর গণ্ডযুগল, নিকটস্থ ঝাড়ের গোলাপ পাপড়ির মতই লাল হইয়া গেল। যুবরাজের বারম্বার প্রশ্নে কুমারীও স্বীকার করিলেন, যে দিন হইতে তিনি পিতৃগৃহে যুবরাজকে দেখিয়াছেন, সেইদিন হইতেই তাঁহাকে নিজ হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছেন। এই প্রথম প্রণয় ব্যক্ত করিতে সেই অসামান্যা সুন্দরীর মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাজপুত্র আত্মহারা হইয়া স্বীয় প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার গোলাপী অধর চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কুমারী বলিলেন—"না প্রাণাধিক, আত্মসম্বরণ কর, আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইতে পারিব না।" যুবক বলিলেন—"তোমার অধর চুম্বনের মূল্যস্বরূপ যদি আমার প্রাণ দিতে হয়, আমি তাহাতেও কাতর নহি।" কুমারী ঈষৎ হাস্য করিয়া, গোলাপের ঝাড় হইতে একটি ফুল ছিঁড়িয়া, তাহা চুম্বন করিয়া যুবকের কোলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন—'ঐ ফুলে আমার চুম্বন আছে, উঠাইয়া লও।"

যুবক সাগ্রহে ফুলটি উঠাইয়া লইয়া বারম্বার তাহা চুম্বন করিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। শত বজ্রনির্ঘোষের শব্দ শ্রুত হইল।

যুবরাজ বুঝিলেন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। ফকীরকন্যাও বুঝিলেন, এইবার সর্ব্বনাশ হইল। তিনি ভয়ে যুবরাজের কণ্ঠলগ্না হইলেন।

মুহূর্ত্ত পরে মালেক সাদেক আসিয়া সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইয়া বিকট শব্দ উত্থিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া ফকীরকন্যার মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল।

মালেক সাদেক শাহজাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বিশ্বাসঘাতী যুবক! তোর উত্তর কি?"

শাহজাদা বলিলেন—"কিসের উত্তর?"

মালেক সাদেক বলিলেন—"এই কন্যার প্রতি তুই কেন প্রেমাভিলাষ করিয়াছিস?"

শাহজাদা কহিলেন—"দৈত্যপতি, এ প্রশ্নের কোনই উত্তর নাই। আমি উঁহাকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া ভালবাসিয়াছি।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"মনে ভালবাসিয়াছিস, কিন্তু মুখে প্রকাশ করিলি কেন?"

যুবরাজ উত্তর করিলেন—"যদি জানিতাম, আপনি যেরূপ এই কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী তিনিও সেইরূপ আপনার প্রতি অনুরক্ত, তবে আমি কখনই তাঁহার কাছে আমার প্রণয় ব্যক্ত করিতাম না। কিন্তু তিনি যখন আমাকেই হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছেন ইহা বুঝিলাম, তখন প্রণয় ব্যক্ত না করিব কেন?"

দৈত্যপতি বলিলেন—"আমার ক্রোধের ভয় করিস না? প্রাণের মায়া নাই?"

শাহজাদা বলিলেন—"দৈত্যরাজ, মৃত্যু হইতে প্রেম বলবান। প্রেম কি কখনও মৃত্যু-ভয় করে? ইচ্ছা হয় আমাকে বধ করুন, তথাপি আমি আমার প্রিয়তমার নিকট প্রণয় ব্যক্ত করিয়াছি এবং তাঁহার প্রেমও যে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইজন্য মৃত্যুর পর নরকে যাইলেও আমার আত্মা স্বর্গসুখ অনুভব করিবে।"

ধীরে ধীরে আকাশ পরিষ্কার হইল। পুনশ্চ দিবার তরুণালোক দেখা দিল। অল্পে অল্পে দৈত্যপতির মুখমণ্ডলে, ক্রোধের পরিবর্ত্তে, প্রসন্নতার চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন—"যুবা—উঠ। আমি তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র। আমি দৈত্যবংশোদ্ভব, তাহাতে বৃদ্ধ হইয়াছি। মনুষ্যকন্যায় আমার কোনই প্রয়োজন নাই। উঠ, নদী হইতে শীতল জল আনিয়া তোমার প্রিয়তমার চেতনা সম্পাদন কর। তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

একথা শুনিয়া, শাহজাদা. মহা আশ্বস্ত হইয়া, নদী হইতে জল আনিয়া, সযত্নে স্বীয় প্রণয়িণীর চেতনা সম্পাদন করিলেন। যুবতী একটু সুস্থ হইলে, মালেক সাদেক বলিতে লাগিলেন—"যখন তুমি শিশু, তখন একদিন তোমার পিতা এবং আমি উভয়ে ছদ্মবেশে ইস্তাম্বুল সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে এই কন্যাকে দেখি। ইঁনিও তখন অতি শিশু। তোমার পিতা ইঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার পুত্র যদি বাঁচে তবে এই কন্যার সহিত বিবাহ দিব। ইস্তাম্বুলের শাহজাদা যখন ইঁহাকে বিবাহ করিল, তখন সেই কারণেই আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলাম। পরে তোমার পিতার মৃত্যুর পর, অনেক বৎসর ধরিয়া আর ওকথা আমার স্মরণ ছিল না। তোমাকে আসিতে দেখিয়া আবার আমার স্মরণ হইল। তোমার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিবার জন্য কন্যাকে অন্বেষণ করিবার ভার তোমাকেই দিয়াছিলাম। বৎস,—তোমার ক্লেশকর পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ইতিমধ্যেই তোমার নিষ্ঠুর পাপাত্মা পিতৃব্যকে তোমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। তোমার পিতৃসিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শীঘ্রই তোমাকে পারস্য-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া, এই কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

মহা সমারোহে যুবরাজের অভিষেক ও উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর, নবীন বাদশাহ রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিকে ডাকাইয়া নিজ জীবনের ইতিহাস বলিয়া, একখানি কাব্য রচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেই কাব্যের শীর্ষদেশে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল—

"মৃত্যু হইতে প্রেম বলবান"

ভূত না চোর ?

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার প্রপিতামহ মহাশয় বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে দিল্লী সহরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই অবধি বংশানুক্রমে আমরা দিল্লীরই অধিবাসী বাঙ্গালী বলিয়া এখনও নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে বাঙ্গালিত্বের পরিমাণ উচ্চ-ক্রমের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের আদিবাস ডুমুরদহ গ্রাম বঙ্গের মানচিত্রে কোন স্থানে অবস্থিত, তাহাও জ্ঞাত নহি। বাস্তবিক, আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শৈলবালা দেবী খাঁটি বাঙ্গালিনী না হইলে এতদিন আমি মাতৃভাষার একটি কথাও মনে করিয়া রাখিতে পারিতাম কি না বিশেষ সন্দেহ।

আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভাল থাকিলেও, পিতা ও পিতামহের দোষে আমি এক প্রকার নিঃস্ব। শুনিয়াছি আমার পিতামহের আমলে আমাদের এই অট্টালিকাখানি এই সুবিস্তৃত দিল্লী সহরের তদানীন্তন কোনও রঙ্গিণীর চরণরেণুকায় বঞ্চিত হয় নাই। আমার পিতার চরিত্রও নির্দ্দোষ ছিল না;—কিন্তু তাঁহার ক্যাসবাক্সে টাকাও অধিক ছিল না। শেষ দশায় তিনি বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া যান; তাঁহার মৃত্যুর পরে, আমি স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া বহুকষ্টে বাড়ীখানি উদ্ধার করি। এখন অনেক উমেদারীর পর জজ সাহেবের কাছারিতে সেরেস্তাদারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি।

মহল্লা "মোসাক্ চৌকে" আমাদের বসতি। দিল্লীর এই অংশ অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। আমাদের বাড়ীটি সেকেলে ধরণের, চকমিলান প্রকাণ্ড তিনতলা অট্টালিকা—অনেকগুলি ঘর। আমরা স্বামী স্ত্রী দুটি প্রাণী, দুটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, আমরা অত বড় বাড়ী লইয়া কি করিব? অনেক দিন হইতে মনে করিতেছিলাম, যদি ভাড়াটিয়া পাই, তবে তেতলার উপরের ঘরগুলি ভাড়া দিই। তেতলার ভাল ঘরগুলি এবং গ্রীষ্মকালের রাত্রে ছাদের মুক্ত বায়ুর মহাসুখ অন্যের জন্যে ছাড়িয়া দিতে যে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। বাড়ীর ভিতর দিয়া না যাইয়া, বাহির হইতেও তেতলার উপর পৌঁছান যায়। রাস্তার ধারে যেখানে আমাদের সদর দরজা, তাহার বাম দিকেই একটু গলির মত আছে। সেই গলিতে সিঁড়ির যে দরজা আছে, তাহা দিয়া পরে পরে দোতলায় ও তেতলায় যাওয়া যায়। সিঁড়ির যে দরজা দোতলায় খুলিয়াছে, সেইটিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিলেই, আর আমাদের সঙ্গে তেতলার কোনই সম্বন্ধ রহিল না। নীচের তলায় আমার প্রপিতামহ মহাশয়ের "দফ্তরখানা" ছিল—কর্ম্মচারী লোকজনে সদা পূর্ণ থাকিত; সেই জন্য মেয়েছেলেদের বাহিরে যাইতে হইলে এই সিঁড়ির দরজার মুখে পাল্কী আসিয়া লাগিত;—অর্থাৎ এইটাই যেন আমাদের খিড়্‌কী দরজার মত ছিল।

আমি যে উপরতলাটি ভাড়া দিব, তাহা অনেক দিন হইতে অনেক লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইয়াছি। কয়েকটা লোক চাহিয়াও ছিল, কিন্তু কেহই মনের মত হয় নাই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। হয় অতি অল্প ভাড়া দিতে চায়, নয়ত মুসলমান, নয়ত আর কোনও বাধা থাকে। একদিন রবিবার অপরাহ্নে বৈঠকখানা ঘরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছি, মৌলবী সাহেব তক্তপোষের উপর ছেলেদের লইয়া সুর করিয়া করিয়া "চুন্না হঙ্গে রফ্তন্ কুনদ্জানে পাক্" ইত্যাদি গোলেস্তাঁ পড়াইতেছেন, এমন সময় একটি ফিরিঙ্গি সাহেব আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহাকে সাহেব দেখিয়া থতমত খাইয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিলাম, নিজে তক্তপোষে বসিলাম।

সাহেব বলিলেন—"বাবু আপনার নাম সেরেস্তাদারবাবু?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আপনি তেতলার মহল ভাড়া দিবেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কত ভাড়া? আমি লইতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম—"আপনি লইবেন? বেশ ত! আগে দেখুন কেমন ঘর দুয়ার। পছন্দ যদি হয়, তাহার পর সে কথা হইবে।"

সাহেব সম্মত হইলেন। আমি বাড়ীর ভিতর হইতে সিঁড়ির খিড়কী-দরজার চাবি চাহিয়া আনিলাম। সাহেবকে লইয়া উপরে গেলাম। ঘরগুলি, গোসলখানা ইত্যাদি সমস্ত দেখিয়া সাহেব ভারি খুসী হইলেন। শেষে ছাদের উপর যাওয়া গেল। সেখানে একটি ছোট কুঠারি ছিল; সাহেব বলিলেন, এইটি আমার "বাবুর্চিখানা" হইবে।

দেখা শেষ হইলে দুইজনে অবতরণ করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। ভাড়ার কথা হইল। সাহেব বলিলেন—"কত চাহেন?" আমি বলিলাম, "কত দিতে পারেন?" সাহেব বলিলেন—"দশ।" আমি শুনিয়া হাসিলাম। মৌলবী সাহেব তাঁহার সেই সুদীর্ঘ দাড়ী দোলাইয়া হা হা হা হা করিয়া সপ্তমে এমন হাসিলেন যে সম্মুখে রাজ-পথচারী দুই চারিজন লোক ঘরের মধ্যে সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। মৌলবী সাহেব যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এই—"এমন ইন্দ্রালয় (ফির্দোস্ত) ইহার ভাড়া দশ টাকা!" সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আমাকে বলিলেন—"বাবু, আপনি কত চাহেন?" আমি বলিলাম—"পঁচিশ।" সাহেব বলিলেন—"অত হইবে না, পনেরোর বেশী এক পয়সা নহে।" আমি বলিলাম—"সাহেব আপনি বিবেচনা করুন। তেতলার উপর, ভেণ্টিলেটেড ঘর, অমন ছাদ" ইত্যাদি। সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আমার মুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি আমির লোক; আমি বড় গরীব। আমার প্রতি দয়া করিয়া যদি অল্প ভাড়ায় দেন ত ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

সাহেবের করুণ কাতরোক্তিতে আমার হৃদয় গলিয়া গেল। হোক না কালো ফিরিঙ্গি সাহেব—হ্যাট্‌কোটধারী ত বটে! ঐ পরিচ্ছদবিশিষ্ট জীবগণের নিকট হইতে গালি ধমকই আমাদের ন্যায্য পাওনা বলিয়া অনেক দিন হইতে মনে মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে। সুতরাং ও শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে মিষ্ট কথা শুনিলেই ভিজিয়া যাইতে হয়—কাতরোক্তিতে আর হইবে না?

আমি বলিলাম—'আচ্ছা সাহেব, আপনি বসুন। দশ মিনিট পরে আসিয়া আপনাকে বলিব।" সাহেব নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"অলরাইট বাবু।"

গৃহিণী ত প্রথমে সাহেব শুনিয়া কিছুতেই রাজি হন না। বলিলেন—"সাহেবকে ভাড়া দিব যদি, তবে মুসলমানেরা কি দোষ করিয়াছিল? কে জানে বাপু, তোমার কেমন প্রবৃত্তি!" আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম—সাহেবেরা মুসলমান নহে, উহারা অন্য জাতি। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি। গৃহিণী বলিলেন—"সেই ত মাংস রাঁধিবে, পেঁয়াজ রাঁধিবে, গন্ধে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইবে?" আমি বলিলাম—"সে ভয় নাই; সাহেবের রসুইঘর ছাদের উপর হইবে, এখানে দুর্গন্ধ আসিবে না।" —শুনিয়া গৃহিণী আশ্বস্ত হইলেন এবং মত করিলেন। ভাড়ার কথায় তাঁহার কোনও বক্তব্য ছিল না। অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার সেরেস্তাদার স্বামী তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী চতুর, ইহাই তাঁহার চিরদিন বিশ্বাস। তবে তিনি বলিলেন—"সাহেব যদি ননী আর চারুকে কিছু কিছু ইংরাজি পড়াইতে স্বীকার হন, তবে অল্প ভাড়ায় বা ভাড়া না লইয়া দেওয়া যাইতে পারে।" শুনিয়া আমার মনে হইল, ঠিক ত! "দেখা যাক্‌" বলিয়া একটা পাণ মুখে দিয়া নীচে চলিয়া গেলাম।

সাহেবকে বলিলাম—"আপনি যদি আমার ছেলেদুটিকে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা ইংরাজি পড়াইতে পারেন, তবে আপনার কিছুই ভাড়া লাগিবে না।" এ প্রস্তাবে সাহেব পরম আহ্লাদিত হইয়া সম্মত হইলেন এবং আমাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন—তাঁহার পত্নী আমার "লেডির"—(হা হা—শৈলবালা লেডি! ভারি হাসির কথা) "ক্যাপিটাল কম্প্যানিয়ন" (উত্তম সঙ্গিনী) হইবেন, এবং অনেক প্রকার উল-টুলের কাজ শিখাইয়া দিতে পারিবেন। আমি ভাবিলাম আমার স্ত্রী সেই স্লেচ্ছানীকে চৌকাঠের এ দিকে পদার্পণ করিতে দিলে ত! সাহেব বলিলেন—"বাবু, তবে আমি পরশু বৈকালে জিনিষপত্র ও মেমসাহেবকে লইয়া আসিব। কাল আপনি ঘরগুলা পরিষ্কার করাইয়া রাখিবেন।"—বলিয়া তিনি আমার সহিত শেক্‌হ্যান্ড করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাহেব সপরিবারে জিনিষপত্র লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন —"বাবু, আমি গাজীপুর হইতে পত্র পাইয়াছি আমার শ্যালক বড় পীড়িত। আমরা আজই রাত্রে সেখানে চলিলাম। জিনিষপত্র সব চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেছি। বোধ হয় দুই সপ্তাহের এদিকে ফিরিতে পারিব না।" বলিয়া সাহেব ও মেম খিড়কীর সিঁড়ির দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যাবেলায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকাল সকাল শয়ন করা আমাদের বহুদিনের অভ্যাস। যখন রাত্রি নয়টা বাজে, তখন আমাদের বাড়ীটি অন্ধকার হয় এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে। রাত্রি চারিটা বাজিলেই সকলকার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, ছেলেরা বিছানায় থাকিয়াই "শুক্‌রো সিপাসো মিন্নতো ইজ্জৎ খোদা এরা" করিয়া পারসী শ্লোক আবৃত্তি করিতে থাকে। আমরা স্ত্রী পুরুষে সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। বেশ আলো হইলে তবে সকলে শয্যাত্যাগ করি।

সাহেব যে দিন গাজীপুর গেলেন, তাহার তিন চারিদিন পরে অনেক রাত্রে (বোধ হয় বারোটা হইবে—বারোটাই আমাদের "অনেক রাত্রি") হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বোধ হইল যেন উপরে দুব্ দুব্ করিয়া কি শব্দ হইতেছে। কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিলাম, শব্দ আর শুনা গেল না। একটু তন্দ্রা আসিল। আবার যেন শব্দ হইল। মনে করিলাম, ও কিছু নয়, কি শুনিতে কি শুনিয়াছি। অনেকক্ষণ কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম, আর কিছুই শুনিলাম না। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তাহার পর দুই তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেক রাত্রে কাহার মৃদুহস্তস্পর্শে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আর ভয়ের কোনও কারণ রহিল না। শৈলবালা কম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"ওঠ ওঠ—উপরের ঘরে ভূত আসিয়াছে।"

শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইল। বলিলাম—"ভূতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে নাকি?"

তিনি বলিলেন—'হাসি রাখ। উপরে ভারি শব্দ হইতেছে। সিঁড়ি দিয়া কে যেন ওঠা নামা করিতেছিল। আমার গা কেমন করিতেছে।"

আমি সেই রাত্রির কথা স্মরণ করিলাম। ঠিক সেই সময়ে উপরে গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হইল। মনে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইল। কিন্তু ভাবিলাম, ভয় পাওয়া উচিত নহে। আমি ভয় পাইয়াছি দেখিলে এই বাঙ্গালিনীর ত মূর্চ্ছা হইবে। সুতরাং সাহস করিয়া বলিলাম—"বেরাল-টেরাল আসিয়াছে বোধ হয়।"

স্ত্রী বলিলেন—"তুমি কি পাগল হইলে? বেরালের পায়ের শব্দে কখনও গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হয়?"

আমি বলিলাম—"কুকুর ত হইতে পারে?"

"কুকুর কোথা দিয়া যাইবে?"

"সাহেবের কুকুর বোধ হয় সাহেব ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলেন।"

"সাহেবের ত কুকুর আসে নাই।"

মনে করিলাম—তাই ত। বলিলাম—"বোধ হয় চোর-টোর।"—গৃহিণী এ কথার প্রতিবাদ করিলেন না।

আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আর কোনও শব্দ শুনা গেল না। খোকা কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী চলিয়া গেলেন। তাহার পর কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম মনে নাই।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, শৈলবালার চক্ষু রক্তবর্ণ। বলিলেন, সমস্ত রাত্রি ভয়ে তাঁহার ঘুম হয় নাই। আবার নাকি বেশী রাত্রেও দুইবার শব্দ হইয়াছিল। আমি যে আর একদিন ঐরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম তাহা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলি নাই। এইবার বলিলাম। শুনিয়া তিনি অধিক ভীত হইলেন।

যথাসময়ে ছেলেরা আহার করিয়া স্কুলে গেল। আমি কাছারি গেলাম। মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া রহিল। কাহারও কাছে এ কথা বলিলাম না। সহকর্ম্মীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"অক্ষয়বাবু, আজ আপনার অসুখ করেছে নাকি?" একজনকে ঠাকুর-দাদা বলি, তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"কাল রাত্রে নাত্‌বউ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বুঝি?" ইত্যাদি।

সে দিন একটু সকাল সকাল কাছারি বন্ধ হইল। পরদিন বক্‌রাইদের ছুটি। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, শৈলবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ছেলেরা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জাগাইল। তাহারা খাবার খাইয়া খেলা করিতে গেল। আমরা পরামর্শ করিলাম, আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া দেখিতে হইবে ব্যাপারটা কি।

সকাল সকাল বালকবালিকাদিগকে খাওয়াইয়া তাহাদিগকে বিছানায় দেওয়া হইল। আমি ভাল আহার করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা অমন করিয়া থাকিয়া বসিয়া থাকিলে কি খাওয়া যায়? আর শৈলবালা—তিনি ত নাম মাত্র আসনে বসিলেন।

দুইটা বাতি ঠিক করিয়া রাখিলাম। দিয়াশলাই রাখিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম—"চল আমরা ওঘরে গিয়ে কিছু পড়ি-টড়িগে।" আলোক সম্মুখে রাখিয়া গৃহিণী একখানি বাঙ্গালা বহি লইয়া পড়িতে লাগিলেন, আমি তামাক খাইতে খাইতে শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মন তখন উদ্‌ভ্রান্ত। কতক শুনি, আবার গল্পের সূত্র হারাইয়া ফেলি। এই রকম করিয়া রাত্রি দশটা বাজিল। তখন আস্তে আস্তে হুট্ হুট্ করিয়া শব্দ আরম্ভ হইল। শৈলবালা বলিলেন—"ঐ দেখ।" বলিয়া বহি বন্ধ করিলেন। আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে শব্দ বেশ স্পষ্ট আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম—"আর কিছু নয়, উপরে চোর গিয়াছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"চোর হইলে এক দিনে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইত, রোজ রোজ আসিবে কেন? ও ভূত বই আর কিছু নয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল এবং ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল। আমি বলিলাম—"একবাব কোন্ হ্যায়রে বলিয়া একটা হাঁক দিব?"

"হানি কি?"

আমি তখন উঠিয়া জানালার কাছে গেলাম। মুখ বাহির করিয়া, উপরের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কোন্ হ্যায় রে?" স্বরটা যেন বড় উচ্চ হইল না। পুনশ্চ সপ্তমে বলিলাম,—"কোন্—হ্যায়—রে?"

কিন্তু শব্দ বন্ধ হইল না।

শৈলবালা বলিলেন—"ভূত তোমার ভয়ে মরে' কাঠ হয়ে যাবে!"

কিছুক্ষণ পরে শব্দ বন্ধ হইল। আমি তখন সগর্ব্বে বলিলাম—"দেখ ভূত না চোর। এ চোর তাতে কোন সন্দেহ নাই।"

গৃহিণী বলিলেন—"হায় হায় সাহেবের সর্ব্বস্বটা চুরি করে' নিয়ে গেল গো!"

আমি বলিলাম—"দেখ, সে বেচারি আমাকে বিশ্বাস করিয়া জিনিষপত্রগুলি রাখিয়া গেল। আমি যদি জানিয়া শুনিয়া চোরকে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইতে দিই, তবে নিতান্ত অধর্ম্ম হয়। আমি উপরে গিয়া চোর ধরি।"

প্রশ্ন হইল—"কেমন করিয়া যাইবে?"

"চোর যেমন করিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির দরজার তালা নিশ্চয় ভাঙ্গিয়াছে।"

"দুয়ার কি আর খুলিয়া রাখিয়াছে? চোর যদি হয়, নিশ্চয়ই ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।"

আমি বলিলাম—"দুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব।"

গৃহিণী বলিলেন—সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে কি আর তোমাকে ফিরিয়া পাইব? বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে।"

আমি বলিলাম—"আমি ভোজালি হাতে করিয়া যাইব।"

গৃহিণী বলিলেন—"না, সে কখনই হইবে না। চোর নয়—চোর নয়।"

আমি বলিলাম—"যদি চোর না হয়, ভূতই হয়, তবে সিঁড়ির খিড়কী দরজায় সাহেবের তালা যেমন তেমনই থাকিবে। দেখিয়া আসিতে ক্ষতি কি?"

গৃহিণী কহিলেন—"এই রাত্রে! কাল সকালে গেলেই ত হইবে।"

আমি বলিলাম—"যদি চোরই হয়, তবে পুলিশ ডাকিতে পারিব। চাকরবাকরকে জাগাইব। সকালে চোর পলাইলে আর কি হইবে?"

শৈলবালা আমাকে তিন সত্য করাইয়া লইলেন, যদি চোরই হয়, তালা ভাঙ্গিয়াই থাকে, তবে আমি নিজে উপরে যাইব না। শেষে তাঁহার গা ছুঁইয়া শপথ করিতে হইল। যাইবার সময়—"আমার মাথা খাবে, আমার মরা মুখ দেখবে" এই দুইটা দিব্যও প্রয়োগ করিয়া দিলেন। আমি লণ্ঠন লইয়া নীচে গেলাম। সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিলাম। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির দরজায় উপস্থিত হইলাম। সাহেবের তালা যেমন তেমনই আছে। তাহাতে মাছিটিও বসিয়া পায়ের দাগ রাখিয়া যায় নাই।

এ পথ ব্যতীত উপরে যাইবার আর কোনই উপায় নাই। মানুষের ত নাই—ভূতের থাকিতে পারে—কিন্তু, ভূত আমি বিশ্বাস করি না। অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তবে কি মানুষ বেলুনযোগে আমার ছাদে অবতীর্ণ হইল? ইহা ত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীতে, অন্ততঃ আমাদের দেশে ত এরূপ বৈজ্ঞানিক চোরের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক উপরে গিয়া গৃহিণীকে বলিলাম—"তালা ত ঠিক আছে।"

তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি ত বলিয়াইছি।"

আমার "কোন্ হ্যায়রে" বলিয়া হাঁক দেওয়ার পর আধ ঘণ্টা আন্দাজ অতীত হইয়াছে। আবার শব্দ আরম্ভ হইল। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। গৃহিণী বলিলেন—"রাম রাম করিয়া আজিকার এ কালরাত্রি কাটিয়া যাক্—কালই সকালে তুমি অন্য বাড়ী ভাড়া কর, সেইখানে যাই। আমার এ ছেলেপিলের ঘরকন্না, কোথা থেকে হতচ্ছাড়া সাহেবকে আনিয়া জুটাইলে, বাড়ীটা ভূতের বাথান হইয়া দাঁড়াইল।"

আমি ত নীরব। ভূত—(ভূত না বলিয়া আর কি বলিব?) যেন উপরে এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর যেন মনে হইল, দুইটা ভূত। একটা এ ঘরের

উপর, একটা ও ঘরের উপর। আমার স্ত্রীও ইহা লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন,—"ঐ দেখ, একটা ছিল, দুটো ভূত হল। সে হতভাগা মিন্‌সে কখনই সাহেব নয়। কোনও বাদুকর সাহেবের বেশ ধরে এসেছে। সেই কালো কালো বাক্সগুলো করে ভূত ভরে এনেছিল, তা কে জানত ? মা গো মা, কি সর্ব্বনাশ হল !"—বলিয়া তিনি চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আমি ত মহাবিপদে পড়িলাম। কি বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করি ? কি বলিয়া ভয় ভাঙ্গিয়া দিই ? ঘড়ি দেখিলাম, তখনও বারোটা বাজিতে কয় মিনিট বাকী। শৈলবালা রামনাম জপ করিতে করিতে মেঝেব উপর বসিয়া পড়িলেন।

আমি তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বাড়ীটি চক্‌-মিলান। যে বারান্দায় উপরে যাইবার সিঁড়ি-দরজা আছে, সে বারান্দার ঠিক বিপরীত দিকের বারান্দায় আমার শয়নঘর। আমি জানালা দিয়া ওদিকের বারান্দা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম। যখন ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিতে আরম্ভ করিল, তখন দেখিলাম, সিঁড়ির সেই দরজাটি আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। জ্যোৎস্না রাত্রি, কিন্তু সে সময়টা একটু মেঘ থাকাতে আলোক অল্প ছিল। সেই সামান্য আলোকে দেখিলাম, শ্বেত বস্ত্রাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তির মত কি একটা সিঁড়ি হইতে বাহিব হইয়া বারান্দা দিয়া ওদিকে চলিয়া গেল। দুই তিন মিনিট পরে আবার সেইটা ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির দরজা অতি সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিল। আমি শৈলবালাকে এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে পুনরায় দুয়ার খুলিয়া সেই শুভ্র-বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি বাহির হইল। এই সময়ে আমার স্ত্রী আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনিও তাহা দেখিতে পাইলেন। বলিলেন—'ও কি ?" আমি বলিলাম—'ভূতই হউক, আব মানুষই হউক ওই সে। আমি একবার দেখিব উহা কি। আমার ভোজালি কই ?" বলিয়া দেওয়াল হইতে ভোজালি পাড়িয়া লইলাম। স্ত্রী আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। আমি সবলে হাত ছাড়াইয়া এক লম্ফে ঘরের বাহিরে গেলাম। নিমেষের মধ্যে সিঁড়ির দুয়ারের কাছে উপস্থিত হইলাম। মেঘটা তখন অপসৃত হইল—জ্যোৎস্না প্রকাশ হইল। দেখিলাম সিঁড়ির দরজার কাছে অনেকটা স্থান যেন রক্তমাখা ! তেতলার উপর হইতে যেন কাহার কাতরাণিও শুনিতে পাইলাম। লিখিতে লজ্জা নাই, আতঙ্কে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল—মনে করিলাম বীরত্বে কাজ নাই, পলাইয়া যাই। কিন্তু রহস্যের উদ্ভেদ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, সাহস সংগ্রহ করিয়া, সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বজ্রমুষ্টিতে ভোজালি ধরিয়া, যেন সাক্ষাৎ শমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চারি-মিনিট অতীত হইয়াছে। সেই শাদা ছায়াটা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে করিলাম, এই সময়। তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে সেই মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া পড়িয়া ভোজালি তুলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—"কে তুই বল্‌, নহিলে খুন করিব।" সেই মূর্ত্তি "MyGod !"—বলিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেল, তাহার পর অতি দ্রুতভাবে ইংরাজিতে বলিল —"আমি—আমি—আমি—বাবু;—আমি !" পরিচিত কণ্ঠস্বর। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যাহাকে বাড়ী ভাড়া দিয়াছি, সেই সাহেব !!

আমি তখন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। সেই সময় উপর হইতে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। বলিলাম—"সাহেব, তুমি খুন করিয়াছ ?"

সাহেব বলিলেন—"আমি খুন করিব কেন ? তুমিই আর একটু হইলে আমাকে খুন করিয়াছিলে।"

আমি পায়ের কাছে দেখাইয়া বলিলাম—"এত রক্ত কেন ?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"ও বুঝি রক্ত ? ও তো জল। এই দেখ"—বলিয়া সাহেব

একটি জলপূর্ণ ছোট বালতী তুলিয়া ধরিলেন।

সাহেব বলিলেন—"এই নূতন সিমেণ্টের উপর জল পড়িয়া জ্যোৎস্নায় রক্ত বলিয়া তোমার ভ্রম হইয়াছিল।"

এই সময়ে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। সাহেব বলিলেন—"বাবু, তুমি বিস্মিত হইয়াছ, ভয়ও পাইয়াছ। আমার স্ত্রী পীড়িতা—তাই ও কাতরাণি শব্দ। সকল কথা কাল সকালবেলা বলিব। আমি কোথাও যাই নাই। গাজীপুর যাওয়ার কথা ছলনা মাত্র। আমি দেনার জ্বালায় এমন করিয়াছি।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। আমি শয়ন-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম শৈলবালা মূর্চ্ছিতা। অনেক কষ্টে মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইলাম। সমস্ত রাত্রি সেবা করিয়া তবে তাঁহাকে সুস্থ করি।

সকাল হইলে সাহেবের মুখে শুনিলাম, তিনি সেই রাত্রে আবার চুপে চুপে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল, সে ইঁহাদিগকে ভিতরে দিয়া তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সাহেবের নাকি মিউনিসিপ্যালিটীতে একটা চাকরী হইবে—হইলেই তিনি অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির হইবেন। পাছে আমরা জানিতে পারি এই ভয়ে তাঁহারা দিনের বেলায় চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতেন। অনেক রাত্রি হইলে রান্না খাওয়া করিয়া লইতেন। আমাদের রান্নাঘরের পাশে যে চৌবাচ্চা আছে, তাহা হইতে জল লইয়া যাইতেন। শৈলবালা ত এ কথা শুনিয়া মহা খাপ্পা হইলেন, বলিলেন—না জানিয়া সাহেবের ছোঁয়া জল খাইয়া আমাদের সপরিবারের জাতি গিয়াছে।

যাহা হউক আগামী বারের অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তাঁহাকে এলাহাবাদে লইয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিব, এরূপ আশা দিয়া ঠাণ্ডা রাখিয়াছি। ভাগ্যে আমার স্ত্রী জ্যোতিষ জানেন না! এই সে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়া গিয়াছে, আপাততঃ দশ বারো বৎসবেব মধ্যে আর তাহা ঘটিবাব সম্ভাবনা নাই।

পূজার চিঠি

ভাগলপুর
৬ই অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রাণাধিক,

কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি খোকাকে লইয়া জানালায় বসিয়াছি, ঝি আসিয়া তোমার চিঠি দিয়া গেল। চিঠি খুলিয়া পড়িবার আগেই কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিল। মনটা ভারি বিষন্ন হইল; আহা, যাহা স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা যদি সত্য হইত! অথচ এই সেদিন তোমার চিঠি পাইয়াছি, এত শীঘ্র আবার চিঠি আসিবার কিছু কথা নহে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটে না, যে বলে, তাহা কিন্তু যথার্থ। স্বপ্নটা মনে বড় বেদনা দিতে লাগিল। বাল্যকালে একটি কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহার কথাগুলি মনে নাই, ভাবটা এই যে, যে স্বপ্নে সুখী হয়, সে জাগে কাঁদিবার জন্য;—তাহার পর বিদ্যুতের সঙ্গে একটা তুলনা দেওয়া ছিল, সেটা আমি বিলকুল ভুলিয়া গিয়াছি (আমার স্মরণ-শক্তির যা তেজ তাহা তোমার কাছে অবিদিত নাই)—তুমি অল্প দুঃখে আমাকে লেখাপড়া শিখান হইতে বিরত হও নাই। যাহা হউক, তখন তিনটা বাজিয়াছে, খোকাকে উঠাইয়া দুধ খাওয়াইলাম। দুধ খাইয়া খোকা ঘুমাইতে লাগিল। একটা কথা আছে, কোন

স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিলে বাকী রাতটুকু যদি আর ঘুমান না যায়, তবে সে স্বপ্ন সফল হইতে পারে; সুতরাং আর ঘুমাইব না স্থির করিলাম। কি করি? মনে করিলাম, একখানা বই-টই লইয়া পড়ি; তাহার পর মনে হইল, যদিও না ঘুম পাইত, বই হাতে করিলে ত জাগিয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব হইবে। এই ভাবিয়া তোমার কতকগুলি চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম।

এগুলি সব এবার তোমার গ্রীষ্মের ছুটির পর কলিকাতায় গিয়া লেখা। এক এক-খানি করিয়া চিঠি পড়িতে লাগিলাম, আর আমার অতীত দিনের কথাগুলি একে একে মনে উদয় হইতে লাগিল। এ দিনের সঙ্গে সে দিনের কত প্রভেদ! আমি এখন যে অবস্থায় আছি, বোধ হয় প্রেমিক প্রেমিকার এই অবস্থাই সুখের। আজ কাল আসিবে, ইহাতে বড়ই আনন্দ। যখন মিলন হয়, তখন কেমন করিয়া কোথা দিয়া যে দিন কাটিয়া যায়, কিছু বোঝা যায় না। তারপর বিরহের ক্রন্দন আরম্ভ হয়। তাহার পর যখন আবার পুনর্মিলনের দিন অত্যন্ত নিকটিয়া আসে, তখন বড় সুখ। সূর্য্য উঠিবার অনতিপূর্ব্বে যেমন আকাশ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠে, তেমনি এ সময়ও মনটাময় ছবি আঁকিয়া যায়। শুনিতে পাই, স্বর্গে চিরমিলন। তাহা কি তত সুখের? আমি যদি বিশ্বকর্ম্মা হইতাম (বিশ্বকর্ম্মাই স্বর্গ গড়িয়াছিল, না কে? কে জানে বাপু, রামায়ণ টামায়ণ অত আমাব মনে নাই) তবে এমন স্বর্গ গড়িতাম, যে প্রতি প্রেমিক প্রেমিকার মনে হইত, আমার হৃদয়নিধি আজি কালি ফিরিয়া আসিবেন। যাহা হউক, তোমার চিঠিগুলি পড়িতে লাগিলাম, আর আমি যত কাঁদিয়াছি, যত নিঃশ্বাস ফেলি-যাছি সব মনে পড়িতে লাগিল। তুমি যখন কাছে থাক, তখন মনে হয়, ছাড়িয়া গেলে নাকি আবার বাঁচিয়া থাকা যায়! সেই তুমি বিদেশে চলিয়া যাও, অথচ বাঁচিয়া থাকি, কিন্তু দগ্ধ হইয়া বাঁচিয়া থাকি। বাড়ীতে এত লোকজন, ছেলেপিলে, কিন্তু সব যেন খালি খালি বোধ হইত। সমস্ত জিনিষপত্র যাহা তুমি ব্যবহার করিতে, সমস্ত যেন তোমাকে স্মরণ করিয়া কাঁদে মনে হইত। ঐ চেয়ারে তুমি বসিয়া পড়িতে, তোমার চেয়ারখানিতে আমি বসিয়া থাকিতাম। মনে মনে অনুভব করিতাম, আমি শ্রীমতী সুরবালা দেবী নহি; আমি শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,—প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পাঠ করি, এবং সিটি কলেজে আইনের শ্রেণীতে হাজিরা লেখাইয়া অন্যের অলক্ষিতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়ি; আপাততঃ ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি। এই মনে করিয়া 'সুরি' 'সুরি' বলিয়া ডাকিতাম; নিজেই 'সুরি' সাজিয়া তাহার উত্তর দিতাম; কত কথা হইত আম ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া শয্যায় আরোহণ করিতাম। খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে তাহার মুখখানি দেখিতাম, ঠিক যেন ছোট তুমি! মা বলেন, ছেলেবেলায় ঠিক তুমি খোকার মত ছিলে। খোকার পানে চাহিয়া চাহিয়া তবু অনেক পরিমাণে সান্ত্বনা পাইতাম। সকলে বলে, মা ছেলেকে বেশী ভালবাসিবে, কারণ সেই কোমল শিশুর মুখে তাহার প্রিয়তমের মধুমূর্ত্তির আভাস দেখা যায়; এবং ঠিক এই কারণে বাপ মেয়েকে বেশী ভালবাসিবে। খোকা যদি না হইত, তবে তোমার বিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিতাম কে জানে!

আমার বিরহকালে দ্বিতীয় সঙ্গী ছিল ঐ ঘড়িটি। আমার এ শয়নকক্ষে খোকা ছাড়া ঐ একমাত্র সজীব পদার্থ। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ, কিন্তু ও বেচারীর নিদ্রা নাই—টক্ টক্ টক্ টক্। ভাবিতাম, এ আমাদের কি না জানে? কি না দেখিয়াছে? সেই ফুলশয্যার রাত্রে আমাকে কথা কহাইবার জন্য তোমার সাধাসাধি হইতে আরম্ভ করিয়া সেই ৪ঠা আষাঢ় ভোর রাত্রে তোমার বিদায় গ্রহণের দৃশ্য পর্য্যন্ত সব কথার এ সাক্ষী আছে। ইহাকে কত কথা বলি কিন্তু কোনও কথা কাণে তুলে না, এই একটা এর ভারি দোষ! এ যদি আমার সুখে সুখী হয়, দুঃখে

দুঃখী হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? তুমি যখন আসিবে তখন ইহাকে বলিতাম, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইয়া দে, তারপর আ-স্তে আ-স্তে আ-স্তে চলিবি। দশটা হইতে এগারোটা আর বাজে না। এগারোটা বাজিল ত বারোটা বাজিতে চাহে না! চারিটা বাজিয়া গিয়াছে তবু আর রাত্রি পোহায় না! সময় চুরি করিতে তাহাকে বলি না। দিনের বেলায় খুব শীঘ্র শীঘ্র চলিলেই ত হইল! চব্বিশ ঘণ্টায় দিনমান ত? সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা অবধি এই ষোল ঘণ্টা, চারি পাঁচ ঘণ্টায় চলিয়া সমস্ত রাত্রে বাকি সময়টা পোষাইয়া লও না বাপু! আর এখন? এখন বলি, তোর কাঁটাগুলো বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া ২৫শে আশ্বিনের সন্ধ্যা আনিয়া দে। তা সে শুনিবে না—সেই টক্-টক্-টক্-টক—গা জ্বলে যায়! একটু জোরে চল না মুখপোড়া! খেতে পাও না? তুমি যে কেবলা চাকরের বাপ হলে! তুই তোকারি করিলে, গালি দিলে না শুন. তুমি বলিব, আপনি বলিয়া কথা কহিব। হাতযোড় করিয়া, গলবস্ত্র হইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত আছি—স্তব করিতেও আপত্তি নাই! রবিবারে রবিবারে দম পায়, প্রত্যহ স্বহস্তে দুই বেলা দম দিব স্বীকার করিতেছি। এতেও সে শুনে না। কাঁটা দুটা ভাঙিগয়া ডায়েলে কালি ঢালিয়া দিলে তবে রাগ যায়।

এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে চিঠি পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে সকাল হইয়া গেল। তখন সব তুলিয়া রাখিয়া উঠিতে হইল। মনে হইতে লাগিল, আজ আমার চিঠি আসিবেই, কেহই রোধ করিতে পারিবে না। কতবার ভাবিলাম হে ঠাকুর, যদি স্বপ্ন দিলে, তবে আজ আমার একখানি চিঠি আনাইয়া দাও; অনেক কষ্টে বেলা দশটা অবধি কাটিল। সাড়ে দশটার মধ্যে চিঠি আসিবে। আমি তখন রান্নাঘরে; উৎকণ্ঠায় ডালে তিনবার নুণ দিয়া ফেলিয়াছি, মাছগুলো ভাজিতে গিয়া এক পিঠ পোড়াইয়া কালো করিয়া দিয়াছি, আনমনে জলের ঘটিটা ফেলিযা দিয়া ঘরের মেঝেতে আথার পাথার খেলাইয়াছি। মা আসিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বকুনি ধরিলেন। আমি ছুটিয়া পথের ধারের জানালায় গিয়া বসিলাম,—বকুনি শুনিবার আমার অবসর কোথায়? চিকের আড়াল হইতে দেখিতে লাগিলাম। কত লোকজন, গাড়ি, ঘোড়া, খাবারওয়ালা, জুতো সেলাই বুরুষ, কনেষ্টবল, ভিখারী, স্কুলের ছেলে, আপিসের বাবু যাইতেছে, আসিতেছে কিন্তু ডাকওয়ালার দেখা নাই। রাস্তার যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা লাল পাগড়ী দেখা গেল। বলিহারি, ইংরেজের কি বুদ্ধি রে! ডাকওয়ালার মাথায় লাল পাগড়ী কেন? না অনেক দূর হইতে অনেক লোকের মাঝে সে আসিতেছে দেখা যাইবে বলিয়া। ক্রমে সে নিকটে আসিল, হায়! হায়! ডাকওয়ালা নহে চাপরাশি! চুলোয় যাউক! ইংরাজ, যদি এত বুদ্ধি ধর,—তবে ডাকওয়ালা ছাড়া অন্য কাহাকেও লাল পাগড়ী পরিতে দাও কেন? আইন করিয়া ইহা দমন করা উচিত। ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সভ্যগণ এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন না কেন? তাঁহাদের কি স্ত্রী নাই? তাঁহারা কি এমনি করিয়া প্রবাসী স্বামীর পত্রের প্রতীক্ষায় জানালায় বসিয়া থাকিয়া কখনও আমার মত নির্দ্দয় ভাবে প্রতারিত হন নাই? যাহা হউক ক্রমে ডাকওয়ালা আসিল। দরজায় চাকরের হস্তে 'চিট্‌ঠি' এই শব্দ করিয়া চিঠিগুলি দিয়া গেল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই তিন মিনিটের পর ঝি আসিয়া আমার হাতে লেফাফা দিল, গোলাপী রঙের সমচতুষ্কোণ খামখানি, তাহার উপরে তোমার হাতের গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—শ্রীমতী সুরবালা দেবী।

জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমার জন্য কি আনিতে হইবে? আমার জন্য আর কি আনিবে ভাই? আমাদের আর এখন সখ করিবার বয়স আছে? খোকাবাবুর জন্য ভাল করিয়া পোষাক লইয়া আসিও, আর যাহা যাহা ভাল দেখ তাহাই আনিও। আর অধিনীর

জন্য যদি নিতান্তই কিছু আনিতে হয়, তবে একখানি টিয়ে রঙের কাপড়, তাহার জমিটা হইবে টিয়াপাখীর গায়ের মত সবুজ, পাড় হইবে ঠোঁটের মত লাল। এক বোতল কুন্তলীন আনিও—এবার পদ্মগন্ধ আনিও; গোলাপগন্ধ সুবাসিত অনেক মাথা হইয়াছে। খান দুই লেবুর সাবান, এক বাক্স ভাল সোপ, দুই জোড়া জুবিলীচুড়ি—সরুগুলি আনিবে, মোটাগুলি ভাল দেখিতে নয়; এক শিশি কুন্তলীনওয়ালাদের এসেন্স দেলখোস; সাদা কালো ছাই রঙের তিন বাণ্ডিল পশম, আর পার ত কোন ভাল দোকান হইতে একটি মাথায় পরিবার রূপার প্রজাপতি—এইগুলি আনিবে। অধিক আর কি লিখিব, আমাদের আর কি মানায়? লোকে নিন্দা করিবে যে! মার জন্য একগাছি আসল রুদ্রাক্ষের মালা, বাবার জন্য একখানি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পুস্তক আনিবে। আর আনিবে শ্রীযুক্ত বাবু অমলেন্দুকে; অধিক টাকা না থাকে বরং আর কিছু আনিবার প্রয়োজন নাই: শেষের লিখিত এই ফরমাসটি আনিলে চলিবে। কারণ ইহার দাম এক আনা মাত্র। ইতি—

তোমার
সুরো, সুরু—রা সুরি

কাজির বিচার

জগদ্বিখ্যাত আরব্যোপন্যাসের নায়ক বোগ্দাদাধিপতি হারুণ আল রশীদ একদিন সিংহাসনে বসিয়া পাত্র মিত্র সভাসদবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কন্যা ও পুত্রবধূ এই দুইয়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কাহাকে অধিক ভালবাসে?"

সভাসদ্‌গণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে সকলে অধিক ভালবাসে সুতরাং পুত্রবধূকেও সর্ব্বাধিক ভালবাসিবার কথা। অন্যেরা প্রতিবাদ করিলেন, পুত্রবধূ পরের মেয়ে সুতরাং কন্যাকেই সকলে অধিক ভালবাসিবে। কেহ বলিলেন, পুত্রবধূ পরের মেয়ে হইলেও ঘরে থাকে, কন্যা পরের ঘরে চলিয়া যায়, অতএব পুত্রবধূর প্রতিই স্নেহ গাঢ়তর হয়। অপরেরা ঠিক এই যুক্তিতেই উক্তমত খণ্ডন করিযা বলিলেন, যে সর্ব্বদা কাছে থাকে, তাহার প্রতি ততটা স্নেহোদ্রেক হয় না; যে দূরে থাকে, সে-ই অধিক স্নেহের অধিকারিণী হয়। এইরূপে বাদানুবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না।

এক বৃদ্ধ বিচক্ষণ সভাসদ্ এতাবৎকাল নীরবে বসিয়া ছিলেন। খালিফ তাঁহাকে বলিলেন —"মৌলবী সাহেব, আপনি কেন স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন না?" বৃদ্ধ, খালিফের এই প্রকার উক্তিতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন—"হে ঈশ্বর-প্রেরিতে মহম্মদীয় ধর্ম্মের রক্ষক, স্ত্রীলোকেরা যে পুত্রবধূ অপেক্ষা কন্যাকে অধিক ভালবাসে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি একটি গল্প জানি, অনুমতি হইলে নিবেদন করিতে পারি।" খালিফের অনুমতিক্রমে প্রবীণ মৌলবী এইরূপ গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে এক নগরে এক বৃদ্ধা বাস করিত। তাহার এক পুত্র আর এক কন্যা ছিল। এই কন্যা ও পুত্রবধূটি একই সময়ে আসন্নপ্রসবা হইলেন। পুত্রবধূর নাম ওয়াজিহন (সুন্দরী) এবং কন্যাব নাম জহুরণ (প্রকাশমানা) ছিল। এক রাত্রে একই সময়ে ওয়াজিহন ও জহুরণ দুইজনেরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তখনও ধাত্রী আসিয়া পোঁছে নাই। বিধবা দেখিল পুত্রবধূ ওয়াজিহনের পুত্র সন্তান ও কন্যা জহুরণের কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। ইহা বিধবাব সহ্য হইল না। সে ওয়াজিহনের পুত্রকে জহুরণের

সূতিকাগৃহে স্থাপন করিয়া দৌহিত্রীকে আনিয়া পুত্রবধূর নিকট রাখিয়া দিল। বাড়ীতে আর জনপ্রাণীও ছিল না;—প্রসূতিরা গতচেতন ছিলেন; একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ এ বিনিময় ব্যাপারের সাক্ষী রহিল না।

দুই বৎসর অতীত হইল। ওয়াজিহন কন্যাকে এবং জহুরণ পুত্রকে লালন পালন করিতেছেন;—কাহারও মনে অণুমাত্র সন্দেহেরও সঞ্চার হয় নাই।

একদিন সায়ংকালে ওয়াজিহন স্বীয় কক্ষে নামাজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার পালিত শিশুকন্যাটি কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। জহুরণের পুত্রটি নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা হইলে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শঙ্কার ভাব প্রত্যেক মাতৃহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং তাবৎ জীবজগতে মাতৃস্নেহের একটা প্রবাহ বহিয়া যায়।

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সেই প্রার্থনা-পরায়ণা জননীর হৃদয়ে সেই মাতৃস্নেহ-প্লাবিত সন্ধ্যাকালে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহার স্তনে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। কে যেন তাঁহার কাণে বলিয়া দিল—"এ সন্তান তোমারই।"

সেই অবধি তিনি অতি নিপুণতা ও সাবধানতার সহিত সেই বালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন এবং সঞ্চালনের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামীর সহিত ঐ বালকের সমস্তই আশ্চর্য্যরূপ মিলিতে লাগিল। একদিন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট এ কথা বলিলেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর পাইলেন—"বাঁদি, যদি বারদিগর (দ্বিতীয়বার) ও কথা মুখ হইতে বাহির করিবি, তবে তোর জিহ্বাটা জলন্ত লৌহ দিয়া পোড়াইয়া দিব।" এইরূপ ব্যবহারের পর ওয়াজিহনের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার গুণবতী শ্বাশুড়ীই সেই সন্দিগ্ধ অপকার্য্যের কর্ত্রী! অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সেই নগরের কাজির নিকট বিচারপ্রার্থিনী হইলেন।

কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কোন সাক্ষী সাবুদ আছে?"

ওয়াজিহন বলিলেন—"আমার সাক্ষী স্বর্গে ঈশ্বর এবং মর্ত্ত্যে আমার এই মাতৃহৃদয়।"

কাজি মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া এই মোকর্দ্দমার কিনারা করিবেন? দুই চারি দিনের মধ্যে একথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ক্রমে আপনার পূর্ব্বপুরুষ (নাম করিলে গোস্তাকি হইবে) তদানীন্তন বোগ্দাদাধিপতির কর্ণেও একথা পৌঁছিল। তিনিও অপর সকলের ন্যায় সমুৎসুক হইয়া কাজির বিচারফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই তিন মাস অতীত হইয়া গেল তবুও মোকর্দ্দমার কিছুই হইল না। অবশেষে খালিফ হুকুম দিলেন, তিন মাসের মধ্যে যদি কাজি বিচার সমাধা করিতে না পারেন, তবে তিনি সপরিবারে নির্ব্বাসিত হইবেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাজি সাহেব যারপরনাই দুশ্চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে ভাবিলেন আমার নির্ব্বাসন ত হইবেই, অতএব সে অপমান সহ্য করা অপেক্ষা এখন হইতেই ফকিরী গ্রহণ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করি। যদি ঈশ্বর দয়া করেন—যদি কোন উপায় স্থির করিতে পারি—তবেই ফিরিব, নতুবা মক্কায় গিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিব। এইরূপে কাজি গৃহত্যাগ করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে, পর্ব্বত পার হইয়া, নদী পার হইয়া, জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিলেন। অষ্টাদশ দিবসের পর সন্ধ্যাকালে এক দরিদ্র গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সেই গৃহস্থের একখানি মাত্র ঘর, তাহাতেই সে সপরিবারে শয়ন করিত। অতিথিকে বলিল—"মহাশয় আপনি যদি ঐ গোশালায় রাত্রি যাপন করিতে প্রস্তুত হন, তবে অবস্থিতি করুন।" কাজি স্বীকৃত হইলেন।

পথশ্রমে তিনি নিতান্ত কাতর ছিলেন। গৃহস্থ প্রদত্ত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া

অবিলম্বেই নিদ্রিত হইলেন। অনেক রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পৃথিবীর যাবতীয় দুর্ভাগ্য মনুষ্যের মত তিনিও সেই ঘোর অন্ধকারময়ী স্তব্ধ রজনীতে স্তব্ধভাবে আপনার অদৃষ্টান্ধকারের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জনকতক অস্ত্রধারী দস্যু সেই গোশালায় প্রবেশ করিল। দুইটি গাভী এবং তাহাদের দুইটি বৎস বাঁধা ছিল—দস্যুরা একটি গাভী এবং একটি বৎসকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে পরিত্যক্ত গাভী ও বৎস অত্যন্ত কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। গাভীটি "হা বৎস" এবং বৎসটি "হা মাতা" বলিয়া রোদন করিতেছিল। কাজি বিদ্যাবলে পশুপক্ষী-দিগের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। তিনি এই ক্রন্দন ব্যাপারের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে শুনিলেন, গাভীটি বলিতেছে—"বাছা তোর মা গিয়াছে; আমার বৎস গিয়াছে; আর তুই আমার সন্তান হইয়া থাক্, আমি তোর মা হইয়া সান্ত্বনা লাভ করি।" বৎসটি বলিল—"মা, তুমি আমায় খাওয়াইবে কি? তোমার বৎস স্ত্রীজাতীয় ছিল; আমি পুরুষ; তোমার অল্প পরিমিত স্তনদুগ্ধে কেমন করিয়া আমার ক্ষুধা নিবারণ হইবে?"

এই কথা শুনিতেই কাজি সাহেবের মস্তিষ্কে একটি সত্যের বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। ভাবিলেন ঠিক কথা। ঈশ্বর স্ত্রী জাতিকে দুর্ব্বল এবং পুরুষ জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়াছেন। উভয়ের দেহপুষ্টির জন্য সমান আহার কখনও প্রয়োজন হইতে পারে না। যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় তাহাও এই অপূর্ব্ব কৌশলে সৃষ্ট বিশ্বজগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই পুং-বৎস-মাতা গাভী এবং স্ত্রী-বৎস-মাতা গাভীর স্তন্যপরিমাণ সমান নহে।

এতদিনে সে মোকর্দ্দমার কিনারা হইল। কাজি প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় ঈশ্বর ও মহম্মদকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রফুল্ল মনে দেশে ফিরিলেন। বোগদাদে রাজসন্নিধানে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদিনে দেশময় এ কথা প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছিল। খালিফ কাজিকে আজ্ঞা করিলেন—"তুমি বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী প্রভৃতি সমস্ত লইয়া এই রাজধানীতে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিচার কার্য্য সম্পাদন করিবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে কাজি রাজসভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। রাজ্যের সমস্ত গণ্য মান্য লোক—আমির, ওমরাহগণ উপস্থিত হইয়াছেন, বিচার কার্য্য আরম্ভ হইল।

কাজি পূর্ব্ব হইতে প্রায় একশত চতুষ্পদ পশু রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি সভাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। খালিফ কহিলেন—"এ সব কি হইবে?" কাজি কহিলেন, "এ সকল সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত।"

সকলে একান্ত কৌতূহলের সহিত বিচার প্রণালী দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে বাদিনী তাঁহার মোকর্দ্দমার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। প্রতিবাদিনী দোষ অস্বীকার করিল। তখন বৃদ্ধা ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। সে বলিল—"সন্তান দুইটি ভূমিষ্ঠ হইবার বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম।" প্রতিবেশিনীরা সাক্ষ্য দিল—"আমরা সন্তান জন্মের রাত্রি প্রভাত হইলে দুইজনেরই সূতিকাগারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ওয়াজিহনের কোলে কন্যা এবং জহুরণের কোলে পুত্র সন্তানই দেখিয়াছিলাম।"

ইহার পর কাজি বলিলেন—"এখন বাক্‌শক্তিসম্পন্ন সাক্ষীদিগের পরীক্ষা শেষ হইল; এইবার সেই শক্তি হইতে বঞ্চিত সাক্ষীগুলির পরীক্ষা লওয়া যাইতেছে;—মাননীয় সভাসদ্-বর্গ এবং সর্ব্বসাধারণ মনোযোগ করুন।"

পূর্ব্বকথিত পশুপাল হইতে একটি পুং-বৎসযুক্ত এবং স্ত্রী-বৎসযুক্ত গাভী আনা হইল, বৎস দুইটি সমবয়স্ক। দুইটি সমভার রৌপ্য পাত্রে গাভী দুইটির দুগ্ধ দোহন করণান্তর তুলাদণ্ডে পরিমিত করা হইল। সর্ব্বসাধারণ প্রত্যক্ষ করিল, পুং-বৎসযুক্ত গাভীটির দুগ্ধ অধিক হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহিষ, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হরিণ প্রভৃতি বহু বহু পশুমাতার পরীক্ষা লওয়া হইল এবং প্রত্যেক বারেই ফল পূর্ব্বানুরূপ হইল।

পরীক্ষা শেষ হইলে কাজি বলিতে লাগিলেন—"হে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান সভাসদ্‌গণ, আপনারা জানেন, ঈশ্বর স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতিকে বলবত্তর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারণে সর্ব্বজীবের আদিম খাদ্যভাণ্ডারে তিনি পুরুষের জন্য অধিক এবং স্ত্রীজাতির জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প খাদ্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাহাও আপনারা প্রত্যক্ষ করিলেন। এক্ষণে (ওয়াজিহন ও জহুরণকে দেখাইয়া) এই স্ত্রীলোক দুইটির স্তন-দুগ্ধ এইরূপে তুলনা করিয়া দেখা যাউক, যাহার দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হইবে, তাহাকেই পুত্র সন্তানের মাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে। কেমন, এ প্রকার নিষ্পত্তিতে আপনাদের সকলের সম্মতি আছে ত?"

সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"আছে।"

বলা বাহুল্য ওয়াজিহনের দুগ্ধই গুরুতর হইল। ওয়াজিহন সভা সমক্ষে আপনার পুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন। জহুরণকে তাঁহার কন্যা প্রত্যর্পিত হইল।

খালিফ এই বিচার পদ্ধতি দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে বহুমূল্য মণিহার মোচন করিয়া কাজি সাহেবের গলে পরাইয়া দিলেন। অল্পদিনেব মধ্যেই তাঁহাকে রাজধানীর প্রধান কাজির (চীফ-জষ্টিস্) সম্মানসূচক পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

দণ্ডস্বরূপ সেই শ্বাশুড়ীকে পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থিত এক জনহীন প্রান্তরে নির্ব্বাসিত করা হইল।

কাটা মুণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোগদাদের বাদশাহ হারুণ-অল-রশিদ একজন ভুবন-বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে, তাঁহার বংশে আলি মহম্মদ নামক একজন বাদশাহ সিংহাসন প্রাপ্ত হ'ন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, দেশে মহম্মদীয় ধর্ম্ম আর পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইতেছে না। দেশে অনেক লোক প্রতিমাপূজক হইয়া উঠিতেছে, নানাবিধ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। তাহা দেখিয়া বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্থির করিলেন, তিনিও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ প্রাতস্মরণীয় হারুণ-অল-রশিদের ন্যায় তেব্‌দিল অর্থাৎ ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিবেন এবং ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিগণেব কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। রাজ্যের কোথায় কোন্ ব্যক্তি খাইতে পাইতেছে না, সমস্ত নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহারও প্রতিবিধান করিবেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি নানাপ্রকার ছদ্মবেশে প্রতি রজনীতে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কোনও দিন ফকীরের বেশ, কোনও দিন

খাজা অর্থাৎ সওদাগরের বেশ, কোনও দিন আমির ওমরাহের বেশ—ফল কথা তাঁহার ছদ্মবেশ এতই গোপনীয় ছিল যে, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। কেবল তাঁহার দুই চারিজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও অনুচর সে বিষয় অবগত ছিল।

ইতিমধ্যে রাজ্যে প্রবল অসন্তোষ উপস্থিত হইল, এমন কি বিদ্রোহ হয় হয়। তখন বাদশাহ মনে করিলেন, এখন আমার এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, আমার নিজ বিশ্বস্ত মন্ত্রীগণও কিছুই জানিতে না পারে। তাহাদের নিজের মনের অবস্থা কিরূপ, তাহারও অনুসন্ধান আবশ্যক।

ছদ্মবেশের পোষাক প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন দরজিকে নিযুক্ত করিতেন। এবার কোনও মন্ত্রীকে কিছু না বলিয়া মনসুরি নামক তাঁহার অতি বিশ্বস্ত গোলামকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, "সহরে গিয়া কোনও একজন দরজিকে লইয়া আইস। গভীর রাত্রি হইলে তাহাকে আনিবে। এরূপ সাবধানে আনিবে যে, সে দরজিও যেন না জানিতে পারে যে, সে কোথায় আসিতেছে।"

গোলাম নত হইয়া বলিল—"বেশ আস্তান। প্রভুর আদেশ এইক্ষণেই পালন করিব।"

এই বলিয়া মনসুরি বিদায় লইল। সন্ধ্যা হইলে বেজেস্তান অর্থাৎ সহরের যে বাজারে বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়, তথায় যাইয়া একজন সামান্য দরজির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র দুর্গন্ধময় গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি সামান্য দোকানে গিয়া দেখিল, এক বৃদ্ধ দরজি বসিয়া একটা পুরাতন কোট মেরামত করিতেছে। দরজির দোকানে মৃত্তিকার প্রদীপে আলো জ্বলিতেছে, তাহার চক্ষুতে চশমা লাগানো। দেখিয়া মনসুরি ভাবিল—"এই ঠিক লোক পাইয়াছি।"

দোকানে উঠিয়া মনসুরি বলিল—"খলিফা সাহেব! সেলাম আলেকুম।"

দরজি তখন নিজকার্য্য ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "আলেকুম সেলাম, কি চান আপনি?"

মনসুরি কহিল—"আপনার নাম কি?"

"আমার নাম আবদুল্লা, কিন্তু লোকে আমাকে বাবাদল বলিয়া ডাকে।"

"আপনি কি দরজি?"

"হাঁ, আমি দরজির কার্য্যও করি এবং মাছুয়াবাজারে যে ক্ষুদ্র মসজিদ আছে, সেখানে মুয়েজ্জিনের কার্য্যও করিয়া থাকি। আপনার কি হুকুম?"

"বাবাদল সাহেব, একটা পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিবে?"

"কেন পারিব না? অবশ্য পারিব।"

"অনেক পয়সা পাইবে।"

"উত্তম কথা।"

মনসুরি তখন বলিল—"কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। যেখানে তোমাকে পোষাকের মাপ লইতে হইবে, সে অতি গোপনীয় স্থান। আমি রাত্রিতে তোমার চোখে রুমাল বাঁধিয়া সেখানে লইয়া যাইব। রাজি আছ?"

দরজি তখন বলিল—"তাই ত! এ যে বড় বিষম কথা। আজকাল যেরূপ দিন পড়িয়াছে, তাহাতে ভয় হয়। আচ্ছা, তবে যদি আমাকে ভালরূপে বখ্‌শিস দাও আমি সম্মত আছি। বেশী পয়সা পাইলে আমি স্বয়ং ইব্লিশ অর্থাৎ সয়তানের জন্যও পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।"

মনসুরি বলিল—"তবে এই লও" বলিয়া দরজির হস্তে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল।

একবারে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা গরীব দরজি জীবনেও কোন দিন পায় নাই, মুদ্রা পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল—"কখন যাইতে হইবে?"

মনসুরি কহিল—"রাত্রি বারোটার সময় এই দোকানে থাকিও, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া মনসুরি প্রস্থান করিল।

বাবাদল তখন নিজের স্ত্রীকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গেল।

তাহার স্ত্রীর নাম দিলফেরেব। সেও দরজির মতই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর নিকট এই সুসংবাদ শুনিয়া এবং স্বর্ণমুদ্রা দুইটি পাইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। সেই রাত্রিতে তাহারা গরম গরম কাবাব কিনিয়া আহার করিল। কিছু আঙ্গুর ও মিষ্টান্নও আনিয়া ভোজন করিল। ভোজনান্তে উত্তম দুই পেয়ালা কাফি প্রস্তুত করিয়া দুইজনে পান করিতে করিতে মনের সুখে গল্প করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি যখন বারোটা বাজিল, বাবাদল তখন নিজ দোকানে গিয়া দর্শন দিল। মনসুরিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিনা বাক্যব্যয়ে মনসুরি তখন বাবাদলের চক্ষুতে রুমাল বাঁধিল। তাহার পর, নানা পথ দিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, একটি পশ্চাতের দ্বার দিয়া তাহাকে রাজবাটীতে প্রবেশ করাইল। সুলতানের একটি গোপনীয় কামরায় লইয়া গিয়া তাহার চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া দিল।

বাবাদল চক্ষু খুলিলে দেখিল, একটি সুন্দর সুসজ্জিত কামরা, কিন্তু সেখানে একটি মাত্র ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। মনসুরি বলিল—"এখানে থাক, আমি এখনই আসিতেছি"—বলিয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে শালের রুমালে জড়ান একটি পদার্থ লইয়া মনসুরি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এই দেখ, একটি ফকীরের পোষাক। এখন দেখিয়া বল, কয় দিনে এরূপ একটি পোষাক তৈয়ারি করিতে পারিবে?" বলিয়া মনসুরি প্রস্থান করিল।

দরজি তখন সেই পোষাকটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষা শেষে, সেটিকে আবার শালের রুমালখানিতে জড়াইয়া রাখিয়া দিল। মনসুরির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে একজন উন্নতকায় উত্তম পোষাকপরা লোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গরীব দরজির প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া, শালের রুমালে বাঁধা সেই বাণ্ডিলটি উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বেচারা দরজি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। নীরবে বসিয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিল।

সেই সময় আবার দরজা খুলিল, অন্য একজন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহারও হস্তে শালের রুমালে জড়ানো একটি বাণ্ডিল। প্রবেশ করিয়া সে ব্যক্তি অত্যন্ত নত হইয়া দরজিকে বারংবার সেলাম করিতে লাগিল। কাছে আসিয়া সেই বাণ্ডিলটি দরজির পদতলে রাখিয়া, মৃত্তিকা চুম্বনপূর্বক সে ব্যক্তিও প্রস্থান করিল।

ইহা দেখিয়া দরজি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এ সব কি? আমাকে এত সেলাম করেই বা কেন, কোথায় আসিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; কি বিপদই না জানি হইবে।"

ইতিমধ্যে মনসুরি আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, "তবে বাণ্ডিল উঠাও—বল কয়দিনে এরূপ পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিবে?"

বাবাদল বলিল, "তিন দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া দিব।" বলিয়া বাণ্ডিল উঠাইয়া লইল। মনসুরি দরজির চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, এবং

অন্যপথ ঘুরাইয়া, তাহার দোকানে পৌঁছাইয়া দিল। চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া বলিল —"তিন দিন পরে আবার আসিব। যদি পোষাকটি প্রস্তুত পাই, তবে আর দুইটি স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়া পোষাক লইয়া যাইব"—বলিয়া মনসুর প্রস্থান করিল।

বাবাদল তখন তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিল। দিলফেরেব স্বামীর জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বাবাদলকে দেখিয়া বলিল, "কি হইল ?"

বাবাদল বলিল, "নমুনা লইয়া আসিয়াছি, কিছুই না, কেবল একটা সামান্য ফকীরের পোষাক তৈয়ারি করিতে হইবে। তৈয়ারি হইলে আরও দুই মোহর দিবে বলিয়াছে।"

দিলফেরেব বলিল, "কিরূপ নমুনা দেখি ?"

দরজি বলিল, "এখন অধিক রাত্রি হইযাছে, শয়ন করা যাউক। কল্য প্রভাতে দেখাইব।"

দিলফেরেব বলিল, "না এখনই দেখাও। আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। না দেখিলে রাত্রে আমার নিদ্রা হইবে না।" এ কথা বলিয়া দিলফেরেব নিজেই বাণ্ডিলটি খুলিতে লাগিল। খুলিবামাত্র তাহা হইতে ফকীরের পোষাক বাহির হইল না, বাহির হইল একটা কাটা মুণ্ড! টাট্‌কা কাটা একটা মানুষের মুণ্ড রুমাল হইতে পড়িয়া ঘরের মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। বৃদ্ধ দরজি ও তাহার স্ত্রী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। মুণ্ড দেখিয়াই বুড়া বুড়ি ভয়ে হস্ত দ্বারা নিজ নিজ চক্ষু আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কাঁপিতে লাগিল। তাহার পর চক্ষু খুলিয়া পরস্পরের প্রতি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে বুড়ির বড় রাগ হইল। দাঁত মুখ খিঁচাইয়া স্বামীকে বলিল, "হতভাগা বুড়া! খুব কাজ আনিয়াছিস্। এইবার বড় লোক হইবি! রাত পোহাইলে পুলিশ আসিয়া হাতে দড়ি দিয়া লইয়া যাইবে। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে। তখন খুব বড়লোক হইবি!"

বুড়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আল্লা সেল্লা! বাবা সেল্লা! তাহার মা জাহান্নমে যাউক, তাহার বাপ জাহান্নমে যাউক, যে আমার উপর এই মহা বিপদ নিক্ষেপ করিয়াছে। যখনই শুনিলাম, চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তখনই ভাবিয়াছিলাম যে, তাহাদের মৎলব ভাল নয়। আল্লা! আল্লা! এখন কি করি? সে পাজির বাড়ীও চিনিতে পারিব না যে গিয়া কাটা মুণ্ড ফিরাইয়া দিব। দিলফেরেব! এখন কি করা যায়?"

বৃদ্ধা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল—"যেমন করিয়াই হউক, এ কাটা মুণ্ডটাকে এখনি কোথাও সরাইতে হইবে। নহিলে প্রভাত হইলেই সর্ব্বনাশ।"

দরজি বলিল, 'প্রভাত হইতে আর দেরী কি? রাত্রি ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। কোথায় এটাকে ফেলা যায় ?"

বৃদ্ধা আবার কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "এক কাজ কর। আমাদের বাড়ীর পাশে যে হাসান রুটিওয়ালা রহিয়াছে, সে ভোরে উঠিয়া রুটি প্রস্তুত করিবে বলিয়া রোজ রাত্রিতে তুন্দুরায় ময়দা ভরিয়া চুল্লীর মুখের কাছে রাখিয়া দেয়। একটা তুন্দুরাতে এই মুণ্ডটা ভরিয়া তাহার চুল্লীর কাছে রাখিয়া আইস, সে ভোরে উঠিয়া আগুনে জ্বালিয়া অন্য তুন্দুরাসহ এটাকেও ভিতরে ভরিয়া দিবে, তাহা হইলেই মুণ্ডটা অর্দ্ধেক জ্বলিয়া যাইবে, আর কেহ চিনিতে পারিবে না।"

বাবাদল বলিল, "বাহবা দিলফেরেব! সুন্দর উপায় বলিয়াছ। তবে এখনই তাহাই কর।"

বুড়ি তখনই গিয়া হাসান রুটিওয়ালার চুল্লীর মুখের কাছে তুন্দুরায় ভরিয়া মুণ্ডটা রাখিয়া আসিল। সে ফিরিয়া আসিলে, দরজি উত্তমরূপে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া

দিল। তখন দুইজনে শয্যায় শয়ন করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "যাহা হউক, এই দামী শালের রুমালখানা ত আমাদের লাভ হইয়া গেল!"

রাত্রি শেষ হইলে হাসান রুটিওয়ালা উঠিয়া নিজ পুত্রকে ডাক দিয়া বলিল, "মামুদ! —ওরে মামুদ! ওঠ্। আগুন জ্বাল্।"

তখন পিতাপুত্রে বাহির হইয়া আসিল। কাঠ, খড়, শুক্না পাতা প্রভৃতি নানা দাহ্য দ্রব্য চুল্লীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া অগ্নি দিল।

একটা কুকুর রুটির টুক্রা টাক্রা খাইবার জন্য দোকানের নীচে রাস্তায় সর্ব্বদাই বসিয়া থাকিত। সেই কুকুরটা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকার করে আর মধ্যে মধ্যে নাক তুলিয়া যেন কি শুঁকিতে থাকে।

হাসান বলিল, "মামুদ! দেখ্ ত, কুকুরটা অমন করে কেন?" মামুদ একটা কাঠ লইয়া কুকুরকে তাড়াইতে গেল, কিন্তু কুকুরটা এক লম্ফে দোকানে উঠিয়া একটা তুন্দুরায় টান দিল। হাসান ও মামুদ মহাক্রোধে কুকুরকে মারিতে যাইতেছিল, এমন সময় কুকুরের টানাটানিতে তুন্দুরার মুখ খুলিয়া গিয়া কাটামুণ্ড বাহির হইয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া হাসান বলিল, "আল্লা আল্লা! এ কোন্ শয়তানের কার্য্য? কি সর্ব্বনাশ! কে খুন করিয়া এ মাথা এখানে রাখিয়া গেল? কি সৌভাগ্য যে কুকুরটা বুঝিতে পারিয়াছিল, নহিলে আমাদের চুল্লী অপবিত্র হইয়া যাইত। আল্লা খুব বাঁচাইয়াছেন। এখন এ মুণ্ডটা কি করা যায়? এটাকে এখানে দেখিলে লোকে ত আমাদিগকেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবে! শেষে কি ফাঁসি যাইব নাকি?"

মামুদ বলিল, "বাবা! এটা ত সরাইতে হইতেছে। এখন প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই, কি করা যায়?"

হাসান বলিল, "আমাদের দোকানের পাশে যে কিওর আলি নাপিতের দোকান আছে, সেইখানেই এটাকে রাখিয়া আয়। কিওর আলি এখনি দোকান খুলিবে, তাহার এক চক্ষু অন্ধ, সে তোকে দেখিতে পাইবে না। এই বেলা যা।"

ইতিমধ্যে কিওর আলি আসিয়া আপনার দোকান খুলিল। তখনও ভাল আলো হয় নাই। মামুদ আস্তে আস্তে গিয়া দেখিল, কিওর আলি পার্শ্বের ঘরে গিয়া জল গরম করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মামুদ তখন একটা বাঁশ মুণ্ডের গলার ভিতর ঢুকাইয়া, সেটাকে একখানা কুশীর্ব উপর খাড়া করিয়া দিল। খানকতক তোয়ালিয়া কুশীর আসে পাশে জড়াইয়া দিল। এইরূপ রাখিয়া মামুদ আস্তে আস্তে পলায়ন করিল।

জল গরম করিয়া কিওব আলি দোকানে প্রবেশ করিল। একে অন্ধকার, তাহাতে এক চক্ষু নাই, কিওর আলি ভাবিল, কোনও খরিদ্দার মাথা কামাইবার জন্য আসিয়া বসিয়াছে। তাই সে বলিল, "সেলাম আলেকুম ভাই! আজ যে এত সকালে আসিয়াছ?" এই বলিয়া আপন মনে একটা টিনের পাত্রে একটু গরম জল ঢালিল, সাবান লইল, ক্ষুরখানি চোখাইয়া, খরিদ্দারেরর নিকট আসিয়া, সাবান জল মাখাইবার জন্য মাথাটায় হাত দিল। মাথা তৎক্ষণাৎ কুশী হইতে মেঝেতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া নাপিত ভয়ে এক লম্ফে দোকান হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। নামিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও রাস্তায় কোন লোক চলাচল করিতেছে না। তখন আবার আস্তে আস্তে দোকানে উঠিয়া, মুণ্ডটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। আপন মনে বলিল, "এ যে দেখিতেছি শুধুই মাথা, দেহটা তবে কোথায় গেল?" পরে মুণ্ডটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "অ্যাঁ! তুই কোথা হইতে আসিলি? আমাকে ফাঁসাইবার চেষ্টা? আচ্ছা, আচ্ছা, আমার একটা মাত্র চক্ষু বলিয়া মনে করিস্ না যে, আমি বড় নিরীহ ব্যক্তি। তোকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেছি। আমার দোকানের পাশে ইয়ানাকি

নামক গ্রীসদেশীয় একজন কাবাবচি আছে, সে তাহার স্বধর্ম্মাবলম্বী জু কাফেরগণের জন্য কাবাব তৈয়ারী করে। কাবাবের জন্য সে যে সকল মাংস কাটিয়া রাখিয়াছে, তোকে তাহারই মধ্যে ফেলিয়া আসি, কাবাবচি আসিয়া অন্য মাংসের সঙ্গে তোকেও কাটিয়া কুটিয়া কাবাব বানাইয়া ফেলিবে। মরুক কাফের বেটারা মনুষ্য-মাংসের কাবাব খাইয়া।"

ইয়ানাকির কাবাবের দোকান ছিল, সরবত প্রভৃতি নানাবিধ পানীয় দ্রব্যও সে বিক্রয় করিত। আর গোপনে বিক্রয় করিত মদ্য। কিওর আলি মাঝে মাঝে গোপনে ইয়ানাকির দোকানে গিয়া মদ্য পান করিয়া আসিত। কাটা মুণ্ডটা তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া, পশ্চাতে লইয়া কিওর আলি ইয়ানাকির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ইয়ানাকি বলিল, "আদব আরজ মিঞা। আজ এত ভোরেই তৃষ্ণা পাইয়াছে নাকি?"

কিওর আলি বলিল, "আদব আরজ! হাঁ এখন বেশী নয়, এই এক ছটাক আন্দাজ দোয়াস্তা, একটু বেশী সরবত মিশাইয়া আনিয়া দাও ত. গলাটা বড় শুকাইয়াছে।"

ইয়ানাকি তখন হাসিতে হাসিতে পাশের ঘরে মদ্য মিশ্রিত সরবত প্রস্তুত করিতে প্রবেশ করিল। কিওর আলি এই সুযোগে মাংসের ঝুড়ির ভিতর কাটা মুণ্ডটা লুকাইয়া রাখিল। পরে ইয়ানাকি আসিলে. সরবত পান করিয়া বলিল—"গরমাগরম খানিকটা কাবাব তৈয়ারি করিয়া আমার দোকানে পাঠাইয়া দাও ত, বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" এই বলিয়া কাবাবচিকে পয়সা দিয়া কিওর আলি প্রস্থান করিল। মনে ভাবিয়াছিল, কাবাব পাঠাইয়া দিলে তাহা ফেলিয়া দিলেই চলিবে; ঐ ঝুড়ির মাংস হইতেই কাবাব প্রস্তুত করিবে ত? কিছু পয়সা নষ্ট হইল, কিন্তু একটা মহা বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম।

এদিকে কিওর আলি চলিয়া গেলে, ইয়ানাকি তাহার কাবাবের জন্য এক টুকরা মাংস ঝুড়ি হইতে খুজিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "তাজা মাংস দিতেছি না। মুসলমানের পক্ষে বাসি মাংসই যথেষ্ট।" এই বলিয়া এক টুকরা বাসি মাংস অন্বেষণ করিতে করিতে, কাটা মুণ্ড বাহির হইয়া পড়িল।

ইয়ানাকি তখন আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ! এ কি? এটা কোথা হইতে আসিল? কাহার মুণ্ড? দেখিতেছি মুসলমানের মুণ্ড। বেশ হইয়াছে। এইরূপ সব মুসলমানের মুণ্ড আমি কাটিতে পারি, তবে বড় সুখ হয়। মুসলমানেরা আমাদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করে। ইচ্ছা করে সব মুসলমানের মুণ্ড কাটিয়া কাবাব বানাই।"

কিন্তু পরক্ষণেই ইয়ানাকির মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে মনে বলিল, "এ ত খুন হইয়াছে দেখিতেছি। কে আমার শত্রু আছে খুনটা আমার ঘাড়েই চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু এখন এ মুণ্ডটা লইয়া কি করি? কোথায় ফেলি?"

ইয়ানাকি চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিল. "ঠিক হইয়াছে। রাজদণ্ডে দণ্ডিত সেই জু-টার মৃতদেহ পথের ধারে পড়িয়া আছে, সেইখানেই এটা রাখিযা আসি।"

তৎকালে মুসলমান রাজ্যে যদি রাজদণ্ডে কোনও ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদ হইত. তবে তাহার দেহ তিন দিন অবধি রাজপথে ফেলিয়া রাখা হইত। উদ্দেশ্য, ইহা দেখিয়া সকলে ভয পাইবে, কেহ আর সেরূপ গুরুতর অপরাধ করিতে সাহসী হইবে না।

তখন মাত্র প্রভাত হইয়াছে। রাজপথে লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। ইয়ানাকি সেই কাটা মুণ্ডটা কাপড়ে জড়াইযা লইযা কিছুদূরে পতিত সেই জু'র মৃতদেহের নিকটে গেল। সে ব্যক্তির শিরচ্ছেদ হইয়াছিল। সেই দেহের পা দুইটার মধ্যস্থানে কাটা মুণ্ড রাখিযা পলাইয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমে রৌদ্র উঠিল, বেলা বাড়িতে লাগিল। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইল। যে পথে জুর মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, সেই পথে লোক গিয়া দেখিল, অদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার, একটা মানুষের দুইটা মাথা, একটা উপরে একটা পায়ের নিকট।

এই সংবাদ সহরে প্রচার হওয়া মাত্র দলে দলে লোক দেখিতে ছুটিল। ক্রমে তাহাদের সঙ্গে একজন সিপাহীও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পায়ের নিকট মুণ্ডটা দেখিয়া বলিল, "আল্লা, আল্লা, ইয়া আল্লা—এ ত কাফেরের মস্তক নয়, এ যে আমাদের সেনাপতি আগা সাহেবের মুণ্ড! কে তাঁহাকে খুন করিল? খুন করিয়া আবার বিধর্মী জুর পদতলে মুণ্ডটি রাখিয়া গিয়াছে? এত অপমান!" বলিয়া মহাক্রোধে সিপাহী ছুটিয়া গিয়া নিজের দলের সমস্ত সিপাহীকে সংবাদ দিল।

এই আগা সাহেব কিছুদিন হইতে বাদশাহের কোপ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। বাদশাহ সন্দেহ করিতেন, সেনাপতি ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই সৈন্যগণ কেহ কেহ বলিল, "নিশ্চয়ই বাদশাহের হুকুমে আমাদের আগা সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে।" কেহ বা বলিল—"তাহা হইলে বাদশাহ মুণ্ডটা গোপনে নষ্ট করিয়া ফেলিতেন, ওরূপ করিয়া বিধর্মী জুর পদতলে ফেলিয়া অপমান করিবেন কেন? ইহা নিশ্চয়ই জু-গণের কাজ। মার তাহাদের।"

বলিতে বলিতে সিপাহীগণ ছুটিয়া ঘটনাস্থলে আসিল। আগা সাহেবের মস্তক দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত শোক করিতে লাগিল এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জু-জাতিকে যেখানে দেখিতে পাইল সেইখানেই প্রহার করিতে লাগিল। সহরে ভয়ানক শান্তিভঙ্গ উপস্থিত হইল। জু-গণ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

কিন্তু বাস্তবিক জু-গণ আগা সাহেবকে হত্যা করে নাই। যে রাত্রে বাবাদল সুলতানের নিকট নীত হইয়াছিল, সে রাত্রেই সুলতান একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে হুকুম দিয়াছিলেন—"যাও আগা সাহেবের মাথা কাটিয়া আমায় আনিয়া দাও।"

যে সময় বাবাদল সুলতানের গোপন কামরায় বসিয়া ছিল, সেই সময়েই আগা সাহেবের মাথা কাটিয়া সেই বিশ্বস্ত ভৃত্যের ফিরিবার কথা।

এ দিকে, পাছে মনসুরি জানিতে পারে যে, বাদশাহ কি ছদ্মবেশে এবার নগর ভ্রমণ করিবেন তাই বাদশাহ মনসুরির চক্ষেও ধুলো দিবার জন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। মনসুরি বাবাদলকে ফকীরের ... আনিয়া দিয়াছিল। সুতরাং মনসুরি জানিবে, বাদশাহ ফকীরের বেশে রাত্রি ভ্রমণে যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। তাই বাদশাহ স্বয়ং আসিয়া বাবাদলের নিকট হইতে সে শালমোড়া বাণ্ডিল উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই শালে একটা সওদাগরের বেশ জড়াইয়া বাবাদলকে দিবেন, তাহা হইলে মনসুরিও জানিতে পারিবে না। বাদশাহ বাণ্ডিলটা লইয়া গেলে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, সে-ই আগা সাহেবের মাথা আনিতে গিয়াছিল। একে সে কামরায় আলোক অতি ক্ষীণ ছিল, তাহাতে বাদশাহের গোপন কামরায় অন্য কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই, তাই সে বিশ্বস্ত ভৃত্য ভাবিয়াছিল, ইনিই বাদশাহ, বোধ হয় বাহিরে যাইবেন বলিয়া দরজির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। তাই সেই বাণ্ডিলটি বাবাদলের পায়ের কাছে রাখিয়া, নত হইয়া সেলাম ও ভূমিচুম্বন করিয়াছিল।

এ দিকে সেই রাত্রে মনসুরি বাবাদলকে লইয়া চলিয়া গেলে পর, বাদশাহ সেই কামরায় সওদাগরের পরিচ্ছদ সহ প্রবেশ করিলেন। দরজি ও মনসুরিকে না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

তখন একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহাকে আগা সাহেবের মুণ্ড কাটিয়া আনিতে হুকুম দিয়াছিলাম, সে ফিরিয়াছে?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "হাঁ প্রভু, সে ফিরিয়াছে।"

বাদশাহ বলিলেন, "তাহাকে ডাকিয়া আন।"

সে ব্যক্তি আসিলে বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার্য্য শেষ হইয়াছে?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ দুনিয়ার মালেক, কার্য্য শেষ করিয়া ত মুণ্ডটা হুজুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া গিয়াছি।"

বাদশাহ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কখন?"

ভৃত্য বলিল, "এই অল্পক্ষণ হইল, প্রভু দরজির ছদ্মবেশ পরিয়া গোপন কামরায় বসিয়া ছিলেন, তখন দিয়া গেলাম।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে বাদশাহ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ভাবিলেন একটা মহা ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভৃত্যগণের সম্মুখে কোনওরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না।

ক্রমে মনসুরি ফিরিয়া আসিল। তখন বাদশাহ তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শেষে আজ্ঞা দিলেন, "যাও এখনি যেখানে পাও দরজিকে ধরিয়া কাটা মুণ্ড ফিরাইয়া আন, নহিলে মহা অনর্থপাত হইবে।"

আজ্ঞা পাইয়া মনসুরি ছুটিল, কিন্তু সে দরজির দোকানই দেখিয়াছিল, তাহার বাড়ী কোথায় জানিত না। রাত্রিতে বেজেস্তানের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। এইরূপে ক্রমে রজনী প্রভাত হইল।

তখন মনসুরি শুনিল, কিছু দূরে ভাংগা গলায় এক ব্যক্তি এক মসজিদ হইতে সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী মুসলমানগণকে প্রাতঃকালীন নামাজ করিতে আহ্বান করিতেছে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া মনসুরি সেই দিকে গেল। দেখিল বাবাদল দুই কাণের পশ্চাতে হাত দিয়া ফুকারিতেছে—"লা ইলাহা ইল্লাল্লা মোহম্মদর্ রসুলাল্লা।"

মনসুরি তখন তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই বাবাদলের চীৎকার বন্ধ হইয়া গেল। মনসুরিকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"ওহে তুমি কিরূপ লোক? একজন গরীবের উপর এমন করিয়াই কি অত্যাচার করিতে হয়? খুব পোষাকের নমুনা দিয়াছিলে! কেন, সে কাটা মুণ্ডটা সওগাদ করিবার জন্য কি আর কোনও লোক পাও নাই! পোষাক তৈয়ারি এই ভাবেই হয় বটে। তোমার সে প্রভুটি কে বল ত? সে একজন মুসলমানকে হত্যা করিলই বা কি জন্য? তোমার প্রভু নিশ্চয়ই একজন বজ্জাৎ কাফের, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মনসুরি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল,—"বৃদ্ধ! সাবধান, তুই কাহাকে গালি দিতেছিস জানিস?"

বৃদ্ধ একটু ভয় পাইয়া বলিল,—"কেন কে সে?"

মনসুরি বলিল,—"তিনি শাহানশাহ বাদশাহ বোগদাদের অধিপতি।"

ইহা শুনিয়া বাবাদল কাঁপিতে লাগিল। বলিল,—"মাফ্ করুন, মাফ্ করুন। না জানিয়া আমি দুনিয়ার মালেক বাদশাহকে গালি দিয়াছি, মাফ্ করুন।" বলিতে বলিতে নিজের দুই কর্ণ মর্দ্দন করিতে করিতে বাবাদল জানু পাতিয়া ভূমিতে বসিল।

মনসুরি জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কাটা মুণ্ড কোথায়?"

বৃদ্ধ বলিল,—"আমার বাড়ীতে নাই।"

"কোথায় তবে?"

"সেটা এতক্ষণ আগুনের মধ্যে পাক হইতেছে।"

মনসুরি বলিল,—"পাক হইতেছে? খাইবি নাকি? কি হইয়াছে, শীঘ্র বল্।"

বৃদ্ধ তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। মনসুরি শুনিয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া হাসান রুটিওয়ালার দোকানে যাইল। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে হাসান স্বীকার করিল, সে তাহা নাপিতের দোকানে রাখিয়া আসিয়াছে।

মনসুরি, হাসান ও বাবাদল তিনজনে তখন নাপিতের দোকানে গেল। নাপিত প্রথমে ভয়ে কিছুই স্বীকার করিল না। অবশেষে সে সকল কথা বলিল।

চারিজনে তখন কাবাবচি ইয়ানাকির দোকানে উপস্থিত হইল। যে সময় সিপাহীরা সকল বিধর্ম্মীগণকে প্রহার করিতেছিল, সেই সময়েই ইয়ানাকি প্রাণভয়ে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। সুতরাং ইয়ানাকির দেখা পাওয়া গেল না।

এই সময় মনসুরি রাস্তার কিছু দূরে গোল শুনিয়া সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল আগা সাহেবের কাটা মুণ্ড সেইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

তখন মনসুরি আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাদশাহের নিকট গিয়া সকল কথা বলিল।

বাদশাহ দেখিলেন, সৈন্যগণ ক্ষেপিসা রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। তখন তিনি হুকুম দিলেন আগা সাহেবের মুণ্ড আনিয়া মহা সমারোহে তাহার কবর দাও। আগা সাহেবের সিপাহীগণকে পাঁচ পাঁচ মোহর বখশিস্ কর।

মহা সমারোহে আগা সাহেবের মুণ্ড সমাধিস্থ হইল। সিপাহীদের মনোমত এক ব্যক্তিকে বাদশাহ আগার পদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর রাজ্যে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। বাদশাহের হুকুম অনুসারে মনসুরি গিয়া বাবাদল দরজিকে দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া আসিল। বুড়া দরজির আব কোনও কষ্ট রহিল না।*

গুলে বেগমের আশ্চর্য্য গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকালে খাদির দেশে এক প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার নাম শ্যামশাদলালপোষ। তাঁহার তুল্য জ্ঞানী, ধনী ও প্রজাপালক বাদশাহ তৎকালে প্রায়ই দেখা যাইত না। তাঁহার সৈন্যবলও অপরিমিত ছিল।

এই প্রতাপশালী নরপতির সাত পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই যুবা বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানা শাস্ত্রে পারদর্শী এবং যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন।

একদিন জ্যেষ্ঠপুত্র তহমাশ পিতার সমীপে আসিয়া সেলাম করিয়া কহিলেন—"পিতা, ইচ্ছা করিয়াছি কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণ ও মৃগয়া করিতে বাহির হইব। সম্প্রতি আমার চিত্ত নানা কারণে বিষাদগ্রস্ত। পর্য্যটনে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হইবে। এখন আপনার আজ্ঞা পাইলেই হয়।"

বাদশাহ পুত্রের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"বৎস, ইহা উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। দেশ ভ্রমণে নানা জ্ঞান লাভ হয়, বহুদর্শিতা উপস্থিত হয় এবং চিত্তবৃত্তিও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

বাদশাজাদা আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দেশ ভ্রমণের সমস্ত আয়োজন করিতে ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দিলেন। নিজ বয়স্যগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকেও সঙ্গে যাইতে

* ইংরাজি হইতে গৃহীত।

আমন্ত্রণ করিলেন। মীরশিকারী মৃগয়ার উপযুক্ত বাজ, শিকরা, কুক্কুর প্রভৃতি সংগ্রহ করিল। অনেকগুলি তাম্বু, প্রচুর পরিমাণ আহারীয় দ্রব্য, বহুসংখ্যক সৈন্য উত্তম উত্তম অশ্বগণ সঙ্গে লইয়া বাদশাজাদা তহমাশ মৃগয়া ও দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিবস গমন করিলে পর, এক বিপুলকায় পর্ব্বত দৃষ্ট হইল। সেই স্থান শিকারের উপযুক্ত জানিয়া বাদশাজাদা তথায় ছাউনি ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং অশ্বারোহণে বন্ধুগণসহ শিকারে বহির্গত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ শিকার করিবার পর বাদশাজাদা দেখিলেন, অতি সুন্দর একটি হরিণ চরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার দেহ এমন সুচিত্রিত, তাহার শৃঙ্গ এমন সুঠাম, তাহার চক্ষু এমন স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ যে, সেই হরিণকে দেখিয়াই বাদশাজাদার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে আজ্ঞা দিলেন—"সাবধান, ইহার দেহে কেহ অস্ত্রাঘাত করিও না। ইহাকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিতে হইবে। ফাঁদ পাতিয়া হউক, জাল ফেলিয়া হউক, যে কেহ ইহাকে ধরিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে প্রচুর পারিতোষিক দিব।"

ইহা শ্রবণ করিয়া সকলে মণ্ডলাকার হইয়া সেই হরিণকে ঘিরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। হরিণ দেখিল তাহার আর মুক্তি নাই। নিজের প্রাণসংশয় জানিয়া সে এক লম্ফ দিয়া মণ্ডল হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বায়ুবেগে জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিল।

ইহা দেখিয়া বাদশাজাদা তহমাশ স্বয়ং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোড়া ছুটাইলেন। কিন্তু হরিণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া লম্ফে লম্ফে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতে লাগিল। বাদশাজাদা তথাপি হতাশ হইলেন না, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তাঁহার সৈন্যসামন্ত ও বন্ধুবর্গ বহু দূরে পড়িয়া রহিল। হরিণের পশ্চাৎ ধাবন করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। ঘর্ম্মে বাদশাজাদার সমস্ত পোষাক ভিজিয়া উঠিল। পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে হরিণও দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া পড়িল। বাদশাজাদা তখন অশ্ববেগ সংযত করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কোথায় আসিয়াছেন, সঙ্গীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কতদূর আসিয়াছেন, কোন পথেই বা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অশ্বটিও পিপাসায় কাতর হইয়া নিজ জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁফাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বাদশাজাদা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া লাগাম হস্তে ধরিয়া জল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে এক সুবৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাহার নিম্নে একটি জলকুণ্ডও দেখা গেল, সে জল যেমন স্বচ্ছ তেমনি সুশীতল। সেই কুণ্ডের চারিপার্শ্বে নানা পুষ্পবৃক্ষ সুগন্ধ বিতরণ করিতেছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বাদশাজাদা স্বয়ং প্রাণ ভরিয়া সেই জল পান করিলেন এবং অশ্বকেও পান করাইলেন।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সেটি একটি মনুষ্যহস্ত রচিত পুষ্পবাটিকা। নিকটে কোন মনুষ্যাবাস থাকিতে পারে এই অনুমান করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন অনতিদূরে একটি কুটীর রহিয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক অপূর্ব্ব প্রভাসসম্পন্ন রাজচিহ্নধারী বৃদ্ধ ব্যক্তি নামাজ পড়িতেছেন। বাদশাজাদা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নামাজ সমাপ্ত করিয়া সেই বৃদ্ধ বাদশাজাদাকে দেখিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। বাদশাজাদা তাঁহার নিকটে গিয়া সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? আর এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ মহাবনে কি প্রয়োজনেই বা আসিয়াছ?"

ইহা শুনিয়া বাদশাজাদা তহমাশ নিজ বৃত্তান্ত সমস্তই বৃদ্ধকে অবগত করাইলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় আপনিই বা কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? এবং এই মনুষ্য সমাগমহীন অরণ্যেই বা কেন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন? আপনার অঙ্গে সমস্ত রাজচিহ্ন বর্ত্তমান দেখিতেছি, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলুন।'

বৃদ্ধ কহিলেন—"হে যুবা, আমার কাহিনী অতি দুঃখপূর্ণ। তুমি শুনিয়া কি করিবে?"

কিন্তু বাদশাজাদা কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। আত্ম-কাহিনী বলিবার জন্য বৃদ্ধকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

তখন বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"হে বিদেশি, আমি বিলায়ৎ কাবুলের বাদশাহ। আমার নাম জাহাঙ্গীর শাহ। আমার বহু ধনরত্ন ছিল এবং খোদাতালা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সাতটি পুত্র দিয়াছিলেন। আমার পুত্রগণ সকলেই জ্ঞানে, গুণে, বীর্য্যে ভূষিত ছিল। আমি পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতেছিলাম। একদিন ঘটনাক্রমে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কোনও ভ্রমণকারীর মুখে শুনিল যে, তুর্কস্থান এবং চীন রাজ্যের সীমায় যে রুমদেশ আছে, তথায় কৈমুশ শাহ নামে এক বাদশাহ রাজত্ব করেন। তাঁহার কন্যার নাম মেহেরঙ্গেজ। সেই কন্যার মত রূপবতী নারী, আর পৃথিবীতে নাই। স্বয়ং পূর্ণিমার চন্দ্রও যেন তাহার মুখদর্শনে লজ্জা প্রাপ্ত হন। তাহার অঙ্গের কোমলতা কুসুমদলকেও পরাজিত করিয়াছে। তাহার গণ্ডদেশের আভা দেখিলে গোলাপ ফুলের প্রতি আর চাহিতে ইচ্ছা করে না। মেহেরঙ্গেজ পিতার একমাত্র কন্যা—রাজ্যের অধিকারিণী। এই কন্যা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বাদশাজাদাগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কন্যা এই বিষম পণ করিয়া বসিল যে, —"গুল বা সনোবর চে কর্দ্দ?" অর্থাৎ—গুল, সনোবরের সহিত কি করিয়াছিল?—এই প্রশ্নের যে উত্তর দিতে পারিবে তাহাকেই বিবাহ করিব, আর যে বিবাহার্থী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না তাহার মস্তক তরবারি দ্বারা কাটিয়া দুর্গদ্বারে টাঙ্গাইয়া দিব।

"হে যুবক, ভ্রমণকারীর নিকট আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এই কথা শুনিয়া, সেই কন্যাকে লাভ করিবার জন্য উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। আমার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে নিবেদন করিয়া বিদায়ের প্রার্থনা জানাইল। আমি তাহাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

"অবশেষে আমি কহিলাম—'হে পুত্র, যদি সেই কন্যাকে লাভ করিবার জন্য তুমি এতই ব্যগ্র হইয়াছ, ত বল, আমি স্বয়ং সসৈন্যে রুমের বাদশাহের নিকট গিয়া তোমার জন্য সে কন্যা প্রার্থনা করি। যদি তিনি সম্মত হন, উত্তম কথা। যদি সম্মত না হন, তবে আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার দেশ ধ্বংস করিয়া, বলপূর্ব্বক সে কন্যাকে লইয়া আসিয়া তোমার সহিত বিবাহ দিব।' ইহা শুনিয়া আমার পুত্র কহিল—'পিতঃ, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের ধন, প্রাণ, দেশ ধ্বংস করা একান্ত অনুচিত। আমি স্বয়ং যাইয়া, প্রশ্নের উত্তর দিয়া, সে কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিব।'

"ফলতঃ, কোনমতেই তাহাকে বিরত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহাকে বিদায়ের অনুমতি দিলাম। সে রুমদেশে পেঁৗছিয়া, প্রশ্নের উত্তর-দানে অক্ষম হইল। তখন প্রতিজ্ঞামত মেহেরঙ্গেজ তাহার মস্তক কাটিয়া দুর্গদ্বারে টাঙ্গাইয়া দিল।

'আমি এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিয়া চল্লিশ দিন শোকে ও দুঃখে নিমগ্ন রহিলাম। আমার রাজবাটী ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মিত্রবর্গ অসহ্য শোকে নিজ নিজ বস্ত্র ছিঁড়িতে লাগিল। তাহার ভ্রাতৃগণ মস্তকে ধূলি মাখিয়া পাগলের মত বেড়াইতে লাগিল।

"এইরূপে চাল্লিশ দিন কাটিলে আমার দ্বিতীয় পুত্র বলিল—'আমি যাই। প্রশ্নের উত্তর দিয়া সে ভ্রাতৃহন্ত্রীকে করতলগত করিয়া প্রতিশোধ লই।' আমি অনেক বারণ করিলাম, কিছুতেই সে শুনিল না। ফলতঃ সেও গিয়া, প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিয়া প্রাণ হারাইল। পুনরায় আমি শোকসাগরে মগ্ন হইলাম।

"আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? একে একে আমার সাতটি পুত্র এইরূপে মেহেরঙ্গেজকে লাভ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইল।

"আমি সেই অবধি মহাশোকে দগ্ধ হইতেছি। বাদশাহী ছাড়িয়া দিয়া এই অরণ্যে আসিয়া নির্জ্জনে বাস করিতেছি এবং ঈশ্বরকে ডাকিতেছি।"

এই পর্যন্ত বলিয়া, জাহাঙ্গীর শাহ নীরব হইলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু-বারি বিগলিত হইতে লাগিল।

এই কাহিনী শুনিয়া, মেহেরঙ্গেজকে দর্শন ও তাহাকে লাভ করিবার জন্য বাদশা জাদার মনে প্রবল অভিলাষ জন্মিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে বাদশাজাদার সঙ্গের সিপাহী ও বন্ধুগণ তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বাদশাজাদাকে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল এবং বলিল—"আপনি আমাদিগকে এতদূরে ছাড়িয়া এই গভীর বনমধ্যে কেন প্রবেশ করিলেন? ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাকে খুঁজিয়া পাইলাম সেই মঙ্গল; যদি আমাদের অন্বেষণ ব্যর্থ হইত তাহা হইলে অদ্য রজনী আপনার কি কষ্টেই না কাটিত!"

বাদশাজাদা তহমাশ তখন তাহাদের সহিত বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আজ্ঞা প্রচার করিলেন, আর আমি অধিক দূর দেশ ভ্রমণে যাইব না। এইবার রাজধানীতে ফিরিব। পরদিন প্রভাতে সকলে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাদশাজাদার বয়স্য ও সখাগণ দেখিল, তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বের মত আর হাস্য পরিহাসে রত হন না, আহারে রুচি নাই, সদাই অন্য-মনস্ক থাকেন। বয়স্যগণ তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে বাদশা-জাদা তাহাদিগকে সকল কথাই বলিলেন। শুনিয়া তাহারা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল।

ক্রমে বাদশাহ তহমাশ রাজধানীতে পৌঁছিলেন। নগরবাসীরা আনন্দ কোলাহল করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। পুত্র নিরাপদে ফিরিয়াছে বলিয়া বাদশাহও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কিছুদিন অতীত হইতে না হইতেই বাদশাহ লক্ষ্য করিলেন যে, পুত্রের আর সে পূর্ব্বভাব নাই। মুখে হাসি নাই, মনে আনন্দ নাই, সর্ব্বদাই বিষন্ন বদন। ইহা দেখিয়া বাদশাহ পুত্রকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বাদশাজাদা লজ্জাবশতঃ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। অগত্যা বাদশাহ পুত্রের বয়স্যগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন তাহারা সকল কথাই বাদশাহ সমক্ষে নিবেদন করিল।

বাদশাহ তখন পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন—"বৎস, যদি তুমি মেহেরঙ্গেজকে লাভ করিবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়া থাক, তবে আমি তাহার সদুপায় করিতেছি। রাজনীতি-অনুসারে, প্রথমে রুমের বাদশাহের নিকট এক বিনীতপূর্ণ পত্র লিখিয়া তোমার জন্য তাঁহার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিব। বহুমূল্য রত্নসকল উষ্ট্রপৃষ্ঠে তাঁহার জন্য উপহার পাঠাইব। ইহাতে যদি তিনি সম্মত হন, উত্তম। না সম্মত হন, তখন সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে ছিনাইয়া লইয়া আসিব। তুমি তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না।"

পিতার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বাদশাজাদা কহিলেন—"পৃথিবী-পালক, একজনকে বিনাদোষে লাঞ্ছনা করা নীতি ও ধর্মসংগত নহে। তদপেক্ষা আমি গিয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়া মেহেরঙ্গেজকে বিবাহ করিয়া আনিব।"

বাদশাহের পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ, সকলেই কহিলেন—"বাদশাজাদা যদি নিতান্তই যাইবেন, তাহা হইলে উঁহার সহিত যথেষ্ট সৈন্যবল প্রেরণ করা হউক, কারণ পথে কি বিপদ উপস্থিত হইতে পারে কিছুই বলা যায় না।" ফলতঃ বাদশাজাদা তহমাশ সৈন্য-সামন্ত এবং উষ্ট্রপৃষ্ঠে নানাবিধ রত্নরাজি উপহার লইয়া রুমযাত্রা করিলেন।

কৈমুশ বাদশাহের রাজধানী কুস্তন্তুনিয়া (অথবা ইস্তাম্বুল) নগরে পোঁছিয়া দেখিলেন, তথায় এক প্রকাণ্ড দুর্গ দণ্ডায়মান। দুর্গদ্বারে বাদশাহ ও বাশাজাদাগণের এক হাজার কাটা মুণ্ড ঝুলিতেছে। বাদশাজাদার সঙ্গীগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন—"মহাশয়, এখনও নিবৃত্ত হউন, নতুবা আপনারও মস্তক কাটিয়া এইখানে ঝুলোইয়া দিবে।" কিন্তু বাদশাজাদা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তহমাশ দেখিলেন যে, গৃহ ও পথাদি অতি রমণীয়। রাজপথে ধূলি দমনার্থ সর্ব্বদা জল ছিটান হইতেছে। পথের পার্শ্বদেশে ফুলের বাগান। মালীগণ সর্ব্বদা সেই সকল বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিতে ব্যস্ত। স্থানে স্থানে বাদ্যমঞ্চ গঠিত আছে, সেখানে শানাই ও অন্যান্য বিবিধ যন্ত্র সুমধুর সঙ্গীত আলাপ করিতেছে। নাগরিকগণ নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়া হাস্যমুখে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। নগরের মধ্যে মধ্যে সাধারণ বিহার-বাটিকা। পানাহারের জন্য স্থানে স্থানে তাম্বু রচিত হইয়াছে। জরির পর্দ্দায় দ্বারদেশগুলি অলঙ্কৃত। বাদশাজাদা এইরূপ নগরের শোভাসম্পদ দেখিতে দেখিতে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে রাজবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দ্বারে একটি সুবর্ণ গঠিত ডঙ্কা ছিল এবং সেই ডঙ্কায় রত্নের অক্ষরে লেখা ছিল—"যদি কেহ এই নগরে আসিয়া বাদশাজাদী মেহেরঙ্গেজের হস্ত প্রার্থনা করে, তবে সে যেন এই ডঙ্কা বাজায়।"

বাদশাজাদা তাহা দেখিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ডঙ্কা বাজাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তখনও একবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যদি কোনও মতে তাঁহাকে এই ভীষণ দশা হইতে বাঁচাইতে পারে। তাহারা বলিল, "রাজকুমার, আমরা অদ্যমাত্র এই নগরে উপস্থিত হইয়াছি। এখনও ইহার বিষয়ে কিছুই অবগত নহি। বাসস্থানও এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। অতএব এখন নিবৃত্ত হউন, পরে একদিন সময়মত ডঙ্কা বাজাইবেন।" তহমাশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি কি এখানে বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে আসিয়াছি? ডঙ্কা বাজাইলে আমি রাজসমীপে নীত হইব। আমার পরিচয় পাইলে বাদশাহ অবশ্যই আমার থাকিবার স্থান প্রভৃতি বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই ডঙ্কা বাজাইয়া দিলেন।

ডঙ্কা বাজিবামাত্র রাজবাটী হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে কৈমুশশাহ বাদশাহের নিকট লইয়া গেল। কৈমুশশাহ বাদশাজাদা তহমাশের রূপদর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত স্নেহ উপস্থিত হইল। পরিচয় পাইয়া বলিলেন—'বৎস, তুমি কেন প্রাণ দিতে এখানে আসিয়াছ? আমার কন্যা অতি রূপবতী বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় পাষাণের মত কঠিন। কত কত বাদশাহ ও বাদশাজাদাকে সে যে প্রশ্নোত্তর দানে অক্ষম বলিয়া হত্যা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং আমার অনুরোধ, তুমি এ কঠিন সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।"

বলা বাহুল্য তহমাশ কোন মতেই নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। তখন

অগত্যা বাদশাহ নিজ পত্নী গুলরুখ বেগম সহ বাদশাজাদা তহমাশকে সঙ্গে লইয়া কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া নিজ কন্যাকে কহিলেন—"তোমার এ কি পণ? কত কত বাদশাজাদা, তোমার সহিত বিবাহার্থ আগমন করিল তুমি এক প্রশ্নের ছলে তাহাদের সকলকেই হত্যা করিলে। এখনও বলিতেছি, এই ভীষণ পণ পরিত্যাগ কর। এই দেখ খাদির দেশের বাদশাজাদা তহমাশ বহুবিধ রত্নাদি উপহার লইয়া তোমার হস্ত কামনায় সমাগত। প্রশ্নের পণ পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে পতিত্বে বরণ কর। তাহা যদি না কর, সহস্র বৎসর ধরিয়া লক্ষ মনুষ্য বধ করিলেও কেহ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইবে না। তোমাকে আজন্ম কুমারীই থাকিয়া যাইতে হইবে।"

এ কথা শুনিয়া মেহেরঙ্গেজ কহিল—"পিতঃ, আমি একবার যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কখনই তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না। আমার ভাগ্যে যদি আজন্ম পতিলাভ না হয় সেও ভাল, তথাপি বিনা প্রশ্নোত্তর-দানে কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইব না।"

তখন মেহেরঙ্গেজ রাজকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"গুল বা সনোবর চে কর্দ?" অর্থাৎ গুল সনোবরের সহিত কি করিয়াছিল? রাজকুমারের মুখে যাহা আসিল তাহাই বলিয়া উত্তর দিলেন। মেহেরঙ্গেজ বলিল—"হইল না।" বলিয়া জল্লাদকে হুকুম দিল—"অবিলম্বে ইহার শিরচ্ছেদ করিয়া মুণ্ড দুর্গদ্বারে টাঙ্গাইয়া দাও।" আজ্ঞামাত্র জল্লাদ রাজকুমারকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া তাঁহার শিরচ্ছেদ করিল।

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাদশাহ শ্যামশাদলালপোষ কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া চল্লিশ দিন অবধি পুত্রশোকে মুহ্যমান রহিলেন। পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কহমাশও জেষ্ঠ ভ্রাতার পদানুসরণ করিয়া মেহেরঙ্গেজের হস্তে প্রাণ দিল। পরে পরে আরও চারিপুত্র এই প্রকারে প্রাণ দিলেন। কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র অলমাশ রুহবক্স তখনও পিতামাতার শোক-দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে বাকী রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাদশাজাদা অলমাশ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। তিনি সমস্ত বিদ্যায় নিপুণ এবং চৌষট্টি কলায় সুদক্ষ ছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা রত্নজড়িত সিংহাসনে বসিয়া পুত্রশোকে নেত্রনীর বিসর্জ্জন করিতেছেন। অলমাশ পিতার এই দশা দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া সেলাম করিয়া বলিলেন,"পিতঃ, বাদশাহ কৈমুশের কন্যা আমার ছয়টি ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছে, আমার অভিলাষ যে আমি গিয়া সেই পাপীয়সীর উপর প্রতিশোধ লই। তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া, তাহাকে নিজ পত্নী করিয়া, যথোপযুক্ত দণ্ড তাহাকে প্রদান করি।"

ইহা শুনিয়া বাদশাহ কহিলেন—"বৎস, একে একে আমার ছয়টি পুত্র কালকবলে পতিত হইয়াছে, এখন একমাত্র তুমি অবশিষ্ট আছ। তুমিই আমার বৃদ্ধদশার ভরসা-স্থল, তোমার দ্বারাই আমার পৈত্রিক রাজ্য বজায় থাকিবে। তুমিও কি জানিয়া শুনিয়া সেই পাপীয়সীর হস্তে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছ?"

অলমাশ রুহ কহিলেন—"পিতঃ, যদি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ না লইতে পারি, তবে এ জীবনে ফল কি? তাহা হইলে আমার রাজ্যসুখও বৃথা, আমার পুরুষার্থও বৃথা।" ফলতঃ পিতাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া অলমাশ রুমদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অলমাশ কোনও সৈন্যসামন্ত বা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে লইলেন না। একাকীই যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবসান্তর কৈমুশ শাহের রাজধানীতে পৌঁছিয়া, দুর্গদ্বারে নিজ ছয় ভ্রাতার মুণ্ড বিলম্বিত দেখিয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সমস্ত দেখিয়া ও জানিয়া লইলেন, কিন্তু যাহা বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন—অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর—তাহার কোনও সন্ধান পাইলেন না।

অবশেষে যখন সন্ধ্যা সমাগত হইল, তখন নগর হইতে বাহির হইয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটি সামান্য চাষা লোকের গৃহে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য যাচ্ঞা করিলেন। কৃষক আনন্দমনে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইল।

সেই কৃষকের কুটীরে সমস্ত রাত্রি অবস্থান করিয়া, পরদিন প্রভাত হইবামাত্র অন্নপ্রাশ পুনরায় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইল। প্রশ্নের উত্তর কি, সে বিষয়ে বাদশাজাদা বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই কুল-কিনারা পাইলেন না। এইরূপে দুঃখিত অন্তঃকরণে নগরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন মেহেরঙ্গেজের মহালের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই মহালের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। দ্বারে সশস্ত্র সৈন্যগণ পাহারা দিতেছে। রাজকুমারের মনে প্রবল ইচ্ছা হইল, একবার কোনও মতে ইহার ভিতর প্রবেশ করিয়া মেহেরঙ্গেজকে দেখিতে হইবে। না জানি সে কি রূপ, যাহার লালসায় উন্মত্ত হইয়া এত বাদশাহ এবং বাদশাজাদা প্রাণ দিল! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজকুমার সেই প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ভাবিলেন, যদি কোথাও গোপন পথের সন্ধান পাই ত প্রবেশ করি। চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একস্থানে একটি কৃত্রিম নদী মহালের ভিতর হইতে, প্রাচীরের নিম্নদেশ দিয়া বাহিয়া, বাহির হইয়া আসিতেছে। সুযোগ পাইয়া সেই কৃত্রিম নদীতে বাদশাজাদা অবতরণ করিলেন এবং ডুব দিয়া প্রাচীরের নিম্নপথে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া রাজকুমার দেখিলেন, সে স্থান একটি মনোহর প্রমোদ কানন। নদীর দুই পার্শ্বে হরিদ্বর্ণ বৃক্ষরাজি ও লতাপুষ্প শোভায়মান, তাহার ছায়া নদীর নির্ম্মল জলে পড়িয়া দ্বিতীয় প্রমোদ কাননের সৃষ্টি করিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে বুলবুল পক্ষী বসিয়া ঐক্যতানবাদন করিতেছে। ফুলে ফুলে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিয়া মধুপান করিয়া বেড়াইতেছে। কোকিল ও কোকিলাগণ পরস্পরের মনোহরণ করিবার জন্য অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনিতে আকাশমার্গ পরিপ্লাবিত করিতেছে।

তখন সেখানে কেহই ছিল না। রাজকুমার এক স্থানে রৌদ্রে বসিয়া নিজ গাত্র ও পরিধেয় বস্ত্র শুকাইয়া লইলেন। তাহার পর সাবধানে প্রমোদ কাননের ভিতর অগ্রসর হইলেন। ক্রমে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নিকট হইতে অনতিদূরে পরীসদৃশ কয়েকটি কন্যা বসিয়া আছে। কিংখাব নির্ম্মিত একটি সুন্দর ফরাস, তাহার উপর রত্ন সিংহাসন। সেই সিংহাসনে দিব্যাঙ্গনা সদৃশ একটি কন্যা বসিয়া, তাহারই চতুষ্পার্শে পরীসদৃশ সখিগণ বসিয়া আছে। অনুমানে বুঝিলেন, সিংহাসনস্থিতা কন্যা মেহেরঙ্গেজ হইবে। সেই সুন্দরীর অঙ্গের লাবণ্যে সমস্ত প্রমোদ কানন যেন উদ্ভাসিত। তাহার কেশদামের সৌগন্ধ কুসুমগন্ধকেও পরাজিত করিয়াছে। দেখিয়া রাজকুমার ভাবিলেন, বিধাতা যাহাকে এরূপ রূপলাবণ্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, সে কেন এমন নিষ্ঠুরবৎ সহস্র প্রাণী হত্যা করিতেছে?

রাজকুমার মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একজন সখী একটি স্বর্ণনির্ম্মিত পেয়ালা হস্তে করিয়া নদী হইতে জল লইতে আসিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া রাজকুমার ত্বরিতপদে বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কাইত হইলেন। সেই সখী নদীতে পেয়ালা ডুবাইবার সময় দেখিল, জলে এক অপরূপ রূপবান পুরুষের ছায়া। সেই ছায়া দেখিবামাত্র সেই সখীর হস্ত হইতে পেয়ালা স্খলিত হইয়া পড়িল এবং সে অত্যন্ত উন্মনা হইয়া উঠিল। হয়ত বা কোন দেবতার ছায়া হইবে ইহা অনুমান করিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সে স্বামিনীর সমীপে ফিরিয়া গেল। সেখানে গিয়া সে সকল বিবরণ নিবেদন করিল। তখন মেহেরঙ্গেজ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আমার এ প্রমোদ

বনে পুরুষ কেমন করিয়া প্রবেশ করিল?" একজন সাহসিকা সখী বলিল,—"আমি যাইয়া ইহার তত্ত্ব লইতেছি।" বলিয়া সে নদীতীরে উপস্থিত হইল।

এদিকে রাজকুমারের মনে হইল, যদি ইহারা আমাকে ধরিয়া ফেলে তবে আমার প্রাণ-বিনাশের সম্ভাবনা। • অতএব পাগল সাজিতে হইতেছে। কিন্তু সে সখীও আসিয়া রাজকুমারকে দেখিতে পাইল না, কেবল জলমধ্যে ছায়ামাত্র দেখিয়া গেল। সে গিয়া মেহেরঙ্গেজকে বলিল,—"বাদশাজাদী, যাহা দেখিলাম তাহা কোনও দেবতা অথবা গন্ধর্ব্বের ছায়া হইবে। এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই। অথচ কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলাম না।" তাহা শুনিয়া মেহেরঙ্গেজ সেই ছায়া দেখিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। নদী-তীরে গিয়া সেই ছায়া অবলোকন করিবামাত্র তাহার হৃদয়ে মীনকেতনের পঞ্চশর বিদ্ধ হইয়া পড়িল। সে আপন একজন দাসীকে কহিল—"কাহার এ ছায়া? তাহাকে অন্বেষণ করিয়া সত্বর আমার নিকটে আনয়ন কর।" আজ্ঞা অনুসারে দাসী চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। পলাইবার পথ থাকিলে বাদশাজাদা অলমাশ পলায়ন করিতেন, কিন্তু সে উপায় ছিল না। অগত্যা তিনি সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে দাসী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। দাসীকে দেখিবা মাত্র তিনি পাগলামির ভান করিয়া হো হো করিয়া হাসিলেন এবং ভূমিতে মাথা রাখিয়া দুই তিন বার ডিগবাজী খাইলেন। দাসী তাঁহাকে বলিল—"ওহে পাগল, তুমি কোথা যাও? বাদশাজাদী তোমাকে স্মরণ করিয়া-ছেন। আমার সঙ্গে আইস।" রাজকুমার কহিলেন—"বাদশাজাদী? কোন দেশের বাদশাজাদী? আমি ত শুনিয়াছি এ দেশের বাদশাজাদীকে ইঁদুরে খাইয়া ফেলিয়াছে।" দাসী কহিল--পাগল চুপ কর্। ওসব কথা বলিস্ না। আয় বাদশাজাদীর কাছে আয়।"

রাজকুমার দাসীর সঙ্গে আগমন করিলেন। মেহেরঙ্গেজ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে? কি উপায়েই বা এখানে আগমন করিয়াছ?" শুনিয়া রাজকুমার প্রথমে রোদন করিলেন। পরে হাস্য করিয়া বলিলেন—"শুন নাই বাদশাজাদী? আজ সহরে বড় মজা হইয়াছে। এক সওদাগরের এক হরিণ ছিল। রাত্রে সে হরিণটা কেমন করিয়া ছাগল হইয়া গিয়াছে। আব একটা তুলার পাহাড় ছিল, বৃষ্টিতে সেটা গলিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আর সেখানে একটা উট চরিতেছিল, বন হইতে একটা বিড়াল বাহির হইয়া তাহাকে গপ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজকুমার পুনরায় রোদন ও হাস্য করিতে লাগিলেন।

মেহেরঙ্গেজ সখিগণকে কহিল—"কি পরিতাপ! আহা, এমন সুন্দর যুবা পুরুষ কি করিয়া পাগল হইয়া গেল? ইহাকে ছাড়িও না, কোথায় বিঘোরে মারা যাইবে। ইহাকে এই প্রমোদকাননেই রাখিয়া দাও। দেখিও কোন প্রকার যত্নের ত্রুটি না হয়।"

বাদশাজাদা ভাবিলেন, উত্তম হইল। এইবার মেহেরঙ্গেজের সখীগণের নিকট হইতে যে কোনও উপায়ে পারি প্রশ্নের উত্তরটা জানিয়া লইব।

তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িল মেহেরঙ্গেজের সখী দিল-আরামের প্রতি। দিল-আরাম প্রত্যহ আসিয়া রাজকুমাবের পরিচর্য্যা করিত. তাঁহার সহিত বসিয়া কথোপকথন করিত। ক্রমশঃ দিল-আরামের চিত্ত রাজকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে মন্মথবাণ-বিদ্ধা হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিল।

রাজকুমার পাগলামির ভাণ সর্ব্বদা সমভাবে স্থির রাখিতে পারিতেন না। অনেক সময়েই সহজভাবে দিল-আরামের সঙ্গে কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করিতেন। এক-দিন দিল-আরাম নির্জ্জন পাইয়া রাজকুমারকে কহিল—"তুমি কে এবং এস্থানে কেনই বা আসিয়াছ? তোমার বাড়ী কোথায়? আমি তোমার প্রেমে পাগল হইয়াছি। তুমি যদি এস্থান হইতে আমাকে তোমার গৃহে লইয়া চল, তাহা হইলে আমি তোমার চির-দাসী হইয়া থাকিব এবং যত্ন সুশ্রূষা করিয়া তোমার ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দিব।"

রাজকুমার এ কথা শুনিয়া আবার পাগলের ভাণ আরম্ভ করিলেন। দিল-আরামও দুঃখিত মনে কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

পরদিন যখন দিল-আরাম রাজকুমারের নিকট আসিতেছিল তখন দেখিল, মেহেরঙ্গেজের দাসী রাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া মেহেরঙ্গেজের মহালের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া দিল-আরামের মনে ঈর্ষা ও সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে চুপে চুপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া, মহালের এক কক্ষে লুকাইয়া মেহেরঙ্গেজ ও রাজকুমারের কথাবার্ত্তা গোপনে শুনিতে লাগিল।

দিল-আরাম শুনিল, মেহেরঙ্গেজ পাগলের সহিত যে প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, মেহেরঙ্গেজও পাগলকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়া দিল-আরামের চিত্ত ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মেহেরঙ্গেজ পাগলকে বিদায় দিল।

কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন দিল-আরাম রাজকুমারকে স্বভবনে লইয়া গেল। সেখানে নির্জ্জনে রাজকুমারের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কহিতে লাগিল—"প্রিয়তম, তুমি কে এবং তোমার গৃহ কোথায় বল। কি প্রয়োজনেই বা এদেশে আসিয়াছিলে ? আমি সমস্ত জানিতে পারিলে যেমন করিয়া হউক তোমাকে এখান হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়া তোমার চরণসেবায় রত হই।" এই কথা বলিযা দিল-আরাম অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

বাদশাজাদা দেখিলেন, এই উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ আমার প্রতি যেরূপ প্রেমভাবাপন্ন, আমার কোন অনুরোধই এ ঠেলিতে পারিবে না। এই বিবেচনা করিয়া, সস্নেহে দিল-আরামের অশ্রু নিজ রুমালে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"সুন্দরি, আমার কি প্রয়োজনে এখানে আসা যদি শুনিতে এতই উৎসুক হইয়াছ তবে আমার বলিতে কোন বাধা নাই। আমি কেবল, জানিতে চাহি—'গুল্ বা সনোবর চে কর্দ্দ ?' ইহার উত্তর যদি জানা থাকে ত বলিযা আমার বাসনা পূর্ণ কর।"

ইহা শুনিয়া দিল-আরাম কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বলিল—"যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমায় বিবাহ করিবে এবং তোমার সমস্ত বেগমগণের মধ্যে আমায় প্রধানা করিবে, তাহা হইলে ও প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি যত দূর জ্ঞাত আছি তাহা তোমায় বলিব।"

দিল-আরামের কথা হইতে রাজকুমার বুঝিলেন, সে এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর জ্ঞাত নহে। সুতরাং প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"হে প্রেয়সী, যদি তোমার সহায়তায় আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে, তুমি যেরূপ বলিতেছ ঐ রূপই করিব।" তখন দিল-আরাম বলিল— নাথ 'গুল্ বা সনোবর চে কর্দ্দ', ইহার উত্তর ত আমি অবগত নহি। তবে এই মাত্র জানি যে, মেহেরঙ্গেজের সিংহাসনের নিম্নে একজন হাবসী লুকাইয়া থাকে, সেই মেহেরঙ্গেজকে এ প্রশ্নের কথা বলিযাছে। আমি আরও জানি যে ঐ হাবসী, বাকাফ সহর হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া মেহেরঙ্গেজের সিংহাসন তলে লুক্কাইত হইয়াছে। সুতরাং তুমি যদি বাকাফ সহরে যাইতে পার, তাহা হইলেই এ প্রশ্নের গুপ্তভেদ করিতে পার, নচেৎ আর কোনও উপায় দেখি না।"

এ কথা শুনিয়া বাদশাজাদা অলমাঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন—তবে আমাকে বাকাফ যাত্রা করিতে হইবে। না জানি সে নগর কত দূরে এবং তথায় যাইতে কতই না বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু যত দূরই হউক, যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছি তখন যাইবই তাহাতে অন্যথা হইবে না।

রাজকুমারকে চিন্তা করিতে দেখিয়া দিল-আরাম কহিল—"যদি মেহেরঙ্গেজকে বধ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রশ্নের উত্তর আনিতে যাইবার ক্লেশ স্বীকার করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। আমি সহজেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারি।

মেহেরুঙ্গেজকে মদ্য দিবার কালে তাহার সহিত এমন বিষ মিশাইয়া দিতে পারি যে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইবে।"

রাজকুমার কহিলেন—"না প্রিয়তমে, ছলে শত্রুবধ করা পুরুষার্থ নহে। আমি স্বয়ং বাকাফ সহরে গিয়া প্রশ্নের উত্তর আনয়ন করিয়া নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিব।"

অতঃপর দিল-আরামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সুযোগ মত সেই কৃত্রিম নদী পথে রাজকুমার বাহির হইলেন। যাহার গৃহে পূর্ব্বে অতিথি হইয়াছিলেন, সেই কৃষকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাকাফ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তম বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া, বাদশাজাদা অলমাশ বাকাফ নগর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বাকাফ নগর কোথায়, কোন দিকে, কোন পথে যাইতে হইবে, তাহা তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। অথচ মনের আবেগে অশ্ব ছুটাইয়া যাইতে লাগিলেন।

কয়েক দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইল। পথচারী কত লোককেই জিজ্ঞাসা করেন, বাকাফ সহর কোথা? কেহই সন্ধান বলিতে পারে না। এই কারণে বাদশাজাদার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সপ্তম দিবসে তিনি দেখিলেন, সবুজ বস্ত্র পরিধান করিয়া একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি অশ্বারোহণে পথে যাইতেছেন। রাজকুমার সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জনাব, বাকাফ নগর কোন পথে যাইতে হইবে বলিতে পারেন?"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে যুবক, তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন—"আমি একজন পথিক মাত্র। যদি বাকাফ নগরের সন্ধান আমায় বলিতে পারেন ত বলিয়া উপকৃত করুন।"

বৃদ্ধ কহিলেন—"বৎস, তুমি বাকাফ নগরে যাইবার আশা পরিত্যাগ কর। সে পথ অতি ভয়ানক। যদি সারা জীবন সে পথ অন্বেষণ কর, তাহা হইলেও সফল হইবে না।"

কিন্তু রাজকুমার অলমাশ কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে বৃদ্ধ বলিলেন—"সহর বাকাফ, কাফ দেশে অবস্থিত। সে দেশে দৈত্যগণ বাস করে। এই স্থান হইতে কিছু দূর যাইলে, সম্মুখে দুইটি পথ দেখিতে পাইবে। তোমার দক্ষিণ দিকে যে পথ সেই পথ অবলম্বন করিও। বামদিকের পথে কদাপি পদার্পণ করিও না। দক্ষিণ দিকের পথ একদিন এবং এক রাত্রি চলিলে পর, সম্মুখে একটি স্তম্ভ দেখিতে পাইবে। সেই স্তম্ভে এক শ্বেত প্রস্তর খণ্ড যোজিত আছে। সেই শিলায় স্বর্ণের অক্ষরে কিছু লেখা আছে। সেই লেখা পড়িয়া, তদনুসারে পথ অবলম্বন করিবে। কদাপি তাহার বিরুদ্ধ পথ গ্রহণ করিবে না। করিলে তোমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে।"

রাজকুমার এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধকে সেলাম করিয়া অশ্বচালনা করিলেন। একদিন এবং এক-রাত্রির পর কথিত স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইল। শ্বেত প্রস্তরে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত ছিল যে পথিকের উচিত দক্ষিণ মার্গ অবলম্বন করা। যদি কেহ বাম মার্গ অবলম্বন করে তবে তাহাকে অল্প ক্লেশ পাইতে হইবে কিন্তু শীঘ্র আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে। আর মধ্যবর্ত্তী যে পথ তাহাই বাকাফ সহরের পথ। কিন্তু সে পথ এতই ভয়ানক যে পথিকের প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

রাজকুমার সেই শিলালিপি পাঠ করিয়া, নির্ভয়ে মধ্য পথই অবলম্বন করিলেন। একদিন এক রাত্রি সেই পথে চলিবার পর একটি সুন্দর ময়দান দৃষ্টিগোচর হইল। তথায় উচ্চ বনস্পতিরাজি আকাশে মস্তক মিলিত করিয়াছে। কিছু দূরে একটি উদ্যানবাটিকাও রহিয়াছে। রাজকুমার সেই বাটিকার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তথায় পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, উদ্যানবাটিকার প্রবেশপথ মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত। একজন মসীবর্ণ হাবসী দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহার ওপরের ওষ্ঠ উল্টাইয়া নাসিকা স্পর্শ করিয়াছে। নিম্নের ওষ্ঠ ঝুলিয়া নাভিদেশে নামিয়াছে। বহুসংখ্যক পশুচর্ম্ম একত্র সেলাই করিয়া সে নিজ পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। নিকটস্থ এক দাড়িম্ব বৃক্ষে একশত মণ পাথরের এক ঢাল ঝুলিতেছে। একটি শামশাদ বৃক্ষে পঞ্চাশ মণ লোহার নির্ম্মিত তাহার তরবারি ঝুলিতেছে। পাথরের শয্যায়, পাথরের বালিশ মাথায় দিয়া সেই হাবসী শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। রাজকুমার ঈশ্বরের নাম লইয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষে অশ্বকে বন্ধন করিলেন। তৎপরে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উদ্যানের শোভা পরম রমণীয়। দেখিলেন কতকগুলি হরিণ চরিতেছে। তাহাদের শৃঙ্গগুলি সোনা দিয়া বাঁধানো। সোনার কাজ করা মখমলের আঙিয়া তাহাদের পৃষ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে। প্রত্যেকের গলায় একখানি করিয়া রেশমী রুমাল বাঁধা রহিয়াছে। দেখিয়া রাজকুমারের মনে বিস্ময় উৎপন্ন হইল। ভাবিলেন—"কে এ উদ্যানের মালিক? সে ত অত্যন্ত সৌখীন লোক দেখিতেছি।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু হরিণগণ আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। হরিণগুলির চক্ষু বিনতিপূর্ণ, যেন তাহারা রাজকুমারকে বলিতে লাগিল—"এ পথে যাইও না যাইও না।" কিন্তু রাজকুমার ভীত হইবার পাত্র নহেন। তিনি হরিণগণকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইলেন। কিছু দূর যাইয়া দেখিলেন, একটি সুন্দর গৃহ রহিয়াছে। বাটীর চতুর্দ্দিকে বিবিধ ফুলের বাগান। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সুন্দর পুষ্পসকল সেখানে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। তাহাদের গন্ধও অভিনব প্রকারের। রাজকুমার সে বাটীর এক দ্বার দেখিতে পাইয়া নির্ভয়ে সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কয়েকটি সুসজ্জিত কক্ষ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, একটি কক্ষে একজন অপ্সরাসদৃশী রূপবতী কামিনী মখমল ও কিংখাব গালিচার উপর বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই রাজকুমারের মন প্রীতি-প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই কামিনীও রাজকুমারের অলৌকিক রূপ দর্শনে অস্থির হইয়া পড়িল।

রাজকুমারকে দেখিবামাত্র সেই তরুণী উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"হে শুভদর্শন, তুমি কে? তোমার আগমনে আমি অতীব পুলকিত হইলাম। তুমি কোথা হইতে আসিলে আর কোথাই বা যাইবে?"

রাজকুমার সেই কামিনীর পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া নিজের তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেন। শুনিয়া রমণী কহিল—"হে প্রিয়, এ কঠিন কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইলে? এখনও এ পণ পরিত্যাগ কর। সে পথে কোন মনুষ্য অদ্যাবধি যাইতে পারে নাই। তুমি এইখানেই থাক, কোথাও যাইও না। নিজ করকমল আমার গলায় বেষ্টন করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, আমার তুল্য সুকুমারী ললনা প্রাপ্ত হইলে। প্রিয়তম, তোমার মুখদর্শনে আমি পাগলিনীপ্রায় হইয়াছি। এইখানে অবস্থান করিয়া আমার সহিত সুখসম্ভোগে কালাতিপাত কর।"

রাজকুমার কহিলেন—"প্রিয়ে, তোমার নাম কি?"

রমণী কহিল—"আমার নাম লতিফাবানু। তুমি বাকাফ নগরে গেলে যে অভিপ্রায় পূর্ণ হইত, আমি এইখানে বসিয়াই তাহা পূর্ণ করিয়া দিব। আমি যাদুবিদ্যার অধিকারিণী। এ সংসার সুখের আগার। এস আমরা পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গসুখ উপভোগ করি।" এই বলিয়া লতিফাবানু রাজকুমারের প্রতি বিলোল কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত করিল।

বাদশাজাদা অলমাশ কহিলেন—"সুন্দরি, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, যত দিন না কৈমুশ শাহ বাদশাকে সপরিবারে বন্দী করিতে পারি, এবং দুষ্টা মেহেরঙ্গেজকে ধাবমান অশ্ব-

গণের পদতলে পাতিত করিয়া তাহার অঙ্গ ছিন্নভিন্ন করাইয়া, সেই মাংস চিল ও কুক্কুরগণকে না খাওয়াইতে পারি, ততদিন কোনও সংসার-সুখের বশীভূত হইব না। আমি বাকাফ নগরে গিয়া নিজ অভিপ্রায় সফল করিয়া, পরে তোমাকে বিবাহ করিব। তখন তোমার সুন্দর গ্রীবাতে ভুজবন্ধন করিয়া তোমার যৌবনসুধা পান করিব।"

লতিফাবানু রাজকুমারকে ভুলাইবার জন্য সেই নির্জ্জন কক্ষে অনেক প্রকার হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু রাজকুমার অটল রহিলেন। তখন লতিফাবানু মনে করিল "ইহাকে মদ্যপান করাইলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। নেশার অবস্থায় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া আমার দাস হইয়া আমাকে সুখী করিবে।" মনে এই বিচার করিয়া লতিফাবানু সহচরিগণকে ডাকাইয়া পানপাত্র ও মদ্য আনিতে কহিল। অবিলম্বে একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত হীরকখচিত পানপাত্র উপস্থিত হইল এবং বিবিধ প্রকারের সুস্বাদু মদিরা আনীত হইল। এই সকল রাখিয়া সহচরিগণ বিদায় হইল।

লতিফাবানু এক পাত্রে মদিরা ঢালিয়া প্রথমতঃ রাজকুমারের হস্তে প্রদান করিল। কিন্তু তিনি বলিলেন—"প্রিয়সখি, প্রথম পাত্র তোমারই পান করা উচিত।"—বলিয়া রাজকুমার স্বহস্তে সেই পাত্র লতিফাবানুর অধরের নিকট ধরিলেন। লতিফাবানু তাহা পান করিয়া আর এক পাত্র মদ্য ঢালিয়া, রাজকুমারের গলদেশে বামভুজ বেষ্টন করিয়া, তাঁহাকে পান করাইয়া দিল। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চলিতে লাগিল। ক্রমে মত্ততার প্রভাবে লতিফাবানুর বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল। সে রাজকুমারের গলবেষ্টন করিয়া প্রেমভরে তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। রাজকুমারেরও বিলক্ষণ মত্ততা উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি অটল রহিলেন।

রাজকুমারের এইরূপ অনিচ্ছা দেখিয়া অবশেষে লতিফাবানু সখিগণকে ডাকাইয়া নৃত্যগীত করিতে আদেশ দিল। ভাবিল, নৃত্য ও সঙ্গীত প্রেমের উত্তেজক—কিছুকাল এইরূপ উৎসব করিলে রাজকুমারের মন গলিতে পারে। সখিগণ নানা যন্ত্র-তন্ত্র আনিয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া দিল। এদিকে মদ্যপানও চলিতে লাগিল। তিন দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল, তথাপি রাজকুমার প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন না।

চতুর্থ দিন রাজকুমার বলিলেন—"প্রিয়ে লতিফাবানু, তিন দিন এখানে বৃথা আমোদে অতিবাহিত করিলাম। এবার আজ্ঞা কর, বাকাফ নগরে যাত্রা করি। তোমার প্রণয় আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় বাকাফ নগরে গিয়া স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া, আসিয়া তোমার প্রেম-সরোবরে অবগাহন করিব।"

ক্রোধে অভিমানে লতিফাবানুর অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল। সে ভাবিল—"আমি এত করিয়া ইহার প্রণয় যাচ্ঞা করিলাম তথাপি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিল না? আচ্ছা, ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।" দাসীকে আজ্ঞা করিল—"ও ঘরে যে এক কৌটা মাজুম আছে তাহা আনিয়া দাও ত।" মাজুম আসিলে ছলনাময়ী পাপীয়সী রাজকুমারকে বলিল—"প্রিয়তম, ইহা একটু ভক্ষণ কর। ইহা অত্যন্ত প্রণোয়ত্তেজক।" রাজকুমার তাহা ভক্ষণ করিবামাত্র তাঁহার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তখন লতিফাবানু সর্পাকৃতি একটা যষ্টি বাহির করিয়া, তাহাকে মন্ত্রঃপূত করিয়া, সেই যষ্টি লইয়া রাজকুমারের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিল। রাজকুমার ভূমি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যন্ত্রণায় ঘুরপাক খাইতে লাগিলেন এবং দেখিতে দেখিতে পুনরায় ভূমিতে পতিত হইলেন। পতিত হইবামাত্র তিনি একটি হরিণের আকৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

লতিফাবানু তখন স্বর্ণকার ডাকাইয়া রাজকুমারের শৃঙ্গ সোণায় বাঁধাইয়া দিল। মখমলের উপর জরির কাজ করা এক অঙ্গিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিল। গলায় একটি রেশমী রুমাল বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে উদ্যানে ছাড়িয়া দিল।

এ দিকে বাদশাজাদা হরিণত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার বুদ্ধিসুদ্ধি পূর্ব্ব মতই রহিল, কেবল বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি ক্রমাগত অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি বাগানের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া কেবলই পলাইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "আমি এখানে নিরাপদে আছি বটে, কিন্তু আমার জীবন বিফল হইল। তাহার অপেক্ষা যদি আমি পলাইতে পারি, যদি ব্যাঘ্র ভল্লুকেও আমাকে খাইয়া ফেলে, এ বিফল জীবন অপেক্ষা তাহাও ভাল।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি ক্রমাগত পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নির্গমনের কোনও পথ খুঁজিয়া পাইলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরিণবেশী বাদশাজাদা এই প্রকার মনোদুঃখে সেই বাগানে দশ বারো দিন যাপন করিলেন। একদিন বাগানের এক কোণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানকার প্রাচীরের উপরাংশ বর্ষা-জলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা তাদৃশ উচ্চ নহে। দেখিয়া বাদশাজাদার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বিপুল বলের সহিত এক লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাচীরের বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন—আশঙ্কা পাছে আবার লতিফাবানুর মায়াজালে বদ্ধ হইয়া পড়েন। সারাদিন ছুটিয়া ছুটিয়া, সেই বাগান হইতে বহু ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িলেন। সেখানে একটি জলাশয় ছিল। কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া এবং তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া রাত্রের মত সেই স্থানেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া, পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দূর যাইয়া দেখেন, একটি বিপুল অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে এক সহস্র বাতায়ন সন্নিবিষ্ট ছিল। গৃহের নিকট গিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় একটি বাতায়ন পথে এক পরমা সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি দেখা গেল। সেই রমণীকে দেখিয়াই বাদশাজাদার বিশ্বাস হইল, ইঁনি স্নেহশীলা করুণাময়ী রমণী,—লতিফাবানুর মত কামুকী ও পাষাণ-হৃদয়া নহেন। মনে হইল, এই রমণী হয়ত বা আমাকে এই ইন্দ্রজাল হইতে মুক্ত করিয়া প্রাণদান দিতে পারেন।

এদিকে সেই রমণী হরিণকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। স্বীয় পরিচারিকাকে ডাকিয়া কহিলেন—"দেখ দেখ, কি সুন্দর হরিণ! উহার শৃঙ্গ কেমন স্বর্ণজড়িত! অঙ্গে কেমন সুন্দর জরিদার মখমলের আঙ্গরাখা। গলায় কেমন রেশমী রুমাল বাঁধা রহিয়াছে। বোধ হয় কোনও বড়লোকের পালিত হরিণ হইবে—কি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তুমি যাও উহাকে ধৃত করিয়া আন। আমি পুষিব।"

আজ্ঞা পাইয়া পরিচারিকা নীচে নামিয়া আসিল। এক মুষ্টি সবুজ নবীন ঘাস লইয়া, হরিণের নিকট যাইয়া, "আয় আয়" বলিয়া প্রলোভিত করিতে লাগিল। বাদশাজাদারও মন সেই রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছটফট করিতেছিল, তিনি সহজেই ধরা দিলেন। দাসী তাঁহার গলার রুমাল ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

ভিতরে গিয়া বাদশাজাদা দেখিলেন, সেই সুন্দরী নবীনা যুবতী একটি রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার রূপের জ্যোতিতে কক্ষখানি ঝলমল করিতেছে, যুবতীর নাম জমিলাবানু। হরিণকে দেখিবামাত্র তিনি তাহাকে কাছে আনিতে বলিলেন। হরিণের গায়ে আদর করিয়া হাত বুলাইতে লাগিলেন। হরিণও নিজ মস্তকটি তাঁহার কোলে রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝে মাঝে মস্তক তুলিয়া জমিলাবানুর প্রতি সকাতর ভাবে দৃষ্টি করিতে লাগিল। জমিলাবানু উত্তম মেওয়া ফল আনিয়া হরিণকে

খাইতে দিলেন। উত্তম সুগন্ধি গোলাপী সরবৎ তাহাকে পান করিতে দিলেন। বাদশা-জাদা এতদিন ঘাস খাইয়া বিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। এই সকল উপাদেয় পান ভোজন পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। খাওয়া হইলে জমিলাবানু নিজ রুমাল দিয়া হরিণের মুখ মুছাইয়া দিয়া আবার আদর করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

তাঁহার এই স্নেহ-ব্যবহারে রাজকুমারের মনে অতি পরিতাপ উপস্থিত হইল। মনে করিলেন—"হায়, এই সুন্দরী আমাকে সামান্য পশু বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। আমার যদি মনুষ্যদেহ থাকিত, যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তবে আত্মপরিচয় দিয়া ইঁহার শরণাপন্ন হইতাম।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া জমিলাবানু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দাসীকে বলিলেন—"দেখ দেখ, হরিণ কাঁদিতেছে। পশু হইয়া এমন করিয়া কাঁদে কেন? এরূপ ত কখনও দেখি নাই।"

দাসী বলিল—"স্বামিনি, বোধ করি এ কোনও মনুষ্য হইবে। কাহারও ইন্দ্রজাল প্রভাবে পশুদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

যখন এই প্রকার কথোপকথন হইতেছিল, তখন হরিণ ধীরে ধীরে নিজ মস্তক জমিলাবানুর পদতলে স্থাপন করিয়া, ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জমিলাবানুর মনে প্রতীতি জন্মিল যে, দাসীর কথাই সত্য। বলিলেন—"দাই, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই ঠিক। নিশ্চয়ই ইহা লতিফাবানুর কার্য্য। সেই এইরূপে মনুষ্যকে পশু করিয়া রাখে। তুমি যাও, ও ঘর হইতে মাজুমের ডিবিয়া লইয়া আইস।" আজ্ঞানুসারে দাসী ডিবিয়া লইয়া আসিল। জমিলাবানু তাহার কিযদংশ লইয়া আদর করিয়া হরিণকে খাওয়াইয়া দিলেন। মাজুম খাইয়াই হরিণ অচেতন হইয়া গেল। তখন জমিলাবানু গদির নিম্ন হইতে এক ছড়ি বাহির করিয়া, তাহা মন্ত্রঃপূত করিয়া ধীরে ধীরে হরিণের স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন। হরিণ তখন মাটিতে লুটাপুটি করিতে লাগিল এবং অবিলম্বে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

মনুষ্যাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে রাজকুমার জানু পাতিয়া ঈশ্বর সমীপে নিজ অন্তরের ধন্যবাদ প্রেরণ করিলেন। তাহার পর জমিলাবানুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"হে সুচরিতে, তুমি আমার পুনর্জ্জীবন দান করিলে। কি বলিয়া তোমায় ধন্যবাদ দিব? আমার প্রত্যেক কেশ তোমার দয়ার জন্য কৃতজ্ঞ।"

তখন জমিলাবানু রাজকুমারকে স্নান করাইয়া রাজবস্ত্র পরাইয়া দিলেন। তৎকালে রাজকুমারের অলৌকিক রূপ এরূপ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া প্রকাশ পাইল যে জমিলাবানু তখনি তাঁহার পদে দেহ মন সমর্পণ করিলেন। রাজকুমার ত হরিণাবস্থা হইতেই জমিলা-বানুর রূপদর্শনে হৃদয় হারাইয়াছিলেন।

জমিলাবানু তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি কে এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছেন? আপনার প্রয়োজনই বা কি, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলুন।"

রাজকুমার তখন নিজ আমূল বৃত্তান্ত জমিলাবানুর সম্মুখে বর্ণনা করিলেন।

তাঁহার ইতিহাস শুনিয়া জমিলাবানু কহিলেন—"হে প্রিয়, বাকাফ নগরে যাইবার এক চতুর্থ মাত্র পথ তুমি অতিক্রম করিয়াছ। এখনও বারো আনা অংশ পথ বাকী আছে। ইহারই মধ্যে তুমি এত দুঃখ ক্লেশ পাইয়াছ, বাকী পথ অতিক্রম করিতে হইলে তুমি প্রাণে বাঁচিবে না। সে পথ অতীব ভয়ানক। অতএব তোমার পণ পরিত্যাগ কর। মিছামিছি প্রাণ খোয়ানো বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। আমার এই অনাথভবন নিজ সুখ-ভবন মনে করিয়া এইখানেই জীবনকালের সুখ সম্ভোগ কর। তোমায় মনুষ্যমূর্ত্তিতে দেখিবামাত্র আমি তোমাকে দেহ মন সমর্পণ করিয়াছি। তোমার সুখকেই আমি নিজ সুখ বলিয়া জ্ঞান করিব এবং সকল প্রকারে তোমার সন্তোষ সাধনে যত্নবতী থাকিব।"

রাজকুমার কহিলেন—"প্রেয়সি, তোমার নিকট আমি জীবন পাইয়াছি, সুতরাং এ জীবন তোমারই। অল্পদিনের জন্য তোমার বিচ্ছেদ ক্লেশ সহ্য করিয়া, বাকাফ নগরে গিয়া, নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসি। তাহার পর তোমায় মুসলমান ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিয়া, চিরদিন হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিব।"

জমিলাবানু যখন দেখিলেন যে, রাজকুমার কোন মতেই বাকাফ যাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইবেন না, তখন দাসীকে আজ্ঞা করিলেন—"হজরৎ ইসাক পয়গম্বরের ধনুর্ব্বাণ, তৈমুসী ঢাল এবং অকবর সুলেমানী তরবারি লইয়া আইস।" দাসী উক্ত তিন অস্ত্র আনিলে পর জমিলাবানু রাজকুমারকে কহিলেন—"এই তিনটি অস্ত্র তুমি সঙ্গে লইয়া যাও। এ তিন অস্ত্র অত্যন্ত দুর্লভ সামগ্রী। এই অকবর সুলেমানী তরবারির গুণ এই যে, যদি পর্ব্বতগাত্রেও ইহা আঘাত করা যায়, তবে সাবান যেমনি তারের ধারে সহজে কাটিয়া যায়, এ পর্ব্বতও সেইরূপ কাটিয়া যাইবে। আর এই তৈমুসী ঢালের গুণ এই যে, ইহা যাহার নিকট থাকিবে, শত যোদ্ধাও যুগপৎ তাহাকে আক্রমণ করিলে বিপদাশঙ্কা নাই। আর এই পয়গম্বর ইসাকের ধনুর্ব্বাণেরও গুণ অদ্ভুত। এই ধনুর শরসন্ধান অব্যর্থ, যে যত বড়ই বলবান হউক, এই শরের আঘাতে তাহার নিশ্চিৎ মৃত্যু। এই তিনটি অমূল্য বস্তু সাবধানে রক্ষা করিবে। আর এক কথা। এই পথে অগ্রসর হইলে সী-মোরগের বিনা সাহায্যে পথ অতিক্রম করিতে পারিবে না। কারণ, বাকাফ পথে সাতটি বৃহৎ বৃহৎ নদী আছে। সে নদী সমুদ্র অপেক্ষাও ভয়ানক, পার হওয়া মনুষ্যজাতির পক্ষে একান্ত অসম্ভব।"

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয় সখি, সী-মোরগ কোথায় আছে? এবং কি করিয়াই বা আমি সে স্থানে পৌঁছিব?"

জমিলাবানু কহিলেন—"এখান হইতে একদিনের পথের পর একটি গৃহ আছে। সে স্থানের নাম সফহাপৃথ্বী। সেখানে একটি কুন্ড দেখিতে পাইবে। তুমি সেখানে রাত্রে বিশ্রাম করিও। রাত্রে অনেক পশু সেখানে আসিবে, তাহার মধ্যে দুই চারিটা পশু বধ করিয়া আপনার কাছে রাখিয়া দিও। রাত্রি গভীর হইলে আশী হাত লম্বা একটি ব্যাঘ্র আসিবে। সেই ব্যাঘ্র বনের রাজা। তাহার সহিত আরও অন্যান্য ব্যাঘ্রও আসিবে। ব্যাঘ্ররাজকে দেখিবামাত্র তাহার সম্মুখে গিয়া তাহাকে সেলাম করিও এবং রুমাল দিয়া তাহার সমস্ত শরীর সাবধানে মুছিয়া দিও। তাহার পর বধ করা পশু মাংস তাহাকে খাইতে দিও। তাহা হইলে ব্যাঘ্ররাজ তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবে এবং অপর কোনও পশু তোমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই প্রকারে সারা পথ ব্যাঘ্ররাজের সেবা করিও। তাহার পর দুই তিন দিনের পথ যাইলে সম্মুখে দুইটি রাস্তা দেখিতে পাইবে। সাবধান, দক্ষিণ দিকের পথে যাইও না। বামদিকের পথ ধরিও। সেই পথে যাইতে যাইতে ক্রমে হাবসীদিগের এক দুর্গ দেখিতে পাইবে। সেই নগরের নাম খুমাশা। সেই স্থানে চল্লিশজন মহাবীর হাবসী সেনাপতি আছে। প্রত্যেকের অধীনে পাঁচ পাঁচ সহস্র করিয়া হাবসী সৈন্য। তাহাদের বাদশাহের নাম তুর্ম্মতাক। যদিও তুর্ম্মতাক অতি প্রতাপশালী তথাপি এই তরবারি প্রভৃতির প্রভাবে সে তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে। দুই একদিন সেখানে থাকিয়া অগ্রসর হইও। ক্রমে সী-মোরগের গৃহে পৌঁছিবে। এই তরবারির প্রভাবে সেও তোমার বশ্যতা স্বীকার করিবে ও তোমার যথেষ্ট সহায়তা করিবে। তাহারই সাহায্যে তুমি নদী পার হইয়া বাকাফ দেশে পৌঁছিতে পারিবে। সাবধান, আমি যাহা বলিলাম, ঠিক ঠিক সেই মত করিবে, কোনওরূপ অন্যথা না হয়।" এই বলিয়া জমিলাবানু নিজ অশ্বশালা হইতে পবনসদৃশ বেগবান এক অশ্ব রাজকুমারকে আনাইয়া দিলেন।

রাজকুমার তখন সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিলেন। জমিলাবানু তাঁহার বিরহক্লেশ সহ্য

করিতে না পারিয়া অনেক দূর অবধি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পরে সাশ্রু-নয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে রাজকুমার সমস্ত দিবস চলিয়া সফহাপৃথিব নামক স্থানে উপনীত হইলেন। সেখানে দুইটা মার্গ দেখা গেল। তখন জমিলাবানুর কথা স্মরণ করিয়া, রাত্রির জন্য সেইখানেই বিশ্রামের আয়োজন করিলেন।

অল্প রাত্রি হইলে বহুসংখ্যক পশু সেখানে চরিতে আসিল। বাদশাজাদা তাহাদের মধ্যে কয়েকটিকে বধ করিয়া আপনার পার্শ্বে রাখিযা দিলেন। যখন অর্দ্ধরাত্রি সমাগত হইল, তখন সেই বন হইতে সমস্ত পশু চলিয়া গেল। ক্রমে আশী হাত লম্বা ব্যাঘ্র-রাজ আসিয়া দর্শন দিল। মনুষ্যচক্ষু কখনও সেরূপ ব্যাঘ্র অবলোকন করে নাই। বাদশাজাদা সাহসপূর্ব্বক ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া তাহাকে সেলাম করিলেন এবং বানু প্রদত্ত রুমাল দিয়া ব্যাঘ্রের সমস্ত শরীব হইতে বনের ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন। পরে শিকারেব পশু তাহাকে ভক্ষণ করিতে দিলেন। ব্যাঘ্র পরম আনন্দে সেই মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাজকুমার হাত যোড় করিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আহার শেষ হইলে রাজকুমার সেই রুমাল দিয়া ব্যাঘ্রের মুখ ভাল করিয়া মুছিয়া দিলেন। অন্যান্য ব্যাঘ্রগণ পবিত্যক্ত মাংস ভোজন করিতে লাগিল।

আহারান্তে ব্যাঘ্ররাজ পরম আপ্যায়িত হইয়া রাজকুমারের কোলে মাথা দিয়া শয়ন করিল। বলিল—"তুমি নির্ভয়ে এখানে থাক। কোনও জন্তু তোমার হিংসা না করে, আমি এমন হুকুম দিতেছি। সমস্ত পথ আমার ব্যাঘ্রেরা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ব্যাঘ্ররাজ প্রস্থান করিল। রাজপুত্রকে রক্ষা করিবাব জন্য একটি ব্যাঘ্রকে রাখিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র বাদশাজাদা অশ্ব ধাবিত করিলেন। কিছু দূর গিয়া দেখিলেন যে সম্মুখে দুইটি পথ। ভাবিলেন, বামদিকের পথে বিস্তর বিপদ, দক্ষিণ-দিকের পথেই যাই। ঈশ্বরের নাম স্মরণপূর্ব্বক তাহাই করিলেন। দুই তিন দিন সেই পথে যাইয়া সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দুর্গ দেখিতে পাইলেন। সেই দুর্গের প্রত্যেক বুরুজে তোপ সজ্জিত রহিয়াছে। দুর্গদ্বারে বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হাবসী সৈন্যগণ পাহারা দিতেছে। রাজকুমার ধীরে ধীরে সেই দুর্গের দ্বারদেশের নিকট আসিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, জিনপোষ বিছাইয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিলেন। এমন সময় কয়েকজন হাবসী আসিয়া রাজকুমারকে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল—"ভাই সকল আজ বড় শুভদিন। একজন মনুষ্য আসিয়াছে। আমাদেব বাদশাহ তুর্ম্মতাক মনুষ্যের মাংস বড়ই ভালবাসেন। ইঁহাকে ধরিয়া তাঁহার কাছে লইয়া গেলে আমাদের সকলের ভাল বখশিস মিলিবে।"

ইহা বলিয়া দশ-বারোজন হাবসী রাজকুমারের কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিতে চাহিল। রাজকুমার ধীরে ধীরে সুলেমানি তরবারি বাহির করিয়া, এক আঘাতে হাবসীগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

দুর্গদ্বার হইতে সৈন্যগণ এই ব্যাপার দেখিয়া কয়েকজন সশস্ত্র হাসবীকে পাঠাইয়া দিল। সুলেমানি তরবারির প্রভাবে রাজকুমার তাহাদিগকেও মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বহু হাবসী আসিল এবং রাজকুমারের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

তুর্ম্মতাক বাদশাহ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। নিজ

প্রধান সেনাপতি চলমাক্ নামক মহাযোদ্ধাকে ডাকিয়া সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। চলমাক্ সহস্র সহস্র হাবসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। রাজকুমারের নিকটে আসিয়া কহিলেন—"ওরে নির্ব্বুদ্ধি, তুই গোটাকতক হাবসী সৈন্য মারিয়াই কি নিজেকে মহাবীর বলিয়া মনে করিতেছিস? তোর শক্তি কতখানি এবার আমি দেখিব।" রাজকুমার এই দুর্ব্বচন শুনিয়া ক্রোধে সুলেমানি তরবারি বাহির করিয়া হাবসীগণের মস্তক ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া ক্রোধে চল্‌মাক এক বর্শা ঘুরাইয়া রাজকুমারকে লক্ষ্য করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইলেন। রাজকুমার সুলেমানী তরবারি দ্বারায় চল্‌মাককে এমন আঘাত করিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সেনাপতি নিহত দেখিয়া হাবসী সৈন্যগণ উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

এই সমাচার তুর্ম্মতাকের নিকট পৌঁছিবামাত্র ক্রোধে ও অপমানে তিনি অগ্নিসমান হইয়া উঠিলেন। আজ্ঞা দিলেনঃ 'সৈন্যগণ সজ্জিত হও, আমি স্বয়ং এবার যুদ্ধযাত্রা করিব।"

পরদিন প্রভাতে, প্রলয়ের মেঘপুঞ্জ সদৃশ. অগণ্য হাবসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া, স্বয়ং তুর্ম্মতাক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর, রাজকুমার সহস্রাধিক হাবসী সৈন্য বধ করিলেন বটে, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ভাবিলেন, এবার বুঝি রণে পরাজয় মানিতে হয়। একা অত লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন? এমত সময়ে দেখা গেল, ব্যাঘ্ররাজ দুই সহস্র ব্যাঘ্র সৈন্য লইয়া, বজ্রগম্ভীর স্বরে হুহুঙ্কার করিতে করিতে, রাজকুমারের সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ব্যাঘ্রগণ হাবসী সৈন্যকে ধরিযা সদ্য সদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাজকুমারের সাহস ও বলবৃদ্ধি হইল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পয়গম্বর ইসাকের ধনুর্ব্বাণের সাহায্যে সহস্র সহস্র হাবসী সৈন্য নিপাত করিতে লাগিলেন।

তুর্ম্মতাক ইহা দেখিয়া ভাবিলেন—"নিশ্চয়ই এ মনুষ্য নহে—কোনও দৈত্য বা দানব হইবে। মনুষ্য হইলে কি একাকী এত হাবসীকে বধ করিতে পারিত? আর ব্যাঘ্ররাজই বা আসিয়া সাহায্য করে কেন? অতএব যুদ্ধে আর মঙ্গল নাই। পলায়ন করিয়া দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় লই।" এই চিন্তা করিয়া তুর্ম্মতাক সেনাগণকে পলায়ন করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই পয়গম্বর ইসাক প্রদত্ত এক শর আসিয়া তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ হইল এবং তিনি ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এইরূপে হাবসীগণকে জয় করিয়া ব্যাঘ্ররাজের সহিত রাজকুমার দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিজেতাকে রাজা জানিয়া হাবসীগণ তাঁহাকে সিংহাসনে সমর্পণ করিল। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও সুরা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। তিনি ব্যাঘ্ররাজের সহিত সে সমস্ত পানাহার করিয়া, বিশ্রামসুখে সেই দুর্গে দুই তিন দিন কাটাইলেন। তুর্ম্মতাকের একটি মাত্র কন্যা ছিল। তিনি তাহাকে আনাইয়া, মহম্মদী কলমা শিখাইয়া, তাহাকে পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। সে কন্যা অতীব সুন্দরী। বলিলেন —"কুমারি, তুমি এখন তোমার পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া রাজ্য প্রতিপালন কর।" এই বলিয়া তুর্ম্মতাক কন্যাকে সিংহাসনে বসাইয়া, ব্যাঘ্ররাজকে অনুরোধ করিয়া এক ফৌজ ব্যাঘ্র সৈন্য তাহার রক্ষার্থ রাখিয়া, রাজকুমার বাকাফ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হাবসী রাজ্য পরিত্যাগ করিবার পর দুই তিন মাস অতীত হইলে বাদশাজাদা অলমাশ এক প্রকাণ্ড উপবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় বিবিধ বর্ণের পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। চামেলি, চম্পা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলকুল মনোন্মাদকর সুগন্ধি বিতরণ করিতেছে। উপবনের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন একটি লতাবৃক্ষপূর্ণ উচ্চ পর্ব্বত। নিম্নে বড় বড় বনস্পতিসকল দণ্ডায়মান। একটি সুশীতল বারিপূর্ণ কুণ্ডও রহিয়াছে। পর্ব্বত হইতে জল নামিয়া সেই কুণ্ডে প্রবেশ করিতেছে এবং অপর এক স্থান দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। বাদশাজাদা সেই কুণ্ড দেখিলেন, এই বোধ হয় জমিলাবানু কথিত সী-মোরগের আবাস স্থান।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই স্থানে বিশ্রামের আয়োজন করিলেন। চরিবার জন্য অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। কুণ্ডে নামিয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, প্রথমে নামাজ পড়িলেন। অবশেষে পোঁটকা হইতে খাদ্য বাহির করিয়া, কিছু ভোজন করিয়া জিনপোষ পাতিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন।

কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ হইয়াছে, এমন সময় তাঁহার অশ্ব মহাভয়ে শব্দ করিতে করিতে তাঁহার বিছানার কাছে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাজকুমার জাগিয়া উঠিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইলেন, এক বৃহৎ অজগর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশস্থিত একটি মহাবৃক্ষের নিকট যাইতেছে। তাহার দেহভরে পথস্থিত প্রস্তরখণ্ডসকল চূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া যাইতেছে। সর্পকে দেখিবামাত্র রাজকুমার ইসাক্ পয়গম্বরের ধনু লইয়া সর্পকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর চালাইলেন। তীরের আঘাতে সর্প অতি বিকট শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং যাতনায় ভূমিতে পুচ্ছ আছড়াইতে লাগিল। বিষের উত্তাপে নিকটস্থ বৃক্ষসকল জ্বলিয়া উঠিল। রাজকুমারের শরীর সে উত্তাপে অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় একটি তীর লইয়া সর্পের মস্তক বিদ্ধ করিলেন। সর্প তখন ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

বাদশাজাদা সেই সময় দেখিলেন, যে বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া সর্প যাইতেছিল, সেই বৃক্ষে একটি পক্ষীর বাসা রহিয়াছে। পক্ষীশাবকগণ মুখ বাহির করিয়া সর্পের সহিত রাজকুমারের যুদ্ধ দেখিতেছিল। রাজকুমার ভাবিলেন ইহারাই বোধ হয় সী-মোরগ পক্ষীর শাবক হইবে। এই ভাবিয়া সর্পদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, সেই মাংস পক্ষী শাবকদিগকে খাইতে দিলেন। শাবকগণ মাংস আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিদ্রা গেল। এদিকে রাজকুমারও কুণ্ডে নামিয়া নিজ দেহ হইতে সর্পরক্ত ধৌত করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, জিনপোষ বিছাইয়া শয়ন করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে আকাশ যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। সূর্য্য ঢাকিয়া গেল। সন্ সন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সী-মোরগ ও সী-মুরগী চরিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

সী-মোরগ বৃক্ষের নিকট আসিয়া বলিল—"আমরা যখন ফিরিয়া আসি, তখন প্রত্যহ আমাদের শাবকগণ ক্ষুধায় কলবল করিতে থাকে, আজ তাহারা কোথায়?" এই কথা বলিতে বলিতে দেখিতে পাইল, কুণ্ডের তীরে রাজকুমার নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সী-মোরগ নিজ পত্নীকে বলিল—"নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি আমাদের শাবককে হত্যা করিয়াছে। মাঝে মাঝে আমাদের শাবককে কে আসিয়া খাইয়া ফেলে, এতদিন সন্ধান পাই নাই। আজ বুঝিলাম এই ব্যক্তিরই কার্য্য।" এই বলিয়া ক্রোধে সী-মোরগ একখণ্ড তিনশত মণ ওজনের পাথর পর্ব্বত হইতে খসাইয়া মুখে করিয়া নিদ্রিত রাজকুমারের উপর ফেলিতে চাহিল।

ইহা দেখিয়া সী-মুরগী বলিল—"আগে নিজের বাসা অন্বেষণ করিয়া দেখ শাবক আছে কি নাই। যদি শাবক থাকে তবে নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যাজনিত পাপ কেন মাথায় লইবে?"

তাহারা বাসায় গিয়া দেখিল—শাবকগণ সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পিতামাতার আগমনে তাহারা জাগিয়া উঠিল। বলিল—"বাবা, মা, ঐ যে কুণ্ডতীরে মনুষ্যটি শুইয়া আছেন, উনিই আজ আমাদের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, এক অজগর সর্প আমাদিগকে খাইতে আসিতেছিল, উনিই তাহাকে বধ করিয়া, তাহার মাংস কাটিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়া দিয়াছেন। তাহাই পেট ভরিয়া খাইয়া আমরা সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম।"

ইহা শুনিয়া সী-মোরগ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া রাজকুমারকে জাগাইয়া তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়, আপনি কে? আর কি জন্যই বা এ দুর্গম প্রদেশে আগমন করিয়াছেন?" রাজকুমার তখন নিজের আমূল বৃত্তান্ত সমস্তই সী-মোরগকে অবগত করাইলেন।

সী-মোরগ বলিল—"আপনি বাকাফ সহরে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে সমুদ্র সমান সাতটি নদী পার হইতে হইবে। সে নদী পার হওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আপনি কেমন করিয়া পার হইবেন?"

রাজকুমার বিনয় করিয়া সী-মোরগকে কহিলেন—"আপনি যদি দয়া করেন তবেই পার হইতে পারি।"

সী-মোরগ বলিল—"আপনি আজ আমার শাবকগণের প্রাণ রক্ষা করিয়া আমার যেরূপ মহদুপকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব এবং অবশ্যই আপনার সহায়তা করিব। আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি আমার পাখায় আরোহন করিবেন, আমি সাতটি নদী পার করিয়া আপনাকে বাকাফ সহরে পৌঁছিয়া দিব।"

শুনিয়া রাজকুমার সী-মোরগকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সী-মোরগ কহিল—"এক কাজ করুন। পথে খাইবার জন্য আহার ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া লউন। এখানে অনেক বন্য গর্দ্দভ চরিতে আসে। সাত দিনের খোরাক স্বরূপ সাতটি বন্য গর্দ্দভ মারিয়া তাহাদের মাংসে কাবাব প্রস্তুত করিয়া লউন। তাহাদের ছালের মশক নির্ম্মাণ করিয়া সাত মশক জল ভরিয়া লউন। আমি একদিন সমস্ত দিন উড়িয়া এক একটি নদী পার হইব। তখন ক্ষুধায় ও তৃষ্ণার অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। তখন আমাকে এই মাংস খাইতে দিবেন এবং এই জল পান করাইবেন। আপনিও আবশ্যক মত পানাহার করিবেন।"

পরদিন রাজকুমার সাতটি বন্যগর্দ্দভ মারিয়া কাবাব প্রস্তুত করিলেন এবং ছালের মশকে জল ভরিয়া লইলেন।

তৎপরদিন প্রভাতে সী-মোরগ একদিকের পক্ষে রাজকুমারকে বসাইয়া, অন্য দিকের পক্ষে কাবাব ও জল লইয়া, আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল।

এইরূপে সাতদিনে একটি একটি করিয়া সাতটি নদী পার হইয়া, সী-মোরগ রাজকুমারকে লইয়া বাকাফ নগরে উপনীত হইল।

তখন সী-মোরগ বলিল—"এই বাকাফ নগর। এখানে খুব সাবধানে থাকিবে। তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহা আমি এ জীবনে ভুলিব না। এই আমার কয়েকটি পালক তোমায় দিতেছি, সাবধানে রাখিয়া দাও। যদি কখনও কোনও বিপদে পতিত হও, একটি পালক জ্বালাইও, তাহা হইলেই আমি আসিয়া উপস্থিত হইব।" এই বলিয়া, নিজের কয়েকটি পালক রাজকুমারকে দিয়া সী-মোরগ বিদায় গ্রহণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সী-মোরগ প্রস্থান করিলে পর বাদশাজাদা অলমাশ বাকাফ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সারাদিন পথে পথে বেড়াইয়া নগরের শোভা দর্শন করিলেন। সন্ধ্যাকালে একজন নগরবাসীর সহিত আলাপ পরিচয় হইল, তাহার নাম ফরুখ্‌পাল। রাজকুমারের সুন্দর মূর্ত্তি ও বিনয়পূর্ণ কথাবার্ত্তায় ফরুখ্‌পাল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে অবস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ করিল। রাজকুমার আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইয়া ফরুখ্‌পালের গৃহে গিয়া তাহার সহিত বসবাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজকুমারের সহিত ফরুখ্‌পালের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। একদিন দুইজনে একত্র বসিয়া মদ্যপান করিতেছিলেন—এমন সময় ফরুখ্‌পাল বলিল—"বন্ধু, তুমি এদেশে কি কামনা করিয়া আসিয়াছ তাহা ত আজিও বলিলে না।" রাজকুমার কহিলেন—"বলিলে তুমি কি তাহার সুসার করিতে পারিবে?" ফরুখ্‌পাল বলিল—"অবশ্যই চেষ্টা করিব। যদি আমার সাধ্য হয়, অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। ইহা ত বন্ধুত্বের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

রাজকুমার আশ্বাম্বিত হইয়া বলিলেন—"একটি প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য আমি এত বিপদ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া এদেশে আসিয়াছি।"

ফরুখ্‌পাল বলিল—"সে প্রশ্নটি কি?"

রাজকুমার বলিলেন—"গুল বা সনোবর চে কর্দ্দ?"

প্রশ্ন শুনিবামাত্র ফরুখ্‌পালের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া গেল। সে সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"দুর্ব্বৃত্ত, তুই যদি আমার বন্ধু না হইতিস্‌ তবে এখনি তোর শিরশ্ছেদ করিতাম।"

এই কথা শুনিয়া রাজকুমার অতিশয় ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সে দিন চুপ করিয়া রহিলেন।

পরদিন মাদকতা অপসৃত হইলে ফরুখ্‌পাল বলিল—"বন্ধু, গতকল্য হঠাৎ ক্রোধ হওয়ায় তোমার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আসল কথা এই যে তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি কিছুই অবগত নহি। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, সনোবর আমাদের বাদশাহের নাম এবং গুল তাঁহার বেগমের নাম। বাদশাহ এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে, যদি কোনও বিদেশী আসিয়া গুলের নাম এবং আমার দশার কথা জিজ্ঞাসা করে, আমার প্রজারা তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন করিবে। তুমি যদি এ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহ, তবে আমার পরামর্শ বাদশাহের নিকট চাকরি গ্রহণ কর, ক্রমে সুযোগ মত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিও।"

রাজকুমার বলিলেন—"ভাই, বাদশাহের নিকট কেমন করিয়া চাকরিতে ভর্ত্তি হইব?"

ফরুখ্‌পাল বলিলেন—"আমি সে বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি। রাজবাড়ীতে আমার কিঞ্চিৎ আধিপত্য আছে।"

পরদিন বাদশাহের নিকট রাজকুমারকে লইয়া গিয়া ফরুখ্‌পাল বলিল—"জাঁহাপনা, এই এক ব্যক্তি আপনার গুণগ্রাম ও দয়াশীলতা শ্রবণ করিয়া, আপনার খেজমৎ করিবার অভিলাষী হইয়া অনেক দূর হইতে আগমন করিয়াছে।"

সনোবর শাহ রাজকুমারের রূপ কান্তি দেখিয়া প্রীত হইয়া তাঁহাকে চাকরিতে বাহাল করিয়া লইলেন। ক্রমে তাঁহার উপর অধিকতর প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিজ সভাসদ করিয়া মিত্রস্থানীয় করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়। রাজকুমারের প্রতি বাদশাহের মিত্রতা ক্রমে প্রগাঢ় হইতে লাগিল। একদিন সভামধ্যে তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্ধু, তোমার

ব্যবহারে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। যদি তোমার কোনও মনস্কামনা থাকে নিবেদন কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।"

একথা শুনিয়া রাজকুমার বলিলেন—"প্রভু, যদি নির্জ্জন পাইতাম তবে মনস্কামনা নিবেদন করিতাম।"

ইহা শুনিবামাত্র বাদশাহ সভাভঙ্গ করিয়া রাজকুমারকে লইয়া বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বসিয়া বলিলেন—"কি তোমার মনস্কামনা?"

রাজকুমার বলিলেন—"যদি প্রাণদান দেন ত বলি।"

বাদশাহ বলিলেন—"আচ্ছা, প্রাণদান দিতে স্বীকৃত হইলাম।"

রাজকুমার তখন বলিলেন—"গুল বা সনোবর, চে কর্দ্দ?"

ইহা শুনিবামাত্র বাদশাহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিলেন। বলিলেন—"রে দুর্ব্বৃত্ত নরাধম, কি বলিব তোকে প্রাণদান দিয়াছি, নচেৎ এই মুহূর্ত্তেই তোর মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত করিতাম।"

রাজকুমার কহিলেন—"প্রভু, আমাকে শুধু প্রাণদান দিবার প্রতিজ্ঞা করেন নাই। আমার বাসনা পূর্ণ করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুত আছেন। এখন দুনিয়ার বাদশাহ যদি কথা ঠিক না রাখেন, তবে সংসারে কে আর কাহাকে বিশ্বাস করিবে?"

একথা শুনিয়া বাদশাহ মৌন হইয়া রহিলেন। আরও কিছু দিবস অতীত হইল। একদিন বাদশাহ পানোৎসবে রত হইলেন। রাজকুমারও সঙ্গে ছিলেন। যখন বাদশাহ পান করিয়া মত্ততার অবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন রাজপুত্র একটি বীণা লইয়া তাহার ঝঙ্কারসহ কণ্ঠ মিলাইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই বীণাবাদন ও গীত শুনিয়া বাদশাহ অত্যন্ত মোহিত হইয়া গেলেন এবং রাজকুমারকে বলিলেন—"অদ্য তুমি আমায় যে গীত শুনাইলে, তাহাতে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি কি বখশিস্ চাও বল, আমি তাহাই দিব।"

রাজকুমার তখন বলিলেন—"হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ, আমার সেই প্রশ্নটি ছাড়া আর কিছু অভিলষিত নাই।" বাদশাহ তখন মত্ততার অবস্থায় বলিলেন—"যদি স্বীকার কর যে, সে প্রশ্নের উত্তর শুনিলে পর, তোমার মাথা আমি কাটিয়া লইব, তবে বলিতে পারি।"

রাজকুমার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—"প্রভু যদি আমার কৌতূহল সম্পূর্ণভাবে চরিতার্থ করিতে পারেন, কোনও বিষয়ে ত্রুটি না থাকে, তবে মাথা দিতে আমার আপত্তি নাই।"

বাদশাহ তখন বলিলেন—"আচ্ছা, তবে অন্তঃপুরে চল। সেখানে সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাকে বলিয়া, তোমার মাথাটি কাটিয়া লইব।" এই বলিয়া রাজকুমারকে লইয়া বাদশাহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বাদশাহ হুকুম দিলেন—"কুকুরকে লইয়া আইস।" কয়েকজন ভৃত্য তখন একটি কুক্কুরকে আনিল। তাহার রত্নজড়িত গলাবন্ধ, সোনার শিকলে কুকুর বাঁধা ছিল। ভৃত্যগণ তাহাকে আনিয়া একটি মখমলের গদীতে বসাইয়া দিল। কয়েকজন বাঁদী তখন একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোককে আনিল। তাহার হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি। কোমরে লোহার শিকল। একটি থালায় একজন হাবসীর কাটামুণ্ড রাখা হইয়াছে। কয়েকটি পাত্র পূর্ণ করিয়া নানাবিধ সুরস খাদ্য এবং একটি পেয়ালায় গোলাপের সরবৎ আনিয়া কুকুরের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইল। কুকুর যাহা ইচ্ছা তাহা খাইল। তখন সেই উচ্ছিষ্ট সেই স্ত্রীলোকটির সম্মুখে রাখা হইল। স্ত্রীলোকও ক্ষুধার যাতনায় সেই উচ্ছিষ্ট কিয়দংশ ভক্ষণ করিল। তখন বাদশাহ উঠিয়া, একটি লাঠি লইয়া, সেই কাটামুণ্ডের উপর সজোরে এক আঘাত করিলেন। আঘাতের চোটে সেই মুণ্ড হইতে কয়েক বিন্দু রক্ত বাহির হইল। রক্ষিগণ বলপূর্ব্বক সেই রক্ত স্ত্রীলোকটিকে চাটাইয়া দিল।

অতঃপর কুকুর, কাটামুণ্ড ও সেই স্ত্রীলোককে সেখান হইতে লইয়া যাওয়া হইল।

রাজকুমার এসমস্ত ব্যাপার অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিতেছিলেন। উহারা চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শাহানশাহ—এ কি দেখিলাম? জীবশ্রেষ্ঠ যে মানুষ্য, তাহাকে কেন কুক্কুরেরই উচ্ছিষ্ট খাইতে বাধ্য করিলেন?"

বাদশাহ বলিলেন—"যুবক, যে স্ত্রীলোক দেখিলে, উহারই নাম গ.ল। আমারই নাম সনোবর। আমাদের কাহিনী অতি হৃদয়বিদারক। তুমি কি না শুনিয়া নিবৃত্ত হইবে না?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন—"না প্রভু, না শুনিলে আমার মন শান্ত হইবে না।"

তখন বাদশাহ নিজ কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

হে যুবক, আমি একদিন শিকার করিতে গিয়াছিলাম। একাকী এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ শিকার করিয়া, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। জল অন্বেষণ করিতে করিতে গভীর জঙ্গল মধ্যে এক কূপ দেখিতে পাইলাম। কোথায় ডোল কোথায় দড়ি পাইব? ইজারাবন্দকে দড়ি করিয়া, টুপীতে বাঁধিয়া জল তুলিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। আশ্চর্য্যেব বিষয় এই যে কূপের মধ্যে গিয়া টুপী আটকাইয়া গেল। টানাটানি করি তথাপি উঠে না। তখন মনে করিলাম, কূপের মধ্যে কোনও ভূতযোনি আছে, সেই টুপী আটকাইযাছে। তখন চীৎকার করিয়া বলিলাম—"এ কূপের মধ্যে কোন মহাত্মন আছে? আমি তৃষ্ণাতুর পথিক, টুপী ছাড়িয়া দাও।"

তখন কূপের মধ্য হইতে শব্দ হইল—"হে ঈশ্বরভক্ত, আমরা বহু বর্ষ হইতে এই কূপের মধ্যে পড়িয়া আছি। আমাদের উত্তোলন করিয়া প্রাণদান কর।"

আশ্চর্য্য হইয়া, অত্যন্ত বল সহকারে, দড়ি টানিয়া তুলিলাম, দেখিলাম দুইজন বৃদ্ধ অন্ধ স্ত্রীলোক। উহাদের শরীর শুকাইয়া ধনুকের মত হইয়া গিয়াছে। হাত পা শুকাইয়া কাঠির মত হইয়া গিয়াছে। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। দাঁত সমস্ত পড়িয়া গিয়াছে।

তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা এ কূপে কেমন করিয়া পড়িয়াছিলে?"

স্ত্রীলোকগণ কহিল—"হে পথিক, এদেশের বাদশাহ রাগ করিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিয়া এই কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এক ঔষধ বলিতেছি, তাহা আনিয়া আমাদের চক্ষে দাও, তাহা হইলে আমরা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইব এবং তোমাব পরম উপকাব করিব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ঔষধ?"

তাহারা বলিল—"এখান হইতে অল্প দূরে এক নদী আছে। তাহার তীরে নদী হইতে উঠিয়া একটি গরু চরিতে আসে। গরু আসিলে তুমি লুকাইয়া থাকিও, কারণ তোমায় দেখিলে মারিয়া ফেলিবে। সেই গরু চরিয়া গেলে তাহার গোবর কিঞ্চিৎ আনিয়া আমাদের চক্ষে প্রলেপ দাও।"

তাহা শুনিয়া আমি নদীতীরে গিয়া এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লুকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে জল হইতে এক প্রকাণ্ড গরু বাহির হইয়া আসিল। তাহার গাত্র রূপার মত শুভ্র। তাহার শৃঙ্গ শাণিত ইস্পাতের ন্যায় চাকচিক্যশালী, গরু কিয়ৎক্ষণ চরিয়া আবার জলমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তখন নামিয়া কিঞ্চিৎ গোবর উঠাইয়া লইলাম। কূপের নিকট আসিয়া সেই বৃদ্ধাদের চক্ষে অল্প গোবর প্রলেপ দিবামাত্র তাহারা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল এবং আমাকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

তখন বৃদ্ধাগণ কহিল—"হে বিদেশি, ইহা পরীদিগের রাজ্য। এখানকার বাদশাহের

এক পরম রূপবতী কন্যা আছে। তাহার মুখ চন্দ্রের অপেক্ষাও দৃষ্টিসুখকর। তাহার চক্ষু দেখিলে দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়। তাহার ওষ্ঠ কুন্দের মত লাল, তাহার একটি চুম্বনে সহস্র দুঃখের শান্তি হয়। তাহার পিতামাতা তাহাকে অত্যন্ত আদর করেন সেই জন্য অদ্যাবধি বিবাহ দেন নাই, আমি তোমাকে সেই কন্যার নিকট লইয়া যাইব। সমস্তদিন সে কন্যা একাকী থাকে। তুমি পরমানন্দে তাহার সহিত মিলনসুখে অতিবাহিত করিতে পারিবে। ঈশ্বর না করুন, তাহার পিতামাতা যদি তোমাদের মিলনবার্ত্তা অবগত হয়, তবে তোমাকে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তুমি তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না। অগ্নিকুণ্ডের নিকট যখন ভৃত্যেরা তোমাকে লইয়া যাইবে তখন বলিও—"আমাকে একটু তেল মাখিতে দাও যাহাতে সহজেই পুড়িয়া মরিতে পারি।" তাহারা সম্মত হইবে। তখন তুমি ফুকারিয়া বলিও—"কেহ আমাকে একটু তেল মাখাইয়া দিতে পার ? আমরা তখন আসিয়া তোমার অঙ্গে এমন তেল লেপন করিব যে, অগ্নি তোমার পক্ষে সুশীতল অনুভূত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া, সেই পরীকন্যার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। তাহারা আমাকে লইয়া পরীর বাদশাহের মহলে লইয়া গেল। সেখানে সেই কন্যা ছাড়া আর কেহই ছিল না। সকলেই দূর বনে চরিতে গিয়াছিল।

সেই পরীকন্যাকে দেখিবামাত্র আমি প্রণয়তৃষ্ণায় পীড়িত হইতে লাগিলাম। সে একটি রত্নপালঙ্কে নিদ্রিত ছিল। সেই পালঙ্কে মখমলের বালিস ছিল, রেশমের মশারি লাগানো ছিল। মশারি এত সূক্ষ্ম সূতায় নির্ম্মিত ছিল যে, তাহার মুখকমল স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল। আমি সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের শোভা অবাক হইয়া ক্ষণকাল দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে তবে ইহাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালা জাগরিত হইল। আমাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইল। কেশ-বেশ সুসম্বৃত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে ?"

আমি কহিলাম—"প্রাণেশ্বরি, আমি তোমার প্রণয়ার্থী।" আমি তাহাকে দেখিয়া যেরূপ প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলাম, বোধ হয় আমাকে দেখিয়া সেও তদ্রূপ হইল। আমি তখন সাহস করিয়া মশারি তুলিয়া, পালঙ্কে উপবেশন করিলাম। তাহার সহিত উচ্ছ্বসিত স্বরে সুমধুর প্রেমালাপ করিতে লাগিলাম। সে ষোড়শী সুকুমারীও আমার প্রেমালাপে প্রীতি অনুভব করিল এবং আমাকে প্রণয়জড়িত স্বরে নানা মধুর বাক্য বলিতে লাগিল।

দিবা যখন শেষ হইল সেই তরুণী তখন আমাকে একটি সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া লুকাইয়া রাখিল। পরদিন প্রভাতে তাহার পিতামাতা চরিতে গেলে, আবার আমায় বাহির করিল। আমরা সারাদিন প্রেমসুখে অতিবাহিত করিলাম। প্রতিদিন এইরূপ হইতে লাগিল। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। আমি রাজ্য ভুলিয়া সেই সুখময়ীর প্রেমে মগ্ন রহিলাম।

একদিন দৈবাৎ দিবাভাগে পরী-বাদশাহ আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। পরী-বাদশাহের বেগম কন্যাকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। পরী-বাদশাহ ক্রোধান্ধ হইয়া ভৃত্য-গণকে আজ্ঞা করিলেন—"ইহাকে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ কর।"

ভৃত্যগণ আমাকে বাঁধিয়া লইয়া পোড়াইতে চলিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল। আমি তখন বলিলাম—"তোমরা দয়া করিয়া আমায় একটু তেল মাখিতে দাও, যাহাতে সহজে পুড়িয়া মরিতে পারি।" তাহারা সম্মত হইল। তখন উচ্চৈস্বরে বলিলাম—"এমন কেহ আছ আমাকে একটু তেল মাখাইয়া দিতে পার ?" তৎক্ষণাৎ সেই বৃদ্ধাদ্বয় আসিয়া আমার অঙ্গে যাদুপূর্ণ তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। ইহার পর ভৃত্যগণ আমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। একদিন একরাত্রি জ্বলিবার মত ইন্ধন তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল।

অগ্নি জ্বলিতে লাগিল, আমি তৈলের প্রভাবে সুস্থ শরীরে তাহার মধ্যে বসিয়া রহিলাম।

পরদিন প্রভাতে, আমি পুড়িয়াছি কি না দেখিবার জন্য পরী-বাদশাহ ও তাঁহার বেগম আগমন করিলেন। আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে সসম্মানে সেলাম করিলাম, আমাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহারা পরম বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"একি আশ্চর্য্য ব্যাপার, তুমি জীবিত আছ?" পরী-বেগম কহিলেন—"নিশ্চয়ই ও কোনও দেবযোনিসম্ভূত হইবে। মনুষ্য নহে।" তাঁহারা আমাকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। আমি তাঁহাদিগের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। পরী-বেগম বাদশাহকে কহিলেন—"এ মরে নাই ভালই হইয়াছে। কল্য হইতে আমার কন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরণাপন্ন হইয়াছে। চল ইহাকে লইয়া গিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিই।

মহাসমারোহে পরী-কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইল। কয়েক দিবস শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া, স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সেই পরী-কন্যারই নাম গুল। হে বিদেশি, সেই কন্যাকেই তুমি আজ শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিয়াছ। তাহার কারণ ক্রমে বলিতেছি।

দেশে ফিরিয়া গুলবেগমের সহিত প্রণয়সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। একদিন ভোর সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, গুলবেগমের হাত পা বরফের মত শীতল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বাহিরে গিয়াছিল, হাত পায়ে জল দেওয়াতে অমন শীতল হইয়া গিয়াছে। আমি তখন উহার কথা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিলাম. কয়েকদিন পরে পুনরায় জাগিয়া ঐ প্রকার দেখিলাম এবং বেগম ঐ উত্তরই দিল। তখন আমার সন্দেহ হইল যে বোধ হয় রাত্রে কোথাও যায়. তাই শীতে হাত পা শীতল হয়। এ কথা আমি মনে মনেই রাখিলাম. প্রকাশ করিলাম না।

একদিন অশ্বশালায় গিয়া দেখি আমার উৎকৃষ্টতম অশ্বটি জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইয়া রহিয়াছে। রক্ষকগণকে গালিমন্দ দিতে লাগিলাম, বলিলাম—"তোরা নিশ্চয়ই দানা চুরী করিস। নহিলে আমার এমন মোটা তাজা ঘোড়া এমন হইয়া গেল কেন?" তখন প্রধান অশ্বরক্ষক বলিল—"জাঁহাপনা, যদি প্রাণদান পাই তবে ইহার কারণ খুলিয়া বলি।" আমি প্রাণদান দিলাম। সে তখন বলিল—"পৃথিবীপালক, প্রত্যহ রাত্রে বেগম সাহেবা এই অশ্বকে খুলিয়া কোথায় লইয়া যান এবং ভোর বেলায় ফিরাইয়া আনেন। অত্যধিক পরিশ্রমে ঘোড়া এমন দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে।"

শুনিয়া আমি মৌন হইয়া বাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে পরীক্ষা করিবার জন্য কপট নিদ্রাগ্রস্ত হইয়া জাগিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, বেগম আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া উঠিল। পশ্চাদ্দেশে শিঙ্গার কামরায় গিয়া দাঁতে মিশি, চোখে সুরমা, গণ্ডস্থলে গোলাপী রঙ প্রভৃতি দিয়া বহুমূল্য পেশোয়াজ পরিয়া, নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, অশ্বশালাব দিকে গমন করিল। আমার সেই বেগবান উৎকৃষ্ট অশ্বটি খুলিয়া লইয়া, তাহাতে আরোহণ করিয়া. বাহির হইল। আমি অন্য একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া গোপনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। আমার প্রিয় কুকুরটিও ঘোড়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে গুলবেগম নগর ছাড়াইয়া মাঠে গিয়া পড়িল। সেখানে একজন হাবসী, কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। সাধারণ হাবসীগণের মতই তাহার গাত্রবর্ণ মসীতুল্য ছিল, তাহার মুখাবয়ব অতি কদাকার ছিল। হাবসী কুটীরের বাহিরে দণ্ডায়মান ছিল। গুল-বেগম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহার নিকট গেল। তাহাকে দেখিবামাত্র সেই হাবসী নিজের পা হইতে জুতা খুলিয়া বেগমকে পটাপট মারিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল—"হারামজাদি! আজ এত দেরী করিয়া আসিলি কেন?" যে বেগমকে আমি কখনও ফুল ছুঁড়িয়াও মারি নাই, সেই সুকুমারীকে এরূপ ভাবে প্রহৃত হইতে দেখিয়া ভাবিলাম

বোধ হয় মরিয়া যাইবে। কিন্তু অভাগিনী মরিল না। সেই হাবসীর চরণ চুম্বন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—"কি করিব, আমার স্বামী আজ দেরী করিয়া নিদ্রা গিয়াছে তাই আসিতে একটু বিলম্ব হইল। আমার কোনও অপরাধ নাই, প্রাণেশ্বর আমাকে মার্জ্জনা কর।"

তখন হাবসী বলিল—"আমি তোকে কতদিন বলিয়াছি তোর স্বামীটাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেল্। তাহা ত তুই শুনিবি না। সে হতভাগা বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের সুখ নাই।" এই বলিয়া বেগমকে আরও প্রহার করিতে লাগিল।

বেগম তখন বলিল—"নাথ, ক্ষমা কর। আমি কল্যই আমার স্বামীকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলিব। তুমি তখন নিষ্কণ্টকে রাজ্য ও আমাকে অধিকার করিবে।"

ইহা শুনিয়া হাবসী ক্ষান্ত হইল এবং তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া কুটীরে লইয়া গেল। আমিও দূর হইতে দাঁড়াইয়া কুটীরের ভিতর দেখিতে লাগিলাম। আমি আর থাকিতে না পারিয়া, সিংহনাদ করিয়া, তরবারি হস্তে হাবসীকে আক্রমণ করিলাম।

হাবসীও চীৎকার করিয়া, অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া তাহার ভৃত্য চারিজন হাবসী সশস্ত্র হইয়া আগমন করিল। তাহারা পাঁচজন, আমি একজন। তরবারি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি ক্রমে ক্রমে ভৃত্যগণের মধ্যে তিন হাবসীকে যমালয়ে প্রেরণ করিলাম। তখন চতুর্থ হাবসী ভৃত্য প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। আমার বেগমের সর্ব্বনাশকারী হাবসীর সঙ্গেই আমার যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি রক্তক্ষয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। তথাপি হাবসীর হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া, দুই হস্তে দুই তরবারির দ্বারায় যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। এতক্ষণ গুলবেগম নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। সে ইহা দেখিয়া, পশ্চাৎ হইতে আমাকে এমন ধাক্কা মারিল যে আমি ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তখন হাবসী সুবিধা পাইয়া আমার বুকে চড়িয়া বসিল। বেগম নিজের কোমর হইতে এক ছুরি বাহির করিয়া, আমাকে হত্যা করিবার জন্য হাবসীর হাতে দিল। আর এক মুহূর্ত্ত হইলেই আমাকে যমালয় দর্শন করিতে হইত। এমন সময় আমার প্রভুভক্ত কুকুর এক লম্ফ দিয়া হাবসীর টুটি কামড়াইয়া ধরিল। হাবসীর হাতের ছুরি হাতেই রহিয়া গেল। সে আমার পার্শ্বে ভূমিতে পড়িয়া গেল। আমি তখন উঠিয়া হাবসীকে ও গুলকে বাঁধিয়া ফেলিলাম, তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাজবাটীতে লইয়া আসিলাম। সেই হাবসীর মাথা কাটিয়া এক থালায় রাখিয়া দিলাম। তুমি থালায় সেই হাবসীর মুণ্ড দেখিয়াছ। আমার কুকুরটিকেও দেখিয়াছ। ঐ কুকুরই আমার জীবন-দাতা। তাই উহার এত আদর। আর গুলকে যে দণ্ড দিতেছি, তাহা উহার মহাপাপের তুলনায় লঘুদণ্ড বলিতে হইবে। আর যে হাবসী ভৃত্য পলাইয়া গিয়াছিল, সে কৈমুশ শাহ বাদশাহের দেশে লুকাইয়া আছে। ইহাই আমার জীবনের হৃদয়বিদারক ইতিহাস।

দশম পরিচ্ছেদ

সনোবর শাহ এই বৃত্তান্ত শেষ করিয়া রাজকুমারকে বলিলেন—"হে বিদেশি, এখন তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর অবগত হইলে, এখন নিজের প্রতিজ্ঞা পালন কর। আমি তোমার মস্তকটি কাটিয়া লইব।"

রাজকুমার বলিলেন—"দেখিতেছি আমাকে বধ করিবার জন্য আপনার সম্পূর্ণ ইচ্ছা; আমিও তাহাতে পশ্চাৎপদ নহি। কেবল এক বিষয়ের মীমাংসা এখনও অবগত হই নাই। আপনার সঙ্গে কথা ছিল, আমার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ভঞ্জন করিয়া আমার মাথা কাটিয়া লইবেন। অতএব হে দেশাধিপতি, সেই চতুর্থ হাবসী ভৃত্য এত লোক থাকিতে মেহেরঙ্গেজের সিংহাসন তলেই বা লুকাইত হইল কেন এবং মেহেরঙ্গেজই বা কি কারণে

তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে? আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আমার মস্তক কর্ত্তন করুন।"

সনোবর শাহ অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং রাজকুমারের সম্পূর্ণ সংশয় দূর করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার মস্তক কর্ত্তন করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন।

রাজকুমার আর কিছুদিন সনোবর শাহের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া একদিন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সনোবর শাহ তাঁহাকে বহু রত্ন-মাণিক্যাদি উপহার দিয়া দুঃখিত মনে বিদায় দিলেন।

রাজকুমার তখন বাজার হইতে সাত দিনের আহারোপযোগী মাংসের কাবাব ক্রয় করিয়া, সাতটি মশক জলে পূর্ণ করিলেন। তাহার পর সী-মোরগের একটি পালক আগুনে জ্বালিয়া দগ্ধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সী-মোরগ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকুমার খাদ্যাদিসহ তাহার পক্ষে আরোহণ করিয়া একে একে সাতটি নদী পার হইলেন।

সী-মোরগ এবং সী-মুর্গী বিবিধ প্রকারে রাজকুমারের আতিথ্য করিল। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া, নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে হাবসীর দুর্গে পৌঁছিয়া, হাবসী কন্যাকে বিবাহপূর্ব্বক, বহু-রত্ন সহ গৃহযাত্রা করিলেন।

কয়েক দিবস পথ পর্য্যটনের পর ব্যাঘ্র রাজার দেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে পূর্ব্বমত ব্যাঘ্ররাজার সেবা করিলেন এবং ব্যাঘ্ররাজা নিজ সৈন্য সঙ্গে দিয়া সেই মহাবন তাঁহাকে পার করাইয়া দিল।

আরও কয়েক দিবস পরে জমিলাবানুর দেশে পৌঁছিলেন। সেখানে প্রতিশ্রুতি মত তাহাকে বিবাহ করিয়া কিয়দ্দিন বহুসুখে অতিবাহিত করিয়া, জমিলাবানুকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে রাজকুমার লতিফাবানুর দেশে পৌঁছিলেন। তাহার বাগানে প্রবেশ করিয়া, জমিলাবানু একে একে সমস্ত হরিণকে ইন্দ্রজালমুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা নানা দেশ বিদেশের বাদশাজাদা। জমিলাবানু ও অলমাশকে বহু ধন্যবাদ দিতে লাগিল। অলমাশ তখন সেই যুবকগণকে আজ্ঞা দিলেন—"যাও, লতিফাবানুকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।" তাহারা অবিলম্বে লতিফাবানুকে বাঁধিয়া রাজকুমারের পদতলে নিক্ষিপ্ত করিল। রাজকুমার বলিলেন, "ইহার মাংস টুকরা টুকরা করিয়া কুকুরকে খাওয়াইলে তবে ইহার উপযুক্ত দণ্ড হয।" কিন্তু জমিলাবানু লতিফাবানুর ভগ্নী ছিল। ভগ্নীর প্রাণ-রক্ষার্থ জমিলাবানু রাজকুমারকে অনেক অনুনয় করিতে লাগিলেন। তখন রাজকুমার বলিলেন—"আচ্ছা এ যদি পবিত্র মোহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং শপথপূর্ব্বক ইন্দ্রজাল-চর্চ্চা পরিত্যাগ করে, তবে ইহাকে ক্ষমা করিতে পারি।"

লতিফাবানু প্রাণভয়ে স্বীকৃত হইল। রাজকুমার তখন তাহাকে কলমা পড়াইযা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন এবং শপথ করাইয়া লইলেন যে, আর কখনও ইন্দ্রজাল-চর্চ্চা করিবে না। অতঃপর তাহাকে ক্ষমা করিয়া, সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। নানা দেশের রাজপুত্রগণও আনন্দ মনে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পথভ্রমণে এক মাস কাটিলে পর বাদশাজাদা পুনর্ব্বার রুমদেশে পৌঁছিলেন। কৈমুশ শাহের রাজধানীতে উপস্থিত হইযা, মহাবলে রাজদ্বারের ডঙ্কা বাজাইয়া দিলেন।

ডঙ্কা বাজিবামাত্র কয়েকজন রাজভৃত্য তাঁহাকে কৈমুশ শাহেব নিকট লইয়া গেল। বাদশাহ বলিলেন—"হে যুবক, তোমার কি মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে? কত হাজার রাজপুত্র আসিয়া প্রশ্নোত্তর দানে অসমর্থ হইয়া প্রাণ দিয়াছে তাহা কি তুমি জান না? তোমার নিকট তোমার প্রাণের মূল্য কি কিছুই নাই?"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—"পৃথিবীপতি, আমি বহু কষ্টে এ প্রশ্নের উত্তর

সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। আমাকে বাদশাজাদী সমীপে পাঠাইতে আজ্ঞা করুন।"

বাদশাহ তখন রাজকুমারকে মেহেরঙ্গেজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রাজকুমার মেহেরঙ্গেজের মহালে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল্লাদও আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। জল্লাদ এক টুকরা ইষ্টক লইয়া তরবারিতে শান দিতে লাগিল।

রাজকুমার মেহেরঙ্গেজের নিকট উপস্থিত হইয়া, কহিলেন—"বাদশাজাদি, তোমার প্রশ্ন কি?"

বাদশাজাদী কহিলেন—"গুল্ বা সনোবর চে কর্দ?"

ভ্রাতৃহন্ত্রীকে দেখিয়া রাজকুমারের দুই চক্ষু দিয়া ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"গুল্ সনোবরের সঙ্গে যাহা করিয়াছিল তাহার জন্য সে উত্তমরূপ প্রতিফলও পাইয়াছে। আর তোমার কৃত দুষ্কৃতের জন্য তোমাকেও সেইরূপ প্রতিফল পাইতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া মেহেরঙ্গেজের মন ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। তথাপি সে বলিল—"ও কথা বলিলে চলিবে না। যদি তুমি আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে পার, তবেই মানিব।"

রাজকুমার বলিলেন—"যদি গুল্ ও সনোবরের কাহিনী শুনিবার তোমার এতই ইচ্ছা, তবে তোমার পিতাকে পাত্রমিত্র সহ এইখানে আসিয়া সভা করিতে আহবান কর, আমি সে কাহিনী সভাসমক্ষে বলিব।"

মেহেরঙ্গেজ সম্মত হইলেন। রাজকুমারকে বৈকালে আসিতে বলিয়া দিলেন।

বৈকালে রাজকুমার গিয়া দেখিলেন, বাদশাহ পাত্রমিত্র এবং প্রধান নাগরিকগণ লইয়া সভা করিয়া বসিয়াছেন। বাদশাজাদি ও বেগমও দুইখানি সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

রাজকুমার তখন বলিলেন—"বাদশাজাদি, যাহার কাছে তুমি এ বৃত্তান্ত শুনিয়াছ সে মনুষ্যকে সভায় উপস্থিত কর। কারণ আমার কথা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য একজন দক্ষ লোক এখানে উপস্থিত থাকা আবশ্যক।"

রাজকুমারী তখন বলিল—"আমি কোনও বিদেশীর নিকট একথা শুনিয়াছিলাম। এখন কোথা হইতে তাহাকে উপস্থিত করিব?"

রাজকুমার কহিলেন—"আচ্ছা, আমিই না হয় একজন দক্ষ লোক এখানে উপস্থিত করিতেছি।" এই বলিয়া বাদশাজাদীর সিংহাসনের নিকট গিয়া পর্দ্দা উঠাইয়া, চুলের মুঠি ধরিয়া এক প্রকাণ্ডকায় হাবসীকে টানিয়া বাহির করিলেন।

সভাস্থ লোক ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। বাদশাজাদী লজ্জায় অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিল। বাদশাহ ও বেগমও লজ্জায় বাকশক্তিবিহীন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তখনও মেহেরঙ্গেজ আশা ছাড়ে নাই। তখনও বলিতেছে—"বল বল গুল্ সনোবরের সহিত কি করিয়াছিল?"—বাদশাজাদী ভাবিতেছিল, যদি না বলিতে পারে, তবে এখনই ইহাকে কাটিয়া লজ্জা ও অপমানের প্রতিশোধ লইব।

তখন রাজকুমার গুল্ ও সনোবরের আমূল বৃত্তান্ত সভা মধ্যে বর্ণনা করিলেন। প্রত্যেক কথায় হাবসীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"কেমন, একথা সত্য কি না?" হাবসী বলিতে লাগিল—"সত্য।"

সভাস্থ সকলে এ আখ্যান শ্রবণ করিয়া রাজকুমারের বুদ্ধি ও সাহসের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। বাদশাহ বহুসংখ্যক রত্ন-মাণিক্য সহ সভাস্থলেই অলমাশকে মেহেরঙ্গেজ সমর্পণ করিলেন। শুভদিনে বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু রাজকুমার তাহার সহিত বিবাহযোগ্য ব্যবহার করিতে বিরত রহিলেন। কয়েকদিন রুমদেশের রাজধানীতে থাকিয়া, জমিলাবানু এবং মেহেরঙ্গেজ সহ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সিংহাসনতলস্থ সেই হাবসীকেও বাঁধিয়া আনিলেন।

তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শামশাদলালপোষ পরমানন্দে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। রাজ্যে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। বাদশাহ এত দান ধ্যান আরম্ভ করিলেন যে, দেশের সমস্ত কাঙাল নেহাল হইয়া গেল। জমিলাবানুকে পুত্রবধূরূপে পাইয়াও তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

একদিন মহতী সভা আহূত হইল। তথায় রাজকুমার গৃহত্যাগের দিন হইতে অদ্যাবধি নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। অবশেষে তিনি সেই হাবসীকে ও মেহেরঙ্গেজকে হাত পা বাঁধিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিয়া পিতাকে বলিলেন—"এই হাবসীর চক্রান্তে, এই মেহেরঙ্গেজ আপনার সাত পুত্রকে বধ করিয়াছে। এখন ইহাদের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করুন।"

বাদশাহ তখন হাবসীকে বন্ধদশায় সভার প্রাংগণে ফেলিয়া, তাহার উপর দিয়া চারিজন অশ্বারোহীকে অশ্ব ছুটাইতে আদেশ করিলেন। একে একে চারি অশ্ব হাবসীর উপর দিয়া ছুটিলে তাহার অঙ্গ খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া গেল এবং সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

মেহেরঙ্গেজ ভাবিতেছিল, আমারও বোধহয় এই দশা হইবে। ভয়ে সে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সভাসদ্‌গণের মন দ্রবীভূত হইল। তাহারা করযোড়ে বাদশাহের কাছে প্রার্থনা করিল—"এ অতি পাপীয়সী বটে। অনেক নিরপরাধী মনুষ্যকে বধ করিয়াছে। তথাপি এ রাজবংশসম্ভূত—বিশেষতঃ স্ত্রীলোক। দয়া করিয়া ইহাব প্রতি লঘুদণ্ড বিধান করুন।"

বাদশাহ তখন বলিলেন—"আমার পুত্র যখন উহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, তখন ও আমার পুত্রেরই সম্পত্তি। উহার প্রতি যাহা বিধান হয়, করিতে আমার পুত্রকেই ভার দিলাম।"

বাদশাজাদা মেহেরঙ্গেজের রূপজ্যোতি দেখিয়া সভার প্রার্থনা শুনিয়া, তাহাকে প্রাণে না মারিয়া জমিলাবানুর দাসী করিয়া রাখিলেন।

কয়েক বৎসর পরে শামশাদলালপোষ স্বর্গারোহণ করিলেন। অলমাশ তখন বাদশাহ হইয়া জমিলাবানুর সহিত সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

সতীদাহ

(সত্য ঘটনা)

হিন্দুধর্ম্ম-বিহিত বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে, মৃত স্বামীর চিতায় বিধবার স্বেচ্ছাকৃত আত্মজীবন-বিসর্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার।

এই ভয়ংকর প্রথাটি যে অতি প্রাচীন, তাহা ডাইওডোরস লিখিত গ্রন্থেই জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"অ্যান্টিগোনস ও ইউমিনিস যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন একদিন ইউমিনিস, অ্যান্টিগোনসের নিকট নিজ সৈন্যের মৃতদেহগুলি সৎকার করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন। এই সময়ে একটি অদ্ভুত কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। মৃতের মধ্যে একজন ভারতীয় সৈনিক ছিল, তাহার দুই স্ত্রী,—উভয়েই স্বামীর সহিত আসিয়াছিল। কনিষ্ঠা স্ত্রীকে সে অল্পদিন পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছিল। বিধবার বাঁচিয়া থাকা ভারতীয় শাস্ত্রানুমোদিত নহে। স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে অসম্মত হইলে আমরণ তাহাকে নিন্দিত ও অপমানিত জীবন যাপন করিতে হয়। সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না,

কোনও প্রকার ধর্ম্মোৎসবে যোগদানও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে এক স্ত্রী পুড়িয়া মরিবার কথাই আছে, এ ক্ষেত্রে দুই স্ত্রী বর্ত্তমান। উভয়েই সে সম্মান দাবী করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। একজন বলিল—'আমি জ্যেষ্ঠা, আমিই এ গৌরবের ন্যায্য অধিকারিণী।' কনিষ্ঠা কহিল—'তুমি অন্তঃসত্ত্বা, শাস্ত্রানুসারে তোমার পুড়িয়া মরা নিষিদ্ধ।' অবশেষে কনিষ্ঠারই জয় হইল। জ্যেষ্ঠা তখন নিজ পরিধেয় বসন ও মস্তকের কেশ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, বিলাপ করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল—যেন তাহার কতই না দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। কনিষ্ঠা সানন্দে বিবাহোচিত বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে সগর্ব্বে দাহস্থানে উপনীত হইল। নিজ বসনভূষণ সখিগণকে বিতরণ করিয়া, সকলের নিকট শেষ বিদায় লইয়া, অবিচলিত পদক্ষেপে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্যে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী হর্ষসূচক চীৎকার ও হরিধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

যে পরিবারে কেহ "সতী" হয়, সমাজ মধ্যে সে পরিবারের যশের সীমা থাকে না। যে ব্রাহ্মণ এ ব্যাপারে পৌরোহিত্য করেন, তাঁহার নাম ও দক্ষিণা দুই-ই বাড়িয়া যায়। এমন কি দেশীয় রাজপুরুষগণ জাঁকজমকের সহিত সতীদাহস্থানে আসিয়া দর্শকরূপে দণ্ডায়মান হন।

বিধবারা শুধু সাময়িক কৃত্রিম উত্তেজনার বশেই এরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সন্দেহ নাই। তবে সব সময়ে একথা খাটে না। মেজর কার্ণাক বরোদারাজ্যে রেসিডেন্ট থাকার সময় নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

বরোদা-নিবাসী একজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, গোয়ালিয়র-রাজ দৌলৎ রাও সিন্ধিয়ার অধীনে কারকুণের কর্ম্ম করিতেন। ১৮১৫ সালে তাঁহার পত্নী (বরোদায়) এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। স্বপ্ন দর্শন করিয়া কয়েকদিন অবধি তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া রহিল।

একদিন কূপ হইতে জলের কলসী মাথায় করিয়া তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। গলার হারই সে দেশে সধবার চিহ্ন, সেটি তিনি কলসীর গলায় রাখিয়া আনিতেছিলেন। হঠাৎ একটা কাক পড়িয়া কলসীর গলা হইতে সেই হার মুখে লইয়া উড়িয়া পলাইল। এইরূপ দুর্নিমিত্ত ঘটায় ভয়ে ও চিন্তায় ব্রাহ্মণকন্যা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। কলসী সেখানেই আছাড়িয়া ফেলিয়া গৃহে আসিয়া বলিলেন, "আমি সতী হইব।"

রেসিডেন্ট সাহেব এই সংবাদ পাইবামাত্র, সেই ব্রাহ্মণগৃহে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে অনেক বুঝাইলেন, এ কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। সাহেব তখন বরোদা মহারাজের নিকট গিয়া সমুদয় বিবরণ কহিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে মহারাজও স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে এমন সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় নাই, কেন তুমি অকারণ আত্মহত্যা করিতে যাইতেছ? যদি সত্য সত্যই তোমার স্বামী মরিয়া থাকেন, তুমি যাবজ্জীবন রাজসরকার হইতে খোরপোষ পাইবে, তোমার স্বামীর উপার্জ্জনের উপর আর যাহার যাহার অশনবসন নির্ভর করিত, সকলকেই আমি প্রতিপালন করিব, তুমি এ সংকল্প পরিত্যাগ কর।" কিন্তু তথাপি তিনি অটল রহিলেন। মহারাজ তখন নিজ সিপাহীগণকে আদেশ দিয়া আসিলেন—"তোমরা এ বাড়ীর চারিদিকে অষ্টপ্রহর পাহারা দাও, সাবধান যেন কোনওক্রমে স্ত্রীলোকটি বাহিরে না যাইতে পারে।"

মহারাজ প্রস্থান করিলে, সিপাহীগণকে ব্রাহ্মণকন্যা অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন—"কেন তোমরা আমায় আটকাইয়া রাখিয়াছ, ছাড়িয়া দাও।" কিন্তু সিপাহীরা রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না। অবশেষে স্ত্রীলোকটি একখানা ছোরা আনিয়া

সিপাহীদিগকে বলিলেন—"তোমরা যদি আমায় ছাড়িয়া না দাও, এই ছোরা আমি নিজের বুকে মারিব। ব্রহ্মরক্তপাতে তোমাদের রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে।"—তখন ভয়ে সিপাহীরা পথ ছাড়িয়া দিল।

রমণী তখন প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া ধীরে ধীরে নদীতীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি আত্মীয় বন্ধুগণের আগমন্ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সকলে আসিয়া পৌঁছিল। চিতা রচিত হইল। স্বামীর একটি অন্নগঠিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, সেটি চিতায় স্থাপন করিয়া, রমণী স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। তাহার পর অবিকম্পিত পদে, চিতায় উঠিয়া অন্নমূর্ত্তি-স্বামীর পদতলে উপবেশন করিলেন। তাহার পর, চিতা জ্বলিয়া উঠিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে, স্ত্রীলোকটির স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ আসিল, লোকে হিসাব করিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণের মৃত্যুর সময়টি, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর স্বপ্নদর্শন-সময়ের সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

কালিদাসের বিবাহ

(পশ্চিমাঞ্চলের কিংবদন্তী)

[বাঙ্গালা দেশে কালিদাসের বিবাহ সম্বন্ধে যে গল্পটি প্রচলিত আছে তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—গৌড়াধিপতি মাণিকেশ্বরের রত্নাবতী নাম্নী অত্যন্ত রূপবতী ও বিদুষী এক কন্যা ছিলেন। বিচারে যিনি তাঁহাকে পরাস্ত করিবেন, তাঁহাকেই স্বামীত্বে বরণ করিবেন, রত্নাবতী এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতেরা বিচারে হারিয়া গিয়া ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এক মহামূর্খকে আনিয়া রাজকন্যার সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। তদনুসারে তাঁহারা অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, দেশভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে দেখিলেন, এক ব্যক্তি গাছের ডালে বসিয়া সেই ডাল কাটিতেছে। সুতরাং তাহাকেই তাঁহারা আদর্শ মূর্খ স্থির করিয়া গৌড়ে লইয়া আসিলেন, এবং কৌশলে রাজকন্যাকে বিচারে পরাস্ত করাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দেওয়াইলেন। এই বরই ভবিষ্যতের কবি-বর কালিদাস। ফুলশয্যার রাত্রেই রাজকন্যা বুঝিতে পারিলেন তাঁহার বরটি কত বড় মূর্খ—ক্রোধে তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। অপমানিত কালিদাস তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, অরণ্যমধ্যে মায়াবেশধারিণী দেবী সরস্বতীর দর্শন পাইলেন এবং তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া, অসামান্য কবিত্বশক্তির অধিকারী হইলেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কিংবাদন্তী ভিন্ন রূপ; নিম্নে আমরা গল্পাকারে তাহা প্রকাশ করিলাম]

পুরাকালে বঙ্গদেশে সত্যবান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একটি কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার নাম চম্পক-কলিকা। মেয়েটি বড়ই সুন্দরী—তাহার রঙটি যেন চাঁপাফুলের কুঁড়ির মত, সেইজন্যই তাহার ঐরূপ নামকরণ হয়। মা-বাপে, কখনও তাহাকে 'চম্পা', কখনও বা শুধু 'চাঁপা' বলিয়া ডাকিতেন।

চাঁপা জন্মিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, রাজার প্রধানমন্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল—তাহার নাম চূড়ামণি। প্রধানমন্ত্রীর দাসী, চূড়ামণিকে কোলে করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া যাইত; রাণীমা ছেলেটিকে কোলে করিতেন, সন্দেশ খাইতে দিতেন।

ক্রমে চম্পা বড় হইল। তখন চূড়ামণি রাজবাড়ী গিয়া চম্পাকে কোলে করিত; তাহার

সহিত খেলা করিত। চাঁপা আধ আধ কথায় তাকে "চূলো দাদা" বলিয়া ডাকিত।

ক্রমে চাঁপা আরও বড় হইল। রাজা তাহাকে পাঠশালায় পড়িতে পাঠাইলেন। চাঁপার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি দেখিয়া গুরু মহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। অন্য পড়ুয়ারা বলিতে লাগিল—"তা হবে না? হাজার হোক রাজার মেয়ে ত!"

চূড়ামণিও সেই পাঠশালায় পড়িত: কিন্তু লেখাপড়ায় তাহার তাদৃশ মন ছিল না। চাঁপা যখন পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়, চূড়ামণি সে সময় অনেক উপরে পড়িত; কিন্তু দুই তিন বৎসর মধ্যেই চাঁপা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে ছাড়াইয়া গেল। ইহাতে চূড়ামণি মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল বটে, কিন্তু চাঁপার সহিত ছেলেবেলা হইতে তাহার যেমন ভাবটি ছিল, তাহার খর্ব্বতা হইল না। চাঁপা কিন্তু মনে মনে বলিত—"ঐ চূড়োদাদা ভারি গাধা!"

চূড়ামণি ছেলেটি দেখিতে কিছু মন্দ ছিল না—তবে রঙটি তাহার শ্যামবর্ণ। রাজকন্যা আড়ালে বলিত—"মাগো—কি কালো!" তাহার আর একটু দোষ ছিল—সে একটু তোৎলা। তবে সাধারণতঃ তাহার তোৎলামি বড় জানা যাইত না—রাগিলেই তাহা বৃদ্ধি পাইত। চম্পা মাঝে মাঝে "চূড়োদাদা"র অসাক্ষাতে তাহার তোৎলামিকে ভেঙাইয়া আনন্দ পাইত।

॥ দুই ॥

রাজকন্যার বয়স তখন নয় কি দশ, চূড়ামণির বয়স চৌদ্দ বৎসর। একদিন পাঠশালার পর রাজোদ্যানে চাঁপা ও চূড়ামণি খেলা করিতেছিল—রাজকন্যার দাসী সে সময়টা কোথা গিয়াছিল; চূড়ামণি রাজকন্যাকে বলিল, "চাঁপা, তুই আমায় বিয়ে করবি?"

কথাটা শুনিবামাত্র চন্ করিয়া রাজকন্যার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি বললে চূড়ামণি?"—বিরক্ত হইলে, সে আর 'চূড়োদাদা' বলিত না।

চূড়ামণির বুদ্ধিটা কিছু মোটা;—চাঁপা যে তাহাকে 'চূড়ামণি' বলিল, তাহা সে অত খেয়াল করিল না। ভাবিল, রাজকুমারী বোধ হয় শুনিতে পান নাই। তাই সে প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিয়া বলিল, "চাঁপা বলি শোন্—যদি আমাকেই বিয়ে করতে তোর ইচ্ছা হয়, তবে এক কাজ করিস।"

চাঁপা তাহার রাগের কোনও লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ না করিয়া বলিল "কি কাজ?"

"তুই যখন বড় হবি, তোর বাবা এখানে সেখানে তোর বিয়ের সম্বন্ধ করবেন, সেই সময় তুই তোর বাবাকে বলিস—আর যদি বাবাকে বলতে লজ্জাই করে—তোর মাকেই বলিস না হয়, যে মা, আমার অন্য কোথাও সম্বন্ধ কোর না; আমি ঐ চূড়োদাদাকেই বিয়ে করব। তা' হলেই, বুঝেছিস, আমার সঙ্গেই তাঁরা তোর বিয়ে দিয়ে দেবেন। সে বেশ মজা হবে—না ভাই? কি বলিস, তোর মন আছে?"

চাঁপা আর রাগ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "চূড়ামণি, তোমার আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়!"

চূড়ামণি একথা শুনিয়া, একটু বিস্মিত হইল। রাজকন্যার পানে চাহিয়া বলিল, "কেন? আস্পর্দ্ধাটা কি হল্?"

চাঁপা বলিল, "তোমার বাবা আমার বাবার চাকর, তুমি চাও আমায় বিয়ে করতে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! আমি হলাম রাজার মেয়ে, আমার বিয়ে হবে মস্ত বিদ্বান রূপবান কোন রাজপুত্রের সঙ্গে! তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে? বলতে লজ্জা করে না?"

এই কথা শুনিয়া চূড়ামণিরও রাগ হইয়া পড়িল। বলিল, "ওঃ—রাজপুত্তুর বি-বিয়ে করবে তুমি? বটে! বলি, কোন্ রাজপুত্তুরকে বিয়ে করবে বল দেখি? কা-কা-কার কপাল ফিরল?"

চাঁপা বলিল, "সে, যার সঙ্গে যার ভবিতব্যতা আছে, তার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। কিন্তু তোমার মুখে এ ব্যঙ্গ শোভা পায় না চূড়ামণি! যারা চাকর-বাকর, তারা চাকর-বাকরের মত থাকলেই ভাল হয়।"—বলিতে বলিতে চম্পার মুখখানি রাঙা টক্‌টক্‌ করিয়া উঠিল।

চূড়ামণি বলিল, "আ-আমার মত সুপাত্র তোমার অদৃষ্টে নেই: কাজেই দু-দুষ্টু সরস্বতী তোমার স্কন্ধে ভর করে' তোমার মু-মুখ দিয়ে ঐ সকল কথাগুলো বলালেন। নি-নি-নি-নিজের পায়ে নিজে কেউ কুড়ুল মারলে, অন্য লোকে আর কি-কি-কি করবে বল! আমি বুঝি হলাম চাকর-বাকর!' বলি রা-রাজকন্যে, তো-তোমার বাবার এই রা-রাজ্যটা চালাচ্চে কে? সে খবর রাখ কি? তোমার বাবার ত ভারি মুস্মু-মুরুদ কিনা?—আমার বাবা না থাকলে, এ রাজ্য যে এতদিন কবে লো-লো-লোপাট হয়ে যেত! তোমার বিয়ের স-স-সময় হলে, তোমার বাবা ত আমার বাবাকেই পা-পা-পা-পাত্র খুঁজে আনতে বলবেন!—তুমি দেখো তখন কেমন এক পা-পাত্র নিয়ে আসি তোমার জন্যে! এর শোধ সেই সময় যদি না তুলি, তবে আমার নাম চু-চু-চূড়ামণিই নয়!"

রাজকন্যা ব্যঙ্গভরে হাসিয়া বলিল, "কি শোধটা তুলবে, চূড়ামণি?"

চূড়ামণি ইহাতে আরও চটিয়া বলিল, "কি শোধটা তু-তুলব, শুনবে তুমি?—আজ থেকে আমার এই পি-পি-পি-পিতিজ্ঞে রইল, একজন আকাট গ-গণ্ডমুখ্যু গরীবকে এনে তোমার সঙ্গে বি-বিয়ে দেওয়াব তবে ছাড়ব। তা-তা যদি আমি না পারি, তু-তু-তুমি ছুরি দিয়ে আমার এই কা-কা-কাণ দুটি কে-কে-কে-কে-কে-কেটে নিয়ে তোমার শোবার ঘরের দে-দে-দেওয়ালে পে-পে-পেরেক পুঁতে টা-টা-টাঙ্গিয়ে রেখ।"

চাঁপা ওষ্ঠ ও নাসিকা স্ফীত করিয়া বলিল, "যে লম্বা লম্বা কাণ, দেওয়ালে টাঙ্গালে মেঝেয় লুটোবে যে!"

"আ-আ-আমার কা-কা"—করিয়া চূড়ামণি কি বলিতে যাইতেছিল। তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া, বেণী দুলাইয়া ক্ষিপ্রপদে চাঁপা তথা হইতে চলিয়া গেল।

॥ তিন ॥

বর্ষের পর বর্ষ কাটিতে লাগিল। রাজকন্যা অন্তঃপুরচারিণী হইলেন, চূড়ামণির সহিত আর তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় না। অন্তঃপুরেই তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বালিকা ক্রমে নব যুবতী হইয়া উঠিলেন।

চূড়ামণি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে; সে এখন তাস পাশা খেলিয়া, গুড়ুক ফুঁকিয়া, আড্ডা দিয়া বেড়ায়। রাজকন্যা সে বাল্যকলহ বহুকাল বিস্মৃত হইয়াছেন—কিন্তু চূড়ামণি তাহা মনে পুষিয়া রাখিয়াছে।

রাজা সত্যবান একদিন তাঁহার প্রধানমন্ত্রীকে ডাকিয়া, কন্যার জন্য একটি যোগ্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

মন্ত্রী গৃহে আসিয়া পুত্রের নিকট রাজাদেশের কথা জানাইয়া বলিলেন, "পুর্ব্বকালে নিয়ম ছিল, রাজার ছেলেমেয়ের বিবাহের জন্যে দেশে দেশে ভাট পাঠান হত। ইনি ভাট না পাঠিয়ে আমাকেই যেতে হুকুম করলেন! আমার একে এই বুড়ো শরীর, তায় অম্বলের ব্যারাম, সাত দেশে ঘুরে বেড়াবার এই কি আমার বয়স? রাজার যেমন কাণ্ড!" —বলিয়া বৃদ্ধ মুখখানি অত্যন্ত কাতর করিয়া রহিলেন।

চূড়ামণি বলিল, "ঠিক কথাই ত বাবা! আপনি বুড়ো হয়েছেন, এখন কি আর দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানো আপনার পোষায়? আপনি বাড়ীতে থাকুন, আমিই বরং যাই, ভাল দেখে একটি পাত্র খুঁজে আনি।"

মন্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা, তবে রাজাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি।"

রাজা সত্যবান এ প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছ। তুমি গেলে এ রাজ্য চালায় কে? তা বেশ ত, চূড়ামণিই যাক। চম্পার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই ওর ভাব—দুটিতে ভাইবোনের মত খেলা করেছে। ও নিশ্চয় খুব ভাল পাত্রই আনবে।"

চূড়ামণি রাজাজ্ঞা পাইয়া, চম্পার জন্য বর খুঁজিতে বাহির হইল। দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া, একজন আদর্শ মূর্খের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনেক দিন কাটিল, কিন্তু মনের মতনটি কাহাকেও পাইল না।

অবশেষে একদিন এক বনের মধ্যে দিয়া যাইতে যাইতে, চূড়ামণি দেখিল, গলে যজ্ঞোপবীত, সুন্দর সুগঠিত দেহ এক যুবক বৃক্ষের শাখায় বসিয়া সেই শাখারই মূলদেশ কর্ত্তন করিতেছে। দেখিয়া চূড়ামণি উল্লসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, "হাঁ—এই উপযুক্ত পাত্র বটে। রাজকন্যের জন্যে বর খুঁজতে বেরিয়ে অনেক মূর্খই দেখলাম, কিন্তু এটির মত কেউ নয়।" যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে, এস এস নেমে এস;—একটা কথা বলি শোন।"

যুবক নামিয়া আসিয়া চূড়ামণির পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

চূড়ামণি জিজ্ঞাসা করিল, "গাছের ডালটি কাটছিলে কেন?"

"আমার কাঠের দরকার।"

"কাঠ কি হবে?"

"কাঠ আবার কি হয়? উননে দিয়ে রান্না করতে হয়!"

চূড়ামণি বলিল, "হেঁ হে—তাও ত বটে! তোমার নাম কি হে ছোকরা?"

যুবক বলিল, "কালিদাস।"

"কালিদাস? বেশ বেশ। কি জাত? গলায় ত পৈতে দেখছি, ব্রাহ্মণ বুঝি?"

"এজ্ঞে।"

"কি কর? পড়াশুনো কিছু কর?"

"এজ্ঞে পাঠশালায় একবার ভর্ত্তি হয়েছিলাম। গুরুমশাই বড্ড মারে তাই ছেড়ে দিয়েছি।"

চূড়ামণি বলিল, "বেশ বেশ। তোমাদের বাড়ী কোথায়? বাপের নাম কি?"

উত্তরে যুবক নিজ পরিচয় দিল। নিকটেই গ্রামে বাড়ী, বাল্যকালেই পিতৃমাতৃবিয়োগ হইয়াছে, লেখাপড়া সে কিছুই শেখে নাই—শিখাইবেই বা কে? গ্রামের লোকের গরু চরাইয়া দিনপাত করে। বিবাহ হয় নাই।

চূড়ামণি মনে মনে বলিল, "ছেলেটির যে রকম ভাল চেহারা, একে যদি আমি রাজপুত্র বলে' চালিয়ে দিই ত হঠাৎ কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।"

যুবক বলিল, "এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে গাছ থেকে আমায় নামালে? না, আর কোনও কথা আছে?"

চূড়ামণি বলিল, "আছে। বিয়ে করবে?"

"কাকে?"

"আমাদের রাজার মেয়েকে?"

"রাজার মেয়ে? তা মন্দ হবে না। আমরা কিন্তু কুলীন; কি পাব?"

"ধন দৌলৎ ঢের পাবে। যত চাও।"

যুবক একটু ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, "সে যেন হল। কিন্তু মেয়েটি কেমন?"

"পরমা সুন্দরী। রাজার মেয়ে, বুঝছ না! গায়ের রঙটি যেন চাঁপা ফুলের মত। মুখখানি যেন পূর্ণিমের চাঁদ। যেমন চোখ, তেমনি নাক তেমনি ঠোঁট—একবারে পরী হে পরী! করবে বিয়ে?"

যুবক সোল্লাসে বলিল, "করব। কোথা সে মেয়ে?"

"আমার সঙ্গে এস তবে।"—বলিয়া চূড়ামণি কালিদাসকে সঙ্গে করিয়া বংগদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাজধানীর পদতলবাহিনী নদীতীরে পেঁাছিয়া চূড়ামণি কালিদাসকে সেই নদীতে স্নান করাইয়া, উত্তমোত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া, নিকটস্থ এক মন্দিরে তাহাকে লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি এখানে চুপটি করে বসে থাক। আমি সহরে গিয়ে তোমার জন্যে হাতীঘোড়া লোকলস্কর সব পাঠিয়ে দিচ্চি—তুমি যেও। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করে দিই, কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বেশী কোয়ো না—খুব গম্ভীর মেজাজে বসে থাকবে। বুঝেছ?"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া কালিদাস সেখানে বসিয়া রহিলেন। চূড়ামণি নগরে গিযা রাজাকে সংবাদ দিল, "মগধ দেশের যুবরাজকে পাত্র স্থির করে, তাঁকে নিয়ে এসেছি। অমুক মন্দিরে তিনি অপেক্ষা করছেন—তাঁকে আনবার জন্যে হাতীঘোড়া লোকলস্কর পাঠিয়ে দিন।"

এ সংবাদে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। বর আসিলে সকলেই দেখিল—অতি সুন্দর যুবাপুরুষ—রাজকন্যার উপযুক্ত পাত্র বটে।

চারি দিবস ব্যাপিয়া "লগন্" উৎসব চলিল। চম্পক-কলিকা ইতিমধ্যে বর দেখিবার জন্য গোপনে এক দাসী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বর অত্যন্ত সুপুরুষ শুনিয়া তিনিও খুসী হইলেন।

পঞ্চম দিনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

রজনীতে কালিদাস শয়নমন্দিরে নীত হইলেন। সুবর্ণময় পালঙ্কে পুষ্পসুকোমল শয্যায় শয়ন করিবামাত্র, তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকন্যা সোণার থালায় করিয়া "পঞ্চারতি" লইয়া প্রবেশ করিলেন।

বরকে নিদ্রিত দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। জাগাইবার অভিপ্রায়ে, মল ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া এদিক ওদিক একটু বেড়াইলেন; কিন্তু বরের ঘুম ভাঙ্গিল না। রাজকন্যা তখন বরের নাসিকার নিকট সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ ধরিলেন—তাহাতেও বর জাগিল না। তাহার পর, গোলাপ-পাশ লইয়া সুশীতল গোলাপজল বরের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন—তাহাতেও কোন ফল হইল না। বর না জাগিলে "পঞ্চারতি"* করিবেন কেমন করিযা? তাই লজ্জার মাথা খাইয়া, বরের গায়ে হাত দিয়া তিনি ডাকিতে লাগিলেন—"ওগো--শুনছ?"

কেই বা শোনে!—কালিদাস গভীর নিঃশ্বাস লইতে লইতে আরামে নিদ্রা যাইতেছেন।

রাজকুমারী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"এই কি মগধের রাজপুত্র!— এ ত বাপের জন্মে ভাল বিছানায় শোয়নি বলে বোধ হচ্চে।"—মনে মনে তাঁহার রাগ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি পালংক হইতে নামিয়া, বরের হাত ধরিয়া সবলে এক 'হেঁচকা টান' মারিলেন।

কালিদাস উঠিয়া বসিলেন। রাজকুমারীর ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। বলিলেন, "অ্যাঁ! অ্যাঁ! এটা আপনার বিছানা বুঝি? আমি ভুলে এখানে এসে শুয়েছি বুঝি? আমায় মাফ করুন, আমি ত জানতাম না; রাজভৃত্যেরা বললে তাই এখানে শুলাম। আমি এখনি চলে যাচ্চি।"

ক্রোধে রাজকন্যার বাক্যস্ফুরণ হইল না। হস্তদ্বারা ইঙ্গিতে তিনি কালিদাসকে যাইতে

* পশ্চিমাঞ্চলে ফুলশয্যার রাত্রে কন্যা, একটি থালায় করিয়া মালা চন্দন তাম্বুল প্রভৃতি লইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া, স্বামীকে "আরতি" করিয়া থাকেন।

নিষেধ করিলেন। ক্রোধ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে বলিলেন, "ভুল করনি—এ তোমারই শয্যা বটে। আমায় 'আপনি আপনি' বোলো না—আমি তোমার স্ত্রী। চোখের ঘুম ছাড়লো?—একটু বেড়াবে এস না।"

সে সমস্ত মহলটাই রাজকন্যার—সে রাত্রে সেখানে আর জনপ্রাণী নাই। রাজকন্যা প্রথমে স্বামীকে স্বীয় পাঠমন্দিরে লইয়া গেলেন। তথায় কাব্য অলঙ্কার পুরাণ ইতিহাস নানা গ্রন্থ রক্ষিত আছে—তাহার মলাটগুলি সোণা রূপার পাতে মোড়া, হীরা মোতি চুনী পান্না খচিত। কালিদাস একখানি পুঁথি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "এটা কি গো? বেশ চক্‌চক্‌ করছে ত!"

রাজকন্যা বলিলেন, "ও একখানি কাব্য।"

কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাব্য কি? এতে কি হয়?"

রাজকন্যা বলিলেন, "পড়তে হয়।"

কালিদাস বলিলেন, "পড়তে হয়? ওঃ—বুঝেছি—ক-খ'র বই। আমি ছেলেবেলায় ক-খ শিখেছিলাম, এখন ভুলে গেছি।"

রাজকন্যা কোনও উত্তর না দিয়া, বিরক্তিভরে কক্ষান্তরে চলিলেন। কালিদাসও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি যাহা দেখেন, তাহারই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন—"এটা কি গো? এতে কি হয়?" রাজকন্যা মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এই মগধের রাজপুত্র! যাহা দেখিতেছে, সবই ইহার পক্ষে নূতন? জীবনে এ কি কিছুই দেখে নাই?"

পরে রাজকন্যা চিত্রশালায় প্রবেশ করিলেন। বড় বড় চিত্রকরগণ কর্তৃক অঙ্কিত রামায়ণ মহাভারতাদির নানা চিত্র তথায় শোভা পাইতেছে। কালিদাস যে ছবিই দেখেন, তাহারই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন—"এটা কি গো?"—রামায়ণ মহাভারতের কোন চিত্রই কালিদাস চিনিতে পারিলেন না।

অবশেষে নবদম্পতী একখানি বৃন্দাবন-চিত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় বসিয়া রাধিকার মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন—কিয়দ্দূরে বড় বড় গরু চরিতেছে। এই প্রথম কালিদাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—"আহা!—কিবে গাইগুনি! কিবে বাঁট!—আঃ, ইচ্ছে করছে একটা বোগ্‌নো নিয়ে চ্যাঁক্‌চোঁক্‌ করে দুধ দুই।"

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুধ দুইতে জান নাকি?"

কালিদাস বলিলেন, "তা আর জানিনে!—গরু চরিয়ে আর দুধ দুয়েই ত এত বড়টা হলাম!"

রাজকুমারী বিস্মিতভাবে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। কৌশলে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাসের জন্মেতিহাস, চূড়ামণির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন—সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, ললাটে করাঘাত করিয়া নিকটস্থ পর্য্যাঙ্কপ্রান্তে তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তখন সহসা সেই বাল্যকালের কথা—চূড়ামণির সহিত কলহ—তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বুঝিলেন, চূড়ামণিই তাঁহার এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে।

ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে রাজকন্যা আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল—এই মূর্খ বর্ব্বরের সঙ্গে চিরজীবন কি করিয়া আমি কাটাইব!

অদূরে ভিত্তিগাত্রে একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল, সেই দিকে হঠাৎ রাজকন্যার দৃষ্টি পড়িল। চক্ষের পলকে তিনি উঠিয়া সেই তরবারি গ্রহণ করিয়া, কালিদাসের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন।

কালিদাস দুই লম্ফে পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "এ কি! আমায় কাট কেন?"

রাজকন্যা প্রবলভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে।"

কালিদাস বলিলেন, "বাঃ—মজার লোক তুমি! আমি মরলে তুমি বিধবা হবে না?"

"বিধবা হব সেও ভাল। সারাজীবন তোমায় নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে, বিধবা হয়ে থাকাও ভাল।"

কালিদাস বলিলেন, "কেন, আমায় নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরবে কেন? আমার অপরাধ?"

রাজকন্যা বলিলেন, "তুমি যে মূর্খ!"

কালিদাস বলিলেন, "ওঃ—আমি মূর্খ, তাই তোমার যোগ্য নই? বুঝেছি। আচ্ছা, তুমি আমায় প্রাণে মেরো না। আমায় যদি তুমি সহ্য করতে না পার, আমি চলে যাচ্ছি।"

রাজকুমারী ঝনৎকারের সহিত তরবারি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। উন্মুক্ত দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "যাও—দূর হয়ে যাও।" তাঁহার গ্রীবা উন্নত, বক্ষ ঘন ঘন স্ফীত হইতেছে, দুই চক্ষু দিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা উছলিয়া পড়িতেছে।

কালিদাস তৎক্ষণাৎ রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

রাজপথগুলি অতিক্রম করিয়া, রাজধানীর বাহির হইয়া, যে দিকে দুই চক্ষু যায়, কালিদাস সেই দিকে চলিতে লাগিলেন।

রাজধানী হইতে কিছু দূরে এক অরণ্য ছিল। কালিদাস ভাবিলেন—"লোকালয়ে মুখ দেখাইবার আমার আর প্রয়োজন নাই। বনের মধ্যেই প্রবেশ করি, বাঘে ভালুকে আমায় খাইয়া ফেলুক সেই ভাল। স্ত্রী যাহাকে মূর্খ বলিয়া কাটিতে যায়, তাহার জীবনে ধিক্! বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই তাহার শতগুণে ভাল।"—অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কালিদাস ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঘ ভালুকের সাক্ষাৎ পাইলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। জঙ্গলের ফল খাইয়া, গাছতলায় শুইয়া, কয়েকদিন কাটাইলেন।

এইরূপে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কালিদাস একদিন কালীচন্দ্র নামক এক যোগি-পুরুষের সাক্ষাৎ পাইলেন। কালিদাসের সেবায় ও স্তবস্তুতিতে যোগী প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস নিজ ইতিহাস—বিবাহ, স্ত্রী কর্তৃক অপমানিত হওয়া প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাকে জানাইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি মহামূর্খ। আমার মূর্খত্ব কিসের ঘুচে, আমায় তাহা বলিয়া দিন।"

যোগিপুরুষ ধ্যানস্থ হইয়া, ভবিষ্যতের সমস্ত কথাই অবগত হইলেন। ধ্যানভঙ্গে তিনি বলিলেন, "বৎস, তুমি বনে আসিয়াছিলে বাঘে তোমায় খাইয়া ফেলুক এই মনে করিয়া। বাঘের সাধ্য কি! পৃথিবীতে তুমি অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে। এই নশ্বর জীবনান্তে যশঃশরীরে তুমি অমর হইয়া থাকিবে। বনের বাঘের কথা কি বলিতেছ, কালরূপী মহাব্যাঘ্রও তোমায় খাইতে পারিবে না! ঐ সরোবরে তুমি স্নান করিয়া এস, আমি তোমায় রবি-মন্ত্র দিতেছি। তুমি আমার নিকটে থাকিয়া সেই মন্ত্র একাগ্রচিত্তে জপ কর—তোমার উপর দৈবকৃপা বর্ষিত হইবে।"

কালিদাস স্নান করিয়া আসিয়া, রবি-মন্ত্র গ্রহণান্তর জপ করিতে বসিলেন।

ক্রমে রাজধানীতে সংবাদ পৌঁছিল বনমধ্যে কালীচন্দ্র নামে এক মহাযোগীর আবির্ভাব হইয়াছে। দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে ও প্রণাম করিতে আসিতে লাগিল।

কালিদাসের মন্ত্র জপের শেষ দিন, রাজকন্যা চম্পক-কলিকাও সখিগণ সহ যোগিদর্শনে আসিলেন। যোগী তখন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, কালিদাস বসিয়া মন্ত্রজপ করিতেছিলেন। জপের নির্দ্দিষ্ট কাল তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই, কিন্তু অধিক বিলম্ব ছিল না।

রাজকন্যা সখিগণ সহ আশ্রমের অদূরে দাঁড়াইয়া, জপনিরত যুবকটিকে দেখিতে-ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে তখন কবিত্বপ্রভা স্ফুরিত হইতেছে—রাজকন্যা তাঁহাকে

স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না।

সেদিন বড় গরম। কোথাও গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। গ্রীষ্মবোধ করিয়া রাজকন্যা সখিগণ সহ অল্পে অল্পে সরোবরের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। দেখিলেন, জলে অনেকগুলি পদ্মফুল—কোনটি কলিকা—এখনও ফুটে নাই, কোনটি ফুটিয়া আছে, কোনটি গতকল্যকার বাসি ফুল—মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। রাজকন্যা দেখিলেন সেইরূপ একটি মুদ্রিতদল পদ্ম ধীরে ধীরে দুলিতেছে। ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি সখিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

অনিলস্য গমো নাস্তি দ্বিপদো নৈব দৃশ্যতে।
জলমধ্যে স্থিতং পদ্মং কম্পিতং কেন হেতুনা॥

— বাতাস নাই, কোন পাখীও দেখিতেছি না (যে বলিব, হয়ত পদ্মের উপর বসিয়াছিল, এইমাত্র উড়িয়া গিয়াছে, তাই দুলিতেছে) তবে জলমধ্যে স্থিত পদ্মটি কাঁপিতেছে কেন?"

সখিগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল—কেহই রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

কালিদাসের জপকাল কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল। রাজকন্যার শ্লোকটি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াই রাজকন্যাকে চিনিতে পারিলেন।

সখীরা কেহ কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া কালিদাস বলিলেন,—

পাবকোচ্ছিষ্টবর্ণস্য শর্ব্বর্য্যাং বন্ধনং কৃতং।
মোক্ষং ন লভতে কান্তে কম্পিতং তেন হেতুনা॥

—"হে কান্তে, অগ্নির উচ্ছিষ্ট (অর্থাৎ কালো) বর্ণ যার, তাকে (অর্থাৎ ভ্রমরকে—পদ্ম) রাত্রিকালে (মুদ্রিত হইয়া) বন্ধন করিয়াছে, (ভ্রমর বাহির হইবার জন্য ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে) বাহির হইতে পারিতেছে না, তাই (পদ্ম) কাঁপিতেছে।"

এই উত্তর শুনিয়া, প্রথমেই রাজকন্যার বিস্ময়বোধ হইল যে, এ ব্যক্তি আমাকে "কান্তা" সম্বোধন করিতেছে কেন? এবং শ্লোকরচয়িতার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি দেখিয়াও তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ আড়চোখে লোকটির পানে চাহিয়া, শেষে চিনিতে পারিলেন—ইনিই আমার সেই একরাত্রির স্বামী।

তখন রাজকন্যা স্বামীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, বিনয়নম্রমস্তকে, মিনতির স্বরে বলিলেন, "আমি তোমার মূল্য না বুঝিয়া, তোমায় চিনিতে না পারিয়া, তোমার সহিত অতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমার অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কর।"

কালিদাস বলিলেন, "রাজকুমারী, তুমি কোনও অপরাধ কর নাই—তোমায় মার্জ্জনা করিবার কিছুই নাই। তুমি আমার মহা উপকার করিয়াছ। তুমি যদি সেদিন আমার সহিত ওরূপ কঠোর ব্যবহার না করিয়া, আমায় আদর যত্ন করিতে, তবে আমি যেমন মূর্খ ছিলাম, চিরজীবন সেইরূপই থাকিয়া যাইতাম। তোমার নিকট ওরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া মনের দুঃখে আমি এই বনে আসি, এবং মহাযোগীর সাক্ষাৎ পাই। তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া আমি কবিত্ব-বরলাভ করিয়াছি—কিন্তু তুমিই এ সকলের মূলীভূত কারণ। সুতরাং যাবজ্জীবন তোমার নাম কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক আমি স্মরণ করিব।"

রাজকন্যা স্বামীকে ফিরাইয়া নিজ পিতৃ-গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কালিদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমা হইতেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে; সুতরাং তুমি আমার গুরুস্থানীয়া। কল্যাণি, তুমি গৃহে যাও,—তোমার সহিত আমার পতি-পত্নী ভাব এখন আর সম্ভব নহে।"

অবশেষে দুঃখিত চিত্তে রাজকন্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে কালিদাস গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, নানা

দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে ধারা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কবিত্ব-খ্যাতি ইতিপূর্ব্বেই দেশবিদেশে রটিয়া গিয়াছিল। ধারাধিপতি ভোজরাজ, মহাসমাদরে তাঁহাকে নিজ সভায় সভাকবি করিয়া রাখিলেন।

ভোজরাজের গল্প

(ভোজপ্রবন্ধ হইতে)

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

খৃঃ একাদশ শতাব্দীর কোনও একদিন (বার তারিখ এখনও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নির্ণয় করিতে পারেন নাই) মালব দেশাধিপতি ভোজরাজ, একটা খুব খারাপ কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন—বনের মধ্যে একটি পুকুরের ধারে নামিয়া, নিতান্ত চাষাভুষার মত, অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া জল পান করিয়াছিলেন। অবশ্য মৃগয়া করিতে করিতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াই তিনি এ কাজ করিয়াছিলেন; কিন্তু মৃগয়া যাত্রার পূর্ব্বে একটা থার্ম্মস-ফ্ল্যাস্কে ভরিয়া চূর্ণ বরফ—অভাব পক্ষে শীতল জল, স্ট্র্যাপে বাঁধিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া গেলেই হইত। কিন্তু সেকালের রাজারা—ঐ এক রকমের মানুষ ছিলেন!

মৃগয়া করিয়া রাজা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু মাথার ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। মাথার ভিতর কি যেন খুস খুস করে! ঘুম হয় না, খাদ্যে রুচি চলিয়া গেল। হইল কি?

দুই চারিদিন এইভাবে কাটিলে, মাথার ভিতর রীতিমত যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। রাজ-বৈদ্য মহাশয় আসিলেন, নাড়ী টিপিলেন, মাথাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, এবং রোগ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া, তাহা ঢাকিয়া লইবার জন্য অনেক শ্লোক ঝাড়িলেন; খাইবার ঔষধ, মাথায় মালিসের তৈল—খুব দামী দামী সব ঔষধ আনিয়া রাজার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না: উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। "মাথা গেল মাথা গেল" শব্দ—আর বিছানায় পড়িয়া ছটফটানি! রাজা দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। রাজ্যের যেখানে যে চিকিৎসক ছিল, সবাই আসিল, সকলে মিলিয়া বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া 'কন্‌সল্টেশন' করিল; দিনে দুইবার করিয়া প্রেস্ক্রিপশন বদল হইতে লাগিল;—কিন্তু রোগ যেমন তেমনি—রোজ রোজ বাড়িয়াই যাইতেছে।

অবশেষে সকলেই রাজার প্রাণের আশা পরিত্যাগই করিল। রাণীরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল, আমলারা বিষণ্ণ বদন, প্রজারা হায় হায় করিতে লাগিল—"আহা এমন রাজা আর হবে না!"

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের সমস্ত এবং মর্ত্ত্যের অনেকগুলি খবরের কাগজের গ্রাহক ছিলেন। সব কাগজ যে তিনি পড়িবার সময় পাইতেন তাহা নহে। তথাপি মূল্য দিয়া লইতেন, কারণ সৎসাহিত্যকে উৎসাহ দান করা তিনি নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

একদিন রবিবারে, কাছারি না থাকায়, অলস মধ্যাহ্ন যাপনের জন্য তিনি খবরের কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। "মালোয়া টাইম্‌স্" খুলিয়া দেখিলেন, কি সর্ব্বনাশ! ভোজরাজ যে মরো মরো! আহা, বড় ভাল রাজা! যেমন পণ্ডিত তেমনি পুণ্যবান! কাগজে লিখিয়াছে চিকিৎসায় কিছুমাত্র ফল পাওয়া যাইতেছে না। দেবরাজ আপন মনে

বলিলেন, "নাঃ, এ কাজের কথা নয়।" কাগজ ফেলিয়া, চশমা খুলিয়া রাখিয়া হাঁকিলেন, "কোই হায় !"

"হুজুর"—বলিয়া একজন দেব-বেয়ারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল।

দেবরাজ সংক্ষেপে বলিলেন, "ডক্টর সা'বলোগ্।"

পাঁচমিনিটের মধ্যে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেবরাজ কাগজখানা তাঁহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

পড়িয়া তাঁহারা বলিলেন, "এ কি কাণ্ড! রোগী মরে অথচ এখনও পর্য্যন্ত রোগ নির্ণয় হল না। হুঃ—যত সব—"

ইন্দ্র বলিলেন—"বড়কুমার, এখনি তুমি যাও—অদৃশ্যভাবে যাবে। রাজাকে দেখে এসে আমাকে বল তাঁর কি হয়েছে।"

বড়কুমার হুস্ করিয়া মর্ত্তে নামিয়া গেলেন,—একেবারে ভোজরাজের শয়নকক্ষে। রাজার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তাঁহার (রন্টগেন রে অপেক্ষাও তীক্ষ্ন) দিব্যদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিলেন, মস্তিষ্কের মধ্যে একটি পাঠীন (বোয়াল) মৎস্যের "পোনা" শুইয়া আছে, এবং মাঝে মাঝে নড়িতেছে চড়িতেছে। দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্বর্গে ফিরিয়া, দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

ইন্দ্র। কিহে বড়কুমার, কি দেখে এলে ?

বড়কুমার। মহারাজ! কেস সঙীন। ভোজরাজের মস্তিষ্কমধ্যে বোয়াল মাছের একটি জ্যান্ত ছানা।

ইন্দ্র। অ্যাঁ ?—বল কি হে ?, বোয়াল মাছের ছানা ? রাজার মাথায় কি কোরে ঢুকলো ?

বড়কুমার। তাও আমি যোগবলে জানতে পেরেছি। রাজা একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে, বনের মধ্যে এক পুকুরে নেমে আঁজলা আঁজলা ভরে' জলপান করেছিলেন, সেই সময় তাঁর নাকের ফুটো দিয়ে সদ্য ডিমফোটা বোয়াল মাছের এক সূক্ষ্ম ছানা প্রবেশ করে এবং ক্রমে মস্তিষ্কে গিয়ে বাসা বাঁধে। রাজমস্তকের খাঁটি ঘি খেয়ে খেয়ে সে এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।

ইন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! তবে এখন উপায় ?

বড়কুমার। উপায়—অপারেশন। মাথার খুলি উঠিয়ে ফেলে মাছটাকে বের করতে হবে; এ ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

ইন্দ্র। এ ত সাংঘাতিক অপারেশন! তুমি তবে যাও—তাই কর। ছোটকুমার এখানেই থাকুন, সময়টা বড় খারাপ—কখন কার কি হয়! কাল থেকে আমার শরীরটেও কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ কচ্ছে! তুমি গিয়ে রাজার চিকিৎসা কর। মোট কথা তাঁকে বাঁচাতেই হবে। আহা, বড় ভাল রাজা!

বড়কুমার। আজ্ঞে, আমি তা'হলে যাই।

ইন্দ্র। হ্যাঁ, আর দেখ, এবার ত অদৃশ্য হয়ে গেলে চলবে না। বৃদ্ধ কবিরাজের বেশ ধরে যাবে—'রাজাকে আমি বাঁচিয়ে দিতে পারি' একথা বললেই, তারা তোমার হাতে রাজাকে ছেড়ে দেবে এখন।

বড়কুমার তাঁহার ব্যাগে যন্ত্রপাতি, ব্যাণ্ডেজের সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র ভরিয়া, সেই দিনই যাইয়া ধারানগরীর রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

রোগীর কক্ষ হইতে সমস্ত লোক বাহির করিয়া দিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া, বড়কুমার ভাবিলেন, "যে রকম শক্ত অপারেশন, আর রোগী যে রকম দুর্ব্বল, এ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে যদি পটল তোলে? তার চেয়ে ক্লোরোফর্ম্ম করি।" (পাঠক ইহা পরিহাস ভাবিবেন না। মূল ভোজপ্রবন্ধে আছে, "মোহচূর্ণেন মোহয়িত্বা শিরঃকপালমাদায়..." —সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৯০০ বৎসর পূর্ব্বেও কবিরাজ মহাশয়গণ ক্লোরোফর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত ছিলেন।)

ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া অশ্বিনীকুমার রাজাকে বসাইয়া তাঁহার মাথার চামড়া কাটিয়া খুলি খসাইয়া ফেলিলেন। মাছটাকে বাহির করিয়া জলপূর্ণ একটা হাঁড়ির মধ্যে ফেলিলেন। তারপর খুলি বসাইয়া, চামড়া সেলাই করিয়া, ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া রাজাকে আবার শোয়াইয়া দিলেন। আরামসূচক একটা আঃ শব্দ করিয়া, পাশ ফিরিয়া রাজা ঘুমাইতে লাগিলেন।

দ্বার খোলা হইল। সকলে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাজা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রোগ হইবার পর, এই প্রথম তাহারা রাজাকে ঘুমাইতে দেখিল। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল মশাই?"

অশ্বিনীকুমার হাঁড়ি দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমাদের রাজার মস্তিষ্কের ভিতর ঐ মাছ ছিল।" কি করিয়া মাছ ঢুকিয়াছিল, তাহাও তিনি সকলকে বলিয়া দিলেন। সকলে শুনিয়া ত অবাক।

পুরা ৪৮ ঘণ্টা রাজা ঘুমাইলেন। ঘুম ভাঙিলে দেখিলেন, মাথায় আর কোনও যন্ত্রণা নাই—কেবল দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাঁহাকে বলকারক ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হইতে লাগিল।

প্রজারা, আমলারা, চিকিৎসক মহাশয়কে তখনই যাইতে দিল না। বলিল, "রাজা আগে শরীরে বল পান, উঠে হেঁটে বেড়ান, তখন আপনি যাবেন। কি জানি, আবার যদি কোনও উপসর্গ দেখা দেয়!"

সুতরাং অশ্বিনীকুমার কয়েকদিন রহিয়া গেলেন। রাজা দিন দিন সবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। খুব উচ্চ বেতনে ইঁহাকে তিনি নিজ ষ্টেট-ফিজিসিয়ন নিযুক্ত করিতে চাহিলেন —কিন্তু কবিরাজ মহাশয় রাজি হইলেন না!

অবশেষে তাঁহার বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। ভোজরাজ রাজসভা মধ্যে কবিরাজ মহাশয়কে বহুসম্মানে ভূষিত করিলেন। ঘড়া-ঘড়া মোহর, মণি-মুক্তা, হাতী ঘোড়া প্রভৃতি তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদত্ত হইল। অবশেষে রাজা বলিলেন, "কবিরাজ মশায়, আপনি ত চললেন—আপনাকে রাখতে আমরা পারলাম না। তা, সে ক্ষোভ করা আর বৃথা। আপনার তুল্য মহাপণ্ডিত সুচিকিৎসক ত আমাদের নজরে কখনও আসেনি। তা, একটা কথা আপনার কাছে জেনে নিতে চাই!"

"কি বলুন?"

"আহার বিহার প্রভৃতিতে, কি রকম নিয়ম পালন করলে, আমাদের দেহ বেশ ভাল থাকে,—সেইটে আমাদের বলে' দিয়ে যান। অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল পথ্য কি কি?"

অশ্বিনীকুমার কহিলেন—

অশীতেনাম্ভসি স্নানং, পয়ঃ পানং, বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
এতদ্ বো মানুষাঃ পথ্যং—

শ্লোক শেষ হইল না—ভোজরাজ খপ্ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন —"মানুষাঃ! আপনি আমাদের 'হে মানুষগণ' বলে' সম্বোধন করছেন, আপনি কি তাহলে

মানুষ ন'ন? আপনি কে বলুন।"

ভানুমতীর খেলা!—কবিরাজ মহাশয় অদৃশ্য। ধরা পড়িয়াই একদম অন্তর্ধান। পারিতোষিকের ঘড়া-ঘড়া মোহর, মণিমুক্তা, হাড়ী ঘোড়া সবই পড়িয়া রহিল। রাজা বোকা বনিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

বিস্ময় কতকটা অপগত হইলে, রাজা বলিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই অশ্বিনীকুমার—আমার পিতৃপুরুষের পুণ্যফলে, আমায় এসে বাঁচিয়ে গেলেন। কিন্তু হায় হায় কি আপশোষ, শ্লোকটি যে শেষ হল না! উপদেশটি যে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল! এখন উপায়? কে এই শ্লোকটির যথার্থরূপে পাদপূরণ করে দিতে পারে?"

সকলে বলিল, "কালিদাস ভিন্ন আর কেউ এ শ্লোক পূরণ করতে পারবে না। পারবে না কেন? একটা যা তা দিয়ে শ্লোক পুরিয়ে, ষোল অক্ষর গুণে দেখিয়ে দেবে এখন। বাধা না পেলে অশ্বিনীকুমার যা বলতেন, তা কেবল কালিদাসের মুখ থেকেই বেরুবে, কেননা তাঁর জিহ্বাগ্রে মা সরস্বতী বাস করেন।"

কালিদাসের ডাক পড়িল। তিনি আসিয়া পাদপূরণ করলেন—"স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজনম্।" সম্পূর্ণ শ্লোকটি দাঁড়াইল—

অশীতেনাম্ভাসি স্নানং, পয়ঃ পানং, বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
এতদ্ বো মানুষাঃ পথ্যং স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজনম্॥

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে তোমাদের উৎকৃষ্ট পথ্য এইগুলি—

"অ-শীতল জলে স্নান, দুগ্ধপান, উত্তমা স্ত্রীগণের সঙ্গ, উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ (ঘৃতাদি-যুক্ত) দ্রব্য ভোজন।"

—অতএব, পাঠকগণ, এখন হইতে জলকে সামান্য মাত্র গরম করিয়া স্নান করুন, ঘৃত দুধের বরাদ্দটা কিছু বাড়াইয়া দিন—দিনের বেলা আপিস যাইতে হয়, গরম ভাত খাইয়াই থাকেন—রাত্রে বেশী দেরী না করিয়া বাড়ী ফিরিবেন—নহিলে ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, —এবং যাঁহাদের একটি মাত্র স্ত্রী, তাঁহারা অন্ততঃ আর দুইটি সুপাত্রীর সন্ধানে ঘটক লাগাইয়া দিন—কারণ শ্লোকে আছে, "স্ত্রিয়ঃ"—একবচনও না দ্বিবচনও না—একেবারে বহুবচন।

আইনের গল্প

(১) মাতঙ্গিনীর কাহিনী

ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী এলোকেশী, তারকেশ্বরের মোহন্তের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছিল বলিয়া, এলোকেশীর স্বামী তাহাকে খুন করিয়াছিল। সেই ব্যাপার লইয়া একদিন বাঙ্গালা দেশে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। সে সম্বন্ধে কত ছড়া কত গান উঠিয়াছিল, গ্রামে গ্রামে ভিখারীরা সেই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। এলোকেশীর মত না হউক, মাতঙ্গিনীর ব্যাপারেও এক সময় বাঙ্গালা-দেশকে অত্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। মাতঙ্গিনী অথবা তাহার জার অথবা দুইজনে মিলিয়া, মাতঙ্গিনীর স্বামীকে হত্যা করিয়াছিল। তাহার জার পলাইয়াছিল—পুলিস তাহাকে ধরিতে পারে নাই। মাতঙ্গিনীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়।

এই ঘটনাটি, বিখ্যাত সাহিত্যিক কৃষ্ণনগরনিবাসী রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুরের মুখে যেমন শুনিয়াছি, নিম্নে তাহাই বর্ণনা করিলাম।

মাতঙ্গিনীর স্বামীর (নামটি শুনি নাই) বাস ছিল নদীয়া জেলার কোনও এক পল্লীগ্রামে। সংসারে কেবল স্বামী, স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্র। স্বামী বড় গরীব, কিছু ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়াছিল, নানাস্থানে চাকরির জন্য দরখাস্ত পাঠাইত। ক্রমে তাহার চাকরি একটি জুটিল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন্ এক সহরে। কিন্তু বেতন এত অল্প যে, সে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রকে নিজ সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। প্রতিবেশীরা তাহাকে অভয় দিলেন, "তোমার চিন্তা কি বাবা? আমরা সব রয়েছি, আমরা সর্ব্বদা দেখবো শুনবো, তোমার স্ত্রী-পুত্রের জন্যে কোনও চিন্তা তুমি কোরো না। যাও গিয়ে কর্ম্মে ভর্ত্তি হও, মন দিয়ে কাজকর্ম্ম করলে নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হবে, মাইনে বাড়বে, তখন এসে তোমার স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে নিয়ে যেও।"

যুবক, প্রতিবেশীদের তত্ত্বাবধানে স্ত্রী ও দুই বৎসর বয়স্ক পুত্রকে রাখিয়া কর্ম্ম-স্থানে গমন করিল। সেখানে গিয়া কঠোর পরিশ্রমে সে আপন কার্য্য করিতে লাগিল। মনিব খুসী হইয়া মাঝে মাঝে কিছু কিছু করিয়া তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

মাতঙ্গিনী, তখনকার দিনেও লেখাপড়া জানিত। স্বামীর সহিত নিয়মিতভাবে সে পত্র-বিনিময় করিত। স্বামী তাহাকে মাসে মাসে খরচের টাকা মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দিত।

স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিয়া, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া বাস করিবার উপযোগী বেতন যখন তাহার হইল, তখন তাহার চাকরি প্রায় তিন বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

স্বামী তখন এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করিল—ছুটি মঞ্জুরও হইল। সে তখন স্ত্রীকে পত্র লিখিল, "ভগবান এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এতদিনে আমার এমন ক্ষমতা হইয়াছে যে, বাসা ভাড়া করিয়া তোমাদের আনিয়া নিজের কাছে রাখি। এক মাসের ছুটি পাইয়াছি। অমুক দিন হইতে আমার ছুটি আরম্ভ। অমুক তারিখে বাড়ী পৌঁছিব, এক মাস বাড়ীতে থাকিয়া, বাড়ী তালা বন্ধ করিয়া, তোমাদের লইয়া এখানে চলিয়া আসিব।"

মাতঙ্গিনী ছিল, অত্যন্ত রূপসী। স্বামীর বিদেশগমনের বছরখানেকের মধ্যেই, তাহার অধঃপতন ঘটিয়াছিল। ক্রমে প্রতিবেশীরা সকল কথা জানিতেও পারিয়াছিল কিন্তু কেহই তাহার স্বামীকে এ অপ্রিয় সংবাদ প্রেরণ করে নাই।

পত্র আসিবার পর, মাতঙ্গিনী ও তাহার জার, মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল। "তাই ত! এক মাস পরে লইয়া যাইবে, আর দেখাশুনা হইবে না।" এই জাতীয় চিন্তাই বোধ হয়।

ক্রমে তাহাদের পরামর্শ হইল, সে আসুক, রাতারাতি তাহাকে হত্যা করিয়া, লাসে পাথর বাঁধিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেই হইবে। কেহ জানিবে না শুনিবে না। পরদিন প্রচার করিয়া দিলেই হইবে যে, ভোরে উঠিয়া সে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে হতভাগ্য স্বামী বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। প্রবাস-যাপনকালে নিজেকে সকল রকম সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া অতি কষ্টে তাহার স্বল্প বেতন হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিত। আসিবার সময় এই সঞ্চিত অর্থে, স্ত্রীর জন্য একযোড়া সোণার বালা সে গড়াইয়া আনিয়াছিল—তাহা স্ত্রীকে উপহার দিল।

পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল—একটু সকালেই নৈশ-ভোজন শেষ করিয়া পুত্রসহ সে শয্যায় আশ্রয় লইল। ছেলেটি তখন তাহার পাঁচ বৎসরের হইয়াছে। তারপর কি ঘটিল, নদীয়া জজ আদালতে সেই পাঁচ বৎসরের ছেলের মুখে শুনুন।

"একদিন একব্যক্তি আমাদের বাড়ী আসিল, মাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "তোর বাবা।" আমি বলিলাম, "আমার একটা বাবা ত রহিয়াছে।" মা বলিল, "এও তোর বাবা, সে বাবার কথা এ বাবাকে কিছু বলিস্ না।"

নূতন বাবা আমাকে কাছে লইয়া রাত্রে শয়ন করিলেন। আমায় [illegible]লেন,

কত আদর করিলেন। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম, আমার মা ও পুরাতন বাবা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে, আমার নূতন বাবা যে সেদিন আসিয়াছিল, তার গলা কাটা, রক্তে বিছানা ভাসিয়া যাইতেছে। দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। বাবা আমায় ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর্ পাজি! চেঁচাবি ত তোরও গলা এমনি ক'রে কেটে দেবো।" ভয়ে আমি চক্ষু মুদিলাম এবং ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

গ্রামের একজন ডোম এ মোকর্দ্দমায় একটা প্রধান সাক্ষী ছিল, তাহার উক্তি হইতে প্রকাশ—

খুনের পর মার্তঙ্গিনী তাহার জারকে বলিতে লাগিল "চল, এবার দুজনে লাসটা নদীতে দিয়ে আসি।"

সে ব্যক্তি বলিল, "দাঁড়াও, একটু স্থির হয়ে নিই। রক্ত দেখে আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে। ভয় কি? একটু সবুর কর—সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

কিছুক্ষণের পর সে ব্যক্তি বলিল, "একবার চট্ করে বাইরে থেকে আসি"—বলিয়া সে বাহির হইয়া, রাত্রির অন্ধকারে কোথায় গেল, পুলিস তাহার কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

মার্তঙ্গিনী বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। দশ মিনিট—পনেরো মিনিট আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার পেয়ারের লোকটি—এই অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া—পলায়ন করিয়াছে।

মার্তঙ্গিনী তখন বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া, সেই অন্ধকারে বাহির হইল। গ্রামের ডোমপাড়ায় গিয়া, তাহার বিশ্বস্ত একজন ডোমকে জাগাইল। তাহার নিকট আমূলে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি আমার বাবা, তুমি আমার প্রাণ বাঁচাও। এখন মাত্র দুপুর রাত, রাতারাতি লাসটা নদীতে দাও। তোমার পুরস্কার, আমার হাতের এই নূতন বালাযোড়াটা। একটা তোমায় আমি এখনি দিয়ে যাচ্চি—আগাম। আর একটা, কাজ শেষ হয়ে গেলেই তুমি পাবে।"—বলিয়া মার্তঙ্গিনী এক হাতের বালা খুলিয়া ডোমকে দিল।

সমস্ত শুনিয়া বালা লইয়া ডোম বলিল, "আচ্ছা মাঠাকরুণ, যা করবার আমি সব করছি। তামাকটা খেয়ে নিই, খেয়ে, আমার এক বন্ধু ডোমকেও ডাকি। তাকেও সঙ্গে নেওয়া দরকার, একলা ত আমি পারবো না। অন্য বালাটা বরঞ্চ তাকেই দেবেন, সেও ত পুরস্কারের আশা করবে। আপনি বাড়ী যান, আমি আধ ঘণ্টার ভিতরই তাকে নিয়ে আসছি।"

মার্তঙ্গিনী বাড়ী চলিয়া গেল। ডোম, তামাক শেষ করিয়া, অন্য কোনও ডোমকে জাগাইতে গেল না,—সে গেল থানায়। দারোগাকে জাগাইয়া মার্তঙ্গিনী যাহা যাহা তাহাকে বলিয়াছিল, সমস্তই দারোগাকে জানাইল, এবং বালাটিও দারোগাকে দিল।

দারোগা সেই রাত্রেই গিয়া মার্তঙ্গিনীকে গ্রেপ্তার করিলেন।

অবশেষে, সেসন জজের আদালতে মার্তঙ্গিনীর বিচার হইল। কে যে হত্যা করিয়াছিল,—মার্তঙ্গিনীই গলা কাটিয়াছিল, অথবা তাহার জারই ও-কার্য্য করিয়াছিল,—তাহা নির্ণীত হইল না। চাক্ষুষ সাক্ষী কেবলমাত্র সেই পাঁচ বৎসরের বালক। কিন্তু আইন এই যে, যদি দুই বা তদধিক ব্যক্তি একমত হইয়া কোনও দুষ্কার্য্য করে, তবে প্রত্যেকেই সমভাবে অপরাধী (পীনাল কোড, ৩৪ ধারা)। স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার ধারাতেই জজ মার্তঙ্গিনীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া দয়া করিয়া চরম-দণ্ড (ফাঁসি) না দিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন।

জজ আদালত হইতে মার্তঙ্গিনীকে কয়েদী গাড়ীতে (prison van) যখন জেলে

লইয়া যাইত, সেই সময় পথের দুই ধারে কৃষ্ণনগরের লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। গাড়ী দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, তাহারা অকথ্য ভাসায় মাতঙ্গিনীকে গালাগালি দিত,—কেহ গাড়ীর কাছে যাইয়া তাহাতে থুথু ফেলিত, ছেঁড়াজুতা প্রভৃতি, এমন কি কাগজে মোড়া বিষ্ঠা পর্য্যন্ত গাড়ীতে ছুঁড়িয়া মারিত। জনসাধারণের ক্রোধ (public indignation) এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত। তারকেশ্বরের মোহান্তের বেলায়ও এইরূপ ঘটিয়াছিল। মোহান্তের চারি বৎসর জেল হয়—হুগলি জেলে সে আবদ্ধ হইয়াছিল। গুজব রটিয়াছিল, মোহান্তকে ঘানি টানাইতেছে। সহবে জেলের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের একটা দোকান (jail depot) ছিল। মোহান্তের নিষ্কাশিত সর্ষপ তৈল সে দোকানে একটাকা সেরে বিক্রয় হইয়াছিল। (তখনকার দিনে এক সের সর্ষপ তৈলের মূল্য দুই আনা দশ পয়সা মাত্র ছিল—আমিই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চারি আনা সের সর্ষপ তৈল কিনিয়াছি)।

সান্যাল-মহাশয় ছিলেন একজন সরকারী ডাক্তার—অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন। (ক্রমে তিনি সিভিল সার্জ্জন পদে উন্নীত হইযাছিলেন। এখন পেন্সন ভোগ করিতেছেন)। এক সময় পোর্ট ব্লেয়ারের মেডিক্যাল অফিসারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বদলি করে। তিনি স্ত্রী-পুত্রাদি লইযা পাঁচ বৎসর কাল পোর্ট ব্লেয়ারে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিযাছেন—

পোর্ট ব্লেয়াবে পৌঁছানব অল্প দিনের মধ্যে আমি জানিতে পারি যে, মাতঙ্গিনী তথায বহিযাছে। একজন বাঙালী অফিসার আসিয়াছেন শুনিয়া, মাতঙ্গিনী আমাদের বাসায আসিল, আমার স্ত্রীব সহিত আলাপ করিয়া গেল। তারপর হইতে মাঝে মাঝে সে আসিত, আমার স্ত্রীর সহিত গল্প-গুজব করিয়া চলিয়া যাইত। তখন সে বৃদ্ধা, সমস্ত চুল তাব পাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, যৌবনে সে খুব সুন্দরীই ছিল।

একদিন নির্জ্জন পথে মাতঙ্গিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। অন্যান্য কথার পর বলিলাম, "মাতঙ্গিনী, তোমার মত, আমিও নদীয়া জেলার লোক, কৃষ্ণনগবে আমার বাড়ী, ইহা আমার স্ত্রীর কাছে তুমি শুনিয়া থাকিবে। সেসন আদালতে যখন তোমার মোকর্দ্দমা হয়, তখন আমি বালক স্কুলে পড়ি। সে সময় লোকে বলাবলি করিত, খুনটা কে করিল, তুমিই করিলে, অথবা তোমার সেই লোকই করিল, তাহা কিছুই জানা গেল না। এ বিষয়ে, অন্য সকলের মত, আমার মনেও অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। সে ঘটনার পর বহু বৎসর গত হইয়াছে। এখন তুমি আমায় সে কথা বলিবে?"

সান্যাল-মহাশয আমায বলিলেন, "এই কথা শুনিয়া মাতঙ্গিনী কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া নতমুখে রহিল।" তার পর ধীরে ধীরে, মুখ পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া বলিল, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।"

(২) বেশ্যা খুন

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, একদিন সন্ধ্যার পর, কলিকাতার কোনও এক কু-পল্লীতে মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। এক বারবিলাসিনী খুন হইয়াছে, ইহাই সকলে বলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল। যে বাড়ীতে খুন হইয়াছে, তথায় পুলিস গিয়া লাস দেখিল, আসামীকে গ্রেপ্তার করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, আসামী পলাইবার চেষ্টা মাত্র করে নাই।

ইনস্পেক্টর আসিয়া সরেজমিন তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিলেন। বাড়ীটি দ্বিতল। যে সকল রমণী দ্বিতলের বিভিন্ন ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিত, তাহারা এইরূপ এজাহার দিল—

"আজ সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে, এই ব্যক্তি (আসামীকে দেখাইয়া) সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসে। আমরা সে সময় সাজ-সজ্জা করিয়া, ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া, খরিদ্দারের অপেক্ষায় নিজ নিজ শয্যায় বসিয়া ছিলাম। আসামী প্রথমে প্রথম ঘরটির সামনে দাঁড়াইয়া, ভিতরে উপবিষ্টার পানে অল্পক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর আর একটি ঘরের সামনে দাঁড়াইল, তারপর আর একটি—বুঝিলাম খরিদ্দার জিনিস পছন্দ করিতেছে। অবশেষে সে, আমাদের মৃতা সখীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কপাট ভেজাইয়া দিল। অতি অল্পক্ষণ পরে সেই ঘর হইতে একটা গোঁ গোঁ শব্দ আমাদের কাণে আসিল। আমরা ভীত হইয়া বাহির হইলাম এবং সেই কামরার দিকে ছুটিলাম। দুয়ার ঠেলিতে উহা খুলিয়া গেল। দেখি, আমাদের সখী, মেঝেয় বিছানো তার শয্যার উপর গলাকাটা অবস্থায় পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে এবং আসামী, বিছানার পাশে মেঝের উপর দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। হাতে একখানা রক্তমাখা ক্ষুর, তাহা দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। আমরা খুন খুন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেহ নিঃস্পন্দ হইয়া গেল। অনেক লোক ছুটিয়া আসিল—তারপর পুলিসও আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রশ্ন। এ ব্যক্তি কে? মৃতার ঘরে এ কতদিন হইতে যাতায়াত করিতেছে?

সকলের উত্তর। মৃতার ঘরে ইহাকে পূর্ব্বে কোনও দিন আসিতে আমরা দেখি নাই। এ কে তাহা জানি না, পূর্ব্বে কখনও ইহাকে দেখি নাই।

একতলায় যে রমণীগণ বাস করিত, তাহারা বলিল, সন্ধ্যার একটু পরে এ ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল উপরে যাইবার সিঁড়ি কোথা? সিঁড়ি দেখাইয়া দিলে সে উপরে গেল। অল্পক্ষণ পরে উপরে ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনিয়া আমরা উপরে গেলাম এবং দেখিলাম—দ্বিতলে রমণীগণ যে দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ বলিল। আরও বলিল, আসামীকে পূর্ব্বে তাহারা কোনও দিন দেখে নাই।

পুলিস, লাস হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

যথাসময়ে আসামী নরহত্যার ধারায় চালান হইয়া, বিচারার্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রেরিত হইল।

সে বাড়ীর রমণীগণ পুলিসের নিকট যাহা বলিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসেও সেইরূপ বলিল। শেষে, যে ডাক্তার সাহেব লাস পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সাক্ষীমঞ্চে দাঁড়াইলেন।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, বর্ণনা করিলেন। গলার সেই কাটার মাপ,—লম্বায় কতখানি, কোনখানে কতটা গভীর ছিল, তাহা বলিলেন। সরকারী উকীল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বলিতে পারেন, এ কাটা suicidal (মৃতা নিজের গলা নিজে কাটিয়াছে) অথবা homicidal (অপর কেহ কাটিয়াছে ?)

এখন, Medical Jurisprudence গ্রন্থগুলিতে এরূপ অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দিবার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ নিজের গলা নিজে যদি কাটে, তবে অস্ত্রটা রহিল তার ডান-হাতে, সে উহা গলার বাঁ-দিকে বসাইয়া, টানিয়া ডান-দিকে লইয়া গিয়া থামিল। সুতরাং বাঁ-দিকের ক্ষতের গভীরতা হইবে সবচেয়ে কম। গভীরতা ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া, ডান-দিকে যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে হইবে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু অন্য কেহ যদি তাহাকে হত্যা করিবার মানসে এইরূপ করে, তবে সে অস্ত্র ধরিবে নিজের ডান-হাতে; বসাইবে, যাকে খুন করিতেছে তার গলার ডান-পাশে, সেখানে গভীরতা হইবে সবচেয়ে কম; ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া, বাঁ-দিকে যেখানে ক্ষত শেষ হইয়াছে, সেখানে গভীরতা হইবে সবচেয়ে বেশী।—কিন্তু, সকল সময়, গভীরতার এরূপ তারতম্য পাওয়া যায় না—তখন

ডাক্তার এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হন।

এ মোকদ্দমাতেও ডাক্তার উল্লিখিত কারণে বলিতে পারিলেন না যে, এই কাটা suicidal অথবা homicidal।

আদালত আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কিছু বলিতে চাও ?"

আসামী। আমি কিছুই বলিব না।

সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হইল। সরকারী উকীল যাহা বক্তৃতা করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—

সেই ঘরে এই ব্যক্তি এবং হতা রমণী ছাড়া, কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না যে, বলিব হয়ত সেই তৃতীয় ব্যক্তিই হত্যাকর্ত্তা। স্ত্রীলোকটার, নিজের গলা নিজে কাটিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। যদি এমন হইত যে, এ ব্যক্তি অনেকদিন হইতে উহার নিকট যাতায়াত করে, দুজনের মধ্যে প্রেম হইয়াছে, তাহা হইলে হয়ত মনে করাও যাইত যে, কোনও ঝগড়া কলহের কারণ, অভিমানে রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। সকলেই বলিতেছে, সে বাড়ীতে আসামীকে তাহারা পূর্ব্বে কোনও দিন দেখে নাই। তাহা হইলে, আসামীই রমণীকে হত্যা করিয়াছে ইহা স্থির। কেন করিল ? চুরির অভিপ্রায়ে হইতে পারে। হয়ত পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল, গলাটি কাটিয়া দিলেই রমণী চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে—তখন সে অভাগিনীর টাকা-কড়ি গহনা-পত্র লইয়া বাহির হইয়া, কপাটটি ভেজাইয়া, চম্পট দিবে। কিন্তু অভাগিনী মৃত্যুযন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করাতেই আসামীর উদ্দেশ্য বিফল হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট তখন আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন। হাইকোর্টের আগামী সেসনে, তাহার বিচার হইবে। আসামী প্রেসিডেন্সি জেলে হাজতবন্ধ রহিল।

ইতিমধ্যে দেশে যুবকের আত্মীয়-স্বজন খবর পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অসম্ভব। ও যে অর্থলোভে নারী-হত্যা করিবে, ইহা একেবারে অসম্ভব। সে প্রকৃতির ছেলে ত ও নয়।" তাঁহারা, সেসনে আসামীর পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য বড় বড় উকীল কৌঁসুলি নিযুক্ত করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসের কাগজ-পত্রের নকল পড়িয়া, এবং আসামীর আত্মীয়-স্বজনের মুখে আসামীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা শুনিয়া, আসামীর উকীলেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। জজের অনুমতি লইয়া, প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়া তাঁহারা আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আসামীকে বলিলেন, "আসল ঘটনা সমস্ত আমাদের খুলিয়া বল।"

আসামী। বলিব না।

উকীল। না বলিলে আমরা তোমার পক্ষাবলম্বন করিব কি করিয়া ? ব্যাপার যেরূপ দেখিতেছি, ইহাতে তোমার যে ফাঁসির হুকুম হইতে পারে।

আসামী। হউক। ফাঁসি যাইব। আমি কিছুই বলিব না।

উকীলেরা সেদিন হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসামীর আত্মীয়-স্বজনের মিনতি এড়াইতে না পারিয়া, আবার তাঁহারা গিয়া আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এইরূপ দুই তিন বার সাক্ষাতে অনেক বুঝানো সুঝানোর পর, আসামী অবশেষে আসল ঘটনাটি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিল।

"কলিকাতা হইতে দূরে, অমুক গ্রামে আমার বাস। সেখানে আমার একখানি মণিহারী দোকান আছে, উহাই আমার উপজীবিকা। দুই তিন মাস অন্তর আমি মাল খরিদ করিতে কলিকাতায় আসি। এবারও সেইরূপ আসিয়াছিলাম।

"দশ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা বলি শুনুন। আমার এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল, অল্প বয়সে সে বিধবা হইয়া যায়। তার রূপ ছিল, সেই রূপের জন্যই তাহার সর্ব্বনাশ

হইল। ষোল সতেরো বৎসর বয়সে, কোনও দুর্ব্বৃত্তের সহিত সে কুলত্যাগ করে। এই ঘটনায়, লজ্জায় অপমানে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, সমাজে আমাদের মাথা তুলিবার উপায় ছিল না। প্রথম প্রথম কোন আত্মীয়-বন্ধু তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিতাম, সে মরিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহার নামও আমাদের গৃহে আর উচ্চারিত হইত না। সে যে একদিন ছিল, ইহাও আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছিলাম।

"এবার কলিকাতায় আসিয়া, মাল খরিদ শেষে, বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় ভাবিলাম, যখন কলিকাতায় আসিয়াছি, তখন একটু আমোদ-প্রমোদ করিয়া লই। তাই, সে পল্লীতে গিয়া, সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম। গৃহবাসিনীরা যাহা যাহা বলিয়াছে সমস্তই সত্য। উপরে গিয়া আমি এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া, অবশেষে এই ঘরে প্রবেশ করিয়া, কপাট ভেজাইয়া দিয়াছিলাম। "কি গো তোমার নাম কি?"— আমি এই প্রশ্ন করিবামাত্র, অভাগিনী অতি বিস্মিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল এবং আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার এই ব্যবহারে আমিও বিস্মিত হইয়া, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়াই বুঝিলাম, সে আর কেহ নহে, দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কুল-ত্যাগিনী আমারই সেই ভগিনী। সেও অবশ্য আমায় চিনিয়াছিল। "হা ভগবান!"— বলিয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ দেওয়াল-আলমারি হইতে একটা ক্ষুর বাহির করিয়া, চক্ষের নিমেষে সে নিজ গলায় বসাইল। তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, তাহাকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে আমি ক্ষুরখানা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলাম। কিন্তু, তৎপূর্ব্বেই তাহার শ্বাসনালী ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, সে বিছানায় পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তারপর লোকজন আসিয়া পড়িল।"

এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইবার পর, আসামী পক্ষের লোকেরা মৃতার কলিকাতা বাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এ বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বে সে কোন্‌ বাড়ীতে থাকিত, তার পূর্ব্বে কোন্‌ বাড়ীতে থাকিত, এইরূপ সন্ধান করিতে করিতে, যে বাড়ীতে তাহার হরণকারী প্রথম তাহাকে আনিয়া রাখিয়াছিল, সে বাড়ী খুঁজিয়া বাহির হইল। সে বাড়ীর বাড়ীউলি ও অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ, নবাগতার সকল পরিচয়ই জানিত—তাহারা আসিয়া সাক্ষী দিয়া প্রমাণ করিল যে, আসামীর উক্তি যথার্থ। জজসাহেব উহা বিশ্বাস করিয়া আসামীকে বেকসুর খালাস দিলেন।

কাজির বিচার

পুরাকালে পারস্য দেশের কোনও গ্রামে একজন অতি ধনবান ওমরাহ্‌ বাস করিতেন, তাঁহার নাম ছিল নবাব কুদরৎউল্লা খাঁ। তিনি ছিলেন সেই গ্রাম এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। প্রকাণ্ড পাঁচমহল প্রাসাদে তিনি বাস করিতেন। প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে এত গোলাপ ফুটিত যে, তাহার সৌরভে চারিদিক অনেক দূর পর্য্যন্ত আমোদিত থাকিত। নবাব বাহাদুর প্রত্যহ গোলাপ জলে স্নান করিতেন।

নবাব বাহাদুরের তখন যৌবন কাল; বয়স ৩০ বৎসরের অধিক হয় নাই; কিন্তু নিত্য কালিয়া পোলাও ও নানাবিধ শিরনী (মিষ্টান্ন) আহার করিয়া তাঁহার দেহটি অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়িয়াছিল। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি আবলুশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত, লাল মখ্‌মল মণ্ডিত এক সোফায় শয়ন করিয়া কাটাইতেন। শয়ন করিয়া, সোণার ফর্সিতে

তামাকু সেবন করিতে করিতে তিনি কিছুক্ষণ বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; অবশিষ্ট সময় নিদ্রায় অথবা মোসাহেবগণের খোস গল্প শ্রবণ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। কেবল বিকালে একবার তাঞ্জামে চড়িয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন।

গ্রামের বাহিরে বলিলেই হয়, নদীর নিকট একস্থানে একটি ক্ষুদ্র মৃৎকুটীরে আবদুল নামক একজন গরীব লোক বাস করিত। রাস্তা হইতে এই কুটীরখানি বেশী দূরে নহে;—মাঝে খানিকটা পতিত জমি মাত্র। কুটীরের উভয় পার্শ্বে এবং পশ্চাতে নদীতীর অবধি শরবন। আবদুল প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া, একখানি ছুরি হাতে করিয়া এই শরবন মধ্যে প্রবেশ করিত;—এবং বেশ পাকাপাকা শরগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাটিয়া, বোঝা বাঁধিয়া তার কুটীরের সম্মুখে আনিয়া ফেলিত। ধারালো ছুরীর সাহায্যে শরের ছাল-গুলি ছাড়াইয়া তাহা দিয়া সারাদিন বসিয়া কুলা, ডালা, পাখা, ছোট ছোট বাক্স ইত্যাদি নানা দ্রব্য বয়ন করিত। বাজারে বা গৃহস্থ বাড়ী গিয়া, সেই সব বিক্রয় করিত—ইহাই তাহার উপজীবিকা।

নবাব বাহাদুর বিকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইলে, প্রায়ই তাঁহার তাঞ্জাম আবদুলের কুটীরের সম্মুখ দিয়া যাইত। তিনি দেখিতেন, সারাদিনের পরিশ্রমের পর, আবদুল কোন দিন কুটীরের বাহিরে বসিয়া অন্নপাক করিতেছে, কোনও দিন দেখিতেন, বৃহৎ শানকীতে লাল মোটা চাউলের একরাশি ভাত ঢালিয়া, যৎসামান্য ব্যঞ্জন অথবা কেবল-মাত্র লবণ সহযোগে পরমানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। কোনও দিন বা দেখিতেন, তাহার খাওয়া হইয়া গিয়াছে, ধুলো মাটীর উপর ছেঁড়া চেটাই বিছাইয়া, গ্রীষ্মের ফুরফুরে হাওয়ায় আবদুল গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দেখিয়া দেখিয়া, নবাব বাহাদুরের মনটা ঈর্ষায় জ্বলিয়া যাইত।

তিনি ভাবিতেন, "উঃ—হতভাগার কি স্পর্দ্ধা! উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী চাউলের পোলাও তাহাই আধপোয়ার বেশী আমি খাইতে পারি না;—বাবুর্চ্চিরা প্রত্যহ ৮।১০ প্রকারের মাংস রন্ধন করিয়া দেয়, কোনওটা একটু চাখিয়া দেখি মাত্র—মুখে রুচে না—খাই না,—কোনওটার দুই চারি টুকরা খাই; একদিন দুই চামচ বেশী খাইলেই বদহজম হয়! আর ঐ শয়তান, শুধু খানিকটা নুন বা খানিকটা কুমড়ার ঘ্যাঁট্ দিয়া সেরখানেক বুকড়ি চাউলের অন্ন গোগ্রাসে গিলিতেছে; রেশমের গদি তোষকের উপর শুইয়া থাকি, ভৃত্যেরা দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, গোপালজলে ভিজানো পাখায় আমায় হাওয়া করে, তবু আমার ঘুম আসে না, অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত আমি জাগিয়া কেবল এ পাশ ও পাশ করি! আর, ও কিনা ধুলোর উপর চেটাই পাতিয়া এমন ঘুমায় যে, আমার তাঞ্জামবাহকগণের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পায় না,—উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমায় সেলাম করে না! উঃ, অসহ্য!"

গ্রীষ্মকাল! সমস্ত শরবন পাকিয়া শুকাইয়া উঠিয়াছে। একদিন রাগের মাথায় নবাব বাহাদুর ভৃত্যগণকে হুকুম দিলেন, "দে—ওর শরবনে আগুন লাগাইয়া দে।"

শুধু শরবন পুড়িল না;—সেই আগুনে আবদুলের কুটীরখানিও ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

নবাবের এইরূপ অত্যাচারে নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়া, আবদুল্লা রাজধানীতে গিয়া, প্রধান কাজির নিকট নবাবের নামে নালিশ করিয়া দিল।

॥ দুই ॥

কাজী সাহেব উভয় পক্ষের সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করিলেন। কূট প্রশ্ন করিয়া, আবদুলের উপর নবাব সাহেবের রাগের যথার্থ কারণও তিনি অবগত হইলেন।

বিচার-শেষে কাজি সাহেব রায় প্রকাশ করিলেন। ফরিয়াদীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন :—

"আবদ্দুল, তুই অতি অভদ্র ও অন্যায় কার্য্য করিয়াছিস। এত বড় তোর গোস্তাকী যে নবাব সাহেবের দৃষ্টিপথে বসিয়া তুই কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত মারিস্! এমন ঘুমাস্ যে তাঞ্জামবাহকগণের উচ্চ চীৎকারেও তোর ঘুম ভাঙ্গে না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাব সাহেবকে সেলাম করিস্ না! এই অপরাধে, আমি তোর এক বৎসরকাল দ্বীপান্তরের দণ্ডবিধান করিলাম।"

আদেশ শুনিয়া, নবাব বাহাদুরের মুখে হাসি আর ধরে না! তাঁহার মোসাহেবগণ সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মোবারক্! মোবারক্!—হাঁ, সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার যদি বলিতে হয় তবে ইহাকেই বলা যায়। ধন্য কাজি সাহেবের শিক্ষা, ধন্য তাঁহার তীক্ষ্ম বুদ্ধি, ধন্য তাঁহার সমদর্শিতা!"

এই উচ্চ প্রশংসাবাদ শ্রবণেও কাজি সাহেবের মুখখানি গম্ভীর। ইহার পর তিনি বলিলেন:—

"আর শুন, নবাব সাহেব। তুমি বড়লোক, জমিদার,—আর গরীব আবদুল খাটিয়া খুটিয়া কোন রকমে দিন গুজরাণ করে! সামান্য অপরাধে তুমি এই গরীবের সর্ব্বনাশ করিয়াছ ইহা নিতান্ত অন্যায়, অধর্ম্ম ও নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইয়াছে। অতএব তোমার প্রতি আমার দণ্ডাজ্ঞা যে, তুমিও এক বৎসরকাল দ্বীপান্তরের শাস্তিভোগ করিবে।"

বলিয়া কাজি সাহেব, এজলাস ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

আদেশ শুনিয়া, নবাব বাহাদুরের মুখখানি শুকাইয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে "অ্যাঁ? অ্যাঁ?" বলিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মোসাহেবগণ হতভম্ব হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

এই রায়ের বিরুদ্ধে, বাদশাহের নিকট নবাব বাহাদুর আপীল করিলেন কিন্তু কোনও ফল হইল না।

কয়েক দিন পরে, আবদুল ও নবাব সাহেব উভয়কে রাজকীয় জাহাজে উঠানো হইল। সমুদ্র পারে, একটি দ্বীপে গভীর রাত্রে উভয়কে নামাইয়া দিয়া, কাপ্তেন জাহাজ লইয়া ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন, "বৎসর অতীত হইলে, তোমরা উভয়েই এইখানে অপেক্ষা করিও আমি আবার আসিয়া তোমাদের তুলিয়া লইয়া যাইব।"

॥ তিন ॥

এই দ্বীপে যাহারা বাস করিত, তাহারা সভ্যজগতের কোনও সংবাদই রাখিত না, কোনও সভ্যজাতির ভাষা অবগত ছিল না, বনের ফল মূল আহরণ করিয়া কিংবা পশু শিকার করিয়া তাহার মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিত এবং পশুচর্ম্মই ছিল তাহাদের বস্ত্র। প্রাতে উঠিয়া সমুদ্রতীরে আসিয়া এই দুইটি নবাগত অতিথিকে দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই সংবাদ ক্রমে তাহাদের বস্তিতে গিয়া পৌঁছিলে, বহুসংখ্যক নর-নারী ও বালকবালিকা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের দেখিতে আসিল। তাহারা নিজ ভাষায় এই দুইজনকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নবাব ও আবদুল তাহাদের একটা কথাও বুঝিতে না পারিয়া, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কেহ কেহ বলিল, "এ উৎপাত কোথা হইতে আসিয়া জুটিল! না জানি ইহারা কবে আমাদের কি অনিষ্ট করে, ইহাদের মারিয়া ফেলাই উচিত।" কেহ বলিল, "না না, আমরা এত লোক, ইহারা দুইজনে আমাদের কি অনিষ্ট করিতে পারে? মারিয়া ফেলা উচিত নহে।" আবার কেহ বলিল, "আমাদের সর্দ্দার আসুন, তিনি যেমন বলিবেন, সেই-রূপ ব্যবস্থাই করা যাইবে।"

নবাব বাহাদুর দুঃখে ও অপমানে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। আবদুল হাত

দুটি যোড় করিয়া, কাতর নয়নে, ইঙ্গিতে তাহাদের দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল।

সর্দ্দার মহাশয় অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া পেঁাছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেছে বুঝিতে পারিয়া, আবদুল গিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। অনেকেই তাঁহাকে পরামর্শ দিল, ইহাদের হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু সর্দ্দার এ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন, "মিছামিছি মনুষ্য হত্যা করিয়া কি হইবে? বরং ইহাদের দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারে। চল, ইহাদের বস্তির ভিতর লইয়া চল। ইহাদের কাজ দেওয়া যাইবে,—খাটিবে খাইবে।"

বস্তির ভিতর লইয়া গিয়া, সর্দ্দারের লোকেরা দুইখানি কুড়ুল আনিয়া ইহাদের হাতে দিয়া, দুইটা শুকনা গাছ দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিল, "এই গাছ দুইটি তোমরা কাটিয়া ফেল, কাজ শেষ হইলে তবে খাইতে দিব।"—বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

আবদুল কুড়ুলখানা লইয়া, গাছের গোড়ায় কপাকপ্ কোপ বসাইতে লাগিল। তাহার দেহে বিপুল শক্তি—এ সকল কার্য্যে সে বিলক্ষণ অভ্যস্ত। সারাদিনে গাছটাকে ভূমিসাৎ করিয়া শাখাগুলাও একে একে কাটিয়া পৃথক্ করিয়া ফেলিল।

নবাব বাহাদুর প্রাণের দায়ে, কুড়ুলখানি উঠাইয়া গাছে কোপ্ দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু একটা কোপও গাছের গুঁড়িতে ভাল করিয়া বসিল না। দশ মিনিট অতীত হইতে না হইতেই, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দরদর ধারায় ঘাম ছুটিল; হাত ব্যথা হইয়া গেল, তিনি কুড়ুল ফেলিয়া, বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর আবার সুরু করিলেন; কিন্তু অধিকক্ষণ কুড়ুল চালাইতে পারিলেন না। ক্রমে দিবা অবসান হইল।

সর্দ্দারের লোকেরা আসিয়া আবদুলের কার্য্য দেখিয়া খুব খুসী হইল। তাহার পিঠ থাবড়াইয়া সেই খুসী প্রকাশ করিল। নবাবের গাছটা অর্দ্ধেকও কাটা হয় নাই দেখিয়া রাগিয়া তাঁহাকে এক লাথি মারিয়া বলিল, 'তুই পাজি কোনও কর্ম্মের নোস্! কেবল ভুঁড়িই সার।"

আবদুলকে তাহারা আদর করিয়া কতকগুলি ফল, ও খানিকটা মাংস খাইতে দিল। নবাবকে গোটাকতক নিকৃষ্ট ফল মাত্র খাইতে দিল, মাংস মোটেই দিল না।

এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। আবদুলকে তাহারা যে কার্য্যে লাগায় তাহা যতই পরিশ্রমসাধ্য হউক না কেন, আবদুল তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। নবাবকে যে কার্য্যই দেয়, কোনটাই তিনি সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। ফলে, আবদুলের খুব আদর হইল। সে ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল ঘরে থাকিতে পায়। নবাবকে খাইতে দেয় অন্য সকলের উচ্ছিষ্ট—কদন্ন। পেটের জ্বালায় নবাব তাহাই খাইয়া কোনও মতে জীবন-ধারণ করেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিলে পর, নবাব বাহাদুরের শরীরে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তিনি এখন আর সেরূপ স্থূলকায় নাই। তাঁহার চর্ব্বি গলিয়া ভুঁড়ি খসিয়া, দেহের আয়তন অনেক কমিয়া গিয়াছে। খাইবার সময় উপস্থিত হইলে, ক্ষুধায় তিনি অস্থির হইয়া উঠেন। রাত্রে কুঁড়ে ঘরে চেটাইয়ের উপর শয়ন করিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন—এবং প্রায়ই একঘুমে তাঁহার রাত কাটিয়া যায়। প্রভাতে উঠিয়া দেহে নূতন বল অনুভব করেন, এবং এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াও কাতর হইয়া পড়েন না। এতদিনে ইহাদের ভাষাও তিনি কিছু শিখিয়া ফেলিয়াছেন। আবদুলও শিখিয়াছে।

॥ চার ॥

এই অসভ্যগণের একজনের একটি বালক পুত্র আবদুলের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আবদুল যখন কাজ করিত, তখন সে প্রায়ই তাহার কাছে কাছে থাকিয়া খেলা করিত;—কার্য্য শেষ হইলে, আবদুল তাহাকে কোলে বা কাঁধে তুলিয়া বেড়াইতে যাইত। সেই দ্বীপে নানা জাতীয় শরগাছ ছিল—কোনটার ছাল শাদা ধবধবে, কোনটার পীতবর্ণ, কোনটার বা টক্‌টকে লাল। আবদুল একদিন অবসর সময়ে বসিয়া, নানা বর্ণের শরকাঠি হইতে ছাল ছাড়াইতে লাগিল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি হইবে আবদুল?'

আবদুল বলিল, "তোর জন্য একটা মজার জিনিস তৈরী করিয়া দিব।"

পরদিন কার্য্যশেষে আবদুল বসিয়া সেই শরের ছালগুলি দিয়া, বালকের জন্য একটি টুপী বুনিয়া দিল। সেই টুপী মাথায় দিয়া বালক ত আনন্দেই আটখানা!—সে নাচিতে নাচিতে গিয়া তাহার জনক জননীকে উহা দেখাইল।

সেই সুন্দর টুপী দেখিয়া, অসভ্যগণের মনে সেইরূপ টুপী পরিবার জন্য অত্যন্ত লোভ জন্মিল। তাহারা আবদুলকে কাঠ কাটা, মাটী খোঁড়া প্রভৃতি কার্য্য হইতে অবসর দিয়া বলিল, "তুমি কেবল সারাদিন বিভিন্ন মাপের এইরূপ টুপী প্রস্তুত কর—আমাদের সকলের জন্যই এইরূপ টুপী চাই। অবশ্য সর্দ্দার মহাশয় ও তাঁহার পুত্র পরিবারগণের টুপীগুলিই প্রথমে প্রস্তুত করিতে হইবে।"

ইহার পর হইতে আবদুল কেবল টুপীই বুনিতে লাগিল। তাহার কাজের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, অসভ্যগণ অত্যন্ত প্রীত হইল। বাসের জন্য তাহাকে ভাল ঘর দিল, এবং খাদ্যদ্রব্যাদিও ভাল ভাল দিতে লাগিল।

নবাব বাহাদুর সেই কাঠ কাটা এবং মাটী খোঁড়ার কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহার দেহে এখন বিলক্ষণ বলসঞ্চয় হইয়াছে- দেহ নীরোগ,—ভাগ্যবিপর্য্যয় সত্ত্বেও, মন এখন বেশ প্রফুল্ল থাকে। আবদুলের প্রতি এখন আর তাঁহার মনে কিছুমাত্র ঈর্ষা বা বিদ্বেষ নাই—তাহার সহিত বন্ধুভাবেই মিশিয়া থাকেন। আবদুলও তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে, এবং নিজের ভাল খাবারগুলির ভাগ দেয়।

বৎসর অতীত হইল। পারস্য রাজ্যের জাহাজ আবার এই দ্বীপে আসিয়া লাগিল। কাপ্তেন নামিয়া আসিয়া, নবাবকে এবং আবদুলকে জাহাজে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

যথাসময়ে জাহাজ গিয়া পারস্য দেশে পৌঁছিল। রাজাদেশে, আবদুল ও নবাব উভয়কেই সেই কাজি সাহেবের নিকট উপস্থিত করা হইল। তখনও উভয়েরই বন্দী-বেশ।

কাজি সাহেব নবাব বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অলস ও অকর্ম্মণ্য ধনী ব্যক্তির সহিত, দরিদ্র ও শ্রমশীল লোকের পার্থক্য কি, তাহা আপনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন কি?"

নবাব বলিলেন, "করিয়াছি, মহাশয়।"

"এখন আপনার ক্ষুধা কিরূপ হয়?"

"বিলক্ষণ হয়।"

"আর নিদ্রা?"

"অতি সুনিদ্রা হয়—রাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া যায় তাহা জানিতেও পারি না।"

"ইহার কারণ কি, তাহাও বোধ হয় আপনি উপলব্ধি করিয়াছেন?"

"ইহার কারণ,—মিতাহার ও শ্রমশীলতা।"

কাজি সাহেব বলিলেন, 'উত্তম কথা। এখন আপনি নিজগৃহে গমন করিতে পারেন।

দুর্দশায় পতিত হইয়া যে শিক্ষালাভ করিয়া আসিলেন, তাহা যেন আর ভুলিবেন না। আর এক কথা। আপনি অতি অন্যায়পূর্ব্বক এই গরীবের ঘর দুয়ার ও জীবিকার একমাত্র উপায়, ইহার শুরের ক্ষেত জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার ঘর দুয়ার নিজব্যয়ে আপনাকে নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে। এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ আপনি উহাকে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিবেন। এই সর্ত্তে আপনি সম্মত হইলেই আপনাকে ছাড়িয়া দিব, আপনি গৃহে যাইতে পারিবেন।"

নবাব বাহাদুর তৎক্ষণাৎ কাজি সাহেবের আদেশ প্রতিপালনে সম্মত হইলেন। এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, বন্ধুভাবে আবদুলের হস্ত ধারণ করিয়া, আদালত-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

বীরবলের গল্প

॥ এক ॥

কথিত আছে আকবর বাদশাহের সভাসদ্ রাজা বীরবল অত্যন্ত চতুর, সুরসিক ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন। প্রয়োজন হইলে, স্বয়ং বাদশাহকেও তিনি দু'কথা শুনাইয়া দিতে ভয় করিতেন না। বীরবলের প্রতি বাদশাহের স্নেহ ও শ্রদ্ধাও অপরিসীম ছিল।

একদিন বাদশাহ দরবার বরখাস্ত (সভা বিসর্জ্জন) করিবার সময়, সে কালের প্রথা অনুসারে উপস্থিত পাত্রমিত্রগণকে পান ও আতর বিতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় অসাবধানতাবশতঃ এক ফোঁটা আতর নিম্নস্থ গালিচার উপর পড়িয়া গেল। বাদশাহ হঠাৎ ঝুঁকিয়া, সেই আতরের ফোঁটাটি আঙুলে মুছিয়া তুলিয়া লইলেন। তুলিয়াই রাজা বীরবলের দিকে তাঁহার নজর পড়িল। বীরবল মস্তক নত করিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিলেন।

সভাভঙ্গের পর বাদশাহ বিশ্রামস্থানে গেলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরে এই কথাটাই ক্রমাগত খচ্ খচ্ করিতে লাগিল—"কেনই বা আমি নেহাৎ কুঞ্জুষের মত সে আতরের ফোঁটাটুকু তুলিতে গেলাম! একজন গরীব লোক যে আতর কখনও চোখে দেখে নাই, সে ওরূপ করিলে সাজিত। কিন্তু আমি দুনিয়ার মালিক আকবর বাদশা হইয়া ছি ছি বড়ই ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। বীরবল দেখিয়াছে—একদিন নিশ্চয়ই সে ইহা লইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিবে।"

এই ত্রুটিটুকু সারিয়া লইবার মানসে, পরদিন বাদশাহ হুকুম দিলেন, "রাজবাড়ীর সামনে ঐ যে জলের হাউজটা আছে, উহা খালি করিয়া, উৎকৃষ্ট আতরে ভর্ত্তি করিয়া দাও—এবং সহরে ঢোল দাও যে, বাদশাহ প্রজাদের জন্য আতর-সত্র খুলিয়াছেন, যাহার ইচ্ছা সে আসিয়া ঘটি বাটি কলসী ভর্ত্তি করিয়া আতর লইয়া যাইতে পারে।"

ঘড়া ঘড়া আতর ঢালিয়া সেই প্রকাণ্ড হাউজ ভর্ত্তি করা হইল। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে, হাজার হাজার লোক আসিয়া, ঘটি, বাটি, কলসী ইত্যাদি ভরিয়া সেই মূল্যবান আতর সমস্তটা লুটিয়া লইয়া গেল।

আকবর বাদশাহ বীরবলকে সঙ্গে লইয়া এই আতর-লুট দেখিতেছিলেন, শেষ হইলে বলিলেন, "রাজা, কেমন আনন্দ হইল বল দেখি?"

বীরবল উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা, হাউজ দিয়া কি বিন্দু ঢাকা যায়?"

শুনিয়া বাদশাহের মনে বড়ই ক্রোধের উদয় হইল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে

বলিলেন, "বীরবল, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার! তোমার মুখ আমি আর দেখিতে চাহি না। তুমি দূর হও। তোমার ধনসম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে তুমি রাজধানী পরিত্যাগ করিবে,—ইহাই তোমার দণ্ড।"

"যো হুকুম জাঁহাপনা"—বলিয়া কুর্নিশ করিয়া বীরবল প্রস্থান করিলেন।

॥ দুই ॥

বীরবল নির্ব্বাসিত। তাঁহার রাজ্য, ধনসম্পত্তি, সমস্তই বাদশাহের আদেশে বাজেয়াপ্ত।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে বাদশাহের রাগ পড়িয়া আসিল। তখন তাঁহার মনে অনুশোচনা উপস্থিত হইল। "আহা, কেন তাহাকে তাড়াইলাম? বড় ভাল লোক ছিল,—যেমন রসিক, তেমনি বুদ্ধিমান। বড় আনন্দেই তাহার সহিত কাল কাটাইতাম। কেন তাহাকে তাড়াইলাম?"

বাদশাহ প্রতিদিনই বীরবলের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য দেশে দেশে গুপ্তচর পাঠাইলেন—সন্ধান পাইলে নিজে গিয়া তাঁহার মান ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবেন।

দুই মাস গেল, চারি মাস গেল, ছয় মাস গেল, কিন্তু বীরবলের কোন সন্ধানই নাই। অবশেষে বাদশাহ স্থির করিলেন, একটা কৌশল করিয়া দেখিবেন। হুকুম দিলেন, 'আমার অধীনে যত বড় বড় সামন্তরাজ আছে, তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত কর।" —তালিকা প্রস্তুত হইল, ৫০ জন সামন্তরাজের নাম লিখিত হইয়াছে।

অতঃপর বাদশাহ হুকুম দিলেন, "৫০টা মেড়া খরিদ করিয়া আন।"

মেড়া খরিদ হইল। তখন নিম্নলিখিত পরোয়ানা সহিত, ঐ ৫০ জন সামন্তরাজের প্রত্যেকের নিকট এক একটা মেড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পরোয়ানা

"আকবর বাদশাহ এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম করিতেছেন, রাজকর্ম্মচারীর সহিত প্রেরিত মেড়াটি এক মাসকাল তুমি প্রতিপালন করিবে। ইহাকে প্রত্যহ চারি সের পরিমাণ উৎকৃষ্ট দানা খাইতে দিবে। যে রাজকর্ম্মচারী ইহা লইয়া যাইতেছে, সে নিজ তত্ত্বাবধানে মেড়াকে দানা খাওয়াইবে। একমাস পরে মেড়াটি রাজধানীতে ফেরৎ পাঠাইবে, কিন্তু সাবধান, বর্ত্তমানে ইহার দেহের ওজন যাহা আছে, ঠিক সেইরূপ থাকা চাই। যদি এক তোলা পরিমাণও ওজন ইহার বৃদ্ধি পায়, তবে তোমার লক্ষ টাকা জরিমানা হইবে। প্রকাশ্য দরবারে এই মেড়ার ওজন করা হইল ...মণ ...সের ...পোয়া ...ছটাক ...কাঁচ্চা!"

—অর্থাৎ, যে মেড়া যে রাজাকে পাঠানো হইতেছে,—সেটার কত ওজন, তাহা সেই রাজার নামীয় পরোয়ানায় লিখিত হইল।

এই মেড়া ও পরোয়ানা পাইয়া, রাজ্যে রাজ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল, প্রত্যহ চারি সের উৎকৃষ্ট দানা খাইয়াও মেড়ার ওজন বাড়িবে না, ইহা ত' অসম্ভব কথা! কেহ কেহ বলিল, "ইহা কেবল টাকা আদায়ের ফন্দি, আর কিছু নয়। তার চেয়ে খোলাখুলি পরোয়ানা দিলেই হইত, এক লক্ষ টাকা আমায় পাঠাইয়া দাও।"

॥ তিন ॥

বীরবল রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, যে সামন্ত রাজার সীমানার মধ্যে ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বাস করিতেছিলেন, সেই রাজার নিকটও রাজকর্ম্মচারীসহ একটি মেড়া ও পরোয়ানা গিয়া পৌঁছিল। সে রাজা কিছু অমিতব্যয়ী ছিলেন, ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন, এই পরোয়ানা পাইয়া তিনি ত' মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। "তাই ত' একে এই টানাটানি,—এক মাস পরে এক লক্ষ টাকা পাই কোথা? কি ফেসাদেই পড়া গেল, ছি ছি!"

লোকমুখে বীরবলও এই ব্যাপার অবগত হইলেন। তখন তিনি চাপকান পাগড়ী ইত্যাদি পরিধান করিয়া, রাজবাড়ী গিয়া, রাজার সহিত দর্শন প্রার্থনা করিলেন।

রাজার নিকট গিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, শুনিলাম আপনি নাকি মহা মেড়া-সমস্যায় পড়িয়াছেন?"

"হাঁ, সমস্যা নয় ত' আর কি?"

"আমি আপনার একজন দীন প্রজা। যদি আদেশ করেন আমি সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারি।"

"তাহা হইলে ত' বাঁচি। কি সমাধান? বল বল!"

"মহারাজের চিড়িয়াখানা আছে, তাহাতে কতকগুলি বড় বড় খাঁচায় বড় বড় বাঘ আবদ্ধ আছে দেখিয়াছি। সেই একটা বাঘের খাঁচার কাছে মেড়াটাকে বাঁধিবার হুকুম দিন। এক মাস ও মেড়া সেইখানেই বাঁধা থাকিবে। চারি সের কেন, যত খাইতে পারে দানা উহাকে দিবার আদেশ করিয়া রাখুন।"

এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য হইল।

মাসান্তে রাজকর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব জিম্মার মেড়া লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মেড়াগুলি একে একে আবার ওজন করা হইল। সেগুলির ওজন কাহারও দশ সের, কাহারও বিশ সের, কাহারও এক মণ বাড়িয়া গিয়াছে। কেবল একটি মেড়া, অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার ওজন প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

বাদশাহ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এ মেড়াটি এমন কাহিল হইয়া গেল কেন? ইহাকে চারি সের দানা কি রোজ দেওয়া হইত না?"

কর্ম্মচারী হাতযোড় করিয়া বলিল, "চারি সের কেন জাঁহাপনা ৫।৬ সের দানা ইহাকে প্রত্যহ দেওয়া হইত। কিন্তু তাহার সিকি ভাগও এ খাইত না। খাইবে কি—ইহাকে একটা মস্ত বাঘের খাঁচার সামনে এই এক মাস বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। বাঘটা যখন তখন ইহাকে দেখিয়া তর্জ্জন করিত, লোলুপ নেত্রে ইহার পানে চাহিয়া, জিভ বাহির করিত, সে জিভ দিয়া টস্ টস্ করিয়া লালা ঝরিত। মেড়া দানা খাইবে কি, ভয়েই কাঠ হইয়া থাকিত। আতঙ্কে আতঙ্কে দিন দিনই রোগা হইতে লাগিল।"

বাদশাহ বলিলেন, "কে এ রকম করিতে সে রাজাকে পরামর্শ দিয়াছিল জান?"

"শুনিয়াছি তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ* প্রজা তাঁহাকে ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বাদশাহ মনে মনে বলিলেন, সে ব্রাহ্মণ আর কেহ নয়, সেই বীরবল! নহিলে এত বুদ্ধি কার?

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ, সেই রাজ্যে একজন দক্ষ গুপ্তচরকে পাঠাইয়া দিলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বীরবলই নাম ভাঁড়াইয়া সেখানে বাস করিতেছেন। তিনিই রাজাকে পরামর্শ দিয়া মেড়াকে বাঘের খাঁচার সম্মুখে বাঁধাইয়াছিলেন।"

বাদশাহ বলিলেন—"সে আমি আগেই বুঝিয়াছি।"

তার পর বাদশাহ হাতী ঘোড়া সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজোচিত সমারোহে সেই রাজ্যে যাত্রা করিলেন এবং এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, মহা সমাদরে বীরবলকে ফিরাইয়া আনিলেন। বলা বাহুল্য, বীরবল তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সমস্তই ফিরিয়া পাইলেন।

* প্রবাদ এই যে, রাজা বীরবল কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কাজির বুদ্ধি

বাদশাহী আমল।

দিল্লীর প্রধান বিচারপতি, কাজি নবাব মির্জ্জা হামিদুদ্দীন আফসরউল্‌মুল্‌ক্‌ বাহাদুর সান্ধ্যনামাজ সমাপনান্তে, অন্তঃপুরে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া, সোণার আলবোলায় তাওয়াদার মৃগনাভিসুগন্ধি তামাকু সেবনে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময় তাঁহার খাস খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল, মাণেকচাঁদজী নামক একব্যক্তি দর্শনপ্রার্থী।

কাজি সাহেব চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নাম বলিলে?"

"মাণেকচাঁদজী।"

"কে সে, কি পরিচয় দিল?"

পরিচয় কিছুই দেয় নাই। বলিল, সে বড় বিপন্ন, তাহার উপর অত্যন্ত বে-আইনি হইয়াছে,—আপনি ধর্ম্মাবতার, আপনার নিকট সে নিজ দুঃখ নিবেদন করিবে।"

"তা, এখানে কেন? বিচারালয়ে, আমার পেস্কারের নিকট নিজ দরখাস্ত দাখিল করিতে বল।"

ভৃত্য সবিনয়ে উত্তর করিল, "হুজুর, সে বলিল, তাহার যাহা বক্তব্য তাহা অত্যন্ত গোপনীয়, ধর্ম্মাবতার ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট সে কথা সে প্রকাশ করিতে চাহে না। বড়ই কাঁদাকাটা করিতেছে, তাহার উপর বড়ই জুলুম হইয়াছে।"

কাজি সাহেব নীরবে আলবোলায় কয়েক টান দিয়া শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, বৈঠক-খানায় তাহাকে বসাও, আমি ক্ষণকাল পরে আসিতেছি।"

খানসামা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

কাজি সাহেব কিছুক্ষণ আরামে ধূমপান করিলেন। তারপর উঠিয়া, ধীরপদে বাহির হইয়া বৈঠকখানাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

মাণেকচাঁদ বসিয়া ছিল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্ভ্রমে কাজি সাহেবকে সেলাম করিল। "বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে"—বলিয়া কাজি সাহেব নিজেও উপবেশন করিলেন।

কাজি সাহেব দেখিলেন, লোকটির বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর, তাঁহার অপেক্ষা অন্ততঃ দশ বৎসরে বয়ঃকনিষ্ঠ। বেশবাস, ধনীজনোচিত নহে—দরিদ্রেরই মত। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাহেন আপনি?"

মাণেকচাঁদ বলিল, "আমি হুজুরের নিকট ন্যায়-বিচার চাহি। গরীবের উপর বড়ই জুলুম হইয়াছে।"

"কি হইয়াছে খুলিয়া বলুন।"

মাণেকচাঁদ তখন নিজ কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলঃ—

"হুজুর, তিন চারি পুরুষ আমরা এই দিল্লী নগরীর অধিবাসী। পূর্ব্বপুরুষদের আমল হইতেই আমাদের চিনির কারবার আছে। পিতার মৃত্যুর পর আমিই সেই কারবারের মালিক হই,—কারণ আমিই আমার পিতার একমাত্র সন্তান ছিলাম। কারবার চালাইতে লাগিলাম। বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্মও করিতে লাগিলাম। বেশ সুখেই কয়েক বৎসর কাটিল। কারবারটি আমি নিজে বড় দেখিতাম না। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের দিকেই আমার আকর্ষণ বেশী। টাকা পয়সার প্রতি কোনও দিনই নজর করি নাই। পুরাতন আমলের কর্ম্মচারীরা ছিল, তাহারাই দেখিত শুনিত। আমি তাহাদের উপরেই সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন সাধন-ভজন লইয়াই থাকিতাম। কিছুদিন পরে বুঝিতে পারিলাম, কর্ম্মচারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, নিজেরাই সব লুটিয়া পুটিয়া খাইতেছে।

ভাবিলাম, খাউক, আমি খাইতেছি, উহারা খাইবে না? আমি বসিয়া খাইতেছি, উহারা খাটিয়া খাইতেছে—হয়ত, আমার চেয়ে উহাদের অভাব আরও বেশী। এই ভাবেই চলিতেছিল। হুজুরের বোধ হয় স্মরণ আছে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই দিল্লী সহরে হায়জা-বিমারীর (কলেরা) অত্যন্ত প্রকোপ হইয়াছিল। সে বৎসর হাজার হাজার লোক ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। রামজীর কি মর্জ্জি হইল, তিনি আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সকলকেই আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাণেকচাঁদ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল!

কাজি সাহেব বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর ভাইয়া;—আল্লা যাহা করিয়াছেন, শোক করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করা তোমার উচিত নয়। চুপ কর, চুপ কর।"

কিয়ৎক্ষণ পরে মাণেকচাঁদ একটু সামলাইয়া লইল।

কাজি সাহেব বলিলেন, "তোমার উপর বে-আইনী জুলুম কি হইয়াছে, তাহাই বল।"

মাণেকচাঁদ আবার বলিতে লাগিল:—

"আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার মৃত্যুর পর, কিছুদিন আমি পাগলের মত হইয়াছিলাম। অবশেষে ভাবিলাম, আমি সংসার-মায়ায় জড়ীভূত হইয়া থাকি ইহা বোধহয় রামজীর ইচ্ছা নয়, তাই তিনি আমার সকল বন্ধন কাটিয়া দিলেন। সংসারের মোহে আর আকৃষ্ট হইব না; সাধন-ভজন করিয়াই জীবনের অবশিষ্টকাল কাটাইব। ইহাই স্থির করিয়া আমি কারবারটি বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। গৃহের দ্রব্যসামগ্রীও অনেক বিক্রয় করিলাম। ইহাতে লাক্ষাধিক টাকা হইল। ভাবিলাম, এখন কিছুদিন তীর্থ পর্য্যটন করি, তারপর ফিরিয়া আসিয়া ঐ টাকায় একটি দেবমন্দির স্থাপনা করিয়া সাধনভজনে নিযুক্ত হইব। ভাবিলাম, এত টাকা এখন রাখি কোথায়? এই সহরে আমার একজন ধনী বন্ধু আছেন, —শুধু ধনী নহেন, খুব পণ্ডিত ব্যক্তি—তাঁহার নাম মুন্সী ভবানীশঙ্কর—"

কাজি সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "কোন্ ভবানীশঙ্কর? যিনি চন্দন চৌকে বাস করেন?"

"হাঁ, তিনিই। চন্দন চৌকে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা—"

কাজি সাহেব বলিলেন, "হাঁ, তাঁহাকে চিনি আমি।"

মাণেকচাঁদ বলিল, "ভবানীশঙ্কর আমার বাল্যকালের বন্ধু। আমরা এক মখ্তবেই পাঠ করিয়াছি। ভাবিলাম, ভবানীশঙ্করের নিকট লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইব। তাই, তাহার কাছে গিয়া, সমস্ত কথা বলিয়া, লক্ষ টাকা তাহার নিকট জমা দিলাম।"

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসীদ লইয়াছিলে?"

মাণেকচাঁদ বলিল, "বাল্যবন্ধু, মানী লোক, লজ্জায় আমি রসীদ চাহিতে পারি নাই। তবে সে নিজেই বলিয়াছিল, 'একটা রসীদ দিব কি?—আমার খাতায় অবশ্য জমা করাই থাকিবে।' আমি লজ্জার খাতিরে বলিয়াছিলাম, রসীদ আর কি হইবে? তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইব, রসীদ হারাইয়া ফেলিব বইত নয়!"

কাজি সাহেব বলিলেন, "তার পর?"

"তার পর, আমি অবশিষ্ট টাকা লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলাম। দুই বৎসর কাল নানা তীর্থে ঘুরিয়া, এক সপ্তাহ মাত্র দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। সীতারামজীর একটি মন্দির বানাইবার জন্য, যমুনাতীরে একটি স্থান ঠিক করিয়া, গতকল্য আমি টাকাগুলি আনিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু কাজি সাহেব, বলিব কি, ভবানী টাকার কথা একদম অস্বীকার করিল। বলিল, আমি নাকি পাগল হইয়া গিয়াছি, তাই এই অসম্ভব কথা

বলিতেছি। আমাকে হাঁকাইয়া দিয়াছে। ভাবিতাম, ভবানীশঙ্কর অমন ভাল লোক, অত বড় বিদ্বান,—ও কখনও অধর্ম্ম করিবে না। কিন্তু দেখুন একবার কাণ্ডখানা!—এখন কাজি সাহেব, আপনি যদি দয়া করেন, তবেই আমার টাকাগুলি উদ্ধার হয়!"

কাজি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রসীদ না হয় লও নাই, টাকাটা জমা রাখিবার সময় সেখানে অন্য কেহ উপস্থিত ছিল কি?"

"কেহই ছিল না। শুধু সে আর আমি।"

"তবে বাপু আমি কি করিব বল। একটা রসীদ নাই, একটা সাক্ষীও নাই—কি করিয়া তোমার টাকা উদ্ধার করিয়া দিব?"

মাণেকচাঁদ বলিল, "তবে কি হুজুরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ বিচারপতি দিল্লী সহরে থাকিতে, গরীবের উপর এই বে-আইনি হইবে? কোনও উপায় চিন্তা করুন ধর্ম্মাবতার!"

কাজি সাহেব ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "আর, চীলম্ বদল্ দে।" মাণেকচাঁদকে বলিলেন, "আচ্ছা আমি চিন্তা করি, তুমি কল্য সন্ধ্যায় আবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আর, সাবধান, আমার কাছে আসিয়াছিলে, নালিস করিয়াছ, একথা কেহই যেন ঘুণাক্ষরে জানিতে না পারে। এখন যাও।"

"হুকুম তামিল করিব হুজুর"—বলিয়া মাণেকচাঁদ কাজি সাহেবকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

কাজি সাহেব সেইখানেই বসিয়া আবার আলবোলার নল মুখে লইলেন, এবং চক্ষু মুদিয়া, চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "ঠিক হোগা।"—চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, "অরে কৌন্ হ্যায়, চীলম্ বদল্ দে।"

পরদিন সন্ধ্যার পর মাণেকচাঁদ আসিয়া হাজির হইল। কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি বার?"

"আজ হুজুর মঙ্গলবার।"

"পরশু বৃহস্পতিবারে, বিকালে, তুমি আবার ভবানীশঙ্করের নিকট গিয়া টাকা চাহিবে। যদি সে পুনরায় অস্বীকার করে, তবে তুমি তাকে এই বলিয়া শাসাইবে, 'আচ্ছা, তবে অগত্যা আমাকে প্রধান কাজি সাহেবের দরবারে নালিসমন্দ্ হইতে হইবে। কল্য শুক্রবার আদালত বন্ধ। পরশু শনিবার প্রথম কাছারিতে নিশ্চয়ই আমি তোমার নামে নালিস দায়ের করিব, দেখি তিনি ইহার কোনও প্রতীকার করেন কি না।'—এই বলিয়া তুমি বাড়ী চলিয়া যাইবে।"

"যো হুকুম হুজুর।"—বলিয়া মাণেকচাঁদ প্রস্থান করিল।

পরদিন কাজি সাহেব মুন্সী ভবানীশঙ্করকে এই পত্রখানি লিখিলেন—

"বন্ধু,

বহুদিন আপনার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই। আজ সন্ধ্যার পর আমার গরীবখানার যদি একবার দর্শন দেন ত বিশেষ বাধিত হই। জরুরী কথাবার্ত্তা আছে। ইতি।"

পত্র পাইয়া ভবানীশঙ্কর একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল। হঠাৎ কাজি সাহেবের এ তলব কেন? তবে মাণেকচাঁদ তাঁহার কাছে গিয়া আমার নামে কিছু লাগাইয়াছে নাকি?—তাই তাহার টাকা ফেরৎ দিবার জন্য বন্ধুভাবে আমাকে অনুরোধ করিবার জন্যই ডাকেন নাই ত?"

সন্ধ্যার পর ভবানীশঙ্কর গিয়া কাজি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। কাজি সাহেব অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "দেখুন বাবুসাহেব, সহরে কি পরিমাণ জাল জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ইহা দেখিতেছেন ত?"

ভবানী। "হাঁ সাহেব, দেখিতেছি বইকি। ধর্ম্ম রসাতলে গেল। পাপ অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।"

কাজি। "মামলা মোকর্দ্দমা এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, আমার ত মশায় খাটিয়া খাটিয়া প্রাণটা গেল। বিশেষ এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। সেদিন বাদশাহের দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার কাছে সকল কথা আমি বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা কাজি সাহেব, আপনি বরং আপনার অধীনে দুইজন নায়েব-কাজি নিযুক্ত করুন। তাহাতে আপনার শ্রম লাঘব হইবে এবং মামলা মোকর্দ্দমার শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবে। দুইজন উপযুক্ত লোক স্থির করিবার ভার আমি আপনাকেই দিলাম। এমন দুইজন লোক স্থির করিবেন, যাঁহারা খুব বিদ্বান, অত্যন্ত ধার্ম্মিক, যাঁহাদের নামে শত্রুতেও কোনও অপযশ করিতে পারে না। রাজকোষ হইতে তাঁহাদের উপযুক্ত বেতনও মঞ্জুর করিব।' দরবার বরখাস্ত হইলে, আমি চলিয়া আসিতেছিলাম, বাদশাহ পুনরায় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখুন কাজি, দুইজন নায়েব-কাজি—একজন মুসলমান, একজন হিন্দু হওয়া আবশ্যক। কারণ হিন্দু মুসলমান উভয়েই আমার সমতুল্য প্রজা। কিন্তু ঐ কথা স্মরণ রাখিবেন—এমন দুইজন লোক চাই, যাঁহাদের নামে কোনও দিন কোনও শত্রুও কোন অধর্ম্মের আরোপ করে নাই।' তা, ভবানীশঙ্করজী—এ সহরের হিন্দুদের মধ্যে আপনাকেই আমি অত্যন্ত বিদ্বান ও ধার্ম্মিক বলিয়া জানি। আপনি কি এই কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন? মুসলমান একজনকে আমি স্থির করিয়াই রাখিয়াছি। যদি সম্মত হন ত বলুন, আগামী সোমবারে বাদশাহ আবাব আমায় তলব করিয়াছেন,—সেই দিন এই বিষয়ে তাঁহার পরোয়ানা হাঁসিল করিয়া আসিব।"

নায়েব-কাজিগিরি! এই দিল্লী সহরের?—বেতন যাই হোক,—উপরি আয়ও যে বিলক্ষণ! ভবানীশঙ্কর কাজি সাহেবকে বহু ধন্যবাদ দিয়া, কর্ম্মগ্রহণে নিজ সম্মতি জানাইলেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর মাণেকচাঁদ আবার গিয়া ভবানীশঙ্করের দ্বারস্থ হইল। টাকার কথা বলিবামাত্র, আবার তিনি গালিমন্দ করিয়া মাণেকচাঁদকে তাড়াইয়া দিলেন। মাণেকচাঁদও, শনিবার প্রথম কাছারিতেই নালিস দায়ের করিবে বলিয়া শাসাইয়া গেল।

মাণেকচাঁদ চলিয়া গেলে, কিছুক্ষণ পরে ভবানীশঙ্করের মনে হইল, "হায় কি করিলাম! শনিবার দিন ও যদি আমার নামে ঐ কুৎসিত নালিস কাজি সাহেবের নিকট দায়ের করে, তবে ত আমার উপর কাজি সাহেবের সন্দেহ জন্মিতে পারে। তাহা হইলে আমার নায়েব-কাজিগিরি চাকরিটাও ত ফস্কাইয়া যাইবে দেখিতেছি। তার চেয়ে বরং মাণেকচাঁদের লক্ষ টাকার লোভটা পরিত্যাগ করাই যাউক। চাকরিতে বাহাল হইলে অমন কত লক্ষ ঘরে আসিবে।"

পরদিন প্রভাতেই ভবানীশঙ্কর ভৃত্য পাঠাইয়া মাণেকচাঁদকে আবার ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "বন্ধু, তোমার মুখখানি অমন রাগ-রাগ কেন বলু দেখি। ঠাট্টা বোঝ না ভাই! দুই দিন আমি তোমার সহিত একটু ঠাট্টা করিলাম বইত নয়। এই নাও তোমার লক্ষ টাকা।"

মাণেকচাঁদ টাকা গণিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল।

সোমবার দিন সন্ধ্যায় ভবানীশঙ্কর কাজি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাদশাহের পরোয়ানা বাহির হইল? কবে হইতে আমায় এজলাস করিতে হইবে?"

কাজি সাহেব দুঃখিতভাবে বলিলেন, "না, মঞ্জুরী পাইলাম না। বাদশাহ বলিলেন, দেশময় বড়ই দুর্ভিক্ষ বাধিয়াছে—প্রজারা অনাহারে মরিতেছে—তাহাদের খাদ্য জোগাইতেই রাজকোষ শূন্য হইয়া যাইবে। এ বৎসর আর নায়েব-কাজি বাহাল করা হইবে না। একলাই আমায় সব কাজ করিতে হইবে। দেখি, এ বুড়া হাড়ে কতদিন চালাইতে পারি।"